হুমায়ুন আজাদ

বাক্যতত্ত্ব

বাক্য
প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব
সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্ব
রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ
বাঙলা বিশেষ্যপদ
বাক্য সর্বনামীয়করণ
প্রথাগত ব্যাকরণ
সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান

9 789840 412839

ছোটো, শাণিত, ও বিজ্ঞানমনস্ক একটি বই বেরোয় বিশশতকের দ্বিতীয়াংশে; বইটির নাম *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্যাকচারস*, রচয়িতার নাম আবরাম নোআম চোমস্কি। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এর প্রকাশ ভূকম্পনতুল্য। তখন পশ্চিমে উপাত্তপ্রণালিপদ্ধতি পরিবৃত হয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানসাধনা করছিলেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা; তাঁরা শনাক্ত ও শ্রেণীকরণ ক'রে চলছিলেন বিভিন্ন ধরনের ভাষাবস্তু; এবং নিজেদের শাস্ত্রকে খুবই বিজ্ঞানসম্মত ভেবে পাচ্ছিলেন পরম পরিতৃপ্তি। এমন সময়ে বেরোয় *সিন্টাক্টিক স্ট্রাকচারস্* এবং বদলে যায় বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথাগত ও সাংগঠনিক ধারণা। চোমস্কি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে বলেন 'শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান', এবং দেখান যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের মর্মে লুকিয়ে আছে মারাত্মক ত্রুটি। সাংগঠনিকেরা সীমাবদ্ধ থেকেছেন বস্তুর বাহ্যস্তরে; উপাত্তের ভেতরে প্রবেশে তাঁরা হয়েছেন ব্যর্থ। ভাষার মতো ব্যাপক সৃষ্টিশীল বিষয়কে তাঁরা সীমাবদ্ধ করেছেন ধ্বনিলিপিতে আবদ্ধ তুচ্ছ উপাত্তে। ব্যস্ত থেকেছেন তাঁরা ভাষার বহিরঙ্গের ব্যবচ্ছেদে, এবং ভাষার আন্তর শৃঙ্খলা উদঘাটনের বদলে নিবিষ্ট থেকেছেন ভাষার তুচ্ছ খণ্ডাংশের বহিঃস্তরের শ্রেণীকরণ ও বর্ণনায়। চোমস্কি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে বাতিল ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন এক নতুন ভাষিক তত্ত্ব—প্রস্তাব করেন ট্রান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার বা রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ কাঠামো, যার কেন্দ্রবস্তু ভাষার অনন্ত অসংখ্য বাক্য। এখন এটা স্বীকৃত যে ভাষাবিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসের চোমস্কীয় ভাষিক তত্ত্ব সবচেয়ে অভিনব ও বৈপ্লবিক; পুবপশ্চিমের ভাষাশাস্ত্রে এর কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। রূপান্তর ব্যাকরণের আবির্ভাবকে অভিহিত করা হয় চোমস্কীয় বিপ্লব নামে। চোমস্কীয় বিপ্লব বাক্যিক বিপ্লব, যা সৃষ্টি করেছে ভাষা সম্পর্কে নতুন, গভীর ও ব্যাপক বোধ; এবং এর প্রভাব পড়েছে মানববিদ্যার অন্যান্য শাখার ওপরও। সংকীর্ণ উপাত্ত বর্ণনার বিমর্ষতা থেকে চোমস্কি উদ্ধার করেন ভাষাবিজ্ঞানকে, এবং মানুষ সম্পর্কে পুনরায় সৃষ্টি করেন ব্যাপক মানবিক বোধ। চোমস্কীয় রূপান্তর ব্যাকরণের আদিকাঠামো এর পর সংশোধিত হয়; এবং তাঁর উত্তরসূরীরা কিছু মৌলিক বিষয়ে দ্বিমত পোষণ ক'রে উদ্ভাবন করেন সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব নামক নতুন ব্যাকরণকাঠামো। চার্লস জে ফিলমোর প্রস্তাব করেন তাঁর রূপান্তরমূলক কারক-ব্যাকরণকাঠামো। অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক পর্ব হচ্ছে বাক্যতত্ত্বের কাল। এ-সময়ে পৃথিবীর বহু ভাষা বর্ণিত-বিশ্লেষিত-ব্যাখ্যাত হয়েছে চোমস্কীয়, সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক এবং ফিলমোরীয় কারক-ব্যাকরণ কাঠামোতে। বাঙলা ভাষাবিজ্ঞান সব সময়ই কিছুটা পশ্চাৎবর্তী; পাশ্চাত্যের আধুনিক তত্ত্ব-কৌশল আমাদের অঞ্চলে পৌঁছোতে বেশ সময় নেয়। চোমস্কীয় ও ফিলমোরীয় রূপান্তর ব্যাকরণকাঠামোতে বাঙলা ভাষার বাক্যের এক এলাকা প্রথম বিশ্লেষিত হয়েছিলো হুমায়ুন আজাদেরই গবেষণাগ্রন্থ প্রোনোমিনালাইজেশন ইন বেঙ্গলিতে— ১৯৭৩-১৯৭৬ সময়ের মধ্যে। কিন্তু বাঙলা ভাষার ওই তত্ত্ব-কৌশল পরিবেশিত হয় নি। বাক্যতত্ত্ব গ্রন্থেই প্রথম পরিবেশিত হলো রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও কৌশল। কিন্তু এ-গ্রন্থ শুধু রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্বকৌশলবিষয়ক নয়; এতে পেশ করা হয়েছে ভাষাতত্ত্বের প্রধান তিনটি ধারার বাক্য বর্ণনাকৌশলের অনুপুঙ্খ বিবরণ। এ-গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে আটটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ : ছটি প্রধান

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

ISBN 978 984 04 1283 9

পরিচ্ছেদ— বাক্য; 'প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব; সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্ব; রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ; বাঙলা বিশেষ্যপদ; ও বাক্য সর্বনামীয়করণ; ও দুটি পরিশিষ্ট পরিচ্ছেদ : প্রথাগত ব্যাকরণ; ও সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান'। গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ব্যাপক 'পরিভাষা' 'রচনাপঞ্জি', ও নির্ঘণ্ট। পরিশিষ্ট প্রবন্ধ দুটি এ-গ্রন্থের ভূমিকার মতো; ভাষাবিজ্ঞান-উৎসাহীরা, যাঁরা অভিজ্ঞ নন ভাষাবিজ্ঞানে, এ-পরিচ্ছেদ দুটি প্রথমে পাঠ করে নেবেন, কেননা এ-পরিচ্ছেদ দুটি তাঁদের দেবে প্রধান পরিচ্ছেদগুলোতে প্রবেশের সামর্থ। প্রধান পরিচ্ছেদগুলো তাঁদেরই জন্যে, যাঁরা আয়ত্ত করতে চান ভাষাশাস্ত্র, ও যাঁরা বিশেষজ্ঞ। 'বাক্য' পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে 'বাক্য' ধারণাটি সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার ধারণার ব্যাপক পরিচয়। প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রধান ধারাগুলো—গ্রিক-লাতিন-সংস্কৃত-ইংরেজি ও বাঙলা ব্যাকরণে বাক্য বিশ্লেষণের তত্ত্ব ও কৌশলের পরিচয়। 'সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে বাক্যবর্ণনার সাংগঠনিক—বণ্টনিক ও অব্যবহিত-উপাদান–কৌশল। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' পরিচ্ছেদে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পেশ করা হয়েছে রূপান্তর ব্যাকরণকাঠামোর তত্ত্ব-কৌশল-প্রণালি-পদ্ধতি। চোমস্কীয় *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস ও আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণের* প্রকৃতি বিবৃত হয়েছে বিশদভাবে। চোমস্কি-উত্তর আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণকাঠামোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদ দুটিতে— 'বাঙলা বিশেষ্যপদ' ও 'বাক্য সর্বনামীয়করণ'-এ উদঘাটন করা হয়েছে বাঙলা বিশেষ্যপদ' গঠনের সূত্র ও একশ্রেণীর বাঙলা বাক্যের আভ্যন্তর শৃঙ্খলা। এ-গ্রন্থে বাক্যবর্ণনার তত্ত্বকৌশলের যে-বিস্তৃত বিজ্ঞানমনস্ক ভাষ্য রচিত হয়েছে, তা বাঙলা ভাষায় দুর্লভ।

হুমায়ুন আজাদ বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী, সত্যনিষ্ঠ, বহুমাত্রিক লেখক; তিনি কবি ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকার, কিশোরসাহিত্যিক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪ ; ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, বিক্রমপুরের রাড়িখালে। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি। ২০০৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বাঙলা একাডেমির বইমেলা থেকে ফেরার সময় চাপাতি দিয়ে আক্রমণ ক'রে মৌলবাদীরা তাঁকে গুরুতররূপে আহত করে, কয়েক দিন মৃত্যুর মধ্যে বাস ক'রে তিনি জীবনে ফিরে আসেন। তাঁর জন্যে সারা বাঙলাদেশ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো, যা আর কখনো ঘটে নি। ৭ আগস্ট ২০০৪ PEN-এর আমন্ত্রণে কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর গবেষণাবৃত্তি নিয়ে জার্মানী যান। এর পাঁচদিন পর ১২ আগস্ট ২০০৪ মিউনিখস্থ ফ্ল্যাটের নিজ কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর প্রকাশিত বই ৬০-র অধিক।

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

হুমায়ুন আজাদ

বাক্যতত্ত্ব

হুমায়ুন আজাদ

বাক্যতত্ত্ব

আগামী প্রকাশনী

প্রথম আগামী প্রকাশনী সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪০১ ডিসেম্বর ১৯৯৪
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা
মূল্য : ৭০০.০০

Bakyatattva (Syntax) : by Humayun Azad
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100
First Agamee Prakashani Edition February 2010
Price : Taka 700.00

ISBN 978 984 04 1283 9

উৎসর্গ

পানু আপা

আমার মাত্র চার বছরের বড়ো
কিন্তু এর মাঝেই মাটি আর মহাকালের অংশ
তবু আমারও অংশ

ভূমিকা

বাক্য, প্রথাগত ব্যাকরণে, যদিও বর্ণিত-ব্যাখ্যাত-বিশ্লেষিত হয়ে আসছে জেসাসের জন্মেরও আগে থেকে, তবু বিশশতকের পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়াংশের আগে বাক্যের বর্ণনা-বিশ্লেষণ প্রধান গুরুত্ব পায় নি। প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা শুদ্ধ শব্দ গঠন ও প্রয়োগের অনুশাসন রচনায় নিয়োগ করেছেন তাঁদের সমস্ত প্রতিভা; এবং বিশশতকের প্রথমার্ধের সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমস্ত বিজ্ঞানমনস্কতা ব্যয় করেছেন ভাষার ধ্বনি ও রূপ বর্ণনায়। বাক্য বর্ণনায় সাংগঠনিকেরা উদ্যোগী হয়েছেন খুবই কম। তবে বহু দিন ধ'রেই ভাষাভাষী ও ভাষাবিজ্ঞানীরা সহজভাবে বোধ ক'রে এসেছেন যে ভাষায় বাক্য কেন্দ্রবস্তু : ধ্বনি বা রূপ বাক্যের উপাদানমাত্র। প্রতিটি ভাষায় বাক্য অসংখ্য; ধ্বনি ও রূপ সীমিত সংখ্যক। সীমিত সংখ্যক ধ্বনি-রূপের বর্ণনায়ই তৃপ্ত থেকেছেন প্রথাগতরা ও সাংগঠনিকেরা; এবং এমন একটি ধারণা সংগোপনে পোষণ করেছেন যে অপার বাক্যসমষ্টি বর্ণনা করা অসম্ভব। ১৯৫৭ অব্দে চোমস্কি বাক্যকেন্দ্রিক রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকাঠামো পেশ করলে কালান্তর সূচিত হয় ভাষাবিজ্ঞানমণ্ডলে। এই প্রথম কেউ বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্দেশ করেন বাক্যের গুরুত্ব; এবং বাক্য বিশ্লেষণের—চোমস্কির ভাষায় 'সৃষ্টি'র—জন্যে পেশ করেন এক অভিনব ব্যাকরণকাঠামো, যা ভাষা সম্পর্কে নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিসম্পন্ন। চোমস্কির রূপান্তর ব্যাকরণকাঠামো পেশের পর অবসান ঘটে সাংগঠনিক ধ্বনি ও রূপ বর্ণনার কালের; শুরু হয় বাক্য বর্ণনা বা বিশ্লেষণ বা সৃষ্টির যুগ। ১৯৫৭-উত্তর ভাষাবিজ্ঞান ও বাক্যবিশ্লেষণ একার্থক : এ-সময় বিভিন্ন ভাষায় প্রযুক্ত ও সংশোধিত হ'তে থাকে চোমস্কীয় রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব-কৌশল; সম্প্রসারিত হ'তে থাকে তাঁর মানতত্ত্ব, আবির্ভূত হয় আর্থ ব্যাকরণকাঠামো। গত দু-দশকে চোমস্কীয় ও চোমস্কি-উত্তর সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকাঠামো অবলম্বনে বিশ্লেষিত হয়েছে বিপুল পরিমাণ মানবভাষার বাক্য।

গত দু-শো চল্লিশ বছর [১৭৪৩-১৯৮৩] ধ'রে বাঙলা ভাষা বর্ণিত-বিশ্লেষিত-ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে প্রধানত প্রথাগত ব্যাকরণকাঠামোতে, যা গঠিত ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণকাঠামোর মিশ্রণে। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ শব্দের ব্যাকরণ; তাতে গুরুত্ব পায় শব্দগঠনের বিধিবিধান, গৌণ স্থানে থাকে বাক্য। বিশশতকের বাঙলা কালানুক্রমিক ভাষাতাত্ত্বিকেরাও স্বাভাবিকভাবেই অনীহ ছিলেন বাক্যে; এবং পঞ্চাশ-ষাট-দশকের বাঙলা ভাষা বর্ণনাকারীরাও বাক্য-অসচেতন। তাঁদের কোনো উপায় ছিল না। পাশ্চাত্যে তখনও বাক্যের প্রাধান্য সূচিত হয় নি, তাই তাঁদেরও চিন্তার বাইরে ছিলো বাক্য।

কয়েক বছর আগে যখন আমি পরিকল্পনা নিই বাঙলা ভাষার একটি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল কারক-ব্যাকরণ রচনার, তখন বোধ করি যে ব্যাকরণ রচনার আগে রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব-কৌশল পেশ করা দরকার বাঙালি পাঠকদের সামনে। কেননা তত্ত্ব ও কৌশল না জানা পাঠকদের কাছে বাঙলা ভাষার রূপান্তর ব্যাকরণ জটিল, দুরূহ, অগম্য বোধ হবে। শুরুর সময় ভেবেছিলাম সংক্ষেপে রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব-কৌশল পেশ করলেই চলবে; কিন্তু ধীরে ধীরে আমার ধারণা বদলে যায়, রচনাটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে থাকে; এবং এক সময় বোধ করি যে শুধু রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব-কৌশল বর্ণনাই যথেষ্ট নয়; বরং তুলে ধরা দরকার ভাষাতত্ত্বের তিনটি প্রধান ধারার–প্রথাগত ব্যাকরণ, সাংগঠনিক

ভাষাবিজ্ঞান, ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের—বাক্য বর্ণনা-বিশ্লেষণ বা সৃষ্টির তত্ত্ব-কৌশলের পূর্ণ পরিচয়। পরিশেষে আমার পরিকল্পনা বর্তমান রূপ পায়। তবে এটিও সম্পূর্ণ নয়; কেননা আধুনিক কারক-ব্যাকরণের তত্ত্ব-কৌশল এখানে পেশ করা গেলো না। 'কারক-ব্যাকরণ' নামে একটি পরিচ্ছেদ থাকা উচিত ছিলো এ-গ্রন্থে; কিন্তু সে-পরিচ্ছেদটি রচনা এখনো অসম্পূর্ণ ব'লে এ-গ্রন্থভুক্ত হ'তে পারলো না।

গ্রন্থটির লক্ষ্য প্রধানত তিন শ্রেণীর পাঠক : এক—যাঁরা বাঙলা ভাষা-ও ভাষাবিজ্ঞান-উৎসাহী; দুই—যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও কৌশল আয়ত্তাভিলাষী; তিন—যাঁরা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব-কৌশলে অভিজ্ঞ। ভাষা-ও ভাষাবিজ্ঞান-উৎসাহী ও ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব-কৌশল আয়ত্তাভিলাষীদের কাছে বেশ দুরূহ ব'লেই বিবেচিত হবে এটি; তবে তাঁরা অনেক স্বস্তি পাবেন যদি বইটি পড়া তাঁরা শুরু করেন শেষ দিক থেকে; অর্থাৎ তাঁদের আমি পরিশিষ্ট পরিচ্ছেদ দুটি প্রথমে প'ড়ে নিয়ে বইটি পড়ার অনুরোধ জানাই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দুটি বিশেষভাবেই বিশেষজ্ঞদের জন্যে : এ-দুটি আয়ত্তের জন্যে বিশেষ দক্ষতা থাকা দরকার রূপান্তর ব্যাকরণে। তবে উৎসাহীরা পড়লে এদের প্রণালিপদ্ধতি দুরূহ বোধ হ'লেও বর্ণনা-ব্যাখ্যা-সিদ্ধান্ত বোঝা কঠিন হবে না।

বাঙলা ভাষায় রচিত ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ, অধিকাংশ সময়, পৃষ্ঠাপরম্পরায় ভরা থাকে বিদেশি ভাষার অঢেল উপাত্ত-উদাহরণ ও পরিভাষায়। আমি এ-গ্রন্থে সব সময়ই নিয়েছি বাঙলা উপাত্ত; ব্যবহার করেছি বাঙলা পরিভাষা। তাই এতে পাঠকেরা ঢুকতে পারবেন অনেক আরামে। তবু বইটি যে সহজ সরল হয়ে ওঠে নি, তার কারণ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই জটিল-দুরূহ। আমি ভাষাবিজ্ঞান চর্চা করেছি এখানে, প্রথাগত বাঙালির প্রিয় সরসতা-মাধুর্য বিলোতে চাই নি। যদিও আমি ভুলি নি যে পাণিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন পাঠশালা থেকে দুরূহতার অভিযোগে, তবু আমি কোথাও অতি সরলী-তরলীকরণে যাই নি একথা ভেবে যে এ-রচনার লক্ষ্য কোমলমতিরা নয়।

বইটি রচনায় ও সংশোধনে ও প্রকাশে সাহায্য আর অনুপ্রেরণা পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে। ডক্টর জাহাঙ্গীর তারেক সাহায্য করেছেন গ্রিক-লাতিন-জার্মান-ফরাশি শব্দ প্রতিবর্ণীকরণে। মঞ্জুর কবির সহায়তা করেছে নির্ঘণ্ট বিন্যাসে। কয়েকজন মেধাবী ছাত্রছাত্রীও কাজ করেছে দীপ্ত উদ্দীপকের মতো। আর অশেষ আদর প্রাপ্য তার, যে আমার কাছে সমকালীন স্বৈরাচারী অন্ধকারে অন্তিম আলোকখণ্ড—মৌলির : অনুপ্রাণিত করেছে যে আমাকে কখনো জড়িয়ে ধ'রে, কখনো বই এগিয়ে দিয়ে, এবং কখনো—আমার কষ্টে কাতর হ'য়ে—সারাটা বই নিজে লিখে দেয়ার প্রস্তাব ক'রে।

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা : *বাক্যতত্ত্ব*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোতে পারতো কয়েক বছর আগে, নানা কারণে দেরি হয়ে গেলো। ভাষাবিজ্ঞান থেকে এখন আমি দূরে আছি, আনন্দ পাচ্ছি অন্য ধরনের লেখা লিখতে; এবং দুঃখ পাচ্ছি এজন্যে যে ব্যাপক একটি বাঙলা ব্যাকরণ লেখার যে-স্বপ্ন আমার ছিলো, তা বোধ হয় আর বাস্তবায়িত হলো না। এ-সংস্করণে কিছু আমি যোগ করি নি, তবে অনেক বাক্য ও বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা বাদ দিয়েছি, এবং বদল করেছি কিছু শব্দের বানান, ও বাক্যের কাঠামো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ;—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ-সংস্করণের দায়িত্ব না নিলে বইটি আরো বহু কাল দুষ্প্রাপ্য থাকতো।

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
৭ আগস্ট ১৯৯৪ : ২৩ শ্রাবণ ১৪০১

হুমায়ুন আজাদ

সংক্ষেপসূত্র ও প্রথম প্রকাশের তথ্য

সংক্ষেপসূত্র : এ-গ্রন্থে নিম্নরূপ সংক্ষেপসূত্র ব্যবহৃত হয়েছে :

→	তীর : পুনর্লিখন সূত্রে ব্যবহৃত পুনর্লিখন চিহ্ন
⇒	দ্বৈততীর : রূপান্তর সূত্রে ব্যবহৃত সাংগঠনিক রূপান্তর নির্দেশক চিহ্ন
( )	প্রথম বন্ধনি : ঐচ্ছিকতাজ্ঞাপক চিহ্ন
{ }	দ্বিতীয় বন্ধনি : বিকল্প সম্প্রসারণজ্ঞাপক চিহ্ন
[ ]	তৃতীয় (চতুষ্কোণ) বন্ধনি : সমস্থানে বিভিন্নতাজ্ঞাপক চিহ্ন
বা[ ]বা	অভিধাসহ চতুষ্কোণ বন্ধনি : বাক্যের সীমানির্দেশক চিহ্ন
//	দ্বৈত তির্যক রেখা : ধ্বনিমূলচিহ্ন
/	একক তির্যক রেখা : প্রতিবেশনির্দেশক চিহ্ন
+ +	দ্বৈত যোগচিহ্ন : বাক্যের, বা অন্য কোনো উপাদানের, সীমানির্দেশক চিহ্ন
∅	শূন্য : শূন্য-ভাষাবস্তু নির্দেশক চিহ্ন
*	তারকা : ব্যাকরণবিরুদ্ধতা নির্দেশক চিহ্ন
+	যোগচিহ্ন : পুনর্লিখন সূত্রে সংযোগ নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত চিহ্ন
[ ]	চতুষ্কোণ বন্ধনি : বাক্যিক, আর্থ, ধ্বনিতাত্ত্বিক 'বৈশিষ্ট্য' নির্দেশক চিহ্ন
§	পরিচ্ছেদাংশচিহ্ন

অনু : অনুসর্গ; ক্রিমূ : ক্রিয়ামূল; ক্রিরূ : ক্রিয়ারূপ; ক্রিরী : ক্রিয়ারীতি; ক্রিস : ক্রিয়াসহায়ক; ক্রিপ : ক্রিয়াপদ; নি : নির্দেশক; বা : বাক্য; বি : বিশেষ্য; বিপ : বিশেষ্যপদ; বিক : বিশেষক; বিভ : বিভক্তি; বি$_{মনুষ্য}$: মনুষ্যবাচক বিশেষ্য; বি$_{বস্তু}$: বস্তুবাচক বিশেষ্য; মিপ্র : মিশ্রপ্রতীক; দ্র : দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রকাশের তথ্য : এ-গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বিভিন্ন গবেষণাপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। নিচে প্রথম প্রকাশগত তথ্য দেয়া হলো :

১৩৮৪ : ১৯৭৭ 'বাক্য সর্বনামীয়করণ'। *ভাষা-সাহিত্যপত্র,* চতুর্থ বর্ষ, ১০৭-১৩৮।

১৩৮৭ : ১৯৮০ 'প্রথাগত ব্যাকরণ' [প্রথম প্রকাশের নাম 'প্রচলিত ব্যাকরণ']। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* একাদশ সংখ্যা, জুন, ৯-৭১।

১৩৮৭ : ১৯৮০ 'সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান'। *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* ২৫ : ১, বৈশাখ-আশ্বিন, ১-৭২।

১৩৮৭ : ১৯৮০ 'সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্ব'। এ-পরিচ্ছেদটি *বাংলা একাডেমী পত্রিকায়* (১৩৮৭ : ১৯৮০) প্রকাশিত 'সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান'-এর অংশবিশেষ।

১৩৮৭ : ১৯৮০ 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ'। *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষা, ২৩-১৯৬।

১৩৮৭ : ১৯৮০ 'বাঙলা বিশেষ্যপদ'। *ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, ১ : ১, ৮২-১১৯।

১৩৮৮ : ১৯৮১ 'বাক্য'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংখ্যা,* জুন, ১৬১-১৯১।

১৩৮৯ : ১৯৮৩ 'প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব'। *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ২৭ : ৪, মাঘ-চৈত্র, ১২-৯১।

সূ চি প ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য

১.০ ভূমিকা

বাক্য কাকে বলে?—এ-প্রশ্ন করা হ'লে বহুদিন আগে ব্যাকরণ-ভুলে-যাওয়া ব্যক্তিও বেশ দৃঢ় উত্তর দেবেন : 'মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে এমন শব্দসমষ্টিই বাক্য।' তিনি বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পড়েছেন; বাক্যের সংজ্ঞা, আরো নানা সংজ্ঞার সাথে, মুখস্থ করেছেন। তারপর ভুলে গেছেন ব্যাকরণের বহু আদেশ-উপদেশ; কিন্তু তিনি যে-সব ব্যাকরণিক পরিভাষা আমৃত্যু বহন ও ব্যবহার করবেন, তার মধ্যে বাক্য প্রধান। শিক্ষিত মানুষকে কিছু-না-কিছু লিখতেই হয়, ও পড়তে হয় অনেক কিছু; তাই 'বাক্য' শব্দ ও ধারণাটিকে ভোলা সম্ভব হয় না তাঁদের পক্ষে। তাঁদের অনেকে বিশ্বাস করেন যে বাক্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বেশ পরিচ্ছন্ন : সহজেই বুঝতে পারেন কোন বাক্যটি শুদ্ধ, আর কোনটি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণ। বাক্যের যে-সংজ্ঞাটি তাঁরা শিখেছেন প্রথাগত ব্যাকরণে, সেটিকে তাঁরা অনন্য ধ্রুব ব'লে জানেন; কিন্তু বাক্যসংগঠন সম্পর্কে গবেষণায় রত হওয়ার সাথেসাথে গবেষক মুখোমুখি হন একঝাঁক বাক্য সংজ্ঞার। বিভিন্ন ইংরেজি ব্যাকরণে পাওয়া যায় বাক্যের দু-শোরও বেশি সংজ্ঞা (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ৯)); বাঙলা ব্যাকরণেও একগুচ্ছ সংজ্ঞা পাওয়া যায়। প্রথাগত ইংরেজি, ও তার অনুকরণে রচিত বাঙলা, ব্যাকরণে যে-সংজ্ঞাটি ফিরেফিরে পাওয়া যায়, সেটি এমন : 'যে-শব্দগুচ্ছ মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তা-ই বাক্য।' দু-হাজার বছর ধ'রে জনপ্রিয় এ-সংজ্ঞাটিতে এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার সাহায্যে নির্ভুলভাবে বাক্যশনাক্তি সম্ভব। 'মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশের' যে-মানদণ্ড পাওয়া যায় এতে, তা প্রয়োগযোগ্য নয় ; তাই বাস্তবে বাক্যনির্ণয়ের সময় এটির প্রয়োগ থেকে বিরত থাকি আমরা। যদি কেউ কোনো মুদ্রিত রচনার বাক্যসংখ্যা গুণতে চান, তবে তিনি এক পূর্ণচ্ছেদের পরের শব্দ থেকে আরেক পূর্ণচ্ছেদের আগের শব্দ পর্যন্ত শব্দগুচ্ছকে এক বাক্যরূপে ধ'রে হিশেব করবেন সমগ্র রচনার বাক্যসংখ্যা;—ওই শব্দগুচ্ছে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে কি-না, সেদিকে তিনি খেয়ালই করবেন না। তাঁর কাছে বাক্যের সংজ্ঞা এমন : 'এক পূর্ণচ্ছেদের অব্যবহিত পরবর্তী শব্দ থেকে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শব্দ পর্যন্ত বিন্যস্ত শব্দের সমষ্টিই বাক্য।'

এতে মনোভাব-সম্পূর্ণতার কোনো স্থান নেই, যদিও গণনাকারী ধ'রে নিতে পারেন যে লেখকমাত্রই দু-পূর্ণচ্ছেদের মধ্যে বিন্যস্ত শব্দে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করেন।

ছাত্রদের বাক্যবোধ জাগানোর চেষ্টা বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে খুব প্রবল নয়; কিন্তু পশ্চিমে এ-চেষ্টা অন্তহীন। সেখানে শিক্ষার্থীদের মনে বাক্যবোধ সৃষ্টির নিরন্তর চেষ্টা চালানো হয়, ও শুদ্ধ বাক্য রচনার কৌশল শেখানো হয় নিত্য অভিনব উপায়ে। তবুও ত্রুটি ঘটে, যা অনেকে লালন করে সারা জীবন। পাওয়া যায় এমন বাক্য, যা আসলে কয়েকটি বাক্যের সমাহার; আবার এমন বাক্যগুচ্ছও রচিত হয়, যা মাত্র একটি বাক্যে রূপ পেলেই ঠিক হতো। এমন ঘটে যেহেতু বাক্যবোধহীনতাবশত, তাই পশ্চিমের ছাত্রদের মনে বাক্যবোধ বা এমন আন্তর শক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, যার সাহায্যে তারা বাক্য থেকে অবাক্য বা অপবাক্যকে পৃথক করতে পারে। বাক্যবোধ সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়ালকট ও অন্যান্যের পরামর্শ (১৯৪০, ১১-৩৭) এমন (উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১০)) : 'আমাদের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, তা নির্ণয়ের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বাক্য 'অনুভব করা'। অসম্পূর্ণ বাক্য কোনো ভাব প্রকাশ করে না ...সম্পূর্ণ বাক্য থেকে অবাক্য পৃথক করা কঠিন কাজ নয়। কোনো ভাবনা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে কি-না, তা আমরা 'অনুভব করি' সহজাতভাবেই। ...ছাত্রদের রচনায় আরো একটি পুনরাবৃত্ত ত্রুটি হচ্ছে 'কমার সাহায্যে সংযোজন' ...তারা অনেক সময় একাধিক বাক্যকে কমা দিয়ে একসাথে জুড়ে দেয়। যদি আপনি সম্পূর্ণ বাক্য-একক 'অনুভব করা'র শক্তি আয়ত্ত ক'রে থাকেন, তবে আপনার এমন ভুল হওয়ার কথা নয়। ...এমন ত্রুটি নির্ণয়ের উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে রচিত বাক্য উচ্চস্বরে পড়া, ও অনুভব করা যে রচিত বাক্যে ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে কি-না।' বাক্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণবিদেরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন নি একটি বাক্যে ঠিক কি পরিমাণ ভাবনার প্রকাশ ঘটালে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

এক শব্দের বাক্য যেমন দেখা যায়, তেমনি চোখে পড়ে প্রচুর পরিমাণ শব্দে গঠিত বাক্য। উনিশশতকী বাঙলা ভাষার লেখকদের বাক্য সাধারণত দীর্ঘ; তা অনেক সময় পংক্তি-পরম্পরায় ছড়িয়ে প'ড়ে গ'ড়ে তোলে পরিপূর্ণ অনুচ্ছেদ। বিশশতকের লেখকেরা ছোটো বাক্যের প্রতি আকৃষ্ট; তাই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় এমন বাক্য, যার অনেকাংশ গঠিত অল্পসংখ্যক শব্দে। অনেক লেখক তাঁদের পাত্রপাত্রীদের মানস-জটিলতা উন্মোচনের জন্যে জটিল সূত্রে গঠিত বাক্যের পাশাপাশি রচনা করেন এমন অনেক উপবাক্য, বাক্য-টুকরো, যাতে কোনো সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। দীর্ঘ বাক্যের একটি উদাহরণ দিয়েছেন ফ্রিজ (১৯৫২, ১১);—তিনি জানিয়েছেন যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির ১৯৪৩ সালের প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে একটি বাক্য, যা গঠিত ৪২৮৪টি শব্দে, এবং মুদ্রিত হয়েছে এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী। এ-সমস্ত উদাহরণ একটি কথা জানায় যে একটি বাক্যে ঠিক কতোখানি ভাব প্রকাশ পাবে, এবং ঠিক কতোগুলো শব্দ বসবে, তা বাক্য রচনার আগে নির্ণয়ের উপায় নেই।

ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান ধারা—প্রথাগত ব্যাকরণ, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান, ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ—বাক্য সম্পর্কে মোটামুটি তিন রকম ধারণা পোষে। এর মধ্যে প্রথাগত ব্যাকরণের বাক্যধারণা সম্পর্কে আমরা অনেকটা অবহিত। প্রথাগত ব্যাকরণ বাক্যের সংজ্ঞা রচনা করে আর্থ মানদণ্ডে এবং আধেয়-অনুসারে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে বাক্য নামী ব্যাকরণিক এককটিকে। নানা ভাষায় এককটির নানা নাম, যেমন : বাক্য, লোগোস, প্রোপোজিতিও, ফ্রেজ, থিস, সাটজ; তবে পুবপশ্চিমের সমস্ত প্রথাগত ব্যাকরণই প্রায় অভিন্ন কৌশলে নির্ণয় করতে চেয়েছে বাক্য। প্রথাগত ব্যাকরণ অভিলাষী বাক্যের এক সর্বজনীন ও সর্বভাষিক আর্থ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে, যার সাহায্যে যে-কোনো ভাষার বাক্য শনাক্ত করা সম্ভব। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা ধ'রে নিয়েছিলেন যে ভাষা আন্তর ভাবনার প্রতিফলন বা বহিঃপ্রকাশ, এবং ব্যাকরণ যেহেতু ভাষার সূত্র উদঘাটনে উৎসাহী, তাই তা উদঘাটন করবে ভাবনার সমস্ত সূত্র। তাঁরা এমন ধারণাও পুষতেন যে মানব-মন চিন্তা করে বাক্যের সাহায্যে, আর সব মানুষের মনের গঠন যেহেতু একই রকম, তাই সব ভাষার বাক্যের মূল বৈশিষ্ট্য সদৃশ হ'তে বাধ্য। তাই প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা রচনা করেছিলেন বাক্যের সর্বজনীন আর্থ সংজ্ঞা, যা ব্যবহৃত হয়েছে দু-হাজার বছরেরও অধিক সময়; কিন্তু তা বাক্যশনাক্তির উপযুক্ত মানদণ্ড দিতে পারে নি। আদি প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা বাক্যের বিশ্বজনীন ও সর্বভাষিক সংজ্ঞা রচনায় উৎসাহী হ'লেও তাঁরা উপাত্ত-ভাষারূপে নিতেন সাধারণত গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত, বা ফরাশি, এবং বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের উপাত্ত-ভাষাতেই চিন্তাভাবনা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং অন্যান্য ভাষায়ও চিন্তাভাবনা অবিকল এমনভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত। যেমন : দিদরো মনে করতেন যে একমাত্র ফরাশি ভাষায়ই মনোভাব প্রকাশ পায় সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবে, তাই ফরাশিই বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ততম ভাষা (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৭))। তবু প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা বাক্যসংগঠন সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, যদিও সীমাবদ্ধতাও কম নয় তাঁদের। প্রথাগত বাক্যধারণার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি তোলেন সাংগঠনিকেরা। সাংগঠনিকেরা সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থ মানদণ্ডের বিরোধী, রৌপ মানদণ্ডের পক্ষপাতী এবং সর্বজনীনতায়ও অবিশ্বাসী তাঁরা। তাঁরা রৌপ মানদণ্ডে বাক্য শনাক্ত করায় উৎসাহী; এবং বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক ভাষার অনন্য নিজস্ব বাক্যসংগঠন রয়েছে (দ্র পরিশিষ্ট : দুই)। বাক্যসংগঠনের ওপর নতুন আলো ছড়িয়ে তাঁরা বাক্যসংগঠনের অনেক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হ'লেও তাঁদের বাক্যধারণা গভীর নয়। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৯৬৫)) উপস্থিত করেন বাক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা, এবং বাক্য বর্ণনায় অর্জন করেন অভূতপূর্ব সফলতা (দ্র চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। এ-পরিচ্ছেদে আমার লক্ষ্য প্রথাগত, সাংগঠনিক, ও রূপান্তরবাদী বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণার পরিচয় দেয়া, ও তাদের উপযুক্ততা বিচার করা।

১.১ গ্রিক-রোমান বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা

পাশ্চাত্য প্রথাগত ব্যাকরণে যে-বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা পাওয়া যায়, তার উৎস গ্রিক-রোমান বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা। পশ্চিমে প্রথম বাক্য সম্পর্কে ভেবেছিলেন গ্রিক দার্শনিক ও ব্যাকরণবিদেরা; এবং তাঁদের প্রতিভামণ্ডিত অনুকরণ করেছিলেন রোমানগণ। গ্রিক দার্শনিকেরাই প্রথম বাক্যের স্বরূপ উদঘাটনে মন দেন, ও পরে তাতে যোগ দেন ব্যাকরণবিদেরা। গ্রিক ভাষার তিনটি শব্দে ধরা পড়ে দু-রকম বাক্যধারণা। গ্রিক ধাতুজাত 'সিন্ট্যাক্স্' ও 'সেন্টেন্স্' শব্দের অর্থ 'একত্রবিন্যাস' ;—এ-শব্দ দুটি থেকে ধারণা করা যায় যে তাঁরা বিভিন্ন শব্দের সমবায় বা বিন্যাসকে বাক্য ব'লে মনে করতেন। এ-বাক্যধারণাটি প্রধানত রৌপ। আরো একটি শব্দ আছে গ্রিক ভাষায়, শব্দটি হচ্ছে 'লোগোস';—এর আছে বেশ কয়েকটি অর্থ; যেমন : 'পদ', 'বাক্য', 'প্রস্তাব' প্রভৃতি। এ-শব্দটি নির্দেশ করে বাক্যের আধেয় বা অর্থ।

গ্রিকদের মধ্যে প্রথম বাক্যশনাক্তির গৌরব দেয়া হয় প্রোতাগোরাসকে, তবে তাঁর বাক্যসংজ্ঞাটি সম্ভবত বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। অনেকের মতে তিনি শনাক্ত করেছিলেন চার রকম বাক্য;—'প্রার্থনা', 'প্রশ্ন', 'বিবৃতি', ও 'অনুজ্ঞা'; আবার কারোকারো মতে তাঁর শনাক্ত বাক্য সাত শ্রেণীর;— 'পরোক্ষোক্তি', 'প্রশ্ন', 'উত্তর', 'অনুজ্ঞা', 'প্রতিবেদন', 'প্রার্থনা', ও 'আমন্ত্রণ'। তাঁর শনাক্ত বাক্যশ্রেণীগুলো দেখে মনে হয় তাঁর বাক্যসংজ্ঞা ছিলো আর্থ। প্লাতো *থেআতেতুস* গ্রন্থে সক্রেতিসের মুখে ভাষার একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। ওই ভাষাসংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করা যায় বাক্যসংজ্ঞারূপে। সক্রেতিসের ভাষাসংজ্ঞাটি (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ৭৮)) : 'ভাষা হচ্ছে 'ওনোমাতা' [নাম, বিশেষ্য, বিশেষ্যপদীয়, কর্তা] ও 'হ্রিমাতা'র [পদ, উক্তি, ক্রিয়া, ক্রিয়াপদীয়, বিধেয়, কর্ম] সাহায্যে চিন্তাভাবনার প্রকাশ, যা মুখনিঃসৃত বায়ুস্রোতে বক্তার চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করে।' এ-সংজ্ঞাটি নির্দেশ করে যে সক্রেতিস ভাষা ও বাক্যকে অভিন্ন মনে করতেন। তাঁর সংজ্ঞায় বাক্যের যে-দুটি উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাই পরবর্তীকালে 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' নাম ধারণ করে। সক্রেতিসের মুখে প্লাতো যে-ভাষাসংজ্ঞা বসিয়েছেন, সেটিকেই গ্রহণ করতে পারি প্লাতোর বাক্যসংজ্ঞা ব'লে। এ-সংজ্ঞায় নির্ণীত হয়েছে বাক্যের মৌল উপাদান—'ওনোমা' ও 'হ্রিমা' : 'বিশেষ্য' (উদ্দেশ্য) ও 'ক্রিয়া' (বিধেয়), যা রক্ষিত হয়েছে পরবর্তী প্রথাগত ব্যাকরণে। তিনি যে-মানদণ্ডে বাক্য ও বাক্যের মৌল উপাদান নির্ণয় করেছিলেন, তা আর্থ। আরিস্ততলও আর্থ, ও নৈয়ায়িক, মানদণ্ডভিত্তিক বাক্যসংজ্ঞা রচনা করেছিলেন। বাক্য সম্পর্কে আরিস্ততলের মত (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ৮১)) : 'বাক্য হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, যার বিভিন্ন অংশের অর্থ থাকতে পারে, তবে তা হ্যাঁ-বা না-সূচক কোনো বিবেচনা জ্ঞাপন করে না। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যাক 'মরণশীল' শব্দটি। নিঃসন্দেহে এর অর্থ আছে, তবে এটি কোনো কিছুকে স্বীকার বা অস্বীকার করে না। স্বীকার বা অস্বীকার করার

জন্যে এর সাথে অন্য কিছু যোগ করা দরকার।' তাঁর কাছে বাক্য পূর্ণ অর্থপ্রকাশক উক্তি। তিনি বাক্যের সংজ্ঞা রচনায় প্লাতোকেই অনুসরণ করেছেন।

দিওনিসিউস থ্রাক্স, পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যাকরণরচয়িতা, তাঁর *গ্রাম্মাতিকি তেকনি*তে বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করেন নি, তবে বাক্যের যে-সংজ্ঞাটি রচনা করেছিলেন তিনি, সেটিই তেইশ শো বছর ধ'রে গৃহীত হয়ে আসছে বাক্যের জনপ্রিয়তম ও প্রধান সংজ্ঞারূপে। থ্রাক্সের বাক্যসংজ্ঞা নিম্নরূপ (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ৯৯)) : 'বাক্য হচ্ছে পূর্ণ অর্থবহ শব্দের সমষ্টি।' যে-শব্দগুচ্ছ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাক্যরূপে। থ্রাক্স বাক্য বিশ্লেষণ করেন নি;—গ্রিক বাক্য বিশ্লেষণে প্রথম মনোযোগ দেন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ব্যাকরণবিদ আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস। বাক্যসংগঠন সম্পর্কে দিস্কোলুসের মত (দ্র হাউজহোলডার (সম্পাদক ১৯৭২, ৯)) : 'অক্ষরের সমাবেশে যেমন শব্দ গঠিত হয়, তেমনি প্রতিটি স্বাধীন বাক্য গঠিত হয় যথাযোগ্য ভাবের সমাবেশে।' দিস্কোলুসের সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে শব্দের গ্রহণযোগ্য বিন্যাসেই বাক্য গ'ড়ে ওঠে না, বরং বাক্য গঠনের জন্যে দরকার গ্রহণযোগ্য ভাবের সমাবেশ। তাঁর সংজ্ঞাও আর্থ।

লাতিন ভাষার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যাকরণ রচনা করেন প্রিস্কিআন, ষষ্ঠ শতকে। আঠারো খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপক ব্যাকরণগ্রন্থের শেষ দু-খণ্ডে তিনি বর্ণনা করেন লাতিন বাক্য। বাক্যের সংজ্ঞা রচনায় তিনি অনুকরণ করেন থ্রাক্সকে, যদিও তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন দিস্কোলুসকে। প্রিস্কিআনের বাক্যসংজ্ঞা (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১১৫)) : 'বাক্য হচ্ছে শব্দের গ্রহণযোগ্য বিন্যাস, যা পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে।' এ-সংজ্ঞায় থ্রাক্সের প্রভাব স্পষ্ট। এ-ধারায়ই বাক্যের সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন ত্রয়োদশ শতকের ব্যাকরণবিদ পিত্রুস ইস্পানুস। তাঁর সংজ্ঞা এমন (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১৩৫)) : 'বাক্য হচ্ছে অর্থপূর্ণ উক্তি, যার বিভিন্ন অংশেরও অর্থ আছে।... সুষ্ঠু বাক্য শ্রোতার মনে একটি সম্পূর্ণ ভাব সঞ্চার করে, কিন্তু অশুদ্ধ বাক্য তেমন ভাব সঞ্চার করে না।' এটি প্রিস্কিআনের সংজ্ঞারই সম্প্রসারণ।

১.২ সংস্কৃত বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা

পুরোনো ভারতে বাক্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ে বিপুল শ্রম করেছেন দার্শনিক ও ব্যাকরণবিদগণ। বাক্য সম্পর্কে অনন্ত তর্কবিতর্ক করেছেন তাঁরা : কখনো চ'লে গেছেন অতীন্দ্রিয়লোকে, পরম ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশরূপে দেখেছেন বাক্যকে; আবার কখনো বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর মতো পর্যবেক্ষণ করেছেন বাক্যসংগঠন। বাক্যচিন্তায় দু-ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন তাঁরা;—এক গোত্রে ছিলেন 'বাক্যবাদী'গণ, যাঁদের বিশ্বাস বাক্যই একমাত্র সত্যবস্তু; অন্যগোত্রে ছিলেন 'পদবাদী'গণ, যাঁরা বিশ্বাস করতেন সবার ওপরে পদই সত্য, বাক্য নয়। বাক্যবাদীদের মতে বাক্য অখণ্ড-অবিভাজ্য একক, তা বিদ্যুচ্চমকের মতো জ্ব'লে উঠে ছড়ায় অর্থরশ্মি। পদবাদীদের মতে বাক্য খণ্ডনযোগ্য একক, যা গ'ড়ে ওঠে বিভিন্ন পদের

সমবায়ে। তবে তাঁরা সবাই প্রধানত আর্থ মানদণ্ডে শনাক্ত করতে চেয়েছিলেন বাক্য। *বাক্যপদীয়* নামক গ্রন্থের রচয়িতা ভর্তৃহরি বাক্য সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা ক'রে জানিয়েছেন যে সংস্কৃত দার্শনিক ও ব্যাকরণবিদগণ বাক্য সম্পর্কে কমপক্ষে আট রকম মত পোষণ করতেন (দ্র প্রভাতচন্দ্র (১৯৩৩, ১২৬))। এ-মতসমূহকে দু-ভাগে ফেলা সম্ভব : একভাগে আছেন 'অখণ্ডবাদী' বা বাক্যবাদীগণ, অন্যভাগে আছেন 'খণ্ডবাদী' বা পদবাদীগণ। স্ফোটবাদী ব্যাকরণবিদগণ ছিলেন অখণ্ড-বা বাক্য-বাদী, আর মীমাংসক ও নৈয়ায়িকেরা ছিলেন খণ্ড-বা পদ-বাদী।

বাক্যের যে-সংস্কৃত সংজ্ঞাটি সবচেয়ে জনপ্রিয়, ও প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে গৃহীত হয়েছে, সেটির রচয়িতা হিশেবে নাম পাওয়া যায় দুজনের : একজন বিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ, ও অন্যজন ব্যাকরণবিদ জগদীশ। বাক্যের সে-সংজ্ঞাটি : 'বাক্যংস্যাদ-যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়' (বিশ্বনাথ), অর্থাৎ 'আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমুচ্চয়ই বাক্য।' সংজ্ঞাটির 'আকাঙ্ক্ষা', 'যোগ্যতা', ও 'আসত্তি' পারিভাষিক শব্দ, যার মধ্যে 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' বাঙলা ব্যাকরণে অনেক সময় ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আকাঙ্ক্ষা' বলতে বোঝানো হয় যে শুধু সহাবস্থানযোগ্য শব্দই বাক্যে ব্যবহৃত হ'তে পারে, সহাবস্থানঅযোগ্য শব্দ পারে না। আধুনিক পরিভাষায় একে 'সহাবস্থানবিধি' [কোঅকারেন্স রেস্ট্রিকশন] বলা হয়। 'যোগ্যতা' বোঝায় যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহকে অর্থগতভাবে সুসঙ্গত হ'তে হবে, বিসঙ্গত শব্দের বিন্যাসকে বাক্য ব'লে গ্রহণ করা হবে না। আধুনিক পরিভাষায় একে বলা হয় 'সঙ্গতিবিধি' [সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন]। 'আসত্তি' ('আসক্তি' নয়) বোঝায় যে বাক্যে যে-সমস্ত শব্দ ঘনিষ্ঠভাবে ব'সে এককের মতো কাজ করে, সেগুলো পাশাপাশি বা সন্নিকটে অবস্থান করবে, তাদের একটিকে অন্যটির থেকে বেশি দূরে সরিয়ে নেওয়া যাবে না। এ-সংজ্ঞায় যে-তিনটি মানদণ্ড পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' রৌপ, 'যোগ্যতা' আর্থ।

ব্যাসের মতে প্রতিটি শব্দ মর্মমূলে বাক্যের শক্তি বহন করে, তাই শব্দমাত্রই বাক্য হ'তে পারে। মীমাংসকদের মতে (দ্র প্রভাতচন্দ্র (১৯৩৩, ১১৯)) ভাবের একত্বদ্যোতক শব্দসমষ্টিই বাক্য। তাঁরা বোঝাতে চান যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের নিজস্ব অর্থ থাকলেও সেগুলো সবাই মিলে সৃষ্টি করে একক-বাক্যার্থ; তাই বাক্যের বিভিন্ন শব্দের নিজস্ব মূল্য নেই। বাক্যের অর্থ জ্ঞাপন করাতেই তাদের সার্থকতা। মীমাংসকেরা বাক্যে ক্রিয়াপদের প্রাধান্য বুঝতে পেরেছিলেন, এবং ক্রিয়াপদকেই বাক্যের প্রধান পদরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। যেমন : কাত্যায়ন তাঁর *বার্তিক*-এ ক্রিয়াপদকেই বাক্যরূপে নির্দেশ করেছিলেন। ভর্তৃহরি বাক্য সম্পর্কে যে-আট রকম ধারণা খুঁজে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে যে ক্রিয়াপদ বা 'অখ্যাত শব্দ'ই বাক্যগঠনের জন্যে যথেষ্ট। মীমাংসকগণ, যাঁরা বিভক্ত ছিলেন দু-গোত্রে, বাক্য সম্পর্কেও পোষণ করতেন দু-মত। তাঁদের একগোত্রের নাম 'অভিহিতান্বয়বাদী', অন্যগোত্রের

নাম 'অন্বিতাভিধানবাদী'। অভিহিতান্বয়বাদীদের মতে বাক্য হচ্ছে শব্দসমবায়, বা শব্দ-'সংঘাত', বা শব্দক্রম। অন্বিতাভিধানবাদীদের মতে বাক্য হচ্ছে ক্রিয়ারূপ বা আখ্যাত, বা 'আদিপদ'। সংস্কৃত বাক্যসংজ্ঞাসমূহে আর্থ মানদণ্ড বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো, যদিও রৌপ মানদণ্ডও অনুপস্থিত নয়।

১.৩ প্রথাগত ইংরেজি বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যধারণা ও সংজ্ঞা পেয়েছিলেন গ্রিক-রোমান ব্যাকরণবিদদের কাছ থেকে। থ্রাক্স্ ও প্রিস্কিআনের বাক্যসংজ্ঞা তাঁরা কখনো অবিকল, কখনো কিছুটা বিকলরূপে ব্যবহার করেছেন তাঁদের ব্যাকরণপুস্তকে। ফলে রচিত হয়েছে বক্তব্যে প্রায়-অভিন্ন, কিন্তু ভাষায় কিছুটা ভিন্ন, কয়েক শো বাক্যসংজ্ঞা। তাঁরা প্রধান জোর দিয়েছেন থ্রাক্স্কথিত 'সম্পূর্ণ অর্থ বা ভাব'-এর ওপর, এবং বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা মেনে নিয়েছেন প্লাতোকে। প্লাতো প্রতিটি বাক্যকে যেমন 'বিশেষ্য' ও 'ক্রিয়া', বা 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়', খণ্ডে ভাগ করেছিলেন, ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরাও তা-ই করেছেন। তাই ইংরেজি ব্যাকরণে প্রধানত দু-রকম বাক্যসংজ্ঞা পাওয়া যায়;—একটি আর্থ, অন্যটি উপাদানগত। আর্থ সংজ্ঞাগুলো সম্পূর্ণ মনোভাবের ওপর জোর দেয়, আর উপাদানগত সংজ্ঞাগুলো গুরুত্ব আরোপ করে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় খণ্ডের ওপর। পাশ্চাত্য ভাষা-গবেষকেরা বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন বারবার। জন রিজ (১৮৯৪) একশো চল্লিশটি বাক্যসংজ্ঞা পর্যালোচনা ক'রে কোনোটিকেই ঠিক মনে না ক'রে নিজেই রচনা করেছিলেন নতুন একটি সংজ্ঞা, যেটিকে অন্যরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ১৭))। ইউজিন সিইডেল (১৯৩৫) বিচার করেছেন আশিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ বাক্যসংজ্ঞা, এবং ১৯৪১-এ কার্ল সুনডেন (১৯৪১) পরীক্ষা করেন সাম্প্রতিককালে রচিত বাক্যসংজ্ঞাগুলো। তিনিও কোনো সংজ্ঞাকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নি।

উল্লিখিত দু-ধরনের সংজ্ঞার একটি সংগ্রহ উপস্থিত করছি : (১)-এ গুচ্ছিত করা হলো আর্থ সংজ্ঞা, আর (২)-এ উপাদানগত সংজ্ঞা :

(১) ক 'বাক্য হচ্ছে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত শব্দের সমষ্টি, যা পূর্ণ ভাব রচনা করে।'[১]—(লৌথ (১৭৬২, ১১৮; উদ্ধৃত (গ্লিসন (১৯৬৫, ৯১))।

খ 'ভাষা গ'ড়ে ওঠে পৃথকপৃথক উক্তিতে, যার প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ... এ উক্তিগুলোই বাক্য। যে-কোনো পূর্ণ অর্থই বাক্য।'[২]—(বেইন (১৮৭৯, ৮; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৩))।

গ 'বাক্য হচ্ছে শব্দসমষ্টি, যার সাহায্যে আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কিছু বলি।'[৩]—(রো ও ওয়েব (১৮৯৭, ১))।

ঘ 'বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ যাতে কমপক্ষে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় বিদ্যমান থাকে, আর তাতে শব্দগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যাতে একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়।'[৪]—(ম্যাকমোরডি (১৯১১, ১৪৯))।

ঙ 'সম্পূর্ণ ভাবজ্ঞাপক শব্দগুচ্ছই বাক্য।'[৫]—(নেসফিল্ড (১৮৯৫, ৫))।

চ 'বাক্য হচ্ছে পূর্ণভাবজ্ঞাপক শব্দগুচ্ছ। বাক্যে অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকতে হবে।'[৬]—(হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৪৫))।

ছ 'বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ যাতে থাকে একটি ক্রিয়া ও একটি কর্তা, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শব্দ, যাতে ভাবটি ব্যাকরণগতভাবে পূর্ণতা পায়।'[৭]—(জোন্স্‌ (১৯৩৫, ২))।

জ 'বাক্য হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দগুচ্ছের সাহায্যে পূর্ণ ভাবের প্রকাশ।'[৮]—(ট্যানার (১৯২৮, ১৪))।

ঝ 'বাক্য হচ্ছে এক বা একাধিক শব্দের সাহায্যে ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ,—বাক্যে শব্দগুলো এমন রূপে ও ভাবে বিন্যস্ত হয়, যাতে ঈপ্সিত অর্থ দ্যোতিত হয়।'[৯]—(কারমে (১৯৪৭, ৯৭))।

ঞ 'বাক্য হচ্ছে শব্দসমবায়, যা এক বা একাধিক বোধের সমবায়ে গঠিত অন্তত একটি পূর্ণভাব জ্ঞাপক করে।'[১০]—(ফকনার (১৯৫০, ১))।

ট 'বাক্য হচ্ছে রচনা-একক, যার ওপর স্থাপিত হয় ভাব।'[১১]—(ওয়ারফেল ও অন্যান্য (১৯৪৯, ৮০))।

ঠ 'বাক্য হচ্ছে এমন উক্তি, যার সাহায্যে বক্তা, বিরাম গ্রহণের আগে, ঈপ্সিত বক্তব্য প্রকাশ করেন।'[১২]—(গার্ডিনার(১৯৩২, ২০৮;উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৪))।

(২) ক 'প্রত্যেক বাক্যের গোপন কথা নিহিত এখানে : আমরা সবসময় প্রথমে উল্লেখ করি কোনো বস্তু বা স্থান বা ব্যক্তি বা জিনিশের নাম, এবং তারপর আমরা ওই বস্তু বা স্থান বা ব্যক্তি বা জিনিশ সম্পর্কে কিছু বলি। এ-কাজ দুটি যদি না করি, তবে সম্পূর্ণ বাক্য গঠিত হয় না। যে-বস্তু, স্থান বা ব্যক্তি অথবা জিনিশ সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে, তাই সবসময় হবে উদ্দেশ্য। ওই বস্তু, স্থান, ব্যক্তি অথবা জিনিশ সম্পর্কে যা ব্যক্ত হচ্ছে, তাই সবসময় হবে বিধেয়।'[১৩]—(ওয়ালকট ও অন্যান্য (১৯৪০, ১, ৬১-৬২; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৪))।

খ 'পূর্ণভাব প্রকাশের জন্যে দুটি জিনিশ দরকার : (১) একটি কর্তা, যা কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু অথবা ভাবের নাম করে, এবং যার সম্পর্কে কোনো উক্তি করা হয়, এবং (২) একটি বিধেয়, যা কর্তা বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো উক্তি করে।'[১৪]—(বারকার (১৯৩৯, ৪; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৫))।

গ 'সংগঠন বা রূপ অনুসারে সংজ্ঞা রচনা করতে গেলে বলতে হয় যে বাক্য হচ্ছে ভাষার এক মৌল একক, শাব্দ যোগযোগ, যাতে কেন্দ্রবস্তুরূপে আছে একটি স্বাধীন ক্রিয়া, ও তার কর্তা।'[১৫]—(কিয়েরজেক ও গিবসন (১৯৬০, ৩৯))।

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যের সংজ্ঞা রচনার সময় বাক্যের রূপের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিলেও তাঁদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট অর্থের প্রতি। অর্থকেই তাঁরা যেনো বাক্য ব'লে মনে করেন, বাক্যের রূপটি দরকার হয় ওই অর্থ প্রকাশের জন্যে। প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের কেউকেউ বাক্যের অর্থ পরিহার ক'রে বাক্যের রৌপ সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন ফরাশি ভাষাবিজ্ঞানী মিইয়ে (১৯০৩)। তাঁর বাক্যসংজ্ঞা নিম্নরূপ (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ২০)) : 'বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় : ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় পরস্পরঅন্বিত শব্দগুচ্ছ, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং ব্যাকরণগতভাবে অন্য কোনো শব্দগুচ্ছের ওপর নির্ভরশীল নয়।'[১৬] মিইয়ের এ-সংজ্ঞাটিকে গণ্য করা যায় বাক্যের সাংগঠনিক সংজ্ঞার অন্যতম আদি-উদাহরণ ব'লে। তাঁর সংজ্ঞা ভিত্তি ক'রে প্রথাগত ব্যাকরণবিদ ইয়েসপারসেন রচনা করেছিলেন বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা (দ্র ইয়েসপারসেন (১৯২৪, ৩০৭); উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ২০)) : 'বাক্য হচ্ছে (আপেক্ষিকভাবে) সম্পূর্ণ ও স্বাধীন মনুষ্যোক্তি—এ-সম্পূর্ণতা ও স্বাধীনতা প্রকাশ পায় এর একাকী অবস্থানে বা এর একাকী অবস্থানের শক্তিতে, অর্থাৎ একে নিরপেক্ষভাবে উচ্চারণ করা যায়।[১৭] ইয়েসপারসেন বাক্যের অর্থকে যদিও বেশি গুরুত্ব দিতেন, তবু এখানে তিনি রচনা করেছেন সাংগঠনিক সংজ্ঞা। কিন্তু সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তাঁর সংজ্ঞাকেও গ্রহণ করেন নি, করেছেন ব্লুমফিল্ড-রচিত সংজ্ঞা, যার ওপর মিইয়ের প্রভাব বিদ্যমান (দ্র § ১.৫)

১.৪ প্রথাগত বাঙলা বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা

বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণবিদেরা পেয়েছেন দুটি উৎস থেকে : সংস্কৃত ব্যাকরণ, ও প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে। বিশ্বনাথ কবিরাজ ও জগদীশের নাম প্রচলিত সংজ্ঞাটি—'আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহই বাক্য'—কিছু ভুলত্রুটিসহ সম্ভবত গত একশো বছর ধ'রে প্রায় অবিকলরূপে বাঙলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু ইংরেজি-অনুসারী বাক্যসংজ্ঞার ঘটেছে নানা রকম বদল। কেননা বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতাগণ নিজনিজ সময়ের প্রভাবশালী ইংরেজি ব্যাকরণরচয়িতাদের অনুকরণ করেন, এবং মূলের পরিবর্তনের সাথে অনুকৃত বস্তুরও ঘটে বদল। বাঙলা ব্যাকরণবিদসমাজ একটি মৌলিকত্ববর্জিত সমাজ; — তাঁদের ধারণা ভাষা ও বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে সব কিছু আগেই বলা হয়ে গেছে, তাই তাঁদের কর্তব্য শুধু পুনরাবৃত্তি। বাক্যের সংজ্ঞারচনায়ও তাঁরা পুনরাবৃত্তিপ্রতিভার চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। নিচে তাঁদের একগুচ্ছ সংজ্ঞা সংগৃহীত হলো :

(৩) ক 'পদসকল পরস্পর অন্বিত হইয়া অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদায়কে বাক্য কহি।'—(রামমোহন (১৮৩৩, ৩৬৮))।

খ 'আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলে।'—(প্রসন্নচন্দ্র (১৮৮৪, ২১৯))।

গ 'ক্রিয়াদিযুক্ত পদসমূদায়কে বাক্য কহে। এক পদের সহিত অন্য পদের "যোগ্যতা", "আকাঙ্খা" ও "আসত্তি" না থাকিলে বাক্য হয় না।' — (লালমোহন (সংবৎ ১৯১৯, ২০))।

ঘ 'দুই বা অধিক পদ একত্র থাকিয়া পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিলে ঐ পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। বাক্যে অন্ততঃ কর্তা ও ক্রিয়া—এই দুই পদ থাকা আবশ্যক, নতুবা অর্থ সম্পূর্ণ হয় না।' —(নকুলেশ্বর (?১৩০৫, ১))।

ঙ 'যে পদসমূহদ্বারা কোন একটি মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায়, তাহাকে বাক্য বলে; অথবা যোগ্যতা, আকাঙ্খা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহের নাম বাক্য।' — (হরনাথ (?১৯৩০, ২৫৯))।

চ 'পরস্পর অর্থসঙ্গতিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলে।' — (প্রসন্নচন্দ্র (১৯৩৭, ১১৩))।

ছ 'যে পদসমূহের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় তাহার নাম বাক্য।' — (জগদীশচন্দ্র (১৩৪০, ৩৩৮))।

জ 'যে পদ-বা শব্দ-সমষ্টির দ্বারা কোনোও বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপে বক্তার ভাব প্রকটিত হয়, সেই পদ-বা শব্দ-সমষ্টিকে বাক্য বলে।'—(সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৭))।

ঝ 'কোনও ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে, এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলা হয়।'—(সুনীতিকুমার (১৯৭২, ২৮৪))।

ঞ 'সুবিন্যস্ত পদসমষ্টির দ্বারা যদি বক্তার পুরাপুরি আকাঙ্খা প্রকাশ পায় তবে ঐ পদসমষ্টিকে 'বাক্য' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।'—(মু এনামুল (১৯৫২, ২১৭))।

ট 'একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।' — (মু শহীদুল্লাহ (১৩৫৬, ২৪০))।

ঠ 'কতকগুলি পদ যখন যথাযোগ্য ক্রম অনুসারে অন্বিত হইয়া একটি ভাবের আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ দান করে তখন সেই পদগুলির সমষ্টিকে বাক্য বলে।'— (কালিদাস (?, ৩৮১))।

ওপরের সংজ্ঞাগুলোর অধিকাংশ গ্রিক-লাতিন অনুসারী প্রথাগত ইংরেজি বাক্যসংজ্ঞার অনুবাদ, বা অনুকরণে রচিত; এবং কোনোকোনোটি রৌপ মানদণ্ডভিত্তিক আধুনিক সংজ্ঞার অনুবাদ। যেমন : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়(৩জ) সংজ্ঞাটি রচনা করেছিলেন প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে; আর (৩ঝ) সংজ্ঞাটি গঠন করেছেন ইয়েসপারসেনের সংজ্ঞার আদলে। আকাঙ্ক্ষা-আসত্তি-যোগ্যতার মানদণ্ডনির্ভরতাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। সংস্কৃত এ-বাক্য সংজ্ঞাটির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনেক ব্যাকরণরচয়িতা। তাঁদের ত্রুটি ঘটেছে প্রধানত 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' ধারণা দুটি ব্যাখ্যায়। তাঁরা 'আকাঙ্ক্ষা'র পারিভাষিক অর্থের বদলে গ্রহণ করেছেন এর শব্দার্থ, তাই ঘটেছে ত্রুটি (দ্র সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৮); মু এনামুল (১৯৫২, ২১৮))। সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৮) 'আকাঙ্ক্ষা' ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'কোনও বাক্য বা উক্তির পূর্ণ উদ্দেশ্য গ্রহণের জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে; এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত না মিটে, বা যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যে অন্য নতুন পদ আসিবার আবশ্যকতা থাকে।' এখানে 'আকাঙ্ক্ষা'র আভিধানিক অর্থ ধ'রে বাক্যসংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা 'আকাঙ্ক্ষা' বলতে বুঝিয়েছেন বাক্যে পদের সহাবস্থানের বিধিনিষেধকে, আরো বলা বা জানার বাসনাকে নয়। 'আসত্তি' শব্দটি অজ্ঞতাবশত 'আসক্তি' রূপ পেয়েছে অনেকের হাতে। 'আসত্তি'র অর্থ 'নৈকট্য'; কিন্তু প্রথাগত অনেক ব্যাকরণপ্রণেতা এ-শব্দটিতেও আরো জানা বা বলার এক রকম কামনা লুকিয়ে আছে ভেবে এটিকে পরিণত করেছেন 'আসক্তি' শব্দে (দ্র মু এনামুল (১৯৫২, ২১৯))।

১.৫ সাংগঠনিক বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা

প্রথাগত ব্যাকরণের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি তোলেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা; এবং তাঁরা নানাভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে প্রথাগত ব্যাকরণ অবৈজ্ঞানিক। প্রথাগত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী, একটির দৃষ্টিতে যা মূল্যবান অন্যটির চোখে তা তুচ্ছ। প্রথাগত ব্যাকরণ বিশ্বাসী সর্বজনীন তত্ত্বে ও অর্থে, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান বিশ্বাসী প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব সংগঠনে ও রূপে। বাক্যক্ষেত্রে এ-বিরোধ চরমরূপে দেখা দেয় : সাংগঠনিকেরা দেখাতে থাকেন যে প্রথাগত ব্যাকরণের আর্থ মানদণ্ডে কোনো ভাষারই বাক্য নির্ণয় সম্ভব নয়। তাঁরা দাবি করেন বাক্য নির্ণয়ের জন্য রৌপ মানদণ্ড, যা ভাষায় ভাষায় ভিন্ন। প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মিইয়ে ও ইয়েসপারসেন (দ্র § ১.৩) সাংগঠনিকদের উদ্ভবের আগেই রচনা করেছিলেন বাক্যের সাংগঠনিক সংজ্ঞা, যা সাংগঠনিকদের প্রভাবিত করেছে। 'বাক্য' ধারণার সাথে একটি নতুন ধারণা যুক্ত করেন সাংগঠনিকেরা, সেটি হচ্ছে 'উক্তি'।

ব্লুমফিল্ড, মিইয়ের অনুসরণে, বাক্যের যে-সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন, সেটিই গৃহীত হয়েছে আদর্শ সাংগঠনিক বাক্যসংজ্ঞারূপে। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯২৬, ২৮)) : 'যে-কোনো উক্তি-অন্তর্গত বৃহত্তম রূপই বাক্য। সুতরাং, বাক্য হচ্ছে উক্তি-অন্তর্গত এমন রূপ, যা

বৃহত্তর কোনো সংগঠনের অংশ নয়।'[১৮]—এ-সংজ্ঞার তাৎপর্য বোঝা যাবে ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ১৭০) থেকে উদ্ধৃত নিচের ব্যাখ্যার সাহায্যে :

> যে-কোনো উক্তিতে কোনো ভাষিক রূপ উপস্থিত হয় অন্য কোনো বৃহত্তর রূপের উপাদান রূপে;—যেমন 'জন' উপস্থিত 'জন পালিয়ে গেছে' উক্তিতে; অথবা তা উপস্থিত হয় স্বাধীন রূপে, কোনো বৃহত্তর (জটিল) ভাষিক রূপের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে;—যেমন 'জন' উপস্থিত বিস্ময়সূচক উক্তি 'জন'!-এ। যখন কোনো ভাষিক রূপ কোনো বৃহত্তর রূপের অংশরূপে উপস্থিত হয়, তখন সেটি অবস্থিত 'অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে', অন্যথায় সেটি অবস্থিত থাকে 'স্বাধীন-অবস্থানে' এবং বাক্য গঠন করে।
>
> কোনো রূপ এক উক্তিতে উপস্থিত হ'তে পারে বাক্যরূপে, আবার অন্য কোনো উক্তিতে থাকতে পারে অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে। ওপরের বিস্ময়সূচক উক্তিতে 'জন' একটি বাক্য, কিন্তু বিস্ময়সূচক উক্তি 'দুর্ভাগা জন!'-এ 'জন' অবস্থিত অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে। দ্বিতীয় বিস্ময়সূচক উক্তিতে 'দুর্ভাগা জন' একটি বাক্য, কিন্তু 'দুর্ভাগা জন পালিয়ে গেছে' উক্তিতে তা অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে অবস্থিত। পুনরায় ওপরের উদাহরণে 'দুর্ভাগা জন পালিয়ে গেছে' একটি বাক্য, কিন্তু 'যখন কুকুরটি ঘেউঘেউ ক'রে উঠেছিলো, তখন দুর্ভাগা জন পালিয়ে গেছে' উক্তিতে তা অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে অবস্থিত।
>
> উক্তি গঠিত হ'তে পারে একাধিক বাক্যেও। এমন ঘটে যখন কোনো উক্তিতে সন্নিবিষ্ট হয় কয়েকটি ভাষিক রূপ, যাদের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ, প্রথাগত ব্যাকরণিক বিন্যাসের মাধ্যমে (অর্থাৎ কোনো সাংগঠনযোগে) বৃহত্তর কোনো রূপে আবদ্ধ করা না হয়। যেমন : 'কেমন আছো? আজ দিনটা চমৎকার। আজ বিকেলে কি তুমি টেনিস খেলবে?' এ-রূপ তিনটির মধ্যে বাস্তব যে-সম্পর্কই বিদ্যমান থাক-না-কেনো, কোনো ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় এদের কোনো বৃহত্তর রূপে আবদ্ধ করা হয়নি। তাই এ-উক্তিটি তিনটি বাক্যের সমষ্টি।
>
> কোনো উক্তিতে অংশী বাক্যসমূহকে এ-কারণে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয় যে প্রতিটি বাক্যই একটি ক'রে স্বাধীন ভাষিক রূপ, যা কোনো ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর কোনো ভাষিক রূপের অন্তর্ভুক্ত নয়। অধিকাংশ, সম্ভবত সব, ভাষায়ই নানা রকম ট্যাকসিমযোগে বাক্য পৃথক করা হয়, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্য শনাক্ত করা হয়।

ব্লুমফিল্ডের সংজ্ঞানুসারে বাক্য হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন, যা অন্য কোনো সংগঠনের অংশ নয়। সাংগঠনিকেরা সবাই মেনে নিয়েছেন তাঁর সংজ্ঞা, যদিও অনেকে একই বক্তব্য পেশ করেছেন বিভিন্ন ভাষায়। যেমন : লায়ন্স (১৯৬৮, ১৭২) এ-সংজ্ঞাকেই পেশ করেছেন এভাবে :

'বাক্য হচ্ছে ব্যাকরণিক বর্ণনার বৃহত্তম একক।' অর্থাৎ যে-সমস্ত একক ভিত্তি ক'রে ভাষা বর্ণনা করা হয়, তার মধ্যে বৃহত্তমটি হচ্ছে বাক্য। হকেটও (১৯৫৮, ১৯৯) ব্লুমফিল্ডের সংজ্ঞাকেই ভিন্নরূপে প্রকাশ করেছেন : 'বাক্য হচ্ছে এমন ব্যাকরণিক রূপ, যা অন্য কোনো সংগঠনভুক্ত নয় : তা উপাদান নয়, উপাদানে গঠিত।' এ-সব সংজ্ঞা একটি কথা স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করে যে বাক্য ব্যাকরণিক বর্ণনার একটি একক, যা ব্যাকরণিক প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগেই শনাক্ত করা সম্ভব। বাক্যকে স্থূল অর্থে বাস্তব বস্তু ভাবা ঠিক নয়।

সাংগঠনিকেরা বাক্যপ্রসঙ্গে 'উক্তি' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেন। 'উক্তি' কাকে বলে? কতোখানি কথাকে আমরা ধরতে পারি 'উক্তি' রূপে? উক্তিরও নানা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। ব্লুমফিল্ডের (১৯২৬, ২৬) মতে 'যে-কোনো ভাষিক ক্রিয়াই উক্তি।' কিন্তু এর সাহায্যে উক্তি নির্ণয় কঠিন, কেননা এতে স্পষ্ট ক'রে বলা হয় নি একটি উক্তিতে কী পরিমাণ 'ভাষিক ক্রিয়া' স্থান পাবে। হ্যারিসের (১৯৫১, ১৪) মতে 'উক্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বাক্যাংশ, যার আগে-পরে নীরবতা বিরাজ করে।' ফ্রিজ (১৯৫২) বাক্যবর্ণনার সময় উক্তিতে 'ভাষিক ক্রিয়া'র পরিমাণ স্থির ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি কাজ করেছিলেন রেকর্ড করা দূরালাপের ভাষা নিয়ে, এবং হ্যারিসের অনুসরণে তৈরি করেছিলেন 'উক্তি'র সংজ্ঞা। টেলিফোনে একজনের কথা শেষ হ'লে অন্যজন কথা শুরু করে। ফ্রিজ একজন যতক্ষণ কথা বলে, সে-টুকু কথাকে গ্রহণ করেছেন উক্তি হিশেবে এবং তার নাম দিয়েছেন 'উক্তি-একক' (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ২৩))। ফ্রিজ নানা রকম উক্তি বর্ণনা করেছেন; তার মধ্যে একরকম উক্তির নাম তিনি দিয়েছেন 'ন্যূনতম স্বাধীন উক্তি'। তাঁর কাছে 'ন্যূনতম স্বাধীন উক্তি'ই বাক্য। ফ্রিজ (১৯৫২) কাজ করেছেন একরাশ টেলিফোন-আলাপকে উপাত্ত হিশেবে গ্রহণ ক'রে, অর্থাৎ তাঁর কাছে ভাষা সীমিতসংখ্যক বাক্যের সমষ্টি।

১.৬ রূপান্তরবাদী বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা পোষণ করেন ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা, এবং এ-ধারণা প্রকাশ পায় বাক্য কেন্দ্র ক'রে। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা ভাষা বিশ্লেষণের সময় বিশেষ ও অশেষ গুরুত্ব দেন রূপতত্ত্বের ওপর; তাঁদের ব্যাকরণ প্রধানত শব্দশাস্ত্র। সাংগঠনিকেরা প্রধানত ধ্বনিতাত্ত্বিক, ও কিছুটা রূপতাত্ত্বিক। বাক্যতত্ত্ব তাঁদের ব্যর্থতার এলাকা। যেখানে ব্যর্থ হন সাংগঠনিকেরা, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেন রূপান্তরবাদীরা। তাঁদের ব্যাকরণ বাক্যকেন্দ্রিক : তাঁদের মতে প্রতিটি ভাষা অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি;—তাই ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার সংখ্যাহীন বাক্য সৃষ্টি করা। রূপান্তরবাদী ব্যাকরণে বাক্য বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করা হয় না, সৃষ্টি করা হয়; এবং সৃষ্টি করার সময় দেয়া হয় প্রতিটি বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক বর্ণনা। বাক্য সম্পর্কে রূপান্তরবাদী ধারণাও অভিনব। প্রথাগত ও সাংগঠনিকদের মতে বাক্য এক রকম মূর্ত বস্তু; কিন্তু রূপান্তরবাদীরা বাক্যকে গ্রহণ করেন বিমূর্ত ব্যাকরণিক ধারণা হিশেবে। রূপান্তর

ব্যাকরণে দুটি মূল্যবান ধারণার নাম 'ভাষাবোধ', ও 'ভাষাপ্রয়োগ' (দ্র § ৪.২.৬)। ভাষাবোধসংশ্লিষ্ট ব্যাকরণিক একক হচ্ছে 'বাক্য', আর ভাষাপ্রয়োগসংশ্লিষ্ট ধারণা হচ্ছে 'উক্তি'।

প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যের সংজ্ঞা পাওয়া যায় বহু; সাংগঠনিকেরাও বাক্য বর্ণনার আগে বাক্যসংজ্ঞা দেন; কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্যের সংজ্ঞা পাওয়া বেশ দুর্লভ ঘটনা। চোমস্কির রচনাবলিতে (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৯৬৫)) বাক্যসৃষ্টির কথা বারবার ব্যক্ত হয়; কিন্তু বাক্য বলতে তিনি কী বোঝেন, তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন না। তিনি যেনো অনেকটা ধ'রে নেন যে ভাষাভাষী মাত্রই বাক্যবোধসম্পন্ন। তাই তাঁর প্রস্তাবিত ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষাভাষীর বাক্যবোধ স্পষ্টভাবে উদঘাটন করা। নিচের উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয় (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৩));

> এখন থেকে আমি ধ'রে নেবো যে-কোনো ভাষা হচ্ছে একরাশ (সীমিতসংখ্যক বা অসংখ্য) বাক্যের সমষ্টি, যার প্রতিটি সসীম দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ও সীমিতসংখ্যক বস্তুতে গঠিত। সমস্ত স্বাভাবিক ভাষা, তাদের কথ্য অথবা লিখিত রূপে, এ-অর্থে ভাষা; কেননা প্রতিটি স্বাভাবিক ভাষায়ই আছে সীমিতসংখ্যক ধ্বনিমূল (অথবা বর্ণ) এবং প্রতিটি বাক্যকেই উপস্থাপিত করা যায় এ-সব ধ্বনিমূলের (অথবা বর্ণের) এক সীমিত পরম্পরারূপে, যদিও ভাষায় বাক্য অসংখ্য। অনুরূপভাবে, গণিতের কোনো সুশৃঙ্খল সিস্টেমে 'বাক্য'রাশিকেই গণ্য করা সম্ভব ভাষারূপে। কোনো ভাষা 'ভ'-র ভাষিক বিশ্লেষণের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাকরণসম্মত পরম্পরাসমূহকে অর্থাৎ 'ভ'-র বাক্যসমূহকে ব্যাকরণঅসম্মত পরম্পরাসমূহ অর্থাৎ যেগুলো 'ভ'-র বাক্য নয়, তা থেকে পৃথক করা, এবং ব্যাকরণসম্মত পরম্পরাসমূহের সংগঠন বিশ্লেষণ করা। তাই 'ভ'-র ব্যাকরণ হবে এমন একটি যন্ত্র বা কল, যা 'ভ'-র সমস্ত ব্যাকরণসম্মত পরম্পরা সৃষ্টি করবে, এবং কোনো ব্যাকরণঅসম্মত পরম্পরা সৃষ্টি করবে না।

এ-উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে চোমস্কি বিশেষ 'ভাষাবস্তু'র পরম্পরাকে বিবেচনা করেন বাক্যরূপে। ওই পরম্পরা ধ্বনিমূলের, বর্ণের, বা অন্য কিছুর হ'তে পারে। কিন্তু ধ্বনিমূল বা বর্ণের পরম্পরারূপে বাক্য বর্ণনা এক ভয়ানক ব্যাপার; কেননা এতে ব্যাকরণ জড়িয়ে পড়বে অনন্ত জটিলতায়। তাই চোমস্কির কাছে বাক্য ধ্বনিমূলের নয়, রূপমূলের পরম্পরা। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৮));

> আমরা প্রতিটি বাক্যকে মনে করতে পারি সীমিত দৈর্ঘ্যের ধ্বনিমূলপরম্পরা ব'লে। প্রতিটি ভাষা এক বিশাল-ব্যাপক ব্যাপার; এবং এটা অতি স্পষ্ট যে ব্যাকরণসম্মত ধ্বনিমূলপরম্পরার সহায়তায় ভাষা বর্ণনা করতে গেলে ব্যাকরণ এতো জটিল হ'য়ে উঠবে যে তার কোনো মূল্যই থাকবে না। এ-(ও অন্যান্য) কারণে ভাষিক বর্ণনা এগোয় 'উপস্থাপনা স্তর'ক্রমে। সরাসরি বাক্যের ধ্বনিমূলসংগঠন বর্ণনার বদলে ভাষাবিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা করেন 'রূপমূল' প্রভৃতি বস্তুর মতো 'উচ্চতর স্তর'; এবং

> স্বতন্ত্রভাবে বাক্যের রূপমূলসংগঠন ও রূপমূলের ধ্বনিমূলসংগঠন বর্ণনা করেন। এ-স্তর দুটির সম্মিলিত বর্ণনা সরাসরিভাবে বাক্যের ধ্বনিমূলসংগঠন বর্ণনার চেয়ে অনেক সরল কাজ। এখন আমরা পরীক্ষা করবো বাক্যের রূপমূলসংগঠন বর্ণনার বিভিন্ন পদ্ধতি।

এ থেকে বোঝা যায় যে চোমস্কির নিকট বাক্য হচ্ছে রূপমূলপরম্পরা। তাই তিনি তাঁর প্রস্তাবিত ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করতে চান ব্যাকরণসম্মত রূপমূলপরম্পরারাশি, অর্থাৎ বাক্যরাশি। তিনি স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতাত্ত্বিক, তাই অর্থ পরিহার ক'রে রূপমূলের শুদ্ধ পরম্পরা সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য। *আস্পেক্টস্*-কাঠামোর ব্যাকরণ পেশের সময়ও তিনি বাক্য সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁর একটি উক্তি (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৩)); 'এটির বিষয় সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষ, অর্থাৎ সে-সূত্রসমূহ, যা ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক-(গঠক)সমূহের সুগঠিত বিন্যাস নির্দেশ করে।' *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ যে-ভাষাবস্তুদের নাম ছিলো 'রূপমূল', *আস্পেক্টস্*-এ তাদের নতুন নাম হয়েছে 'ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক' বা 'গঠক'; কিন্তু বাক্য সম্পর্কে চোমস্কির ধারণা বদলায় নি। তবে চোমস্কির এ-উক্তি বা ধারণাকে প্রথাগত অর্থে গ্রহণ করলে বিভ্রান্তি জন্ম নেবে।

রূপান্তর ব্যাকরণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে 'ভাষাবোধ' ও 'ভাষাপ্রয়োগ', যার আলোতে নির্ণয় করতে হবে বাক্য। ভাষাবোধ বলতে বোঝানো হয় ভাষা সম্পর্কে ভাষাভাষীর সহজাত অসচেতন জ্ঞান বা বোধকে, আর বস্তুব পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহারকে নির্দেশ করা হয় ভাষাপ্রয়োগ ব'লে। রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্য হচ্ছে ভাষাবোধতত্ত্বের অন্তর্গত ধারণা, আর উক্তি হচ্ছে ভাষাপ্রয়োগতত্ত্বের অন্তর্গত ধারণা। বাক্য বিমূর্ত একক, উক্তি মূর্ত একক। অনেক সময় বাক্য ও উক্তির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে পারে, আবার অনেক সময় আমরা এমন উক্তি উচ্চারণ করতে পারি, যার বাস্তবতা স্বীকার ক'রেও বলতে হবে যে ব্যাকরণিক কোনো বাক্যের সাথে ওই উক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। উক্তিমাত্রই বাক্য নয়, বাক্য একরকম ব্যাকরণিক বিমূর্ত একক। এ সম্পর্কে পোস্টালের (১৯৬৮খ, ২৭৩-২৭৪) ব্যাখ্যা স্মরণীয় :

> বাক্য এমন এক বোধ বা ধারণা, যা বিমূর্ত বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত; তা তুলনীয় সঙ্গীতের *কনসার্টোর* সাথে। *উক্তি* ধারণাটি আচরণ-জাগতিক বা প্রয়োগক্ষেত্রিক। যদিও শুনতে কেমনকেমন লাগতে পারে, তবুও বলা যায় যে উক্তিরাশি হচ্ছে *বাক্যউপস্থাপন*। বাক্যের বিমূর্ত সংগঠনই ভাষাপ্রয়োগের প্রধান নিয়ন্ত্রক। তবে আরো অনেক কিছু ভাষাপ্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে। ... সুতরাং বাক্য ও ব্যাকরণ বিমূর্ত বস্তু। নানা বিমূর্ত বস্তুর সাথে পরিচিত আমরা দৈনন্দিন জীবনে, যেমন : সংখ্যা, বিধিবিধান, সিম্ফনি, গাড়িচালানোর নিয়মকানুন, রসিকতা। এ-সব বস্তুর একটি নঞার্থক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা কোনো বিশেষ স্থানে-কালে বস্তুগতভাবে বিরাজ করে

> না। ... তবে এ-বিমূর্ত বস্তুদের মূর্ত বস্তুরূপে অথবা বিশেষ স্থানে-কালে উপস্থাপিত করা সম্ভব। ... ভাষা বিমূর্ত বস্তু, তবে তা বিশেষ অর্থে এক অ-সাধারণ বিমূর্ত বস্তু। ভাষা অসীম, আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত অধিকাংশ বিমূর্ত বস্তু, গণিত ব্যতীত, সসীম। ... বাক্য এমন এক ধারণা, যা নির্দেশ করে সে-সব বিশেষ বস্তুর প্রতি, যা প্রতিটি ভাষায় আছে অসংখ্য পরিমাণে। ব্যাকরণ ধারণাটি নির্দেশ করে সে-সসীম সিস্টেমের প্রতি, যা সংখ্যাহীন বাক্য শনাক্ত ও সৃষ্টি করে। ভাষা যেহেতু অসীম বিমূর্ত বস্তু, তাই তাকে দেখতে পারি দুটি ভিন্ন কিন্তু সমতুল্য দৃষ্টিতে। উদাহরণরূপে বলতে পারি যে ইংরেজি ভাষা অসংখ্য ইংরেজি বাক্যের সমষ্টি, অথবা অন্য ভাবে বলা যায় যে ইংরেজি ভাষা হচ্ছে সে-সসীম সিস্টেম, যা সৃষ্টি করে অসংখ্য বাক্য।

অর্থাৎ রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্য এক বিমূর্ত তাত্ত্বিক ধারণা। ওই বাক্য আমরা পর্যবেক্ষণ করি বাস্তব ভাষাপ্রয়োগের সময়; এবং লক্ষ্য করি যে প্রতিটি বাক্য ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমাহার : ধ্বনিক, আর্থ, ও বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের এক জটিল সমবায়ে গ'ড়ে ওঠে প্রতিটি বাক্য।

১.৭ মূল্যায়ন

ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি ধারা—প্রথাগত, সাংগঠনিক ও রূপান্তরবাদী—ভাষা ও বাক্য সম্পর্কে পোষণ করে বিভিন্ন, ও অনেকাংশে বিরোধী, ধারণা। প্রথাগত ব্যাকরণ আর্থ ও সর্বজনীনতামুখি। এ-ব্যাকরণের তত্ত্ব হচ্ছে যে বিশ্বের সব মানুষ সদৃশ : তারা অভিন্ন বিষয়ে ভাবে, চিন্তা করে, ও কথা বলে; তাই সব ভাষার বাক্যসংগঠন অভিন্ন। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন, ভাষায় ভাষায় সাংগঠনিক বৈসাদৃশ্য ব্যাপক, যা বিনষ্ট ক'রে দিতে পারে সর্বজনীনতাতত্ত্বকে। তাই তাঁরা আশ্রয় নেন অর্থের, কেননা বিভিন্ন ভাষায় মানুষেরা মোটামুটিভাবে সদৃশ ও সর্বজনীন ভাবই প্রকাশ ক'রে থাকে। বাক্যের সংজ্ঞা রচনার সময় আর্থ মানদণ্ডকে বড়ো ক'রে তোলেন তাঁরা এমন বিশ্বাসে যে ওই মানদণ্ড সমস্ত ভাষায় প্রয়োগ করা সম্ভব, এবং অভিন্ন উপায়ে শনাক্ত করা সম্ভব সমস্ত মানবভাষার বাক্য। সাংগঠনিকেরা বিরোধী আর্থ মানদণ্ড ও সর্বজনীনতার, অর্থাৎ প্রথাগত ব্যাকরণের। তাঁরা উৎসাহী ভাষার রূপসংগঠনে, পর্যবেক্ষণসম্ভব ভাষাবস্তুতে। বিভিন্ন ভাষার বাহ্য সাংগঠনিক বৈসাদৃশ্য সাংগঠনিকদের চোখে দেখা দিয়েছিলো বড়ো আকারে। তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে মানব ভাষাগুলোতে মিলের চেয়ে অমিল অধিক, এবং প্রতিটি ভাষারই রয়েছে একান্ত নিজস্ব ও অনন্য সংগঠন। প্রতিটি ভাষার অনন্য সংগঠন বর্ণনাকে তাঁরা নিজেদের লক্ষ্য ব'লে স্থির করেছিলেন। তাই বাক্যের সংজ্ঞা রচনার সময় তাঁরা আর্থ মানদণ্ড পরিহার ক'রে প্রয়োগ করেছেন রৌপ মানদণ্ড। তবে বাক্য ধারণায় প্রথাগত ও সাংগঠনিকদের মধ্যে এ-বিরোধ সত্ত্বেও মিল রয়েছে এক মূল জায়গায় : উভয় গোত্রের কাছে বাক্য একরকম বাস্তব বস্তু। কিন্তু বিরোধটাই বড়ো;—প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা অনেক বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ও সৃষ্টিশীল; অন্যদিকে সাংগঠনিকেরা ভাষার

বাহ্যস্তরেই সীমাবদ্ধ ও অ-সৃষ্টিশীল। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা স্পষ্টভাবে না বললেও বোঝা যায় তাঁরা প্রতিটি ভাষার বাক্যের অসংখ্যতায় বিশ্বাসী, আর সাংগঠনিকদের ধারণা হচ্ছে যে প্রতিটি ভাষা সীমিতসংখ্যক, যদিও বিপুল, বাক্যের সমষ্টি। প্রথাগত ও সাংগঠনিক ব্যাকরণ বাক্যকেন্দ্রিক নয়। প্রথাগত ব্যাকরণ প্রধানত শুদ্ধ শব্দগঠনের নিয়মকানুন শেখায়, আর সাংগঠনিক ব্যাকরণ গুরুত্ব আরোপ করে ভাষার ধ্বনি-ও রূপ-সংগঠন বর্ণনার ওপর। রূপান্তর ব্যাকরণ পেশ করে ভাষা ও বাক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন মত। রূপান্তরবাদীদের মতে প্রতিটি ভাষা অজস্র ও অনন্ত বাক্যের সমষ্টি; ব্যাকরণের কাজ ওই অজস্র অনন্ত বাক্যরাশি সৃষ্টি করা। তাদের কাছে বাক্য একটি বিমূর্ত তাত্ত্বিক ধারণা, যা সর্বজনীন। বাক্য সৃষ্টি বা বর্ণনার জন্যে যে-তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রণালিপদ্ধতি তাঁরা উদ্ভাবন করেন, তা শুধু অভিনব নয়, সর্বাংশে বিজ্ঞানসম্মতও (দ্র চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

বাক্যের তিনটি প্রথাগত সংজ্ঞা—দুটি গ্রিক-লাতিন ও একটি সংস্কৃত—প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি (দ্র § ১.১-১.৪)। বাক্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রিয় সংজ্ঞাটি—'পূর্ণ মনোভাবজ্ঞাপক শব্দসমষ্টিই বাক্য'—রৌপ ও আর্থ মানদণ্ড একসাথে ব্যবহার করেছে বাক্য নির্ণয়ের জন্যে। সংজ্ঞাটিতে আছে দুটি শর্ত;—(এক) বাক্য শব্দসমষ্টি, এবং (খ) ওই শব্দগুচ্ছ পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন বা প্রকাশ করে। যে-ভাষাসংগঠন মেটায় এ-শর্ত দুটি, তাকে গণ্য করা যায় বাক্যরূপে। শর্ত দুটির প্রথমটি রৌপ, দ্বিতীয়টি আর্থ। প্রথম শর্তটি নির্দেশ করে যে বিশেষ একরকম ভাষা-এককে—শব্দে—গঠিত হয় বাক্য; কিন্তু যে-কোনো শব্দসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্য হয়ে ওঠার জন্যে একত্র-বিন্যস্ত শব্দগুচ্ছকে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হয়। সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে এখানেই, কেননা 'পূর্ণ মনোভাব বা অর্থ' নির্ণয় করা শক্ত কাজ। কোনো কিছু সম্পর্কে কতোখানি ভাব প্রকাশ করা হ'লে বলা সম্ভব যে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে, বা পূর্ণ মনোভাব, প্রকাশ পেয়েছে? যদি বলি যে 'মেয়েটি সুন্দর', তবে কি মনের ভাব উজাড় ক'রে দেয়া হলো সম্পূর্ণরূপে? নাকি মনোভাব পূর্ণতার জন্যে আরো বলা দরকার যে তার চোখ দুটি বিখ্যাত, ওষ্ঠ শহরবিশ্রুত, মাংস তরঙ্গসঙ্কুল? এটা নির্ণয়ের কোনো বস্তুগত উপায় নেই ব'লে বাক্যের এ-সংজ্ঞাটির সাহায্যে বাক্যশনাক্তি সম্ভব নয়। গ্রিক-উৎসজাত বাক্যের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি বাক্যের আধেয় ও উপাদানগত সংগঠন নির্দেশ করে;—বলা হয় যে পূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্যে বাক্যের দরকার দুটি বস্তু। এর প্রথমটির নাম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টির নাম বিধেয়। বাক্যে উদ্দেশ্যরূপে উপস্থিত থাকে কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু অথবা ভাব, আর বিধেয়ের কাজ হলো উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো বিবৃতি পেশ করা। এ-সংজ্ঞাটিতেও এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার সাহায্যে অবাক্য থেকে পৃথক করা যায় বাক্য। এ-সংজ্ঞা অনেক সময় অবাক্যকে গ্রহণ করাবে বাক্যরূপে, আর বাক্যকে শনাক্ত করবে অবাক্য হিশেবে। 'মেয়েটি সুন্দর' উদাহরণে উদ্দেশ্যরূপে আছে একটি বিশেষ্যপদ বা ব্যক্তি, আর বিধেয়রূপে আছে একটি বিশেষণ, যা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করছে। এ-উদাহরণটিকে

প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যরূপে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু একই উক্তিকে যদি সামান্য বদলে দিই, বলি 'সুন্দর মেয়েটি', তবে একে প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্য হিশেবে গ্রহণ করা হবে না, যদিও সংজ্ঞানুসারে একে বাক্যরূপে গ্রহণ করা উচিত। এতেও আছে একটি বিশেষ্য, উদ্দেশ্যরূপে; এবং আছে একটি বিধেয়-বিশেষণ, যা উদ্দেশ্যের ডানে না ব'সে বাঁয়ে বসেছে। দ্বিতীয় উদাহরণটির অর্থ এবং প্রথমটির অর্থ প্রায় এক, তাই দ্বিতীয়টিকেও বাক্যরূপে গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু এক অজানা কারণে প্রথাগত ব্যাকরণে দ্বিতীয়টিকে বাক্যরূপে স্বীকার করা হবে না। বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের উপস্থিতিকে যদি মানা হয় অপরিহার্য ব'লে, তবে বিশ্বের অধিকাংশ ভাষার অনুজ্ঞাসূচক বাক্যরাশিকে অবাক্যরূপে চিহ্নিত করতে হবে। 'যাও', 'এখানে আসো' জাতীয় বাক্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই, আছে শুধু বিধেয়। তাই এগুলোকে গ্রহণ করা উচিত অবাক্যরূপে, কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে বিলুপ্ত উদ্দেশ্যসম্বলিত বাক্যরূপে গ্রহণ করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী বাক্যসংজ্ঞা দুটি ব্যর্থ। অবশ্য এ-দুটিকে শোচনীয়ভাবে বিফল বলা যাবে না, কেননা এ-দুটি বাক্যশনাক্তির সুশৃঙ্খল মানদণ্ড দিতে না পারলেও বাক্য ও বাক্যসংগঠন সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। বাক্যের জনপ্রিয় সংস্কৃত সংজ্ঞাটি—'আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমুচ্চয়ই বাক্য'—যদিও ব্যর্থ, তবু উদঘাটন করে বাক্যের অনেক বৈশিষ্ট্য। সংজ্ঞাটিতে যে তিনটি শর্ত রয়েছে, তার দুটি রৌপ ও একটি আর্থ। 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' বাক্যে শব্দ বা পদের বিন্যাসের সূত্র নির্দেশ করে, 'যোগ্যতা' নির্দেশ করে আর্থসঙ্গতির বিধি। সংজ্ঞাটি একটি বড়ো জটিলতা থেকে মুক্ত : এক বাক্যে কতোখানি অর্থ বা মনোভাব প্রকাশ পেতে পারে, বা কোনো মনোভাব-অর্থ আদৌ প্রকাশ পাওয়া উচিত কি-না, সে-সম্পর্কে এটি নীরব। সংজ্ঞাটির 'আকাঙ্ক্ষা' জ্ঞাপন করে যে বাক্যে শব্দের বা পদের সহাবস্থানের বিশেষ বিধি রয়েছে, যে-কোনো শব্দের পরে যে-কোনো শব্দ বসতে পারে না। যেমন : 'একটি–' পদের পরে বসতে পারে 'ছেলে, মেয়ে, গরু' প্রভৃতি পদ, কিন্তু 'জল, করে' বসতে পারে না। আধুনিক পরিভাষায় এর নাম 'কোঅকারেন্স রেস্ট্রিকশন' বা 'সহাবস্থান বিধি'। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে 'আকাঙ্ক্ষা'র ভুল ব্যাখ্যা প্রায়ই পাওয়া যায়। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুসারে এর এমন আর্থ ব্যাখ্যা দেন, যা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। 'আসত্তি'ও রৌপ শর্ত; এর সাহায্যে নির্দেশ করা হয় যে বাক্যে যে-সব পদ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত, তাদের অবস্থান হবে কাছাকাছি। যেমন : 'একটি মেয়ে সাত দিন ধ'রে ঘুম যাচ্ছে' বাক্যে 'একটি মেয়ে', 'সাত দিন ধ'রে', 'ঘুম যাচ্ছে' পদগুচ্ছভুক্ত শব্দরাশি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত; তাই তাদের অবস্থান হবে সন্নিকট। যদি এর কোনোটিকে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়, তবে বাক্যে বিপর্যয় ঘটবে। 'আসত্তি' শব্দটিকে অনেক প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণবিদ ভ্রান্তিবশত 'আসক্তি' রূপে গ্রহণ ক'রে ভুল ব্যাখ্যা দেন। 'যোগ্যতা' শর্তটি 'আর্থ' ; আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একে বলা হয় 'সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন' বা 'সঙ্গতিবিধি'। শর্তটি দাবি করে যে বাক্যের বক্তব্যমাত্রই হবে সুসঙ্গত; বিসঙ্গত কোনো ভাব

থাকবে না বাক্যে। 'যোগ্যতা'র মানদণ্ডে 'গোপাল কলা খায়' চমৎকার বাক্য, কেননা এর ভাব সুসঙ্গত; আর '*গোপাল রাজনীতি খায়' অশুদ্ধ, কেননা রাজনীতি খাদ্যসংগ্রহের সহায়ক হ'লেও তা খাদ্য নয়। রূপান্তর ব্যাকরণবিদগণ বাক্যের অর্থসঙ্গতি সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আর্থ ত্রুটি বা বিসঙ্গতি বাক্যিক ত্রুটি নয়, তাই বিসঙ্গত বাক্যকে শুদ্ধ বাক্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। চোমস্কি (১৯৫৭, ১৫) রূপান্তর ব্যাকরণ প্রস্তাবের সময় 'রঙহীন সবুজ ভাবনাগুলো ভয়ংকরভাবে ঘুমোচ্ছে'র মতো একটি বিসঙ্গত বাক্যকে সুগঠিত বাক্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু পরে (১৯৬৫, ১১৩-১২০) মত বদলান। *আস্পেক্টস*-এ তিনি বিসঙ্গত বাক্যকে ব্যাকরণঅসম্মত ব'লে নির্দেশ করেন। কিন্তু রূপান্তরবাদীদের অনেকে দেখান যে বিসঙ্গতি বাক্যিক ত্রুটি নয়, আর্থ ত্রুটি; তাই বিসঙ্গতির জন্যে কোনো বাক্যকে গ্রহণঅযোগ্য ব'লে শনাক্ত করা যায় না। 'আমি গতকাল সেখানে যাবো', বা 'আগামীকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম'-এর মতো কালবোধচূর্ণকারী বাক্যও ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ নয়, যদিও তা বিসঙ্গত। তাই সংস্কৃত বাক্যসংজ্ঞার যোগ্যতা শর্তটি গ্রহণযোগ্য নয়। সব মিলিয়ে এ-সংজ্ঞাটির সাহায্যেও নির্ভুলভাবে বাক্য নির্ণয় অসম্ভব।

সাংগঠনিকদের বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা রৌপ। অর্থ বা আধেয় পরিহার ক'রে ভাষা বর্ণনার জন্যে তাঁরা যে-বৃহত্তম ব্যাকরণিক একক নির্ণয় করেন, তার নাম বাক্য। বাক্যশনাক্তির জন্যে তাঁরা একটি আদিম ধারণার সহায়তা নেন, ও তার নাম দেন *উক্তি*। ভাষাপ্রয়োগের সময় উচ্চারিত হয় উক্তি; আর সে-উক্তিকে খণ্ডিত করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভিন্ন সংগঠনে, যা গঠিত নানা ছোটো উপাদানে। কিন্তু ওই সংগঠন কোনো বৃহত্তর সংগঠনের অংশ নয়। এ-সংগঠনই বাক্য। ব্লুমফিল্ডের বাক্যসংজ্ঞাটি, যা মেনে নিয়েছেন সাংগঠনিকেরা, ভাষাবর্ণনার বৃহত্তম একক নির্ণয় করে চমৎকারভাবে। রূপান্তরবাদীগণ বাক্যের এ-সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করেছেন, তবে অনেকটা অন্যভাবে। সাংগঠনিকদের কাছে বাক্য ও উক্তি বাস্তব একক; কিন্তু রূপান্তরবাদীগণ এ-দুটিকে গ্রহণ করেন বিমূর্ত এককরূপে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য পর্যবেক্ষণসম্ভব ভাষা-উপাত্ত বর্ণনা করা; তাই তাঁরা বাক্যকে বাস্তব এককরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রূপান্তরবাদীদের লক্ষ্য ভাষার অনন্ত অসীম বাক্য সৃষ্টি করা, যা কোনো বিশেষ উপাত্তে সীমাবদ্ধ নয়। বাক্য তাঁদের কাছে একটি বিমূর্ত ধারণা, এবং তার বাস্তব রূপ অনেক সময় পাওয়া যায় উক্তিতে। বাক্য ও উক্তি কখনোকখনো অভিন্নরূপ ধরতে পারে, তবে উক্তিমাত্রই বাক্য নয়। অবশ্য বাক্যমাত্রই উক্তি। রূপান্তর ব্যাকরণের লক্ষ্য এমন ব্যাকরণ রচনা, যা ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করবে, ও প্রতিটি বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে (দ্র § ৪.২.৫)। রূপান্তর ব্যাকরণ সাংগঠনিক ব্যাকরণের কিছু কিছু ধারণা গ্রহণ করলেও তা সাংগঠনিক ভাষিক তত্ত্বের বিরোধী, এবং অনেক বিষয়ে প্রথাগত ব্যাকরণের সাথে একমত। প্রথাগত ব্যাকরণ, তার সমস্ত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, বাক্যসংগঠন সম্পর্কে যে-গভীর বোধের পরিচয় দেয়, সাংগঠনিক ব্যাকরণ তা পারে না। রূপান্তর ব্যাকরণ জয় করেছে প্রথাগত ব্যাকরণের অবৈজ্ঞানিকতা ও সাংগঠনিক

ব্যাকরণের অদূরদৃষ্টি : বাক্যকে প্রধান একক ধ'রে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ উদঘাটন করে ভাষার সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য সূত্র।

টীকা

[১] Lowth (1762, 118) : 'A sentence is an assemblage of words, expressed in proper form, arranged in proper order and occurring to make a complete sense.'

[২] Bain (1879, 8) : 'Speech is made up of separate sayings, each complete in itself... these sayings are sentences. Any complete meaning is a sentence.'

[৩] Rowe and Webb (1897, 1) : 'A sentence is a combination of words by which we say something about a person or a thing.'

[৪] McMordie (1911, 149) : 'A sentence is a group of words containing at least one subject and one predicate, the words being so arranged as to express a complete thought.'

[৫] Nesfield (1895, 5) : 'A combination of words that makes a complete sense is called a sentence.'

[৬] House and Harman (1931, 145) : 'A sentence is a group of words expressing a complete thought. A sentence must contain a subject and a predicate.'

[৭] Jones (1935, 2) : 'A sentence is a group of words that contains a verb and its subject and whatever else is necessary to make the thought grammatically complete.'

[৮] Tanner (1945, 14) : 'A sentence is the expression of a complete thought by means of a group of words that can stand alone.'

[৯] Curme (1947, 97) : 'A sentence is an expression of a thought or feeling by means of a word or words used in such a form and manner as to convey meaning intended.'

[১০] Faulkner (1950, 1) : 'A sentence is a combination of words which conveys at least one complete though consisting of a combination of concepts.'

[১১] Warfel et al (1949, 80) : 'The unit of composition upon which thought is based is the sentence.'

[১২] Gardiner (1932, 208) : 'A sentence is an utterance which makes just as long a communication as the speaker has intended to make before giving himself a rest.'

[১৩] Walcott et al (1940, 1, 61, 62) : 'Here then is the secret of every sentence : first we always name some object or place or person or thing; and then, second, we say something about that object or place or person or thing. Unless we do these two things, we are not making complete sentences... The subject will always be the object, place, person, or thing that is being talked about. The predicate will always be what is said about the object, place, person, or thing.'

[১৪] Barker (1939, 4) : 'Two elements are necessary to the expression of a complete thought : (1) a subject which names a person or thing or idea about which a statement is made; and (2) a predicate which makes a statement about the subject.'

[১৫] Kierzek and Gibson (1960, 36) : 'Defined in terms of form or pattern, a sentence is a basic unit of language, a communication in words, having as its core at least one independent verb with its subject.'

[১৬] Meillet (1903, 32) : 'The sentence can be defined (as follows) : a group of words joined together by grammatical agreements (relating devices) and which not grammatically dependent upon any other group are complete in themselves.'

[১৭] Jespersen (1924, 307) : 'A sentence is a (relatively) complete and independent human utterance... The completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone i.e., of being uttered by itself.'

[১৮] Bloomfield (1926, 28) : 'A maximum form in any utterance is a sentence. Thus, a sentence is a form which, in the given utterance, is not part of a larger construction.'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব

২.০ ভূমিকা

গ্রিক-লাতিন ও সংস্কৃত ভাষিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ব্যাকরণের অভিধা 'প্রথাগত ব্যাকরণ', আর ওই ব্যাকরণে যে-প্রণালিপদ্ধতিতে বাক্য বিশ্লেষণ করা হয়, তার নাম 'প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব'। প্রথাগত ব্যাকরণের প্রধান বিষয় শব্দ : শুদ্ধ শব্দ গঠনের সূত্র রচনা ও শুদ্ধ শব্দ ব্যবহারের কৌশল শেখানোই প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁরা শব্দকেই মেনে নিয়েছিলেন ভাষার ক্ষুদ্রতম সার্থ একক ব'লে, এবং তাঁদের উপাত্ত-ভাষাগুলোতে—গ্রিক-লাতিন ও সংস্কৃতে—শব্দরূপের এতো বৈচিত্র্য রক্ষা করেছিলেন যে শব্দবিশ্লেষণকেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন প্রধান কর্তব্যরূপে। তবে ভাষার অন্যান্য স্তর তাঁদের দৃষ্টির বাইরে থাকে নি। ভাষার একটি প্রধান স্তর বাক্য। বাক্য বিশ্লেষণ-বর্ণনা-ব্যাখ্যায় তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন; এবং অসামান্য সার্থকতা আয় করেছিলেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে তাঁরা শনাক্ত করেছিলেন বাক্যের বিভিন্ন উপাদান, এবং বাক্যে উপাদান বিন্যাসের প্রক্রিয়াও ব্যাখ্যা করেছিলেন চমৎকারভাবে। তাঁদের অনেক বর্ণনাব্যাখ্যা বিশৃঙ্খল, বহু সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, ও গ্রহণঅযোগ্য। তবে তাঁদের ওই বিশৃঙ্খল বর্ণনাব্যাখ্যা ও গ্রহণঅযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যেও পাওয়া যায় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। বাক্যবর্ণনায় তাঁদের সাথে তুলনা করা যায় শুধু রূপান্তরবাদীদের, যাঁরা বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেক বোধ-ব্যাখ্যা-সিদ্ধান্ত সুশৃঙ্খলরূপে পেশ করেছেন নিজেদের ব্যাকরণকাঠামোতে।

বাঙলা 'বাক্যতত্ত্ব' শব্দটি গঠিত ইংরেজি 'সিন্ট্যাক্স' শব্দের অনুকরণে, আর ইংরেজি 'সিন্ট্যাক্স' শব্দটি এসেছে গ্রিক 'সিন্ট্যাক্সিস' শব্দ থেকে। 'সিন্ট্যাক্স' শব্দের মূল অর্থ 'একত্রবিন্যাস' বা 'সহবিন্যাস'। গ্রিক ব্যাকরণবিদেরা বাক্যকে গ্রহণ করেছিলেন শব্দের, ও ভাবের একত্রবিন্যাসরূপে (দ্র § ২.১)। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা বাক্যগঠনের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করতেন 'বাক্যবিন্যাস', 'বাক্যবিবেক', 'পদান্বয়' প্রভৃতি অভিধার সাহায্যে (দ্র উইলিয়ামস (১৮৭৬, ৩৫৪))। ব্যাকরণিক অনেক পারিভাষিক শব্দই অদ্ব্যর্থ বা সুনির্দিষ্ট নয়; বহু পারিভাষিক শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশ্চিমে 'সিন্ট্যাক্স' শব্দটিও বিভিন্ন, এবং একই, কালে বিভিন্ন ব্যাকরণবিদের হাতে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সিন্ট্যাক্স' শব্দটিকে নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ব্যাকরণবিদ (দ্র হাউজহোলডার (সম্পাদক ১৯৭২, ১০-১১)) :

[১] ক 'সিন্ট্যাক্স' (একে কখনোকখনো 'গ্রামার'—ব্যাকরণ—নামেও নির্দেশ করা হয়) হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার 'ইনফ্লেকশন' (বিশেষ্যের কারক, ক্রিয়ার ভাব প্রভৃতি) ও বিভিন্ন পদের (বিশেষ ক'রে প্রিপজিশন ও অধীনতামূলক সংযোজকের) অর্থ ও ভূমিকা বিশ্লেষণবিদ্যা।

খ 'সিন্ট্যাক্স' হচ্ছে শব্দকে বাক্যে (অথবা পদে, উপবাক্যে, ও বাক্যে) বিন্যাসের সূত্রের বিশ্লেষণ।

গ 'সিন্ট্যাক্স' হচ্ছে সে-সমস্ত প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণবিদ্যা, যার সাহায্যে কোনো ভাষা বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিরাজমান যৌক্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক আর্থ সম্পর্ক প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্যের ব্যাকরণবিদেরা 'সিন্ট্যাক্স'-এর সংজ্ঞা ও সীমা নির্ণয়ের সময় অবধারিতভাবে মুখোমুখি হয়েছে রূপতত্ত্বের ও অর্থতত্ত্বের, এবং ভাষার ও-দুটি স্তরের সাথে বাক্যতত্ত্বের সম্পর্ক-অসম্পর্ক ভিত্তি ক'রে রচনা করেছেন বাক্যতত্ত্ব—সিন্ট্যাক্স—এর সংজ্ঞা। যিনি রূপতত্ত্বের সাথে পার্থক্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন বাক্যতত্ত্বের, তাঁর বাক্যতত্ত্বের সংজ্ঞা ও সীমা একরকম; যিনি অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা ও সীমা থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন বাক্যতত্ত্বের সীমা ও সংজ্ঞাকে, তিনি নির্দেশ করেছেন বাক্যতত্ত্বের অন্যরকম সংজ্ঞা-সীমা, এবং যিনি রূপতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব উভয়ের থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন বাক্যতত্ত্বকে, তাঁর থেকে পাওয়া গেছে বাক্যতত্ত্বের আরেক রকম সংজ্ঞা-সীমা। তাই প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্বের সীমা-সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট নয়, যদিও সকলেরই লক্ষ্য বাক্যবিশ্লেষণ। প্রথাগত ব্যাকরণে অনেক সময় দেখা যায় বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যাকরণবিদ বিশ্লেষণ করেছেন শব্দরূপ, বা অর্থ। অর্থাৎ প্রথাগত ব্যাকরণবিদ অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়েছেন স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব বর্ণনায়। এর জন্যে তাঁদের অভিযুক্ত করার সাথেসাথে স্মরণ করতে হয় যে রূপ, বাক্য, অর্থের স্তর তিনটিকে পরিচ্ছন্নরূপে পৃথক করা অসম্ভব।

প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা শুধু 'বাক্য' ধারণাটি উপহার দেন নি; বাক্য বিশ্লেষণের সময় যে-সমস্ত *ক্যাটেগরি* আজো ব্যবহার করি আমরা, এবং সম্ভবত ব্যবহার করবো চিরকাল, তার বড়ো অংশই পেয়েছি প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের নিকট থেকে। উদ্দেশ্য-বিধেয়, কর্তা-কর্ম, বিভিন্ন ধরনের পদ ও আরো অজস্র ধারণা প্রথাগত ব্যাকরণেই প্রথম উদ্ভূত হয়। গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণবিদেরা বাক্যসংগঠনকে বিভক্ত করেছিলেন নানা উপাদানে, এবং নির্দেশ করেছিলেন ওই সমস্ত উপাদানের বিন্যাসপ্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে ইংরেজি-ফরাশি-জর্মান প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা ওই সমস্ত ধারণাকে ব্যাপকবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল ক'রে তোলেন, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা আপনআপন ভাষা বিশ্লেষণের সময় ব্যবহার করেন ওই সমস্ত ক্যাটেগরি। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণবিদদের মতো সংগঠন বা উপাদানভিত্তিক বাক্যবর্ণনার দিকে না গিয়ে অগ্রসর হন গভীরতর দিকে, এবং বাক্য বিশ্লেষণের

জন্যে সৃষ্টি করেন গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন *কারক* ধারণা। সংস্কৃত কারকতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব, যদিও পুনরাবৃত্তিকালে সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতারা, ও প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণলেখকেরা, তা বুঝতে পারেন নি। এখনকার যে-কোনো একটি প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ খুললেই দুটি পরিচ্ছেদ চোখে পড়ে : একটি পরিচ্ছেদের নাম 'কারক', অন্যটির নাম 'বাক্য', অথবা 'বাক্যতত্ত্ব' বা 'পদপ্রকরণ' (দ্র § ২.৪.৪)। দুটি পরিচ্ছেদেরই বিশ্লেষণের বিষয় বাক্য : 'কারক' পরিচ্ছেদে বাক্য বিশ্লেষিত হয় সংস্কৃত কারকতত্ত্ব অনুসারে, আর 'বাক্য' বা 'বাক্যতত্ত্ব' বা 'পদপ্রকরণ' পরিচ্ছেদে বাক্য বর্ণনা করা হয় প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসরণে। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণবিদেরা বুঝতে অসমর্থ যে বাক্য বিশ্লেষণের জন্যে উল্লিখিত একটি কৌশল গ্রহণ করলে অন্যটিকে আর গ্রহণ করা যায় না।

২.১ গ্রিক-লাতিন বাক্যতত্ত্ব

পাশ্চাত্যে—গ্রিসে—ব্যাকরণবিদদের আবির্ভাবের আগে ভাষাবিশ্লেষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন দার্শনিকেরা। তাঁদের মনে বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল রহস্য সম্পর্কে জেগেছিলো অজস্র প্রশ্ন;—ভাষা যেহেতু বিশ্বপ্রকৃতির অন্যতম বড়ো রহস্য, তাই ভাষা সম্পর্কেও তাঁদের মনে জেগেছিলো অনেক প্রশ্ন। সে-সব প্রশ্নের উত্তরও দিতে চেষ্টা করেছিলেন গ্রিক দার্শনিকেরা। সক্রেতিস-পূর্ব কালে পেশাগতভাবে বাক্যবর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে-বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিকগোত্র, তাঁরা পরিচিত 'সোফিস্ট' নামে। ছাত্রদের উৎকৃষ্ট বাগ্মীতে পরিণত করা ছিলো তাঁদের লক্ষ্য, তাই সোফিস্টরা বিভিন্ন রকমের বক্তৃতার ভাষা বা বাক্য বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন কী-রকম বিন্যাসে বক্তৃতা হ'য়ে ওঠে আবেদনময়। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের বাক্য শনাক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্য শনাক্তির ও শ্রেণীকরণের গৌরব দেয়া হয় প্রোতাগোরাসকে; তাঁকেই মনে করা হয় পাশ্চাত্যের প্রথম বাক্য শনাক্তকারী ও শ্রেণীকরণকারী ব'লে। অনেকের মতে প্রোতাগোরাস শনাক্ত করেছিলেন চার শ্রেণীর বাক্য : 'প্রার্থনা', 'প্রশ্ন', 'বিবৃতি', ও 'আদেশ'; আবার অনেকের মতে তিনি শনাক্ত করেছিলেন সাত রকম বাক্য : 'বর্ণনা', 'প্রশ্ন', 'উত্তর', 'আদেশ', 'প্রতিবেদন', 'প্রার্থনা', ও 'আমন্ত্রণ' (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ৭৩))। শনাক্ত বাক্যগুলোকে তিনি যে-সব নামে নির্দেশ করেছেন, তা দেখে মনে হয় বাক্যশনাক্তিতে ও শ্রেণীকরণে তিনি ব্যবহার করেছিলেন আর্থ মানদণ্ড। বাক্যের দুটি মৌল উপাদান, যাদের এখন আমরা 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' নামে অভিহিত করি, প্রথম শনাক্ত করেছিলেন প্লাতো (দ্র পরিশিষ্ট : এক)। তিনি বাক্যের ওই উপাদান দুটির নাম দিয়েছিলেন 'ওনোমা' ও 'হ্রিমা', যাদের অর্থ যথাক্রমে 'বিশেষ্য', ও 'ক্রিয়া'; তবে শব্দ দুটি আরো কিছু তাৎপর্য বহন করে। প্লাতোর 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' আবিষ্কার বাক্যতত্ত্বের ইতিহাসে একটি বড়ো ঘটনা—বাক্যসংগঠনের এ-বিভাজন আমরা আজও মেনে চলি। প্রথাগত ব্যাকরণের কঠোর বিরোধী সাংগঠনিকেরা যখন অব্যবহিত-উপাদান ভিত্তি ক'রে বাক্য বর্ণনা করেন, তখন তাঁরা মেনে নেন বাক্যের দ্বি-আংশিক বিভাগ, আর রূপান্তরবাদীগণ এ-বিভাগকে গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব'লে।

সাংগঠনিকেরা যখন কোনো বাক্যকে দুটি অব্যবহিত-উপাদানে ভাগ করেন, তখন তাঁরা বাক্যকে বিভক্ত করেন প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্দেশ্য-বিধেয় অংশেই, যদিও তাঁরা অব্যবহিত-উপাদান দুটিকে কোনো অভিধা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। রূপান্তরবাদীগণ যখন সম্প্রসারিত করেন 'বিপ+ক্রিপ'তে, অর্থাৎ বিশেষ্যপদ ও ক্রিয়াপদের সমষ্টিরূপে দেখেন বাক্যকে, তখন তাঁরা মেনে চলেন প্লাতো ও প্রথাগত ব্যাকরণকে। শুধু কারক-ব্যাকরণবাদীগণই বাক্যের সংগঠন সম্পর্কে পোষণ করেন ভিন্নমত : তাঁরা বাক্যকে উদ্দেশ্য-বিধেয় অথবা 'বিপ' ও 'ক্রিপ'তে বিভক্ত না ক'রে 'মডালিটি+প্রোপজিশন'-রূপে বিশ্লেষণ করেন (দ্র ফিলমোর (১৯৬৮), হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩; তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

দিওনিসিউস থ্রাক্স, পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যাকরণবিদ, তাঁর *গ্রাম্মাতিকি তেকনি*তে বাক্যের বিভিন্ন অঙ্গ (ইংরেজিতে 'পার্টস অফ স্পিচ'—বাক্যাংশ—যে-গ্রিক পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ, তার যথার্থ অর্থ 'বাক্যাংশ'—পার্টস অফ এ সেন্টেন্স্') শনাক্ত করলেও তিনি গ্রিক ভাষার বাক্য বিশ্লেষণ করেন নি। তবে বাক্যের বিভিন্ন অংশ বা পদ শনাক্তিকে একরকম অসম্পূর্ণ বাক্যবর্ণনা ব'লে গ্রহণ করা যায়। গ্রিক ভাষায় বাক্য প্রথম বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করেন খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের ব্যাকরণবিদ আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস তাঁর *পেরি সিন্ট্যাক্সিওস* পুস্তকে। তাঁর বইটি ও বাক্যবর্ণনার পদ্ধতি পরবর্তী বাক্যতাত্ত্বিকদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। 'সিন্ট্যাক্স' শব্দের মূল অর্থ 'একত্রবিন্যাস' বা 'সহবিন্যাস', এবং অনেক প্রথাগত ব্যাকরণবিদের কাছে বাক্য হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দের একত্রবিন্যাস। কিন্তু দিস্কোলুস বাক্যকে শুধু একত্রবিন্যস্ত শব্দসমষ্টি ব'লে গ্রহণ করেন নি, একত্রবিন্যস্ত 'নোএটা' বা 'ভাব'-এর সমষ্টি ব'লেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাক্যকে। বাক্য ও ভাষার অন্যান্য স্তর সম্পর্কে দিস্কোলুসের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ (দ্র হাউজহোলডার (সম্পাদক ১৯৭২, ৯)) :

> ধ্বনিমূল নামক অবিভাজ্য বস্তুগুলো অনেক আগেই এ-শর্তটি মেনে নিয়েছে যে ধ্বনিমূলের স্বেচ্ছাচারী বিন্যাস গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এটা অত্যন্ত জরুরি যে ধ্বনিরাশি পরস্পরের সাথে বিন্যস্ত হবে বিধান অনুসারে। এ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে 'সিলেবল' শব্দটি ('সিলেবল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'একত্রগ্রহণ' বা 'একত্রবিন্যাস')। সিলেবল, যা উচ্চতর একক, পুনরায় নিজেই মেনে নিয়েছে একই শর্ত, কেননা যখন তাদের বিন্যস্ত করা হয় বিধানানুসারে, শুধু তখনই তারা গঠন করে শব্দ। এবং পরবর্তী স্তরে, শব্দের স্তরে, যা সম্পূর্ণ বাক্যের উপাদান, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে শব্দসমূহকে পরস্পরের সাথে বিন্যস্ত করার সময়ও ব্যাকরণ মেনে চলে শব্দের সহাবস্থানবিধি। যেহেতু প্রতিটি শব্দের সাথে সংযুক্ত ভাবই বাক্যের উপাদান, যাদের বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে বাক্য, এবং যেমনভাবে ধ্বনিমূলের সমবায়ে গঠিত হয় সিলেবল, তেমনভাবে সিলেবলও সার্থক হয় শব্দগঠনের বেলায় ভাবের একত্রবিন্যাস

> ঘটিয়ে। এবং শব্দ যেমন গ'ড়ে ওঠে সিলেবল-এ, তেমনি প্রতিটি স্বাধীন বাক্য গঠিত হয় ভাবের সঠিক সহাবস্থানে।

দিস্কোলুস বাক্যের উপাদান নির্দেশের সময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন 'ভাব'-এর ওপর;—তাঁর কাছে বাক্য হচ্ছে সহাবস্থানযোগ্য ভাবের সমবায়। তিনি কেবল শব্দ-সমবায়কে বাক্য ব'লে স্বীকার করেন নি; আর সিলেবল-এর সমবায়কে তো অবশ্যই নয়। দিস্কোলুস যখন গ্রিক বাক্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত, তখন বর্ণনার বিষয় হিশেবে তিনি গ্রহণ করেন এমন সব বিষয়, যার অনেকটাই আর্থ-ও রূপ-তাত্ত্বিক; এমন কি ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরের অন্তর্গত। তাই তাঁর বইটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে নানারকম ব্যাকরণিক বিষয় সম্পর্কে একরাশ মন্তব্যের সমষ্টিরূপে, আর ওইসব বিষয়কে মোটামুটিভাবে গুচ্ছিত করা হয়েছে 'পার্টস অফ স্পিচ' শিরোনামে। তিনি বাক্য বর্ণনার বিষয় হিশেবে যা নেন, তার মধ্যে আছে (দ্র হাউজহোলডার (সম্পাদক ১৯৭২, ৯)) : 'নির্দিষ্টতাসূচক আর্টিক্যালের মূল্য : ইনফিনিটিভসমূহের শুদ্ধ শ্রেণীকরণ, আর্টিক্যাল ব্যবহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রণালি, ইনফিনিটিভ ও পার্টিসিপল-এর বিবিধ ব্যবহার; সম্বন্ধাত্মক সর্বনামের ব্যবহারবিধি, ক্রিয়া কখন কর্তারূপে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম গ্রহণ করে; যে-সমস্ত সর্বনাম ও প্রিপজিশন সর্বনামকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের উচ্চারণ; ইনফিনিটিভযুক্ত দ্বৈতকর্মের অদ্ব্যর্থকরণপ্রক্রিয়া; প্রশ্নে 'নির্দেশক'-এর ব্যবহার; স্বেচ্ছাকৃত্যের সাথে অনুজ্ঞার সম্পর্ক; কোন কোন ক্রিয়া সম্প্রদান অথবা সম্বন্ধপদীয় সম্পূরক গ্রহণ করে, কেনো প্রিপজিশন কখনো কর্তা অথবা সম্বোধনপদকে নিয়ন্ত্রণ করে না।' এ-সূচি থেকে বোঝা যায় বাক্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে দিস্কোলুস ভাষার সমস্ত স্তরকেই কোনো-না-কোনোভাবে আলোচনার বিষয়রূপে নিয়েছেন। তাঁর অনুসরণকারীরাও বাক্যবর্ণনায় নেমে স্তর থেকে স্তরান্তরে অবিরাম যাওয়া আসা করেছেন।

দিস্কোলুস পার্টস অফ স্পিচ অনুসারে বিষয়বিন্যাসের যে-রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, তা আজো বিদ্যমান নানারকম প্রথাগত ব্যাকরণে। রেনেসাঁস ও রেনেসাঁস-উত্তরকালে ব্যাকরণবিদেরা অবশ্য বিষয়বিন্যাসের দিস্কোলুসের রীতির সাথে যুক্ত করেন কিছুটা অভিনবত্ব। উনিশশতকের গ্রিক ব্যাকরণের বিষয়বিন্যাস কী-রূপ পায়, এইচ ডব্লিউ স্মিথ-এর *গ্রিক গ্রামার* অবলম্বনে তা বর্ণনা করেছেন হাউজহোলডার (সম্পাদক ১৯৭২, ৯))। তাতে প্রথম স্থান পায় ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণমালা; তারপর স্থান পায় ইনফ্লেকশন—প্রথমে বিশেষ্যের, পরে ক্রিয়ার; তৃতীয় স্থান পায় শব্দগঠন—প্রথমে ধাতু-প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দগঠনপ্রক্রিয়া, ও পরে সমাসজাত শব্দগঠনপ্রক্রিয়া, এবং সবশেষে স্থান পায় বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্ব বর্ণিত হয় দু-ভাগে : একভাগে থাকে সরল বাক্যের বর্ণনা; অন্যভাগে থাকে মিশ্রবাক্যের, ও কিছুটা সংযুক্ত বাক্যের, বর্ণনা। সরল বাক্য পর্যায়ে প্রথমে আলোচিত হয় উদ্দেশ্য, বিধেয়, সঙ্গতি প্রভৃতি বিষয়; এবং পরবর্তী আলোচ্য বিষয় বিন্যস্ত হয় পদক্রম অনুসারে। অনেকে, যেমন স্মিথ, পদসমূহকে বিন্যস্ত করেন বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, আর্টিক্যাল, সর্বনাম, বিশেষ্য, প্রিপজিশন, ক্রিয়া ক্রমে। পদগুলোর মধ্যে সব পদ অবশ্য সমান গুরুত্ব পায় না; বিশেষ্য ও ক্রিয়াই লাভ করে বিশেষ ও

ব্যাপক গুরুত্ব। বিশেষ্যের আলোচনার সময় বিশেষভাবে আলোচিত হয় কারকসমূহ। কারকগুলোর মধ্যে 'কর্তা' বা 'কর্তৃ' (বা রামমোহনের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ 'অভিমত' : 'নোমিনেটিভ') অবশ্য আলোচিত হয়ে যায় আগেই;—সরল বাক্য বর্ণনার সময়, যখন উদ্দেশ্য-বিধেয়, সঙ্গতি প্রভৃতি আলোচিত হয়। তাই বিশেষ্য পর্যায়ে আলোচিত হয় অন্যান্য কারক, নিম্নক্রমে : সম্বোধন, সম্বন্ধ, সম্প্রদান ও কর্ম (লাতিন ব্যাকরণরচয়িতারা এর সাথে যোগ করেন 'অপাদান'কে)। মিশ্রবাক্যবিষয়ক আলোচনা বিন্যস্ত হয় অধীনতামূলক উপবাক্যের প্রকৃতি অনুসারে। এসব উপবাক্যের মধ্যে আছে কারণাত্মক উপবাক্য, ফলাফলাত্মক উপবাক্য, শর্তমূলক উপবাক্য, কালাত্মক উপবাক্য, তুলনাত্মক উপবাক্য, সম্বন্ধাত্মক উপবাক্য।

লাতিন বাক্যের বর্ণনা গ্রিক বাক্যতত্ত্বের বর্ণনাকাঠামোতেই সম্পন্ন হয়ে আসছে লাতিন ব্যাকরণের উদ্ভবের কাল থেকে। মার্কুস তেরেনতিউস ভাররো (১০০ খ্রিপূ) *দ্যা লিংগুয়া লাতিনা* নামে লাতিন ভাষার পঁচিশ খণ্ডের যে-ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তাতে বাক্যতত্ত্বের আলোচনা হয়তো ছিলো; কিন্তু তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আঠারো খণ্ডে রচিত প্রিস্কিআনের (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) লাতিন ভাষার ব্যাকরণই লাতিনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিস্তৃত ব্যাকরণ হিশেবে গণ্য হয়ে আসছে গত দেড় হাজার বছর ধ'রে। ওই ব্যাকরণের সপ্তদশ-অষ্টাদশ খণ্ড, যা মধ্যযুগে পরিচিত ছিলো *প্রিস্কিআনুস মিনর*—প্রিস্কিআনের অপ্রধান—নামে, লাতিন বাক্যের বর্ণনা। প্রিস্কিআন অনুসরণ করেছিলেন দিস্কোলুসকে, তাই তাঁর বাক্যবর্ণনা দিস্কোলুসের বাক্যবর্ণনার মতোই। প্রিস্কিআন লাতিন বাক্য বিশ্লেষণে প্রধানত অবলম্বন করেছিলেন আর্থ মানদণ্ড, তবে রৌপ মানদণ্ডও ব্যবহার করেছেন তিনি ব্যাপকভাবে। ব্যাকরণের সপ্তদশ খণ্ডে তিনি বর্ণনার জন্যে গ্রহণ করেন একটি বাক্য, এবং নানারকম বাক্যাংশের প্রতিকল্পন ও সংযোজনে বাক্যটি কীভাবে আক্রান্ত হয়, তা বর্ণনা করেন। তিনি দেখান যে তাঁর উদাহরণ-বাক্যটিতে স্থান পেয়েছে সব রকমেরই বাক্যাংশ বা পদ, শুধু একটি বাদে। যে-পদটি স্থান পায় নি, সেটি হচ্ছে সংযোজক; অর্থাৎ সরল বাক্যে সংযোজকের কোনো জায়গা নেই। ওই বাক্যে সংযোজক ব্যবহার করতে হ'লে বাক্যটির সাথে যুক্ত করতে হবে আরেকটি বাক্য। ব্যাকরণের শেষ, অষ্টাদশ খণ্ডে প্রিস্কিআন বর্ণনা করেন ক্রিয়ার ভাব, এবং শনাক্ত করেন চার রকম সংগঠন। সংগঠন শনাক্তির মানদণ্ডরূপে তিনি গ্রহণ করেন ব্যক্তিবাচক কর্তাকে, অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক কর্তার অবস্থা অনুসারে তিনি নির্দেশ করেন ওই সংগঠনগুলোর স্বাতন্ত্র্য। তিনি সংগঠনগুলোর নাম দেন : (ক) 'অকর্মক সংগঠন', (খ) 'সকর্মক সংগঠন', (গ) 'পারস্পরিক সংগঠন', ও (ঘ) 'পুনঃসকর্মক সংগঠন'। ওই সংগঠনগুলো নির্দেশ করার জন্যে প্রিস্কিআন ব্যবহার করেন এ-উদাহরণগুলো : (ক) 'মহিমান্বিত লোকটি দৌড় দিলেন' : এটি অকর্মক সংগঠন; কেননা এখানে লোকটির ক্রিয়া অন্য কারো ওপর 'ক্রিয়া' করে নি; (খ) 'আরিস্তফানেস আরিস্তরকুসকে পড়িয়েছিলেন' : এটি সকর্মক সংগঠন; যেহেতু এখানে এক ব্যক্তি আরেকজনের ওপর 'ক্রিয়া' করেন; (গ) 'আজাক্স নিজেকে খুন করেছে' : এটা পারস্পরিক সংগঠন; কেননা এখানে

লোকটি নিজের ওপরই 'ক্রিয়া' করে (এ-রকম সংগঠনকে এখন বলা হয় 'আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সংগঠন'; কেননা এখানে বাক্যের কর্তা নিজের ওপর ক্রিয়া করে। পারস্পরিক সংগঠনের উদাহরণ : 'হাসান ও হাসিনা পরস্পরকে ঘৃণা করে'; এ-সংগঠনে একজনের ঘৃণা অন্যের দিকে ধাবিত ব'লে এটা পারস্পরিক সংগঠন (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩ ক; সপ্তম পরিচ্ছেদ)) এবং (ঘ) 'সে তোমাকে তার কাছে আসার জন্যে আদেশ দিয়েছে' : এটি পুনঃসকর্মক সংগঠন; কেননা এখানে এক ব্যক্তি আরেকজনের ওপর 'ক্রিয়া' করছে এবং এ-ক্রিয়া ফিরে আসছে তারই অভিমুখে।

এবার উনিশ শতকের একটি লাতিন ব্যাকরণের বিষয়সংগঠন ও বাক্যবর্ণনার কৌশলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। আমি নিচ্ছি গিলডারস্লিভের *লাতিন গ্রামার* (১৮৯৫)। এ-ব্যাকরণটির বিষয়বিন্যাস ও বর্ণনার কৌশল বহুলাংশে স্মিথের *গ্রিক গ্রামার*-এর মতো। ব্যাকরণটি বিভক্ত তিনটি প্রধান পরিচ্ছেদে, যাদের নাম 'শব্দব্যুৎপত্তি', 'বাক্যতত্ত্ব', ও 'ছন্দোশাস্ত্র'। 'শব্দব্যুৎপত্তি' পরিচ্ছেদের আধুনিক নাম রূপতত্ত্ব। এ-পরিচ্ছেদে প্রথমে আলোচিত হয়েছে বর্ণমালা ও সিলেবল; ও পরে 'পার্টস অফ স্পিচ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তৃতভাবে। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, সংখ্যাশব্দ, সর্বনাম, ক্রিয়া—এ-ক্রমানুসারে গিলডারস্লিভ বাক্যাংশসমূহের পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন বিশেষ্য ও ক্রিয়া। পরে ব্যাখ্যা করেছেন শব্দগঠনপ্রক্রিয়া। গিলডারস্লিভের ব্যাকরণের একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বাক্যতত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা;—তিনি লাতিন বাক্যসংগঠন ব্যাপকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, যদিও অন্যান্য ব্যাকরণবিদ সাধারণত বাক্য সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকতে বা কম কথা বলতে পছন্দ করেন। বাক্যের আলোচনা তিনি দুটো বড়ো ভাগে—'সরল বাক্য', ও 'সংযুক্ত বাক্য'—ভাগ ক'রে সম্পন্ন করেছেন। তিনি আলোচনা শুরু করেছেন 'বাক্যতত্ত্ব', 'বাক্য', 'সরল বাক্য;, 'উদ্দেশ্য', 'বিধেয়' প্রভৃতি ধারণার সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিয়ে (দ্র গিলডারস্লিভ ও লজ (১৯৩৬, ১৪৩))। তিনি এ-সমস্ত ধারণার যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়পাঠ্য প্রথাগত ব্যাকরণপুস্তকেই পাওয়া যায়। যেমন : তাঁর কাছে বাক্য হচ্ছে 'শব্দের সাহায্যে ভাবের প্রকাশ', আর 'উদ্দেশ্য' হচ্ছে তা, যার সম্বন্ধে 'বিধেয়' উক্ত হয়, এবং 'বিধেয়' হচ্ছে তা, যা উক্ত হয় 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে। এ-সংজ্ঞা বেশ চক্রাকার, কেননা উদ্দেশ্যকে জানার জন্যে জানা দরকার বিধেয়, আবার বিধেয়কে জানার জন্যে আগেই জানা দরকার উদ্দেশ্যকে। এরপরে তিনি বর্ণনা-ব্যাখ্যা করেছেন সরল বাক্যের বাক্যতত্ত্ব। এ-পর্যায়ে তাঁর ব্যাখ্যার বিষয় : কর্তা, বিধেয়, কোপিউলা, কর্তাক্রিয়াসঙ্গতি, বিধেয়-ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ, বাচ্য, কাল, ভাব প্রভৃতি। এরপরে তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে সরল বাক্যকে সম্প্রসারিত করা যায় নানারূপে। এ-পর্যায়ে বিভিন্ন কারকের পরিচয় দেয়া হয়েছে বিশদভাবে। সরল বাক্য বর্ণনার পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যৌগিক বাক্য। যৌগিক বাক্য হিশেবে তিনি মিশ্র ও সংযুক্ত উভয় শ্রেণীর বাক্যকেই গ্রহণ করেছেন। স্মিথ তাঁর *গ্রিক গ্রামার*-এ সংযুক্ত ও মিশ্র উভয় শ্রেণীর বাক্যকে গ্রহণ করেছেন

মিশ্র বাক্য হিশেবে, আর গিলডারস্লিভ নিয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কাছে যৌগিক বাক্য হচ্ছে 'তেমন বাক্য, যাতে বাক্যের দরকারি অংশগুলো একাধিকবার উপস্থিত থাকে, এবং যাতে থাকে একাধিক উপবাক্য [ক্লজ]'। বাক্যে একাধিক উপবাক্যবিন্যাসের প্রক্রিয়াকে প্রথাগত রীতিতে তিনি ভাগ করেছেন দু-ভাগে : (ক) সংযোজন [প্যারাট্যাকসিস] : এমন বিন্যাস যেখানে একাধিক উপবাক্য পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়; এবং (খ) অধীনতাকরণ [হাইপোট্যাকসিস] : এমন বিন্যাস যেখানে একটি উপবাক্য নির্ভরশীল থাকে আরেকটি উপবাক্যের ওপর। এরপরে তিনি অনেকটা বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করেছেন সংযুক্ত ও অধীনতামূলক বাক্যের সংগঠন। সংযুক্ত বাক্যগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে সংযোজকগুলোর— 'এত, কিউ, আতকিউ, এতিম'—ইত্যাদির প্রকৃতি অনুসারে। অধীনতামূলক বাক্যকে গিলডারস্লিভ সম্প্রসারিত সরল বাক্যরূপে গ্রহণ করেছেন, এবং এমন বাক্যের সংগঠনকে বিভক্ত করেছেন দু-খণ্ডে। এক খণ্ডকে গ্রহণ করেছেন 'বিশেষণ' হিশেবে, অন্যটিকে 'বিশেষ্য' বা 'সাবস্ট্যানটিভ রূপে; কেননা, তাঁর বিশ্লেষণে, অধীনতামূলক বাক্যের একটি উপবাক্য প্রধান সংগঠনরূপে কাজ করে, আর অন্যটি কাজ করে প্রধান উপবাক্যের বিশেষণরূপে। অধীনতামূলক উপবাক্যকে পুনরায় তিনি বিভক্ত করেছেন নানাভাগে; যেমন : কর্ম-বাক্য, কারণসূচক ক্রিয়াবিশেষণাত্মক বাক্য, কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণাত্মক বাক্য, বিশেষণাত্মক বা সম্বন্ধাত্মক বাক্য ইত্যাদি। বাক্যতত্ত্বের আলোচনার শেষে গিলডারস্লিভ পেশ করেছেন বাক্যতত্ত্বের একশো আটত্রিশটি প্রধান সূত্র। কয়েকটি সূত্র নিম্নরূপ (দ্র গিলডারস্লিভ ও লজ (১৯৩৬, ৪৩৭-৪৪৪)) :

(২) ক ক্রিয়া তার কর্তার সাথে বচন ও পুরুষগত সঙ্গতি রক্ষা করে।

খ দুই বা তার অধিক কর্তার সাধারণ বিধেয় বহুবচনের হয়; যখন লিঙ্গ বিভিন্ন হয়, তখন বিধেয় অধিকতর শক্তিমান অথবা নিকটবর্তী লিঙ্গ গ্রহণ করে; যখন পুরুষ বিভিন্ন হয়, তখন তা দ্বিতীয় পুরুষের থেকে প্রথম পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়, আবার তৃতীয় পুরুষের থেকে দ্বিতীয় পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়।

গ বিধেয়-বিশেষ্য কর্তার সাথে কারকগত সঙ্গতি রক্ষা করে।

ঘ সম্বন্ধাত্মক পদ তার পূর্বগামী পদের সাথে লিঙ্গ, বচন ও পুরুষগত সঙ্গতি রক্ষা করে।

ঙ পরোক্ষ কর্মে সম্প্রদান কারক হয়।

চ অপাদানের সাহায্যে কারণ, উপায় ও করণ নির্দেশিত হয়।

ছ পরিমাপ-মান নির্দেশিত হয় অপাদানের সাহায্যে।

গিলডারস্লিভ অনুশাসনিক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, তাই তিনি শেখাতে চেষ্টা করেছেন নির্ভুল বাক্যগঠনের নিয়মকানুন; যদিও তাঁর বিশ্লেষণ সুশৃঙ্খল ও অনুপঙ্খ নয়, তবুও তাঁর

অনেক অন্তর্দৃষ্টিই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লাতিন বাক্যবর্ণনাকে প্রথাগত বাক্যবর্ণনার আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করা যায়।

গ্রিক-লাতিন বাক্যবিশ্লেষণকৌশল গৃহীত হয় পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণে; এবং প্রধানত ইংরেজি প্রথাগত ব্যাকরণের প্রভাবে তা প্রবেশ করে বিশ্বের প্রায় সমস্ত ভাষার প্রথাগত ব্যাকরণে। বাক্যের বিভিন্ন উপাদান যে-ভাবে ওই প্রাচীন ব্যাকরণবিদেরা শনাক্ত করেছিলেন, ও নির্ণয় করেছিলেন যে-সব বাক্য সংগঠন, বিশশতকের প্রথাগত ব্যাকরণেও অবিকল অমনভাবে বাক্য-উপাদান ও বাক্যসংগঠন নির্দেশ করা হয়। ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার প্রথাগত বাক্যতাত্ত্বিকেরা অবশ্য ধ্রুপদী বাক্যতত্ত্বকে নানাভাবে সম্প্রসারিত ও শক্তিমান ক'রে তুলেছিলেন (দ্র § ২.৩-২.৩.৩)। তাঁদের বর্ণনাব্যাখ্যায় নানারকম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করলেও বাক্য সম্পর্কে প্রথাগত গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণবিদেরা মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিককালে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথম আপত্তি তোলেন প্রথাগত ব্যাকরণের বিরুদ্ধে এবং প্রথাগত ব্যাকরণকে প্রায় বাতিল ক'রে দেন। রূপান্তরবাদীরা এসে পুনর্বাসিত করেন প্রথাগতদের এবং বাতিল করেন সাংগঠনিকদের। রূপান্তরবাদীরা বাক্য সৃষ্টির সময় গ্রহণ করেন প্রথাগত ব্যাকরণের অনেক বোধিব্যাখ্যা, এবং দেখান যে প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব ও ব্যাকরণ সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত (দ্র চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

২.২ সংস্কৃত বাক্যতত্ত্ব

শুধু ধ্বনি ও রূপ বর্ণনায় নয়, বাক্য বর্ণনায়ও প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকেরা অর্জন করেছিলেন অসামান্য সাফল্য। সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকদের বাক্যবিষয়ক রচনাবলিকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায় : একভাগে রয়েছে বিপুল পরিমাণে দার্শনিক-তাত্ত্বিক রচনা, যাতে মূর্ত বাক্যরাশিকে লীন ক'রে দেয়া হয়েছে অদৃশ্য-অমূর্ত পরম ব্রহ্মে; এবং আরেক ভাগে রয়েছে প্রণালিপদ্ধতিগত রচনারাশি, যেখানে তাত্ত্বিকেরা দর্শন-পরাবিদ্যা পরিহার ক'রে বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করেছেন বাক্য। দার্শনিকতায় স্বাভাবিক ও প্রচণ্ড উৎসাহ ছিলো সংস্কৃত বাক্যতাত্ত্বিকদের, যার ফলে তাঁরা লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন সাধারণকে বিমূঢ় ক'রে দেয়ার মতো পর্যাপ্ত রচনা। ওই রচনাপুঞ্জের বড়ো অংশ আমাদের ক্লান্ত করে, কিন্তু তার মধ্যে যে-সারটুকু আছে তা চমৎকারভাবে খুলে দেয় অন্তর্দৃষ্টি। বাক্যের আর্থস্তরই প্রধানত ভাবিয়েছিলো সংস্কৃত বাক্যতাত্ত্বিকদের; এবং অর্থ যেহেতু ধ্বনিরূপের চেয়ে অনেক বিমূর্ত 'বস্তু', তাই তাঁরা অতীন্দ্রিয় আকাশবিহারের সুযোগও পেয়েছিলেন প্রচুর। তাঁদের কাছে বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো বাক্য-পদ প্রভৃতির 'সত্যাসত্যে'র বিষয়; এবং প্রায় অনন্ত তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন একটি প্রশ্ন নিয়ে যে বাক্য সত্য না পদ সত্য? সবার ওপরে কী সত্য, তা নির্ণয়ে ভারতীয়দের উৎসাহ ক্লান্তিহীন; বাক্য ও পদের সত্যাসত্য নির্ণয়েও তাঁরা সে-ক্লান্তিহীন, ও নিরর্থক, প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সংস্কৃত বাক্যতাত্ত্বিক বা বাক্য-দার্শনিকদের দুটি ভাগে ফেলা যায় : (ক) বাক্যবাদী গোত্র : এঁদের বিশ্বাস সবার ওপরে বাক্য সত্য—এ-গোত্রে আছেন 'স্ফোটবাদী',

'অন্বিতাভিধানবাদী' ও 'বৈয়াকরণ'গণ; এবং (খ) পদবাদী গোত্র : এঁদের বিশ্বাস সবার ওপরে পদ সত্য—এ-গোত্রে আছেন 'পূর্বমীমাংসক', 'ন্যায়-বৈশেষিক' ও 'অভিহিতান্বয়বাদী'গণ। সত্যাসত্যের তর্ককে তাঁরা টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন চূড়ান্তে (দ্র প্রভাতচন্দ্র (১৯৩০, ৮৪-১৬৯; ১৯৩৩, ৯৭-১৭৭), গুরুপদ (১৩৫০, ১-৩৩), প্রদীপকুমার (১৯৭৭, ৯৪-১৪৪))।

স্ফোটবাদীরা পরমাণুবাদী;—তাঁদের নির্ণীত ধ্রুববস্তুর নাম বাক্য। বাক্য ছাড়া আর কোনো উপাদানের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক : তাঁদের কাছে কোনো মূল্য নেই সে-সমস্ত উপাদানের, যাদের সমবায়ে বা সংসর্গে গ'ড়ে ওঠে বাক্য। তাঁদের বিশ্বাস বাক্য 'নিরংশ', 'নির্বিভাগ' অর্থাৎ অবিভাজ্য। এমন ধারণা পোষণ করতেন ভর্তৃহরি, পতঞ্জলি, শেষকৃষ্ণ, নাঁগেশ, ভট্টোজি, কোণ্ডভট্ট ও আরো অনেক বৈয়াকরণ। স্ফোটবাদকে তুরীয়লোকে উন্নীত করেছিলেন *বাক্যপদীয়* নামক গ্রন্থের রচয়িতা ভর্তৃহরি। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে বাক্যনামক ধ্রুববস্তুটি ক্ষুদ্রতর কোনো উপাদানে বিশ্লেষণীয় নয়; তবে সাধারণ মানুষকে ও নির্বোধদের বোঝানোর জন্যে বাক্যকে ভেঙেভেঙে বিশ্লেষণ করা হয়। তিনি এ-বিশ্লেষণের নাম দিয়েছিলেন 'অপোদ্ধার'। অন্বিতাভিধানবাদের প্রধান পুরুষ প্রভাকর; এবং তাঁরা বাক্যার্থ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া উদঘাটন করতে গিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে বাক্যার্থ অবিভাজ্য, তাই বাক্য অবিভাজ্য। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাশি পরস্পরের সাথে অন্বিত হয়ে গ'ড়ে তোলে এক অখণ্ড অর্থ, যা শ্রোতা বাক্য শোনার সাথেসাথে একবারে অনুধাবন করে। এ-প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'সম্মুগ্ধ ব্যুৎপত্তি'। অর্থাৎ অন্বিতাভিধানবাদীরা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন না, শব্দের নিরপেক্ষ অর্থে ছিলেন তাঁরা আস্থাহীন। তাঁদের সিদ্ধান্ত : বাক্যের প্রতিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্য শব্দের সাথে অন্বিত অর্থ। প্রভাকর শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কিত অর্থের নাম দিয়েছিলেন 'ব্যতিষক্ত'। অন্বিতাভিধানবাদীরা, স্ফোটবাদীদের মতোই, বাক্যার্থতাত্ত্বিক; বাক্যের সংগঠন বিশ্লেষণ তাঁদের লক্ষ্য ছিলো না। তবে তাঁরা সম্পূর্ণ বাক্যকে বিবেচনা করতেন একটি অবিভাজ্য সংগঠন ব'লে। বৈয়াকরণগণ বিশ্বাসী ছিলেন 'অখণ্ডবাক্য' ও 'অখণ্ডবাক্যার্থ'-এ। তাঁরা বাক্যের অবিভাজ্যতাতত্ত্বকে চরমে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাক্যবাদীদের বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন পদবাদীরা; এবং সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে বাক্য বিভিন্ন পদের সমষ্টি। অভিহিতান্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা কুমারিল, আর তিনি যে-দার্শনিক ধারার অন্তর্গত, তার নাম ন্যায়-মীমাংসা। অভিহিতান্বয়বাদ বাক্যের অখণ্ডতা, নিরংশতা বা অবিভাজ্যতায় বিশ্বাস করে না। ন্যায়বৈশেষিকেরাও কুমারিলের মতের অনুসারী। অভিহিতান্বয়বাদেরও লক্ষ্য বাক্যের অর্থজ্ঞাপনপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা, বাক্যসংগঠন বর্ণনা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না। স্ফোটবাদীরা যেমন বিদ্যুচ্চমকের মতো হঠাৎ-জ্ব'লে-ওঠা বাক্যার্থে আস্থাশীল ছিলেন, মনে করতেন বক্তাশ্রোতারা বাক্যে বিভিন্ন উপাদানের অর্থের সংশ্লেষের মাধ্যমে পুরো বাক্যের অর্থ আহরণ করে না, অভিহিতান্বয়বাদীরা তেমন ধারণায় আস্থা না রেখে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বক্তাশ্রোতারা

সমস্ত বাক্যের অর্থবোধের আগে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জের অর্থ গ্রহণ করে, এবং ওই শব্দরাশির অর্থের সমবায়ে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ। এতে বোঝা যায় তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ বাক্যসংগঠন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য-উপাদানের বা শব্দের সমষ্টি।

সংস্কৃত বাক্যবাদী ও পদবাদী গোত্র দুটি বাক্যসংগঠন-বর্ণনাকারী নয়; তাঁরা বাক্যার্থতাত্ত্বিক। তাই তাঁদের রচনা বাক্যসংগঠনের ওপর নানারকম আলো ফেললেও তাঁরা বাক্যসংগঠন বর্ণনা প্রণালিপদ্ধতিকৌশল আবিষ্কার করেন নি। সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না সংগঠনভিত্তিক বাক্যবর্ণনা, যেমন পাওয়া যায় গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা বাক্য বর্ণনার জন্যে আবিষ্কার করেছিলেন একটি সুগভীর তত্ত্ব, যার নাম কারকতত্ত্ব (দ্র ফিলমোর (১৯৬৮ক); হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩))। অবশ্য কারকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হ'তে-না-হ'তেই অনুকরণকারী ব্যাকরণবিদদের হাতে প'ড়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, এবং তা ব্যবহৃত হ'তে থাকে বিভক্তি ব্যবহারের বিধিনিষেধরূপে। বাক্যবর্ণনার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে বাক্যের উপাদান বা 'বাক্যাংশ' বা 'পদ' শনাক্ত করা। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা, পাণিনির আবির্ভাবের অনেক আগেই, শনাক্ত করেছিলেন বাক্যের বিভিন্ন পদ। পুরাণবিশ্বাসী সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা তো এমন ধারণা পোষণ করতেন যে আদিতে বাক বা বাক্য ছিলো অবিভক্ত ; এবং এক সময় ইন্দ্র বাকের বিভিন্ন অংশ নির্দেশ করে, তখন তার পরিচয় হয় 'ব্যাকৃত বাক' বা বিশ্লিষ্ট বাক্য (দ্র প্রভাতচন্দ্র (১৯৩৩, ১৩৬))। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের মধ্যে বাক্যের বিভিন্ন পদ প্রথম শনাক্তির কৃতিত্ব যাঁকে দেয়া হয়, তিনি যাস্ক। যাস্ক *নিরুক্ত* নামক শব্দব্যুৎপত্তিবিষয়ক গ্রন্থে প্রথম যে-সমস্ত পদ শনাক্ত করেছিলেন, ভারতীয় ব্যাকরণবিদেরা এখনো সে-সমস্ত পদই স্বীকার ক'রে থাকেন, যদিও তাঁরা কখনো কখনো ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন। যাস্ক শনাক্ত করেছিলেন চার রকম পদ : নাম (বিশেষ্য), অখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ, ও নিপাত। অবশ্য তাঁর পদবিভাগ যে সবাই মেনে নিয়েছিলেন, এমন নয়,—অনেকে পদের সংখ্যা তিন, দুই, এমনকি এক ব'লেও নির্দেশ করেছিলেন। অনেক ব্যাকরণবিদ, পাণিনির একটি সূত্রানুসারে, স্বীকার করেছেন মাত্র দু-রকম পদ : সুবন্ত পদ—যে-সমস্ত শব্দ 'সুপ'-প্রত্যয়ান্ত, ও তিঙন্ত পদ—যে-সমস্ত শব্দ 'তিঙ'-প্রত্যয়ান্ত্য; অর্থাৎ বিশেষ্যপদ ও ক্রিয়াপদ। কেউ কেউ যাস্কের 'চত্বারি পদজাতানি'র সাথে 'কর্মপ্রবচনীয়' নামক একটি নতুন পদ যুক্ত ক'রে পাঁচ প্রকারের পদ নির্দেশ করেছেন।

ধ্রুপদী সংস্কৃত ব্যাকরণে 'বাক্য', 'বাক্যতত্ত্ব' বা এমন নামের কোনো পরিচ্ছেদ থাকে না; কারক পরিচ্ছেদেই ধ্রুপদী সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা বর্ণনা করেন বাক্য, অর্থাৎ বিভিন্ন কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ব্যবহারের বিধান নির্দেশ করেন। উনিশ শতকে যখন ইউরোপী ভাষাবিদেরা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা শুরু করেন, তখন তাঁদের কেউ কেউ গ্রিক-লাতিনের অনুসরণে বাক্যতত্ত্ব—সিন্ট্যাক্স—নামে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করেন, এবং গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণের কৌশলে বর্ণনা করেন সংস্কৃত বাক্য। তাঁদের কেউই সংস্কৃত বাক্যবর্ণনার ওপর গুরুত্ব দেন নি। তাই অনেকেই বাক্যবর্ণনায় উৎসাহ দেখান নি; আর যাঁরা বাক্যবর্ণনার উদ্যোগ নিয়েছেন,

তাঁরাও বিষয়টিকে অপ্রধান বিবেচনা করেছেন। তাঁদের কাছে গ্রিক-লাতিনের তুলনায় সংস্কৃত বাক্য অনেক সরল ব'লে প্রতিভাত হয়েছে, এবং অনেকের কাছে সংস্কৃত রূপতত্ত্বের বর্ণনাই মনে হয়েছে বাক্যবর্ণনা ব'লে। যেমন—মনিয়ের উইলিয়মস (১৮৭৭, ৩৫৪) মন্তব্য করেছেন : 'যে-লেখক সমাস-ক্রিয়া বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই বাক্যে শব্দের ক্রম, বিন্যাস ও সহাবস্থানের অর্ধেকের বেশি সূত্র বর্ণনা করেছেন।' আধুনিক সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের সংস্কৃত বাক্যবর্ণনার কৌশলের পরিচয় যে-সমস্ত ব্যাকরণে পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছে মনিয়ের উইলিয়মস-এর *এ প্র্যাকটিক্যাল গ্রামার অফ দি স্যান্সক্রিট ল্যাংগুয়েজ* (১৮৫৭, ২৯৮-৩২৭; ১৮৭৭, ৩৫৪-৩৭৭), ম্যাকডোনেল-এর *এ ভেডিক গ্রামার ফর স্টুডেন্টস* (১৯১৬, ২৮৩-৩৬৮) ও *এ স্যান্সক্রিট গ্রামার ফর স্টুডেন্টস* (১৯২৭, ১৭৮-২০৯), ও মোরেশ্বর রামচন্দ্র কালের *এ হায়ার স্যান্সক্রিট গ্রামার* (১৯৩১, ৪৬৮-৫৩৬)।

মনিয়ের উইলিয়মস (১৮৭৭) সংস্কৃত বাক্যবর্ণনার জন্যে গ্রহণ করেছেন নিম্নলিখিত বিষয় : আর্টিক্যাল, সঙ্গতি, বিশেষ্য ('বিশেষ্যের বাক্যতত্ত্ব' শিরোনামে তিনি কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ কারকের ব্যবহারবিধি বর্ণনা করেছেন), বিশেষণ, বিশেষণের তর-তম, সংখ্যাশব্দ, সর্বনাম, ক্রিয়া ইনফিনিটিভ, কাল, পার্টিসিপল, সংযোজক-বিভক্তি-ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি। তাঁর বর্ণনার রীতি লাতিন ব্যাকরণ অনুসারী। তাঁর চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে বাক্যবর্ণনা করেছেন ম্যাকডোনেল (১৯১৬)। ম্যাকডোনেল-এর বর্ণনার বিষয় হচ্ছে : শব্দক্রম, বচন, সঙ্গতি, সর্বনাম, কারক (কারক পর্যায়ে তাঁর ব্যাখ্যার বিষয় : কর্তৃ, কর্ম, দ্বৈত কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধপদ, অধিকরণ), পার্টিসিপল, জিরান্ড, ইনফিনিটিভ, কাল ও ভাব। তিনিও লাতিন ব্যাকরণ অনুসারী। তিনি বৈদিক বাক্যের যে-সমস্ত সূত্র উদঘাটন করেছিলেন, তার কয়েকটি :

(৩) ক কর্তা বাক্যের শুরুতে বসে।

খ বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্যে কখনোকখনো ক্রিয়াকে বাক্যের শুরুতে স্থানান্তরিত করা হয়।

গ কর্মকারক ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে বসে।

ঘ বহুবচন বা সমষ্টিবোধক একবাচনিক শব্দকে একবচনরূপে গণ্য করা হয়, তাদের কখনো বহুবাচনিক ক্রিয়ার সাথে প্রয়োগ করা হয় না।

ঙ ক্রিয়া কর্তার সাথে পুরুষ-ও বচন-গত সঙ্গতি রক্ষা করে। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম অত্যন্ত কম।

চ বিধেয়-বিশেষণ, যখন 'অস্' অথবা 'ভূ'-র সাথে বসে, কর্তার সাথে লিঙ্গ-ও বচন-গত সঙ্গতি রক্ষা করে।

ছ কর্তৃকারক, অন্যান্য ভাষার মতো, প্রধানত বাক্যের কর্তারূপে ব্যবহৃত হয়।

জ দ্বিতীয় একরকম কর্তৃকারক একগুচ্ছ ক্রিয়ার সাথে বাক্যের বিধেয়রূপে বসে।

এসব সূত্র ধ্রুপদী সংস্কৃত ব্যাকরণঅনুসারী নয়; গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণঅনুসারী। ইউরোপী ব্যাকরণবিদেরা সংস্কৃত বাক্যবর্ণনায় প্রয়োগ করেছিলেন প্রথাগত গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণের কৌশল, এবং উদঘাটন করেছিলেন অনেক বিশ্বজনীন সূত্র, যা সামান্য বাহ্যিক ভিন্নতা বাদে ভাষায় ভাষায় অভিন্ন।

২.৩ ইংরেজি বাক্যতত্ত্ব

আঠারো শতকে ইংরেজি প্রথম তীব্র আকর্ষণ করে ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের মনোযোগ : তাঁরা গ্রিক-লাতিন ভাষার যথাযথতা ও সুশৃঙ্খলার সাথে ইংরেজির স্খলন-ত্রুটি-বিশৃঙ্খলার তুলনা ক'রে মর্মাহত, এবং ইংরেজিকে এক সুশৃঙ্খল ভাষায় রূপ দেয়ার জন্য আকুল হন (দ্র গ্লিসন (১৯৬৫, ৬৭-৭৯), ডিনিন (১৯৬৭, ১৫১-১৬৬), পরিশিষ্ট : এক))। স্যামুয়েল জনসনের বিখ্যাত অভিধান *ডিকশনারি অফ দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ,* যা ইংরেজি শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করে নানাভাবে, বেরোয় ১৭৫৫তে; আর ষাটের দশকের শুরুতে বেরোয় দুটি ব্যাকরণ—জোসেফ প্রিস্টলির *দি রুডিমেন্টস অফ ইংলিশ গ্রামার* (১৭৬১), ও পাদ্রি রবার্ট লৌথের *এ শর্ট ইনট্রোডাকশন টু ইংলিশ গ্রামার* (১৭৬২)। প্রিস্টলির বইটি, যদিও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, সাড়া জাগাতে পারে নি; কিন্তু পাদ্রি লৌথের ব্যাকরণ ইংরেজিকে শাসন করে একনায়কের মতো। এর পরে, আঠারো-উনিশ-বিশ শতকে, প্রকাশ পায় অজস্র প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণপুস্তক। ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা ইংরেজি ব্যাখ্যাবর্ণনার সময় মেনে নিয়েছিলেন থ্রাক্স-প্রিস্কিআন ও অন্যান্য গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণবিদের অনুশাসন ও নির্দেশ : পাতায় পাতায় তাঁরা অনুসরণ করেছেন ধ্রুপদী ব্যাকরণবিদদের, ধার করেছেন পরিভাষা, ভাব, সংজ্ঞা; ইংরেজি ব্যাখ্যাবর্ণনা করেছেন গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণের কৌশলে। বাক্যবর্ণনার সময়ও তা-ই করেছেন। প্রথাগত ইংরেজি বাক্যতত্ত্বে যে-সমস্ত ধারণা, সংজ্ঞা, পরিভাষা, বর্ণনাকৌশল ব্যবহৃত হয়, তার প্রায় সবটাই সংগ্রহ করা হয়েছে গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণ থেকে—কখনো অবিকল-কখনো বিকল-ভাবে। তবে দু-শো বছর ধ'রে ইংরেজি বাক্যবর্ণনাকারীরা কি শুধুই অনুকরণ ক'রে যাচ্ছেন ধ্রুপদীদের, পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন নিজেদের? প্রথাগত ইংরেজি বাক্যতাত্ত্বিকেরা কি, প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতাদের মতো, একটি মেধাশূন্য অন্ধ পরিশ্রমবিমুখ অনুকরণকারী শ্রেণী? না, তাঁদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এমন অপবাদ তাঁদের দেয়া যায় না। গত দু-শো বছর ধ'রে অজস্র ব্যাকরণবিদ পরিশ্রম করেছেন ইংরেজি বাক্যের দৃশ্য-অদৃশ্য সূত্র উদঘাটনের, বাক্যের আধার ও আধেয় ব্যাখ্যার, এবং এর ফলে ইংরেজি বাক্যের উপাদান, সংগঠন, শ্রেণী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চমৎকারভাবে উদঘাটিত হয়েছে। ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যকে কখনোই অবহেলা করেন নি, যেমন করেছেন বাঙলা ব্যাকরণবিদেরা ; —যে-কোনো প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণেই পাওয়া যায় বাক্য সম্পর্কে বেশ দীর্ঘ পরিচ্ছেদ। আবার অনেক প্রথাগত ব্যাকরণবিদ সম্পূর্ণ গ্রন্থই রচনা করেছেন বাক্যসম্পর্কে (দ্র কারমে (১৯৩৫)) ; অনেকে পুস্তক শুরু করেছেন বাক্যবিশ্লেষণ দিয়ে।

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যবিশ্লেষণের সময় সাধারণত মেনে নিয়েছেন 'সর্বজনীন ব্যাকরণ'-এর তাত্ত্বিক ধারণা ও প্রণালিপদ্ধতি। তাঁরা বিশ্বজনীন নিয়মশৃঙ্খলা সক্রিয় দেখতে চেয়েছেন ইংরেজিতে, কিন্তু অনেক সময় দেখেছেন সে-নিয়মের ব্যত্যয়;— খুঁজেছেন যুক্তি, কিন্তু পেয়েছেন যুক্তিবিরোধিতা। কেউ কেউ, যেমন লৌথ, অযৌক্তিক বহুল ব্যবহৃত অনেক বাক্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ক'রে তাদের যুক্তিসঙ্গত রূপ নির্দেশ করেন। ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণপুস্তক লেখকেরা, যাতে ছাত্ররা চমৎকারভাবে বাক্য প্রয়োগ করতে পারে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন বাক্যের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে, এবং তাঁরা গ'ড়ে তুলেছেন ইংরেজি বাক্যবর্ণনার এক মান কাঠামো, যা প্রায় অভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় সমস্ত ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণপুস্তকে। বিশ শতকে কেউ কেউ, যেমন ইয়েসপারসেন বা কারমে, প্রথাগত বাক্য-বর্ণনাকে অনেকাংশে নিজেদের ভাবনা অনুসারে ঢেলে সাজান। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভবের পরে প্রথাগত বাক্যতাত্ত্বিকেরা প্রভাবিত হন সাংগঠনিক রীতিপ্রণালিপদ্ধতি দ্বারা, এবং অনেকটা যেনো নিজেদের মর্যাদা রক্ষা বা বাড়ানোর জন্যে প্রথাগত কৌশলের সাথে যুক্ত করেন সাংগঠনিক কৌশল। এতে বাক্যবর্ণনা বেশ ঝকঝকে হয়ে ওঠে কোনোকোনো পুস্তকে, কিন্তু ওই বর্ণনা না প্রথাগত না সাংগঠনিক, অর্থাৎ অবিশুদ্ধ। রূপান্তর ব্যাকরণের উদ্ভবের পরে অনেকে রূপান্তর ব্যাকরণের অনেক বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য অতি উৎসাহে গ্রহণ করেন। নিজেদের পুস্তকে (দ্র কুইর্ক ও গ্রিনবাম (১৯৭৩); এতে শিক্ষার্থীদের হয়তো কিছুটা উপকার হয়, কিন্তু তিরোধান ঘটে প্রথাগত ব্যাকরণ ও বাক্যতত্ত্বের।

ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যের রৌপ ও আর্থ উভয় বৈশিষ্ট্যের দিকেই চোখ দিয়েছেন : শনাক্ত করেছেন, তাঁদের নিজস্ব প্রণালিতে, বাক্যের উপাদান, এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন ওই সব উপাদানের ভূমিকা বা বৃত্তি। কেবল উপাদানের বা রূপের বর্ণনায় তৃপ্ত নন কোনো প্রথাগত ব্যাকরণবিদ, ওই রূপ কোন কাজে লাগে তার ব্যাখ্যা দেয়ার প্রতিই তাঁদের আগ্রহ অধিক;—ইংরেজি বাক্যতাত্ত্বিকেরাও তা-ই। তাঁরা বাক্যের ক্ষুদ্রতম উপাদানরূপে চিহ্নিত করেছেন শব্দকে; শব্দ শনাক্ত করেছেন আর্থ মানদণ্ডে, এবং পূর্ণ ভাবজ্ঞাপক শব্দসমষ্টিকে গ্রহণ করেছেন বাক্যরূপে (দ্র § ১.৩)। তার পরে পরিচয় দিয়েছেন বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গসংস্থানের, ব্যাখ্যা করেছেন ওই সবের ভূমিকা; শ্রেণীকরণ করেছেন বাক্যের—একবার রৌপ মানদণ্ডে, আরেকবার আর্থ মানদণ্ডে। উনিশ শতকের ব্যাকরণবিদেরা প্রথম বোধ করেন যে বাক্যের রূপ মূর্ত ক'রে তোলা দরকার চোখের সামনে, তাই বাক্য বর্ণনাব্যাখ্যার সাথেসাথে তাঁরা দিতে শুরু করেন বাক্যচিত্র, যা বিমূর্ত বাক্যসংগঠনকে অনেকটা মূর্ত ক'রে তোলে। বাক্যচিত্রকে সাংগঠনিকেরা সুষ্ঠুতর করেন; এবং রূপান্তরবাদীদের হাতে বাক্যচিত্র এমন রূপ পায়, যাতে বাক্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদাংশে আমি ইংরেজি বাক্যতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো (দ্র § ২.৩.০-২.৩.৩)।

২.৩.০ শব্দশ্রেণীকরণ : পার্টস অফ স্পিচ

প্রথাগত ইংরেজি বাক্যবর্ণনার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে শব্দশ্রেণীকরণ, অর্থাৎ ইংরেজি শব্দরাশিকে বিভিন্ন 'পার্টস অফ স্পিচ'-এ বিন্যাস ক'রেই আরম্ভ হয় ইংরেজি বাক্যের বর্ণনা। এমন বিন্যাসের ধারণা তাঁরা পেয়েছিলেন থ্রাক্স-প্রিস্কিআনের কাছে থেকে : ওই ধ্রুপদী দুই ব্যাকরণবিদের শব্দশনাক্তি ও শ্রেণীকরণের কৌশল ভক্তের মতো গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা। থ্রাক্স আট রকম গ্রিক শব্দ, আর প্রিস্কিআন আট রকম লাতিন শব্দ নির্দেশ করেছিলেন; এবং জোসেফ প্রিস্টলি, ১৭৬১তে, ইংরেজির জন্য স্থির করেছিলেন আট রকম 'পার্টস অফ স্পিচ'। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা সাধারণত ওই আট রকম শব্দই স্বীকার ক'রে আসছেন। তাঁদের স্বীকৃত আট রকম শব্দ-শ্রেণী হচ্ছে : নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেকটিভ, ভার্ব্, অ্যাডভার্ব্, প্রিপজিশন, কনজাঙশন, ও ইন্টারজেকশন। অবশ্য এ-বিষয়ে যে দ্বিমত নেই, তা নয়। যেমন : গোল্ড ব্রাউন (১৮৬৮) 'আর্টিক্যল', ও 'পার্টিসিপল'কে পৃথক শ্রেণীরূপে গণ্য ক'রে দশ শ্রেণীর শব্দ নির্দেশ করেছেন; ইয়েসপারসেন (১৯২৪, ৯১) স্বীকার করেছেন পাঁচ রকম শব্দ-শ্রেণী : 'সাবস্টেনটিভ, অ্যাডজেকটিভ, প্রোনাউন, ভার্ব্, ও পার্টিক্যল'। অন্য ব্যাকরণবিদদের স্বীকৃত 'অ্যাডভার্ব্, প্রিপজিশন, কনজাংশন ও ইন্টারজেকশন'কে তিনি গুচ্ছিত করেছেন পার্টিক্যল-শ্রেণীতে। শব্দশনাক্তি ও শ্রেণীকরণে প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা, ধ্রুপদীদের মতোই, ব্যবহার করেন মিশ্র মানদণ্ড;—তাঁরা বিশেষ্য ও ক্রিয়া শনাক্ত করেন আর্থ মানদণ্ডে, আর অন্যান্য শব্দ নির্দেশ করেন রৌপ মানদণ্ডে। এ-মিশ্র মানদণ্ড অনেক প্রথাগত ব্যাকরণবিদের কাছেই অস্বস্তিকর ব'লে মনে হয়, আর তা ভয়ংকর আক্রমণস্থল হ'য়ে ওঠে সাংগঠনিকদের। প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের শনাক্ত শব্দশ্রেণী ও তাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

(৪) ক কোনো কিছুর নামই বিশেষ্য (পেন্স (১৯৪৭, ৫))।

কোনো জীবন্ত অথবা জীবনহীন বস্তুর নামই বিশেষ্য, বা সাবস্টেনটিভ (কারমে (১৯৪৭, ১১))।

কোনো কিছুর নাম নির্দেশ করে, এমন শব্দই বিশেষ্য (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩২))।

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামই বিশেষ্য (ফকনার (১৯৫০, ৪))।

বিশেষ্য হচ্ছে এমন শব্দ, যা ব্যক্তি, স্থান, অথবা বস্তুর নাম নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয় (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৩))।

খ সর্বনাম হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো সাবস্টেনটিভের বিকল্পে ব্যবহৃত হয় (পেন্স (১৯৪৭, ৫))।

বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দই সর্বনাম (কারমে (১৯৪৭, ১৩))।

বিশেষ্যের বদলে ব্যবহৃত শব্দই সর্বনাম (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৩))।

বিশেষ্যের বিকল্পে ব্যবহৃত শব্দই সর্বনাম (ফকনার (১৯৫০, ৪))।

বিশেষ্যের বদলে ব্যবহৃত শব্দই সর্বনাম (ওয়ারিনার (১৯৫০, ৩))।

গ ক্রিয়া হচ্ছে এমন শব্দ (বা পদ), যা ক্রিয়া ('পাখিরা ওড়ে'), অস্তিত্ব ('আমি আছি'), বা অস্তিত্বের বা সংগঠনের অবস্থা ('তাকে মনে হয়', 'সে মারা গেছে') বোঝায় (পেন্স (১৯৪৭, ৫))।

ক্রিয়া হচ্ছে উক্তির সে-অংশ, যার সাহায্যে আমরা কোনো বিবৃতি দিই বা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি (কারমে (১৯৪৭, ২২))।

ক্রিয়া হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো ক্রিয়া, অস্তিত্ব অথবা অস্তিত্বের অবস্থা বোঝায় (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৩))।

ক্রিয়া হচ্ছে এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, যা কর্তা সম্পর্কে কিছু বলে, এবং ক্রিয়া, সম্বন্ধ, বা অস্তিত্বের অবস্থা নির্দেশ করে (ফকনার (১৯৫০, ৮))।

ক্রিয়া বা অস্তিত্বের অবস্থা বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত শব্দই ক্রিয়া (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৮))।

ঘ বিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো বিশেষ্যকে বর্ণনা (অর্থাৎ বিশেষিত) করে (পেন্স (১৯৪৭, ৫))।

বিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা বিশেষ্য বা সর্বনামের দ্বারা নির্দেশিত জীবন্ত প্রাণী বা জীবনহীন বস্তু বর্ণনা বা নির্দেশের জন্যে বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে ব্যবহৃত হয় (কারমে (১৯৪৭, ১৮))।

বিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা কেনো বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত (বর্ণনা বা সীমায়িত) করে (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৩))। বিশেষণ হচ্ছে কোনো সাবস্টেনটিভ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বা বিশেষ্যতুল্য শব্দ)-এর বিশেষক (ফকনার (১৯৫০, ২৯))।

কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত করার জন্যে ব্যবহৃত শব্দই বিশেষণ (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৬))।

ঙ ক্রিয়াবিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ, বা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণকে বর্ণনা বা বিশেষিত করে (পেন্স (১৯৪৭, ৬))।

ক্রিয়াবিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ, বা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত করে (কারমে (১৯৪৭, ২৪))।।

ক্রিয়াবিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ, বা অন্য কোনো

ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত করে (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৪))।

ক্রিয়াবিশেষণ হচ্ছে এমন বিশেষক, যা কোনো সাবস্টেনটিভকে বিশেষিত করে না। ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত ক্রিয়া, বিশেষণ, বা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত করে (ফকনার (১৯৫০, ৩৬))।

ক্রিয়াবিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ, বা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয় (ওয়ারিনার (১৯৫১, ১১))।

চ প্রিপজিশন হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো সাবস্টেনটিভের (অর্থাৎ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম-এর) সাথে প্রয়োগ ক'রে 'প্রিপজিশন ফ্রেজ' নামক একরকম পদ গঠন করা হয় (প্রিপজিশনের সাথে ব্যবহৃত সাবস্টেনটিভকে বলা হয় প্রিপজিশনের কর্ম) পেন্স (১৯৪৭, ৬))।

প্রিপজিশন হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামকে কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ, অথবা অন্য কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে যুক্ত করে, এবং তাদের নির্দেশিত বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে (কারমে (১৯৪৭, ২৭))।

প্রিপজিশন হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের (যাকে প্রিপজিশনের কর্ম বলা হয়) সাথে বাক্যের অন্য কোনো শব্দের সম্পর্ক নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয় (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৪))।

প্রিপজিশন হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের সাথে বাক্যের অন্য কোনো শব্দের সম্পর্ক নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয় (ওয়ারিনার (১৯৫১, ১৩))।

ছ সংযোজক হচ্ছে এমন শব্দ, যা বাক্যের এক উপাদানকে অন্য উপাদানের সাথে যুক্ত করে ((পেন্স (১৯৪৭, ৬))।

সংযোজক হচ্ছে এমন শব্দ, যা একাধিক বাক্যকে বা বাক্যাংশকে যুক্ত করে (কারমে (১৯৪৭, ২৯))।

সংযোজক হচ্ছে এমন শব্দ, যা শব্দ, পদ, বা বাক্যদের যুক্ত করে (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৪))।

সংযোজক হচ্ছে এমন শব্দ, যা শব্দ বা শব্দগুচ্ছদের যুক্ত করে (ওয়ারিনার (১৯৫১, ১৫))।

জ ইন্টারজেকশন হচ্ছে এমন আর্তনাদসূচক শব্দ, যা সাধারণত তীব্র আবেগ জ্ঞাপন করে ((পেন্স (১৯৪৭, ৭))।

ইন্টারজেকশন হচ্ছে ব্যথা, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ বা অন্য কোনো আবেগ প্রকাশের জন্যে চিৎকার (কারমে (১৯৪৭, ৩০))।

ইন্টারজেকশন হচ্ছে এমন শব্দ, যা আর্তনাদের সাথে আকস্মিক অথবা তীব্র অনুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৫))।

ইন্টারজেকশন হচ্ছে এমন শব্দ, যা আবেগ প্রকাশ করে, এবং বাক্যের অন্য কোনো শব্দের সাথে যার কোনো ব্যাকরণিক সম্পর্ক নেই (ওয়ারিনার (১৯৫১, ১৬))।

(৪ক-জ)তে সংগৃহীত সংজ্ঞাগুলো নির্দেশ করে যে বিভিন্ন বাক্যাংশের—শব্দের—সংজ্ঞা সম্পর্কে অভিন্ন মতে পৌঁছে গেছেন ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা;—তাঁদের মধ্যে মতের বৈষম্য অল্প। কেউ কেউ কোনো বিশেষ শব্দের সংজ্ঞা রচনার সময় সামান্য এদিকে-ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রধান রাস্তা থেকে বিচ্যুত হন না। আট শ্রেণীর শব্দের মধ্যে দু-শ্রেণীর শব্দকেই—বিশেষ্য বা ক্রিয়াকে—তাঁরা প্রধান শব্দ-শ্রেণী ব'লে বিবেচনা করেন; আর অন্য শব্দ-শ্রেণীদের আশ্রিত ক'রে রাখেন বিশেষ্য ও ক্রিয়ার। শব্দশ্রেণীকরণে তাঁদের মূল মানদণ্ড অর্থ। এসব আর্থ সংজ্ঞা কাজ চালানোর জন্যে চললেও নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট শব্দ শনাক্ত করতে অসমর্থ। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা সচেতন ছিলেন এ সম্বন্ধে;—কেউ কেউ অসামর্থ্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, কেউ কেউ ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমর্থ হন নি। আর্থ সংজ্ঞার ব্যর্থতা কাটানোর জন্যে রৌপ সংজ্ঞা রচনার চেষ্টা করেছেন কতিপয় প্রথাগত ব্যাকরণবিদ। জিটলিন (১৯১৪) বিশেষ্য শনাক্ত করার জন্যে রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এ ব'লে যে 'ইংরেজিতে বিশেষ্যসমূহ এখনো এমন কিছু রৌপ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যা অন্য কোনো শ্রেণীর শব্দের নেই' (দ্র ইয়েসপারসেন (১৯২৪, ৬০))। ইয়েসপারসেনও তৃপ্ত ছিলেন না শব্দশ্রেণীকরণের প্রথাগত মানদণ্ডে; তিনি 'রূপ, ভূমিকা ও অর্থ'-এর ত্রিমাত্রিক মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রে শব্দশ্রেণীকরণে উৎসাহী ছিলেন (দ্র ইয়েসপারসেন (১৯২৪, ৬০-৬৩))। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথাগত আর্থ মানদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ক'রে রৌপ মানদণ্ডে নির্ণয় করতে চেয়েছেন বিভিন্ন 'পার্টস অফ স্পিচ' (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ৬৫-৮৬, ১১০-১৪১))।

২.৩.০.১ অসমাপিকা ক্রিয়ার ত্রিরূপ : ভারবাল

ইংরেজি ব্যাকরণে দেয়া হয় আরেক রকম শব্দ-শ্রেণীর বিস্তৃত বিবরণ;—এ-শব্দশ্রেণীটি ক্রিয়াজাত ব'লে এর নাম 'ভারবাল' : 'ক্রিয়াজ শব্দ'। ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সাহায্যে গ'ড়ে ওঠা ক্রিয়াজ শব্দ-শ্রেণীকে, বাক্যে তাদের ভূমিকা অনুসারে, ভাগ করা হয় তিন ভাগে; এবং নাম দেওয়া হয় 'জিরান্ড' [ক্রিয়াজ বিশেষ্য]. 'পার্টিসিপল' [ক্রিয়াজ বিশেষণ], ও 'ইনফিনিটিভ' [ক্রিয়াজ বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়াবিশেষণ]। ক্রিয়াজাত এ-শব্দগুচ্ছ সমাপিকা ক্রিয়ার মতো সকর্মক অথবা অকর্মক হ'তে পারে, ব্যবহৃত হ'তে পারে কর্তৃ ও কর্ম—উভয় বাচ্যে, এবং গ্রহণ করতে পারে পরিপূরক ও ক্রিয়াবিশেষণধর্মী বিশেষক। সমাপিকা ক্রিয়ার সাথে এদের বড়ো পার্থক্য হচ্ছে এগুলো কোনো বিবৃতি প্রকাশ করতে পারে না। ইংরেজি

ব্যাকরণবিদেরা জিরান্ড, পার্টিসিপল ও ইনফিনিটিভের রূপ ও প্রয়োগবিধির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে থাকেন; কেননা তাঁদের বিবেচনায় অসমাপিকা ক্রিয়ার এ-তিন রকম ব্যবহার ইংরেজি ভাষার শক্তির পরিচায়ক।

[ক] জিরান্ড : ক্রিয়াজ বিশেষ্য

সে-সব ক্রিয়ারূপকেই জিরান্ড বা ক্রিয়াজ বিশেষ্য বলা হয়, যা বাক্যে সাবস্টেনটিভ বা বিশেষ্যরূপে কাজ করে। যেমন : 'হাইকিং ইজ হেলথফুল' বাক্যে 'হাইকিং' শব্দটি কর্তাবিশেষ্যরূপে বসেছে; বা 'শি স্টাডিড টাইপিং' বাক্যে 'টাইপিং' বসেছে কর্মবিশেষ্যরূপে। এ-বাক্য দুটিতে 'হাইকিং' ও 'টাইপিং' শব্দ দুটি বিশেষ্যের ভূমিকা পালন করেছে, যদিও এগুলো সহজাতভাবে বিশেষ্য নয়;—ক্রিয়াকে পরিণত করা হয়েছে বিশেষ্যে। জিরান্ডের রৌপ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এতে মূল ক্রিয়া (যেমন : 'সিইং'), বা সহকারী ক্রিয়ার (যেমন : 'বিইং সিন') সাথে যুক্ত হয় 'ইং'। জিরান্ড ও পার্টিসিপল আকৃতিগত দিক দিয়ে অভিন্ন; এদের ভিন্নতা নির্দেশ করা হয় ভূমিকা অনুসারে : জিরান্ড ব্যবহৃত হয় বিশেষ্য হিশেবে, আর পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয় বিশেষ্যের বিশেষণরূপে। এজন্যে অনেক বাক্য দ্ব্যর্থও হ'য়ে উঠতে পারে; যেমন 'ফ্লাইং প্লেনস কেন বি ডেনজারাস' বাক্যে 'ফ্লাইং'কে বিশেষণ বা পার্টিসিপলরূপে গ্রহণ করলে পাওয়া যায় এক রকম অর্থ, আর 'ফ্লাইং'কে জিরান্ড বা বিশেষ্যরূপে ধরলে পাওয়া যায় অন্য অর্থ।

[খ] পার্টিসিপল : ক্রিয়াজ বিশেষণ

সে-সব ক্রিয়ারূপকেই বলা হয় পার্টিসিপল বা ক্রিয়াজ বিশেষণ, যা বাক্যের সাবস্টেনটিভ বা বিশেষ্যের বিশেষণরূপে কাজ করে। যেমন : 'বারকিং ডগ্‌জ্‌ নেভার বাইট' বাক্যে 'বারকিং' শব্দটি বসেছে কর্তাবিশেষ্য 'ডগ্‌জ্‌'-এর বিশেষরূপে; তাই এটি পার্টিসিপল। জিরান্ডের সাথে পার্টিসিপলের রৌপ সাদৃশ্য রয়েছে;—অধিকাংশ পার্টিসিপলই, জিরান্ডের মতো, গ'ড়ে ওঠে মূল ক্রিয়া (যেমন : 'বারকিং') বা সহকারী ক্রিয়ার (যেমন : 'হ্যাভিং সিন') সাথে 'ইং' যুক্ত হয়ে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে পার্টিসিপল ও জিরান্ডের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় ভূমিকানুসারে : যার ভূমিকা বিশেষণের, তাই পার্টিসিপল ; আর যার ভূমিকা বিশেষ্যের, তাই জিরান্ড। অন্যান্য ক্রিয়াজ শব্দের মতো পার্টিসিপলের চরিত্রও মিশ্র, অর্থাৎ এর মধ্যে জড়ো হয় দুটি শব্দ-শ্রেণীর—ক্রিয়া ও বিশেষণের—বৈশিষ্ট্য। পার্টিসিপলে মূল ক্রিয়ার ভাব বেশ ভালোভাবেই বিরাজ করে; এবং মূল ক্রিয়া যে-সমস্ত সম্পূরক অথবা ক্রিয়াবিশেষণ গ্রহণ করতে পারে, পার্টিসিপলও সে-সমস্তই গ্রহণ করতে পারে।

[গ] ইনফিনিটিভ : ক্রিয়াজ বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়াবিশেষণ

যে-সব ক্রিয়াজ শব্দ বিশেষ্য, বা বিশেষণ, বা ক্রিয়াবিশেষণরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তাদেরই বলা হয় ইনফিনিটিভ। ক্রিয়াজ শব্দগুলোর মধ্যে একমাত্র ইনফিনিটিভই একাধিক

ভূমিকা পালন করে; কোনো ইনফিনিটিভ ভূমিকা নেয় বিশেষ্যের, কোনোটি বিশেষণের, এবং কোনোটি ক্রিয়াবিশেষণের। অন্যান্য ক্রিয়াজ শব্দের মতো ইনফিনিটিভও দ্বৈত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন : ইনফিনিটিভে ক্রিয়ার ও বিশেষ্য, বা বিশেষণ, বা ক্রিয়াবিশেষণের বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়। ইনফিনিটিভের প্রধান রৌপ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আগে সাধারণত প্রিপজিশন 'টু' বসে। 'টু'কে বলা যেতে পারে ইনফিনিটিভের সংকেতচিহ্ন। যেমন : 'টু ফেইল ইজ ডিজহার্টেনিং', 'হি ইনটেন্ডস টু এক্সপ্লেইন', 'হিজ ইমপালস ওয়াজ টু রেজিস্ট' বাক্য তিনটিতে ইনফিনিটিভ বিশেষ্যরূপে তিন রকম ভূমিকা পালন করছে : প্রথম বাক্যটিতে 'টু ফেইল' বসেছে কর্তারূপে, দ্বিতীয় বাক্যে 'টু এক্সপ্লেইন' বসেছে ক্রিয়ার কর্মরূপে, আর তৃতীয় বাক্যে 'টু রেজিস্ট' বসেছে বিধেয়বিশেষ্যরূপে। 'দি বয় হ্যাজ মানি টু স্পেন্ড' বাক্যে, প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের মতে, 'টু স্পেন্ড' বসেছে কর্মবিশেষ্যের বিশেষণরূপে, এবং 'মেরি প্লেইড টু উইন' বাক্যে 'টু উইন' বসেছে 'প্লেইড' ক্রিয়ার বিশেষণ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষণরূপে। ইনফিনিটিভের বিশেষ্য-ভূমিকা বেশ স্পষ্ট; বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণরূপী ভূমিকা অতো স্পষ্ট নয়।

২.৩.১ বাক্যের উপাদান

বাক্যবর্ণনার জন্যে প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় একরাশ তাত্ত্বিক ধারণা ও পারিভাষিক শব্দ : সাবজেক্ট, প্রেডিকেট, অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট, ফ্রেজ, ক্লজ প্রভৃতি। এ-সমস্ত তাত্ত্বিক ধারণা ও পারিভাষিক শব্দ বাক্যের আধার যতোটা বর্ণনা করে তার চেয়ে বেশি বর্ণনা করে আধেয়কে; কিন্তু ব্যাকরণবিদেরা এমন ভঙ্গিতে বাক্যের ব্যাখ্যাবর্ণনা দেন যাতে মনে হয় তাঁরা বাক্য-শরীরের ব্যবচ্ছেদই করছেন অনুচ্ছেদপরম্পরায়। তাঁদের বর্ণনা অনেক সময় বেশ গভীর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, এবং অনেক সময় মর্মান্তিকভাবে বিশৃঙ্খল : জট পাকিয়ে তোলেন রৌপ ও আর্থ ক্যাটেগরির মধ্যে, ব্যবহার করতে থাকেন পারিভাষিক শব্দের পর পারিভাষিক শব্দ, এবং রচনা করেন এক উদ্ধারহীন গোলকধাঁধা। তাই অনেকের কাছে 'প্রথাগত ব্যাকরণ শেখা'র অর্থ দাঁড়ায় সত্তরটির মতো পারিভাষিক শব্দের উদ্দীপনে সাড়া দেয়ার শক্তি অর্জন এবং ওই সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার ক'রে অন্যকে উদ্দীপ্ত করার কৌশল আয়ত্ত করা (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ৫৫))। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাশিকে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ও অসম্পর্ক অনুসারে বিভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত করা যায়;—এ-গুচ্ছগুলো রৌপ, অর্থাৎ এগুলো নির্দেশ করে বাক্যের শরীরের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ। প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যের এ-অঙ্গগুলোকে মোটামুটিভাবে বলা হয় 'ফ্রেজ' বা পদ। প্রতিটি পদ পালন ক'রে থাকে কোনো-না-কোনো ভূমিকা : কোনোটির ভূমিকা কর্তার, কোনোটির কর্মের বা অন্য কিছুর। কিন্তু প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে পদের রৌপ ও আর্থ ভূমিকার মধ্যে জট পাকানো হয় অবলীলায়। ব্যাকরণবিদেরা আর্থ ধারণার সাহায্যেই ব্যাখ্যা করতে চান বাক্য, আর ওই আর্থ ধারণাসমূহকেই বাস্তবায়িত দেখেন বিভিন্ন

শব্দগুচ্ছে। তাই ইংরেজি বাক্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে বাক্যের আধার-আধেয় সম্পর্কে একরাশ মন্তব্যের সমষ্টি, যা ভাষাভাষীর বোধিকে কখনো তীক্ষ্ণ কখনো ভোঁতা করে।

সরল বাক্যের বর্ণনা দিয়ে সাধারণত শুরু হয় ইংরেজি বাক্য ব্যাখ্যা ও বর্ণনা (দ্র পেন্স (১৯৫২, ৭-১১)), ফকনার (১৯৫০, ২১-২৫))। বর্ণনার শুরুতে বাক্যের মৌল উপাদান হিশেবে নির্দেশ করা হয় 'সাবজেক্ট' [উদ্দেশ্য : কর্তা] ও 'প্রেডিকেট' [বিধেয়]-কে। ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন বাক্যের মৌল উপাদান হিশেবে। উদ্দেশ্য, তাঁদের বর্ণনা-অনুসারে, গ'ড়ে ওঠে কোনো বিশেষ্য বা বিশেষ্যধর্মী ভাষাবস্তুতে। বিধেয় গ'ড়ে উঠতে পারে শুধুই ক্রিয়ায়। বিধেয় যখন শুধুই একটি ক্রিয়ায় গঠিত হয়, তখন অনেক ব্যাকরণবিদ তার নাম দেন 'সরল বিধেয়'। তবে বিধেয় গ'ড়ে উঠতে পারে ক্রিয়া ও অন্য কোনো ভাষাবস্তুর সমবায়ে। এ-অন্যবস্তুর নাম প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা দিয়ে থাকেন 'কমপ্লিমেন্ট' [সম্পূরক], অর্থাৎ যা ক্রিয়াকে সম্পূর্ণতা দেয়। সরল বাক্যের উপাদানরূপে আরো একটি বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, সেটির নাম 'মডিফায়ার' [বিশেষক]। বাক্যের এ-উপাদানগুলোর কয়েকটি অত্যাবশ্যক, কয়েকটি ঐচ্ছিক। প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের বর্ণনানুসারে বাক্যের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয়, অর্থাৎ যে-কোনো বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকতেই হবে। তবে সব বাক্যে 'পরিপূর্ণ বিধেয়' থাকার দরকার নেই, বিধেয়রূপে একটি ক্রিয়া থাকলেই চলে; ক্রিয়ার সাথে কোনো সম্পূরক নাও থাকতে পারে। তাই বাক্যের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে কর্তা ও ক্রিয়া; অন্যান্য উপাদান—সম্পূরক, বিশেষক প্রভৃতি—ঐচ্ছিক। কিছু কিছু ক্রিয়া আছে, যেগুলোর সম্পূরক দরকার হয়; এবং বিশেষক বসতে পারে কর্তা, ক্রিয়া, সম্পূরক প্রভৃতিকে বিশেষিত ক'রে।

কখনো কখনো কিছুটা ভিন্ন ভঙ্গিতেও বাক্যের উপাদানগুলোর বিবরণ দেয়া হয় (দ্র পেন্স (১৯৫২, ১০))। এ-ভিন্ন বর্ণনা বাক্যের ভিন্ন উপাদান নির্দেশ করে না; একই বিষয়কে কিছুটা ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে মাত্র। এ-বর্ণনায় বাক্যকে ভাগ করা হয় দুটি মৌল উপাদানে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে, এবং বলা হয় যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়েরই বিশেষক থাকতে পারে। এ-বর্ণনার সময় প্রয়োজন পড়ে চারটি পারিভাষিক শব্দের : 'অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য' ও 'অত্যাবশ্যক বিধেয়', এবং 'পূর্ণ উদ্দেশ্য' ও 'পূর্ণ বিধেয়'। কোনোরকম বিশেষকহীন উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করা হয় অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্যরূপে, আর অত্যাবশ্যক বিধেয়রূপে চিহ্নিত করা হয় সে-বিধেয়কে, যাতে ক্রিয়া এবং সম্পূরক থাকে, কিন্তু ক্রিয়া ও সম্পূরকের কোনো বিশেষক থাকে না। তবে বাক্য সব সময় এমন নির্মেদ অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে গ'ড়ে ওঠে না, দরকার হয় বিশেষকরূপী মেদ বা সম্প্রসারক। সে-উদ্দেশ্যকেই বলা হয় পূর্ণ উদ্দেশ্য, যাতে থাকে অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে দরকারী সমস্ত বিশেষক, এবং পূর্ণ বিধেয়রূপে নির্দেশ করা হয় সে-বিধেয়কে, যাতে উপস্থিত থাকে অত্যাবশ্যক বিধেয়, এবং ক্রিয়া ও সম্পূরকের

জন্যে দরকারী সমস্ত বিশেষক। পারিভাষিক শব্দের অদলবদল অবশ্য ঘটে পুস্তকেপুস্তকে; এখানে যাদের বলা হলো অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য বা বিধেয়, অন্য কোথাও তাদের বলা হ'তে পারে 'সরল উদ্দেশ্য বা বিধেয়', এবং যাদের বলা হলো পূর্ণ উদ্দেশ্য বা বিধেয়, অন্যত্র তাদের নাম দেয়া হ'তে পারে 'জটিল উদ্দেশ্য বা বিধেয়'।

সরল বাক্যের উপাদানের প্রাথমিক পরিচয় দেয়ার সময় যে-তাত্ত্বিক ধারণাটির প্রসঙ্গ ওঠে না, কিন্তু বাক্যবর্ণনা এগোতে থাকলে যেটি এক সময় উপস্থিত হয়, সেটি 'ফ্রেজ' [পদ]। একটি তাত্ত্বিক ধারণা শুধুই ব্যবহৃত হয় যৌগিক ও মিশ্র বাক্য বর্ণনার সময়, সেটি 'ক্লজ' [উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য]। এ-ধারণা দুটিকে প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা পরস্পরসম্পর্কিত ধারণা হিশেবে বিবেচনা করেন; এবং এদের সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন বাক্যের সাথে তুলনা ক'রে। ফ্রেজ এবং ক্লজ উভয়ই শব্দগুচ্ছ; কিন্তু দুটির ভূমিকা দু-রকম : আচরণে ফ্রেজ শব্দের সমতুল্য, আর ক্লজ বাক্যের সমতুল্য।

২.৩.১.১ সাবজেক্ট : উদ্দেশ্য (কর্তা)

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদের কাছে 'সাবজেক্ট', যা বাক্যের অন্যতম প্রধান উপাদান, একটি ধ্রুব ধারণা। এমন কোনো প্রথাগত ব্যাকরণবিদ পাওয়া যাবে না, যিনি বাক্যবর্ণনার সময় পরিহার করেছেন ধারণাটিকে, এবং গ্রহণ করেছেন অন্য কোনো ধারণা। সাবজেক্ট বাক্যের একটি *বাক্যিক ক্যাটেগরি*, কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে এটিকে আর্থ বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্দেশ করা হয়; এবং সৃষ্টি করা হয় অপার জটিলতা। সাবজেক্ট শব্দটি দ্ব্যর্থবোধকও বটে;—সাবজেক্ট বলার সাথে সাথে বিষয়বস্তুর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে আরো অনেক কিছুর কথা; শুধু মনে পড়ে না যে সাবজেক্ট একটি বাক্যিক ক্যাটেগরি। সাবজেক্ট শব্দের সাথে জড়িত অস্পষ্টতা সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় বাঙলায় : বাঙলায় সাবজেক্ট ধারণার জন্যে আছে দুটি শব্দ—উদ্দেশ্য ও কর্তা। 'উদ্দেশ্য' শব্দটি ব্যাকরণবিদেরা ব্যবহার করেন তখন, যখন তাঁরা বাক্যের দুটি প্রধান উপাদান শনাক্ত করতে চান;—বলেন বাক্য উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে গঠিত। কিন্তু অন্য সময় 'উদ্দেশ্য'-এর বদলে ব্যবহার করেন 'কর্তা' শব্দটি, যদিও তাঁদের মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই কেন তাঁরা একই জিনিশকে একাধিক নামে শনাক্ত করেন। ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের কাছেও সাবজেক্ট ধারণাটি অস্বচ্ছ, তাঁরা এটিকে কাজ চালানোর হাতিয়ার হিশেবেই ব্যবহার ক'রে থাকেন। যুক্তিশাস্ত্রী ও মনস্তত্ত্ববিদেরা সাবজেক্ট (এবং প্রেডিকেট) ধারণার এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দেন যে সব কিছুই জটিল হয়ে ওঠে, লোপ পায় উদ্দেশ্য-বিধেয়ের পার্থক্য। তবে ব্যাকরণবিদেরা প্রধানত দুটি রীতিতে নির্ণয় করেন সাবজেক্ট (ও প্রেডিকেট)। একটি রীতিতে তাঁরা সাবজেক্টকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর পরিচিত বস্তু বা বিষয়রূপে গ্রহণ করেন, আর বিধেয়কে গ্রহণ করেন অজানা নতুন বিষয়রূপে, যা জানা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু অজানা নতুন সংবাদ পরিবেশ করে। একজন দর্শন-মনস্তত্ত্বের অভিধানপ্রণেতা এমন সংজ্ঞা দিয়েছেন (দ্র ইয়েসপারসেন

(১৯২৪, ১৪৫)) : 'বক্তা সাবজেক্টে তার জানা সে-সবই পরিবেশন করে, যা শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য, আর প্রেডিকেটে সে জড়ো করে এমন সব বিষয় যাতে গ'ড়ে ওঠে বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত নতুন সংবাদ।' অর্থাৎ উদ্দেশ্য পেশ করে জানা সংবাদ, আর বিধেয় পরিবেশন করে অজানা সংবাদ। দ্বিতীয় যে-রীতিতে উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা দেয়া হয়, তাতে জানা-অজানা সংবাদের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে জোর দেয়া হয় কোনো বিষয় ও সে-বিষয় সম্পর্কে মন্তব্যের ওপর। তাকেই নির্দেশ করা হয় উদ্দেশ্য বা কর্তারূপে, যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, আর বিধেয়রূপে নির্দেশ করা হয় সে-উক্তিটুকুকে যা উক্ত হয় উদ্দেশ্য বা কর্তা সম্পর্কে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা উদ্দেশ্য-বিধেয় ধারণা বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন 'বিষয়-মন্তব্য' [টপিক-কমেন্ট] ধারণা। প্রথাগত ব্যাকরণের উদ্দেশ্য-বিধেয়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞায় যাকে উদ্দেশ্য বলা হয়, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে তাই 'বিষয়', আর প্রথাগত ব্যাকরণের বিধেয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের 'মন্তব্য'।

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে 'সাবজেক্ট'-এর কিছু সংজ্ঞা সংগ্রহ করা হলো :

(৫) বাক্যের উদ্দেশ্য (কর্তা) হচ্ছে সে-ভাবজ্ঞাপক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৩))।

সাধারণত মনে করা হয় যে প্রতিটি বাক্যে দুটি অত্যাবশ্যক উপাদান—উদ্দেশ্য (কর্তা) ও বিধেয় থাকে : 'ফ্রেড বিজয়ী হলো'। সেটিই বাক্যের উদ্দেশ্য (কর্তা), যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়;—যেমন : এ-বাক্যে 'ফ্রেড' (কারমে (১৯৪৭, ৯৮))।

প্রত্যেক বাক্যে এমন কিছু থাকতে হবে, যার সম্বন্ধে কিছু বলা হবে; তাকেই আমরা উদ্দেশ্য (কর্তা) বলবো (পেন্স (১৯৪৭, ৮))।

স্বাভাবিক বাক্যে দুটি উপাদান—উদ্দেশ্য (কর্তা) ও বিধেয়—থাকতে হবে। তা-ই সাবজেক্ট, যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয় (কিয়েরজেক (১৯৪৮, ৩৭))।

বাক্যের উদ্দেশ্য (কর্তা) হচ্ছে সে-শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় বা বিবৃত করা হয় (ব্রাউন (১৯৪৭; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৭৩))।

প্রত্যেক বাক্যের থাকে একটি ক'রে উদ্দেশ্য (কর্তা)—কোনো শব্দ (বা শব্দগুচ্ছ), যা এমন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নির্দেশ করে, যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয় (ফকনার (১৯৫০, ২))।

উদ্দেশ্য (কর্তা) হচ্ছে বাক্যের সে-অংশ, যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয় (ওয়ারিনার (১৯৫১, ২২-২৩))।

(৫)-এর সংজ্ঞাগুলো, ভাষাগত সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও, একই বক্তব্য প্রকাশ করে যে তা-ই বাক্যের উদ্দেশ্য (কর্তা), যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য (কর্তা) একটি আর্থ

ধারণা। কিন্তু বক্তব্যের ভাষারূপ দিতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যাকরণবিদ সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন রকম গোলযোগ। যেমন : হাউজ ও হারম্যানের (১৯৩১) সংজ্ঞাটি, যা বাঙলা অনুবাদে হয়ে উঠেছে দ্ব্যর্থবোধক, কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে উদ্দেশ্য (কর্তা) রূপে নির্দেশ করে না, বরং নির্দেশ করে বিশেষ শব্দ(গুচ্ছ) দ্বারা নির্দেশিত কোনো কিছুকে বা ভাবকে; আর ব্রাউনের (১৯৪৭) সংজ্ঞাটি উদ্দেশ্য (কর্তা) রূপে নির্দেশ করে শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে;—এটিতে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা নির্দেশিত কোনো কিছুর কথা উল্লেখ করা হয় নি। ওয়ারিনারও (১৯৫১) বাক্যের এক বিশেষ অংশকে উদ্দেশ্য (কর্তা) রূপে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এসব বিচলনস্খলন সত্ত্বেও বোঝা যায় ওপরের সংজ্ঞা রচয়িতারা বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের রূপকে উদ্দেশ্য (কর্তা) ব'লে ভাবেন না, তাঁরা ওই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা নির্দেশিত সে-ভাবকেই উদ্দেশ্য (কর্তা) ব'লে মনে করেন, যার সম্পর্কে বাক্যের দ্বিতীয়াংশে কোনো মন্তব্য করা হয়। কিন্তু পুস্তকে পুস্তকে মুদ্রিত ও অসংখ্য ব্যাকরণপুস্তকপ্রণেতা কর্তৃক ধ্রুব ব'লে বিবেচিত উদ্দেশ্যের (কর্তার) উল্লিখিত সংজ্ঞা কি ঠিক মতো নির্দেশ করতে পারে উদ্দেশ্য বা কর্তা? অনেক প্রথাগত, এবং সমস্ত সাংগঠনিক, ব্যাকরণবিদ দেখিয়েছেন যে ওপরের সংজ্ঞা কখনোকখনো সার্থক হ'লেও অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ। কয়েকটি উদাহরণ বিচার করা যাক :

(৬) ক হাসান আসছে।

খ হাসান হাসিনাকে একটি আংটি দিয়েছে।

গ কে হাসিনাকে দেখেছে?

(৬ক) বাক্যের উদ্দেশ্য বা কর্তা (৫)-এর সংজ্ঞাগুলোর সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব; কেননা এ-বাক্যে 'হাসান'ই সে-শব্দ, যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু (৬খ, গ) বাক্যের কর্তা (৫)-এর সংজ্ঞার সাহায্যে নির্ণয় অসম্ভব : (৬খ) বাক্যটি শুনে তো মনে হয় 'হাসান', 'হাসিনা', 'আংটি' প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু বলা হচ্ছে, যদিও প্রথাগত ব্যাকরণ বেশ চাপ দেয় একথা স্বীকার করতে যে বাক্যটিতে 'হাসান' সম্পর্কেই কোনো কিছু বলা হচ্ছে। যেহেতু (৬খ)তে 'হাসান', 'হাসিনা', 'আংটি' প্রত্যেকের সম্পর্কেই কোনো কিছু বলা হচ্ছে, তাই সংজ্ঞানুসারে মেনে নিতে হয় যে এরা প্রত্যেকেই বাক্যের কর্তা। কিন্তু এক বাক্যে কতোগুলো কর্তা থাকে? আর প্রথাগত ব্যাকরণ 'হাসিনা', 'আংটি'কে বিস্ময়কর রহস্যময় কোনো কারণে কর্তা ব'লে স্বীকার করতে রাজি হবে না। (৬গ) উপস্থিত করে আরো চমৎকার ব্যাপার : এ-বাক্যে কার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হচ্ছে? 'কে' সম্পর্কে? বাক্যটি প'ড়ে মনে হয় কোনো কিছু বলা হচ্ছে 'হাসিনা' সম্পর্কে, 'কে' সম্পর্কে নয়; কিন্তু আমরা তো জানি বাক্যটির কর্তা 'কে', 'হাসিনা' নয়। অর্থাৎ (৫)-এর আর্থ সংজ্ঞার সাহায্যে বাক্যের কর্তা নির্ণয় সম্ভব নয়।

ইংরেজি ব্যাকরণে, অনেক সময়, কর্তাকে দুটি ভাগে—'যৌক্তিক কর্তা' ও 'বাক্যিক কর্তা'—ভাগ করা হয়। যৌক্তিক কর্তা ধারণাটি বাঙলা 'কর্তা' শব্দে ধাতুগত অর্থেই বিরাজ

করে। অনেকের মনে কর্তা ভাবনার সাথে সক্রিয়তার ভাবনা জড়িত হয়ে থাকে, তাই যে কোনো কিছু করে—সক্রিয়ভাবে করে—তাকেই কর্তা বিবেচনা করতে ইচ্ছে হয়। যৌক্তিক কর্তাও তাই; বাক্যে তাই যৌক্তিক কর্তা, যে কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করে; আর বাক্যিক কর্তা হচ্ছে তাই, যে বা যা কোনো ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে না, কিন্তু তার সাথে বাক্যের ক্রিয়ারূপ নানা রকম সঙ্গতিসূত্রে আবদ্ধ থাকে। ইংরেজি কর্তৃ-ও কর্ম-বাচ্যের বাক্য যৌক্তিক ও বাক্যিক কর্তার উদাহরণে বারবার ব্যবহৃত হয়। (৭)-এর উদাহরণ বিবেচ্য :

(৭) ক হাসান হাসিনাকে খুন করেছে।

খ হাসিনা হাসান কর্তৃক খুন হয়েছে।

গ হাসান বিশ্রাম করেছে।

(৭ক, খ)তে প্রকাশ পাচ্ছে একই বক্তব্য, যদিও সাংগঠনিকভাবে (৭ক, খ) ভিন্ন : উভয় বাক্যেই 'হাসান' ক্রিয়া নিষ্পন্নকারী, আর 'হাসিনা' ফলভোগকারী। যুক্তিগতভাবে তাই উভয় বাক্যেই হাসান কর্তা বা যৌক্তিক কর্তা; কিন্তু বাক্যিকভাবে 'হাসান' (৭ক)র, ও 'হাসিনা' (৭খ)র কর্তা। সেটিই বাক্যিক কর্তা, যার সাথে ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি রক্ষা করে। একই শব্দ কখনোকখনো যুগপৎ যৌক্তিক ও বাক্যিক কর্তা হ'তে পারে; যেমন (৭ক)তে 'হাসান' ক্রিয়া নিষ্পন্নকারী এবং তারই সাথে ক্রিয়ারূপ রক্ষা করে সঙ্গতি। (৭গ)তে দেখা যায় যে বাক্যটিতে কোনো যৌক্তিক কর্তা নেই। 'বিশ্রাম করা' জ্ঞাপন করে চরম নিষ্ক্রিয়তা, তাই (৭গ)তে 'হাসান' 'ক্রিয়া করছে' না; এবং সে কর্তা নয়, যদি না বাঙলায় বিশ্রাম যাপনকেও শ্রম ব'লে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু 'হাসান' (৭গ)তে বাক্যিক কর্তা, যেহেতু বাক্যটির ক্রিয়ারূপ তারই সাথে সঙ্গতি রক্ষা করছে। কর্তাঘটিত এসব জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটিই উপায়; সব বাদ দিয়ে শুধু বাক্যিক কর্তা ধারণাটিকে গ্রহণ করা। কর্তা তাই, যার সাথে বাক্যের ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি রক্ষা করে; কর্তা সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে কর্তাঘটিত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরপরই প্রশ্ন উঠবে : বাক্যের কোন অংশটি বা পদটির সাথে ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি রক্ষা করবে?

২.৩.১.২ প্রেডিকেট : বিধেয়

বিধেয়, উদ্দেশ্য বা কর্তার মতো, একটি ধ্রুব ধারণা ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের কাছে। বিধেয়কে নির্দেশ করা হয় বাক্যের দ্বিতীয় মৌল উপাদানরূপে। অনেকের কাছে বাক্যের ক্রিয়াই বিধেয়; কারো কারো কাছে বাক্যের কর্তা ও কর্তার বিশেষক ছাড়া বাক্যের আর সমস্তই বিধেয়। বিধেয় ধারণাটি আর্থ। বিধেয়তাত্ত্বিকেরা প্রধানত দু-রকম আর্থ মানদণ্ড ব্যবহার করেন বিধেয় শনাক্তির জন্যে : তাঁদের একরকম বিবেচনায় কর্তা নামক জানা বস্তুর সাথে বিধেয় যোগ করে অজানা সংবাদ; এবং আরেক রকম বিবেচনায় কর্তা নামক অনির্দিষ্ট-নির্বিশেষ বস্তুকে যা নির্দিষ্ট-বিশেষ ক'রে তোলে, তা-ই বিধেয়। বিধেয়ের এমন আর্থ দার্শনিক সংজ্ঞা বিধেয় ব্যাপারটিকে যতোটা

স্পষ্ট করে তার চেয়ে বেশি করে অস্পষ্ট। ব্যাকরণবিদেরা মোটামুটিভাবে বাক্যের সে-অংশটুকুকেই মেনে নেন বিধেয় ব'লে, যা কর্তা সম্পর্কে কোনো উক্তি-মন্তব্য-বক্তব্য পেশ করে। তাই প্রতিটি বাক্যে দেখা যায় বিধেয় বহন করে বাক্যের অর্থের বড়ো অংশ, এবং সাধারণত আকারের দিক দিয়ে কর্তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ হয় বিধেয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা বেশ জটিলভাবে নির্দেশ করতে চান বিধেয়। যেমন : মনস্তত্ত্ববিদ স্টাউট বিধেয়র দিয়েছেন নিম্নব্যাখ্যা (দ্র ইয়েসপারসেন (১৯২৪, ১৪৬)) : 'আগে যা নির্বিশেষ-অনির্দিষ্ট ছিলো, তাকে বিশেষ-নির্দিষ্ট করাই হচ্ছে বিধেয়। কর্তা হচ্ছে সাধারণ বিষয়বস্তুর পূর্ববর্তী-বিশেষীকরণ, যার সাথে সংযুক্ত হয় নতুন বিশেষীকরণ। কর্তা হচ্ছে প্রাকচিন্তার ফল, যা আরো অগ্রসরণের ভিত্তি ও সূচনাবিন্দু সৃষ্টি করে। এ আরো অগ্রসরণই বিধেয়। হাঁটার সময় প্রতিটি পদক্ষেপের যা ভূমিকা, চিন্তাপ্রক্রিয়ায় প্রতিটি বাক্যের ভূমিকা তাই। হাঁটার সময় যে-পায়ের ওপর শরীরের ভর পড়ে, সেটি কর্তার মতো। এগোনোর জন্যে যে-পা সামনের দিকে চালনা করা হয়, সেটি বিধেয়ের সমতুল্য। ... সমস্ত প্রশ্নোত্তরই বিধেয়, এবং সমস্ত বিধেয়কেই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তররূপে গণ্য করা যায়। ... বলা যায় কর্তা হচ্ছে প্রশ্নপ্রণয়ন, বিধেয় তার উত্তর।' প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণপুস্তকে পাওয়া যায় বিধেয়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা :

(৮) বিধেয় হচ্ছে সে-ভাবজ্ঞাপক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, যা উক্ত হয় বাক্য সম্বন্ধে (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩৪, ১৩-১৪))।

বিধেয় হচ্ছে তা, যা বলা হয় বাক্য সম্বন্ধে (কারমে (১৯৪৭, ৯৮))।

যদি কোনো শব্দগুচ্ছকে বাক্যরূপে গ্রহণ করতে হয়, তবে তাতে থাকতে হবে কর্তা সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি। এমন বিবৃতিকেই বলা হয় বিধেয় ((পেন্স (১৯৪৭, ৮))।

বিধেয় হচ্ছে তাই, যা কর্তা সম্বন্ধে কোনো কিছু বলে বা বিবৃত করে (কিয়েরজেক (১৯৪৭, ৩৭))।

বিধেয় হচ্ছে তাই, যা উক্ত হয় কর্তা সম্বন্ধে (ফকনার (১৯৫০, ৬০))।

বিধেয় হচ্ছে বাক্যের সে-অংশ, যা কর্তা সম্বন্ধে কোনো কিছু বলে (ওয়ারিনার (১৯৫১, ২৩))।

(৮)-এর সংজ্ঞাগুলো, প্রায় অভিন্ন ভাষায়, জ্ঞাপন করে যে বিধেয় হচ্ছে কর্তা সম্পর্কে কোনো উক্তি বা মন্তব্য; অর্থাৎ বিধেয় একরকম আর্থ ধারণা। কিন্তু এ-সংজ্ঞা অব্যর্থ নয়। তাই কোনো বাক্যের কোন অংশটি যথার্থ বিধেয়, সে-সম্পর্কে বিতর্ক হয়েছে অনেক। ব্যাকরণবিদেরা মোটামুটিভাবে একরকম বোধির সাহায্যে আগে কর্তা শনাক্ত ক'রে বাক্যের অপরাংশকে ধ'রে নেন কর্তা সম্পর্কে মন্তব্যরূপে, এবং তাকেই গণ্য করেন বিধেয়রূপে। তবে বিধেয় বিষয়ে তাঁরা বেশি সময় ব্যয় না ক'রে বিধেয়কে বিশ্লিষ্ট করেন বিভিন্ন অংশে, এবং নির্দেশ করেন ক্রিয়া, কর্ম, সম্পূরক প্রভৃতি।

বিধেয়কে ব্যাকরণবিদেরা সাধারণ দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। যদি কোনো বিধেয় গ'ড়ে ওঠে শুধু একটি ক্রিয়ায়, তবে ওই ক্রিয়াটিকে নির্দেশ করা হয় সরল বিধেয় ব'লে। ক্রিয়াই অবশ্য অনেকের কাছে বিধেয়। সব বাক্য শুধু কর্তা ও ক্রিয়ায় গ'ড়ে ওঠে না, বিধেয়কে 'সম্পূর্ণ করার জন্যে' ক্রিয়ার সাথে অন্য ভাষাবস্তুরও দরকার পড়ে। ক্রিয়া ও অন্য ভাষাবস্তুর সমবায়ে গঠিত বিধেয়কে বলা হয় পূর্ণ বিধেয়। বিধেয়র ক্রিয়া অংশ বাদে যা থাকে, তাকে নির্দেশ করা হয় সম্পূরক নামে (দ্র §২.৩.১.৩)। (৯)-এর উদাহরণ দ্রষ্টব্য :

(৯) ক একটি ছেলে আসছে।

খ একটি ছেলে বই পড়ছে।

(৯ক)তে 'আসছে' সরল বিধেয়, কেননা এখানে আছে শুধু একটি ক্রিয়া; আর (৯খ)তে 'বই পড়ছে' পূর্ণ বিধেয়, যেহেতু এ-বিধেয়পদটি গ'ড়ে উঠেছে ক্রিয়া ও বিশেষ্যে। পূর্ণ বিধেয় অবশ্য (৯খ)র বিধেয়ের থেকে আরো অনেক ব্যাপক হ'তে পারে; তাতে ব্যবহৃত হ'তে পারে একাধিক সম্পূরক, বসতে পারে সম্পূরকের বিশেষক; এবং বিধেয়টি বেশ জটিল হয়ে উঠতে পারে। সব ব্যাকরণবিদই যে 'সরল বিধেয়', 'পূর্ণ বিধেয়' প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করেন তা নয়; বিধেয়সংগঠন বর্ণনার সময়, এবং অন্য সময়, স্বরচিত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখান বহু ব্যাকরণবিদ।

২.৩.১.৩ সম্পূরক

'কমপ্লিমেন্ট'—সম্পূরক—শব্দের অর্থ 'যা সম্পূর্ণ করে'। প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা মনে করেন যে অনেক ক্রিয়া আছে, যাদের অর্থকে সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্যে কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দরকার, আর ওই শব্দ বা শব্দগুচ্ছকেই বলা হয় সম্পূরক। সম্পূরক বাক্যের বিধেয় খণ্ডের অপরিহার্য অংশ। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা সাধারণত বিধেয় খণ্ডের অন্তর্গত ক্রিয়াটিকে বাদ দিয়ে যা থাকে, তাকেই শনাক্ত করেন সম্পূরক ব'লে। সম্পূরক একটি আর্থ ধারণা। রূপগতভাবে সম্পূরক হচ্ছে কোনো বিশেষ্যপদ অথবা বিশেষণপদ, কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে তাদের রূপ অস্বীকার ক'রে ভূমিকাকেই বড়ো ক'রে দেখা হয়; যেমন : 'কর্ম-সম্পূরক', 'কর্তা-সম্পূরক' বা 'বিধেয়বিশেষ্য' ও 'বিশেষণীয় সম্পূরক' বা 'বিধেয়-বিশেষণ'। কর্ম-সম্পূরক কর্ম নামেই পরিচিত। বিধেয়বিশেষ্য হিশেবে নির্দেশ করা হয় বিধেয়-অন্তর্গত সে-বিশেষ্যপদটিকে, যেটি বাক্যের কর্তার কোনো-না-কোনো রকম পরিচিতি দেয়; আর বিধেয়বিশেষণ হিশেবে নির্দেশ করা হয় সে-বিশেষণটিকে, যেটি বিশেষিত করে বাক্যের কর্তাকে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১০) ক মেয়েটি ছাত্রী।

খ মেয়েটি রূপসী।

(১০ক) বাক্যে 'ছাত্রী' বিশেষ্যপদটি বাক্যের কর্তা 'মেয়েটি'র প্রতি নির্দেশ করছে, ও কর্তার পরিচিতি দিচ্ছে;—তাই এটি কর্তা-সম্পূরক বা বিধেয়বিশেষ্য। (১০খ) বাক্যে 'রূপসী' বিশেষণটিও নির্দেশ করছে বাক্যের কর্তার প্রতি, ও বিশেষিত করছে কর্তাকে;—তাই এটি বিধেয়বিশেষণ। ইংরেজি ব্যাকরণে অনেক সময় উল্লেখ করা হয় যে বিধেয়বিশেষ্য ও বিধেয়বিশেষণ ব্যবহৃত হয় 'টু বি, বিকাম, সিম, গ্রো, অ্যাপিয়ার, লুক, ফিল' ইত্যাদি অস্তিত্বসূচক ক্রিয়ার সাথে।

২.৩.১.৪ কর্ম : মুখ্য ও গৌণ

প্রথাগত ব্যাকরণে কর্তার মতোই ধ্রুব ও সমস্যাপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণা কর্ম। কর্তা যেমন একটি আর্থ ও 'ভূমিকাগত ক্যাটেগরি', কর্মও তেমন। প্রথাগত ব্যাকরণে কর্তা-কর্ম ধারণা দুটি প্রায় যুগলবন্দী থাকে; একটির কথা উঠলে অন্যটিও উপস্থিত হয়, এবং এদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময় দুটিকে বেশ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ক'রে দেয়া হয়। ব্যাকরণবিদেরা কর্ম-ধারণাটিকে সাধারণত প্রথম উপস্থিত করেন সম্পূরক আলোচনার সময়; এবং জানান যে কর্ম একরকম সম্পূরক। কিন্তু পরে কর্মকে সম্পূরক অভিধা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। তখন থেকে কর্মকে বলা হয় শুধুই কর্ম, তাকে আর সম্পূরক বলা হয় না। এমন আচরণ প্রমাণ দেয় তাঁদের আন্তর অস্বস্তির, তাঁরা যেনো কর্মকে সম্পূরক হিশেবে ঠিক মেনে নিতে পারেন না। প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে কর্তা ও কর্মকে জড়িয়ে দেয়া হয় দু-রকম ভূমিকার সাথে : কর্তাকে দেয়া হয় ক্রিয়ানিষ্পন্নকারীর ভূমিকা, আর কর্মকে দেয়া হয় ক্রিয়াভোগীর ভূমিকা। কর্ম হিশেবে নির্দেশ করা হয় বাক্যের বিধেয়-অংশভুক্ত সে-বিশেষ্যপদকে, যা প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের ধারণায়, ভোগ করে ক্রিয়ার সমস্ত আক্রমণ। অর্থাৎ ক্রিয়া তার কাজ চালায় কর্মের ওপর। কিন্তু কর্মের এমন ধারণা সব সময়, অধিকাংশ সময়, কর্ম শনাক্তিতে কোনো সাহায্য করে না। নিচের উদাহরণ বিবেচ্য :

(১১) ক হাসান হাসিনাকে মেরেছে।

খ হাসান হাসিনাকে ভয় পায়।

প্রথাগত ব্যাকরণে ওপরের উভয় বাক্যে 'হাসিনা'কে নির্দেশ করা হবে কর্ম ব'লে, কিন্তু যদি ক্রিয়ার ফলভোগকারীকে মেনে নিই কর্ম ব'লে, তবে (১১ক)র 'হাসিনা' কর্ম, কিন্তু (১১খ)র 'হাসিনা' কর্ম নয়। (১১খ)তে 'হাসিনা' ক্রিয়ার কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি-আক্রমণ ভোগ করছে না; যদি কেউ ক'রে থাকে, তবে সে (১১খ)র 'হাসান'। এ-বাক্যে ভয় দেখায় 'হাসিনা', তাই সংজ্ঞানুসারে সে-ই কর্তা, আর বাস্তব-অবাস্তব কারণে ভয় পায় 'হাসান', তাই সংজ্ঞানুসারে সে-ই কর্ম। কিন্তু এমন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের কাছে; তাঁরা সংজ্ঞার বিরোধিতা ক'রে (১১খ)তে 'হাসান' ও 'হাসিনা'কে যথাক্রমে কর্তা ও কর্মরূপে নির্দেশ করবেন। এর অর্থ হচ্ছে ক্রিয়ানিষ্পন্নকারী ও ক্রিয়াভোগকারী হিশেবে কর্তা ও কর্মকে গ্রহণ করা যায় না। তাই কর্ম শনাক্ত করতে হবে বাক্যিক মানদণ্ডে, আর্থ মানদণ্ডে নয়।

এখনকার অধিকাংশ ইংরেজি ব্যাকরণপ্রণেতা, ওপরে আলোচিত সমস্যার কথা মনে রেখেই সম্ভবত, অবলম্বন করেন এক প্রতারক কৌশল : তাঁরা কর্ম ধারণাটিকে ব্যবহার করেন বাক্যের অঙ্গসংস্থান বর্ণনার জন্যে, কিন্তু কোথাও কর্মের সংজ্ঞা দেন না (দ্র হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১), কিয়েরজেক (১৯৪৭), পেন্স (১৯৪৭), ফকনার (১৯৫০), কুইর্ক ও গ্রিনবাম (১৯৭৩))। যেমন : কুইর্ক ও গ্রিনবাম (১৯৭৩, ১২) 'সে মেয়েটিকে একটি আপেল দিয়েছিলো' বাক্যের দুটি কর্ম—মুখ্য ('আপেল') ও গৌণ ('মেয়েটি')—শনাক্ত করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মের অবস্থান নির্দেশ করেন, এগুলো যে বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে, তাও জানান; কিন্তু ব্যাখ্যা করেন না কেনো এগুলো কর্ম, এবং মুখ্য ও গৌণ কর্ম। কর্মঘটিত সমস্যায় প'ড়ে সমস্যা এড়ানোর প্রবণতা এখন সকল প্রথাগত ব্যাকরণবিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেও তাঁরা বেশ নিষ্ঠার সাথে কর্মকে দু-ভাগে—'মুখ্য বা প্রত্যক্ষ কর্ম' ও 'গৌণ বা পরোক্ষ কর্ম'—ভাগ করেন। প্রত্যক্ষ কর্ম হিশেবে নির্দেশ করা হয় সে-প্রাণী বা বস্তুকে, 'যার জন্যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয়'। কিন্তু এ-সংজ্ঞা এতো মুক্ত যে এর দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্ম নির্ণয় অসম্ভব। প্রথাগত ব্যাকরণে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর্মের উদাহরণরাশি দেখে বোঝা যায় কর্তা ছাড়া ক্রিয়া যে-অপরিহার্য বিশেষ্যপদ গ্রহণ করে, তা-ই প্রত্যক্ষ কর্ম, আর ঐচ্ছিকভাবে ক্রিয়ার পক্ষে যে-বিশেষ্যপদ গ্রহণ করা সম্ভব, তা-ই পরোক্ষ কর্ম।

২.৩.১.৫ বিশেষক

বিশেষক বাক্যের ঐচ্ছিক উপাদান; বিশেষকের কাজ হচ্ছে অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্যবিধেয়ে গঠিত বাক্যকে নানাভাবে প্রসারিত করা। ইংরেজি ব্যাকরণে বিশেষকের বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যবহারবিধি দেয়া হয়; এবং এমন সব বিসদৃশ ভাষাবস্তুদের অভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়, যাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করলেই অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পায়। বিশেষক, প্রথাগত ইংরেজি বাক্যতত্ত্বের অন্যান্য ধারণার মতো, একটি আর্থ ও বিশৃঙ্খল ধারণা। এর আর্থ সংজ্ঞাও এমন ভাষায় রচিত, যার সাহায্যে বিশেষক শনাক্ত করা কঠিন। ফ্র্যাংক ব্রাউন (১৯৪৭) বিশেষকের এমন সংজ্ঞা দিয়েছেন (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ২০২)) : 'বিশেষক হচ্ছে এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, যা অন্য কোনো শব্দের অর্থের সাথে কিছু যুক্ত করে।' কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অন্য কোনো শব্দের অর্থের সাথে 'কিছু যুক্ত করে' এমন সব শব্দকেই বিশেষক হিশেবে মানা হয় না; বিশেষক হিশেবে মানা হয় বিশেষ একগুচ্ছ শব্দকে। বিশেষককে ভাগ করা হয় প্রধান দুটি শ্রেণীতে : 'বিশেষণ' ও 'ক্রিয়াবিশেষণে'। যা 'বিশেষিত' করে বিশেষ্য বা বিশেষ্য-জাতীয় শব্দকে, তাকেই গণ্য করা হয় বিশেষণরূপে; আর যা 'বিশেষিত' করে ক্রিয়া-শব্দকে, তাকেই গণ্য করা হয় ক্রিয়াবিশেষণরূপে। বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় ইংরেজি ব্যাকরণে :

(১২) বিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা ব্যবহৃত হয় বিশেষ্য বা সর্বনামের অর্থকে বিশেষিত (বর্ণনা, সীমিত, বা গুণান্বিত) করার জন্যে (ব্রাউন (১৯৪৭), দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ২০৪))।

বিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা বিশেষ্যকে বর্ণনা (অর্থাৎ বিশেষিত) করে (পেন্স (১৯৪৭, ৫))।

বিশেষণ হচ্ছে সাবস্টেনটিভের (বিশেষ্য, সর্বনাম বা বিশেষ্যতুল্য শব্দের) বিশেষক (ফকনার (১৯৫০, ২৯))।

ক্রিয়াবিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা ব্যবহৃত হয় কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ, বা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত (বর্ণনা, সীমিত, বা গুণান্বিত) করার জন্যে (ব্রাউন (১৯৪৭), দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ২০৪))।

ক্রিয়াবিশেষণ হচ্ছে এমন শব্দ, যা কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ বা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণকে বর্ণনা বা বিশেষিত করে (পেন্স (১৯৪৭, ৬))।

যে সমস্ত বিশেষক সাবস্টেনটিভকে বিশেষিত করে না, তাই ক্রিয়াবিশেষণ।

ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত কোনো ক্রিয়া, বিশেষণ বা অন্য কোনো ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত করে (ফকনার (১৯৫০, ৩৬))।

এ-সংজ্ঞাগুলো ভাব ও ভাষায় প্রায় অভিন্ন; এবং এগুলোর চাবিশব্দ 'বিশেষিত করা'। কিন্তু 'বিশেষিত করা' কথার সুস্পষ্ট অর্থ কী? এর সুস্পষ্ট অর্থ অজানা ব'লে ব্যাকরণবিদেরা বিশেষ্যের সাথে ব্যবহৃত যে-কোনো ঐচ্ছিক উপাদানকেই নির্দেশ করেন বিশেষণ ব'লে; আর ক্রিয়া, বিশেষণ, ও ক্রিয়াবিশেষণের সাথে ব্যবহৃত যে-কোনো ঐচ্ছিক উপাদানকেই ক্রিয়াবিশেষণরূপে গণ্য করেন।

২.৩.১.৬ ফ্রেজ ও ক্লজ : পদ ও খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণের দুটি মৌল একক হচ্ছে শব্দ ও বাক্য; এবং এর মধ্যে শব্দ ক্ষুদ্রতম আর বাক্য বৃহত্তম একক। শব্দ ও বাক্যের মাঝামাঝি আরো দুটি একক স্বীকৃতি পায় ইংরেজি ব্যাকরণে; এদের একটি 'ফ্রেজ'—পদ—, অন্যটি 'ক্লজ'—খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য। পদ ও উপবাক্য অমৌল একক; কেননা এদের শনাক্ত করা হয় শব্দ ও বাক্যের সাথে তুলনা ক'রে। পদ ও উপবাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় এভাবে : যে-শব্দগুচ্ছের নিজস্ব উদ্দেশ্য-বিধেয় থাকে না, ও যা ব্যাকরণিকভাবে কোনো বিশেষ শব্দের সমতুল্য, তাকেই বলা হয় 'ফ্রেজ' [পদ]; এবং যে-শব্দগুচ্ছের নিজস্ব উদ্দেশ্য-বিধেয় থাকে, ও যা কোনো বৃহত্তর বাক্যের অন্তর্গত নয়, তাকেই বলা হয় 'ক্লজ' [খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য] (দ্র লায়ন্স (১৯৬৮, ১৭১))। পদ ও উপবাক্যের মধ্যে মিল এখানে যে উভয়ই একগুচ্ছ শব্দের সমষ্টি; আর অমিল এখানে যে পদের কোনো নিজস্ব উদ্দেশ্য-বিধেয় থাকে না, কিন্তু উপবাক্যের নিজস্ব উদ্দেশ্য-বিধেয় থাকে। 'ক্লজ'কে বাঙলায় 'খণ্ডবাক্য' বা 'উপবাক্য'রূপে নির্দেশ করা হ'লেও 'ক্লজ' অনেক সময় 'সেন্টেন্স' শব্দের বিকল্প হিশেবেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণবিদেরা পদ ও উপবাক্যের মধ্যে আর্থ পার্থক্যও বেশ যত্নের সাথে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা জানান যে পদ নামক

শব্দসমষ্টি কোনো পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, যেমন পারে না কোনো বিচ্ছিন্ন শব্দ; কিন্তু উপবাক্য বাক্যের মতোই পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে। পদ ও উপবাক্য সম্পর্কে ইংরেজি ব্যাকরণে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পেলেও বাক্যবর্ণনার সময় পদ ও উপবাক্যের পার্থক্য অনেক সময় সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রদর্শিত হয় না। যেমন : পদকে শব্দতুল্য আর উপবাক্যকে বাক্যতুল্য ব'লে ঘোষণা করা হ'লেও অনেক বাক্যে দেখা যাবে উপবাক্য ভূমিকা পালন করছে কোনো বিশেষ শব্দের বা পদের; তাই ওই শব্দগুচ্ছকে যেমন বলা যায় উপবাক্য, তেমনি পদও বলা সম্ভব। নিচের উদাহরণ বিবেচ্য :

(১৩) ক একটি চমৎকার মেয়ে আসছে।

খ যে-মেয়েটি নীল শাড়ি পরেছে, সে নাচবে।

(১৩ক) বাক্যের 'একটি চমৎকার মেয়ে' শব্দগুচ্ছটিতে কোনো কর্তা ও বিধেয় নেই, এবং এটি, ধরা যাক, কোনো পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না; তাই এটি একটি পদ। (১৩খ) বাক্যের 'যে-মেয়েটি নীল শাড়ি পরেছে' একটি উপবাক্য, কেননা এটির কর্তা ও বিধেয় রয়েছে : এবং অনেকটা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু এটির ভূমিকা তো বিশেষণের মতো, কেননা এটি 'সে নাচবে' উপবাক্যের কর্তা 'সে'-কে বিশেষিত করছে। যেহেতু এটি বিশেষণ-শ্রেণীর শব্দের ভূমিকা পালন করছে, তাই এটিকে পদ ব'লে গ্রহণ করতে হয়। ভালোভাবে বিচার করলে বোঝা যায় পদধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং যে-কোনো ব্যাকরণে এটিকে গ্রহণ করা দরকার, আর উপবাক্য ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই এটিকে ত্যাগ করা যায়।

২.৩.১.৭ ফ্রেজ : পদ

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে পাওয়া যায় পদের নিম্নরূপ সংজ্ঞা :

(১৪) পদ হচ্ছে কোনো ভাব প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত দুই বা দুয়ের অধিক শব্দের গুচ্ছ, যাতে কোনো বিধেয় (বিবৃতি, বক্তব্য) থাকে না; সুতরাং তা বাক্য নয় (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৪))।

পদ হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয়হীন শব্দগুচ্ছ (পেন্স (১৯৪৭, ১১))।

পদ হচ্ছে পরস্পরসম্পর্কিত শব্দগুচ্ছ, যাতে কোনো উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকে না এবং যা বাক্যে এককরূপে কাজ করে (ফকনার (১৯৫০, ৭৮))।

পদ হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ, যা কোনো বিশেষ শব্দশ্রেণীর মতো কাজ করে এবং যাতে কোনো ক্রিয়া ও তার কর্তা থাকে না (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৩৪))।

(১৪)র সংজ্ঞাগুলো পদের দুটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে : পদ শব্দগুচ্ছ এবং ওই শব্দগুচ্ছের কোনো উদ্দেশ্য-বিধেয় থাকে না। পদের ভূমিকা একক শব্দের মতো;—পদ কখনো বিশেষ্যের, কখনো বিশেষণের, কখনো ক্রিয়ার মতো ভূমিকা পালন করে। পদ এককরূপে

কাজ করে, অর্থাৎ পদে গুচ্ছিত শব্দগুলো পরস্পরের সাথে এমন গাঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ হয় যে তাদের একটি অবিভাজ্য শব্দের মতো মনে হয়। পদের সংজ্ঞা দেয়ার সময় পদকে শব্দের সমান্তরাল ও বাক্যের বিপরীত এককরূপে নির্দেশ করা হয়। ব্যাকরণবিদেরা দাবি করেন পদ যেহেতু শব্দের ভূমিকা পালনরত শব্দগুচ্ছ, তাই পদের কোনো পূর্ণ অর্থ থাকে না, বা পদ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে শুধু বাক্য। পদ ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও প্রথাগত ব্যাকরণে বেশ বিশৃঙ্খলভাবে এটিকে ব্যবহার করা হয়। পদকে শব্দগুচ্ছরূপে ঘোষণা করাও একটি ত্রুটি। প্রশ্ন করতে পারি যদি বিশেষ একটি শ্রেণীর ভূমিকা পালনরত শব্দগুচ্ছকে পদ বলা হয়, তবে একটি নিঃসঙ্গ শব্দে গঠিত একককে কেনো পদ বলা হবে না? পদ তো নতুন কোনো একক গঠন করে না, তা শুধু একগুচ্ছ শব্দকে একটি শব্দের স্তরে নামিয়ে আনে। তাই পদ গ'ড়ে উঠতে পারে একটি শব্দে, ও অনেক শব্দে।

ইংরেজি ব্যাকরণে পদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়, এবং বিস্তৃতভাবে বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হয় প্রতিটি পদের ভূমিকা। প্রতিটি পদ-শ্রেণীর নাম দেয় হয় কোনো-না-কোনো মৌল শব্দ-শ্রেণীর নামের অনুকরণে। ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা পাঁচ রকম পদ শনাক্ত করেন: (ক) বিশেষ্যপদ, (খ) প্রিপজিশনীয় পদ, (গ) জিরান্ড পদ, (ঘ) পার্টিসিপল পদ, ও (ঙ) ইনফিনিটিভ পদ। প্রতিটি পদের রূপ ও আর্থ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন ব্যাকরণবিদেরা বেশ যত্নের সাথে, তবুও তাঁদের নামকরণ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে অনবরত। যেমন : বিশেষ্যপদে শিররূপে থাকে একটি বিশেষ্য, আর সারাটি পদ একটি বিশেষ্যের মতো আচরণ করে; তাই একে বিশেষ্যপদ নাম দেয়া যথার্থ। কিন্তু প্রিপজিশনীয় পদে নিশ্চয়ই প্রিপজিশনের ভূমিকা প্রধান নয়, এবং সারাটি পদ প্রিপজিশনের মতো আচরণ করে না। কোনো প্রিপজিশনীয় পদ পালন করে বিশেষ্যের ভূমিকা, কোনোটি বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণের; তাই ভূমিকানুসারে ওই পদকে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ পদ বলাই সঙ্গত; কিন্তু ব্যাকরণবিদেরা পদের আগের প্রিপজিশনটিকে অকারণ প্রধান্য দিয়ে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ বিসদৃশ পদদের দিয়ে থাকেন অভিন্ন অভিধা—প্রিপজিশনীয় পদ। ক্রিয়াপদের বেলায় শুধু ক্রিয়াগুচ্ছকেই ক্রিয়াপদ হিশেবে শনাক্ত করেন; কিন্তু বিবেচনায় আনেন না যে ক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিশেষ্য পদও ক্রিয়াপদের অন্তর্গত। তাই এসব পদের বর্ণনা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করলেও বিপুল বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করে।

২.৩.১.৮ ক্লজ : খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে ক্লজ বা উপবাক্যের প্রসঙ্গটি ওঠে যৌগিক, ও বিশেষ ক'রে, মিশ্র বা জটিল বাক্যবর্ণনার সময়। সরল বাক্যবর্ণনার সময় উপবাক্যের প্রসঙ্গ ওঠে না। পদের মতো উপবাক্য একটি অমৌলিক একক; এবং এটিকে নির্দেশ করা হয় পূর্ণ বাক্যের সমান্তরাল এককরূপে। পদের মতো উপবাক্যও শব্দগুচ্ছ; তবে এ-শব্দগুচ্ছে উদ্দেশ্য-বিধেয় উপস্থিত থাকে, ও পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়। তবে অনেক ব্যাকরণবিদ পূর্ণভাব প্রকাশের কথাটি তোলেন

বিশেষ একরকম উপবাক্যের বেলাতে শুধু, সব উপবাক্যই যে পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, এমন উক্তি থেকে বিরত থাকেন। উপবাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে :

(১৫) উপবাক্য হচ্ছে বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয়সম্বলিত অংশ (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ২৬০))।

উপবাক্য হচ্ছে উদ্দেশ্য-বিধেয়সম্বলিত পরস্পরসম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ (পেন্স (১৯৪৭, ১১))।

উপবাক্য হচ্ছে এমন কাঠামোতে গঠিত পরস্পরসম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ, যাতে একটি উদ্দেশ্য ও সমাপিকা ক্রিয়া বিদ্যমান (ফকনার (১৯৫০, ১০২))।

উপবাক্য হচ্ছে উদ্দেশ্য-বিধেয়সম্বলিত শব্দগুচ্ছ, যা বাক্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হয় (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৪৯))।

(১৫)র সংজ্ঞাগুলোতে ব্যাকরণবিদেরা দুটি বিষয়ে একমত যে উপবাক্য শব্দের গুচ্ছ, তাতে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উপস্থিত থাকে। কিন্তু উপবাক্য স্বাধীন বাক্য না বাক্যের অংশ সে-সম্পর্কে সবাই একমত নন; যেমন— হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১), এবং ওয়ারিনারের (১৯৫১) মতে উপবাক্য কোনো বৃহত্তর বাক্যের অংশ; আর পেন্স (১৯৪৭) ও ফকনার (১৯৪৭) উদ্দেশ্য-বিধেয়সম্বলিত শব্দগুচ্ছকে মেনে নিয়েছেন উপবাক্য হিশেবে, তা কোনো বৃহত্তর বাক্যের অংশ হোক-বা-না-হোক।

উপবাক্যকে ভাগ করা হয় দুটি শ্রেণীতে : (ক) 'আশ্রিত' (বা 'অধীন বা অপ্রধান উপবাক্য'), এবং (খ) 'স্বাধীন' (বা 'প্রধান') উপবাক্য। পাওয়া যায় এ-দু-শ্রেণীর উপবাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা :

(১৬) স্বাধীন উপবাক্য হচ্ছে উদ্দেশ্য-বিধেয়সম্বলিত যে-কোনো পরস্পরসম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ, যা পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে— যা একটি পূর্ণ বাক্যরূপে বিরাজ করতে পারে, যার শুরুতে একটি বড়ো হাতের অক্ষর ও শেষে একটি পূর্ণযতিচিহ্ন থাকে (পেন্স (১৯৪৭, ১২))।

স্বাধীন উপবাক্য হচ্ছে তা, যা বাক্যের অধীন-ভাষাবস্তুরূপে কাজ করে না (ফকনার (১৯৫০, ১০৩))।

প্রধান উপবাক্য একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এবং নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৪৯))।

অধীন উপবাক্য হচ্ছে উদ্দেশ্য-বিধেয়সম্বলিত যে-কোনো পরস্পরসম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ, যা পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে না—যা শুরুতে একটি বড়ো হাতের অক্ষর ও শেষে একটি পূর্ণযতিচিহ্নসহ পূর্ণ বাক্যরূপে বিরাজ করতে পারে না (পেন্স (১৯৪৭, ১২))।

নাম থেকেই বোঝা যায় যে তা-ই অধীন উপবাক্য, যা বাক্যের একটি অধীন-ভাষাবস্তু (ফকনার (১৯৫০, ১০২))।
অধীন উপবাক্য পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না এবং সব সময়ই কোনো প্রধান উপবাক্যের সাথে যুক্ত থাকে (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৫০))।

(১৬)র সংজ্ঞাগুলোতে প্রধান বা স্বাধীন উপবাক্যের বৈশিষ্ট্য হিশেবে নির্দেশ করা হয়েছে যে উপবাক্য নামক শব্দগুচ্ছ উদ্দেশ্য-বিধেয় উপস্থিত থাকে, তা পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তা কোনো বাক্যে আশ্রিত ভাষাবস্তুরূপে কাজ করে না, এবং তা একলা স্বাধীন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে, আর অধীন বা আশ্রিত বা অপ্রধান উপবাক্যের বৈশিষ্ট্য হিশেবে নির্দেশ করা হয়েছে যে এ-শব্দগুচ্ছে উদ্দেশ্য-বিধেয় উপস্থিত থাকে, তবে তা পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে না; তা কোনো বৃহত্তর বাক্যে আশ্রিত ভাষাবস্তু বা সংগঠনরূপে কাজ করে, এবং তা একলা স্বাধীন সংগঠনরূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। পেন্সের (১৯৪৭) সংজ্ঞার শেষাংশ বিশেষভাবেই ইংরেজি লিপিপ্রণালিভিত্তিক। প্রধান ও অধীন উপবাক্যের পার্থক্য এখানে যে প্রধান উপবাক্য পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে, একলা স্বাধীন সংগঠনরূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে, কোনো বৃহত্তর বাক্যে তা আশ্রিত সংগঠনরূপে বিরাজ করে না; অন্য দিকে অধীন উপবাক্য পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে অসমর্থ, তা একলা স্বাধীন সংগঠনরূপে বসতে পারে না, সব সময়ই অন্য সংগঠন-আশ্রিত থাকে। (১৭)র উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১৭) ক আমি বেশ ভালোভাবে জানি।
খ হাসিনা রূপসী।
গ আমি বেশ ভালোভাবে জানি যে হাসিনা রূপসী।
ঘ যে-মেয়েটি রূপসী, সে গান গাইবে।

(১৭ক, খ) উভয়ই স্বাধীন বাক্য;—বাক্য দুটি যেহেতু নিরপেক্ষভাবে বিরাজ করছে, তাই এদের উপবাক্যরূপে নির্দেশ করা হবে না। তবে (১৭গ)তে 'আমি বেশ ভালোভাবে জানি' প্রধান উপবাক্য; আর 'হাসিনা রূপসী' যেহেতু প্রধান বাক্যের অধীন বা আশ্রিত, তাই এটি অধীন বা আশ্রিত বা অপ্রধান উপবাক্য। (১৭ঘ)তে 'সে গান গাইবে' প্রধান বাক্য, যেহেতু এটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে, আর 'যে-মেয়েটি রূপসী' যেহেতু পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে না, তাই এটি অধীন উপবাক্য। (১৭গ) বাক্যটি কিন্তু পূর্ণ ভাব প্রকাশের মানদণ্ডকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিয়েছে; কেননা এতে উভয় উপবাক্য—'আমি বেশ ভালোভাবে জানি', ও 'হাসিনা রূপসী'—পূর্ণভাব প্রকাশ করে। তাই দুটিকেই প্রধান বাক্য হিশেবে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তা করা হয় না প্রথাগত ব্যাকরণে; 'হাসিনা রূপসী' যেহেতু অন্য উপবাক্যের আশ্রিত, তাই এটিই গণ্য হয় অপ্রধান উপবাক্যরূপে।

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে প্রধান উপবাক্যের কোনো শ্রেণীকরণ করা হয় না; তবে অপ্রধান উপবাক্যকে ভূমিকানুসারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (ক) 'বিশেষ্য-উপবাক্য', (খ) 'বিশেষ-উপবাক্য', ও (গ) 'ক্রিয়াবিশেষণীয় উপবাক্য'। এ-শ্রেণীকরণ পদ ও বাক্যের ব্যবধান লোপ ক'রে দেয়; এবং এক-একটি উপবাক্য এক-একটি পদে পরিণত হয়। উপবাক্যসম্বলিত বাক্যে দেখা যায় যে অপ্রধান উপবাক্য পালন করে বিশেষ্য, বিশেষণ, ও ক্রিয়াবিশেষণের ভূমিকা; তাই ওই শব্দগুচ্ছ এক-একটি শব্দশ্রেণীর (যেমন : বিশেষ্য, বিশেষণ, ও ক্রিয়াবিশেষণ) সমান্তরাল পদের ভূমিকা পালন করে। তাই উপবাক্য ধারণাটিকে বাহুল্য ব'লে মনে হয়। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১৮) ক সবাই জানে যে কবিদের কল্পনাপ্রতিভার কোনো সীমাপরিসীমা নেই।

খ কবিদের কল্পনাপ্রতিভার যে কোনো সীমাপরিসীমা নেই, তা সবাই জানে।

গ যাঁরা সীমাপরিসীমাহীন কল্পনাপ্রতিভাবান, তাঁরা কবি।

ঘ যেহেতু আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম, তাই আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম।

(১৮ক)তে 'কবিদের কল্পনাপ্রতিভার কোনো সীমাপরিসীমা নেই', ও (১৮খ)তে 'কবিদের কল্পনাপ্রতিভার যে কোনো সীমাপরিসীমা নেই' উপবাক্য দুটি পরাশ্রিত ও বিশেষ্য-ভূমিকা পালন করছে; তাই এ-দুটি বিশেষ্য-উপবাক্য। (১৮গ)র উপবাক্য 'যাঁরা সীমাপরিসীমাহীন কল্পনাপ্রতিভাবান' প্রধান উপবাক্যের কর্তা 'তাঁরা'র বিশেষণরূপে কাজ করছে। এ-উপবাক্যটি বিশেষণীয় উপবাক্য। (১৮ঘ)র 'যেহেতু আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম' কারণাত্মক ক্রিয়াবিশেষণের ভূমিকা পালন করছে। ইংরেজি ব্যাকরণে এ-সমস্ত উপবাক্যের রূপ, ভূমিকা ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা থাকে, যা বাক্যসংগঠনের ওপর অনেক সময় চমৎকার আলো ফেলে; এবং অনেক সময় ওই আলোই জন্ম দেয় অন্ধকার। অতিশ্রেণীকরণপ্রবণতায় প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা ব্যর্থ হন সাধারণ সূত্র রচনায়, ও বিভিন্ন ধরনের উপবাক্যের মধ্যে বিরাজিত সাদৃশ্য আবিষ্কারে।

২.৩.২ বাক্যশ্রেণীকরণ

দু-রকম রীতিতে বাক্যশ্রেণীকরণ করা হয় প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে। বাক্যশ্রেণীকরণের একটি রীতি রূপ-বা সংগঠন-বা আধার-ভিত্তিক, আর অন্যটি অর্থ-বা আধেয়-বা ভূমিকা-ভিত্তিক। আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রথম রীতিকে আমি বলবো 'আধারভিত্তিক শ্রেণীকরণরীতি', এবং দ্বিতীয়টিকে বলবো 'আধেয়ভিত্তিক শ্রেণকিরণরীতি'। আধারভিত্তিক রীতিতে খুঁজে বের করা হয় বাক্যের সংগঠন; আর এতে প্রধান ভূমিকা পালন করে উপবাক্য নামক ধারণা বা এককটি। আধেয়ভিত্তিক রীতিতে বাক্যের অর্থ বা ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে; এবং আর্থ ভূমিকা অনুসারে বাক্যকে বিন্যস্ত করা হয় কয়েকটি শ্রেণীতে। দু-রকমের শ্রেণীকরণই বাক্যের সংগঠন ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান দেয়, উদঘাটন করে অনেক

আভ্যন্তর সূত্র; কিন্তু দু-রকম শ্রেণীকরণই বহু বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। দু-রকম শ্রেণীকরণ রীতির একটি প্রধানত রৌপ ও অন্যটি সম্পূর্ণরূপে আর্থ; তবে উভয় রকম শ্রেণীকরণেই অর্থ বড়ো ভূমিকা পালন করে। যেমন : আধেয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণে অর্থ প্রধান ভূমিকা তো পালন করেই, আধারভিত্তিক শ্রেণীকরণেও অর্থ বড়ো ভূমিকা পালন করে; কেননা অনেক ব্যাকরণবিদ উপবাক্যকে রৌপসংগঠন হিশেবে বিবেচনা না ক'রে গ্রহণ করেন আর্থ-একক হিশেবে। তাই অনেকেই, বিশেষ ক'রে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা, প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণের উভয় রকম শ্রেণীকরণকেই গ্রহনঅযোগ্য ব'লে নির্দেশ করেন (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ২৯-৩২))।

২.৩.২.১ আধারভিত্তিক শ্রেণীকরণ

আধারভিত্তিক শ্রেণীকরণের মানদণ্ড হচ্ছে উপবাক্য। কোনো বাক্যে ক-টি উপবাক্য আছে, এবং কীভাবে সেগুলো বিন্যস্ত, তা ভিত্তি ক'রে বাক্যরাশিকে সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয় : (ক) 'সরল বাক্য', (খ) 'মিশ্র বা জটিল বাক্য', ও (গ) 'যৌগিক বাক্য'। অনেকে চতুর্থ একটি শ্রেণীর বাক্যও নির্দেশ করেন : (ঘ) 'যৌগিক-মিশ্র বাক্য'; এবং অনেকে এ-শ্রেণীটিকে বাহুল্য ব'লে ত্যাগ করেন। উল্লিখিত বাক্যশ্রেণীগুলোর নিম্নরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে :

(১৯) যে-বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে, তা-ই সরল বাক্য। উদ্দেশ্য ও বিধেয়র যে-কোনো একটি ও উভয়টিই যৌগিক হ'তে পারে (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৫০))।

সরল বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ, যা একটি স্বাধীন ভাব প্রকাশ করে (ওয়াটস (১৯৪৪, ৪০৪))।

কখনোকখনো একটি উপবাক্য পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে (উপবাক্যটির শুরুতে বড়ো হাতের অক্ষর ও শেষে পূর্ণযতিচিহ্ন থাকে।) এমন উপবাক্যে, তা যতো দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র হোক-না-কেনো, গঠিত বাক্যই সরল বাক্য। তাই এভাবে সংজ্ঞা দেয়া যায় যে : পূর্ণ ভাব প্রকাশক একটি উপবাক্যে গঠিত বাক্যই সরল বাক্য (পেন্স (১৯৪৭, ১৪))।

সরল বাক্যে একটি স্বাধীন বক্তব্য থাকে (কারমে (১৯৪৭, ১৫২))।

একটি স্বাধীন উপবাক্যে গঠিত বাক্যই সরল বাক্য। সরল বাক্যে অনির্দিষ্ট পরিমাণ একক-শব্দবস্তু, যৌগিক ভাষাবস্তু, ও পদ থাকতে পারে; কিন্তু তাতে কোনো অধীন উপবাক্য থাকে না (ফকনার (১৯৫০, ১০৩))।

যে-বাক্যে একটি প্রধান উপবাক্য থাকে এবং কোনো অধীন উপবাক্য থাকে না, তা-ই সরল বাক্য (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৬২))।

(২০) যে-বাক্যে একটি বা একটির বেশি বিশেষণীয় উপবাক্য, ক্রিয়াবিশেষণীয় উপবাক্য, বা বিশেষ্য-উপবাক্য থাকে, তা-ই মিশ্র বাক্য (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ২৬০))।

মিশ্র বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ, যা দুটি বা দুটির বেশি সম্মিলিত ভাব প্রকাশ করে; তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রধান ভাব, যার আশ্রয়ে থাকে এক বা একের অধিক অধীন বা আশ্রিত ভাব (ওয়াটস (১৯৪৪, ৪০৫))।

যে-বাক্যে একটি এবং মাত্র একটি প্রধান উপবাক্য থাকে এবং কমপক্ষে একটি অধীন উপবাক্য থাকে, তা-ই মিশ্রবাক্য (পেন্স (১৯৪৭, ১৬))।

মিশ্র বাক্যে থাকে একটি স্বাধীন বক্তব্য ও এক বা একের অধিক অধীন উপবাক্য (কারমে (১৯৪৭, ১৫২))।

মিশ্র বাক্য হচ্ছে সে-বাক্য, যাতে এক বা একের অধিক অধীন উপবাক্যসম্বলিত একটি স্বাধীন উপবাক্য থাকে (ফকনার (১৯৫০, ১০৩))।

যে-বাক্যে একটি প্রধান ও এক বা একের অধিক অপ্রধান উপবাক্য থাকে, তা-ই মিশ্র বাক্য (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৬৩))।

(২১) যে-বাক্য দুটি বা দুটির বেশি সংযুক্ত প্রধান উপবাক্যে গঠিত, তা-ই যৌগিক বাক্য (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ৩১৩))।

যৌগিক বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ, যা দুটি বা দুটির বেশি সংযুক্ত ও যুগ্ম ভাব প্রকাশ করে (ওয়াটস (১৯৪৪, ৪০৭))।

যে-বাক্যে কমপক্ষে দুটি প্রধান উপবাক্য থাকে, তা-ই যৌগিক বাক্য (পেন্স (১৯৪৭, ১৫))।

যৌগিক বাক্যে দুটি বা দুটির অধিক স্বাধীন বক্তব্য থাকে (কারমে (১৯৪৭, ১৫২))।

যৌগিক বাক্য গঠিত হয় দুটি বা দুটির বেশি স্বাধীন এককে, যাতে কোনো অধীন উপবাক্য থাকে না (ফকনার (১৯৫০, ১৪৯))।

যৌগিক বাক্য হচ্ছে দুটি বা দুটির অধিক স্বাধীন উপবাক্যে গঠিত বাক্য, যাতে কোনো অধীন উপবাক্য থাকে না (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৬৩))।

(১৯-২১)-এর সংজ্ঞাগুলোতে তিন শ্রেণীর বাক্যের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে উপবাক্যের সংখ্যা ও বিন্যাসপ্রক্রিয়া অনুসারে : স্বাধীন একলা উপবাক্য সরল বাক্য; স্বাধীন ও অধীন উপবাক্যের মিশ্রণে গঠিত বাক্য মিশ্র বাক্য; আর একাধিক স্বাধীন উপবাক্যের সংযোগে গ'ড়ে ওঠে যৌগিক বাক্য। সবগুলো সংজ্ঞাই রচিত হয়েছে উপবাক্য ধারণাটিকে ভিত্তি ক'রে; শুধু দুটি সংজ্ঞা—ওয়াটস (১৯৪৪) ও কারমে (১৯৪৭)—একান্তভাবেই আর্থ। ওয়াটসের কাছে সরল বাক্য হচ্ছে একটি স্বাধীন ভাবপ্রকাশক শব্দগুচ্ছ, মিশ্র বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ যাতে

একটি স্বাধীন ভাবের ভেতরে গ্রথিত হয় একটি অধীন ভাব; এবং যৌগিক বাক্য হচ্ছে একাধিক স্বাধীন ভাবের সংযুক্তরূপ। কারমে বক্তব্যকে মানদণ্ড করেছেন তিন শ্রেণীর বাক্যের পার্থক্য নির্দেশের জন্যে। এমন আর্থ সংজ্ঞার সাহায্যে তিন শ্রেণীর বাক্য শনাক্তি ও শ্রেণীকরণ অসম্ভব; কেননা উপবাক্যের স্বাধীন, মিশ্র ও যৌগিক বিন্যাস রৌপভাবে যদিও শনাক্ত করা সম্ভব; কিন্তু স্বাধীন একক-ভাব, মিশ্র ভাব, ও যৌগিক ভাব শনাক্ত করা সম্ভব নয়। উপবাক্যভিত্তিক সংজ্ঞাগুলোও অনেকটা আর্থ, কেননা প্রথাগত ব্যাকরণে উপবাক্য শনাক্ত করা হয় অনেকাংশে আর্থ মানদণ্ডে।

নিচের উদাহরণগুলো বিবেচ্য :

(২২) ক একটি মেয়ে এলো।

খ একটি লাল-শাড়ি-পরা পাঁচ-ইন্দ্রিয়-কাঁপানো জ্যোৎস্না তিন হাজার বছর ধ'রে তিনশো তরুণকে বনের পাশে মেঘের নিচে জলের ভেতরে ঘোরাচ্ছে আর ঘোরাচ্ছে আর ঘোরাচ্ছে।

গ আমি তোমাকে দেখতে চাই।

(২৩) ক মেয়েরা জানে যে ছেলেরা নির্বোধ।

খ হাসান বিশ্বাস করে যে মেয়েরা জানে যে ছেলেরা নির্বোধ।

গ হাসিনা মনে করে যে হাসান বিশ্বাস করে যে মেয়েরা জানে যে ছেলেরা নির্বোধ।

(২৪) ক একটি মেয়ে এলো ও একটি ছেলে এলো।

খ একটি মেয়ে এলো, একটি ছেলে এলো, ও একটি বেড়াল এলো।

গ একনায়কেরা নিজেদের জনপ্রিয় মনে করে, কিন্তু জনগণ তাদের পছন্দ করে না।

(২২ক)র ছোটো-সরল বাক্যটি একটি সরল বাক্য, কেননা এতে একটি উপবাক্য আছে, যা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। (২২খ)ও একটি সরল বাক্য, যদিও আকারে বেশ দীর্ঘ। এটি সরল বাক্য, যেহেতু এটিতে কোনো অধীন উপবাক্য নেই। কিন্তু ভাবের একতা যদি মানদণ্ড হয় সরল বাক্যের, তবে এটিকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে। এ-বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে একটি না একাধিক না অনেক ভাব? তা নির্ণয় করতে গেলে বাধবে অনন্ত বিতর্ক, এবং এটির সরলতা-মিশ্রতাও থাকবে অনির্ণীত। প্রথাগত ব্যাকরণ এটিকে সরল বাক্যরূপেই গ্রহণ করবে; কিন্তু আমার কাছে এটি সরল বাক্য নয়। (২২গ)ও প্রথাগত সংজ্ঞানুসারে বিবেচিত হবে সরল বাক্যরূপে; কেননা এতে কোনো সুস্পষ্ট অপ্রধান উপবাক্য নেই। কিন্তু মর্মমূলে এটি মিশ্রবাক্য। (২৩ক) বাক্যটি মিশ্র; কেননা এটিতে 'মেয়েরা জানে' রূপী প্রধান বাক্যের শরীরে গেঁথে দেয়া হয়েছে অপ্রধান বাক্য 'ছেলেরা নির্বোধ'। এ-বাক্যে একটি প্রধান উপবাক্যের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে একটি অপ্রধান উপবাক্য। (২৩খ)তে একটি প্রধান উপবাক্যের গায়ে গ্রথিত হয়েছে একটি অপ্রধান উপবাক্য—'মেয়েরা জানে'—; এবং তার গায়ে গাঁথা হয়েছে

আরেকটি অপ্রধান উপবাক্য—'ছেলেরা নির্বোধ'। (২৩গ)তে একটি প্রধান, উপবাক্যের গায়ে প্রথমে গাঁথা হয়েছে একটি উপবাক্য এবং তার গায়ে গাঁথা হয়েছে আরেকটি উপবাক্য এবং তার গায়ে গাঁথা হয়েছে আরেকটি উপবাক্য। (২৩ক, খ, গ) তিনটিই মিশ্রবাক্য। (২৪ক, খ)তে সংযুক্ত করা হয়েছে যথাক্রমে দুটি ও তিনটি স্বাধীন উপবাক্য; তাই এগুলো যৌগিক বাক্য। (২৪গ)ও যৌগিক বাক্য, কিন্তু এটি ভিন্ন ধরনের; এখানে যে-সংযোগ, তা একাত্মক নয় ভিন্নাত্মক। প্রথাগত ব্যাকরণ, ও ইংরেজি প্রথাগত ব্যাকরণ, সরল ও মিশ্র বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে; এবং গোপনে ইঙ্গিত দেয় যে মিশ্র বাক্য একরকম সরল বাক্যই; পার্থক্য শুধু এখানে যে সরল বাক্যে যে-দায়িত্ব পালন করে একক শব্দ বা পদশ্রেণী, মিশ্র বাক্যে তা পালন করে উপবাক্য। তাই মিশ্র বাক্য কোনো নতুন ধরনের বাক্যসংগঠন সৃষ্টি করে না; সরল বাক্যসংগঠনকেই নানারকম উপবাক্যযোগে সম্প্রসারিত করে।

কোনো কোনো বাক্যতাত্ত্বিক যৌগিক-মিশ্র নামক একশ্রেণীর বাক্য স্বীকার করেন; এবং নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেন :

(২৫) যৌগিক-মিশ্র বাক্য গঠিত হয় দুটি বা দুটির বেশি স্বাধীন এককে, যার অন্তত একটি মিশ্র—অর্থাৎ এক বা একাধিক অধীন বাক্য বহন করে (ফকনার (১৯৫০, ১৪৯))।

সে-বাক্যই যৌগিক-মিশ্র বাক্য, যাতে দুই বা দুয়ের অধিক প্রধান উপবাক্য ও এক বা একাধিক অপ্রধান উপবাক্য থাকে (ওয়ারিনার (১৯৫১, ৬৪))।

সংজ্ঞাগুলো নির্দেশ করে যে যৌগিক-মিশ্রবাক্য একরকম যৌগিক বাক্য, যার এক বা উভয় বা সমস্ত উপবাক্যই মিশ্র। এমন বাক্যকে যেমন যৌগিক-মিশ্র বাক্য বলা হয়, তেমনি বলা যেতে পারে মিশ্র-যৌগিক বাক্য। কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ এমন বাক্য পৃথক শ্রেণীভুক্ত করলেও অনেকে এমন শ্রেণীকরণকে বিভ্রান্তিকর মনে করেন (দ্র পেন্স (১৯৪৭, ১৬)); কেননা এমন বাক্য পরিচ্ছন্নভাবে পৃথক একটি শ্রেণী সৃষ্টি করে না। তবে যাঁরা এ-শ্রেণীটিকে স্বীকার করেন, তাঁরা উদাহরণ হিশেবে ব্যবহার করেন নিম্নরূপ বাক্য :

(২৬) ক ঘাতকেরা এলো এবং যে-ছেলেটি পাঁচতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো, সে লাফিয়ে পড়লো।

খ হাসিনা বললো যে সে আর কলাভবনে আসবে না; কিন্তু তাতে একটি জানালাও কাঁপলো না।

গ রাজনীতিকেরা জানে যে জনতা নির্বোধ, আর জনতা জানে যে রাজনীতিকেরা স্বার্থপর।

(২৬ক) বাক্যটির প্রথম উপবাক্যটি সরল, দ্বিতীয়টি মিশ্র; (২৬খ) বাক্যটির প্রথম উপবাক্যটি মিশ্র, দ্বিতীয়টি সরল; (২৬গ) বাক্যটির উভয় উপবাক্য মিশ্র। (২৬ক, খ, গ) তিনটিই যৌগিক-মিশ্র বাক্য।

২.৩.২.২ আধেয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

আধেয়-বা অর্থ-বা ভূমিকা-অনুসারে ইংরেজি বাক্যরাশিকে ভাগ করা হয় চার শ্রেণীতে; কিন্তু এ-শ্রেণীকরণের কোনো স্পষ্ট ও বস্তুগত মানদণ্ড নেই। ইংরেজি ভাষার অনন্ত সংখ্যক বাক্যের বক্তব্য বা অর্থ বা ভূমিকাকে কেনো যে চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে হবে, সে-সম্বন্ধে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না কোনো ব্যাকরণে; কিন্তু সবাই, দু-একজন ব্যতিক্রম বাদে, আধেয়-অনুসারে বাক্যকে বিন্যস্ত করেন চারটি শ্রেণীতে: (ক) 'বিবৃতিমূলক বাক্য', (খ) 'প্রশ্নবোধক বাক্য', (গ) 'অনুজ্ঞা বা আদেশাত্মক বাক্য', ও (ঘ) আবেগসূচক বাক্য'। কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ চতুর্থ শ্রেণীর বাক্যকে বাদ দিয়ে তিন শ্রেণীর বাক্য নির্দেশ করেন। এমন শ্রেণীকরণের সারকথা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় ব্যক্ত সমস্ত বক্তব্য বা ইংরেজি ভাষার সমস্ত বাক্যের অর্থ মাত্র চার বা তিন রকমের। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। বিবৃতি থেকে প্রশ্ন কেনো পৃথক, আর প্রশ্ন থেকে কেনো ভিন্ন জিনিশ অনুজ্ঞা বা আবেগ বা কাতর চিৎকার? বিবৃতির সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি আবেগ, প্রশ্নের সাহায্যেও দিতে পারি বিবৃতি, এবং অনুজ্ঞা-আবেগ মিশে যেতে পারে একসাথে।

বিবৃতি-প্রশ্ন-অনুজ্ঞা-আবেগকে যদি শ্রেণীকরণের মানদণ্ড ধরি, তবে কেনো ধরবো না ঘৃণা-বিদ্বেষ-ভালোবাসাকে, চক্রান্ত-শুভেচ্ছা ও আরো হাজারো কামনাবাসনাকে, অর্থাৎ অর্থকে। যদি একশ্রেণীর বাক্যকে প্রশ্নবোধক, বা অনুজ্ঞাসূচক অভিধা দিই, তাহলে কেনো একশ্রেণীর বাক্যকে বলবো না 'বিদ্বেষাত্মক বাক্য', আরেক শ্রেণীকে 'প্রেমাত্মক', আরেক শ্রেণীকে 'চক্রান্তমূলক', আরেক শ্রেণীকে 'অভিসন্ধিমূলক', এবং আরেক শ্রেণীকে 'শুভেচ্ছাত্মক' ইত্যাদি। অর্থাৎ আধেয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের মূলে কোনো সুস্পষ্ট মানদণ্ড নেই, কিন্তু প্রথাবশত এমন শ্রেণীকরণ চ'লে আসছে প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে। তবে উল্লিখিত চার শ্রেণীর বাক্যের যে-সংজ্ঞা পাওয়া যায় প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে, তাতে বোঝা যায় এমন শ্রেণীকরণের সময় ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা চালিত হন শব্দক্রম ও পূর্ণযতিচিহ্নের ব্যবহার দিয়ে। যেমন : বিবৃতিমূলক বাক্যে শব্দের যে-ক্রম, তা বদলে যায় প্রশ্নবোধক বাক্যে; এবং অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে লুপ্ত হয়ে যায় বাক্যের কর্তা। যতিচিহ্নও বেশ প্রভাব ফেলেছে এমন শ্রেণীকরণের ওপর : বিবৃতিসূচক বাক্যের পরে বসে 'ফুলস্টপ' বা দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে 'প্রশ্নচিহ্ন', আবেগসূচক বাক্যের শেষে 'বিস্ময়চিহ্ন'। বিবৃতিসূচক ও অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে 'ফুলস্টপ' বসে ব'লে অনেক ব্যাকরণবিদ এ-দু-শ্রেণীর বাক্যকে বিন্যস্ত করেন একই শ্রেণীতে। সব মিলে এ-শ্রেণীকরণ ও বাক্যবর্ণনার সময় আমরা মুখোমুখি হই একরাশ বিশৃঙ্খলা ও প্রথানুবর্তিতার। উল্লিখিত চার শ্রেণীর বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণে :

(২৭) বিবৃতিমূলক বাক্য কোনো ঘটনা অথবা মত প্রকাশ করে (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৪))।

যে-বাক্য দৃঢ় বিবৃতি পেশ করে, তা-ই বিবৃতিমূলক বাক্য। বিবৃতিমূলক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে (পেন্স (১৯৪৭, ১৭))।

বিবৃতিমূলক বাক্য কোনো সত্য ঘটনা বিবৃত করে বা কোনো কিছুকে সত্য ঘটনা হিশেবে দৃঢ়ভাবে পেশ করে (কারমে (১৯৪৭, ৯৭))।

সে-বাক্যই বিবৃতিমূলক, যা কোনো সত্য ঘটনাকে বিবৃত বা পেশ করে। এমন বাক্যের শেষে পূর্ণযতি—দাঁড়ি—বসে (ফকনার (১৯৫০, ৭১))।

সে-বাক্যই বিবৃতিমূলক, যা কোনো বিবৃতি পেশ করে (ওয়ারিনার (১৯৫১, ২২))।

(২৮) প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৪))।

সে-বাক্যই প্রশ্নবোধক, যা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন বসে (পেন্স (১৯৪৭, ১৭))।

তা-ই প্রশ্নবোধক বাক্য, যা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। এমন বাক্য শেষ করার জন্যে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয় (ফকনার (১৯৫০, ৭২))।

প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, এবং এমন বাক্যের লিখিত রূপের শেষে প্রশ্নচিহ্ন বসে (কারমে (১৯৪৭, ৯৭))।

সে-বাক্যই প্রশ্নবোধক বাক্য, যা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে (ওয়ারিনার (১৯৫১, ২২))।

(২৯) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য আদেশ, অনুরোধ বা অভিশাপ জ্ঞাপন করে (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৪))।

তা-ই অনুজ্ঞাসুচক বাক্য, যা আদেশ বা অনুরোধ প্রকাশ করে (ফকনার (১৯৫০, ৭১))।

তা-ই অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, যা আদেশ দেয় বা অনুরোধ জানায় (ওয়ারিনার (১৯৫১, ২২))।

(৩০) আবেগসূচক বাক্য তীব্র অনুভূতি প্রকাশ করে (হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৫))।

আবেগসূচক বাক্য চিৎকার প্রকাশ করে, বা আদেশ, ইচ্ছে, বাসনা জানায়; এবং এমন বাক্যের শেষে সাধারণত বিস্ময়চিহ্ন বসে (কারমে (১৯৪৭, ৯৭))।

সে-বাক্যই আবেগসূচক বাক্য, যা তীব্র অনুভূতি প্রকাশ করে। তা চিৎকার দেয় (ওয়ারিনার (১৯৩১২, ২২))।

(২৭-৩০)-এর সংজ্ঞাগুলো থেকে বোঝা যায় যে আধেয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের বেলা মতানৈক্য ঘটেছে প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের মধ্যে : হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১), ফকনার (১৯৫০), ওয়ারিনার (১৯৫১) স্বীকার করেন চার রকম বাক্য ; কারমে (১৯৪৭) বিবৃতিমূলক ও প্রশ্নবোধক বাক্য স্বীকার করেন, এবং অনুজ্ঞা ও আবেগসূচক বাক্যকে গ্রহণ করেন একই শ্রেণীর বাক্যরূপে। পেন্স (১৯৪৭) স্বীকার করেন শুধু দু-শ্রেণীর বাক্য-বিবৃতিমূলক ও

প্রশ্নবোধক বাক্য। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা সাধারণত মতৈক্যে বিশ্বাসী; তাই আধেয়ভিত্তিক বাক্যশ্রেণীকরণের সময় তাঁদের মধ্যে যে মতানৈক্য ঘটলো, তা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাৎপর্যটি হচ্ছে : আধেয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ শক্ত সুস্পষ্ট সুশৃঙ্খল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

প্রথাগত ব্যাকরণে চার শ্রেণীর বাক্যের উদাহরণ হিশেবে পেশ করা হয় নিম্নরূপ বাক্য :

(৩১) ক হাসান রাজনীতি করে।

খ হাসান রাজনীতি করে?

গ হাসান রাজনীতি করে!

ঘ যাও।

(৩১ক, খ, গ) একই শব্দবস্তুতে গঠিত; কিন্তু বিবৃতি-প্রশ্ন-আবেগের মানদণ্ডে প্রথমটি বিবৃতিমূলক,দ্বিতীয়টি প্রশ্নবোধক, তৃতীয়টি আবেগসূচক বাক্য। (৩১ঘ), যেহেতু আদেশ দিচ্ছে, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। কিন্তু এমন শনাক্তি বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীকরণ নির্দেশ করে না, প্রথানুবৃত্তিই নির্দেশ করে।

২.৩.৩ বাক্যচিত্রণ

বাক্য বিমূর্ত শব্দে গঠিত বিমূর্ত বস্তু; এবং অধিকাংশ মানুষের কাছে বাক্যের কোনো রূপ-আকার-মূর্তি নেই, অর্থাৎ বাক্য নিরাকার। তবে কেউ কেউ, অস্পষ্টভাবে, বোধ ক'রে থাকতে পারেন যে বাক্যের দৈর্ঘ আছে, কেননা লিখিতরূপে বাক্য বাঁ থেকে ডান, বা ডান থেকে বাঁ, বা ওপর থেকে নিচ দিকে বিন্যস্ত হয়ে নিজের অন্তত একটি মাত্রা প্রকাশ করে। তাই অনেক সময় বাক্যের পরিচয় দেয়া হয় ছোটো বাক্য, বড়ো বাক্য, দীর্ঘ বাক্য প্রভৃতি অভিধায়। বাক্য একরকম সংগঠন, এবং সংগঠনমাত্রই আকৃতিসম্পন্ন, তা যতোই বিমূর্ত হোক-না-কেনো। যার আকৃতি আছে, তারই প্রতিকৃতি বা চিত্র আঁকা সম্ভব; তাই আঁকা সম্ভব বাক্যেরও চিত্র—বাক্যচিত্র। উনিশশতকের পঞ্চম দশকে ইংরেজি বাক্যবর্ণনায় দেখা দেয় এক অভিনবত্ব; স্টিফেন ক্লার্ক *প্র্যাকটিক্যল গ্রামার* (১৮৪৭) নামক পুস্তকে প্রথম মুদ্রিত করেন বাক্যচিত্র; এবং রিড ও কেলোগ *হায়ার লেসন্স ইন ইংলিশ* (১৮৭৭) পুস্তকে ক্লার্কের বাক্যচিত্রকে সংশোধিতরূপে উপস্থাপিত ক'রে তুমুল আলোড়ন জাগান (দ্র গ্লিসন (১৯৬৫, ১৪২)); হাউজহোলডার (সম্পাদক (১৯৭২, ১১-১২))। রিড ও কেলোগের বাক্যচিত্র এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে তা 'রিড ও কেলোগ চিত্র' নামে আখ্যায়িত হয়, এবং শুরু হয়ে যায় প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যচিত্র অঙ্কন ও মুদ্রণের শতাব্দীব্যাপী হুজুগ। গত এক শতকের প্রায় প্রতিটি ইংরেজি ব্যাকরণে মুদ্রিত হয়েছে বাক্যের বিপুল পরিমাণ চিত্র, এবং শিক্ষকেরা আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন ছাত্রদের বাক্যচিত্র আঁকার কৌশল শেখাতে। বিশশতকে দুটি প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যের বিপুল পরিমাণ চিত্র মুদ্রিত হয়, যার মধ্যে আছে সরল থেকে অত্যন্ত জটিল বাক্যের

চিত্র (দ্র হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৪৫-৩০৩); পেন্স (১৯৪৭, ৩১১-৩৬৮))। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা এসব বাক্যচিত্র রচনার কৌশল স্পষ্টভাবে বাখ্যা করেন নি; দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন নি বাক্যের কোনো উপাদান চিত্রের কোন স্থানে চিত্রিত হবে, তবে চিত্রগুলো থেকে বাক্যসংগঠন সংস্পর্কে তাঁদের ধারণা অনেকটা ধরা পড়ে। তাঁরা বাক্যের যে-চিত্র আঁকার রীতি প্রবর্তন করেন, তাকে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অন্য ধারায় প্রবাহিত ক'রে দেন, আর বাক্যচিত্র চূড়ান্ত, সুশৃঙ্খল, বোধি-ও বস্তু-সম্মত রূপ পায় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে (দ্র § ৪.৩.১)।

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণের বাক্যচিত্র বাক্যের আবশ্যিক উপাদান ও আবশ্যিক উপাদানের বিশেষকের রেখাচিত্র। চিত্রে প্রধান গুরুত্ব পায় বাক্যের প্রধান উপাদান দুটি : উদ্দেশ্য ও বিধেয়; এবং এর পরেই গুরুত্ব পায় প্রধান শব্দ-শ্রেণীসমূহ—বিশেষ্য, ও ক্রিয়া; আর অন্যান্য শব্দ-শ্রেণীকে আশ্রিত ক'রে রাখা হয় বিশেষ্য ও ক্রিয়ার। বাক্যচিত্র অবশ্য শব্দের সরলরৈখিক বিন্যাস নির্দেশ করে না; নির্দেশ করে বাক্যের বিভিন্ন শব্দের ভূমিকা। তাই বাক্যে যে-ক্রমানুসারে শব্দগুচ্ছ বিন্যস্ত হয়, চিত্রে অনেক সময় বিন্যস্ত হয় তার থেকে ভিন্ন ক্রমে। প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যচিত্র স্বয়ংক্রিয় ও সুশৃঙ্খলভাবে রচিত হয় না, যেমন হয় রূপান্তর ব্যাকরণে। প্রথাগত বাক্যচিত্রের দিকে তাকালে ওই চিত্রকে লম্বালম্বি ও উলম্ব ও তীর্যক রেখার সমাবেশ ব'লে মনে হয়; এবং বেশ জটিল বাক্যের চিত্রে লম্বালম্বি-উলম্ব-তীর্যক রেখার বিন্যাস বাক্যচিত্রকে লন্ডনের সুড়ঙ্গরেলপথের মানচিত্রের রূপ দেয়। চিত্রগুলো সুস্পষ্ট নয়; অর্থাৎ চিত্র দেখেই বোঝা যায় না বাক্যের কোন শব্দের কী ভূমিকা, কোনটি কোন শ্রেণীর শব্দ, এবং বাক্যের একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গের সাথে গ্রথিত কী-রীতিতে। কিন্তু প্রথাগত বাক্যবর্ণনায় যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা চিত্র রচনা করতে পারেন যেমন, তেমনি পারেন চিত্রের পাঠোদ্ধার করতে। অনেক চিত্রই চমৎকার অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক; কেননা এ-চিত্রগুলোতে বাক্যের বিভিন্ন অঙ্গকে বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

সাংগঠনিক বাক্যচিত্রের সাথে প্রথাগত বাক্যচিত্রের পার্থক্য অনেক (দ্র § ৩.২)। সাংগঠনিক বাক্যচিত্র একরকম বংশলতিকারূপীচিত্র, যাতে বাক্যের প্রতিটি সংগঠনের অব্যবহিত-উপাদান নির্দেশ করা হয়; এবং চিত্রের নিম্নভাগে ঝুলে থাকে একেকটি রূপমূল। সাংগঠনিকেরা বাক্যচিত্রে বিভিন্ন রূপমূল বা অন্ত-উপাদানের শ্রেণী নির্দেশ করেন না, চিত্রের কোন উপাদানের কী ভূমিকা তাও নির্দেশ করেন না, এমন কি চিত্র দেখে জানা যায় না কোনো সংগঠন বা উপাদানের অভিধা কী। একদিক দিয়ে প্রথাগত বাক্যচিত্র সাংগঠনিক চিত্রের থেকে অনেক উন্নত : প্রথাগত চিত্র বাক্যের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা অস্পষ্টভাবে হ'লেও নির্দেশ করে, কিন্তু সাংগঠনিক বাক্যচিত্র তা করে না। অন্যদিকে সাংগঠনিক চিত্র প্রথাগত চিত্রের চেয়ে উন্নততর : বংশলতিকারূপী বাক্যচিত্র বাক্যের বিভিন্ন সংগঠন ও উপাদানকে এমনভাবে রেখার

সাহায্যে যুক্ত করে যে বাক্যের উপাদানরাশির পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা মূর্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু প্রথাগত বাক্যচিত্রের বিভিন্নমুখি সরলরেখা বাক্যের সাংগঠনিক রূপকে মূর্ত না ক'রে তাকে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। সাংগঠনিক বাক্যচিত্র সংহত, প্রথাগত বাক্যচিত্র অসংহত। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় বৃক্ষ-বা পদ-চিত্র, যাকে প্রথাগত-সাংগঠনিক বাক্যচিত্রের চূড়ান্ত বিকাশ ব'লে গণ্য করা যায় (দ্র § ৪.৩.১)। রূপান্তর ব্যাকরণের পদচিত্র কাটিয়ে উঠেছে প্রথাগত ও সাংগঠনিক বাক্যচিত্রের সমস্ত ত্রুটি, এবং হয়ে উঠেছে স্বয়ংক্রিয়, সুশৃঙ্খল ও তাৎপযপূর্ণ সংবাদবহ। রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্যের সূত্রগুলো এমনভাবে রচিত হয় যে তাদের প্রয়োগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রচিত হয় পদচিত্র; এবং প্রতিটি পদচিত্র চিত্রিত বাক্যের সংগঠনবিষয়ক সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করে। কিন্তু প্রথাগত বাক্যচিত্র তা করে না, তাই প্রথাগত বাক্যচিত্রের পাঠোদ্ধার করতে হ'লে প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দরকার।

নিচে প্রথাগত বাক্যচিত্রের কয়েকটি নমুনা দেয়া হলো, এবং বাক্যচিত্র রচনার নীতি ব্যাখ্যা করা হলো :

[ক] বাক্যের প্রধান উপাদানগুলোকে একটি মোটা অনুভূমিক সরলরেখার ওপরে বিন্যস্ত করা হয়; এবং উপাদানগুলোকে উল্লম্বরেখা দিয়ে পৃথক করা হয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে পৃথক করার জন্যে যে-উল্লম্বরেখাটি ব্যবহার করা হয়, সেটি অনুভূমিক রেখাকে অতিক্রম ক'রে কিছুটা নিচে নেমে যায়। যেমন : 'অনন্য আজাদ আসছে' বাক্যের চিত্র হবে (৩২) :

(৩২)

অনন্য আজাদ | আসছে

[খ] যদি কোনো বাক্যে দুয়ের অধিক প্রধান উপাদান থাকে, তবে তাদের অনুভূমিক রেখার ওপর বিন্যস্ত করা হয়; উদ্দেশ্য-বিধেয়কে পৃথক করা হয় (৩২)-এর মতো; এবং বিধেয় অংশের উপাদানগুলোকে উল্লম্বরেখার সাহায্যে পৃথক করা হয়। যেমন : 'আমরা ভাত চাই' বাক্যের চিত্র হবে (৩৩) :

(৩৩)

[গ] বিশেষকগুলোকে অনুভূমিক রেখার নিচে তীর্যক রেখার ওপর বসিয়ে দেয়া হয়। বিশেষ্য শব্দের নিচে তীর্যক রেখায় ঝুলে থাকা শব্দগুলো 'বিশেষণ', আর ক্রিয়া-শব্দের নিচে ঝুলে থাকা শব্দ 'ক্রিয়াবিশেষণ'। 'লাল নীল বেলুন নিঃশব্দে উড়ছে' বাক্যের চিত্র হবে (৩৪) :

(৩৪)
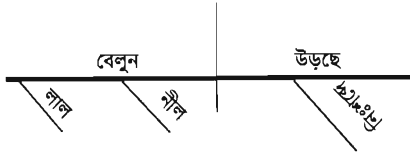
[ঘ] যৌগিক উপাদানগুলো চিমটেরূপী সরলরেখার ওপর লিখিত হয়। সমগ্র যৌগিক উপাদানের বিশেষক বিন্যস্ত হয় একক তীর্যক রেখার ওপর, আর প্রতিটি যুগ্মের বিশেষক বিন্যস্ত হয় প্রতিটি যুগ্ম থেকে বেরিয়ে আসা তীর্যক রেখার ওপর। যেমন : 'বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা ও চাষীরা এলো' বাক্যের চিত্র হবে (৩৫); এবং 'দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষেরা ঠাণ্ডা ও মোটা ভাত পছন্দ করে' বাক্যের চিত্র হবে (৩৬) :

(৩৫)
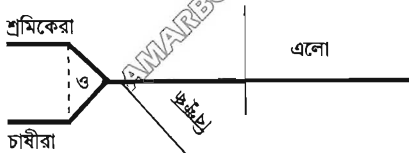
(৩৬)
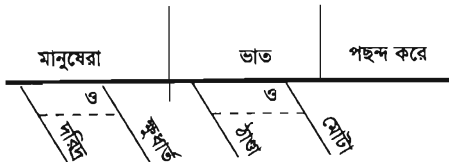
[ঙ] বাক্য যতো জটিল হ'তে থাকে চিত্র হ'তে থাকে জটিলতর (দ্র পেন্স(১৯৪৭, ৩১২-৩৬৮))। এখানে সব ধরনের চিত্রের উদাহরণ দেয়া সম্ভব নয়। (৩৭)-এ দেয়া হলো 'হি বিলিভস ইট ইম্পোরটেন্ট টু বি অ্যাবল টু পুট টু অ্যান্ড টু টুগেদার' বাক্যের পেন্স-কৃত চিত্র (দ্র পেন্স (১৯৪৭, ৩৪৭)) । :

(৩৭)
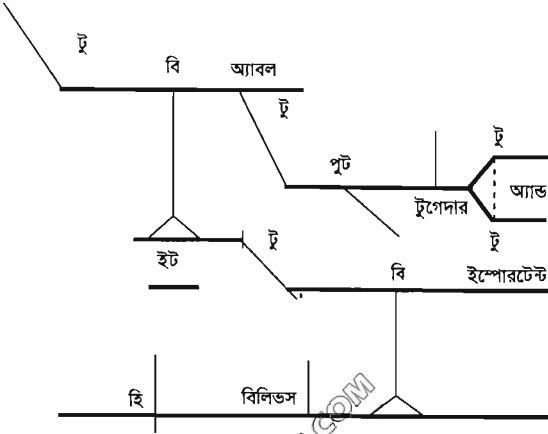
চিত্রটিতে যেনো খুলে ফেলা হয়েছে বাক্যের সমস্ত উপাদান;—তাই প্রথমে এটি বিহ্বল করতে পারে পাঠক-চিত্ত; কিন্তু চিত্রটিতে প্রকাশ পেয়েছে ব্যাকরণপ্রণেতার চমৎকার বাক্যবোধ।

২.৪ বাঙলা বাক্যতত্ত্ব

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ শব্দের ব্যাকরণ; এর প্রধান লক্ষ্য শুদ্ধ শব্দ গঠনের কৌশল শেখানো। ভাষার একটি স্তরের ওপরেই প্রায়-সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন, ও করেন, প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকরচয়িতারা; অন্যান্য স্তরের দিকে দেন তাঁরা ক্ষণিক খণ্ডদৃষ্টি। তাই বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকের প্রায় সবটা জুড়ে পাওয়া যায় শব্দগঠনের বিভিন্ন কৌশলের বর্ণনাবিবরণ; সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় বর্ণ-ও ধ্বনি-তত্ত্বের বর্ণনা; এবং বাক্যের বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সামান্য। বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা গ'ড়ে তুলেছেন একটি মেধাশূন্য অন্তর্দৃষ্টিহীন শ্রেণী;—তাঁদের ভাষিক ধারণা ভ্রান্ত, বর্ণনা বিশৃঙ্খল ও ত্রুটিপূর্ণ, এবং উপাত্ত সীমাবদ্ধ। মৌলিকতা তাঁদের কাম্য নয় : অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তিই তাঁদের চারিত্র। বাঙলা ভাষা বর্ণনাব্যাখ্যার জন্যে তাঁরা কোনো তত্ত্ব রচনা করতে পারেন নি; কোনো প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন নি সুষ্ঠুভাবে। তাঁরা সব সময় তাকিয়ে থেকেছেন সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের দিকে; কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরেজি ব্যাকরণতত্ত্ব থেকে কোনো তত্ত্ব-প্রণালি ঋণ ক'রে এনে তাকে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলরূপে প্রয়োগ ক'রে বাঙলা ভাষা ব্যাখ্যাবর্ণনা করতে সমর্থ হন নি। এর কারণ তাঁদের কোনো উচ্চ লক্ষ্য ছিলো না, ও নেই; বাঙলা ভাষার দৃশ্য-অদৃশ্য সূত্রশৃঙ্খলা উদঘাটন তাঁদের

লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়—তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যাকরণব্যবসা। তাই বাঙলা ব্যাকরণ নামক যে-পুস্তকরাশি রচিত ও পঠিত হচ্ছে দু-শতাব্দী ধ'রে, সেগুলোর মতো করুণ শোচনীয় আর কিছু নেই। এ-পুস্তকগুলোতে বর্ণনা করা হয় অত্যন্ত সংকীর্ণ উপাত্ত, এবং তাও সুশৃঙ্খল নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয় না; যে-সব প্রচ্ছন্ন মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় শব্দ-বাক্য প্রভৃতি ব্যাখ্যার জন্যে এ-পুস্তকগুলোতে, সেগুলো সম্পর্কে ব্যাকরণরচয়িতাদের সাধারণত কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না। এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাকরণবিদ বাঙলা ভাষার দিকে গভীরব্যাপক দৃষ্টিতে তাকান নি, তাই বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকগুলোতে পাই বাঙলা ভাষার খণ্ডাংশের বর্ণনাব্যাখ্যা, এবং যেহেতু কোনো ব্যাকরণবিদই বাঙলা ভাষা বর্ণনাব্যাখ্যায় উৎকৃষ্ট তত্ত্ব ও সুশৃঙ্খল প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগ করেন নি, তাই ওই পুস্তকগুলোতে পাই বাঙলা ভাষার খণ্ডাংশের বিশৃঙ্খল-বিভ্রান্ত-ক্রটি-ছাওয়া বর্ণনা ও ব্যাখ্যা।

বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তখন, যখন তাঁরা বাক্যবর্ণনায় উদ্যোগী হন। বাঙলা বাক্য বিশ্লেষিত হয়ে আসছে আড়ই শো বছর ধ'রে;—বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ আসসুম্পসাঁউর *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেঙ্গল্লা, এ পোর্তুগিজ : বাঙলা ও পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ* (১৭৪৩) (দ্র সুনীতিকুমার ও প্রিয়রঞ্জন (সম্পাদক-অনুবাদক ১৯৩১, ২১-২৮) নামক গ্রন্থেও উনিশটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে বাঙলা বাক্য গঠনের কৌশল; এবং এর পরে লেখা অজস্র ব্যাকরণপুস্তকে 'অথ বাক্যরচন প্রকরণ', 'অন্বয় প্রকরণ', 'বাক্য', 'বাক্য প্রকরণ', 'বাক্য-রীতি', 'বাক্য-গঠন' প্রভৃতি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে বাঙলা বাক্য, তবু আজো বাংলা বাক্যের সংগঠন আমাদের কাছে এক অজানা রহস্যময় মহাদেশ। কোনো ব্যাকরণরচয়িতাই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেন নি বাক্যের ওপর; তাই সমস্ত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকেই বাক্য-আলোচনা সমাপ্ত হয় মাত্র কয়েক পাতায়। যেমন : আসসুম্পসাঁউ (১৭৪৩) বাক্যের জন্য বরাদ্দ করেছেন সাড়ে সাত পৃষ্ঠা, বাঙলায় লেখা বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ব'লে আজকাল নির্দেশ করা হচ্ছে যে-ব্যাকরণপুস্তকটিকে, তাতে 'বাক্যরচন প্রকরণ' আলোচিত হয়েছে চার পৃষ্ঠায় (দ্র তারাপদ (সম্পাদক ১৩৭৭, ৫০-৫৪); আহমদ শরীফ (সম্পাদক ১৩৮০, ৪১-৪৪)), রামমোহন রায় (১৮৩৩, ৪০৯, ৪১১)) 'অন্বয় প্রকরণ' ব্যাখ্যা করেছেন চার পৃষ্ঠায় (মূল বইয়ের ৯০-৯৫ : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ), জগদীশচন্দ্র ঘোষ (১৩৪০, ৩৩৮-৩৬০) 'বাক্য-পদ-বিন্যাস ও পদান্বয়' আলোচনা করেছেন বাইশ পৃষ্ঠায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯, ৪২৭-৪৪২) বিশাল *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*-এ বাক্য আলোচনার জন্যে বরাদ্দ করেছেন ষোলো পৃষ্ঠা, আর *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*-এ (১৩৬৬, ২৮৪-৩১২) নিয়োগ করেছেন উনত্রিশ পৃষ্ঠা, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (১৯৪০, ১-১৪২) বরাদ্দ করেছেন একশো বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২২৯-২৫৯) নিয়োগ করেছেন একত্রিশ পৃষ্ঠা, মুহম্মদ এনামুল হক (১৯৫২, ২১৭-২২৮) বাক্য বর্ণনা করেছেন বারো পৃষ্ঠায়। পৃষ্ঠার হিশেব নির্দেশ করে যে বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা বাক্যকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন

নি। প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের মধ্যে একমাত্র উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসই বাক্যকে গ্রহণ করেছিলেন কিছুটা গুরুত্বের সাথে; এর পরিচয় পাই তাঁর একশো বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী বাক্যালোচনায়, এবং পুস্তকের শুরুতেই 'বাক্য-প্রকরণ' পরিচ্ছেদকে স্থান দেয়ার মধ্যে।

বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকরচয়িতাদের চোখে বাঙলা বাক্যসংগঠন ধরা পড়ে নি; বাঙলা বাক্যের অজস্র রূপ তাঁদের চোখের আড়ালে থেকে গেছে। তাঁদের বাক্য ব্যাখ্যাবর্ণনা প'ড়ে বোঝা যায় যে তাঁরা বাক্যের অনন্ততা-অসংখ্যতা অনুধাবন করতে পারেন নি; অথবা বাঙলা বাক্যের অনন্ততা-অসংখ্যতার মুখোমুখি তাঁরা বোধ করেছেন অত্যন্ত অসহায়,—যেনো তাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন অজস্র জটিল-দুর্গম-অজানা পথবিপথ-গহ্বর-পর্বত-পরিবৃত এক অজানা মহাদেশে, যার ভূগোল তাঁদের অজানা; তাই তার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন তাঁরা; এবং পালানোর পরে যে-ছিটেফোঁটা দৃশ্য তাঁদের চোখে লেগে ছিলো, তারই বিশৃঙ্খল বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের ভাষাভ্রমণকাহিনীতে। কখনো তাঁরা অন্য এলাকার মানচিত্রের আদলে এঁকেছেন বাঙলা বাক্যের মানচিত্র। যে-ব্যাকরণপুস্তকরচয়িতারা সংস্কৃতমুখি, তাঁরা সংস্কৃত বাক্যের আদলে বর্ণনা করেছেন বাঙলা বাক্য; এবং বিশেষ অসুবিধায় ভুগেছেন, কেননা সংস্কৃত ব্যাকরণে সংগঠনভিত্তিক বাক্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইংরেজি ব্যাকরণ অনুকরণকারীরা ইংরেজি বাক্যবর্ণনার কৌশল, অধিকাংশ সময় বিশৃঙ্খল-ও ভুল-ভাবে, প্রয়োগ করেছেন বাঙলা বাক্যের ওপর। ইংরেজি বাক্যবর্ণনার জন্যে যে-সমস্ত ক্যাটেগরি ব্যবহার করেছেন প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা, সেগুলোকে বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা না বুঝে খুঁজেছেন বাঙলা ভাষায়; ইংরেজি বাক্যের বাঙলা অনুবাদ পেশ করেছেন উদাহরণ হিশেবে; এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না ক'রে তাঁদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন পাঠকদের ওপর। ইংরেজি ও সংস্কৃত রীতির অস্বস্তিকর মিশ্রণও ঘটিয়েছেন অনেকে। বাক্যবর্ণনায় তাঁদের বিপর্যয়ের বড়ো কারণ তাঁরা বিষয়বস্তু ঠিকমতো শনাক্ত ও সীমাবদ্ধ করতে সমর্থ হন নি কখনো। তাঁরা যদি আলোচ্য বিষয় স্থিরভাবে শনাক্ত ক'রে সুশৃঙ্খলভাবে এগোতেন বাক্যবর্ণনায়, তবে সাফল্য অর্জিত হ'তে পারতো কিছুটা। তাঁরা প্রাথমিক ও ছোটোখাটো সমস্যার সমাধান না ক'রেই অনেক সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বড়ো বড়ো সমস্যার ওপর, এবং যতোই সমাধানের চেষ্টা করেছেন ততোই জড়িয়ে পড়েছেন উদ্ধারহীন সমস্যাজালে। তাঁরা যদি তালিকা তৈরি করতেন বিভিন্ন রকম বাক্যের, শনাক্ত করতে চেষ্টা করতেন ওই সব বাক্যের উপাদান, পর্যবেক্ষণ করতেন ওই উপাদানরাশির বিন্যাস, এবং রচনা করতেন তার সূত্র, তবে বাঙলা বাক্যের অবয়ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট হতো। বাক্য যে একরকম সংগঠন, এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় নি তাঁদের; সম্ভবত বাঙলা বাক্যের অনেকাংশে-মুক্ত শব্দক্রম তাঁদের বিভ্রান্ত ক'রে থাকবে যে বাঙলা বাক্যের কোনো রূপ নেই।

প্রথাগত বাঙলা বাক্যতত্ত্ব সব দিক দিয়েই ব্যর্থ : ব্যাকরণরচয়িতারা ঠিক মতো উপাত্ত নির্বাচন সংগ্রহ করতে পারেন নি, উপাত্ত সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ধারণা বা তত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারেন

নি, এবং উপাত্ত ব্যাখ্যাবর্ণনার জন্যে আবিষ্কার করতে পারেন নি কোনো দক্ষ প্রণালিপদ্ধতি। অত্যন্ত খণ্ড উপাত্ত তাঁরা ব্যাখ্যাবর্ণনা করেছেন ধার করা বিশৃঙ্খল প্রণালিপদ্ধতির সাহায্যে। তাই প্রথাগত বাঙলা বাক্যতত্ত্ব বাঙলা বাক্যের আধার-আধেয় সম্পর্কে আমাদের কোনো গভীরব্যাপক জ্ঞান দেয় না। অবশ্য এ-বিশাল বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতার মধ্যে সে সামান্যও সার্থকতা নেই, তা নয়; কিছু কিছু বিষয়ে প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা মোটামুটি ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছিলেন। প্রথাগত বাঙলা বাক্যতত্ত্বের প্রণালিপদ্ধতি, ও সাফল্যব্যর্থতার বিস্তৃত পরিচয় দেয়া আমার লক্ষ্য নয়; আমি শুধু বাঙলা বাক্যতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে ইঙ্গিত দিতে চাই।

২.৪.০ শব্দ ও পদ : শব্দশ্রেণীকরণ

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে দু-রকম ভাষাবস্তু বা উপাদান-শব্দ ও পদ-নির্দেশ করা হয়; এবং এদের পার্থক্য নির্দেশ করা হয় বাক্য ভিত্তি ক'রে। শব্দ বাক্যবিচ্ছিন্ন ভাষাবস্তু; পদ বাক্যে বিন্যস্ত ভাষাবস্তু। প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা শব্দ ও পদের পার্থক্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মানেন; তাই সব ব্যাকরণপুস্তকেই শব্দ ও পদের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে শব্দ ও পদের পার্থক্য নির্দেশ নিরর্থক প্রথামাত্র; এবং শব্দ ও পদ ধারণা দুটির মধ্যে পদ ধারণাটি অপ্রয়োজনীয়। বাক্যবর্ণনার প্রথম স্তর হচ্ছে শব্দশ্রেণীকরণ ; —কোনো ভাষায় যে-সমস্ত শব্দ আছে, সেগুলো বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বসে ও বিভিন্ন রকম অর্থ প্রকাশ করে; তাই শব্দরাশিকে অর্থ, ও বাক্যের স্থান অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শব্দরাশিকে শ্রেণীকরণ করা যায় না; প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা এ-বিষয়টিকে মনে রাখেন না শব্দ ও পদের পার্থক্য নির্দেশের সময়। তাই তাঁদের কাছে 'হাসিনা', 'অত্যন্ত', 'রূপসী' প্রভৃতি ভাষাবস্তু শব্দের উদাহরণ, কিন্তু যখন এগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় 'হাসিনা অত্যন্ত রূপসী' বাক্যে, তখন এগুলো হয়ে ওঠে পদের উদাহরণ। একই জিনিশকে দু-নামে ডাকার মধ্যে কোনো অন্তঃসার নেই। প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা, সম্ভবত, অবচেতনায় বাক্যকে দেখেন কোনো পা-অলা প্রাণী বা বহু-পা-অলা সরীসৃপের রূপকে, যা পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলে সামনের দিকে; তাই বাক্যে বিন্যস্ত শব্দের অভিধা দেন পদ অর্থাৎ 'পা'। কিন্তু বাক্যে এমন সব পদ পাওয়া যায়, যাদের 'পদ-প্রকরণ'-এ পদশ্রেণীকরণের সময় বিবেচনায় আনা হয় না। যেমন : 'তার চোখ সুন্দর' বাক্যে 'তার' সম্বন্ধ পদ; কিন্তু পদ-শ্রেণীর তালিকায় সম্বন্ধপদের কেনো স্থান নেই। পদ ধারণাটি অবশ্য বেশ সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারতো, যদি প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা ইংরেজি 'ফ্রেজ' ধারণাটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। বাক্যে শব্দগুলো বিভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়; আর প্রতিটি গুচ্ছ এককের মতো কাজ করে;—এমন এক বা একাধিক শব্দের গুচ্ছকে 'পদ' অভিধা দেয়া সম্ভব, ও দেয়া দরকার। যেমন : 'হাসিনা একটি জামা কিনেছে' বাক্যে চারটি শব্দ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে বসেছে : 'হাসিনা', 'একটি জামা' ও 'কিনেছে'। বাক্যটিতে আছে তিনটি পদ ও চারটি শব্দ। কিন্তু

প্রথাগত ব্যাকরণে শব্দ ও পদের এমন সুশৃঙ্খল পার্থক্য দেখানো হয় না; বাক্যে ব্যবহৃত শব্দমাত্রই পদ, আর বাক্যবিচ্ছিন্ন পদমাত্রই শব্দ। প্রথাগত পদ ধারণাটি ত্যাগ করা দরকার।

বিশশতকী বাঙলা ব্যাকরণে পাঁচ রকম পদ স্বীকার করা হয়। যেমন : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। এ-শ্রেণীকরণ সংস্কৃতানুসারী; কিন্তু ব্যাকরণরচয়িতারা যখন বিভিন্ন পদের সংজ্ঞা ও বিবরণ দেন, তখন তাঁরা ইংরেজি ব্যাকরণকেই অনুসরণ করেন। বাঙলা ব্যাকরণের উদ্ভবকাল থেকেই যে পাঁচ রকম পদ স্বীকৃত হ'য়ে আসছে, তা নয়।

আসসুম্পাসাঁউর *বাঙলা ও পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ*-এ (১৭৪৩) পদশ্রেণীকরণবিষয়ক কোনো পরিচ্ছেদ বা আলোচনা নেই; তবে বইটির নানাস্থানে 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ', 'ক্রিয়া', 'সর্বনাম' প্রভৃতি পদের নাম পাওয়া যায়। বাঙলা ভাষায় লেখা বাঙলা-ভাষার-প্রথম-ব্যাকরণ ব'লে দাবি করা পুস্তকের লেখক (দ্র তারাপদ (সম্পাদক ১৩৭৭, ৭-৪৮); আহমদ শরীফ (সম্পাদক ১৩৮০, ১১-৩৯)) পদ শব্দটিকে গ্রহণ করেন নি, তিনি শব্দশ্রেণীকরণ করেছেন 'শব্দপ্রকরণ' শিরোনামে। তাঁর শব্দশ্রেণীকরণ ও উপশ্রেণীকরণ বেশ শিহরণজাগানো। তিনি প্রথমে শব্দরাশিকে বিভক্ত করেছেন মাত্র তিনটি শ্রেণীতে : 'নাম', 'ক্রিয়া', আর 'অব্যয়'; এবং তারপর অবিরাম ক'রে গেছেন চাঞ্চল্যকর উপশ্রেণীকরণের পর উপশ্রেণীকরণ। 'নাম'কে প্রথমে তিনি ভাগ করেছেন তিন ভাগে : 'দ্রব্যবাচক', 'গুণবাচক', ও 'অনুকরণ'। এরপর 'দ্রব্যবাচক'কে ভাগ করেছেন তিন ভাগে : 'নামবাচক', 'জাতিবাচক', 'ভাববাচক'। 'ভাববাচক'-এর আবার দুটি শ্রেণী : 'ভাববাচক', ও 'ক্রিয়াবাচক'। দ্রব্যবাচক নাম'কে শুধু অর্থানুসারে ভাগ ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবেও ভাগ করেছেন দু-ভাগে : 'স্বরান্ত শব্দ', ও 'ব্যঞ্জনান্ত শব্দ'-এ। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি 'সর্বনাম' শব্দেরও বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু তা 'নাম'-এর কোন শ্রেণীভুক্ত, তা নির্দেশ করেন নি। ক্রিয়া প্রসঙ্গে তিনি নানা জটিলতায় জড়িয়ে প'ড়ে শ্রেণীভাগের কথা বিস্মৃত হন; কিন্তু 'অথ অব্যয়'-এ এসে প্রথমেই নির্দেশ করেন যে অব্যয় চার প্রকার : 'ক্রিয়ার বিশেষণ', 'উপসর্গ', 'দ্যোতক', ও 'বাচক'। শ্রেণীকরণের মানদণ্ড তিনি ব্যাখ্যা করেন নি; তবে আমরা বুঝতে পারি তিনি প্রথাসম্মতভাবে মিশ্র আর্থ-রৌপ মানদণ্ড প্রয়োগ করেছেন। প্রথমে তিনি যখন শব্দরাশিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন, তখন তিনি রৌপ মানদণ্ডে পৃথক ক'রে নেন অব্যয়কে, এবং আর্থ মানদণ্ডে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেন নাম ও ক্রিয়ার। চার রকম অব্যয়, এবং নাম ও ক্রিয়া ধ'রে তিনি মোট ছ-রকম শব্দ স্বীকার করেন : 'নাম', 'ক্রিয়া', 'ক্রিয়ার বিশেষণ', 'উপসর্গ, 'দ্যোতক' ও 'বাচক'। রামমোহন (১৮৩৩, ৩৭২-৪০৯) আর্থ মানদণ্ডে সমস্ত শব্দকে—পদকে—দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। একটির নাম দিয়েছেন তিনি 'বিশেষ্য'; অন্যটির নাম, বিস্ময়করভাবে, দিয়েছেন তিনি 'বিশেষণ'। রামমোহন সে-শব্দকেই বিশেষ্য বলেন 'যে শব্দের অর্থ প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়'; আর বিশেষণ হিশেবে নির্দেশ করেন তিনি সে-শব্দকে 'যাহার অর্থ অপ্রাধান্যরূপে বুদ্ধির বিষয় হয়'। 'প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের বিষয়' ও

'অপ্রাধান্যরূপে বুদ্ধির বিষয়' বেশ দুরূহ মানদণ্ড; তাই পাঠকের পক্ষে কোনো কিছুকে 'প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের' বা 'অপ্রাধান্যরূপে বুদ্ধির' বিষয় হিশেবে শনাক্ত করা কঠিন। তাঁর সিদ্ধান্ত বোঝার জন্যে সাহায্য নেয়া দরকার তাঁরই উদাহরণের। 'রাম যাইতেছেন', 'রাম সুন্দর' বাক্যে, রামমোহন বলেন, 'রামের জ্ঞান প্রাধান্যরূপে হয়, এ নিমিত্তে রাম বিশেষ্য'; আর 'রাম যাইতেছেন', 'রাম সুন্দর' বাক্যে, তাঁর মতে, "যাইতেছেন' ও 'সুন্দর' এই দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ কারণ বিশেষণ পদ কহে।' এটা বিস্ময়কর যে রামমোহন সর্বশক্তিমান ক্রিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণারূপে না নিয়ে বিশেষণকে গ্রহণ করেছেন প্রধান শব্দ-শ্রেণীরূপে। এরপরে তিনি উপশ্রেণীকরণে মন দেন, এবং বিশেষ্যকে বিভক্ত করেন দুটি প্রধান শ্রেণীতে : শ্রেণী দুটির কোনো নাম দেন নি তিনি, শুধু নির্দেশ করেছেন যে বিশেষ্যের (এর বিকল্প অভিধা 'নাম') একটি শ্রেণী 'বহিরিন্দ্রিয়ের' হয়, এবং অন্য শ্রেণীটির 'উপলব্ধি কেবল অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা হয়'। 'বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর' বিশেষ্যকে তিনি ভাগ করেছেন 'ব্যক্তি সংজ্ঞা', 'সাধারণ সংজ্ঞা', 'সর্বসাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা' প্রভৃতি শ্রেণীতে। সর্বনামকেও তিনি নির্দেশ করেছেন বিশেষ্যের একটি শ্রেণীরূপে, এবং নাম দিয়েছেন 'প্রতিসংজ্ঞা'। বিশেষণকে ভাগ করেছেন তিনি সাত ভাগে : 'গুণাত্মক বিশেষণ' ('ভাল, মন্দ'), 'ক্রিয়াত্মক বিশেষণ' ('মারি, মারিবে'), 'ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ' ('প্রহার করত' অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়া), 'বিশেষণীয় বিশেষণ' ('শীঘ্র, মৃদু'), 'সম্বন্ধীয় বিশেষণ' ('প্রতি, হইতে'), 'সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ' ('যদি, কিন্তু, ও'), ও 'অন্তর্ভাব বিশেষণ' ('হায়, আঃ, উঃ')। প্রধান দু-রকম 'বিশেষ্য'— 'নাম', ও 'প্রতিসংজ্ঞা', ও সাত রকম 'বিশেষণ' মিলে রামমোহন মোট নয় শ্রেণীর পদ স্বীকার করেন।

কালক্রমে প্রধান পাঁচ শ্রেণীর শব্দ বা পদ স্বীকার বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতাদের মধ্যে প্রথায় পরিণত হয়। তবে প্রধান পদগুলোকে এমনভাবে উপশ্রেণীকরণ করা হয় যে পদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়; অন্তত ছ-টিতে পরিণত হয় : 'বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও অব্যয়'। অনেক ব্যাকরণরচয়িতা শব্দের শ্রেণীকরণে নিরর্থক বা তাৎপর্যহীন শ্রেণীকরণপ্রতিভাও দেখিয়ে থাকেন। যেমন : মুহম্মদ এনামুল হক (১৯৫২, ১২৯) শব্দ-সমূহকে প্রথমে দুটি প্রধান ভাগে —'নাম-পদ' ও 'ক্রিয়াপদ'—ভাগ করেছেন; পরে ক্রিয়াপদকে অবিভাজ্য রেখে 'নাম-পদকে'—'বিশেষ্য', 'সর্বনাম', 'বিশেষণ', 'অব্যয়'—চারভাগে ভাগ করেছেন। তিনি, অন্যদের মতোই, প্রথম শ্রেণীকরণের মানদণ্ড ব্যাখ্যা করেন নি এবং 'নাম-পদ'কে কেনো চারভাগে ভাগ করতে হলো, বিশেষণ ও অব্যয়কে কেনো নাম-পদের অন্তর্ভুক্ত করতে হলো, তা ব্যাখ্যা করেন নি। এমন বিভাগ তাৎপর্যহীন শ্রেণীকরণপ্রবণতার উদাহরণ। এর তুলনায় উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের (১৯৪০, ৮৪-৮৮) একান্ত ব্যক্তিগত শব্দশ্রেণীকরণ অনেকটা মূল্যবান, যদিও পরিশেষে তাঁর শ্রেণীকরণ প্রথার পায়েই অবনত হয়। তিনি প্রথমে শব্দ বা পদসমূহকে ভাগ করেছেন দু-ভাগে; 'সবিভক্তিক' ও 'অবিভক্তিক' পদে। এরপর শুরু হয় তাঁর

উপশ্রেণীকরণ'—সবিভক্তিক পদকে তিনি দু-ভাগে—'নামিক পদ' ও 'কারিক পদ'—ভাগ করেন; পুনরায় নামিক পদকে ভাগ করেন 'নামপদ' ও 'প্রতিনামপদ'-এ। কারিক পদ বা ক্রিয়াকে তিনি শ্রেণীবিভক্ত করেন নি। অবিভক্তিক পদকে তিনি ভাগ করেন দু-ভাগে : 'সব্যয়' ও 'অব্যয়' পদে। সব্যয় পদের প্রচলিত নাম 'বিশেষণ'; এবং একে তিনি 'নামিক-বিশেষণ'. 'ক্রিয়া-বিশেষণ' ও 'বিশেষণীয় বিশেষণ'-এ বিভক্ত করেন। অব্যয় পদ, তাঁর কাছে, দু-রকম : 'আশ্রিত' ও 'আশ্রয়হীন' অব্যয়। আশ্রিত অব্যয় পদ, পুনরায়, দু-রকম : 'অন্বয়ী-পদ' ও 'সংযোজক পদ'। এমন শ্রেণীকরণ ও উপশ্রেণীকরণ উপাত্তের নতুন বিন্যাসমাত্র, যা মূল্যবান নয়। কারণ তাঁর শ্রেণীকরণের ও উপশ্রেণীকরণের শেষভাগে এসে হিশেব নিলে বোঝা যায় তাঁর প্রধান পদসংখ্যা পাঁচ : 'নাম-পদ' (বিশেষ্য), 'প্রতিনাম-পদ' (সর্বনাম), 'কারিক পদ' (ক্রিয়াপদ), 'বিশেষণ', ও 'অব্যয়'। তাঁর এতোখানি শ্রম যে ব্যর্থ হলো, তাঁর কারণ এ-উদ্যমশীল ব্যাকরণপ্রণেতা নতুন সুশৃঙ্খল মানদণ্ড বের করতে পারেন নি; মৌলিকত্ব ও অভিনবত্বের ছদ্মবেশে, না বুঝে, তিনি করেছেন প্রথাপরিক্রমা।

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে শব্দ ও পদের নিম্নরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় :

(৩৮) বৈয়াকরণেরা শব্দকে বর্ণের দ্বারা বিভক্ত করেন, সেই প্রত্যেক বর্ণ শব্দের আমূল হয় (রামমোহন (১৮৩৩, ৩৬৮))।

বাক্য হইতে বিচ্যুত, অন্য কোনও পদের সহিত সম্বন্ধহীন এবং কোনও রূপ সম্বন্ধের চিহ্নহীন একটিমাত্র বাক্যাংশকে, ক্রিয়া-ভিন্ন স্থলে, পদ না বলিয়া শব্দ বলা হইয়া থাকে (দেবকুমার (? ১৩৩৯, ৪))।

অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৩))।

পূর্বে ও পরে কিঞ্চিৎ বিরাম-যুক্ত অর্থবোধক ধ্বনিকে অথবা একত্র উচ্চারিত ধ্বনি-সমষ্টিকে শব্দ কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৮৪))।

বাংলায় শব্দ বলিতে মানবকণ্ঠনির্গত এক বা একাধিক সার্থক (অর্থযুক্ত) ধ্বনিসমষ্টি বুঝায়; অথচ এইরূপ এক ধ্বনিসমষ্টির সহিত আর এক ধ্বনিসমষ্টির কোন অন্বয় থাকে না (মু এনামুল (১৯৫২, ৩৭))।

স্পষ্টার্থক ধ্বনিকে বলে শব্দ (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২১২))।

মানুষের ভাব ও বস্তুর প্রতীককে বলা হয় শব্দ (মুনীর ও অন্যান্য (১৯৭৬, ৬))।

(৩৯) এক বর্ণ কিংবা বহু বর্ণ একত্র হইয়া যখন কোন এক অর্থকে কহে, তখন তাহাকে পদ কহা যায় (রামমোহন (১৮৩৩, ৩৬৮))।

বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে (নকুলেশ্বর (১৩১৫, ৭))।

বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বা সম্বন্ধযোগ্য ভিন্নভিন্ন বাক্যাংশগুলি পদ (দেবকুমার (? ১৩৩৯, ৩))।

বাক্যের প্রত্যেক অর্থবিশিষ্ট অংশকে পদ বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৩))।

বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৮৪))।

বাক্যের অবস্থান-পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত (অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত) শব্দের নাম পদ (মু এনামুল (১৯৫২, ১২৯))।

বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি কথাকে পদ বলে (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৪৮))।

বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলা হয় (মুনীর ও অন্যান্য (১৯৭৬, ২০৪))।

(৩৮)-এ সংগৃহীত শব্দের সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে রামমোহনের (১৮৩৩) সংজ্ঞাটি দুর্বোধ্য, আর মুনীর ও অন্যান্যের (১৯৭৬) সংজ্ঞাটি বিভ্রান্তিপূর্ণ। অন্য সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে বেশ মিল রয়েছে ; দেবকুমার ছাড়া অন্য সবাই শব্দের সংজ্ঞা রচনা করেছেন ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে' ; —তাঁদের কাছে অর্থসম্পন্ন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছই শব্দ। শুধু দেবকুমার শব্দের সংজ্ঞা রচনা করেছেন রূপতাত্ত্বিক-বাক্যিক মানদণ্ড ভিত্তি ক'রে। শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনেকটা গ্রহণযোগ্য হ'লেও এর মাঝে ফাঁক রয়েছে। ফাঁকটা এখানে যে ব্যাকরণরচয়িতারা বাক্যবর্ণনার সময় শব্দকে ধ্বনিগুচ্ছ ব'লে মানেন না; তখন শব্দ তাঁদের কাছে একরকম অর্থসম্পন্ন ভাষাবস্তু বা একক, যা বাক্যে ব'সে পদ নাম ধারণ করে। তাই শব্দের সংজ্ঞা রচিত হওয়া উচিত রূপতাত্ত্বিক-বাক্যিক মানদণ্ডে। ব্যাকরণপ্রণেতারা শব্দের সংজ্ঞা রচনায় ধ্বনিতত্ত্ব দ্বারা যতোই প্রভাবিত হোন-না-কেনো, যখন তাঁরা উদাহরণসহ শব্দ ও পদ ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁরা অজ্ঞাতসারে রূপতত্ত্বকেই মেনে নেন। প্রথাগত ব্যাকরণে শব্দ ও পদের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় :

(৪০) 'উমা', 'বুদ্ধিমতী' এবং 'মেয়ে'—পৃথকভাবে এই তিনটি-ই শব্দ, এবং প্রত্যেকটি শব্দেরই বিশিষ্ট অর্থ আছে। এই তিনটি শব্দকে গুছাইয়া যদি এক সঙ্গে বলা যায় 'উমা বুদ্ধিমতী মেয়ে' তাহা হইলে সেই উক্তি হইল একটি একক সম্পূর্ণ রূপের সার্থক উক্তি। 'উমা বুদ্ধিমতী মেয়ে'—ইহা একটি বাক্য; এই বাক্যের অন্তর্গত 'উমা', 'বুদ্ধিমতী' ও 'মেয়ে' প্রত্যেকটি-ই হইতেছে 'পদ'। আলাদা আলাদাভাবে এই তিনটি কথার প্রত্যেকটিই 'শব্দ', কিন্তু ঐ বাক্যের অংশ হিসাবে প্রত্যেকটি-ই 'পদ' (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৪৮))।

সংজ্ঞায় যা-ই ব্যক্ত হোক-না-কেনো, প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা শব্দ ও পদের পার্থক্য নির্দেশের জন্যে (৪০)-এর মতো ব্যাখ্যা-ভাষ্য দেন। (৩৯)-এর পদসংজ্ঞাগুলোর মধ্যে রামমোহনের সংজ্ঞাটিকে মনে হয় শব্দের সংজ্ঞা;—তিনি সার্থ বর্ণ (অর্থাৎ ধ্বনি) বা বর্ণগুচ্ছকে মেনে নিয়েছেন পদ ব'লে। পদকে যে বাক্যের অংশ হ'তে হবে, এমন কেনো শর্ত আরোপ করেন নি তিনি; তবে পদব্যাখ্যার সময় তিনি পদকে বাক্যান্তর্গত শব্দ ব'লেই বিবেচনা

করেছেন। পদের অন্য সংজ্ঞাগুলো প্রকাশ করছে একই বক্তব্যে যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দই পদ, যদিও সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে ভাষাগত বৈষম্য রয়েছে।

সংজ্ঞাগুলোতে অস্পষ্টতা ও বিশৃঙ্খলাও রয়েছে প্রচুর। যেমন : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাক্যের 'প্রত্যেক অর্থবিশিষ্ট অংশকে' পদ হিশেবে নির্দেশ করেছেন; কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেন নি কীভাবে শনাক্ত করতে হবে বাক্যের 'প্রত্যেক অর্থবিশিষ্ট অংশকে'। 'একটি রূপসী মেয়ে এলো' বাক্যের অর্থবিশিষ্ট অংশ কোনগুলো? মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলবেন যে বাক্যটিতে আছে চারটি অর্থবিশিষ্ট অংশ : 'একটি', 'রূপসী', 'মেয়ে', 'এলো'; কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে পদের শ্রেণীসমূহের মধ্যে 'একটি'র কোনো স্থান নেই। আসলে প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা পদশনাক্তির সময় প্রভাবিত হন বাক্য-লেখন-পদ্ধতি দ্বারা : লেখার সময় যে-সমস্ত ভাষাবস্তুকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়, তাদেরই ব্যাকরণপ্রণেতারা বলেন 'পদ'। সুনীতিকুমার 'বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি কথা'কে পদ হিশেবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু তিনি 'কথা' ধারণাটির কোনো সংজ্ঞা-ব্যাখ্যা দেন নি। তাই তাঁর সংজ্ঞা বিশৃঙ্খল। (৩৯)-এর সংজ্ঞাগুলোর সারকথা হচ্ছে : বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তি-যুক্ত বা-অযুক্ত শব্দমাত্রই পদ। পদের প্রথাগত এ-ধারণাটি বাক্যবর্ণনায় কোনো উপকারে আসে না; কেননা শব্দের ধারণা দিয়েই পদের কাজ চমৎকারভাবে চালানো সম্ভব। তবে পদ-ধারণাটিকে ব্যবহার করা যায় অন্যভাবে : বাক্যের যে-সমস্ত শব্দ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে, এবং বাক্যকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত ক'রে বাক্যের শব্দস্তরক্রমের পরিচয় দেয়, তাদের নির্দেশ করা সম্ভব 'পদ' ধারণাটি দিয়ে।

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে স্বীকৃত প্রধান পাঁচ শ্রেণীর পদের সংজ্ঞা, শুধু অব্যয়ের সংজ্ঞা বাদে, রচিত হয় ইংরেজি ব্যাকরণের বিভিন্ন 'পার্টস অফ স্পিচ'-এর সংজ্ঞার অনুকরণে। পাওয়া যায় নিম্নরূপ সংজ্ঞা :

(৪১) যে শব্দের অর্থ প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে বিশেষ্য কহে (রামমোহন (১৮৩৩, ৩৭২))।

যাহা দ্বারা জাতি, গুণ, দ্রব্য, ব্যক্তি বা ক্রিয়া বোধ হয়, তাহাকে বিশেষ্য কহে (প্রসন্নচন্দ্র (১৮৮৪, ১৮৫))।

যে সব পদ কোনও বস্তুর, ব্যক্তির, কাজের বা অবস্থার নাম বুঝায়, সেই সকল পদকে নাম, সংজ্ঞাপদ বা বিশেষ্যপদ বলা হয় (দেবকুমার (? ১৩৩৯, ১১))।

যে পদে ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, বা সমষ্টির নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৪০))।

যে জাতীয় পদে কোন কিছুর নাম বুঝায় তাহাকে নাম-পদ কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৮৯))।

বাক্য-মধ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যক্তি, বস্তু, গুণ, স্থান, কাল, ভাব ও ক্রিয়া প্রভৃতির নামকে—বিশেষ্য-পদ বা নাম-পদ বলে (মু এনামুল (১৯৫২, ১৩০))।

যে পদে কোন কিছুর 'নাম'—জীব, বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, ক্রিয়া, ভাব বা গুণের নাম—বুঝায়, তাহাকে বলে বিশেষ্য (বা নাম) (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৪৯))।

(৪২) যাহার অর্থ অপ্রাধান্যরূপে বুদ্ধির বিষয় হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে (রামমোহন (১৮৩৩, ৩৭২))।

যদ্বারা বিশেষ করা যায়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করা হয়, তাহাকে বিশেষণ কহে (প্রসন্নচন্দ্র (১৮৮৪, ১৮৫))।

যে পদ বিশেষ্য-পদের বিশেষত্বটি বা গুণটি প্রকাশ করিয়া বিশেষ্য পদকে অন্য হইতে বিশিষ্ট করিয়া তুলে, সেইরূপ, বিশেষত্ব-বাচক বা গুণবাচক পদকে বিশেষণ পদ বলা হয় (দেবকুমার (?১৩৩৯, ১২))।

যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের দোষগুণ, অবস্থা বা সংখ্যা বিশেষরূপে বুঝায়, তাহাকে বিশেষণ বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৪১))।

যে পদ বাক্য-মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য-পদের অধীন অবস্থায় থাকিয়া ঐ বিশেষ্যের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি বুঝায়, সেই পদকে বিশেষণ বলে (মু এনামুল (১৯৫২, ১৩২))।

যে পদ বিশেষ্য বা অন্য কোনও পদকে 'বিশেষিত' করে, অন্য কোনও পদের অর্থকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে, তাহাকে বলে বিশেষণ (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৪৯))।

(৪৩) ঐ নামের মধ্যে কতিপয় শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নির্ধারিত হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশেষবিশেষ ব্যক্তিকে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তিসমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করে না, ওই সকলকে প্রতিসংজ্ঞা কহি (রামমোহন (১৮৩৩, ৩৭৩))।

যে পদ আবশ্যক হইলে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি বা ভাব-বিশেষকেও বুঝাইতে পারে, অথচ তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া সকলকেও বুঝাইতে পারে, সেইরূপ পদই সর্বনাম পদ (দেবকুমার (?১৩৩৯, ১১-১২))।

যে পদ অন্য কোনও পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সর্বনাম বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৪১))।

যে পদ নাম-পদের পরিবর্তে বসিয়া বাক্যে তাহারই অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাকে প্রতিনাম-পদ কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৮৫))।

পূর্ববর্তী বাক্যে বা বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য-পদের পরিবর্তে যে-পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সর্বনাম পদ বলে (মু এনামুল (১৯৫২, ১৩১))।

বাক্যের মধ্যে অথবা পূর্ববাক্যে ব্যবহৃত কোনও 'নাম'-পদের অর্থাৎ বিশেষ্য বা বিশেষ্যার্থক কোনও পদের (বা পদসমূহের) পরিবর্তে, পূর্ববর্তী কোনও বাক্য বা বাক্যাংশ কিংবা প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হইলে তাহার যথাযথ পুনরাবৃত্তি না করিয়া তাহার পরিবর্তে—'সে', 'সব', 'ইহা', 'এই', 'উহা' ইত্যাদি যে সমস্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বলে সর্বনাম (বা প্রতিনাম) (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৪৯))।

(৪৪) বিশেষণ শব্দের মধ্যে যাহার কালের সহিত সম্বন্ধপূর্বক বস্তুর অবস্থাকে কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি (রামমোহন (১৮৩৩, ৩৭৩))।

যে পদ দ্বারা কোনও বিশেষ কালে সম্পন্ন ক্রিয়া বুঝায় তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৪২))।

বাক্যে ব্যবহৃত যে সব পদে (সাধারণত মন ও অঙ্গচালনা বা স্থিতিবোধক) কোন কিছু কার্য করা বা না করা বুঝায়, তাহাদিগকে কারিক পদ বা ক্রিয়াপদ কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৮৫))।

যে-পদের দ্বারা খাওয়া, করা, হওয়া প্রভৃতি কাজ বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া-পদ বলে (মু এনামুল (১৯৫২, ১৩৬))।

বাক্যের অন্তর্গত যে-পদে কোনও কালের ও কোনও প্রকারের ক্রিয়া-ব্যাপার (অর্থাৎ 'করা, যাওয়া, হওয়া, থাকা, ঘটা' প্রভৃতি ব্যাপার) বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে (সুনীতিকুমার (১২৬৬, ৫০))।

(৪৫) যে পদ একটি বাক্যের মধ্যে কখনও লিঙ্গ-বিভক্তি-বচন-গত কোনও পরিবর্তনের অধিকারভুক্ত হয় না, তাহাকে 'অব্যয়'-পদ বলা হয় (দেবকুমার (?১৩৩৯, ১০৩))।

যে পদের কোন অবস্থায় আকৃতির ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাহাকে অব্যয় বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৪২))।

যে জাতীয় পদ বিভক্তি বা প্রত্যয় কিছুই গ্রহণ করে না এবং সব সময় একই আকারে থাকে তাহাদিগকে অব্যয় পদ কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৮৬))।

যে-পদ লিঙ্গ, বচন ও কারকে 'শূন্য-বিভক্তি'-সংশ্লিষ্ট অশ্রুত ও অদৃষ্ট পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের পরিবর্তন-সাপেক্ষ নহে, বাংলা ভাষায় তাহাকে অব্যয় বলে (মু এনামুল (১৯৫২, ১৩৫))।

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হইবার সময়ে কোনও অবস্থাতেই যে শব্দের মূল রূপের কোন ব্যয় অর্থাৎ পরিবর্তন হয় না, তাহাকে অব্যয় বলা হয় (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৫১))।

(৪১-৪৫)-এর সংজ্ঞাগুলো নির্দেশ করে যে বিভিন্ন পদ সম্পর্কে বাঙলা ব্যাকরণবিদ-সম্প্রদায় একমত, যদিও তাঁদের সংজ্ঞার ভাষা বিভিন্ন। তাঁদের পদশনাক্তির মানদণ্ড মিশ্র : পাঁচটি পদ নির্ণয় করার জন্যে তাঁরা ব্যবহার করেন চার রকম মানদণ্ড। রূপতাত্ত্বিক মানদণ্ড ব্যবহার ক'রে একশ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ', 'সর্বনাম', ও 'ক্রিয়া'কে; এবং অন্য শ্রেণীতে বিন্যস্ত হয় 'অব্যয়' শব্দাবলি। আর্থ মানদণ্ডে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় 'বিশেষ্য' ও 'ক্রিয়া'র; এবং এ-দুটিকে বিবেচনা করা হয় প্রধান শব্দশ্রেণীরূপে। সর্বনাম শনাক্ত করা হয় প্রাতিকল্পনিক মানদণ্ডে; অর্থাৎ তা-ই সর্বনাম, যা বিশেষ্যশব্দের বিকল্পে বসতে পারে; আর বিশেষণ শনাক্ত করা হয় বিশেষ্য ও ক্রিয়াশব্দের সাথে জড়িত ক'রে। বিশেষ্য ও ক্রিয়া যেনো মূল গ্রহ, যাদের কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয় বিশেষণ। এমন শ্রেণীকরণ ও শনাক্তি বাক্যের শব্দরাশির অনেক বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সুশৃঙ্খলভাবে ভাষার সমস্ত শব্দ শনাক্ত ও শ্রেণীকরণ করে না। শব্দশনাক্তি ও শ্রেণীকরণের শুরুতেই যে-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নেয় শব্দ-উপশ্রেণীকরণের সময়। তাই আমরা আজো স্পষ্টভাবে জানি না আসলেই কতো শ্রেণীর শব্দ আছে বাঙলায়।

২.৪.১ বাঙলা বাক্যতত্ত্বের উপাত্ত

বাঙলা ভাষায়, যে-কোনো ভাষার মতোই, বাক্য অসংখ্য; এবং তাদের সাংগঠনিক বৈচিত্র্য-জটিলতাও বিপুল। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা এড়িয়ে যান বাক্যের ব্যাপকতা বিপুলতাকে, বর্ণনা করেন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ উপাত্ত; এবং এমন ধারণা সৃষ্টি করেন যে বাক্য এক গৌণ ব্যাপার, যা বিস্তৃত বিশ্লেষণের বিষয় হ'তে পারে না। কিন্তু সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত : অসংখ্য অনন্ত বাক্যের বিশ্লেষণ ব্যাপকবিস্তৃত হওয়াই স্বাভাবিক। বাক্যের ব্যাপকতা বিপুলতাই প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতাদের বড়ো শত্রু;—বাক্যের এলাকাটি এতো বড়ো যে তার সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছোতে পারেন নি প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা; স্থির করতে পারেন নি আলোচনা-বিশ্লেষণের জন্যে গ্রহণ করবেন কী কী বিষয়, এবং কোন বিষয়ের আলোচনা করবেন আগে, কোন বিষয়ের পরে। এমন বিমূঢ়তাবশত তাঁরা এ-বিষয় সে-বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, ও সৃষ্টি করেছেন বিভ্রান্তি। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বের সাধারণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে : 'বাক্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণ', 'বাক্যের অবয়ব ও উপাদান', 'বাক্যশ্রেণীকরণ'—'সরল', 'যৌগিক', ও 'জটিল বাক্য' নির্ণয় ও বিশ্লেষণ, 'বাক্যের প্রকার পরিবর্তন', 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি', 'বাচ্য', 'পদক্রম', 'বাক্য সংক্ষেপণ' প্রভৃতি। কেউ কেউ এসবের বাইরের কিছু বিষয়ও নেন আলোচনায়। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বের যে-বিষয়সূচি ওপরে দেখানো হলো; তা শুধু সংকীর্ণই নয়, বিশৃঙ্খলও। বাক্যের বিশ্লেষণে, আশা করতে পারি, পাওয়া যাবে বাক্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ; থাকবে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের বিস্তৃত পরিচয়; এবং বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশিত হবে বিস্তৃতভাবে। প্রথাগত ব্যাকরণ এ-বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা কিছুটা মেটায়, কিন্তু

অচিরেই হতাশ হই যখন দেখি এ-সমস্ত বিষয়ে প্রথাগত বিশ্লেষণ অত্যন্ত অগভীর ও সংক্ষিপ্ত। এরপরেই প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা আমাদের ঠেলে দেন বিভ্রান্তির জগতে : 'বাক্যের প্রকার পরিবর্তন', 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি', 'বাক্য সংক্ষেপণ' প্রভৃতির মতো নানা বিষয় মনে প্রশ্ন জাগায় : এগুলো কেনো এতো শিগগির স্থান পেলো, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক আর কিছু কি নেই, যা বিশ্লেষিত হ'তে পারতো ব্যাপকভাবে? আছে অনেক কিছুই; কিন্তু সে-সব বিষয় প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতাদের চোখে ধরা পড়ে নি, ও পড়ে না।

বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ আসসুম্পসাঁউর *বাঙলা ও পোর্তোগিজ ভাষার শব্দকোষ*-এ (১৭৪৩) 'সিন্ট্যাক্সিস' বা 'বাক্য-যোজনা' (দ্র সুনীতিকুমার ও প্রিয়রঞ্জন (সম্পাদক-অনুবাদক (১৯৩১)) নামে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এতে তিনি বাঙলা বাক্যের সংগঠন, বাক্যের উপাদান, বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণী ইত্যাদি আলোচনার বিষয় করেন নি, বরং বাঙলা বাক্যের কয়েকটি গৌণ সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন উনিশটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে। বাক্যে কী-রকম ক্রিয়ার সাথে কী-রকম কর্তা বসে, কখন কর্তা উহ্য থাকে, কখন স্পষ্ট ব্যক্ত হয়, কর্তা ও ক্রিয়ারূপের মধ্যে কী-রকম সঙ্গতি থাকে, কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সংযোজক প্রভৃতি নির্দেশ করেছেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ নির্দেশই আপাতনির্ভুল, তবে একটু গভীরে গেলেই ওগুলোর ত্রুটি ধরা পড়ে। আসসুম্পসাঁউর বাঙলা বাক্যালোচনা অংশ জানায় যে বাঙলা বাক্যের আলোচ্য বিষয় স্থির করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাঙলায় বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণপ্রণেতা (দ্র তারাপদ (সম্পাদক ১৩৭, ৫০-৫৪); আহমদ শরীফ (সম্পাদক ১৩৮০, ৪১-৪৪)) 'অথ বাক্যরচনা প্রকরণ' অংশে বাঙলা বাক্যগঠনের কতিপয় সূত্র, বিশৃঙ্খলভাবে, বর্ণনা করেছেন। বাক্যের উপাদান-অবয়ব সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি, বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন না। তিনি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি পদ, বিশেষ্যের সাথে বিশেষণের লিঙ্গগত সঙ্গতি, কিছু কিছু পদের ক্রম, কর্তা ও ক্রিয়ারূপের সঙ্গতি, বিভক্তির ব্যবহার, সর্বনামের সম্মান-হীনাত্মক প্রয়োগ, প্রশ্নাত্মক-নিষেধাত্মক শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল ও ত্রুটিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যেমন : কর্তা-ক্রিয়ারূপের সঙ্গতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'পুরুষেতে, বচনেতে, ও উক্তিতে কর্তা-ক্রিয়ারূপের সঙ্গতিতে বচনের কোনো ভূমিকা নেই। 'উক্তিতে' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তাও অস্পষ্ট। রামমোহন রায় (১৮৩৩) বাক্য আলোচনা করেছেন 'অন্বয় প্রকরণ' শিরোনামে। তাঁর আলোচনাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি বাক্যের উপাদান, সঙ্গতিসূত্র, বিভক্তিপ্রয়োগ, পদক্রম, সম্বোধনের সামাজিক রীতি প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনাও সুশৃঙ্খল-সুচিন্তিত নয়; বাক্যতত্ত্বের বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তিনি পোষণ করেন নি। তবে তাঁর পূর্ববর্তী ব্যাকরণপ্রণেতাদের চেয়ে তিনি অনেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। প্রথমেই তিনি বাক্যের মৌল উপাদান নির্দেশ করেছেন এভাবে (১৮৩৩, ৪০৯) : 'এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্তত দুই শব্দের অন্বয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া উহ্য হউক কিম্বা উক্ত হউক, মিলিত হইয়া যায়।' মৌল উপাদান নির্দেশের পরে

তিনি আর এগোন নি দীর্ঘ বাক্যের উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে; তবে তিনি নির্দেশ করেছেন যে 'নামের সহিত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ও ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবিশেষণ শব্দের প্রয়োগ হইয়া এক বাক্যে অনেক শব্দের সঙ্কলন হইতে পারে; কিন্তু বাক্য দুই শব্দের ন্যূনে কদাপি হয় না।' কর্তা-ক্রিয়ারূপের সঙ্গতির সূত্রটিও তিনি অনেকটা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। তিনি (১৮৩৩, ৪০৯) সূত্রটি নির্দেশ করেন এভাবে : 'অভিহিত পদের প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ভেদেই ক্রিয়ার রূপান্তর হইয়া থাকে, লিঙ্গ এবং সংখ্যাতে কোন বিশেষ নাই।' তিনি বিস্তৃত বিশ্লেষণে প্রবেশ করেন নি, এক নিশ্বাসে বাঙলা বাক্যের অনেকগুলো নিয়ম ব'লে গেছেন।

পরবর্তী প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে, ও সম্ভবত মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদের পাঠ্যসূচির নির্দেশে, স্থির করেন তাঁদের 'বাক্য-প্রকরণ'-এর বিষয়। কিন্তু তাঁরা কখনো ইংরেজি ব্যাকরণরচয়িতাদের মতো পরিশ্রমী হন নি; তাই উদঘাটন করতে পারেন নি বাঙলা বাক্যের শৃঙ্খলা। তাঁরা অত্যন্ত সংকীর্ণ বিষয় অগভীরভাবে বর্ণনা করেছেন; অধিকাংশ সময় তাকিয়ে থেকেছেন ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের বিশ্লেষণের দিকে, এবং তার কিছুটা প্রয়োগ করেছেন বাঙলা বাক্যের ওপর। ইংরেজি বাক্যের সংগঠনের সাথে বাঙলা বাক্যের সংগঠনকে মেলাতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন অনেকেই; এবং ভুলভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছেন বাঙলা বাক্যসংগঠন।

২.৪.২ আকাঙ্খা-যোগ্যতা-আসত্তি

অধিকাংশ প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর 'বাক্যংস্যাদযোগ্যতাকাঙ্ক্ষা-সত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ' সংজ্ঞার অনুসরণে বাক্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা শর্ত বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয় ;—শর্ত তিনটি হচ্ছে 'আকাঙ্খা' ('আকাঙ্ক্ষা'র 'আকাঙ্খা' বানানই আমি পছন্দ করি), 'যোগ্যতা', ও 'আসত্তি' (দ্র প্রসন্নচন্দ্র (১৮৮৪, ২১৯), জগদীশচন্দ্র (১৩৪০, ৩৩৮-৩৩৯), সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৮-৪২৯), কালিদাস (?, ৩৮২-৩৮৫), মু এনামুল (১৯৫২, ২১৮-২১৯))। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকে সাধারণত বাক্যের পাশ্চাত্য সংজ্ঞাটিকে—পূর্ণ ভাববোধক শব্দসমষ্টিই বাক্য—বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়; এবং ওই সংজ্ঞার পাশাপাশি সংস্কৃত সংজ্ঞাটিকেও বর্ণনা করা হয় (দ্র § ১.৪; ১.৭)। সংস্কৃত বাক্যসংজ্ঞার শর্তগুলো ব্যাখ্যা করা হয় বাক্য-পরিচ্ছেদের শুরুতে; এবং বাক্যবর্ণনা যতোই এগোতে থাকে ব্যাকরণরচয়িতারা ততোই ভুলতে থাকেন শর্তগুলো, এবং বাক্যের অবয়ব-উপাদান প্রভৃতি বর্ণনা করেন ইংরেজি রীতির অনুকরণে। শর্ত তিনটির মধ্যে 'আকাঙ্খা', 'যোগ্যতা'কে প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা গ্রহণ করেছেন আর্থ শর্তরূপে, আর 'আসত্তি'কে গ্রহণ করেন রৌপ শর্তরূপে। প্রথাগত ব্যাকরণে 'আকাঙ্খা' শর্তটির ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়; এবং যেভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাতে একে বাক্যের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব। বলা হয় যে 'কোনও বাক্য বা উক্তির পূর্ণ উদ্দেশ্য গ্রহণের জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্খা থাকে' (সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৮));

তাই কোনো শব্দগুচ্ছ যদি শ্রোতার আকাঙ্খা-আগ্রহ না মেটায়, তবে তাকে বাক্য বলা যায় না। কিন্তু শ্রোতার আকাঙ্খা বস্তুগতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং বক্তার পক্ষে স্থির করা সম্ভব নয় তার উক্তিতে শ্রোতার আকাঙ্খা মিটেছে কি মেটে নি। যদি কোনো বক্তা শ্রোতার কাছে বলে যে 'একটি মেয়ে আসবে'; এবং উদগ্রীব উৎকণ্ঠ শ্রোতা যদি তিন শব্দের ওই বাক্যে তৃপ্ত-নিবৃত্ত না হয়ে জানতে চায় মেয়েটি দেখতে কেমন, কেনো সে আসবে, এসে কী করবে, কতক্ষণ থাকবে ইত্যাদি, অর্থাৎ যদি শ্রোতার আকাঙ্খা তিন শব্দের সমষ্টিতে পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলে তো ধ'রে নিতে হবে 'একটি মেয়ে আসবে' বাক্য নয়। কিন্তু সব ব্যাকরণরচয়িতাই স্বীকার করবেন এ-শব্দগুচ্ছ চমৎকার বাক্য। প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা বিপদে পড়েছেন 'আকাঙ্খা' শব্দের পারিভাষিক অর্থ ভুলে আভিধানিক অর্থের আশ্রয় নিয়ে। আদিতে সংস্কৃত ব্যাকরণে 'আকাঙ্খা' বলতে বোঝানো হতো 'শব্দের সহাবস্থান';—এটি একটি রৌপ মানদণ্ড। বাক্যে সব রকম শব্দ পাশাপাশি বসতে পারে না, বিশেষ বিশেষ শব্দ সহাবস্থান করতে পারে বিশেষ বিশেষ শব্দের সাথে; এবং বাক্যে বিন্যস্ত করতে হয় সহাবস্থানযোগ্য শব্দরাশিকে। এ-অর্থে গ্রহণ করলে 'আকাঙ্খা' একটি চমৎকার রৌপ মানদণ্ডরূপে কাজ করতে পারে।

'যোগ্যতা'র শর্তটি আর্থ;—এটি নির্দেশ করে যে বিসঙ্গত অর্থসমষ্টি বাক্য নয়। প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা এ-শর্তটিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন; এবং এমন ধারণা সৃষ্টি করেন যে ভাষার কাজ শুধু বাস্তব-স্বাভাবিক, ও বেশ তুচ্ছ, বক্তব্য পেশ করা। তাঁদের এ-শর্তে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য অবাক্যরূপে পরিগণিত হয়। যোগ্যতাবিহীন বাক্যের উদাহরণরূপে পাওয়া যায় 'মাটিতে সাঁতার দিতেছে,' 'জলের উপরে হাঁটিয়া চলিতেছে', 'রাত্রিতে রৌদ্র হয়' ইত্যাদির মতো নিষ্প্রভ বাক্য (দ্র সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৯))। তাঁদের উদাহরণ দেখে মনে হয় তাঁরা সম্ভবপরতাকে বেশি মূল্য দেন। কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে যা এককালে অসম্ভব ছিলো, এখন সম্ভব, বা ভবিষ্যতে খুবই সম্ভবপর হয়ে উঠবে। তাই অসম্ভব অশুদ্ধ বাক্যকে শুদ্ধ করার জন্যে দরকার কোনো-না-কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার? কিন্তু বাক্যিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ও যোগ্যতাহীন অর্থাৎ আর্থত্রুটিপূর্ণ বাক্যের মধ্যে তুলনা করলে বোঝা যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্যের ত্রুটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। '*একটি ভদ্রলোক আসছি' যে বলে, তার বাক্য শুদ্ধ করার জন্যে তাকে ভাষা শেখার ক্লাশে পাঠানো দরকার; কিন্তু যে 'মাধুরীকে মেখে খাই খশখশে রুটির সঙ্গে' বলে, তাকে প্রকাশক অথবা চিকিৎসকের কাছে পাঠানো দরকার। 'আসত্তি' শর্তটি রৌপ;—এটি নির্দেশ করে যে বাক্যের যে-সমস্ত শব্দ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বাঙলা ভাষায় অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক শব্দকে তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে বসানো সম্ভব।

২.৪.৩ বাক্যের অবয়ব ও উপাদান

বাক্যের অবয়ব বিশ্লেষণে ও উপাদান নির্দেশে, এবং বাক্যশ্রেণীকরণে প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের অনুকারী। বাক্যের অনেক বৈশিষ্ট্য

সর্বজনীন;—ইংরেজি বাক্যসংগঠনের সাথে অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে বাঙলা বাক্যসংগঠনের; তাই ইংরেজি বাক্যবিশ্লেষণের কৌশল ও অনেক ক্যাটেগরি বাঙলা বাক্য বিশ্লেষণের সময় ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু এমন গ্রহণের সময় দৃষ্টি সজাগ রাখা দরকার, নইলে পদস্খলন ঘটতে পারে পদেপদে; এবং তা-ই ঘটেছে বাঙলা বাক্যবর্ণনায়। প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা অনেকটা অন্ধভাবে ধার করেছেন ইংরেজি বাক্যতত্ত্বের ক্যাটেগরিগুলো, এবং সেগুলোকে কোনোমতে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন বাঙলা বাক্যসংগঠনের সাথে। তাই তাঁদের বাঙলা বাক্যবর্ণনা মূলত ইংরেজি বাক্যবর্ণনা, যাতে উদাহরণগুলো বাঙলা ভাষায়। বেশ কিছু বাক্যিক ক্যাটেগরি ইংরেজিতে আছে, সম্ভবত আছে বাঙলায়ও; কিন্তু ইংরেজিতে যেভাবে আছে, বাঙলায় সেভাবে নেই, আছে বাঙলা-রীতি অনুসারে। কিন্তু প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা সে-ক্যাটেগরিগুলোকে বাঙলা বাক্যে অবিকল সে-স্থানে খুঁজেছেন, যেখানে ওগুলোকে পাওয়া যায় ইংরেজি বাক্যে; এবং রচনা করেছেন, বলা যাক, বাঙলা ভাষার ইংরেজি ব্যাকরণ।

বাঙলা বাক্যের উপাদান হিশেবে নির্দেশ করা হয় এসব বস্তুকে : উদ্দেশ্য (কর্তা), বিধেয় (ক্রিয়া), সম্পূরক বা পরিপূরক, এবং সম্প্রসারক। বলা হয় যে বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয় থাকতেই হয়, তবে এদের কোনোটি কোনো কোনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে। উদ্দেশ্য পালন করে কর্তার ভূমিকা, আর ক্রিয়া থাকে বাক্যের বিধেয়রূপে; এবং কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়ার সম্পূরক থাকতে পারে। সম্প্রসারক বাক্যের ঐচ্ছিক উপাদান, এর কাজ হলো উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে সম্প্রসারিত করা। সম্প্রসারক শনাক্তিতে অনেক সময় বিভ্রান্ত হন ব্যাকরণরচয়িতারা; উদ্দেশ্যের প্রসারককে বিধেয়র এবং বিধেয়র প্রসারককে উদ্দেশ্যের সম্প্রসারকরূপে নির্দেশ করেন। দুটি উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৪৬) ক শ্যাম বনে চলিতে চলিতে একটি বাঘ দেখিতে পাইল (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩১))।

খ চাটুকার পরিবৃত হইয়াই সাহেব থাকেন (মুনীর ও অন্যান্য (১৯৭২, ৩০৮))।

(৪৬ক) উদাহরণটিতে 'বনে চলিতে চলিতে' অংশকে নির্দেশ করা হয়েছে 'অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশ'-রূপী উদ্দেশ্যের প্রসারক হিশেবে; কিন্তু এটি প্রসারক বা বিশেষকরূপে বসেছে বিধেয়ক্রিয়ার। (৪৬খ) উদাহরণটিতে 'চাটুকার পরিবৃত হইয়াই' অংশকে শনাক্ত করা হয়েছে উদ্দেশ্যের প্রসারক হিশেবে; কিন্তু এ-বাক্যাংশটি উদ্দেশ্যকে বিশেষিত ও প্রসারিত করে না, বিশেষিত ও প্রসারিত করে বিধেয়ক্রিয়া 'থাকেন'কে। এ-ধরনের ত্রুটি, বিশেষ ক'রে প্রসারক ও উপবাক্য শনাক্তির ক্ষেত্রে, প্রচুর পাওয়া যায় প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকে।

উদ্দেশ্য (কর্তা), বিধেয় (ক্রিয়া), সম্পূরক, সম্প্রসারক, কর্ম (মুখ্য ও গৌণ) প্রভৃতির সংজ্ঞা ও বিবরণ প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে দেয়া হয় অবিকল ইংরেজি ব্যাকরণের প্রক্রিয়ায়

(দ্র § ২.৩.১-২.৩.১.৫); তাই এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা এসব ক্যাটেগরি ব্যাখ্যাবর্ণনার সময় খুবই যত্ন করেন ইংরেজি ব্যাখ্যা-বর্ণনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে; তাই এসব বিষয়ক আলোচনা-অংশে প্রচুর পরিমাণে উপহার দেন তাঁরা ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ-বন্ধনির মধ্যে—; এবং ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেন প্রচুর পরিমাণে। তাই বাক্যের অবয়ব ও উপাদান আলোচনা-অংশ হয়ে ওঠে বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতাদের ইংরেজি ব্যাকরণজ্ঞানের পরীক্ষাকেন্দ্র;—বিশ্লেষণের ব্যাপকতা-গভীরতা দিয়ে তাঁদের উৎকর্ষ বিচার হয় না, বিচার হয় কে কত বেশি পরিমাণে ইংরেজি ব্যাকরণকাঠামো বাঙলা ভাষার ওপর চাপাতে সমর্থ, তার দ্বারা।

২.৪.৩.১ বাক্যশ্রেণীকরণ বা বাক্যের প্রকার

বাক্যশ্রেণীকরণে বা বাক্যের 'প্রকারভেদ' নির্দেশে বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারী। তবে ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যকে দু-রকম মানদণ্ড—রৌপ ও আর্থ—অনুসারে শ্রেণীকরণ করেন ; কিন্তু বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা সাধারণত রৌপ বা আধারভিত্তিক মানদণ্ড অনুসারে বাক্য শ্রেণীকরণ করেন (দ্র § ২.৩.২-২.৩.২.২)। আর্থ বা আধেয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ বেশ দুর্লভ, তবে কেউ কেউ তেমন শ্রেণীকরণেও উৎসাহ দেখান। সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩৪-৪৩৫; ১৩৬৬, ৩০০-৩০১)) রৌপ মানদণ্ডে বাক্য শ্রেণীকরণ করার পরে অর্থানুসারে বাঙলা বাক্যরাশিকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর বাক্যের আর্থশ্রেণীগুলো হচ্ছে : 'নির্দেশ-সূচক বাক্য', 'প্রশ্ন-সূচক বাক্য', 'ইচ্ছা-সূচক বা প্রার্থনা-সূচক বাক্য', 'আজ্ঞা-সূচক বাক্য', 'কার্যকারণাত্মক বাক্য', 'সন্দেহদ্যোতক বাক্য', 'বিস্ময়াদি-বোধক বাক্য'। সুনীতিকুমার তাঁর আর্থশ্রেণীকরণের মানদণ্ড ব্যাখ্যা করেন নি। এমন অব্যাখ্যাত মানদণ্ড প্রয়োগে শো শো শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় বাঙলা ভাষার সংখ্যাহীন বাক্যকে;— ইচ্ছা করলেই তাঁর 'নির্দেশ-সূচক বাক্য'কে ভাঙতে পারি 'হ্যাঁ-সূচক' ও 'না-সূচক' বাক্যে; এবং আবিষ্কার করতে পারি 'কাতরতাসূচক', 'কামনামূলক', 'প্রতিহিংসাপরায়ণ', 'উদারতাসূচক', 'হাস্যকর', 'নিবেদনাত্মক', 'অহমিকাদ্যোতক' ইত্যাদি অনন্ত শ্রেণীর বাক্য। সুনীতিকুমার যাকে বলেছেন 'উদ্দেশ্য-বা অর্থ-অনুসারে' বাক্যের শ্রেণীকরণ, উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৮-১৪) তাকে বলেছেন 'ভাব অনুসারে' বাক্যের শ্রেণীকরণ। তিনিও সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন বাক্যকে : 'সাধারণী ভাবার্থক বাক্য', 'জিজ্ঞাসা ভাবার্থক বাক্য', 'অপেক্ষী ভাবার্থক বাক্য' 'অনিশ্চয়ী ভাবার্থক বাক্য', 'নিশ্চয়ী ভাবার্থক বাক্য', 'কামনী ভাবার্থক বাক্য', ও 'আনুজ্ঞী ভাবার্থক বাক্য'। তাঁর মানদণ্ড বা বাক্যের নাম ভিন্ন হ'লেও তা সুনীতিকুমারের মানদণ্ড ও বাক্যশ্রেণীগুলোর সাথে প্রায় অভিন্ন; এবং একই রকমে গ্রহণঅযোগ্য। কোনো কোনো ব্যাকরণরচয়িতা বেশ কৌতুককর প্রণালিতেও বাক্যশ্রেণীকরণ করেছেন : যেমন প্রসন্নচন্দ্র (১৮৮৪, ২২১) বলেন : 'বাক্য প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত; গদ্যময় ও পদ্যময়'। এ-ব্যাকরণপ্রণেতা নিশ্চিত নন তিনি ব্যাকরণলেখক না অলঙ্কারশাস্ত্রী।

বাক্যের গঠন, বা আকার, বা রূপ অনুসারে বাক্যরাশিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : 'সরল', 'জটিল', 'যৌগিক' বাক্য। জটিল বাক্যের অন্য নাম 'মিশ্র বাক্য', যদিও দু-

একজন জটিল ও মিশ্র বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের চেষ্টা করেন (দ্র উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৩৩))। অনেক ব্যাকরণপ্রণেতাই রৌপ শ্রেণীকরণের সময় উল্লেখ করতে ভুলে যান যে তাঁরা রূপ বা গঠন অনুসারে শ্রেণীকরণ করছেন (দ্র মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩২), সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩১, ২৯৭));—শুধু জানিয়ে দেন যে 'বাক্য তিন প্রকারের হইয়া থাকে।' শ্রেণীকরণে তাঁরা ইংরেজি ব্যাকরণের কৌশল ব্যবহার করেন পুনর্বিবেচনা না ক'রেই। ইংরেজি ব্যাকরণে বাক্যের রৌপ শ্রেণীকরণের আগেই উপবাক্য বা খণ্ডবাক্যের বর্ণনা দেয়া হয়; এবং বাক্যে উপবাক্যের বিন্যাসরীতি অনুসারে বাক্যকে সরল, যৌগিক, বা মিশ্র বাক্যরূপে শনাক্ত করা হয়। কিন্তু বাঙলা ব্যাকরণে উপবাক্যের ধারণা না দিয়েই ব্যাকরণপ্রণেতারা তিন শ্রেণীর বাক্যবর্ণনায় প্রবেশ করেন, এবং এক সময় হঠাৎ খণ্ড-বা উপবাক্যের বিবরণ দেন। অর্থাৎ তাঁরা সুশৃঙ্খল নন; আগে থেকে প্রস্তুতি নেন না, প্রয়োজনের সময় প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেন। উপবাক্য তাঁদের বিপদে ফেলে বারবার; কেননা ইংরেজি ভাষায় যতো রকমের উপবাক্য আছে, সবই তাঁরা পেতে চান বাঙলা ভাষায়। এর চেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে ইংরেজি উপবাক্যগুলো ইংরেজি ভাষায় যেভাবে বিন্যস্ত হয়, ও যে-সব ভূমিকা পালন করে, বাঙলা উপবাক্যগুলোকেও ব্যাকরণপ্রণেতারা অবিকল তেমনভাবে বিন্যস্ত ও তেমন ভূমিকা পালনরত অবস্থায় দেখতে চান। মাঝেমাঝেই তাঁরা বাঙলা ভাষায় উপবাক্যের তেমন বিন্যাস ও ভূমিকা খুঁজে পান না; তখন আকাঙ্ক্ষিত বাক্য তৈরি করেন বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা দেন। তাই প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের 'বাক্যের প্রকারভেদ', 'বাক্যের শ্রেণীবিভাগ' প্রভৃতি অধ্যায় অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে সরল, যৌগিক ও মিশ্র (জটিল) বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় :

(৪৭) যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা সরল বাক্য (জগদীশ (১৩৪০, ৩৫০))।

কোনও বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে তাহা সরল বাক্য (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৩))।

যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাহাকে সরল বাক্য বলে (সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩২))।

যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তৃপদ এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াপদ থাকে, তাহাকে সরল বাক্য কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৩৪))।

যে বাক্যের বিধেয় একটি, সেই বাক্যকে বলে সরল বাক্য (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২৯৭))।

(৪৮) পরস্পর-নিরক্ষেপ দুই বা ততোধিক বাক্য কোন সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে পূর্ণ বাক্য গঠিত হয় তাহা যৌগিক বাক্য (জগদীশ (১৩৪০, ৩৫০))।

দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য স্বাধীন যোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে একটি পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহা যৌগিক বাক্য (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৩))।

দুইটি বা দুয়ের অধিক সরল, মিশ্র, অথবা সরল ও মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অথবা প্রতিষেধক অব্যয়ের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া, একটি দীর্ঘ প্রস্তাব বাক্যবৎ গঠিত করিয়া লইলে, যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য হয় (সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩৪))।

পরস্পরনিরপেক্ষ একাধিক বাক্যের যোগে যে বাক্য গঠিত হইয়াছে, তাহাকে যৌগিক বাক্য কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৩৪-৩৫))।

দুই বা দুইয়ের অধিক নিরপেক্ষ নিরাকাঙ্ক্ষ স্বাধীন বাক্য সংযোগবাচক অব্যয়ের সাহায্যে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি দীর্ঘতর বাক্য গঠন করিলে, তাহাকে বলে যৌগিক বাক্য (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২৯৯))।

(৪৯) একটি প্রধান বাক্যের সহিত তদঙ্গীভূত অন্য অপ্রধান বাক্য কোন অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বা কোন সাপেক্ষ সর্বনাম দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে পূর্ণবাক্যটি গঠিত হয়, তাহা জটিল বাক্য (জগদীশ (১৩৪০, ৩৫০))।

যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা ততোধিক অধীন খণ্ডবাক্য থাকে, তাহা জটিল বাক্য (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৫))।

কোনও-কোনও বাক্যে, উদ্দেশ্য এবং বিধেয় (অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া)-যুক্ত মুখ্য অংশ ব্যতীত, এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ থাকে। এই অপ্রধান অংশ, প্রধান বাক্যেরই অংশ-বা অঙ্গ-স্বরূপ হয়; ইহাতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, না হয় ইহাতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলেও 'যে, যেরূপ, যেমন', প্রভৃতি পদ বা অব্যয়ের মুখ-বন্ধে বা সহায়তায় ইহা উপস্থাপিত হয়; এবং এই হেতু সমাপিকা ক্রিয়া সাকাঙ্ক্ষ বা অসমাপ্তার্থ হয়, প্রধান বাক্যাংশেই অর্থপূর্তি ঘটে;— এইরূপ বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে (সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩২))।

একটি প্রধান বাক্যের অধীন এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্যের সহযোগে যে বাক্য গঠিত হয়, তাহাকে জটিল বাক্য কহে। সরল, যৌগিক এবং জটিল—এই তিন প্রকার বাক্যের মিশ্রণে যে বাক্য গঠিত হয়, তাহাকে মিশ্র বাক্য কহে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৩৬-৩৭))।

যে উক্তিকে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে, এবং এই একাধিক খণ্ডবাক্যের মধ্যে একটি স্বাধীন ও অন্যটি (বা অন্যগুলি) তাহার অধীন, তাহাকে বলে জটিল বাক্য (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২৯৮))।

সরল বাক্যের যে-সংজ্ঞাগুলো সংগৃহীত হয়েছে (৪৭)-এ, সেগুলো নির্দেশ করে যে প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা সরল বাক্যের সংগঠন সম্পর্কে একমত নন। জগদীশচন্দ্র (১৩৪০), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৪৭) সে-বাক্যকেই মেনে নেন সরল বাক্য হিশেবে, যাতে

আছে একটিমাত্র বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়া। তাঁরা অন্য উপাদানের সংখ্যা সম্পর্কে নীরব';— এতে মনে হয় কোনো বাক্যে যতোগুলো উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের প্রসারক থাকুক-না-কেনো, তাতে যদি থাকে মাত্র একটি সমাপিকা ক্রিয়া, তবে তাঁরা সে-বাক্যকে সরল ব'লে গ্রহণ করবেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০) উদ্দেশ্য-বিধেয়র সংখ্যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন;— তাঁর কাছে সে-বাক্যই সরল বাক্য, যাতে আছে মাত্র একটি উদ্দেশ্য, ও মাত্র একটি বিধেয়। তিনি অজস্র প্রসারকসম্পন্ন বাক্যকেও সরল ব'লে মানেন এ-শর্তে যে ওই বাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য ও বিধেয় নেই। তাই তিনি জগদীশচন্দ্র ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর থেকে পৃথক মত পোষেণ। সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ১৩৬৬) নিজের সঙ্গেই একমত নন;—তিনি (১৯৩৯)-এ একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয়সম্পন্ন বাক্যকে সরল বাক্যরূপে স্বীকার করেছেন; কিন্তু ১৩৬৬তে তিনি উদ্দেশ্যের সংখ্যার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বিধেয়ের সংখ্যার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(৫০) ক আশু ও মহেন আসিয়াছে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৩৪))।

খ রহিম ডুবিতেছে ও ভাসিতেছে (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৩৪))।

গ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বনে চলিলেন (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২৯৭))।

ঘ 'ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ু-সেবনে বাহির হইয়াছেন' (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২৭৯))।

(৫০ক)কে উপেন্দ্রনাথ সরল বাক্য হিশেবে স্বীকার করেন না; কিন্তু সুনীতিকুমার যেহেতু (৫০গ, ঘ)কে সরল বাক্য হিশেবে গ্রহণ করেছেন, তাই (৫০ক)কেও তিনি সরল বাক্য হিশেবে স্বীকার করবেন না। কোনো ব্যাকরণরচয়িতাই (৫০খ)কে সরল বাক্য হিশেবে স্বীকার করবেন না, কেননা এখানে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে। সুনীতিকুমার (১৯৩৯)-এ হয়তো (৫০গ, ঘ)কে সরল বাক্য হিশেবে বিবেচনা করতেন না, কেননা তখন তিনি মনে করতেন যে সরল বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যে-সকল ব্যাকরণরচয়িতা উদ্দেশ্যের সংখ্যা সম্পর্কে নীরব, তাঁরা সরল বাক্যের উদাহরণ হিশেবে যে-সমস্ত বাক্য ব্যবহার করেন, তাতে সব সময়ই উদ্দেশ্য পাওয়া যায় একটি। এতে বোঝা যায় তাঁরা সংজ্ঞায় উদ্দেশ্যের সংখ্যা সম্পর্কে নীরবতা পালন করলেও মনে মনে তাঁরা সরল বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্যই দেখতে চান। তবে প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতাদের সরল বাক্য সব সময় খুব সরল নয়; তাঁরা অজস্র প্রসারক ও নানামুখি অসমাপিকাআক্রান্ত বক্র-জটিল বাক্যকেও গ্রহণ করেন সরল বাক্যরূপে।

যৌগিক বাক্যের গঠন সম্পর্কে ব্যাকরণপ্রণেতারা মোটামুটি একমত, তাঁদের সংজ্ঞা যে-রকম বাক্যেই রচিত হোক-না-কেনো। তাঁরা একাধিক বাক্যের— সরল ও সরল, সরল ও জটিল, জটিল ও সরল, জটিল ও জটিল প্রভৃতি—সংযুক্ত রূপকেই যৌগিক বাক্যরূপে গণ্য করেন। তবে এখানেও অস্বস্তি থেকে যায় : যৌগিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বাক্য যৌগিক না সরল,

সে-সম্পর্কে অধিকাংশেই থাকেন নীরব। মিশ্র বাক্যের সংজ্ঞা রচনার সময় প্রথম দেখা দেয় প্রধান ও অপ্রধান খণ্ডবাক্যের ধারণা; এবং এ-ধারণা দুটির সাহায্যে রচনা করা হয় মিশ্র বাক্যের সংজ্ঞা। সব ব্যাকরণপ্রণেতা, একমাত্র উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০) বাদে, মিশ্র ও জটিল বাক্যকে অভিন্ন মনে করেন; এবং সে-বাক্যকেই শনাক্ত করেন মিশ্র বা জটিল বাক্যরূপে, যাতে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের অধীনে থাকে একটি অপ্রধান খণ্ডবাক্য। প্রধান ও অপ্রধান খণ্ডবাক্যের ধারণা ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে নেয়। অনেক ব্যাকরণপ্রণেতাই খণ্ডবাক্য, প্রধান খণ্ডবাক্য, অপ্রধান খণ্ডবাক্য প্রভৃতির সাধারণ সংজ্ঞা না দিয়ে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে কোনোরূপে চিনিয়ে দিতে চেষ্টা করেন কোনটি প্রধান খণ্ডবাক্য, আর কোনটি অপ্রধান খণ্ড-বাক্য (দ্র সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩৩; ১৩৬৬, ২৯৮))। দু-একজন নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেন :

(৫১) যে বাক্যগুলি লইয়া একটি জটিল বাক্য গঠিত হয়, তাহাদের প্রত্যেককে খণ্ডবাক্য বলে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৫))।

যে খণ্ডবাক্যে প্রধান বিধেয় থাকে, তাহা প্রধান খণ্ডবাক্য (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৫))।

যে খণ্ডবাক্য অপর খণ্ডবাক্যের অংশরূপে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণের কার্য করে, তাহা অধীন খণ্ডবাক্য (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৫))।

প্রধান খণ্ডবাক্যে অপ্রধান খণ্ডবাক্যের ভূমিকা অনুসারে অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় তিনটি শ্রেণীতে : 'বিশেষ্যস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য', '(নাম)বিশেষণস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য', ও 'ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য' (দ্র মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৬); সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২৯৮-২৯৯))। এগুলোকে 'সংজ্ঞা-বা বিশেষ্য-ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ', 'বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ', 'ক্রিয়াবিশেষণধর্মী বাক্যাংশ' (সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩৩) বা 'নামীয় খণ্ডবাক্য', 'নাম-বিশেষণীয় খণ্ডবাক্য', 'ক্রিয়াবিশেষণীয় খণ্ডবাক্য' (উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৪৫)) অভিধাও দেয়া হয়। তিন শ্রেণীর খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য শনাক্ত করেন তাঁরা ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে, এবং অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হন। ইংরেজি ভাষায় একটি পুরো খণ্ডবাক্য বেশ চমৎকারভাবে বাক্যের কর্তারূপে বসতে পারে; কিন্তু বাঙলায় এমন ব্যাপার বেশ দুর্লভ; তবুও ইংরেজি ব্যাকরণের নির্দেশে বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা খণ্ডবাক্যিক কর্তা খোঁজেন প্রাণপণে; এবং এক সময় ভুল উদাহরণ পেশ করেন। খণ্ডবাক্যের ভূমিকা নির্ণয়ে ভুল করেন প্রায় সবাই; এবং বিশেষ বিপদগ্রস্ত হন ক্রিয়া-বিশেষণীয় খণ্ডবাক্য নিয়ে। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৫২) ক যাহা হইবার ছিল, হইয়াছে (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৭))।

খ বোধ হইতেছে (যে) বৃষ্টি হইবে (সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪৩৩))।

গ যদি সে আসে, তবে আমি খুব খুশি হই (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৩৯))।

ঘ 'যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না পড়বে, ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন' (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ২৯৯))।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (৫২ক) বাক্যের 'যাহা হইবার ছিল' খণ্ডবাক্যটিকে ক্রিয়ার কর্তা বিবেচনা করেন। তাঁর ধারণা একটি বিশেষ্যপদ যেমন কর্তারূপে বসতে পারে, তেমনি এখানে 'যাহা হইবার ছিল' কর্তারূপে বসেছে। কিন্তু বাক্যটিতে একটা ফাঁক রয়ে গেছে ; — (৫২ক) বাক্যের পূর্ণরূপ হচ্ছে 'যাহা হইবার ছিল, তাহা হইয়াছে'। তাই এ-বাক্যটিতে 'তাহা' কর্তা, আর 'যাহা হইবার ছিল'-কে গণ্য করা যায় 'তাহা'র বিশেষণরূপে। সুনীতিকুমার (৫২খ) বাক্যের 'বৃষ্টি হইবে' খণ্ডবাক্যটিকে কর্তা ব'লে নির্দেশ করেছেন। 'বোধ হইতেছে (যে) বৃষ্টি হইবে' বাক্যটির বাহ্যরূপ তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে : এবং তিনি ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। বাক্যের বাহ্যকাঠামো দেখে সব সময় বিভিন্ন পদের ভূমিকা নির্ণয় করা যায় না। (৫২ খ) বাক্যটিকে যদি দুটি উপবাক্যে বিভক্ত করি, তবে পাই 'বোধ হইতেছে', ও 'বৃষ্টি হইবে' বাক্য দুটি। কিন্তু সুনীতিকুমার 'বোধ হইতেছে'-কে বাক্য হিশেবে মানতে সম্ভবত প্রস্তুত নন; তাই 'বোধ হইতেছে (যে) বৃষ্টি হইবে' বাক্যের 'বৃষ্টি হইবে' অংশের ভূমিকা নির্ণয় করার সময় তিনি মনেমনে সম্পূর্ণ বাক্যটিকে 'বৃষ্টি হইবে বোধ হইছে'রূপে ধ'রে 'বৃষ্টি হইবে' উপবাক্যটিকে পুরো বাক্যটির কর্তারূপে শনাক্ত ক'রে থাকবেন। বাঙলা ভাষায় 'বোধ হইতেছে (যে) বৃষ্টি হইবে' ধরনের বাক্য প্রচুর পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণপুস্তকে এমন বাক্যের অন্তর্ভেদী বর্ণনা পাওয়া যায় না। এর কারণ এমন বাক্য বেশ প্রতারক ও বিভ্রান্তিজাগানিয়া। (৫২ খ)কে যদি মিশ্র বাক্য গণ্য করি, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে বাক্যটিতে একটি প্রধান উপবাক্যের শরীরে গাঁথা আছে অন্তত একটি অপ্রধান উপবাক্য। বাক্যটিতে একটি উপবাক্য স্পষ্ট : 'বৃষ্টি হইবে': কিন্তু অন্যটি কোথায়? 'বোধ হইতেছে' কি বাক্য; এবং যদি হয়, তবে এ-বাক্যের কর্তা কোন পদ? 'বোধ' কি এ-বাক্যের কর্তা, না কর্তা উহ্য এ-বাক্যে? (৫২ খ) বাক্যে কার 'বোধ' হইতেছে (যে) বৃষ্টি হইবে'? বৃষ্টি বোধ কার হচ্ছে (৫২খ) বাক্যে, তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে না বাক্যটি; কিন্তু আমরা বুঝি যে এ-বোধ বক্তার। (৫২খ) বাক্যটি যে-বাক্যের বহুস্তরিক রূপান্তর, সেটি অনেকটা এরকম : 'আমি বোধ করিতেছি একথা যে বৃষ্টি হইবে'। এটিকে বিশেষ্যীকরণ সূত্রের দ্বারা পরিণত করা যায় 'আমার বোধ হইতেছে একথা যে বৃষ্টি হইবে'; এবং এটি থেকে 'আমার', ও 'একথা' বাদ দিয়ে পাই 'বোধ হইতেছে যে বৃষ্টি হইবে'। 'আমি বোধ করিতেছি একথা যে বৃষ্টি হইবে' বাক্যটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে 'একথা' বিশেষ্যপদটি কর্মরূপে উপস্থিত; এবং 'বৃষ্টি হইবে' উপবাক্যটি 'একথা' বিশেষ্যপদের বিস্তৃত বিবরণ বা প্রসারণ। এ-জন্যে 'বৃষ্টি হইবে'-কেও গণ্য করতে পারি কর্মরূপে। কিন্তু 'বৃষ্টি হইবে' উপবাক্যের—আশ্রিত উপবাক্যের—ভূমিকা শুধু মাত্র 'বোধ হইতেছে (যে) বৃষ্টি হইবে' বাক্যটি দেখে নির্ণয় করা শক্ত। (৫২গ, ঘ) বাক্য দুটিকেও ভ্রান্তভাবে, ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে, ক্রিয়াবিশেষণধর্মী উপবাক্যসম্পন্ন মিশ্রবাক্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে : (৫২গ)র 'যদি সে আসে' কি 'খুশী হই'-কে, এবং (৫২ঘ)র 'যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না পড়বে' কি 'ভুলে থাকবেন'-কে বিশেষিত করছে? এর উত্তর : না। তাই

(৫২গ, ঘ) বাক্যের প্রথম উপবাক্য দুটিকে ক্রিয়াবিশেষণধর্মী উপবাক্যরূপে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। বাক্য দুটির উভয় উপবাক্যই গুরুত্বপূর্ণ। এমন ধরনের বাক্যে প্রথম উপবাক্যে থাকে 'যদি', 'যতদিন', 'যখন', 'যেভাবে' প্রভৃতি, আর দ্বিতীয় উপবাক্যে থাকে 'তবে', 'ততদিন', 'তখন', 'সেভাবে' প্রভৃতি। এমন বাক্য এক ধরনের সংযুক্ত বাক্যের উদাহরণ, এবং এদের নাম দিতে পারি 'অধীনতামূলক সংযুক্ত বাক্য'। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা এসব বিবেচনায় না এনে ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে এমন বাক্যের প্রথম উপবাক্যকে ক্রিয়াবিশেষণধর্মী উপবাক্য ব'লে গণ্য করেছেন।

কোনো কোনো ব্যাকরণপুস্তকে, ন্যাসফিল্ড ও অন্যান্য ইংরেজি ব্যাকরণপ্রণেতার অনুকরণে, 'বাক্যের বিশ্লেষণ' নামে বাক্যসংগঠনের 'বাক্সচিত্র' দেয়া হয় (দ্র মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৪২, ২৪৫), উপেন্দ্রনাথ (১৯৪০, ৩৮-৪৭), সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৩২২, ৩২৪, ৩২৬))। এসব চিত্রে বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয় অংশ দুটিকে দুটি বড়ো ভাগে ফেলা হয়, এবং ছোটো ছোটো খোপে বিন্যস্ত করা হয় উদ্দেশ্য-বিধেয়র প্রসারকগুলোকে। বাস্তব বাক্যে প্রসারক মূল বস্তুর বাঁয়ে এলেও এসব চিত্রে প্রসারকগুলোকে ন্যস্ত করা হয় মূলবস্তুর ডানে। এসব চিত্র বাক্যসংগঠনকে মূর্ত করে না, ব্যবচ্ছেদ করে। 'সন্ন্যাসী নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন' (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৪২)), ও 'সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে, কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া, স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশ-প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন' (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৩২২) বাক্য দুটির চিত্র নিম্নরূপ :

(৫৩)

উদ্দেশ্য		বিধেয়			
উদ্দেশ্যপদ	উদ্দেশ্যপদের প্রসারক	বিধেয়ক্রিয়া	বিধেয়ক্রিয়ার কর্ম (বিশেষণসহ)	বিধেয়ক্রিয়ার পরিপূরক (বিশেষণসহ)	বিধেয়ক্রিয়ার প্রসারক
সন্ন্যাসী	(১) নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া (২) অবশেষে কাশীতে আসিয়া	হইলেন	×	উপস্থিত	×
কুন্দনন্দিনী	×	নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন	স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশ-প্রতিবিম্ব	×	সেই বকুলের তলায় সোপানের উপরে, অন্ধকার প্রদোষে, একাকিনী বসিয়া

(৫৩)-ধরনের বিশ্লেষণ বাক্যের বিভিন্ন উপাদানকে বিভিন্ন খোপে বিন্যস্ত করে; বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের অন্বয় প্রক্রিয়া নির্দেশ করে না, অর্থাৎ বাক্যসংগঠনকে মূর্ত করে না।

২.৪.৩.২ অন্যান্য বিষয়

অন্যান্য যে-সব বিষয় প্রথাগত বাঙলা বাক্যতত্ত্বে স্থান পায়, তার মধ্যে রয়েছে 'বাক্যের প্রকার পরিবর্তন', 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি', 'বাচ্য', 'বাক্যে পদের ক্রম', 'বাগধারা', 'বিরাম চিহ্ন বা ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার' প্রভৃতি। এগুলো সম্ভবত বাঙলা ব্যাকরণে ঢুকেছে ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাবে ও মাধ্যমিক শিক্ষাসূচির আদেশে। 'বাক্যের প্রকার পরিবর্তন' অংশে ব্যাকরণরচয়িতারা একই ভাব কেমনে বিভিন্ন ধরনের বাক্যসংগঠনের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, তা উদাহরণসহ দেখান; কিন্তু প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেন না। এ-অংশে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন নিজেদের ও পাঠকদের বোধির ওপর। অনেক সময় এমন সব বাক্যকে অভিন্ন ভাবের বাহন ব'লে নির্দেশ করেন, যাদের অভিন্ন ভাববহ ব'লে মানতে কষ্ট হয়। প্রক্রিয়াটি রূপান্তরমূলক;—মানব ভাষায় বিশেষ বিশেষ বাক্য রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে যায় সাংগঠনিক সম্পর্ক ও আর্থ সাম্য। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ এ-ধারণার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রথাগত ব্যাকরণচয়িতারা বিভিন্ন বাক্যের আর্থ ও সাংগঠনিক সম্পর্ক অস্পষ্টভাবে বোধ করেছিলেন; কিন্তু তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। কয়েকটি উদাহরণ বিবেচ্য :

(৫৪) ক সরল : 'মন দিয়া পড়িলে পাস করিতে পারিবে।'

খ জটিল : 'যদি মন দিয়া পড়, তাহা হইলে পাস করিতে পারিবে।'

গ যৌগিক : 'মন দিয়া পড়, তাহা হইলে পাস করিতে পারিবে।' (সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৩০৭))।

(৫৫) ক সে গাধার মত বোকা।

খ গাধা তাহার চেয়ে বেশী বোকা নহে। (মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ২৫২))।

(৫৪ক, খ, গ)কে সুনীতিকুমার সমার্থক মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (৫৪ক, খ) সমার্থক, আর (৫৪গ) ভিন্নার্থক। (৫৪খ) বাক্যটি শর্তমূলক বাক্য, এবং আকারে বিস্তৃত। এ-বাক্যটিকে সুনির্দিষ্ট সূত্রের সাহায্যে (৫৪ক) বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়; কিন্তু (৫৪গ)তে পরিণত করা যায় না। 'যদি মন দিয়া পড়' একটি শর্ত দিচ্ছে, আর এর রূপান্তর হচ্ছে 'মন দিয়া পড়িলে'। (৫৪গ)র 'মন দিয়া পড়' অনুজ্ঞা বা পরামর্শ নির্দেশ করছে, শর্ত দিচ্ছে না; তাই (৫৪গ) ভিন্নার্থক (৫৪ক, খ) থেকে। প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা ও সুনীতিকুমার এতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে যান না; এবং নির্দেশ করেন না কীভাবে এক বাক্যসংগঠনকে, অর্থ বিপর্যস্ত না ক'রে, পরিণত করা যায় অন্য বাক্যসংগঠনে। (৫৫ক, খ)কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অভিন্ন মনে করেন; কিন্তু বাক্য দুটির মধ্যে আর্থ ও সাংগঠনিক পার্থক্য অনেক। (৫৫ক) নির্দেশ করে যে 'সে' ও 'গাধা' সমান বোকা; বা গাধা যতোটা বোকা সেও ততোটা বোকা। উভয়ের বোকামিরই মাত্রা ও প্রকৃতি এক। (৫৫খ)র অর্থ এর থেকে ভিন্ন। (৫৫খ) নির্দেশ করে যে

গাধা তার চেয়ে বেশি বোকা নয়, হয়তো সমান বোকা বা কম বোকা। (৫৫ক) ও (৫৫খ)র মধ্যে আর্থ সাম্য নেই, নেই সাংগঠনিক সাদৃশ্য; তাই এদের একটিকে অন্যটিতে রূপান্তরিত করা যায় না। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের 'বাক্যের প্রকার পরিবর্তন' অংশ এ-ধরনের ত্রুটিপূর্ণ উদাহরণে পরিপূর্ণ থাকে; এবং কোনো ব্যাখ্যা থাকে না বাক্যের সমার্থকতা ও সাংগঠনিক সাদৃশ্য নির্ণয়ের।

২.৪.৪ কারকতত্ত্ব ও উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বাক্যতত্ত্ব

অনেক দিনের ধারে-ঋণে-শ্রমে বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা রচনা করেছেন বাঙলা বাক্যতত্ত্বের যে-বেঢপ, কিমাকার, অপরিকল্পিত, বিশৃঙ্খল সৌধ, তার ভিত্তিতলে হাঁ-ক'রে আছে এক বিশাল খাদ;—সামান্য কম্পনে যার ভেতর আভিত্তিছাদ ধ'সে পড়তে পারে ওই নড়োবড়ো দু-শতাব্দীর বাক্যতত্ত্বসৌধ। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা, একটি বহুলব্যবহৃত রূপক ব্যবহার ক'রে বলা যায়, অজান্তে পা রেখেছিলেন দু-নৌকায়; এবং আমরা জানি দু-নৌকার যাত্রী কখনো গন্তব্যে পৌঁছে না, যায় অন্তিম গন্তব্যালোকে। বোঝেন নি তাঁরা যে ব্যাকরণপুস্তকের দু-অংশে দু-নামে তাঁরা ক'রে যাচ্ছেন একই কাজ। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের একটি অপরিহার্য পরিচ্ছেদের নাম 'কারক'; এবং অধিকাংশ ব্যাকরণপুস্তকের একটি পরিচ্ছেদের নাম 'বাক্য' বা 'বাক্য-প্রকরণ'। দুটির কাজ একই: বাক্যবর্ণনা। কারকতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব;—সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা বাক্য বর্ণনা করেছিলেন কারকতত্ত্ব অবলম্বনে। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা বুঝতে পারেন নি যে কারকতত্ত্ব বাক্যতত্ত্ব। কারকের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন কারকের পরিচয় দেয়ার সময় তাঁরা বাক্যের কথা বলেন; জানান যে বাক্যের বিভিন্ন পদ ক্রিয়ার সাথে অন্বিত থাকে নানারকম সম্পর্কে; কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারেন না যে কারকবর্ণনা বাক্যবর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁরা এটা বুঝতে না পেরে বিভিন্ন কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগকৌশল বর্ণনাতেই ব্যস্ত থাকেন; এবং এমন ধারণা সৃষ্টি করেন যে একমাত্র বিভক্তিপ্রয়োগের কৌশল শেখানোর জন্যে কারক-ধারণার প্রয়োজন। কিন্তু কারকতত্ত্ব নির্দেশ করে যে বাক্যের বিভিন্ন পদ ক্রিয়ার সাথে কয়েক রকম সম্পর্কে জড়িত থাকে, যে-সম্পর্ক অনুসারে নির্ণীত হয় বাক্যের সংগঠন; এবং কোনো কোনো ভাষায় কারক-অনুসারী চিহ্নও যুক্ত হয় বিভিন্ন পদের সাথে। অনুকরণ-যুগের সংস্কৃত ব্যাকরণেই কারকতত্ত্ব ব্যবহৃত হ'তে থাকে স্থূলভাবে, আর বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা করেন তার স্থূলতম ব্যবহার। বাঙলা ব্যাকরণের একাংশে, ব্যাকরণপ্রণেতাদের অজ্ঞাতে, রচিত হয় কারকবিভক্তির বাক্যবর্ণনা; এবং আরেক অংশে পাওয়া পাশ্চাত্য উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বাক্যবর্ণনা। তাঁরা দ্বিতীয় ধরনের বর্ণনাকেই মনে করেন বাক্যবর্ণনা ব'লে; কারকতত্ত্ব দিয়ে তাঁরা যে কী করলেন সে-সম্পর্কে নিশ্চিত নন তাঁরা। আমরা বুঝি তাঁরা একই উপাত্ত ব্যাখ্যার জন্যে ব্যবহার করছেন দুটি তত্ত্ব : কারকতত্ত্ব ও উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বাক্যতত্ত্ব। কিন্তু একই উপাত্ত যিনি একই পুস্তকে দুটি বিরোধী তত্ত্ব অবলম্বনে ব্যাখ্যা করেন, তাঁকে সরল ভাবতে পারি, গ্রহণযোগ্য ভাবতে পারি না। দু-বিরোধী

তত্ত্ব যাঁর অবলম্বনে, তিনি নিজেকেই নিজে বাতিল করেন। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারাও দু-তত্ত্ব গ্রহণ ক'রে নিজেদের অজ্ঞাতে বাতিল ক'রে দেন নিজেদের।

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে বইয়ের শুরুর দিকে স্থান পায় কারক, আর শেষের দিকে বর্ণিত হয় উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বাক্যসংগঠন। অধিকাংশ ব্যাকরণপ্রণেতা কারকবর্ণনার সময় উদ্দেশ্যবিধেয়র প্রসঙ্গ তোলেন না, আবার উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বর্ণনার সময়, অনন্যোপায় না হ'লে, কারকের প্রসঙ্গ গোপন ক'রে যান (দ্র প্রসন্নচন্দ্র ১৮৮৪, ১৭২-১৮০), মু শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৬২-৭৮), মু এনামুল (১৯৫২, ১৩৭-১৫৩))। তাই 'কারক' পরিচ্ছেদে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে বাঙলা ভাষা একান্তভাবে বিভক্তিনিয়ন্ত্রিত ভাষা; সুতরাং বিভক্তির প্রয়োগবিধি জানাই বাঙলাশিক্ষার্থীর প্রধান কর্তব্য। অন্য দিকে উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বাক্যবর্ণনার সময় বিভক্তির প্রসঙ্গ একেবারেই ওঠে না; মনে হয় যে বাঙলা ভাষায় কোনো বিভক্তি নেই, বা থাকলেও তা গুরুত্বহীন। অনেক ব্যাকরণপ্রণেতা কারকতত্ত্বও বর্ণনা করেন এমনভাবে যাতে মনে হয় এ-তত্ত্বটিও পাশ্চাত্য;— যেমন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৪৭, ৬৩) প্রতিটি কারক-নামের সাথে পরিবেশন করেন লাতিনজাত ইংরেজি কারক-নাম; এবং এমন ধারণা সৃষ্টি করেন যে কর্তৃ, কর্ম, করণ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দও বিদেশি পরিভাষার অনুসরণে তৈরি করা। অধিকাংশ ব্যাকরণপ্রণেতা, সম্ভবত অজ্ঞাতসারে বা সহজাত বোধিবশত, কারকের ও উদ্দেশ্যবিধেয়র বর্ণনাকে পরিচ্ছন্নভাবে পৃথক ক'রে রাখেন; কিন্তু বিভ্রান্ত কেউ কেউ কারক-ও উদ্দেশ্য-বিধেয়-তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটাতে চেষ্টা করেন (দ্র সুনীতিকুমার (১৩৬৬, ৭৪-৯৭))। সুনীতিকুমার ভেবেছিলেন কারক ও উদ্দেশ্যবিধেয়র মিশ্রণে তাঁর ব্যাকরণ অর্জন করবে অধিক উৎকর্ষ; বা তিনি কারকতত্ত্ব, ও উদ্দেশ্যবিধেয়তত্ত্বের মর্মবক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। কারকতত্ত্বের মর্মবাণী হচ্ছে বাক্যের ক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন বিশেষ্যপদ জড়িত থাকে কয়েক রকম সম্পর্কে; অর্থাৎ বাক্য শুধু দুটি প্রধান খণ্ডে বিভাজ্য নয়: বেশ কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করা সম্ভব বাক্যসংগঠন (দ্র ফিলমোর (১৯৬৮), হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ))। উদ্দেশ্যবিধেয়তত্ত্বের সারকথা হচ্ছে বাক্য দ্বিআংশিক, তা যতো বড়ো বা ছোটো হোক-না-কেনো। তত্ত্ব দুটি পরস্পরবিরোধী, তাই তাদের মিশ্রণ অসম্ভব। ইংরেজি ব্যাকরণপুস্তকে দেখা যায় ব্যাকরণবিদেরা বাক্যবিশ্লেষণ করেন উদ্দেশ্যবিধেয় ভিত্তি ক'রে; কারকের প্রসঙ্গ তাতে থাকে না। যদি কোনো ব্যাকরণে কারকভিত্তিক বাক্যবর্ণনা পাওয়া যায়, তবে তাতে উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বর্ণনা থাকে না; আর যখন কোনো ব্যাকরণপ্রণেতা উদ্দেশ্যবিধেয়ভিত্তিক বর্ণনার সাথে কারকের প্রসঙ্গও তোলেন, তখন তিনি কারক বলতে বোঝেন শুধু বাক্যের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন রূপ। ইংরেজি ব্যাকরণপ্রণেতারা দুটি তত্ত্বের পার্থক্য বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতারা পারেন নি। তাই তাঁরা বাতিল ক'রে দিয়েছেন নিজেদের ; — দু-শতাব্দী ধ'রে তাঁরা অনেক অনুকরণ করেছেন, তাঁদের স্বেদ ঝরেছে বিপুল, নিন্দিত হয়েছেন দশকেদশকে, কিন্তু সব কিছু পর্যবসিত হয়েছে শোকাবহ ব্যর্থতায়। ব্যর্থতার এমন বিষ বাঙলা ব্যাকরণবিদসম্প্রদায় ছাড়া আর কার পেয়ালায় জুটেছে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্ব

৩.০ ভূমিকা

বাক্যতত্ত্ব সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের স্খলনক্ষেত্র। বাক্যবর্ণনায় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যর্থতার সংবাদ আজ চরাচরে জানা। বাক্য প্রাথমিক উপাত্ত থেকে সুদূরবর্তী;—যতো সহজে ধ্বনি ও রূপ পর্যবেক্ষণ এবং বিচারবিশ্লেষণ করা যায়, ততো সহজে কাবু করা যায় না বাক্যকে। অবিরাম উচ্চারিত অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহকে সহজে খণ্ডবিখণ্ড করা যায়, এবং আবিষ্কার করা যায় উপাত্তের ধ্বনিমূলসংখ্যা। সব মানবভাষাতেই আছে মুষ্টিমেয় ধ্বনি;— কোনো ভাষাই কোটিকোটি ধ্বনি ব্যবহার করে না: সাধারণত বারো থেকে ষাটটি ধ্বনির পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে ভাষাশরীর। ধ্বনিমূলের তুলনায়, প্রত্যেক ভাষায়, রূপমূলের সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু তা অসংখ্য নয়। ধ্বনিমূলের পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠা রূপমূলপুঞ্জকে তাই বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, এবং নানা প্রণালিপদ্ধতির প্রয়োগে আবিষ্কার করা সম্ভব ওই রূপমূলরাশি। কিন্তু যে-কোনো মানবভাষায় বাক্য সংখ্যাহীন। যেহেতু বাক্য অসংখ্য, তাই সমস্ত বাক্য কারো পক্ষে উপাত্তরূপে গ্রহণ ক'রে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। যা পর্যবেক্ষণ অসম্ভব, তা যেহেতু সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীর আয়ত্তের বাইরে, তাই বাক্য নিয়ে তাঁরা বিপদগ্রস্ত।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে প্রথমে 'ধ্বনি'-রাশির ওপর 'বৈপরীত্য' প্রণালি প্রয়োগ ক'রে-ও নির্ণয় করা হয় 'ধ্বনিমূল', তারপর ধ্বনিমূলসমূহের ওপর 'প্রতিকল্পন' প্রণালি প্রয়োগ ক'রে স্থিরকরা হয় 'ধ্বনিমূল-শ্রেণী। ধ্বনিমূল সাংগঠনিক ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব কক্ষের উচ্চতম বস্তু। ধ্বনিতত্ত্বের পরে আসে রূপতত্ত্ব কক্ষ। এ-কক্ষে নিম্নতম বস্তুরূপে ব্যবহার করা হয় ধ্বনিতত্ত্ব কক্ষের উচ্চতম বস্তুকে, অর্থাৎ ধ্বনিমূলকে। ধ্বনিমূলের পারস্পরিক বিন্যাসে গঠিত হয় 'রূপ', এবং 'রূপ' হচ্ছে রূপতত্ত্ব কক্ষের নিম্নতম বস্তু। 'রূপ'-রাশির ওপর 'বৈপরীত্য' প্রণালি ব্যবহার ক'রে শনাক্ত করা হয় 'রূপমূল'। পুনরায় রূপমূলরাশির ওপর 'প্রতিকল্পন' প্রণালি প্রয়োগ ক'রে নির্ণয় করা হয় 'রূপমূল-শ্রেণী'। তাই আমরা আশা করতে পারি যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে একই প্রণালি প্রয়োগ ক'রে আবিষ্কার করা হবে 'বাক্য', ও 'বাক্য-শ্রেণী'। অর্থাৎ এ-স্তরে রূপমূলকে নিম্নতম ভাষাবস্তু রূপে গ্রহণ ক'রে 'বৈপরীত্য' ও 'প্রতিকল্পন'-এর সাহায্যে বর্ণনা করা হবে বাক্য। সাংগঠনিকদের পক্ষে বাক্যকে রূপমূল-শ্রেণীর পারস্পরিক বিন্যাস ব'লে

বিবেচনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাক্য কেবল রূপমূলের সরলরৈখিক বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে না : বাক্যে শব্দরাশির বিন্যাস সহজ সরল একের-পরে-এক ক'রে বসা শব্দের সমষ্টির চেয়ে অধিক কিছু। তবে সাংগঠনিক তত্ত্বের মূলে আছে 'প্রতিবেশ', 'বণ্টন' ইত্যাদি বোধ, যা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীকে বাধ্য করে বাক্যকে রূপমূল, বা রূপমূলের চেয়ে বড়ো কোনো ভাষা-এককের পারস্পরিক বিন্যাস ব'লে বিবেচনা করতে (দ্র হ্যারিস (১৯৫১), ফ্রিজ (১৯৫২))। তাঁরা যেহেতু অর্থকে পরিহার করেছিলেন, তাই বাক্য তাঁদের কাছে বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ভাষাবস্তুর সমাবেশ। তাঁরা রচনা করতে চেয়েছিলেন 'রৌপ ব্যাকরণ' [ফর্মাল গ্রামার], যা অর্থের ওপর অনির্ভর। রৌপ ব্যাকরণ ভাষার অর্থ সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে বিভিন্ন ভাষাবস্তুর বণ্টন ও বিন্যাস বর্ণনা করে। বাক্যসংক্রান্ত সাংগঠনিক ধারণাই ভ্রান্ত : তাঁরা মনে করেছিলেন যে ধ্বনিমূল-রূপমূলের মতো ভাষায় বাক্যও সংখ্যায় সীমিত। তাই তাঁরা পরিতৃপ্ত রয়েছেন ভাষার বিপুল পরিমাণ বাক্যের অতি তুচ্ছ খণ্ডাংশের রৌপ বর্ণনায় ও বিবরণে।

বাক্যবর্ণনা তাঁদের লক্ষ্য ছিলো না; তাঁদের মনোভাব অনেকটা এ-রকম: আমাদের দায়িত্ব ধ্বনিমূল-রূপমূল শনাক্তি ও বিন্যাস বর্ণনা, বাক্য ও অর্থ বিশ্লেষণ ও বর্ণনার দায়িত্ব অন্য কারো। ভাষার যে-স্তরে তাঁরা পদস্খলিত হন, সে-স্তর থেকে যাত্রা শুরু করেন রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭))। সাংগঠনিক কিছু কিছু বোধ রূপান্তরবাদীরা গ্রহণ করলেও সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁরা উদঘাটন করেন পরিপূর্ণভাবে (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৪ক, ১৯৬৫), পোস্টাল (১৯৬৪), লিজ (১৯৬০ক))। বাক্যবর্ণনায় সাংগঠনিক উদ্যমকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

[ক] বণ্টনিক বাক্যবর্ণনাকৌশল

[খ] অব্যবহিত-উপাদানকৌশল

এর মধ্যে বণ্টনিক কৌশল দুর্বল ও ব্যর্থ, এবং অব্যবহিত-উপাদানকৌশল বেশ শক্তিমান ও সফল। তবে অব্যবহিত-উপাদান প্রণালির আন্তর শক্তির আবিষ্কারক ও সফল ব্যবহারকারী রূপান্তরবাদীরা, সাংগঠনিকেরা নন। অব্যবহিত-উপাদান প্রণালি পাংশুভাবে ব্যবহৃত হয় সাংগঠনিকদের হাতে, এবং একে শক্তিমান, সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খলরূপে ব্যবহার করার উপযোগী ক'রে তোলেন রূপান্তরবাদীরা (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৯৬৫), পোস্টাল (১৯৬৪))। রূপান্তর ব্যাকরণে অব্যবহিত-উপাদানকৌশল ব্যবহৃত হয় ভিত্তি কক্ষে (দ্র § ৪.৫.১.১)।

৩.১ বণ্টনিক বাক্যবর্ণনাকৌশল

বণ্টনিক বাক্যবর্ণনাকৌশলের প্রধান পুরুষ হ্যারিস (দ্র হ্যারিস (১৯৪৬, ১৯৫১), এবং ফ্রিজ (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২))। তাঁদের প্রণালি মূলত অভিন্ন, তবে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বণ্টনের বস্তু নির্ধারণে। হ্যারিস (১৯৪৬, ১৯৫১), রূপমূল ' ও 'রূপমূলপরম্পরা'র বণ্টনের সাহায্যে বর্ণনা করেন বাক্য, আর ফ্রিজ (১৯৫২) বর্ণনা করেন 'পদ' বা 'বাক্যাংশ'-এর (পাশ্চাত্য প্রথাগত

ব্যাকরণের 'পার্টস অফ স্পিচ') বণ্টন। উভয় রীতিই প্রণালিপ্রাণ : ভাষা বা বাক্য সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁরা ব্যবহার করেন নি বর্ণনার ভিত্তিরূপে। উভয়েই দিয়েছেন গঠিত সামান্য সংখ্যক বাক্যের রৌপ বর্ণনা, এবং ভাষা সম্পর্কে কোনো গভীর বোধ সৃষ্টির বদলে রচনা করেছেন ব্যাপক বিভ্রান্তি। তাঁদের উভয়ের নিকট বাক্য হচ্ছে কতিপয় 'ভাষাবস্তু-শ্রেণী'র সরলরৈখিক পরম্পরা। প্রথমে আমি হ্যারিসি প্রণালির সরল বিবরণ দেবো (প্রণালিটি বেশ জটিল, ও ক্লান্তিকর), এবং পরে সরল বর্ণনা দেবো ফ্রিজের প্রণালির। কোনো প্রণালিরই বিস্তৃত পরিচয় দেয়া আমার লক্ষ্য নয়, শুধু প্রণালি দুটির রূপরেখা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

হ্যারিস বাক্যকে বিচ্ছিন্ন—পৃথক—রূপমূলের পরম্পরা রূপে বর্ণনা করতে চান নি, তিনি চেয়েছেন বাক্যকে 'রূপমূলপরম্পরা'র—পাশাপাশি বসা একাধিক রূপমূলের—বিন্যাসরূপে বর্ণনা করতে। ভাষায় কোন কোন রূপমূলপরম্পরা ব্যবহৃত হয়, তিনি তা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, এবং ওই পরম্পরাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন গাণিতিক সূত্রে। এতে তাঁর প্রধান সহায়ক 'প্রতিকল্পন'। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের এক বড়ো হাতিয়ার প্রতিকল্পন। সাংগঠনিক রূপতত্ত্বে 'রূপমূল-শ্রেণী' নির্ণয় করা হয় প্রতিকল্পনের সাহায্যে : যে-সমস্ত রূপমূল পরস্পরের বিকল্পে বা বদলে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তাদের বিন্যস্ত করা হয় একটি বিশেষ 'শ্রেণী'তে। অর্থাৎ যে-সমস্ত রূপমূলের 'প্রতিবেশ' অভিন্ন, সেগুলো অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। উদাহরণরূপে বলা যায় : 'একটি মেয়ে এলো' বাক্যটিতে 'মেয়ে'র বদলে ব্যবহার করা যায় 'ছেলে', 'তরুণী', 'ছাত্র', 'গাধা' ইত্যাদি শব্দ। এ-শব্দগুলো 'একটি—এলো' প্রতিবেশে বসতে পারে। তাই 'ছেলে', 'মেয়ে', 'তরুণী', 'ছাত্র', 'গাধা'...একই 'শ্রেণী'ভুক্ত। হ্যারিস শুধু রূপমূলের বদলে রূপমূল বসিয়ে বাক্যবর্ণনায় উৎসাহী নন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে অনেক স্থলে একটিমাত্র রূপমূলের বদলে ব্যবহার করা সম্ভব অব্যবহিত অনেকগুলো রূপমূল, অর্থাৎ 'রূপমূলপরম্পরা'। যেমন : ওপরের বাক্যে 'মেয়ে' রূপমূলটির বদলে ব্যবহার করা যায় একটি ক'রে রূপমূল : 'ছেলে', 'তরুণী', 'ছাত্র', 'গাধা'; এবং ওই স্থানে ব্যবহার করা সম্ভব পাশাপাশি বসা অনেক রূপমূল। 'মেয়ে'র বদলে ব্যবহার করতে পারি 'সুন্দর তরুণী', 'ডানাকাটা পরী', 'তালিমারা ট্রাউজারপরা যুবক' ইত্যাদি রূপমূলপরম্পরা। তিনি রূপমূলপরম্পরা বিন্যাস বর্ণনায় উৎসাহী (দ্র হ্যারিস (১৯৪৬))। তবে তিনি যাত্রা শুরু করেন রূপমূল থেকে, কেননা রূপমূলই সরলতম সার্থ একক, যা পর্যবেক্ষণ করা যায় সহজে। বাক্যবর্ণনায় হ্যারিসের সহায়ক দু-রকম ভাষাবস্তু—রূপমূল, ও রূপমূলপরম্পরা, এবং এক রকম প্রণালি—প্রতিকল্পন।

এ-প্রণালিতে বাক্যবর্ণনায় প্রথমে দরকার হচ্ছে উপাত্ত-ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত রূপমূলের একটি তালিকা বা কোষ। অর্থাৎ উপাত্ত-ভাষার সমস্ত রূপমূল শনাক্ত করার পরই শুধু শুরু হ'তে পারে বাক্যবর্ণনা। কেননা সাংগঠনিক দৃষ্টিতে বাক্য হচ্ছে রূপমূলসমবায়। মনে করা যাক, বাঙলা ভাষার সমস্ত রূপমূল শনাক্ত হয়ে গেছে, এবং রূপমূলরাশির ধ্বনিমূলক গঠনও নির্ণীত হয়েছে। এখন কাজ হচ্ছে রূপমূলরাশির 'শ্রেণী' নির্ণয় করা; অর্থাৎ নির্ণয় করতে হবে

কোন কোন রূপমূল অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। রূপমূল-শ্রেণী নির্ণয়ের জন্যে ব্যবহার করতে হবে, পৌনপুনিকভাবে, প্রতিকল্পন প্রণালি। প্রতিকল্পন প্রণালি প্রয়োগের পদ্ধতি এমন : কোনো বাক্যের একটি রূপমূলের স্থানে ব্যবহার করতে হবে এক, বা একাধিক রূপমূলের পরম্পরা। যেমন : 'ছেলেটি কাকে ডাকছে?' বাক্যের 'ছেলে' রূপমূলটির প্রতিবেশ হচ্ছে '—টি', এবং ওই শূন্যস্থানে বা প্রতিবেশে ব্যবহার করা যায় 'ওই মেয়ে দু' রূপমূলপরম্পরা। কোনো প্রতিবেশে একটি রূপমূলের বদলে অন্য একটি, বা একাধিক রূপমূলের ব্যবহার প্রণালি একটি সাধারণ সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায়। মনে করা যাক, 'অ—আ' প্রতিবেশে 'ক' বসতে পারে, অর্থাৎ কোনো অবস্থানের বাঁয়ে 'অ', এবং ডানে 'আ' থাকলে, সে-স্থানে 'ক' বসতে পারে। এখন ওই প্রতিবেশে 'ক'-র বদলে 'খ' ব্যবহার করা যাক। যদি দেখা যায় যে 'ক'-র বদলে 'খ'-র ব্যবহারে বাক্যটিতে কোনো ত্রুটি ঘটে নি, তবে মনে করতে হবে যে 'ক' এবং 'খ' একই 'প্রতিকল্পন-শ্রেণী', বা 'বণ্টনশ্রেণী'-ভুক্ত। 'অ—আ' প্রতিবেশে 'ক' বসতে পারে কথার অর্থ হচ্ছে আমাদের কৃত্রিম ভাষায় 'অ ক আ' একটি চমৎকার বাক্য, এবং 'ক'-র স্থানে 'খ' বসলে যদি বাক্যটি দুষ্ট না হয়, তবে বুঝতে হবে যে 'অ খ আ'-ও চমৎকার বাক্য। 'অ—আ' প্রতিবেশে বসতে পারে ব'লে 'ক', ও 'খ' একই 'প্রতিকল্পন-শ্রেণী' বা 'বণ্টন-শ্রেণী'র সদস্য।

হ্যারিসের বাক্যবর্ণনার প্রথম ধাপ হচ্ছে রূপমূলের বদলে রূপমূল ব্যবহার। প্রথম ধাপে, উল্লিখিত প্রাতিকল্পনিক প্রণালিতে, ভাষার রূপমূলপুঞ্জকে বিন্যস্ত করতে হবে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে। ফলে দেখা দেবে রূপমূলের 'শ্রেণী', 'উপ-রূপমূল-শ্রেণী', 'উপ-উপ-রূপমূল-শ্রেণী', 'উপ-উপ-উপ-রূপমূল শ্রেণী', 'উপ-উপ-উপ...রূপমূল-শ্রেণী'। শ্রেণীকরণ এবং শ্রেণীকরণ এবং শ্রেণীকরণ চালাতে হবে যতোক্ষণ না শ্রেণীকরণের অন্তস্তরে পৌছোই। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক বিষয়টি বোঝার জন্যে। আমরা বলতে পারি :

(১) ক আপনার কবিতাটি চমৎকার।

খ আপনার বাড়িটি চমৎকার।

(১ক, খ)তে একই প্রতিবেশে বসেছে 'কবিতা' ও 'বাড়ি' রূপ দুটি, তাই এরা একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আরো অনেক প্রতিবেশ পাওয়া যায়, যেখানে 'কবিতা' ও 'বাড়ি' পরস্পরের বিকল্পে বসতে পারে না। (২)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(২) ক আমি একটি কবিতা লিখেছি

খ *আমি একটি বাড়ি লিখেছি।

গ আমার বাড়িটি ঝড়ে ভেঙে গেছে।

ঘ *আমার কবিতাটি ঝড়ে ভেঙে গেছে।

ঙ আমার কবিতাটি একটি সনেট।

চ *আমার বাড়িটি একটি সনেট।

(২ক, খ)তে দেখছি যে-প্রতিবেশে 'কবিতা' বসে, সেখানে 'বাড়ি' বসে না; (২গ, ঘ)তে দেখছি যে-প্রতিবেশে 'বাড়ি' বসে, সেখানে 'কবিতা' বসে না, এবং পুনরায় (২ঙ, চ)তে দেখি যে-প্রতিবেশে 'কবিতা' বসে, সে-প্রতিবেশে 'বাড়ি' বসে না। তাই (১, ২)-এ পাচ্ছি রূপমূলের তিনটি 'শ্রেণী' : (ক) রূপমূল শ্রেণী (১) : 'কবিতা', 'বাড়ি'—যখন উভয়ে একই প্রতিবেশে বসে; (খ) রূপমূল-শ্রেণী (২) : 'কবিতা'—যে-প্রতিবেশে 'কবিতা' বসে, কিন্তু 'বাড়ি' বসে না, এবং (গ) রূপমূল-শ্রেণী (৩) : 'বাড়ি'—যে-প্রতিবেশে 'বাড়ি' বসে, কিন্তু 'কবিতা' বসে না। এ-ভাবে এ-দুটি রূপমূলকে, অন্যান্য রূপমূলের সাথে প্রতিবেশ বিবেচনা ক'রে, সংখ্যাহীন উপ-শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে হবে। এ-শ্রেণীকরণ একটি রূপমূলের সাথে আরেকটির পার্থক্যকেই বড়ো ক'রে তোলে, তাদের সাদৃশ্য গোপন ক'রে যায়; এবং বাধা দেয় নির্বিশেষ বা সাধারণ সূত্র রচনায়।

হ্যারিস (১৯৪৬) শুধু বিচ্ছিন্ন ও পৃথক রূপমূলের প্রতিকল্পনের সাহায্যে রূপমূল-শ্রেণী নির্ণয় ক'রে বাক্যবর্ণনা করতে চান না। তিনি রূপমূলের সাথে রূপমূলপরম্পরার প্রতিকল্পনের মাধ্যমে নির্ণয় করতে চান রূপমূল ও রূপমূলপরম্পরা-শ্রেণী। ওপরে একটি রূপমূলের সাথে আরেকটি রূপমূলের প্রতিকল্পনের প্রণালি দেখানো হয়েছে। তিনি একই প্রণালিতে একটি রূপমূলের বিকল্পে ব্যবহার করতে চান একাধিক রূপমূল, অর্থাৎ রূপমূলপরম্পরা। রূপমূল-শ্রেণী শনাক্তির সময় বিবেচনা করা হয় 'অ—আ' প্রতিবেশে 'ক' এবং 'খ' বসতে পারে কি-না? রূপমূলপরম্পরা-শ্রেণী নির্ণয়ের সময় ওই বিবেচনাকে সম্প্রসারিত করা হয়, এবং দেখা হয়, 'অ—আ' প্রতিবেশে শুধু 'ক', বা 'খ' নয়, বরং 'কচ' বা 'কছ' বা 'টঠড'—অর্থাৎ একাধিক রূপমূল—বসতে পারে কি-না? যদি এরা সবাই এ-প্রতিবেশে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তবে 'ক', 'খ', 'কচ', 'কছ' এবং 'টঠড' পরস্পর-বদলযোগ্য। এমন পরিস্থিতিতে বলা যায় যে এরা এমন এক প্রতিকল্পন-শ্রেণীর সদস্য, যা শুধু রূপমূল-শ্রেণী নয়, বরং এক রূপমূলপরম্পরা-শ্রেণী। এ-শ্রেণীর প্রতি সদস্যই রূপমূলপরম্পরা;—তা একটি রূপমূলে গঠিত হ'লেও। কোনো রূপমূলপরম্পরা যদি মাত্র একটি রূপমূলে গঠিত হয়, তবে তাকে ধরা হবে রূপমূলপরম্পরার এক বিশেষ নিদর্শন ব'লে। অর্থাৎ একটি রূপমূলেও গঠিত হ'তে পারে রূপমূলপরম্পরা। 'সে ফুল ভালোবাসে' বাক্যটিতে 'ফুল' রূপমূলটির স্থানে ব্যবহার করা সম্ভব 'মদ', 'কবিতা', 'বেড়াল' ইত্যাদি একক রূপমূল, এবং এ-স্থানে ব্যবহার করা সম্ভব 'লাল তিল', 'শাদা ত্বকের তরুণী', 'মানুষ খুন করতে', 'জীবনানন্দের রূপভারাতুর কবিতা', 'স্ফটিকপাত্রে তরল পানীয়' প্রভৃতি রূপমূলপরম্পরা। এ-রূপমূলপরম্পরাগুলোর মধ্যে নানা পার্থক্য রয়েছে; তাদের আন্তর সংগঠন ভিন্ন, কিন্তু তা বড়ো ও মূল্যবান নয়। যা মূল্যবান, তা হচ্ছে এরা পরস্পরের বদলে ব্যবহৃত হ'তে পারে। অব্যবহিত ওপরের উদাহরণে একটি মাত্র রূপমূলের স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে একাধিক রূপমূল বা রূপমূলপরম্পরা। এর অর্থ হচ্ছে রূপমূলপরম্পরাসমূহ নতুন কোনো ভাষাবস্তু-শ্রেণী সৃষ্টি করে না, বরং তারা অন্তর্ভুক্ত হয় বিভিন্ন রূপমূল-শ্রেণীর। এদের

আচরণ রূপমূল-শ্রেণীর আচরণের মতোই। সুতরাং বলতে পারি যে প্রতিকল্পনের এ-প্রণালি রূপমূলপরম্পরাকে নামিয়ে আনে রূপমূলস্তরে। অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক রূপমূল একটি মাত্র রূপমূল-এককের সমতুল্য। ওপরের উদাহরণে 'ফুল' রূপমূলটির স্থানে বসতে পারে 'জীবনানন্দের রূপভারাতুর কবিতা' রূপমূলপরম্পরা; তাই এ-পরম্পরা রূপমূলস্তরে নমিত। তাই রূপমূলকে যেমন ধরা হয় একটি একক ব'লে, রূপমূলপরম্পরাকেও ধরা হয় সমতুল্য একক ব'লে। তবে এমন অনেক প্রতিবেশ পাওয়া যায় যেখানে রূপমূলপরম্পরা বসে, কিন্তু কোনো একলা রূপমূল বসে না। এ-প্রণালিতে যেহেতু যে-কোনো পরম্পরাকে যে-কোনো রূপমূল বা পরম্পরা দ্বারা প্রতিকল্পিত করা সম্ভব, তাই ত্রুটিপূর্ণ প্রতিকল্পনের সম্ভাবনা অসীম। যেমন : 'আমি তোমাকে দেখতে চাই' বাক্যের 'তোমাকে দেখতে' অংশের বদলে ব্যবহার করতে পারি একটি মাত্র রূপমূল 'ভাত', এবং পেতে পারি একটি গ্রহণযোগ্য বাক্য 'আমি ভাত চাই'। কিন্তু এখানে 'তোমাকে দেখতে', এবং 'ভাত'কে সমতুল্য, ও প্রতিকল্পনযোগ্য একক ব'লে ধরা হচ্ছে ভ্রান্তিবশত। 'আমি তোমাকে দেখতে চাই' একটি জটিল বাক্য, এবং 'আমি ভাত চাই' সরল বাক্য। 'তোমাকে দেখতে' একটি একক কি-না, তাতে সন্দেহ আছে; কিন্তু এর বদলে স্পষ্টভাবে একক 'ভক্তি' বসালে ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যাবে। এ সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার, কিন্তু কীভাবে সাবধান থাকা যাবে, তার নির্দেশ হ্যারিসে নেই।

এ-প্রণালিতে বাঙলা ভাষার এক অতি তুচ্ছাংশের বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করছি। অনুপুঙ্খ ও ব্যাপক বর্ণনায় আমি যাবো না—হ্যারিসও যান নি; তাঁর প্রণালির কৌশল ও রূপরেখা তুলে ধরাই আমার লক্ষ্য। হ্যারিস প্রতিকল্পনের জন্যে ব্যবহার করেছেন সমীকরণরীতি, এবং ওই রীতিটি এখানে ব্যবহৃত হবে। একটি সমীকরণসূত্র : কখ=চ। এ-সমীকরণ সূত্রটি বোঝাচ্ছে যে 'ক'-শ্রেণীর রূপমূলপরম্পরা যদি 'খ'-শ্রেণীর রূপমূলপরম্পরা দ্বারা অনুসৃত হয়, তবে 'কখ'-র বদলে 'চ'-শ্রেণীর যে-কোনো রূপমূল ব্যবহার করা যাবে। অস্পষ্টতার সম্ভাবনা দেখা দিলে 'কখ'-র বদলে 'ক+খ'-ও লেখা যেতে পারে। এ-সূত্র 'প্রতিবেশকাতর', এবং 'প্রতিবেশমুক্ত' হ'তে পারে। বিশেষ প্রতিবেশে প্রতিকল্পন বোঝানোর জন্যে সমীকরণসূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতিবেশের। একটি প্রতিবেশকাতর প্রতিকল্পন সূত্রের উদাহরণ : কখ=চখ। এ-সূত্রটি বোঝাচ্ছে যে 'ক'-শ্রেণীর রূপমূলের ডানে 'খ'-শ্রেণীর রূপমূল থাকলে 'ক'-শ্রেণীর রূপমূলের বদলে 'চ'-শ্রেণীর রূপমূল ব্যবহার করা যেতে পারে। সমীকরণসূত্র রচনার আরো সুষ্ঠু ও সরল প্রণালি, পরবর্তীকালে, বের করেন রূপান্তরবাদীরা। বাঙলা ভাষা বর্ণনার জন্যে প্রথমে দরকার রূপমূল ও রূপমূল-শ্রেণী শনাক্ত করা। আমি কয়েকটি রূপমূল ও রূপমূল-শ্রেণী নেবো, এবং শনাক্তির প্রণালি দেখানো থেকে বিরত থাকবো। বুঝতে হবে যে প্রতিটি রূপমূল-শ্রেণীর সদস্যারা পরস্পরের বদলে বাক্যের নির্দিষ্ট অংশে ব্যবহৃত হ'তে পারে। নিচের রূপমূল-শ্রেণীসমূহ নিচ্ছি :

(৩) বি(শেষ্য) : যে-সমস্ত রূপমূলের অন্তে বহুবচনচিহ্ন 'রা', 'গুলো' ব্যবহৃত হ'তে পারে; এবং আগে 'একটি', 'দুটি', 'তিনটি' ইত্যাদি নির্দেশক, অথবা বিশেষণ বসতে পারে। যেমন : 'ছেলে', 'মেয়ে', 'পাখি', 'ছাত্র'...।

ক্রি(য়া)-১ : সকর্মক ক্রিয়া, যা দুটি বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন : 'কিন', 'লিখ', 'দেখ'...। এগুলো 'ছেলেটি একটি বই—ছে/এছ/বে' প্রতিবেশে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

ক্রি(য়া)-২ : অকর্মক ক্রিয়া, যা একটি বিশেষ্যের পর বসতে পারে। যেমন : 'যা', 'নাচ', 'ঘুমা'...। এগুলো 'মেয়েটি—ছে' প্রতিবেশে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

অনু(সর্গ) : 'টা', 'টি' ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিবেশ 'এক—ছেলে'।

সং(খ্যা) : 'এক', 'দু(ই')', 'তিন'...। এগুলোর প্রতিবেশ '—টি ছেলে'।

বি(শেষ)ণ : 'সুন্দর', 'ভালো', 'চমৎকার'...। এগুলোর প্রতিবেশ 'একটি—মেয়ে'।

ক্রি(য়া)স(হায়ক) : 'এ', 'ই', 'এছে', 'লো'...। এগুলোর প্রতিবেশ 'একটি মেয়ে নাচ—'।

(৩)-এ সাতটি রূপমূল-শ্রেণী স্থির করা হয়েছে। এখন দেখতে হবে কোন কোন রূপমূলপরম্পরাকে মাত্র একটি রূপমূল দ্বারা বদলানো সম্ভব। যদি দেখা যায় যে কোনো রূপমূল-শ্রেণীপরম্পরাকে শুধুমাত্র একটি রূপমূল-শ্রেণীর কোনো সদস্যের দ্বারা বদল করা সম্ভব, তবে সে-রূপমূল-শ্রেণীপরম্পরাকে সমীকৃত করা হবে প্রতিকল্পনযোগ্য রূপমূল-শ্রেণীর সাথে। যেমন : 'একটি সুন্দর মেয়ে এসেছিলো' বাক্যের 'সুন্দর মেয়ে'র স্থানে ব্যবহার করতে পারি 'ছেলে' রূপমূলটি, এবং পেতে পারি ব্যাকরণসম্মত বাক্য 'একটি ছেলে এসেছিলো'। এখানে দেখা যাচ্ছে যে 'বিশেষণ + বিশেষ্য' পরম্পরার বদলে শুধুমাত্র একটি বিশেষ্য বসানো সম্ভব। এ-প্রতিকল্পনপ্রণালিকে নিচের সমীকরণসূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় : বিণ-১ + বি=বি। এমন কয়েকটি সমীকরণপ্রণালি ও সূত্র (৪)-এ দেয়া হলো :

(৪) 'একটি সুন্দর মেয়ে' = 'একটি মেয়ে' = 'মেয়ে'। সমীকরণসূত্র :

সং + অনু + বিণ + বি = সং + অনু + বি = বি।

'পড়-ছে'='পড়ছে'। সমীকরণসূত্র : ক্রি-১ + ক্রিস = ক্রি(য়া)প(দ)।

'একটি চমৎকার বই পড়ছে' = 'একটি বই পড়ছে' = 'বই পড়ছে' = 'পড়ছে'।

সমীকরণসূত্র : সং + অনু + বিণ + বি + ক্রি-১ + ক্রিস = সং + অনু + বি + ক্রি-১ + ক্রিস = বি + ক্রি-১ + ক্রিস = ক্রিপ।

'একটি সুন্দর মেয়ে একটি চমৎকার বই পড়ছে'='একটি মেয়ে একটি বই পড়ছে'='একটি মেয়ে বই পড়ছে'='একটি মেয়ে পড়ছে'=? 'মেয়ে পড়ছে'।

সমীকরণসূত্র : সং + অনু + বিণ + বি + সং + অনু + বিণ + বি + ক্রি-১ + ক্রিস = সং + অনু + বি + সং + অনু + বি + ক্রি-১ + ক্রিস = সং + অনু + বি + বি + ক্রি-১ + ক্রিস = সং + অনু + বি + ক্রি-১ + ক্রিস = ? বি + ক্রিপ।

(৪)-এ সমীকরণের পর সমীকরণ করে অনেকগুলো রূপমূলের সমবায়ে গঠিত একটি বাক্যকে সংকুচিত করা হয়েছে দুটি রূপমূলের পরম্পরায়। এ-বর্ণনা বাক্যের বহিঃস্তরের রূপমূলের পরম্পরা নির্দেশ করে : দেখাতে চায় কোনো ভাষার বাক্যে কী পরম্পরায় রূপমূলরাশি বিন্যস্ত হ'তে পারে। কিন্তু এ-পদ্ধতির ব্যর্থতা অসামান্য;—রূপমূলের ক্লান্তিকর শ্রেণীকরণের পর তাদের হাজারো বিন্যাস দেখানো যেমন বিরক্তিকর, বর্ণনাও তেমনি অন্তর্দৃষ্টিহীন। এক-একটি রূপমূলে ধ্বনিবিন্যাস সাধারণত বিশেষ ক্রম রক্ষা করে, কিন্তু বাক্যের উপাদানপুঞ্জ তেমন শক্ত ক্রম রক্ষা করে না। আর উপাদান বিন্যাসে অপার স্বাধীনতা বাঙলা বাক্যের বৈশিষ্ট্য। যেমন : 'তরুণ' রূপমূলটির পাঁচটি ধ্বনি-উপাদান তাদের বিন্যাসক্রম সব সময় রক্ষা করে। ক্রম বদলালে রূপমূলটিই পাল্টে যায়। এ-রূপমূলটি উপাদানগুলোর বিন্যাস বদলিয়ে পাওয়া যায় '*রুতণ', '*তণরু'র মতো নতুন রূপমূল। কিন্তু বাক্যের, বিশেষত বাঙলা বাক্যের, উপাদানপুঞ্জ এমন দৃঢ়ভাবে ক্রমরক্ষা করে না। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বাক্যটির মূল অর্থ নষ্ট না-ক'রে এর উপাদানগুলোকে নানাভাবে বিন্যস্ত করা যায়। তাই রূপমূলের বিন্যাসের সাহায্যে বাক্যবর্ণনা ব্যর্থ। এ-পদ্ধতিতে রূপমূলের পৌনপুনিক শ্রেণীকরণ সাধারণসূত্র রচনায় বাধা দেয়, এবং অসন্নিকট রূপমূলের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে পারে না। 'মেয়ে' রূপমূলটি কতো উপ-উপ-শ্রেণীর সদস্য হ'তে পারে, তার কয়েকটি নিদর্শন দেখানো হচ্ছে (৫)-এ :

(৫) ক-শ্রেণী : 'মেয়ে', 'কুকুর' এ-শ্রেণীর সদস্য; কেননা উভয়ই 'একটি—যাচ্ছে' প্রতিবেশে বসতে পারে।

খ-শ্রেণী : 'মেয়ে', 'ছেলে', এ-শ্রেণীর সদস্য, কিন্তু, 'কুকুর' নয়। '—টি মন্ত্রী হবে' প্রতিবেশে 'মেয়ে' 'ছেলে' বসতে পারে, কিন্তু 'কুকুর', সম্ভবত, পারে না।

গ-শ্রেণী : 'মেয়ে', 'মহিলা' এ-শ্রেণীর সদস্য, কিন্তু, 'ছেলে' নয়। '—(টি) রূপসী' প্রতিবেশে 'মেয়ে', 'মহিলা' বসতে পারে, কিন্তু 'ছেলে' পারে না।

ঘ-শ্রেণী : 'মেয়ে, 'কুকুর' এ-শ্রেণীর সদস্য, কিন্তু 'মহিলা' নয়। '—টি আসবে' প্রতিবেশে 'মেয়ে', 'ছেলে', 'কুকুর' বসতে পারে, কিন্তু 'মহিলা' পারে না। 'মহিলা'র উপযুক্ত প্রতিবেশ হচ্ছে '—আসবেন'।

(৫)-এ 'মেয়ে' রূপমূলটিকে ফেলা হয়েছে চারটি সুস্পষ্টভাবে পৃথক শ্রেণীতে। এমন শ্রেণীকরণ সাধারণসূত্র রচনায় ব্যর্থ হয়। বণ্টনিক বাক্যবর্ণনা পদ্ধতিতে রূপমূলের পারস্পরিক

নির্বাচন—বাক্যে বিভিন্ন রূপমূলের সহাবস্থানে—নির্দেশ করাও বেশ কঠিন। যে-সমস্ত রূপমূল পাশাপাশি অবস্থান করে, তাদের পারস্পরিক নির্বাচন, এ-পদ্ধতিতে, নির্দেশ করা যায়; কিন্তু অসংলগ্ন রূপমূলের পারস্পরিক নির্বাচন দেখানো অসম্ভব। 'এক— মেয়ে'র শূন্যস্থানে 'টি' বসতে পারে,—এ-ব্যাপারটি বণ্টনিক প্রণালিতে দেখানো যায়, কেননা 'এক'-জাতীয় রূপমূল-শ্রেণীর অব্যবহিত পরে বাঙলায় বসতে পারে 'টি'-জাতীয় রূপমূল-শ্রেণী। কিন্তু বিলগ্ন রূপমূলের পারস্পরিক নির্বাচন দেখানো এ-পদ্ধতির শক্তির বাইরে। (৬)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৬) ক মেয়েটি গান গায়।

খ *টাইপরাইটারটি গান গায়।

বাঙলা বাক্য রচনার নিয়মানুসারে (৬)-এর দুটি বাক্যই শুদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটির অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। 'মেয়ে', এবং 'টাইপরাইটার' উভয়ই '—টি' প্রতিবেশে বসতে পারে, কিন্তু 'গা(হ্)' ক্রিয়ার সাথে বসতে পারে শুধু 'মেয়ে', 'টাইপরাইটার' নয়। (৬)-এ 'মেয়ে' ও 'টাইপরাইটার'-এর প্রতিবেশ হচ্ছে '—টি গান গায়'। এ-প্রতিবেশের শূন্যস্থানে যে-সমস্ত রূপমূল বসতে পারে, তাদের থেকে 'গা'-র অবস্থান বেশ দূরে, তাই রূপমূলের পরম্পরার সাহায্যে তাদের পারস্পরিক নির্বাচন দেখানো কঠিন। 'গা' ক্রিয়ামূলের কর্তারূপে বসতে পারে কোন প্রাণীবাচক বিশেষ্য, এ-রীতিটি জানানোর জন্যে দরকার একটি বিমূর্ত সূত্র। রূপমূলের পরম্পরার সাহায্যে ব্যাপারটি দেখাতে গেলে অতিশয় জটিল সমস্যায় জড়াতে হবে।

ফ্রিজ-এর (১৯৫২) বাক্যবর্ণনাপ্রণালিও বণ্টন-বা প্রতিবেশ-ভিত্তিক। তবে তিনি, রূপমূল নয়, বর্ণনা করেন পদ, বা বাক্যাংশের [পার্টস অফ স্পিচ] বিচিত্র বিন্যাস। তিনি বাক্যকে রূপমূলের বিচিত্র বিন্যাসরূপে গ্রহণ না ক'রে রূপমূলের চেয়ে বৃহত্তর ভাষাবস্তুর বিন্যাসরূপে গ্রহণ করেছেন ব'লে তাঁর ব্যাকরণ হ্যারিসের ব্যাকরণের চেয়ে অধিকতর 'সাধারণ', ও উন্নত। প্রথাগত পশ্চিমি ব্যাকরণে আট প্রকার 'পদ' স্বীকার করা হয়, কিন্তু ফ্রিজ প্রচলিত পদবিভাগ মানেন নি। অন্যান্য সাংগঠনিকের মতো তাঁরও লক্ষ্য বাক্যের রৌপ বর্ণনা। তিনি ভাষাকে সৃষ্টিশীল ব'লে বিবেচনা না-ক'রে ইংরেজিকে ব্যাপকভাবে বর্ণনার জন্যে নিয়েছেন বিপুল পরিমাণ উপাত্ত। কিন্তু তাঁর ওই বিপুল উপাত্তও ইংরেজির এক তুচ্ছাংশ মাত্র। তিনি ভাষাকে যে-ভাষা-এককের বিচিত্র বিন্যাস ব'লে মনে করেন, এবং গ্রহণ করেছেন ইংরেজি-বর্ণনার জন্যে, তার অভিধা হচ্ছে 'গঠক-শ্রেণী' [ফর্ম-ক্লাস]। তবে তাঁর 'গঠক-শ্রেণী' প্রচলিত পশ্চিমি ব্যাকরণের 'পদ'-এর নামান্তর। প্রথাগত পাশ্চাত্য ব্যাকরণে স্বীকার করা হয় আট প্রকার পদ বা বাক্যাংশ : 'বিশেষ্য', 'সর্বনাম', 'বিশেষণ', 'ক্রিয়া', 'ক্রিয়াবিশেষণ', 'প্রিপজিশন', 'সংযোজক', ও 'অব্যয়'। মোটামুটিভাবে ১৮৫০ থেকে ইংরেজিতে এ-পদবিভাগ মানা হচ্ছে। ফ্রিজ এ-ঐতিহ্যে অবিশ্বাসী। প্রথাগত পদপ্রকরণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান আপত্তি : পদসমূহ

শনাক্ত করা হয়েছে আর্থ মানদণ্ডে, এবং সে-মানদণ্ড সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হয় নি। প্রথাগত ব্যাকরণে মানদণ্ডের অদলবদল এক পৌনপুনিক ঘটনা। পদশনাক্তির সময় সুবিধা মতো মানদণ্ড বদল করা হয়, এবং যে-সমস্ত পদ নির্ণয় করা হয়, তা এক বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার ফল। প্রথাগত ব্যাকরণে বিভিন্ন পদের সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হয় আর্থ মানদণ্ড। বিশেষ্যের প্রথাগত সংজ্ঞা হচ্ছে (দ্র সুনীতিকুমার (১৯৭২, ৪৯)): 'যে পদে কোনও কিছুর 'নাম'—জীব, বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, ক্রিয়া, ভাব বা গুণের নাম–বুঝায়, তাহাকে বলে বিশেষ্য (বা নাম)।' এ-সংজ্ঞা এতো মুক্ত ও সাধারণ যে বিশ্বের সমস্ত কিছুকেই বিশেষ্য বলা যেতে পারে (দ্র § ২.৩.০)। 'হাসান', 'ঢাকা' বিশেষ্য, কেননা এরা যথাক্রমে ব্যক্তি ও স্থানের নাম বোঝায়, 'লাল', 'নীল'ও বিশেষ্য, কেননা এরা রঙের নাম বোঝায়; কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে 'একটি লাল ফুল', 'নীল আকাশ' প্রভৃতি বাক্যাংশে ব্যবহৃত 'লাল' ও 'নীল'কে বিশেষ্য না ব'লে বলা হয় 'বিশেষণ'। বিশেষণের সংজ্ঞা দেয়া হয় প্রচলিত ব্যাকরণে এভাবে (দ্র সুনীতিকুমার (১৯৭২, ৪৯)) : 'যে পদ বিশেষ্য বা অন্য কোনও পদকে 'বিশেষিত' করে, অন্য কোনও পদের অর্থকে বিশেষ-ভাবে নির্দেশ করে, তাহাকে বলে বিশেষণ।' বিশেষ্য ও বিশেষণের সংজ্ঞা দুটি বিচার করলে বোঝা যায় যে সংজ্ঞা দুটি অভিন্ন মানদণ্ডে রচিত নয়। বিশেষ্যের সংজ্ঞানির্ণয়ে মানদণ্ডরূপে নেয়া হয় শব্দার্থ, এবং বিশেষণের সংজ্ঞানির্ণয়ে মানদণ্ডরূপে নেয়া হয় পদগুলোর ভূমিকা [ফাংশন]কে। বিভিন্ন মানদণ্ডে বিভিন্ন পদ নির্ণীত ব'লে প্রথাগত ব্যাকরণের পদপ্রকরণকে ফ্রিজ, এবং আরো অনেকে, পরিহার্য মনে করেন। ফ্রিজ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এমন এক মানদণ্ড, যার সাহায্যে সমস্ত 'গঠন-শ্রেণী' নির্ণয় করা সম্ভব।

ফ্রিজ (১৯৫২, ৫৬) সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে বাক্যার্থ আমরা বুঝি বাক্যের শব্দগুলোর নিজস্ব অর্থ ও সাংগঠনিক অর্থের সংশ্লেষের মাধ্যমে। সাংগঠনিক অর্থ, ফ্রিজের মতে, দ্যোতিত হয় এমন সব রৌপ ভাষাবস্তুর সাহায্যে, যাদের রূপ (গঠন) ও বিন্যাসক্রম বর্ণনা করা সম্ভব। বাক্যের সাংগঠনিক অর্থের ভিত্তি হচ্ছে শব্দসমবায়ে গঠিত নানারকম 'গঠক-শ্রেণী'। তাই তাঁর কাছে বাক্য শব্দসমবায় নয়, বাক্য হচ্ছে বিভিন্ন গঠক-শ্রেণীর বিন্যাস। কোনো বাক্যের সাংগঠনিক অর্থ বোঝার জন্য বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাশির অর্থ জানার দরকার নেই, দরকার হচ্ছে ওই শব্দরাশি কোন গঠক-শ্রেণীভুক্ত, তা জানা। তাই বিভিন্ন গঠক-শ্রেণী নির্ণয়, ও তাদের বিন্যাস দেখানোই ফ্রিজের বাক্যবর্ণনার সারকথা। ফ্রিজকথিত সাংগঠনিক অর্থ ব্যাপারটি বোঝার জন্যে লুইস ক্যারল, বা সুকুমার রায়ী নিরর্থ শব্দগঠিত বাক্যের সাহায্য নেয়া যাক :

(৭) ক *একটি লাল টশর টাশছে।

খ *টশরগুলো টাশছিলো।

'*টশর', ও '*টাশ' শব্দ দুটি বাঙলায় অর্থশূন্য, কিন্তু বাক্য দুটিতে যে-স্থানে এরা বসেছে, তাতে বোঝা যায় যে, '*টশর' বিশেষ্যশ্রেণীর শব্দ, এবং '*টাশ' ক্রিয়াশ্রেণীর। 'একটি', ও

'গুলো' বাঙলায় বিশেষ্যশব্দের সাথেই বসে, এবং 'ছে', 'ছিলো' ইত্যাদি বসে ক্রিয়াশব্দের সাথে। '*টশর' ও '*টাশ'-এর অর্থ না বুঝলেও এরা বাক্য দুটিতে যে-স্থানে বসেছে, তার দ্বারা বাক্য দুটির একরকম 'সাংগঠনিক অর্থ' বাঙলাভাষীর বোধগম্য। বাক্যে এ-শব্দ দুটির অবস্থান ও ভূমিকা ভিন্ন।

ফ্রিজের মতে বাক্যে গঠক-শ্রেণীর বিভিন্ন বিন্যাসে জন্মে সাংগঠনিক অর্থ। তাই গঠক-শ্রেণী হচ্ছে বাক্যবর্ণনার জন্যে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। ফ্রিজের গঠক-শ্রেণীর শনাক্তির প্রণালি অভিনব নয়। সাংগঠনিকেরা যে-ভাবে আবিষ্কার করেন বিভিন্ন ভাষাবস্তু-শ্রেণী, সে-প্রতিকল্পন প্রণালির সহায়তায় তিনিও আবিষ্কার করেন তাঁর 'গঠক-শ্রেণী'। যে-সমস্ত শব্দ কোনো ভাষার বাক্যে (ফ্রিজ ইংরেজিনির্ভর) অভিন্ন প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়, তারা এক গঠক-শ্রেণীভুক্ত। ফ্রিজ ইংরেজিতে দু-রকম গঠক-শ্রেণীর সন্ধান পেয়েছেন। এদের বলা যায় : 'প্রধান গঠক-শ্রেণী', ও 'অপ্রধান গঠক-শ্রেণী'। প্রধান গঠক-শ্রেণী গঠন করে যে-কোনো ভাষার প্রধানাংশ, আর অপ্রধান গঠক-শ্রেণী ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের নাটবল্টুরূপে। চার রকম গঠক-শ্রেণীকে তিনি প্রধান গঠনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নামকরণে অর্থাগমবশত রূপ বর্ণনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে ব'লে তিনি তাঁর চার প্রধান গঠক-শ্রেণীকে সংখ্যার সাহায্যে নির্দেশ করেছেন, এবং তাদের অভিধা দিয়েছেন 'গঠক-শ্রেণী-১', 'গঠক-শ্রেণী-২', 'গঠক-শ্রেণী-৩', ও 'গঠক-শ্রেণী-৪'। তবে তাঁর 'গঠক-শ্রেণী-১', 'গঠক-শ্রেণী-২', 'গঠক-শ্রেণী-৩', ও 'গঠক-শ্রেণী-৪' যথাক্রমে প্রথাগত ব্যাকরণের 'বিশেষ্য', 'ক্রিয়া', 'বিশেষণ', ও 'কালজ্ঞাপক শব্দরাজি'র সমান্তরাল, বা নামান্তর। অপ্রধান গঠক-শ্রেণীকে, যাকে তিনি বলেন 'ভূমিকা শব্দ' [ফাংশন ওয়ার্ড], ফ্রিজ ভাগ করেছেন পনেরোটি উপশ্রেণীতে। প্রধান গঠক-শ্রেণীভুক্ত চার রকম গঠক-শ্রেণী ছাড়া ইংরেজির অন্যান্য শব্দ 'ভূমিকা-শব্দশ্রেণী', বা 'ব্যাকরণিক গঠক-শ্রেণী'র অন্তর্গত। বাঙলায় 'টা, টি, খানা...' ইত্যাদি অনুসর্গ, 'কে, রে, এ,...' প্রভৃতি বিভক্তি তাঁর ব্যাকরণিক গঠক-শ্রেণীতে পড়বে।

ফ্রিজের গঠক-শ্রেণীশনাক্তির হাতিয়ার হচ্ছে প্রতিকল্পনপ্রণালি। প্রতিকল্পনের জন্যে তিনি ব্যবহার করেছেন স্বল্পসংখ্যক শব্দসমবায়ে গঠিত নানাপ্রকার বাক্যকাঠামো [ফ্রেম]। মনে করা যাক, বাঙলা বাক্যের তিন রকম কাঠামো নিম্নরূপ :

(৮) ক-কাঠামো : মেয়েটি সুন্দর ছিলো।

খ-কাঠামো : মেয়েটি একটি ছেলেকে ভালোবাসে।

গ-কাঠামো : মেয়েটি সেখানে যাবে।

প্রথমে ক-কাঠামোর বাক্য 'মেয়েটি সুন্দর ছিলো'র 'মেয়ে'র স্থানে অন্য শব্দ ব্যবহার ক'রে যদি দেখা যায় যে বাক্যটির সাংগঠনিক অর্থে কোনো ভিন্নতা ঘটে নি, তবে যে-সমস্ত

শব্দ ওই স্থানে বসতে পারে তাদের গ্রহণ করতে হবে একই গঠক-শ্রেণীর সদস্য ব'লে। (৮)-এর ক-কাঠামোর বাক্য 'মেয়েটি সুন্দর ছিলো'র 'মেয়ে'র স্থানে অন্য শব্দ বসিয়ে পাবো (৯) :

(৯) { ছেলে, গরু, পাখি, কবিতা, দৃশ্য, সুর,
পোশাক, স্বপ্ন, নর্তকী, উপমা, চিত্রকল্প, গাধা, ছাত্রী,
কেঁচো, প্রচ্ছদপট, পুতুল, রাত্রি, সন্ধ্যা,... } টি সুন্দর ছিলো।

(৯)-এ প্রতিকল্পনের সাহায্যে আঠারোটি শব্দ পাওয়া গেছে, যারা পরস্পর বদলযোগ্য। এদের সাথে বদলযোগ্য আরো বহু শব্দ আছে বাঙলায়। এ-সব শব্দকে বিবেচনা করা যেতে পারে একই শ্রেণীভুক্ত ব'লে। দেখা যাবে বাঙলায় আরো অনেক শব্দ আছে, যাদের ব্যবহার করা সম্ভব উল্লিখিত প্রতিবেশে, যদি বাক্যে সামান্য পরিবর্তন ঘটাই। যেমন : 'ভদ্রলোক', 'মহিলা'...প্রভৃতি শব্দ বসাতে পারি উল্লিখিত প্রতিবেশে, যদি ডান দিকের 'টি', টি' বাদ দিই, এবং ক্রিয়ারূপে কিছুটা বদল ঘটাই। যেমন : (১০)-এ :

(১০) {ভদ্রলোক, মহিলা, আব্বা, তিনি...} সুন্দর ছিলেন।

এখন এ-শব্দরাশির জন্যে যে-কাঠামো পাওয়া গেলো, তা হলো :

(১১) ক —টি সুন্দর ছিলো।
খ —সুন্দর ছিলেন।

এমন প্রতিকল্পনের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব বাঙলা ভাষার গঠক-শ্রেণী। প্রধান ও অপ্রধান উভয় শ্রেণীর গঠকই পাওয়া যাবে বাঙলায়, কিন্তু তাদের সংখ্যা আজো অনির্ণীত। যখন সমস্ত গঠক-শ্রেণী শনাক্ত করা হবে, তখন বিভিন্ন কাঠামোর যে-সমস্ত স্থানে সেগুলো ব্যবহৃত হ'তে পারে, সে-অনুসারে বাঙলা বাক্যের সংগঠন গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করা যাবে। তবে ফ্রিজের আবিষ্কৃত গঠক-শ্রেণীও অকাট্য নয়; স্থূল বহিঃসংগঠনের ওপর প্রতিকল্পনপ্রণালি ব্যবহার ক'রে তিনি গঠক-শ্রেণী নির্ণয় করেছেন ব'লে বিভ্রান্তি প্রায়ই চোখে পড়ে। বাঙলা ভাষার ওপর ফ্রিজ-ধরনের শক্ত দৃঢ় সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চালানো কঠিন। বাংলা বাক্য অদৃঢ়; দৃঢ়শব্দক্রম না মানাই বাঙলার বৈশিষ্ট্য। সহ্যগুণে বাঙলা ভাষা স্বর্ণস্বভাবী, যে-পীড়নে ইংরেজি-ফরাশি সংজ্ঞাহীন হয়, বাঙলা তা অবলীলায় সহ্য করে। ফ্রিজের বাক্য-কাঠামো ব্যবহার করা সম্ভব দৃঢ় শব্দক্রমসম্পন্ন ভাষায় এবং তাতে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু প্রায়-মুক্ত, বা স্বাধীন শব্দক্রমসম্পন্ন ভাষায় তার ব্যবহার সুফলদায়ক নয়।

ফ্রিজের বাক্যবর্ণনাকৌশলও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, যেহেতু তিনি বাক্যের সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাসী নন। তিনি বিপুল পরিমাণ গঠিত বাক্যকে গঠক-শ্রেণীর কাঠামোতে ফেলে বর্ণনা করেন। তাই তাঁর ব্যাকরণকে (১৯৫২) সাংগঠনিক অন্যান্য ব্যাকরণের মতোই 'উপাত্তের ভিন্ন বিন্যাস' বলা যেতে পারে। ফ্রিজ, অন্যান্য সাংগঠনিকের মতোই, অর্থ ত্যাগ ক'রে রৌপ ব্যাকরণ রচনার

জন্যে দেখান গঠক-শ্রেণীর বিবিধ বিন্যাস, তাই বাক্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির অসীম অভাব গোচরে আসে তাঁর বর্ণনায়। এ-প্রণালি বাক্যরাশির মধ্যে সাদৃশ্যের বদলে বৈসাদৃশ্যই বড়ো ক'রে তোলে; ফলে অতি সন্নিকট দুটি বাক্যের মধ্যেও দেখানো যায় না কোনো সাদৃশ্য। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথাগত ব্যাকরণের 'অস্পষ্ট', 'আর্থ' পদনির্ণায়ক মানদণ্ড পরিত্যাগ ক'রে রৌপ মানদণ্ডে শনাক্ত করতে চেয়েছিলেন রূপশ্রেণী, বা গঠক-শ্রেণী। কিন্তু তাঁরা বেশি দামে কিনেছেন সামান্য সাফল্য। ফ্রিজের কাছে বাক্য হচ্ছে গঠক-শ্রেণীর সরলরৈখিক পরম্পরা। প্রথাগত ব্যাকরণেও বাক্যকে বিবেচনা করা হয় বিভিন্ন পদের পরম্পরা, বা ক্রম ব'লে। তবে ফ্রিজের নবত্ব হচ্ছে যে তিনি পদসমূহকে নির্ণয় করেছেন 'রূপগতভাবে', এবং পুরোনোপন্থী পদ-নামের বদলে তাদের দিয়েছেন নতুনপন্থী সংখ্যাবাচক অভিধা। প্রতিকল্পনের মাধ্যমে পদনির্ণয় ব্যাপারটিও অভ্রান্ত নয়। ফ্রিজের ব্যাকরণকাঠামো অনুপযুক্ত ব'লে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে (দ্র লিজ ১৯৬২))। এ-পদ্ধতিতে পৌনপুনিক-ভাবে শ্রেণীকরণ করতে হয়, এবং শুধুমাত্র পরম্পরার খাতিরে এমন শব্দাবলিকে অভিন্ন ও বিভিন্ন গোত্রে বিন্যস্ত করতে হয়, যাদের এমন বিন্যাস ভাষাভাষীর বোধবিরোধী।

৩.২ অব্যবহিত উপাদানকৌশল

কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ গঠনে অংশী ভাষাবস্তুসমূহ ওই বাক্য বা বাক্যাংশে পরস্পর নিঃসম্পর্কিত রূপে ও সরলরেখাক্রমে বিন্যস্ত হয় না। সংলগ্ন শব্দরাশির মধ্যে একরকম ঘনিষ্ঠতা থাকে, এবং ওই ঘনিষ্ঠ শব্দসমূহ অনেকটা অচ্ছেদ্য এককের মতো কাজ করে। বাক্যে, বা বাক্যাংশে অব্যবহিতক্রমে অবস্থিত শব্দের মধ্যে বিরাজমান ঘনিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে বাক্য, বা বাক্যাংশ বিশ্লেষণের অব্যবহিত উপাদানতত্ত্ব। 'অব্যবহিত উপাদান (সংক্ষেপে 'আইসি', বাঙলায় 'অ-উ') তত্ত্ব'-এর উন্মেষ ঘটে ব্লুমফিল্ডে (১৯৩৩), সম্প্রসারণ ঘটে বিভিন্ন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীর রচনায় (দ্র ওয়েলস (১৯৪৭), হ্যারিস (১৯৫১), ফ্রিজ (১৯৫২), গ্লিসন (১৯৫৫), হকেট (১৯৫৮)), এবং এ-তত্ত্ব সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল, শক্তিমান হয়ে ওঠে রূপান্তরবাদীদের রচনায় (দ্র চোমস্কি (১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৬২), পোস্টাল (১৯৬৪ ক, খ))। অব্যবহিত উপাদানতত্ত্ব সাংগঠনিকদের হাতে অত্যন্ত স্থবির ও নিষ্প্রাণ হয়ে উঠছিলো ক্রমশ, কিন্তু চমস্কি ও অন্যান্য রূপান্তরবাদীর, যাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো এ-তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা দেখানো, ছোঁয়ায় তা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, সুশৃঙ্খল, ও অভাবিত শক্তিগর্ভ। অব্যবহিত উপাদানতত্ত্বকে নামান্তরিত ক'রে ব্যবহার করা হয় রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তি কক্ষে। অব্যবহিত উপাদানতত্ত্ব 'প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা' ও বাল্যে-পড়া বীজগণিতের বন্ধনিকরণপ্রণালির সাথে তুল্য। বিষয়টি বেশ সহজ, কোনো ভয়াবহ জটিলতা নেই এতে। মনে করা যাক, আমাদের নিচের রাশিগুলো রয়েছে :

(১২) ক $ক \times (খ + গ)$

খ $ক \times খ + গ$

(১২ক)তে, প্রচলিত নিয়মানুসারে, বন্ধনিমধ্যস্থ বস্তুরাশির মধ্যে যোগের কাজ আগে করা হবে, এবং পরে করা হবে গুণের কাজ, এবং (১২খ)তে আগে করা হবে গুণের কাজ, এবং পরে করা হবে যোগের কাজ। যদি ধরি যে ক=৪, খ=৬, এবং গ=৮, তবে (১২ক)র ফল হয় ৫৬, এবং (১২খ)র ফল হয় ৩২। (১২ক, খ)র দ্ব্যর্থহীন ফল লাভের কারণ এখানে সুনির্দিষ্ট প্রথানুসারে বন্ধনি-গুণ-যোগের কাজ করা হয়েছে। এখানে দ্ব্যর্থতার কোনো সম্ভাবনা রাখা হয় নি' ; —কোন রাশির সাথে কোন রাশির সম্পর্ক কেমন, এখানে তা নির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত। মানবভাষার বাক্যে এমন সব শব্দপরম্পরা পাওয়া যায়, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-ও অসম্পর্ক-বশত বাক্য দ্ব্যর্থ ও অদ্ব্যর্থ হয়। দ্ব্যর্থ বাক্যকে দ্ব্যর্থতা থেকে মুক্তিদানের উপায় হলো বন্ধনিকরণ, অর্থাৎ বাক্যের অব্যবহিত শব্দের ঘনিষ্ঠতা-অঘনিষ্ঠতা নির্ণয়। বাঙলা ভাষার বহু পদ [ফ্রেজ], ও বাক্য দ্ব্যর্থ, বা বহুঅর্থবোধক। এ-সব পদ ও বাক্যকে দ্ব্যর্থতা থেকে অদ্ব্যর্থতায় নিয়ে আসা যায় অব্যবহিত উপাদান নির্ণয় ক'রে।

(১৩)র পদসমূহ লক্ষণীয় :

(১৩) ক তরুণ ও তরুণীরা; প্রেমিক ও প্রেমিকার; নৃত্য ও গীতানুষ্ঠান।

খ চমৎকার যুবক ও যুবতী; রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক; হিংস্র হস্তী ও গণ্ডার।

গ নতুন শাড়ির দোকান; হলুদ চাঁদের জ্যোৎস্না; সবুজ পাতার আন্দোলন।

উল্লিখিত পদরাশি, দৈনন্দিন ব্যবহারে, অদ্ব্যর্থ হয়ে ওঠে যোগ্য পরিস্থিতির সহায়তায়, যদিও এগুলো উপাদানের বিভিন্ন বিন্যাসে সহজেই দ্ব্যর্থ হয়ে উঠতে পারে। (১২)র রাশিমালার সাথে (১৩)র পদরাশির পার্থক্য হচ্ছে (১২)তে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক, কিন্তু (১৩)তে তা দেখানো হয় নি। মানবভাষা গাণিতিক ভাষা নয়, এতে দ্ব্যর্থতার অপার সম্ভাবনা থাকে। (১৩)র পদসমূহের আন্তর দ্ব্যর্থতা মোচন করা সম্ভব পদগুলো গঠনে অংশী উপাদানের বন্ধনিকরণের সাহায্যে : কোনো বিশেষ উপাদান অন্য কোন উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠ, বা ঘনিষ্ঠ নয়, তা নির্ণয় ক'রে। (১৩ক)র পদগুলোকে তাদের উপাদানসমূহের ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিম্নরূপ দু-ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি :

(১৪) ক 'তরুণ ও তরুণীরা'=(তরুণ ও তরুণী)রা; 'প্রেমিক ও প্রেমিকার'=(প্রেমিক ও প্রেমিকা)র; 'নৃত্য ও গীতানুষ্ঠান'=(নৃত্য ও গীত) অনুষ্ঠান। এখানে অব্যবহিত উপাদান বিন্যাস হচ্ছে : (ক+খ) গ।

খ 'তরুণ ও তরুণীরা' = (তরুণ) ও (তরুণী + রা); 'প্রেমিক ও প্রেমিকা'র=(প্রেমিক) ও (প্রেমিকা+র); 'নৃত্য ও গীতানুষ্ঠান'=(নৃত্য) ও (গীত+অনুষ্ঠান)। এখানে অ-উ বিন্যাস হচ্ছে : (ক) + (খ+গ)।

(১৩খ)র পদসমূহের দু-রকম অব্যবহিত উপাদান বিন্যাস হবে নিম্নরূপ :

(১৫) ক 'চমৎকার যুবক ও যুবতী' = (চমৎকার (যুবক ও যুবতী); 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক'=(রক্তিম (ওষ্ঠ ও চিবুক); 'হিংস্র হস্তী ও গণ্ডার'=(হিংস্র (হস্তী ও গণ্ডার)। এখানে অ-উ বিন্যাস হচ্ছে : (ক (খ+গ)।

খ 'চমৎকার যুবক ও যুবতী'=(চমৎকার যুবক) ও (যুবতী); 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক'=(রক্তিম ওষ্ঠ) ও (চিবুক); 'হিংস্র হস্তী ও গণ্ডার'=(হিংস্র হস্তী) ও (গণ্ডার)। এখানে অ-উ বিন্যাস হচ্ছে : (ক+খ)+গ।

(১৩গ)র পদসমূহের দু-রকম অব্যবহিত উপাদান বিন্যাস হবে নিম্নরূপ :

(১৬) ক 'নতুন শাড়ির দোকান'=(নতুন (শাড়ির দোকান); 'হলুদ চাঁদের জ্যোৎস্না'=(হলুদ (চাঁদের জ্যোৎস্না): 'সবুজ পাতার আন্দোলন'=(সবুজ (পাতার আন্দোলন)। এখানে অ-উ বিন্যাস হচ্ছে : ক (খ+গ)।

খ 'নতুন শাড়ির দোকান'=(নতুন শাড়ির) দোকান); 'হলুদ চাঁদের জ্যোৎস্না' (হলুদ চাঁদের) জ্যোৎস্না); 'সবুজ পাতার আন্দোলন'=(সবুজ পাতার) আন্দোলন)।

এখানে অ-উ বিন্যাস হচ্ছে : (ক+খ) গ।

(১৩)র পদসমূহকে দু-রকম অব্যবহিত উপাদানে বিন্যস্ত করা হয়েছে (১৪-১৬)তে; এবং এ-পদসমূহের দ্ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'তরুণ ও তরুণীরা' পদটিকে যদি বিন্যস্ত করি '(তরুণ ও তরুণী)রা'-রূপে, তবে পদটি তরুণতরুণীর সম্মিলিত বহুবচনতা বোঝায়; কিন্তু পদটিকে যদি বিন্যস্ত করি '(তরুণ) ও (তরুণী+রা)'-রূপে, তবে পদটি (সম্ভবত) একজন তরুণ ও বহু তরুণীর সমবায় বোঝায়। 'প্রেমিক ও প্রেমিকার' পদটি, (১৪ক)-রূপী বিন্যাসে, প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলিত অধিকার জ্ঞাপন করে; এবং (১৪খ)-রূপী বিন্যাসে প্রেমিক পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে; এবং অধিকার বোঝায় শুধু প্রেমিকার। 'নৃত্য ও গীতানুষ্ঠান' পদটি, (১৪ক)-রূপী বিন্যাসে, বোঝায় নৃত্যগীতের মিলিত অনুষ্ঠান, কিন্তু পদটি, (১৪খ)-রূপী বিন্যাসে, বোঝায় শুধু গীতের অনুষ্ঠান, নৃত্য থাকে পৃথক হয়ে। 'চমৎকার যুবক ও যুবতী' পদটি, (১৫ক)-রূপী বিন্যাসে, বোঝায় যে যুবক ও যুবতী উভয়ই চমৎকার, কিন্তু (১৫খ)-রূপী বিন্যাসে বোঝায় যে শুধু যুবকটিই চমৎকার, যুবতী নয়। এখানে বিশেষণের আলো লাগে শুধু যুবকের শরীরে, যুবতী থাকে অবিশেষিত। 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক' পদটি, (১৫ক)-রূপী বিন্যাসে, জানায় যে অদৃশ্যার ওষ্ঠ ও চিবুক উভয় অঞ্চলই রক্তিম, কিন্তু (১৫খ)-রূপী বিন্যাসে রক্তিমা লাগে শুধু ওষ্ঠে, চিবুকে নয়। 'হিংস্র হস্তী ও গণ্ডার' পদটি, যথাক্রমে (১৫ক, খ) বিন্যাসে, জ্ঞাপন করে উভয় প্রাণীর হিংস্রতা, এবং শুধুমাত্র হস্তীর হিংস্রতা। (১৩গ)র পদসমূহ অব্যবহিত উপাদানের ভিন্ন বিন্যাসে কেমন দ্ব্যর্থ হয়ে উঠতে পারে, তা (১৬)র উপাদান বিন্যাস অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে।

(১৩)র পদরাশিকে (১৪-১৬)তে অব্যবহিত উপাদানের দু-রকম বিন্যাসে ন্যস্ত করা হয়েছে। কোনো সংগঠনের উপাদানসমূহের ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদের যেমন উল্লিখিত রূপে বন্ধনিকরণ সম্ভব, ঠিক তেমনি সম্ভব তাদের 'বৃক্ষচিত্র', বা 'পদচিত্র'-এ উপস্থাপন (দ্র § ৪.৩.১)। পদচিত্রে উপস্থাপিত হ'লে সংগঠনের গঠনগতরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক' পদটিকে, যথাক্রমে (১৫ক, খ)-রূপী বিন্যাস অনুসারে, (১৭ক, খ) পদচিত্ররূপে মূর্ত করা যায় :

(১৭)
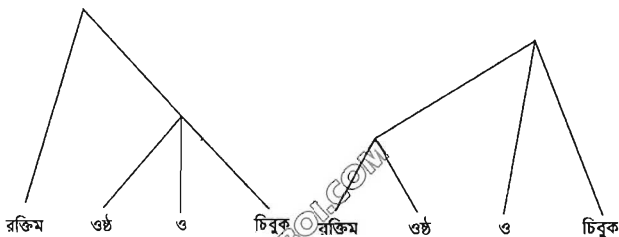
(১৭)তে 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক' পদটির বিভিন্ন উপাদানের লগ্নতা-বিলগ্নতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (১৭ক)তে পদটি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত : এক দিকে 'রক্তিম' এবং অন্য দিকে 'ওষ্ঠ ও চিবুক', এবং এরা দুটি এককরূপে কাজ করছে। (১৭খ)কে পাচ্ছি উপাদানের ভিন্ন বিন্যাস। উপাদানের ভিন্ন বিন্যাসের ফলেই একই ভাষাবস্তুতে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক' পদটি দু-রূপে দু-অর্থ বহন করে। (১৪-১৭)র উদাহরণগুচ্ছ সম্ভবত একটি বিষয় জানাতে পেরেছে যে কোনো সংগঠনে উপাদানরাশির সরলরৈখিক বিন্যাসের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সংগঠনটির সংলগ্ন বা অব্যবহিত উপাদানের ঘনিষ্ঠতা। একটি উপাদান দ্বিতীয় একটি উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠ হ'লে পাওয়া যায় যে-অর্থ, তৃতীয় উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠ হ'লে তা পাল্টে যায়। কোনো বাক্য বা সংগঠনের অব্যবহিত উপাদান অর্থনিয়ন্ত্রক।

সাংগঠনিকেরা বাক্যবর্ণনার জন্যে অব্যবহিত উপাদানতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছিলেন, কিন্তু আয় করেছিলেন সামান্য সাফল্য। কোনো সংগঠনের বিভিন্ন উপাদানের সংলগ্নতা দেখানোর বেশি কিছু তাঁরা করতে পারেন নি। অব্যবহিত উপাদান সম্পর্কে সাংগঠনিক আলোচনাপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওয়েলস (১৯৪৭), এবং তিনি কতিপয় প্রণালি দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। অব্যবহিত উপাদাননির্ভর সাংগঠনিক বাক্যবর্ণনাকে বলা যেতে পারে 'হ্রস্বীকরণী রীতি', এবং একে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় 'সম্প্রসারণী রীতি'। পৌনপুনিক দ্বিখণ্ডীকরণের এক বিবর্ণ প্রণালি হচ্ছে অব্যবহিত উপাদাননির্ভর বাক্যবর্ণনারীতি। প্রথাগত

ব্যাকরণে বাক্যকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এ-দু-অংশে ভাগ করা হয়। এর অচেতন প্রভাবে পড়েছিলেন সাংগঠনিকেরা। তাঁরা বাক্যকে দ্বিধাবিভক্ত করতে করতে অগ্রসর হন, এবং এমন ধারণা পোষণ করেন যে প্রতিটি বাক্যই মৌলরূপে দ্বিআংশিক। এক-একটি বিশাল বাক্যকে পৌনপুনিক দ্বিখণ্ডনের মাধ্যমে ও প্রতিকল্পনের সহায়তায় তাঁরা পৌঁছেন বাক্যের দ্বিআংশিক মৌল রূপে, বা কাঠামোতে : এ-জন্যেই তাঁদের রীতি 'হ্রস্বীকরণী'। অন্যরূপে বাক্যের মৌল দ্বিঅংশকে প্রতিকল্পনের সহায়তায় ক্রমসম্প্রসারিত ক'রে ক'রে তাঁরা উপনীত হন সুদীর্ঘ বাক্যে : এ-জন্যেই তাঁদের রীতি 'সম্প্রসারণী', 'বা 'সম্প্রসারণবাদী'। কিন্তু এ-প্রণালি শুধু খণ্ডন শেখায়। সরল-জটিল-যৌগিক বাক্যের মধ্যে সমস্ত ভেদ লুপ্ত হয় এ-প্রণালিতে—সব রকম বাক্যই সরল বাক্যের রূপ ধরে।

অব্যবহিত উপাদানপ্রণালিতে বাক্যবর্ণনায় যে-সমস্ত 'বোধ', বা 'ধারণা' সহায়ক, ও আবশ্যক, সেগুলো হচ্ছে : 'উপাদান', 'অন্ত্য উপাদান', 'অব্যবহিত উপাদান', 'সংগঠন', 'প্রকেন্দ্রিক সংগঠন', 'বিকেন্দ্রিক সংগঠন', এবং 'প্রতিকল্পন'। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো (দ্র পরিশিষ্ট : দুই) :

[ক] উপাদান : নিজের চেয়ে বৃহত্তর কোনো সংগঠন গঠনে অংশী রূপমূল, শব্দ, বা সংগঠনই হচ্ছে 'উপাদান'। উপাদান সংগঠনে এককরূপে কাজ করে। রূপমূল, ও শব্দ যেমন কোনো সংগঠনে উপাদানরূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তেমনি কোনো ক্ষুদ্র সংগঠন উপাদান হিশেবে ব্যবহৃত হ'তে পারে বৃহত্তর কোনো সংগঠনে। যেমন : (১৭ক)তে সমগ্র সংগঠনটির একটি উপাদান হচ্ছে 'রক্তিম', এবং আরেকটি উপাদান হচ্ছে 'ওষ্ঠ ও চিবুক'। 'ওষ্ঠ ও চিবুক' একাধিক শব্দে গঠিত হ'লেও 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক' সংগঠনের এটি একটি উপাদান। অর্থাৎ কোনো সংগঠন নির্মাণে অংশী বস্তুসমূহ হচ্ছে ওই সংগঠনের উপাদান। তবে ওই উপাদান এককরূপী হ'তে হবে। যেমন : 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক'-এ 'ওষ্ঠ ও', বা 'ও চিবুক' উপাদান নয়; যেহেতু এরা এককরূপে কাজ করে না। 'উপাদান' ও 'সংগঠন'-এর মধ্যে পার্থক্যটি বেশ মজার : ক্ষুদ্রতম উপাদান ছাড়া সমস্ত উপাদানই সংগঠন, আর বৃহত্তম সংগঠন ছাড়া সমস্ত সংগঠনই উপাদান। যেমন : 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক' সংগঠনে ক্ষুদ্রতম উপাদান হচ্ছে 'রক্তিম', তাই এটি সংগঠন নয়, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে 'ওষ্ঠ ও চিবুক' একটি সংগঠন। পুনরায় 'রক্তিম ওষ্ঠ ও চিবুক' সংগঠনটি যেহেতু অন্য কোনো সংগঠনের অংশ নয়, তাই এটিই এখানে বৃহত্তম সংগঠন, এবং এজন্যে এটি উপাদান নয়। তবে বৃহত্তর কোনো সংগঠনে এটি বসতে পারে উপাদানরূপে। উপাদানকে ভাগ করা হয় দুটি প্রধান ভাগে : (ক.১) অন্ত্য উপাদান, এবং (ক.২) অব্যবহিত উপাদান।

[ক.১] অন্ত্য উপাদান : সংগঠনে অংশী অবিভাজ্য উপাদানই অন্ত্য উপাদান। মোটামুটি-ভাবে সংগঠনের প্রতিটি শব্দকেই ধরা হয় অন্ত্য উপাদানরূপে। যেমন : 'তোমার সোনালি চুল উড়ুক' বাক্যটি চারটি শব্দে গঠিত, এবং এগুলোর প্রত্যেকটিকে ধরতে পারি অন্ত্য

উপাদানরূপে। তবে সঙ্গত কারণে যদি এ-শব্দসমূহকে আরো ক্ষুদ্রাংশে ভাঙা হয়, তবে বাক্যটির অন্ত্য উপাদানের পরিমাণ বাড়বে।

[ক. ২] অব্যবহিত উপাদান : কোনো সংগঠন গঠনে প্রত্যক্ষভাবে অংশী উপাদানসমূহ (দুই, বা তার অধিক) ওই সংগঠনের অব্যবহিত উপাদান। সাংগঠনিকেরা সাধারণত কোনো সংগঠনকে দুটি উপাদানের সমবায় ব'লে মনে করেন; তবে দুয়ের অধিক উপাদান মিলেও কোনো সংগঠন গঠিত হ'তে পারে। যদি হয়, তবে তাদেরও অব্যবহিত উপাদানরূপে গ্রহণ করতে হবে। যেমন : 'তোমার সোনালি চুল উড়ুক' বাক্যটিতে গ্রহণ করতে পারি 'তোমার সোনালি চুল', এবং 'উড়ুক'—এ-অব্যবহিত উপাদান দুটির সমষ্টি ব'লে। পুনরায় 'তোমার সোনালি চুল' সংগঠনটির অব্যবহিত উপাদান হচ্ছে 'তোমার', এবং 'সোনালি চুল'। সাংগঠনিকেরা যে-কোনো সংগঠন পেলেই তাকে সোজা দু-ভাগ ক'রে ফেলেন, এবং ভাগ দুটিকে বলেন সংগঠনটির অব্যবহিত উপাদান। অব্যবহিত উপাদান প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষভাবে নয়, সংগঠন রচনা করে। যেমন : 'তোমার সোনালি চুল' সংগঠনটির অব্যবহিত উপাদান হচ্ছে 'তোমার', এবং 'সোনালি চুল', কিন্তু 'তোমার' বা 'সোনালি চুল' অব্যবহিত উপাদান নয় 'তোমার সোনালি চুল উড়ুক' সংগঠনটির। এরা উপাদান, তবে অব্যবহিত নয়, যেহেতু এরা প্রত্যক্ষভাবে সংগঠনটি রচনা করে নি। অব্যবহিত উপাদাননির্ভর বাক্যবর্ণনায় সাংগঠনিকেরা খোঁজেন স্তরেস্তরে সাজানো অব্যবহিত উপাদান।

[খ] সংগঠন : তাৎপর্যপূর্ণ রূপমূল-বা শব্দ-সমষ্টিই সংগঠন। একাধিক শব্দে, বা রূপমূলে তৈরি যে-কোনো ভাষা-এককই সংগঠন। 'তোমার', বা 'চুল' সংগঠন নয়; কিন্তু 'তোমার চুল', 'তোমার সোনালি চুল', 'তোমার সোনালি চুল উড়ুক', 'তোমার সোনালি চুল সমস্ত এশিয়ার আকাশেআকাশে উড়ুক' সংগঠন। ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩) সংগঠনকে ভাগ করেছিলেন দু-ভাগে : [খ. ১) প্রকেন্দ্রিক সংগঠন, ও (খ. ২) বিকেন্দ্রিক সংগঠন।

[খ. ১] প্রকেন্দ্রিক সংগঠন : যে-সংগঠনের অব্যবহিত উপাদানসমূহের একটি কাজ করে সংগঠনটির 'শির'-রূপে, তাকে বলা হয় প্রকেন্দ্রিক সংগঠন। বণ্টনিক মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রে নির্ণয় করা হয় প্রকেন্দ্রিক ও বিকেন্দ্রিক সংগঠন। কোনো সংগঠনের অব্যবহিত উপাদানসমূহের মধ্যে একটি উপাদান যদি সমগ্র সংগঠনটির স্থানে, বা বিকল্পে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তবে সংগঠনটিকে নির্দেশ করা হয় প্রকেন্দ্রিক সংগঠন ব'লে। যেমন : 'তোমার সোনালি চুল' সংগঠনটির সমগ্রটির বদলে ব্যবহার করা যায় 'চুল', কিন্তু সমগ্রটির বদলে 'তোমার', বা 'সোনালি', বা 'তোমার সোনালি' ব্যবহার করা যায় না (বলতে পারি 'চুল উড়ুক', কিন্তু বলতে পারি না '*তোমার উড়ুক', বা '*সোনালি উড়ুক', বা '*তোমার সোনালি উড়ুক')। 'চুল' হচ্ছে এ-সংগঠনটির অপরিহার্য অংশ, বা শির, এবং এটি শিরযুক্ত সংগঠন ব'লে এটির নাম প্রকেন্দ্রিক সংগঠন।

দু-রকম প্রকেন্দ্রিক সংগঠন স্বীকার করা হয় : অধীনতামূলক প্রকেন্দ্রিক সংগঠন, ও যৌগিক প্রকেন্দ্রিক সংগঠন। 'তোমার সোনালি চুল' অধীনতামূলক প্রকেন্দ্রিক সংগঠনের নিদর্শন। যৌগিক প্রকেন্দ্রিক সংগঠনে অব্যবহিত উপাদান দুটির মধ্যে প্রত্যেকটিই বসতে পারে সমগ্র সংগঠনের বদলে। 'ওষ্ঠ ও চিবুক' সংগঠনটিতে 'ওষ্ঠ' এবং 'চিবুক' উভয়ই বসতে পারে সারাটি সংগঠনের স্থানে (বলতে পারি 'তোমার ওষ্ঠ ও চিবুক চাই', 'তোমার ওষ্ঠ চাই', 'তোমার চিবুক চাই'), তাই এটি একটি যৌগিক প্রকেন্দ্রিক সংগঠন। অধীনতামূলক ও যৌগিক প্রকেন্দ্রিক সংগঠনকে মূর্ত করা হয়েছে যথাক্রমে (১৮ক, খ) পদচিত্রে :

(১৮)
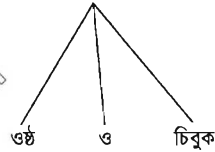
[খ. ২] বিকেন্দ্রিক সংগঠন : যে-সংগঠনের অব্যবহিত উপাদানগুলোর কোনটিই সংগঠনটির শিররূপে কাজ করে না, দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ, সে-সংগঠনকে বলা হয় বিকেন্দ্রিক সংগঠন। যেমন : 'আমাকে', বা 'ছুরি দিয়ে' সংগঠন দুটির কোনোটিকেই তার অব্যবহিত উপাদানগুলোর একটির সাহায্যে প্রতিকল্পিত করা যায় না। তাই এগুলো বিকেন্দ্রিক সংগঠনের নিদর্শন। এগুলোর পদচিত্র রূপ :

(১৯)
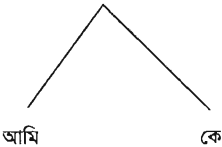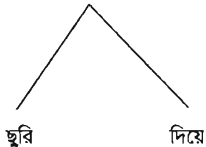
সাংগঠনিকেরা (১৯)-এর সংগঠন দুটির কোনো শির আছে ব'লে স্বীকার করবেন না। তবে সংগঠন দুটির প্রধান বস্তু যে 'আমি'. ও 'ছুরি', তা অস্বীকার অসম্ভব।

[গ] প্রতিকল্পন : কোনো প্রতিবেশে এক ভাষাবস্তুর বিকল্পে অন্য ভাষাবস্তু ব্যবহারই প্রতিকল্পন, বা বিকল্পন। শ্রেণীনির্ণয়ে সাংগঠনিকদের এটি একটি অষ্টপ্রাহরিক হাতিয়ার (দ্র পরিশিষ্ট : দুই)।

সাংগঠনিকদের ধারণা যে বাক্য মৌলরূপে দ্বিআংশিক, তাই তাঁরা যে-কোনো বাক্য বা সংগঠনকে বর্ণনার জন্যে দ্বিখণ্ডিত করেন। বাঙলা ভাষার অনেক বাক্যকে দ্বিখণ্ডিত করতে গেলে সাধারণ বোধ বিপন্ন হয়। (২০)-এর বাক্য দুটি লক্ষণীয় :

(২০) ক মেয়েটি যাবে।

খ যে-ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো, সে কোথায়?

প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে প্রথমটি সরল বাক্য, এবং দ্বিতীয়টি জটিল বাক্য। স্বাভাবিক ভাষাবোধসম্পন্ন কোনো বাঙালাভাষীকে প্রথম বাক্যটিকে দুটি তাৎপর্যমণ্ডিত খণ্ডে ভাগ করতে দিলে পাওয়া যাবে 'মেয়েটি', ও 'যাবে' খণ্ড দুটি। এ-খণ্ডন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বাক্যটি খণ্ডনে দ্বিধান্বিত হবেন, এবং অবশেষে সম্ভবত ভাগ করবেন বাক্যটিকে 'যে-ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো', এবং 'সে কোথায়' এ-দু-খণ্ডে। এ-খণ্ডন গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তা চমৎকার ভাষাবোধের নিদর্শন। বাক্যটির দু-খণ্ড, বা অব্যবহিত উপাদান হচ্ছে 'যে-ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো, সে', এবং 'কোথায়'। কেননা সমগ্র প্রথমাংশ কাজ করে একটি উপাদানরূপে, এবং দ্বিতীয়াংশ কাজ করে আরেক উপাদানরূপে। (২০খ) বাক্যটিকে সামান্য সম্প্রসারিত ক'রে এর সংগঠন অব্যবহিত উপাদানপ্রণালিতে বর্ণনা করা আমার লক্ষ্য। বাক্যটির সম্প্রসারিত রূপ :

(২১) যে-ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো, সে-চমৎকার ছেলেটি কোথায় থাকে?

বাক্যটি গঠিত চোদ্দটি শব্দে : এগুলোর প্রতিটিই এ-বাক্যের অন্ত্য উপাদান। 'ছেলেটি' (দু-বার), 'গতকাল', 'গেয়ে', 'করেছিলো', 'কোথায়', ও 'থাকে'-কে যদি আরো ভাঙি, তবে অন্ত্য উপাদানের সংখ্যা আরো বাড়বে। তবে আমি তা থেকে বিরত থাকবো, কেননা বাঙলা বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমার লক্ষ্য নয়, অব্যবহিত উপাদানভিত্তিক বাক্যবর্ণনার কৌশল দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। বাক্যটির অন্ত্য উপাদানরাশি একটু ভালোভাবে নিরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে এগুলো কেবল বাঁ-থেকে-ডানে সাজানো নিঃসঙ্গ ভাষাবস্তু নয়, বরং এরা আবদ্ধ পাশের উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে, বা অসম্পর্কে। বাক্যটির অন্ত্য উপাদানসমূহ পাশের উপাদানের সাথে সম্পর্ক অনুসারে বিন্যস্ত হয়ে আছে বিভিন্ন গুচ্ছে, বা গোত্রে, বা এককে, বা উপাদানে, অর্থাৎ বাক্যটি হচ্ছে কতিপয় শব্দগুচ্ছের সমষ্টি। প্রথমে শনাক্ত করা যাক দুটি ক'রে অন্ত্য উপাদানের ঘনিষ্ঠতা। আমি বোধ করি যে 'যে : ছেলেটি', 'আধুনিক : গান', 'মাৎ : করেছিলো', 'চমৎকার : ছেলেটি' ও 'কোথায় : থাকে' শব্দগুচ্ছ প্রাথমিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে

আবদ্ধ। এ-শব্দগুচ্ছ বাক্যটির 'উপাদান' : এগুলো এককের মতো কাজ করে। প্রতিকল্পনের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় একক (দ্র § ৩.১)। উল্লিখিত শব্দগুচ্ছ যদি 'উপাদান' বা 'একক' হয়, তবে তাদের একটিমাত্র শব্দের সাহায্যে প্রতিকল্পিত করা সম্ভব। একাধিক শব্দের স্থানে একটি মাত্র শব্দ ব্যবহারে বাক্যের অর্থ অবশ্য বদলে যাবে, কিন্তু তাতে সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটবে না। ওপরে (২১) বাক্যের যে-সমস্ত উপাদান গুচ্ছিত করা হয়েছে, অর্থাৎ স্থির করা হয়েছে বাক্যটির যে-কটি উপাদান, তাদের প্রত্যেকটিকে মাত্র একটি ক'রে শব্দ নিয়ে প্রতিকল্পিত করা সম্ভব। নিম্নরূপ প্রতিকল্পন করলে—'যে ছেলেটি'='যে', 'আধুনিক গান'='গান'; 'মাৎ করেছিলো'='মাতিয়েছিলো', 'চমৎকার ছেলেটি'='ছেলেটি', 'কোথায় থাকে'='আসবে'—(২১)-এর বাক্যটি রূপান্তরিত হবে (২২)-এ :

(২২) যে গতকাল গান গেয়ে সভা মাতিয়েছিলো, সে-ছেলেটি আসবে।

প্রতিকল্পনের ফলে (২১)-এর অর্থ বদলে গেছে (২২)-এ, কিন্তু সংগঠন বদলায় নি। (২২)-এ দেখা যাবে যে পাশাপাশি দুটি ক'রে উপাদান পরস্পরঘনিষ্ঠ। (২২)-এর উপাদান নির্ণয় ও প্রতিকল্পিত ক'রে ('গান গেয়ে'='এসে', 'সভা মাতিয়েছিলো'='কেঁদেছিলো', 'সে-ছেলেটি'='সে') পাই (২৩) :

(২৩) যে গতকাল কেঁদেছিলো, সে আসবে।

(২৩) বাক্যটির উপাদান প্রতিকল্পিত ক'রে ('এসে কেঁদেছিলো'='হেসেছিলো') পাই (২৪); এবং (২৪) বাক্যটির উপাদান প্রতিকল্পিত ক'রে ('গতকাল হেসেছিলো'='এসেছিলো') পাই (২৫) :

(২৪) যে গতকাল হেসেছিলো, সে আসবে।

(২৫) যে এসেছিলো, সে আসবে।

(২৫)-এ 'যে এসেছিলো' এবং 'সে' গঠন করে একটি উপাদান, এবং এ-টিকে প্রতিকল্পিত করতে পারি 'ছেলেটি' দ্বারা। ফলে পাই (২৬) বাক্যটি :

(২৬) ছেলেটি আসবে।

(২১) বাক্যটির উপাদাননির্ণয় ও ক্রমিক প্রতিকল্পনের সাহায্যে (২৬)-এ পৌঁচেছি সাংগঠনিকদের দ্বিআংশিক মৌল বাক্যে (অবশ্য (২৫)-এ কিছুটা অস্বস্তি ভোগ করেছি : 'যে এসেছিলো' উপাদানকে কোনো এক শব্দ উপাদানের সাহায্যে প্রতিকল্পিত করা হয় নি, বরং 'যে এসেছিলো, সে'-কে প্রতিকল্পিত করা হয়েছে 'ছেলেটি'র দ্বারা। 'যে এসেছিলো'-কে প্রতিকল্পিত করা যেতো 'সুন্দর' দ্বারা, এবং পেতাম 'সুন্দর, সে আসবে'। অবশেষে 'সুন্দর, সে'-কে প্রতিকল্পিত করা যেতো 'ছেলেটি'-দ্বারা। কিন্তু 'সুন্দর, সে আসবে' আমার বোধে

গ্রহণযোগ্য বাক্য নয় ব'লে 'যে এসেছিলো, সে'-কে একটি শব্দ-দ্বারা প্রতিকল্পিত করাকেই আমি সংগত মনে করেছি। যে-অস্বস্তির ছাপ এখানে লেগে রইলো, তা সাংগঠনিক প্রণালির দুর্বলতার সাক্ষ্য।

বাক্যের পরস্পরঘনিষ্ঠ উপাদানের সম্পর্ক সাংগঠনিকেরা দেখান দু-রকম চিত্র-প্রণালিতে। এর মাঝে একটি হচ্ছে 'বন্ধনিকরণ', এবং অন্যটি 'বংশলতিকারূপী চিত্র' (এর সাথে রূপান্তর ব্যাকরণের পদচিত্রের পার্থক্য গভীর)। (২১) বাক্যটির পরস্পরঘনিষ্ঠ উপাদানরাশিকে বন্ধনিবদ্ধ করলে পাওয়া যাবে (২৭) :

(২৭) ((((যে ছেলেটি) (গতকাল (((আধুনিক গান) গেয়ে) (সভা (মাৎ করেছিলো)))), (সে (চমৎকার ছেলেটি))) (কোথায় থাকে))?

বন্ধনিকরণপ্রণালি বাক্যের উপাদানরাশি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করলেও বন্ধনিকৃত বাক্য প্রায়-অপাঠ্য। তাই এ-প্রণালির পরিবর্তে সাধারণত ব্যবহার করা হয় বংশলতিকারূপী চিত্র। (২১) বাক্যটির বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক (২৮)-এর বংশলতিকারূপী চিত্রে প্রকাশ করা হলো (রেখা-দ্বারা যুক্ত উপাদানসমূহ পরস্পরঘনিষ্ঠ)।

(২৮)
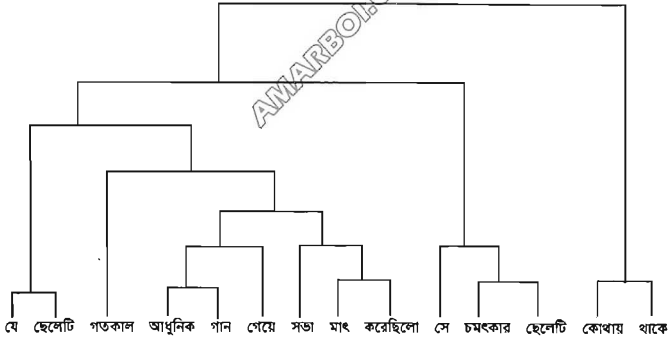
বন্ধনিকরণ ও বংশলতিকারূপী চিত্রপ্রণালি বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক দেখায় (দ্র ২৭, ২৮); কিন্তু এ-প্রণালিতে প্রতিকল্পন দেখানো যায় না। বাক্যের বিভিন্ন উপাদান নির্ণয়, এবং উপাদান-প্রতিকল্পন সাংগঠনিকেরা দেখিয়ে থাকেন 'প্রাতিকল্পনিক চিত্র'-এ। প্রাতিকল্পনিক চিত্রে বাক্যের নির্ণীত উপাদান ও ক্রমপ্রতিকল্পন দেখানো হয় স্পষ্টভাবে। প্রাতিকল্পনিক চিত্রে বাক্যের উপাদানরাশি প্রতিকল্পিত ক'রে ক'রে অবশেষে পৌঁছানো হয় দ্বিআংশিক মৌল বাক্যে। (২১) থেকে (২৬)-এ পৌঁছোতে যে-সমস্ত প্রতিকল্পন ব্যবহার করা হয়েছে, তা দেখানো হলো

(২৯)এর প্রাতিকল্পনিক চিত্রে। (২৯)-এ দেখা যাচ্ছে যে (২১)-এর দীর্ঘ বাক্যটির উপাদানগুলোকে ক্রমপ্রতিকল্পিত ক'রে পাওয়া যাচ্ছে (২৬)-এর দ্বিআংশিক মৌল বাক্যটি :

(২৯)

<table>
<tr><td>যে</td><td>ছেলেটি</td><td>গতকাল</td><td>আধুনিক</td><td>গান</td><td>গেয়ে</td><td>সভা</td><td>মাৎ</td><td>করিছিলো</td><td>সে</td><td>চমৎকার</td><td>ছেলেটি</td><td>কোথায়</td><td>থাকে</td></tr>
<tr><td>যে</td><td>ছেলেটি</td><td>গতকাল</td><td colspan="2">গান</td><td>গেয়ে</td><td>সভা</td><td colspan="2">মাতিয়েছিল</td><td>সে</td><td colspan="2">ছেলেটি</td><td colspan="2">আসবে</td></tr>
<tr><td colspan="2">যে</td><td>গতকাল</td><td colspan="3">এসে</td><td colspan="3">কেঁদেছিলো</td><td colspan="3">সে</td><td colspan="2">আসবে</td></tr>
<tr><td colspan="2">যে</td><td>গতকাল</td><td colspan="6">হেসেছিলো</td><td colspan="3">সে</td><td colspan="2">আসবে</td></tr>
<tr><td colspan="2">যে</td><td colspan="7">এসেছিলো</td><td colspan="3">সে</td><td colspan="2">আসবে</td></tr>
<tr><td colspan="12">ছেলেটি</td><td colspan="2">আসবে</td></tr>
</table>

(২১) বাক্যের ওপরের বর্ণনা অন্ত্য উপাদানের ঘনিষ্ঠতাভিত্তিক : আমি বর্ণনা শুরু করেছি ক্ষুদ্রতম উপাদানে, এবং ক্রমশ বৃহত্তর উপাদান গ্রহণ ক'রে উপনীত হয়েছি বৃহত্তম উপাদানে। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে বর্ণনা শুরু করা যেতো। বর্ণনা দেয়া যেতো সমগ্র বাক্য থেকে শুরু ক'রে ক্রমশ ক্ষুদ্রতম উপাদানে হাজির হওয়ার। সমগ্র বাক্যটি প্রথমে দুটি অব্যবহিত উপাদানে খণ্ডন ক'রে সে-উপাদানের ক্রমদ্বিখণ্ডনের মাধ্যমে উপনীত হওয়া যেতো অন্ত্য উপাদানে। এ-প্রণালিতে (২১) বাক্যটিকে বর্ণনা করতে হ'লে প্রথমে সমগ্র বাক্যটিকে ভাগ করতে হবে দুটি অব্যবহিত উপাদানে, এবং পুনরায় প্রতিটি উপাদানকে করতে হবে দ্বিখণ্ডিত। খণ্ডিত উপাদানকে বারবার দ্বিখণ্ডিত ক'রে এক সময় আর খণ্ডনযোগ্য কোনো উপাদান পাওয়া যাবে না' ; —তখন বুঝতে হবে বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। পৌনপুনিক দ্বিখণ্ডনের এক চমৎকার কশাইকর্ম হচ্ছে এ-রীতির বাক্যবর্ণনা। (২১) বাক্যটিকে ক্রমদ্বিখণ্ডিত ক'রে নিচের অব্যবহিত উপাদানগুলো পাওয়া যাবে :

(৩০) ক যে-ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো, সে-চমৎকার ছেলেটি

খ কোথায় থাকে

(৩১) ক যে-ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো

খ সে-চমৎকার ছেলেটি

(৩২) ক যে-ছেলেটি

খ গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো

(৩৩) ক যে

খ ছেলেটি

(৩৪) ক গতকাল
খ আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো

(৩৫) ক আধুনিক গান গেয়ে
খ সভা মাৎ করেছিলো

(৩৬) ক আধুনিক গান
খ গেয়ে

(৩৭) ক আধুনিক
খ গান

(৩৮) ক সভা
খ মাৎ করেছিলো

(৩৯) ক মাৎ
খ করেছিলো

(৪০) ক সে
খ চমৎকার ছেলেটি

(৪১) ক চমৎকার
খ ছেলেটি

(৪২) ক কোথায়
খ থাকে

চোদ্দো শব্দের বাক্যটিকে তেরো বার দ্বিখণ্ডিত ক'রে বিশ্লিষ্ট করা হয়েছে এর অন্ত্য উপাদানগুলোকে। এ-খণ্ডন স্বেচ্ছাচারী নয় : অব্যবহিত উপাদান নির্ণয়ের সময় এখানেও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাতিকল্পনিক প্রণালি, যদিও তা দেখানো হয় নি। (২৭)-এর বন্ধনিকরণ, ও (৩০-৪২)-এর খণ্ডনের ফলাফল অভিন্ন। (২১) বাক্যটিকে (৩০-৪২)-এ কোনকোন স্থানে খণ্ডিত করা হয়েছে, তা দেখানো হলো (৪৩)-এ (১ নির্দেশ করছে প্রথম খণ্ডন, ২ দ্বিতীয় খণ্ডন, ৩ তৃতীয় খণ্ডন ...ইত্যাদি) :

(৪৩) যে ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো,
৪ ৩ ৫ ৮ ৭ ৬ ৯ ১০
সে- চমৎকার ছেলেটি কোথায় থাকে
২ ১১ ১২ ১ ১৩

(২৭), ও (৪৩)কে উপস্থাপিত করা সম্ভব (৪৪)-এর পদচিত্রে:

(৪৪)
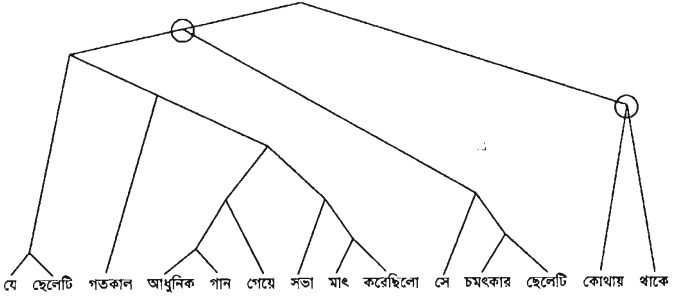
রূপান্তর ব্যাকরণে (৪৪)-এর মতো পদচিত্রে উপস্থাপিত সংগঠনের 'সাংগঠনিক বর্ণনা' থাকে (দ্র § ৪.২.৩), কিন্তু এখানে তা নেই। পদচিত্রটিতে, বা 'বৃক্ষ'টিতে তেরোটি 'বৃন্ত' আছে ('বৃন্ত': দুটি শাখার মিলনস্থল (বিন্দু দিয়ে নির্দেশিত) (দ্র § ৪.৩.১)। প্রতিটি বৃন্ত 'আধিপত্য' করছে দুটি ক'রে উপাদানের ওপর। প্রতিটি বৃন্ত নির্দেশ করছে একটি ক'রে সংগঠন, এবং প্রতিটি সংগঠন গঠনে অংশী উপাদান দুটি ওই সংগঠনের অব্যবহিত উপাদান। যেমন : 'যে' ও 'ছেলেটি' মিলিত হয়েছে একটি বৃন্তে, এবং গঠন করেছে একটি সংগঠন। এমনিভাবে 'আধুনিক' ও 'গান', 'মাৎ' ও 'করেছিলো', 'চমৎকার' ও 'ছেলেটি', 'কোথায়' ও 'থাকে' বিভিন্ন বৃন্তে উপনীত হয়ে সংগঠন সৃষ্টি করেছে। 'যে' ও 'ছেলেটি', 'আধুনিক' ও 'গান', 'মাৎ' ও 'করেছিলো', 'চমৎকার' ও 'ছেলেটি', 'কোথায়' ও 'থাকে' প্রভৃতি উপাদান আপনআপন সংগঠনের অব্যবহিত উপাদান। পুনরায় 'আধুনিক গান' ও 'গেয়ে', 'সভা' ও 'মাৎ করেছিলো', 'সে' ও 'চমৎকার ছেলেটি' উপনীত হয়েছে উচ্চতর বৃন্তে, এবং সংগঠন সৃষ্টি করেছে। এরা স্বসংগঠনের অব্যবহিত উপাদান। পুনরায় 'আধুনিক গান গেয়ে' ও 'সভা মাৎ করেছিলো', 'গতকাল' ও 'আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো', 'যে-ছেলেটি' ও 'গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো', 'যে-ছেলেটি গতকাল আধুনিক গান গেয়ে সভা মাৎ করেছিলো' ও 'সে-চমৎকার ছেলেটি' উচ্চতর বৃন্তে পৌঁছে বৃহত্তর সংগঠন সৃষ্টি করেছে। এগুলো আপনআপন সংগঠনের অব্যবহিত উপাদান। (৪৪)-এর বৃত্তাবদ্ধ বৃন্ত দুটি পরিশেষে উপনীত হয়েছে উচ্চতর সংগঠনে; এরা সম্পূর্ণ বাক্যের অব্যবহিত উপাদান। (৪৪) পদচিত্রে কোনো বৃন্ত-নাম নেই; অর্থাৎ এ-বাক্যিক ক্যাটেগরিগুলো অভিধাহীন। সাংগঠনিক পদচিত্রে বিভিন্ন সংগঠনের কোনো অভিধা দেয়া হয় না, শুধু সংগঠন ও অব্যবহিত উপাদান নির্দেশ ক'রেই বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়। (৪৪)-এ দেখা যাচ্ছে (২১) বাক্যের ক্রমস্তরিক সংগঠনবিন্যাস;—একটি স্তরের ওপরে/নিচে আরেকটি স্তর, এবং আরেকটি স্তর, এবং

আরেকটি স্তর এবং প্রতিটি স্তরে আছে সমান পর্যায়ের পরস্পরঘনিষ্ঠ উপাদান। (৪৪) পদচিত্রটি একটি বিষয় স্পষ্ট জানাচ্ছে যে বাক্যসংগঠন কেবল উপাদানের সরলরৈখিক বিন্যাস নয়, ক্রমস্তরিক বিন্যাসও। অর্থাৎ বাক্যের শুধু 'দৈর্ঘ' নয়, 'গভীরতা'ও আছে।

অব্যবহিত উপাদান নির্ণয়ের একটি উপায় প্রতিকল্পন। (৪৪)-এ বৃত্তাবদ্ধ বৃন্ত দুটি নির্দেশ করছে প্রতিকল্পনের অন্তিম স্থল। বাঁ দিকের বৃন্তের অধীন সমগ্র উপাদানের বিকল্পে ব্যবহার করা সম্ভব 'ছেলেটি', এবং ডানবৃত্তস্থ বৃন্তের অধীন সমগ্র উপাদানের বদলে ব্যবহার করা সম্ভব 'আসবে', এবং পাওয়া যাবে :

(৪৫) ছেলেটি আসবে

(৪৫) নির্দেশ করছে (২১) বাক্যের মৌল সংগঠন। তাই (৪৪)কে বিবেচনা করা যায় (৪৫) সংগঠনটির ক্রমসম্প্রসারণ ব'লে।

অব্যবহিত উপাদানকৌশল সাংগঠনিকদের হাতে শক্তিমান তত্ত্বরূপে ব্যবহৃত হয় নি; আর এ-কৌশলের সাহায্যে ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠুরূপে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। (২১) বাক্যটিকে সাংগঠনিক প্রণালিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায়ই বর্ণনা করতে হবে, কিন্তু এ-বর্ণনায় নানাস্থানে অস্বস্তি ভোগ করতে হয়েছে। (২১)-এ 'গেয়ে' নির্দেশ করছে একটি বিচূর্ণ খণ্ডবাক্য, কিন্তু তা দেখানোর কোনো উপায় নেই এ-প্রণালিতে। (২৫)-এ 'যে এসেছিলো, সে'-কে নিয়েও অস্বস্তি পোহাতে হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক অস্বস্তি সহ্য করতে হয়েছে এজন্যে যে (২১) একটি সম্বন্ধাত্মক জটিল বাক্য, তা জানানোর কোনো উপায় নেই এ-প্রণালিতে। তাই এটিকে গ্রহণ করতে হয়েছে একটি ক্রমসম্প্রসারিত সরল বাক্যরূপে। অব্যবহিত উপাদানরীতির বড়ো ক্রটি হচ্ছে যে বাক্য খণ্ডবিখণ্ড ক'রে যে-সমস্ত উপাদানের সংগ্রহ পাই, বাক্যে তাদের কী ভূমিকা, তা জানানোর কোনো রীতি নেই এ-প্রণালিতে। ব্যবচ্ছেদ ক'রে এখানে দেখানো হয় শরীরের বিভিন্নাংশ, কিন্তু ওই অংশগুলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয় না। এ-কারণে সাংগঠনিক ব্যাকরণকে প্রথাগত ব্যাকরণের চেয়েও দুর্বল মনে করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে 'কর্তা', 'কর্ম', 'প্রত্যক্ষ কর্ম', 'পরোক্ষ কর্ম' প্রভৃতি 'বোধ'-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা, কিন্তু বর্ণনাপ্রাণ সাংগঠনিক ব্যাকরণ উপাদানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে না ব'লে বর্ণনা অনেকটা নিরর্থক। এ হচ্ছে উপাদানের ভিন্ন বিন্যাস। বাক্যকে পর্যবেক্ষণসম্ভব বস্তু ভেবে বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেদের প্রণালিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাংগঠনিকেরা, এবং সৃষ্টি করেছিলেন এক গুমোট-স্থবির ভাষাবিজ্ঞানরাজ্য। ১৯৫৭তে বেরোয় চোমস্কির *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*, এবং ভাষাবিজ্ঞানের এলাকায় ঢোকে জীবনচঞ্চল মুক্তবাতাস। ১৯৫৭-উত্তর ভাষাবিজ্ঞান মানেই 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' : তার প্রধান বস্তু হলো বাক্য—যার মুখোমুখি অসহায় ছিলেন সাংগঠনিকেরা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ

৪.০ ভূমিকা

ছোটো, শাণিত, সর্বাংশে বিজ্ঞানমনস্ক একটি বই বেরোয় বিজ্ঞানস্তুতিমুখর বিশশতকের ষষ্ঠ দশকের দ্বিতীয়াংশে—১৯৫৭ অব্দে; বইটির নাম *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*, লেখকের নাম অ্যাবরাম নোআম চোমস্কি। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এর প্রকাশ ভূকম্পনতুল্য। নিরন্ধ্র গবেষণাকক্ষে সুসজ্জিত উপাত্তপ্রণালিপদ্ধতি পরিবৃত হয়ে বর্ণনামূলক বিজ্ঞানসাধনা করছিলেন যে-ভাষাবিজ্ঞানীরা, ত্রাস ঢুকে পড়ে তাঁদের নৈর্ব্যক্তিক চিত্তে, এবং ভয়ঙ্করভাবে ভেঙে পড়ে কয়েক দশকের শ্রমেঘামে রচিত উপাত্তপ্রণালিপদ্ধতির, শ্রেণীকরণী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের, সুদৃশ্য টাওয়ার। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ছিলো নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানচর্চা। তা-ই তাঁদের আরাধ্য, যা বিজ্ঞানসম্মত। তাঁদের কাছে তা-ই বিজ্ঞানসম্মত, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, বাস্তব, পর্যবেক্ষণসম্ভব, মূর্ত;—গবেষণাটেবিলে ছিঁড়েফেড়ে যা পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীকরণ, বর্ণনা করা যায় না, তাঁদের কাছে তা অবৈজ্ঞানিক; সুতরাং পরিত্যাজ্য। তাঁরা ভালোবাসতেন সংগৃহীত উপাত্তকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে; ভালোবাসতেন উপাত্তের ওপর প্রণালিপদ্ধতির কৌশল চালিয়ে শ্রেণীকরণ ও শ্রেণীকরণ ও শ্রেণীকরণ করতে। ভাষাবর্ণনায় যে-পরিমাণ সাফল্য তাঁরা আয় করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন প্রথাগত ব্যাকরণের নামে বদনাম রটাতে; তাঁরা রটিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রথাগত ব্যাকরণ নামী যে-শাস্ত্র বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ানো হয়, তা শোচনীয়ভাবে অবৈজ্ঞানিক। প্রথাগত ব্যাকরণের কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রণালিপদ্ধতি নেই; তাতে তন্ময় বস্তু বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় মন্ময় মানদণ্ড। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত যখন সর্বত্র আস্থা আয় করতে যাচ্ছিলো, তখন বেরোয় *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* (১৯৫৭); এবং বদলে যায় বিজ্ঞানধারণা (দ্র § ৪.১)। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে চোমস্কি দেন নতুন অভিধা— 'শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান'—তাঁর ভাষায় 'ট্যাক্সোনোমিক লিংগুইস্টিক্স', এবং দেখান যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের মর্মমূলে লুকিয়ে আছে মারাত্মক ত্রুটি। তাঁদের বিজ্ঞানবোধ ভ্রান্ত, এবং বিভ্রান্তিকর। কোনো তত্ত্বের যাথার্থ্য পরখের উপায় এই তত্ত্বের মুখোমুখি প্রশ্নসংকুল উপাত্ত তুলে ধরা : ওই তত্ত্ব যদি বিরোধী উপাত্ত ব্যাখ্যা করতে পারে, তবে তা সার্থক, নইলে ব্যর্থ। চোমস্কি এমন সব উপাত্ত উপস্থিত করেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সামনে, যা ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হয় সাংগঠনিক প্রণালিরাশি। চোমস্কি দেখান

যে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা সীমাবদ্ধ থেকেছেন বস্তুর বাহ্যস্তরে;—উপাত্তের অন্তরে প্রবেশে তাঁরা হয়েছেন ব্যর্থ। ভাষার মতো বিশাল ব্যাপক সৃষ্টিশীল বিষয়কে সাংগঠনিকেরা সীমাবদ্ধ করেছেন ধ্বনিলিপিতে আবদ্ধ তুচ্ছ উপাত্তে; ব্যস্ত থেকেছেন তাঁরা ভাষার বহিরঙ্গের ব্যবচ্ছেদে, এবং ভাষার আন্তর শৃঙ্খলা উদঘাটনের বদলে দশকপরম্পরায় মনোনিবিষ্ট থেকেছেন ভাষার তুচ্ছ খণ্ডাংশের বহিঃস্তরের শ্রেণীকরণে ও বর্ণনায়।

চোমস্কিপ্রবর্তিত ব্যাকরণের নাম *ট্রান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার*, যার বাঙলা নাম দিতে পারি *রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ*—সংক্ষেপে : রূপান্তর *ব্যাকরণ*। 'ব্যাকরণ' শব্দটি সাংগঠনিকেরা সাধারণত ব্যবহার করতেন না, করলেও ব্যবহার করতেন সংকীর্ণ অর্থে। তাঁদের প্রিয় শব্দাবলি হচ্ছে 'ধ্বনিতত্ত্ব', 'রূপতত্ত্ব', 'অব্যবহিত উপাদান', 'বাক্যতত্ত্ব' প্রভৃতি। এমন ধারণারও তাঁরা জন্ম দিয়েছিলেন যে ব্যাকরণচর্চা ভাষাবিজ্ঞান নয়, ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব, এবং সামান্য পরিমাণে, বাক্যতত্ত্বের চর্চা। 'ব্যাকরণ' শব্দটিকে পুনরায় শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছেন চোমস্কি, কেননা তাঁর তত্ত্বে ব্যাকরণই প্রধান বস্তু, যার বিভিন্ন কক্ষ হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব-অর্থতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব-ধ্বনিতত্ত্ব। এ-পরিচ্ছেদে আমি দিতে চাই চমস্কীয় রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও কৌশলের ব্যাপক-বিস্তৃত-অনুপুঙ্খ বিবরণ। রূপান্তর ব্যাকরণের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া বোঝার ও আয়ত্তের জন্যে কালকালান্তরের ভাষাবিশ্লেষণরীতি, ও বিশশতকী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার (দ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ, এবং পরিশিষ্ট : এক; পরিশিষ্ট : দুই)।

৪.১ বিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের ভাষ্যকারেরা সাধারণত 'ভাষাবিজ্ঞান'-এর সংজ্ঞা দিয়ে তাঁদের বই শুরু করেন (দ্র ডিনিন (১৯৬৭), লায়ন্স (১৯৬৮))। 'লিংগুইস্টিক্স'—তাঁদের সংজ্ঞানুসারে—'ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা'। ওই বিদ্যা নির্দেশ করার জন্যে বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় দুটি সমর্থক শব্দ : 'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান'। 'ভাষাতত্ত্ব' শব্দটি, সম্ভবত, রচিত হয়েছিলো 'ফিলোলোজি'র প্রতিশব্দরূপে, এবং পরে 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটি রচনা করা হয়, যখন পাশ্চাত্যে 'ফিলোলোজি' অভিধাটি পরিত্যক্ত হয়, এবং তৈরি করা হয় নতুন কালের অভিধা 'লিংগুইস্টিক্স'। যদিও প্রচুর ব্যতিক্রম মিলবে, তবু সাধারণত 'তত্ত্ব'কে 'লোজি'র সমান্তরাল, এবং 'বিজ্ঞান'কে 'টিক্স'-এর সমান্তরাল ব'লে অসচেতনভাবে মনে করা হয়। বিজ্ঞান বর্তমান কালের স্পর্শমণি : এর ছোঁয়ায় আবর্জনা সোনা হয়ে ওঠে; অশ্রদ্ধেয় প'রে নেয় শ্রদ্ধেয়ের মুখোশ। তাই 'বিজ্ঞান' শব্দটির প্রতি সমকালীন মানুষের ও বিজ্ঞানহীন বাঙালির মোহ রয়েছে। 'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান' সম্পূর্ণরূপে সমার্থক; তবু আমি, সাধারণত, বিশশতকপূর্ব ভাষাবিদ্যা বোঝাতে ব্যবহার করবো 'ভাষাতত্ত্ব' শব্দটি, এবং বিশশতকী ভাষাবিদ্যা বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করবো 'ভাষাবিজ্ঞান';—কেননা এ-শব্দটি থেকে সমকালীন তাপ বিকিরিত হয়।

'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটি আত্মবিশ্লেষণাত্মক, আর এর সংজ্ঞাটি—'ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা'—আভিধানিক। 'ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা'—এ-কথা বললে বিষয়টি সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধরণা জন্মে না, এবং বিষয়টির বৈজ্ঞানিকতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বিশেষণরূপে 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি কী নির্দেশ করে? শব্দটি নির্দেশ করে যে ভাষাবিজ্ঞানে গবেষণা চালানো হয় সুনিয়ন্ত্রিত এবং তথ্য-যাচাই-সম্ভব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে; এর গবেষণায় ব্যবহার করা হয় ভাষাসংগঠন সম্পর্কিত কোনো তত্ত্ব। পাণিনি-পূর্বকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত রচিত ভাষাবিষয়ক বহু রচনা কোনো-না-কোনো অংশে বৈজ্ঞানিক : তাতে বর্ণনা করা হয়েছে পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্ত, এবং উপাত্ত বর্ণনার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে নানা প্রণালিপদ্ধতি। কিন্তু উনিশশতকের ভাষাবিজ্ঞানীরাই প্রথম তাঁদের শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবি করেন। তাঁদের দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে গ্রন্থনামে;—হুইটনির দুটি বইয়ের নাম : (ক) *ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড দি স্টাডি অফ ল্যাংগুয়েজ : টুয়েলভ লেকচারস অন দি প্রিন্সিপলস অফ লিংগুইস্টিক সায়েন্স* (১৮৬৭), (খ) *লাইফ অ্যাণ্ড গ্রোথ অফ ল্যাংগুয়েজ : এ্যান আউটলাইন অফ লিংগুইস্টিক সায়েন্স* (১৮৭৫)। কিন্তু ভাষাবিদ্যাকে সর্বাংশে ভাষাবিজ্ঞান ক'রে তোলার চেষ্টা করেন বিশশতকী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা। তাঁরা উপাত্ত সংগ্রহ ও বর্ণনার এমন সব প্রণালিপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যে তার যান্ত্রিকতা, নিয়ন্ত্রণ, বস্তুপ্রিয়তা ও তথ্যনিষ্ঠাকে অবৈজ্ঞানিক বলা কঠিন। ফ্রিজ (১৯৬১), যিনি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের একজন প্রধান পুরুষ, মনে করেন যে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকতা ও সংকলনধর্মিতা। নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে তিনি বোঝাতে চান যে ভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রণালিপদ্ধতি এমন সাধারণ সূত্র নির্ণয় করবে, যা যাচাই করতে পারবেন যে-কোনো যোগ্য লোক। সংকলনধর্মিতা বলতে তিনি বোঝান যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, প্রাক্তন আবিষ্কারের ভিত্তির ওপরই ঘটে সমস্ত নতুন আবিষ্কার। ফ্রিজ-এর (১৯৬১, ৩৮-৩৯) মতে : 'ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধ, যা গ'ড়ে ওঠে ব্যাপক ও বিচিত্র মানবভাষার সংগঠন, প্রয়োগ, ও ইতিহাসের তথ্য ভিত্তি ক'রে। এতে ব্যবহার করা হয় এমন সব প্রণালিপদ্ধতি, যা ভাষিক ব্যাপারসমূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণসম্ভব সাধারণসূত্র নির্ণয়ে সর্বাধিক সফল ব'লে প্রমাণিত।'

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিকতার ওপর অতি-গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা ভাষা বিশ্লেষণবর্ণনার জন্যে এমন সব প্রণালিপদ্ধতি প্রক্রিয়াকৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যা সীমাবদ্ধ থেকেছে ভাষার বাহ্যরূপের বর্ণনায়। সর্বসাধারণের কাছে ভাষার শ্রুতির দিকটিই প্রধান : তাদের নিকট ভাষা হচ্ছে অবিরাম উচ্চারিত ধ্বনিপুঞ্জ। সাংগঠনিকদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুখর ধ্বনিপুঞ্জই জাগিয়েছে প্রথম-প্রধান আবেদন, এবং দ্বিতীয় আবেদন জাগিয়েছে রূপমূলপুঞ্জ—অর্থাৎ সার্থ ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-এককরাশি। অর্থ, যা ভাষার প্রাণ, তাকে অবহেলা করতে পারেন নি সাংগঠনিকেরা, তবে অবৈজ্ঞানিক ব'লে অবজ্ঞা করেছেন। ১৯৪২-এ হকেট মন্তব্য করেছিলেন (দ্র সার্ল (১৯৭২)) : 'ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে শ্রেণীকরণী বিজ্ঞান'। ১৯৫৭-পূর্ব অধিকাংশ মার্কিন

ভাষাবিজ্ঞানীই মনে করতেন যে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের শ্রেণীকরণই তাঁদের শাস্ত্রের ধ্রুবলক্ষ্য। তাই চোমস্কি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে দেন নতুন নাম—শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাষাবর্ণনার প্রণালি নিম্নরূপ : বিজ্ঞানী সবার আগে মনোযোগ দেবেন তাঁর বর্ণিতব্য উপাত্ত সংগ্রহে। ঘর থেকে তিনি অভিযাত্রীর মতো বেরিয়ে পড়বেন, উপস্থিত হবেন তাঁর উদ্দিষ্ট ভাষা-অঞ্চলে, এবং টেপরেকর্ডারে বা ধ্বনিলিপিতে ধারণ ক'রে নিয়ে আসবেন বিপুল পরিমাণ উক্তি, যাকে তিনি বলেন 'উপাত্ত'। এ-উপাত্ত হচ্ছে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তারপর তিনি উপাত্তের বস্তুরাশিকে বিন্যস্ত করবেন বিভিন্ন স্তরে; প্রথমে তিনি শনাক্ত ও শ্রেণীকরণ করবেন তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-এককগুলো, অর্থাৎ ধ্বনিমূলসমূহ। পরবর্তী স্তরে তিনি মনোযোগ দেবেন ধ্বনিমূলসমবায়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম সার্থ এককরাশির প্রতি, অর্থাৎ তিনি শনাক্ত ও শ্রেণীকরণ করবেন উপাত্তের অন্তর্গত রূপমূলরাশি; এবং পরবর্তী স্তরে তিনি মন দেবেন রূপমূলের বিচিত্র বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠা শব্দ ও শব্দ-শ্রেণী বর্ণনায়। সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে শব্দ-শ্রেণীর পরম্পরা : এ-স্তরে তিনি খুঁজবেন সম্ভাব্য বাক্য ও বাক্য-শ্রেণী। সাংগঠনিক ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য ছিলো ভাষাবিজ্ঞানীকে এমন কিছু যান্ত্রিক প্রণালিপদ্ধতি উপহার দেয়া, যার সাহায্যে তিনি উপাত্ত থেকে অনায়াসে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন ভাষাবর্ণনার যান্ত্রিক প্রণালি, আর তাঁরা সীমাবদ্ধ থেকেছেন ভাষার বাহ্যস্তরের বর্ণনা, বিবরণ ও শ্রেণীকরণে। কিন্তু বর্ণনা-বিবরণ-তথ্য-উপাত্ত-প্রণালি-পদ্ধতি-কৌশল মেটায় বিজ্ঞানের প্রাথমিক চাহিদা—প্রচুর উপাত্ত সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ বিজ্ঞান নয়, তা বিজ্ঞানের আদিস্তর। তাই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে বলা যায় বিজ্ঞানপ্রবণ : সাংগঠনিকেরা বিজ্ঞানের আদিস্তর আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করতে পারেন নি।

কোনো তত্ত্ব কখন বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে? তথ্য সংগ্রহ ও শ্রেণীকরণ কি বিজ্ঞান? সুনিশ্চিতি ও আপাদশির বস্তুময়তাকেই সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান ব'লে মনে করে। এ-ধারণা লৌকিক, এবং ভ্রান্তি-ও বিভ্রান্তি-পূর্ণ (দ্র কুহ্ন (১৯৬২), পপার (১৯৬৩), বুশ (১৯৭৩))। এমন ধারণাও অনেকে পোষণ করেন যে বিপুল শ্রমে সাধনায় পুঞ্জিভূত উপাত্ত থেকে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন তত্ত্ব, যা চিরসত্য। এ-ধারণাও ভ্রান্ত। তথ্য এমন কোনো যাদুকাঠি নয় যে তাকে গবেষণাগারে নাড়াচাড়া করলেই একটি চমৎকার ধ্রুব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়ে যাবে। বিজ্ঞান দেবতা বা বিধাতা নয়। গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে যা মূল্যবান, তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি। পরীক্ষা ও ত্রুটির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিজ্ঞানী কখনোই বিশ্বাস করেন না যে তাঁর উদ্ভাবিত সাধারণ সূত্রাবলি সর্বাংশে ত্রুটিহীন— তিনি সব সময় প্রস্তুত থাকেন কোনো একটি তত্ত্ব বা সূত্রকে পরিত্যাগ ক'রে উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব বা সূত্র গ্রহণের জন্যে। কোনো একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ কীভাবে মূল্যবান ব'লে গৃহীত হয়, তা বিবেচনা করা যাক। বিজ্ঞান তথ্যস্তূপের চেয়ে অনেক বড়ো,—তাকে মনে করা যেতে পারে সংগ্রাহকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সংকলিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সংগ্রহ

ব'লে (দ্র পপার (১৯৬৩))। মানস ধারণারাশি যখন মনোগবেষণাগারে নিরীক্ষিত ও কেলাসিত হয়, তখনই তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে গৃহীত হ'তে পারে। বিজ্ঞানীর মনে বিরাজ করে একটি তত্ত্ব, এবং তিনি অসংখ্য সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার মধ্য থেকে সে-টুকুই বেছে নেন, যা ওই মানব তত্ত্বের কাছে মূল্যবান। কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্বানুকূল তথ্যকে স্বীকার করলে বিজ্ঞানীর চলে না, তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হয় এমন পরীক্ষার জন্যে, যা তাঁর তত্ত্বের ত্রুটি ধরিয়ে দেবে। তিনি প্রস্তুত থাকেন তত্ত্ব সংশোধন করতে; এবং উৎকৃষ্টতর তত্ত্বের জন্যে প্রাক্তন প্রিয় তত্ত্ব বিসর্জন দিতে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রণালি ও শিল্পকলার সৃষ্টিপ্রণালি মর্মমূলে অভিন্ন। হঠাৎ আলোর ঝলকানির দরকার উভয় ক্ষেত্রেই, আর উভয় এলাকায়ই দেখা যাবে যে স্রষ্টা গ্রহণ করেন সে-সবকেই, যা চিত্তে নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন জাগায় ও ঔৎসুক্যকে প্রাণিত করে।

জ্ঞানার্জন সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব রয়েছে : একটিকে বলা যাক 'অভিজ্ঞতাবাদ' [বা উপাত্তবাদ], এবং অন্যটিকে 'বোধিবাদ' [বা চৈতন্যবাদ]। অভিজ্ঞতাবাদীদের ধারণা জ্ঞান আমাদের মধ্যে ঢোকে ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র রাস্তা দিয়ে। সুতরাং, যাতে জ্ঞানের প্রবেশে বিঘ্ন না ঘটে, আমাদের থাকা উচিত নিষ্ক্রিয় ও গ্রহণশীলরূপে। বোধিবাদীদের মতে অভিজ্ঞতা বা উপাত্ত জ্ঞানের জনক নয়;—জ্ঞান মনোজ। মনোজ জ্ঞান দিয়ে আমরা বিশ্বকে দেখি, ব্যাখ্যা করি। উপাত্ত আমাদের কাছে ততোটুকু মূল্যবান, যতোটুকু তা আমাদের সাহায্য করে উপাত্তের আভ্যন্তর সূত্র উদঘাটন করতে। অভিজ্ঞতাবাদীরা মানুষকে অধ্যয়ন করতে চান তার আচরণরাশি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, আর বোধিবাদীরা মনে করেন ওই পর্যবেক্ষণ ততোখানিই মূল্যবান, তা যতোখানি তুলে ধরতে পারে মানবাচরণের আভ্যন্তর, সংগুপ্ত ও রহস্যময় সূত্র। যদি তা না পারে, তবে মানবাচরণ পর্যবেক্ষণ মূল্যহীন। চোমস্কি ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সংগোপন, অদৃশ্য ও রহস্যমণ্ডিত আভ্যন্তর সূত্রের সন্ধানী। উপাত্তের বর্ণনা বিজ্ঞান নয়, উপাত্তের অন্তরে অবস্থিত সূত্রের উদঘাটনই বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের কোনো যৌক্তিক ও যান্ত্রিক উপায় নেই, অভিজ্ঞতাকে সহানুভূতির সাথে বোধ ক'রে বোধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যেই শুধু তা লাভ করা যায়। এ-সম্পর্কে আইনস্টাইন-এর দুটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে (দ্র বুশ (১৯৭৩)) : (ক) 'গাণিতিক সূত্র যে-পরিমাণে বাস্তবকে নির্দেশ করে, সে-পরিমাণে তা অনিশ্চিত, আর যে-পরিমাণে তা নিশ্চিত, সে-পরিমাণে তা বাস্তববিচ্ছিন্ন।'; (খ) 'শুধু অনুমান ও প্রকল্পনার সাহায্যে বাস্তব বিশ্ব আমাদের বোধগম্য হয়। তত্ত্ব কখনো অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয় না, তা পাওয়ার জন্যে শুধু অভিজ্ঞতানির্ভর হ'লে চলবে না।' দেখা গেছে অনেক তত্ত্ব, যা বৈজ্ঞানিক ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, জন্মেছে উপকথা, স্বপ্ন ও মগ্নতা থেকে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎস ও উৎসারণ সম্পর্কে নানারকম ধারণা বিদ্যমান। এসব ধারণার সারকথা হচ্ছে যে তত্ত্ব জন্ম নিতে পারে কল্পনারঞ্জিত অনুপ্রাণিত মুহূর্তে, অবরোহী পদ্ধতিতে, বা নিছক অনুমান থেকে। শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নির্বিশেষ তত্ত্বের উৎসারণ ঘটে না। স্বপ্ন ও সাদৃশ্যীকরণও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জনক হ'তে পারে, এবং হয়। কল্পনা-প্রতিভাদীপ্ত

সাদৃশ্যীকরণ, যাতে বিশেষ এক ক্ষেত্রের ভাবনাকে স্থানান্তরিত করা হয় অন্য ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠা করতে পারে সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এর উদাহরণ ডারউইন-এর প্রবালপ্রাচীর ও প্রবাল দ্বীপ গঠনতত্ত্ব, যা আজো বৈজ্ঞানিক ব'লে গৃহীত। প্রবাল দ্বীপ ও প্রাচীর দেখার অনেক আগে ডারউইন রচনা করেছিলেন এ-তত্ত্ব। স্বপ্নলব্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধ্রুপদী উদাহরণ ক্যক্যুলে-এর (১৮৬৫) বেনজিনচক্রতত্ত্ব। এসব তত্ত্ব বোধিজাত হ'লেও বাস্তব উপাত্তপ্রমাণকে অবহেলা করা হয় নি এতে, বরং ব্যাপক নিরীক্ষার সাহায্যে নানাভাবে সংশোধন করা হয়েছে এগুলো। তথ্য আমাদের সাহায্য করে, তবে আন্তর সূত্র আবিষ্কার করে আমাদেরই বোধিদীপ্ত চিত্ত।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চারটি বৈশিষ্ট্য : (ক) তত্ত্বের ব্যবহৃত শব্দ ও প্রতীকগুলো সুস্পষ্ট, নিরাবেগ ও নৈর্ব্যক্তিক; (খ) সরল তত্ত্বই সবচেয়ে তৃপ্তিকর (যদিও তা বিমূর্ত গাণিতিক হ'তে পারে); (গ) প্রতিটি তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে, এবং বিজ্ঞানী যথাযথ পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে লক্ষ্য করেন তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব ক্রমবর্ধমান উপাত্ত ব্যাখ্যা করতে পারে কি-না;—অর্থাৎ প্রতিটি তত্ত্বই মর্মমূলে বাতিল হওয়ার বীজ বহন করে; এবং (ঘ) বিজ্ঞানী প্রস্তুত থাকবেন সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে, তাঁর তত্ত্ব সংশোধন করতে, এবং উৎকৃষ্টতর কোনো তত্ত্বের জন্যে আপন তত্ত্ব ত্যাগ করতে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কি 'সত্য'? শুধুমাত্র বিশুদ্ধ যুক্তিবিদ্যায় ও সরল গাণিতিক সূত্রে কোনো একটি বক্তব্য অনন্য ও নিরপেক্ষ সত্য হ'য়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানের সূত্র বা নিয়মরাশি সরল নিরীক্ষিত তত্ত্ব, যে-কোনো সময় তাদের খণ্ডনযোগ্য উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে। তাই কোনো তত্ত্বই চিরন্তন নয়।

চোমস্কিপূর্ব কয়েক দশকব্যাপী সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের যুগে (১৯৩৩-১৯৫৬) ভাষাবিজ্ঞানীরা, ও সহযাত্রী সমাজবিজ্ঞানীরা, ভাষাবিজ্ঞানকে অগ্রসর, সুশৃঙ্খল, যথাযথ ও শক্তিশাস্ত্র ব'লে মনে করতেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা যে-ভাবে সুস্থির ব্যাকরণিক সূত্র রচনা করতেন, গবেষণাগারে নিরীক্ষা ক'রে যথাযথ ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনা দিতেন, তাতে ঈর্ষা বোধ করতেন সমাজবিজ্ঞানীরা, এবং আপন শাস্ত্রকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ভেবে গর্ব বোধ করতেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। পশ্চিমে বিজ্ঞানচর্চার অষ্টপ্রাহরিক সঙ্গী হচ্ছে যথাযথ পরিমাপ, জটিল যন্ত্রপাতি, পরীক্ষানিরীক্ষা, উপাত্তের পরিসংখ্যান। তবে এসব বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্ব নির্মাণ ও তত্ত্ব বৈধকরণ। তাৎপর্যপূর্ণ উপাত্তসংগ্রহ ও শ্রেণীকরণের প্রাকবৈজ্ঞানিক স্তর অতিক্রম করার পর শুরু হয় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক স্তর—নির্মাণ করতে হয় তত্ত্ব, এবং পরখ করতে হয় তার ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে হ'তে হয় স্ববিরোধমুক্ত, জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, জানা উপাত্ত ব্যাখ্যায় সমর্থ ও সরল সুন্দর সৌষ্ঠবমণ্ডিত। স্ববিরোধমুক্ত হওয়া দরকার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজনে;—স্ববিরোধপূর্ণ বিবৃতি থেকে যে-কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে হয় যাতে উভয়ের সাধারণ ও ওভারল্যাপিং উপাত্ত ব্যাখ্যায় বিরোধ না বাধে। প্রতিটি তত্ত্ব উপাত্তকে চূড়ান্ত পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাজই হলো সাধারণীকরণের মাধ্যমে বিশেষ ঘটনারাশি ও তাদের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা।

সৌন্দর্যের প্রয়োজনে চাই সারল্য ও সৌষ্ঠব। যখন কোনো বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের প্রাকবৈজ্ঞানিক বোধিজাত ধারণা থেকে স'রে যায়, তখন বুঝতে হবে যে তত্ত্বটি ত্রুটিপূর্ণ, বা আমাদের ধারণাই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু যদি ভবিষ্যদ্বাণী ও সাধারণ ধারণা মিলে যায়, তখন তত্ত্বটি শক্তিমান হয়ে ওঠে।

ওপরের মানদণ্ড অনুসারে চোমস্কিপূর্ব ভাষাবিজ্ঞান কতোখানি বৈজ্ঞানিক? সাংগঠনিকেরা উপাত্ত শ্রেণীকরণ ও বিন্যাসে মনোযোগী ছিলেন। একটি আধুনিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সাথে একটি প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণের তুলনা করলে দ্বিতীয়টিকে অনেকেই অবৈজ্ঞানিক ব'লে বাতিল ক'রে দেবেন, কেননা এসব ব্যাকরণে গ্রিক-লাতিন-সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগত পদরাশিকে চাপিয়ে দেয়া হয় অন্যান্য ভাষার ওপর। কিন্তু বর্ণনামূলক ব্যাকরণরাশিও উৎকৃষ্টতর নয়, এগুলোতে পাওয়া যায় উপাত্তের নব, ও ভিন্ন বিন্যাস, এবং পাওয়া যায় নতুন নতুন পদের ঝকঝকে বিবরণ। এসব ব্যাকরণে, কোনো গভীর কারণ ছাড়াই, এবং ভাষাসংগঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব ব্যবহার না ক'রেই, উপাত্তকে ধ্বনিমূল, রূপমূল, শব্দনির্মাণ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, নির্দেশক, এবং কখনো কখনো বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়। কিন্তু এসব ব্যাকরণ ভাষা সম্পর্কে কোনো গভীর বোধ সঞ্চার করে না। আপাতদৃশ্যমানতায় মগ্ন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান তাই বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। বলা যেতে পারে, ভাষাবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান হয়ে ওঠে ১৯৫৭ অব্দে, *সিন্টাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এর প্রকাশের সাথে। ভাষিক তত্ত্ব গঠনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয় এ-গ্রন্থে, এবং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতিতে। এটিতে শুধু উপাত্তকে নতুনভাবে বিন্যাস করার কৌশল পেশ করা হয় নি, বরং দেয়া হয়েছে ভাষা সম্পর্কে আমাদের বোধির এক কঠোর শৃঙ্খলানিষ্ঠ বিবরণ। চোমস্কি তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে—কুহ্ন (১৯৬২)-কথিত প্রণালিতে। তিনি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে বাতিল ক'রে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নতুন তত্ত্ব। তত্ত্ব পরখের প্রণালি হচ্ছে তত্ত্বের সামনে প্রশ্নসংকুল উপাত্ত তুলে ধরা, চোমস্কি তাই করেছেন। গৃহীত প্রচলিত মডেল বা প্যারাডাইমের সামনে চোমস্কি তুলে ধরেন একরাশ বিরক্তিকর উপাত্ত, যা ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান। তাই তিনি পুরোনো মডেল পরিত্যাগ ক'রে সৃষ্টি করেন নতুন মডেল বা তত্ত্ব, যা মান্য করে বিজ্ঞানের সমস্ত বিধিনিষেধ। আগে ভাষাবিজ্ঞান ছিলো ভাষার উদ্ভিদবিদ্যামাত্র, যার লক্ষ্য শ্রেণীকরণ; চোমস্কি-উত্তর ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো ভাষাসৃষ্টির আন্তর সূত্র উদঘাটন। এতে বিষয়ের আয়তন বাড়ে বহু গুণে, এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণপ্রণালিও হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক (দ্র § ৪.২— ৪.২.৯)।

৪.২.০ চোমস্কীয় বিপ্লব

ভাষাবিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসে চোমস্কীয় ভাষিক তত্ত্ব সবচেয়ে অভিনব ও বৈপ্লবিক (দ্র লায়ন্স, (১৯৭০), সার্ল (১৯৭২)); প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষাশাস্ত্রে এর কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। ভাষাবিজ্ঞানের জগতকে তীব্রভাবে আলোড়িত ক'রে আবির্ভূত হয় চোমস্কীয় রূপান্তরমূলক

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ, এবং ভাষাবিজ্ঞানের সীমানাকে সম্প্রসারিত ক'রে দেয় অভাবিতভাবে। এজন্যে রূপান্তর ব্যাকরণের আবির্ভাবকে অভিহিত করা হয় *চোমস্কীয় বিপ্লব* নামে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের রুদ্ধ সংকীর্ণ এলাকাকে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ শুধু মুক্ত আলোবাতাসে ভ'রে দেয় নি, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছদ্মবৈজ্ঞানিকতাকে অপসারিত ক'রে ভাষাবিজ্ঞানকে ক'রে তুলেছে বিশুদ্ধভাবে বিজ্ঞানসম্মত। চোমস্কীয় বিপ্লব বাক্যিক বিপ্লব, যা সৃষ্টি করেছে ভাষা সম্পর্কে নতুন, গভীর ও ব্যাপক বোধ, এবং এ-বিপ্লবের অমোঘ প্রভাব পড়েছে মানবিদ্যার অন্যান্য শাখার ওপর। সংকীর্ণ উপাত্তবর্ণনার বিমর্ষতা থেকে চোমস্কি উদ্ধার করেছেন ভাষাবিজ্ঞানকে, এবং মানুষ সম্পর্কে পুনরায় জন্ম দিয়েছেন ব্যাপকগভীর বোধ। দৃশ্যমানতার বর্ণনায় তৃপ্ত নন চোমস্কি, দৃশ্যের অভ্যন্তরে গুপ্ত সূত্র ও সত্য আবিষ্কার তাঁর লক্ষ্য। আচরণবাদী দৃষ্টিতে মানুষ পরিণত হয়েছিলো কুকুরগিনিপিগের সমতুল্য উদ্দীপক ও সাড়া-নিয়ন্ত্রিত প্রাণীতে, কিন্তু চোমস্কি দেখান যে মানুষ ভিন্ন, কেননা মানুষের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিশীলতা। তবে চোমস্কির তত্ত্ব মানুষকে পশু, বা যন্ত্ররূপে বিবেচনার প্রতিবাদে মানবতাবাদীর মর্মবিদারী আর্ত চিৎকার নয়। তিনি তাঁর তত্ত্ব পেশ করেছেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রীতিতে। তাঁর রচনা মূল্যবান এজন্যে যে (ক) আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের মানুষ-সম্পর্কিত ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর তত্ত্ব এক শাণিত ও শক্তিমান আক্রমণ, এবং (খ) তিনি তাত্ত্বিক আক্রমণ চালিয়েছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যে-বিজ্ঞানমনস্কতা, বা বৈজ্ঞানিকতা আচরণবাদীদের আরাধ্য, সে-বৈজ্ঞানিক যথাযথতার সাথে তিনি দেখান যে আচরণবাদী তত্ত্ব মানবভাষায় প্রয়োগ করলে যে-ফল পাওয়া যায়, তা শোচনীয়রূপে তুচ্ছ (দ্র চোমস্কি (১৯৫৯))। তিনি দেখিয়েছেন যে আচরণবাদীরা অনুকরণ করেছেন বিজ্ঞানের বহিরঙ্গের, তাই তাঁরা যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তার কোনো মূল্যবান অন্তঃসার নেই।

চোমস্কি উৎসাহী মানুষ, ও ভাষার আপাতদৃশ্যমানতার অভ্যন্তরে ও অন্তরালে সংগুপ্ত আন্তর সূত্র ও শৃঙ্খলা আবিষ্কারে। 'ভাষাপ্রয়োগ', চোমস্কির কাছে, মানুষের 'ভাষাবোধ'-এর বিচূর্ণ প্রকাশমাত্র; তাই ভাষাপ্রয়োগ নয়, মানুষের ভাষাবোধের সূত্র উদঘাটনই লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাষাবিজ্ঞানের। দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। তাঁর তত্ত্ব আকর্ষণীয়, কেননা তিনি পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তের সাহায্যে আবিষ্কার করতে চান ওই উপাত্তের আভ্যন্তর সূত্র। তিনি ভাষাবিজ্ঞানের জগতের একটি দ্বন্দ্বকে নিয়ে গেছেন চূড়ান্তে এবং মানব মন বা চৈতন্য সম্পর্কে উপস্থিত করেছেন এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব, যা আচরণবাদী ও পর্যবেক্ষণবাদী ধারণাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছে। তাঁর বিপ্লব ঘটেছে কুহ্নকথিত (দ্র কুহ্ন (১৯৬২)) বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের রীতি অবলম্বন ক'রেই। যখন কোনো গৃহীত 'মডেল', বা 'প্যারাডাইম', বা 'তত্ত্ব' নতুন উপাত্ত ব্যাখ্যা করতে পারে না, তখন দরকার হয় নতুন তত্ত্বের। চোমস্কি তাঁর সময়ে প্রচলিত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সামনে উপস্থিত করেন এমন উপাত্ত, যা ব্যাখ্যার শক্তি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছিলো না। তাই চোমস্কি পুরোনো মডেল, বা তত্ত্ব ছেড়ে রচনা করেন নতুন মডেল, বা তত্ত্ব। প্রাক-১৯৫৭ সালে মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে

করতেন যে ভাষাবস্তুরাশির শ্রেণীকরণই ভাষাবিজ্ঞানের পরম লক্ষ্য। চোমস্কি দেখালেন যে এ-লক্ষ্য থেকে যে-ফল পাওয়া যায়, তা মূল্যবান নয়। পেনসিলভানিয়ায় ছাত্রাবস্থায় সাংগঠনিক প্রণালিপদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন বাক্যের ওপর, এবং লক্ষ্য করেন যে-সব প্রণালি ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে মোটামুটিভাবে সাফল্য আয় করে, তা বিফল হয় বাক্যবর্ণনার সময়। প্রত্যেক ভাষায়ই ধ্বনিমূল ও রূপমূলের সংখ্যা সসীম, কিন্তু বাক্যের পরিমাণ অসীম। সম্ভাব্য নতুন বাক্যের কোনো সীমাপরিসীমা নেই। সাংগঠনিক প্রণালিতে ভাষার অসংখ্য বাক্য বর্ণনা করার কোনো উপায় নেই। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী ব্যগ্র ভাষার সামান্য খণ্ডাংশের বর্ণনায়। সাংগঠনিকদের কাছে ভাষা 'সৃষ্টিশীল' নয়, কিন্তু চোমস্কির কাছে সৃষ্টিশীলতাই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সাংগঠনিক প্রণালিতে ভাষার সৃষ্টিশীলতা ব্যাখ্যার কোনো উপায় নেই, তাই চোমস্কি (১৯৫৭) জন্ম দেন নতুন তত্ত্ব, এবং সৃষ্টি করেন ভাষার সৃষ্টিশীলতা ব্যাখ্যার উপযোগী ব্যাকরণ, যা রূপান্তরমূলক এবং সৃষ্টিশীল। চোমস্কির কাছে বাক্যই ভাষার মূলবস্তু, তাই রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার 'সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ' বাক্য সৃষ্টি করা (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৩), § ৪.২.৩))। রূপান্তর ব্যাকরণ প্রণালিপদ্ধতি নিয়ে এলো না, এলো একটি ব্যাপক শক্তিমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান ছিলো তত্ত্বহীন, ও প্রণালিসর্বস্ব, কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণে তত্ত্বই প্রধান, প্রণালিপদ্ধতি তার সহায়ক সামগ্রী। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রণালিপদ্ধতির যান্ত্রিক প্রয়োগের সাহায্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলো সত্য, কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণ বিশ্বাস করে যে শুধু প্রণালিপদ্ধতি দ্বারা নয়, চিত্তের হঠাৎ আলোর ঝলকানিও আবিষ্কার করতে পারে সত্য। শক্তিমান তত্ত্বের সাথে তিনি রূপান্তর ব্যাকরণে যুক্ত করেন এমন সব প্রণালিপদ্ধতি, যার সাহায্যে ভাষার মূল্যবান বৈশিষ্ট্যরাশিকে গাণিতিক যথার্থ্যের সাথে প্রকাশ করা সম্ভব। শিশুদের ভাষা-অর্জনপ্রক্রিয়া স্মরণ্য এ-প্রসঙ্গে : শিশুরা তাদের ভাষার শৃঙ্খলা, অর্থাৎ সূত্ররাজি শেখে তাদের সহবাসীদের থেকে, এবং সে-সূত্রের সাহায্যে এমন অভিনব বাক্য সৃষ্টি করে, যা তারা কখনো শোনে নি। চোমস্কি মনে করেন যে পৃথিবীর সব ভাষার সূত্রই কমবেশি 'সাধারণ', বা সন্নিকট, আর ভাষাসংগঠনের আভ্যন্তর নীতিমালা যেনো জৈবিকভাবে স্থির-করা, যা বংশানুক্রমিকভাবে ভাষাভাষীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। চোমস্কি দাবি করেন যে মানবভাষার এ-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। এ-কারণে রূপান্তর ব্যাকরণে জ্ঞান লাভ দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, ও শারীরবিজ্ঞানীর জন্যে অপরিহার্য।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বের হয় তাঁর সাড়াজাগানো, সরল, অপ্রাকরণিক বই *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*। এ-বইতেই প্রকাশিত হয় চমস্কীয় বিপ্লবের মৌল ইশতেহাররাশি। চোমস্কির পরবর্তী রচনাসমূহ (দ্র চোমস্কি (১৯৫৮, ১৯৫৯ক, ১৯৫৯খ, ১৯৬৪, ১৯৬৫)) তাঁর তত্ত্বকে ও ব্যাকরণের প্রণালিসমূহকে বিস্তৃত করেছে, এবং সুষ্ঠুতা দিয়েছে। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* অবশ্য

আজ আর ভাষাবর্ণনায় ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু এ-গ্রন্থে ব্যক্ত মৌলতত্ত্বের আবেদন হ্রাস পাবে না। ১৯৫৭র পর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে চোমস্কীয় বিপ্লববন্যা। আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায় হয়ে ওঠে রূপান্তরবাদী, এবং ইউরোপ ও অন্যত্রও দেখা দেয় তাঁর অনুসারী। প্রাচীন ভাষাবিজ্ঞানীরা তাঁদের শেখাশাস্ত্রেই নিবিষ্ট থাকেন, কিন্তু চোমস্কি জয় ক'রে নেন বিশ্বে যা সবচেয়ে শক্তিমান, সে-তরুণ সম্প্রদায়কে। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক থেকে যান সাংগঠনিক, কিন্তু তাঁর ছাত্ররা হয়ে ওঠে রূপান্তরবাদী। চোমস্কীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে চোমস্কি পান দুজন তীব্র, ও একজন বিজ্ঞ অনুসারী : রবার্ট লিজ ও পল পোস্টাল আমেরিকায়, এবং জন লায়ন্স যুক্তরাজ্যে। লিজ ও পোস্টালের মতো তীব্র প্রবক্তা, এবং লায়ন্সের মতো ভাষ্যকার রূপান্তরবাদী বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেন দেশদেশান্তরে। প্রথম পর্যায়ে দেখা দিয়েছিলো রূপান্তরবাদবৈরিতা, এমন কি দু-দশক পরে আজো দেখা যায় : বৃদ্ধ বিজ্ঞানীদের অনেকে আজো রুষ্ট রূপান্তরবাদীদের ওপরে। তাঁদের কাছে চোমস্কি ও তাঁর অনুসারীরা ভাষাবিজ্ঞানের সুস্থ সুশীল সৌষ্ঠবমণ্ডিত জগতে আচমকা ঢুকে-পড়া বর্বরদল। দু-দশক পরে অবশ্য পরিবর্তন ঘটেছে রূপান্তরবাদী বিশ্বেও : দেখা দিয়েছে বিপ্লবের ভেতরে বিপ্লব। চোমস্কির প্রথম পর্যায়ের অনেক অনুসারী— যেমন : পোস্টাল—যোগ দিয়েছেন চোমস্কিবিরোধী শিবিরে। চোমস্কির প্রতিভাবান অনুসারীরা তাঁরই তত্ত্বকে চূড়ান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ক'রে সৃষ্টি করেছেন এমন এক রূপান্তর ব্যাকরণ, যার নাম তাঁরা দিয়েছেন 'জেনারেটিভ সিম্যানটিক্স', বা 'সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব' (দ্র ল্যাকফ ১৯৭০ক, ১৯৭১খ), পোস্টাল (১৯৭০গ), ম্যাককলি (১৯৭০ক); § ৪.৭))। শিবিরের অন্তর্দ্রোহে কিছুটা আনন্দ পাচ্ছেন সাংগঠনিকেরা। চোমস্কি ও তাঁর অনুসারীদের বর্তমানে বলা হয় 'লেক্সিক্যালিস্ট', বা 'শব্দবাদী', এবং তাঁর বিরোধীদের বলা হয় ট্র্যান্সফরমেশনালিস্ট', বা 'রূপান্তরবাদী'। এঁদের দ্বন্দ্বে যে-গোত্রেরই জয় হোক-না-কেনো, তাতে সাংগঠনিকদের লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই, তাঁদের ক্ষতিই শুধু বাড়বে। তাঁদের পুনরুত্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে-বিপ্লবের স্রষ্টা চোমস্কি, তিনি তাকে চূড়ান্তে নিয়ে যেতে চাইছেন না, তিনি থেমে যেতে চান মধ্যপথে। তাঁর পথ অনুসরণ ক'রে এগোচ্ছিলেন যে-তরুণেরা, তাঁরা বিপ্লবকে নিয়ে যেতে চান চূড়ান্তে। কলহ এখানেই; আদি বিপ্লবীই সর্বাধিক বিপ্লবী নন।

৪.২.১ ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিলো ভাষাবস্তু শনাক্তকরণ ও শ্রেণীকরণ, অর্থাৎ উপাত্তবর্ণনাই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। তত্ত্ব নয়, তাঁদের সহায়ক ছিলো কিছু প্রণালিপদ্ধতি, যার সাহায্যে তাঁরা যান্ত্রিকভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তের ব্যাকরণ। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো সীমাবদ্ধ উপাত্তে। চোমস্কি ভাষাবিজ্ঞানকে মুক্তি দেন উপাত্ত ও প্রণালির পাংশু সংকীর্ণতা থেকে। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ অবশ্য সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের অনেক বোধ তিনি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু যে-সব বোধ তিনি মানেন নি, তা তাঁকে সুদূরে নিয়ে গেছে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান থেকে। পরবর্তী রচনাপুঞ্জে তিনি বহুদূর চলে যান সাংগঠনিকদের থেকে, যদিও

তাঁর অন্তরচনায়ও অস্পষ্টভাবে সাংগঠনিকদের ছোঁয়া বোধ করা যায়— আদিধর্মকে সম্পূর্ণরূপে এড়ানো অসম্ভব ব'লেই সম্ভবত। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমুক্ত। বর্তমানে চোমস্কি ও চৈতন্যবাদ যেমন অচ্ছেদ্য, *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ তা নয়; তাঁর প্রথম গ্রন্থে যে-চোমস্কিকে পাওয়া যায়, তিনি সাংগঠনিক রূপান্তরবাদী।

চোমস্কির কাছে ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য 'সৃষ্টিশীলতা'। তাই তিনি মনে করেন যে-কোনো ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাষার সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশ করা। কোনো ভাষীই সমস্ত বাক্য মুখস্থ ক'রে রাখে না, কেননা তা অসম্ভব। প্রত্যেক ভাষারই বাক্য অসংখ্য। কিন্তু ভাষাভাষীরা ধারণ করে সে-শক্তি, যার সাহায্যে তারা অশ্রুত ও অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, ও বুঝতে পারে। তাই ভাষাভাষীর সৃষ্টিশীলতাকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলাই হওয়া উচিত ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য। ভাষার সৃষ্টিশীলতার প্রতি চোখ ছিলো প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের, কিন্তু সাংঠনিকেরা অবহেলা করেছেন ভাষার সৃষ্টিশীলতাকে। চোমস্কি *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ ইতিহাস খোঁজেন নি, কিন্তু পরবর্তী রচনায় পোর রআইআল পণ্ডিতদের ব্যাকরণে, এবং হুমবোল্‌ড্‌ট্‌ ও সোস্যুর-এর রচনায় দেখেছেন ভাষার সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ (দ্র চোমস্কি (১৯৬৪, ৭-২৭; ১৯৬৫, ৫-৭))। চোমস্কির কাছে কোনো ভাষা—'ভ'—র ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষা—'ভ'—র তত্ত্ব। যে-কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ'ড়ে ওঠে কিছু সংখ্যক পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি ক'রে। ওই তত্ত্ব দৃশ্যমান উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ক'রে রচনা করে এমন 'সাধারণ সূত্র', যা অদৃশ্য উপাত্ত সম্পর্কে করতে পারে 'ভবিষ্যদ্বাণী'। তেমনি, যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণও গ'ড়ে ওঠে কিছু পরিমাণ দৃশ্যমান উপাত্তের ওপর ভিত্তি ক'রে, এবং রচনা করে এমন সাধারণ সূত্র, যা শুধু দৃশ্যমান উপাত্তকেই নয়, অদৃশ্য উপাত্তকেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। ব্যাকরণের সূত্ররাশি উপাত্তের অন্তর্গত বাক্যের সাংগঠনিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, এবং সে-সাথে নির্দেশ করে উপাত্তবহির্ভূত অসংখ্য বাক্যসংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক। তাই, চোমস্কির মতে, ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভাষার জন্যে সঠিক তত্ত্ব, বা ব্যাকরণ প্রণয়ন।

প্রতিটি ব্যাকরণকে পূরণ করতে হয় কতিপয় 'উপযুক্ততার শর্ত', বা 'যোগ্যতার শর্ত' (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ৪৯-৬০; ১৯৬৪, ২৮-৩০))। একটি শর্তের নাম দিয়েছেন চোমস্কি 'উপযুক্ততার বহিঃশর্ত'। ব্যাকরণের 'উপযুক্ততার বহিঃশর্ত' বলতে তিনি বোঝান যে ব্যাকরণের সৃষ্ট সমস্ত বাক্য ওই ভাষাভাষীদের বিবেচনায় শুদ্ধ ব'লে গৃহীত হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণ এমন কোনো বাক্য সৃষ্টি করতে পারবে না, যা ওই ভাষাভাষীদের বিবেচনায় গ্রহণঅযোগ্য, বা অশুদ্ধ। এমন বেশ কিছু 'বহিঃশর্ত' মেটাতে হবে ব্যাকরণকে। এ ছাড়া আরো একটি শর্ত মেটাতে হবে ব্যাকরণকে—চোমস্কি (১৯৫৭, ৪৯-৫১) এ-শর্তটির নাম দিয়েছেন 'সাধারণত্ব শর্ত'। এটি কঠিনতর শর্ত। এ-শর্তানুসারে কোনো বিশেষ ভাষার ব্যাকরণে ব্যবহৃত ক্যাটেগরিসমূহ—যেমন : ধ্বনিমূল, রূপমূল, পদ, বাক্য প্রভৃতি—গৃহীত হবে এমন এক নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব থেকে, যে-তত্ত্ব সমস্ত ভাষায় প্রয়োগ করা সম্ভব। কোনো

বিশেষ ভাষার ক্যাটেগরিরাশি শুধু ওই ভাষানির্ভর হ'তে পারবে না, তা গৃহীত হ'তে হবে সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব থেকে। এ-শর্ত দুটি অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা এ-শর্তের সাহায্যে অসংখ্য প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্য থেকে উপযুক্ত ব্যাকরণগুলোকে বের ক'রে নেয়া সম্ভব।

'সাধারণত্ব শর্ত' প্রসঙ্গে, ওপরে, নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব, এবং ওই তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত বিশেষ ভাষায় ব্যাকরণের কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে : নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব ও বিশেষ ব্যকরণের মধ্যে সম্পর্ক কী? অন্যভাবে বলা যায়, কী অর্থে একটি বিশেষ ব্যাকরণ একটি নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত? কোনো নির্বিশেষ তত্ত্ব থেকে কোনো বিশেষ ব্যাকরণের উদ্ভবের রীতিকে চোমস্কি ভাগ করেছেন তিনটি 'প্রণালি'তে। প্রণালি তিনটি হচ্ছে : (ক) আবিষ্কার প্রণালি, (খ) সিদ্ধান্ত প্রণালি, এবং (গ) মূল্যায়ন প্রণালি। কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমাদের ত্রিবিধ প্রত্যাশা থাকতে পারে :

[ক] আবিষ্কার প্রণালি : কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমরা আশা করতে পারি যে এ-তত্ত্বটি এতো শক্তিমান হবে উপাত্ত সরবরাহের সাথে সাথে ওই তত্ত্ব যান্ত্রিকভাবে উপাত্তের ব্যাকরণ রচনাকৌশল নির্দেশ করবে। অর্থাৎ এ-তত্ত্ব সরবরাহ করে ব্যাকরণ 'আবিষ্কার প্রণালি'।

[খ] সিদ্ধান্ত প্রণালি : কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমরা আশা করতে পারি যে ওই তত্ত্বটি আমাদের এমন প্রণালি উপহার দেবে, যার সাহায্যে বিশেষ উপাত্ত ভিত্তি ক'রে রচিত বহু প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট, তা যান্ত্রিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। কীভাবে ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে এ-তত্ত্ব কিছু বলবে না; কিন্তু তা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণটি নির্দেশ করবে। অর্থাৎ এ-তত্ত্ব আমাদের দেয় 'সিদ্ধান্ত প্রণালি'।

[গ] মূল্যায়ন প্রণালি : কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে আমরা আশা করতে পারি যে ওই তত্ত্ব আমাদের এমন প্রণালি দেবে, যার সাহায্যে প্রতিযোগী ব্যাকরণরাশির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট, কোনটি অনুৎকৃষ্ট, তা নির্ণয় করা যাবে। মনে করা যাক, কোনো উপাত্ত ভিত্তি করে রচিত হয়েছে দুটি ব্যাকরণ : 'ব্যাকরণ-১', এবং 'ব্যাকরণ-২'। তত্ত্বের কাজ হবে এ-ব্যাকরণ দুটির মধ্যে কোনটি উন্নততর, তা নির্দেশ করা। অর্থাৎ এখানে তত্ত্ব উপহার দেয় 'মূল্যায়ণ প্রণালি'।

কোনো তত্ত্বের কাছে 'আবিষ্কার প্রণালি' কামনা করা হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ আশা, ও দুরাশা। এর চেয়ে পরিমিত, ও বাস্তব প্রত্যাশা হচ্ছে 'সিদ্ধান্ত প্রণালি' কামনা, এবং সবচেয়ে পরিমিত, ও বাস্তব প্রত্যাশা হচ্ছে 'মূল্যায়ন প্রণালি' কামনা। চোমস্কির মতে কোনো ভাষিক তত্ত্বের কাছে মূল্যায়ন প্রণালির চেয়ে শক্তিমান কোনো প্রণালি আমরা কামনা করতে পারি না। তাই উল্লিখিত প্রণালি তিনটির মধ্যে চোমস্কি গ্রহণ করেছেন দুর্বলতম মূল্যায়ন প্রণালিটি, এবং পরিত্যাগ করেছেন আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত প্রণালি। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিলো আবিষ্কার প্রণালি প্রণয়ন, কিন্তু এ-দুরভিলাষ পূর্ণ হওয়ার নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও দেখা

যায় যে উপাত্ত ব্যাখ্যার কোনো যান্ত্রিক প্রণালি নেই, আর এমন কোনো প্রণালিও নেই যার সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট, তা ব'লে দেয়া সম্ভব। চোমস্কিপূর্ব মার্কিন ভাষাবিজ্ঞান ছিলো প্রণালিসর্বস্ব। সাংগঠনিকদের ধারণা ছিলো যে বিভিন্ন প্রণালিপদ্ধতি যে-কোনো ভাষা-উপাত্তের ওপর প্রয়োগ করলে ওই উপাত্তের একখানি চমৎকার ব্যাকরণ যান্ত্রিকভাবে রচিত হয়ে যাবে। এমন মনোভাবকে চোমস্কি বিভ্রান্তিকর ও অপকারী ব'লে মনে করেন। তত্ত্ব ও প্রণালির সমীকরণ করা অনুচিত। প্রণালিপদ্ধতি যান্ত্রিক প্রয়োগে ব্যাকরণ রচিত হয় না : ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাবিশ্লেষণের সময় কাজে লাগাতে পারেন ভাষা সম্পর্কে তাঁর পূর্বধারণা, অভিজ্ঞতা, অনুমান, এবং কখনো এ-প্রণালি, কখনো সে-প্রণালি। এমনকি হঠাৎ অনুপ্রাণিত মুহূর্তের বোধিও তাঁকে সাহায্য করতে পারে। মূল্যবান যা, তা হচ্ছে ফলাফল : কী প্রণালিতে ব্যাকরণটি রচিত হয়েছে, তা মূল্যবান নয়; রচিত ব্যকরণটি কেমন হয়েছে, তাই মূল্যবান। প্রণালিপদ্ধতির যে দরকার নেই, তা নয়; তবে প্রণালিপদ্ধতিই প্রধান হয়ে উঠবে না। যান্ত্রিকভাবে প্রণালি প্রয়োগে উপাত্তের ব্যাকরণ আবিষ্কৃত হ'তে পারে না, বা কোনো তত্ত্ব এমন শক্তিমানও হ'তে পারে না, যার সাহায্যে তা বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে উৎকৃষ্টতম ব্যাকরণটিকে যান্ত্রিকভাবে নির্দেশ করতে পারে। কোনো একটি ভাষিক তত্ত্ব যা করতে পারে, তা হচ্ছে মূল্যায়ন প্রণালি রচনা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে তুলনা ক'রে কোন ব্যাকরণটি ভালো, কোনটি ভালো নয়, একটি ভাষিক তত্ত্ব তা নির্দেশ করতে পারে। অন্যান্য বিজ্ঞানেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষণীয়। সেখানেও এমন কোনো উপায় নেই, যার সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে উপাত্তের উৎকৃষ্টতম তত্ত্ব, এবং বিভিন্ন প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট, তা নির্ণয়েরও কোনো প্রণালি নেই। যেমন : আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে তাঁর বর্ণিত উপাত্তের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যা ব'লে কেউ মনে করে না, শুধু মনে করা হয় যে আপেক্ষিক তত্ত্ব নিউটনীয় তত্ত্বের চেয়ে উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানেও কোনো একটি তত্ত্বের কাছে মূল্যায়ন প্রণালির চেয়ে শক্তিমান কিছু কামনা করা হয় না। ভাষাবিজ্ঞানেরও অন্যান্য বিজ্ঞানের চেয়ে অধিক উচ্চাভিলাষী হওয়ার কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকতে পারে না।

ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞানের উচ্চাভিলাষ ছেড়ে সীমিত অভিলাষী মূল্যায়ন প্রণালি গ্রহণ করায় কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে চোমস্কি ভাষাবিজ্ঞানের মহৎ লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করেছেন। এক দিকে তিনি ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে সীমিত করলেও মূল দিকে ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে অভাবিতরূপে প্রসারিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সাংগঠনিকেরা আবিষ্কার প্রণালি কামনা করলেও মূল্যায়ন প্রণালির চেয়ে মূল্যায়ন কিছু আয়ত্ত করতে পারেন নি। চোমস্কি ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে প্রসারিত করেছেন এভাবে : আগে সীমাবদ্ধ ভাষা-উপাত্তের বর্ণনা দেয়াই ছিলো ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য, কিন্তু চোমস্কীয় ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য হলো ভাষার সংখ্যাহীন বাক্য সৃষ্টি করা, ও তার সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়া। ভাষার সৃষ্টিশীলতা, ও ভাষাভাষীদের সৃষ্টিশীলতার আন্তর সূত্র উদঘাটন করাই হলো রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান

স্বপ্নেও এমন লক্ষ্যের কথা ভাবে নি। আবিষ্কার প্রণালি ও সিদ্ধান্ত প্রণালি পরিত্যাগ ক'রে চোমস্কি সাংগঠনিক দুরাশাকে দূর করেছেন, এবং ভাষার সৃষ্টিশীলতার সূত্র উদঘাটন করতে চেয়ে ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে মহান ক'রে তুলেছেন।

৪.২.২ ভাষার সৃষ্টিশীলতা ও বাক্যের অনন্ততা

ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিশীলতা। বিপুল পরিমাণ উপাত্তের মধ্যেও দেখা যাবে যে পুনরাবৃত্ত বাক্যের সংখ্যা খুবই কম। ভাষাভাষীদের দৈনন্দিন ভাষাব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তারা নিত্য নতুন, অভিনব, ও অশ্রুতপূর্ব বাক্য ব্যবহার করে। যে-সমস্ত বাক্য দৈনন্দিন জীবনে পুনরাবৃত্ত হয়, তার এক বড়ো অংশ হচ্ছে 'সামাজিকতার বাক্য': 'কেমন আছেন'?, 'ভালো আছি', 'শরীরটা ভালো নেই', 'শুভেচ্ছা রইলো' জাতীয় সীমিত সংখ্যক বাক্য বাদ দিলে দেখা যায় যে ভাষাভাষীরা নিত্য নতুন বাক্য সৃষ্টি করে। মানুষ যেমন নতুন ও অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি পারে অন্যের সৃষ্ট নতুন ও অভিনব বাক্য বুঝতে। অর্থাৎ ভাষা ও ভাষাভাষীরা সৃষ্টিশীল। এমন নয় যে আমরা সমস্ত বাক্য রচনা ক'রে, বা শিখে ওই বাক্যরাশিকে মজুত ক'রে রেখে দিই মস্তিষ্কে, এবং ব্যবহার করি সুযোগসুবিধা ও সময়-মতো। ভাষার সীমিত সংখ্যক ধ্বনির সাহায্যে মানুষ রচনা করতে পারে 'অসংখ্য' বাক্য। উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ থেকে পৌঁছানো সম্ভব নিম্নের সিদ্ধান্তে (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ১৯)) :

[ক] মনে করা যাক যে পৃথিবী আরো বহু দিন টিকে থাকবে, তাহলে কোনো ভাষা—'ভ'-র বাক্যরাশির প্রধান অংশ গঠন করবে সে-সমস্ত বাক্য, যা আজো উচ্চারিত হয় নি, সম্ভবত কোনোদিন উচ্চারিত হবে না। আর ওই ভাষার বাক্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশটি গঠন করে সে-সমস্ত বাক্য, যা উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু লিপিবদ্ধ হয় নি। তাই কোনো ভাষার কোনো বিশেষ উপাত্ত ওই ভাষার এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ মাত্র। যদি মনে করি যে একজন ব্যাকরণবিদ বাঙলা ভাষা বর্ণনার সময় গ্রহণ করেছেন পৃথিবীর সমস্ত পাঠাগারে সংরক্ষিত সমস্ত পুস্তকের সমস্ত বাক্য, তাহলে তাঁর উপাত্তকে পরিমাণে বিপুল ব'লে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু ওই বিপুল উপাত্তও সমগ্র বাঙলা বাক্যের (উচ্চারিত এবং লিপিবদ্ধ বাক্য, উচ্চারিত এবং অলিপিবদ্ধ বাক্য, এবং ভবিষ্যতে যে-সমস্ত বাক্য উচ্চারিত হ'তে পারে, এবং যে-সমস্ত বাক্য কোনোদিনই উচ্চারিত হবে না)) তুলনায় অতিশয় তুচ্ছ।

[খ] "ক' বাঙলা বলে' বাক্যটির প্রধান অর্থ হচ্ছে যে 'ক' যে-কোনো সময় নতুন ও অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, এবং অন্যের সৃষ্ট বাঙলা বাক্য বুঝতে পারে। এর মানে হচ্ছে 'ক' বাঙলা ভাষাকে 'সৃষ্টিশীলতা'র সাথে ব্যবহার করে। প্রত্যেক ভাষাভাষী ভাষাকে সৃষ্টিশীলরূপে ব্যবহার করতে পারে : প্রত্যেক ভাষাভাষী বহন করে বাক্য সৃষ্টির ও বোঝার অসচেতন শক্তি।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার সৃষ্টিশীলতা মূল্য পায় নি, কিন্তু রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্যই হচ্ছে ভাষা, ও ভাষাভাষীর সৃষ্টিশীলতা সুস্পষ্টভাবে উদঘাটন করা।

যে-কোনো ভাষার সম্ভাব্য বাক্য অসংখ্য। ওপরে বলা হয়েছে : যে-কোনো ভাষার বাক্যের প্রধান অংশ আজো উচ্চারিত হয় নি, এবং, সম্ভবত, কোনোদিন উচ্চারিত হবে না। তাই কোনো ভাষা সীমিত সংখ্যক বাক্যের সমষ্টি, না অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি, তা বাস্তব, উপাত্তনির্ভর প্রমাণের সাহায্যে স্থির করা অসম্ভব। কিন্তু সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা যখন দাবি করেন যে-কোনো ভাষায় বাক্য অসংখ্য, তখন তাঁরা তাঁদের দাবির সপক্ষে কী যুক্তি দেন? বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্যে একটি উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক :

(১) যে-মেয়েটি এসেছে, সে যে-ছেলেটিকে ভালোবাসে, তার ছোটো বোন যে-বেড়ালটি পোষে, সেটি যার থেকে উপহার পেয়েছে, সে যে-ছেলেটিকে পছন্দ করতো...

(১) বাক্যটি বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই বোঝা উচিত যে বাক্যের দৈর্ঘ্য ও সাংগঠনিক বৈচিত্র্য এক কথা নয়। (১) বাক্যটিতে আছে একটি প্রধান বাক্য, এবং একরাশ সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য। একই সূত্রের পৌনপুনিক প্রয়োগে গ'ড়ে উঠেছে (১) বাক্যটি। অর্থাৎ (১) বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাকরণের 'পৌনপুনিকতা শক্তি'। তত্ত্বগতভাবে (১) বাক্যে অসংখ্য সম্বন্ধাত্মক বাক্য গ্রথিত করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সময় এক জায়গায় সম্বন্ধাত্মক বাক্য গ্রন্থনে সীমা আমাদের টানতেই হয়। না টানলে বাক্য গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে : যেমন (১) বাক্যটি সামান্য কয়েকটি সম্বন্ধাত্মক বাক্যের চাপেই গ্রহণযোগ্যতা হারাতে বসেছে। কিন্তু এ-সীমা ব্যাকরণের সূত্রগত নয়, অর্থাৎ ব্যাকরণগত কারণে এখানে সীমা টানা হচ্ছে না, সীমা টানা হচ্ছে স্মৃতিভ্রংশতা, সময়সীমা প্রভৃতি অভাষিক কারণে। যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষার, অর্থাৎ ওই ভাষার বাক্যসমূহের তত্ত্ব। বাঙলা ব্যাকরণ বাঙলা ভাষার তত্ত্ব, তাই বাঙলা ব্যাকরণে (১) বাক্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অবশ্যই নির্দেশ করতে হবে। এ-বাক্যটির সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্যে বাঙলা ব্যাকরণে গ্রহণ করতে হবে 'পৌনপুনিকতা নীতি/তত্ত্ব'। যেহেতু (১)-এ অসংখ্য সম্বন্ধাত্মক বাক্য গেঁথে দেয়া সম্ভব, তাই ব্যাকরণ ধারণ করে সীমাহীন 'পৌনপুনিকতা শক্তি'। এ-শক্তির সাহায্যে ব্যাকরণ নির্দেশ করে যে (১), এবং বাঙলা ভাষার অন্যান্য বাক্য, মর্মমূলে অসীম : ইচ্ছে করলেই যে-কোনো বাক্যকে দীর্ঘতর করা যায়। যেহেতু ভাষার প্রতিটি বাক্যই অসীম, তাই ব্যাকরণ নির্দেশ করে যে-কোনো ভাষায় বাক্য অসংখ্য।

৪.২.৩ 'রূপান্তরমূলক' এবং 'সৃষ্টিশীল'

'সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' বিশেষ একরকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যাকরণ, আর 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' হচ্ছে বিশেষ একরকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। ব্যাকরণ মাত্রই যে সৃষ্টিশীল হবে, তা নয়; আবার সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ মাত্রই যে রূপান্তরমূলক হবে, তাও নয়; এবং

রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ মাত্রই যে সৃষ্টিশীল হবে, তাও নয়। যে-ব্যাকরণ যুগপৎ 'রূপান্তরমূলক' এবং 'সৃষ্টিশীল', তাই রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ চোমস্কিপ্রস্তাবিত ব্যাকরণিক 'রূপান্তর'-এ বিশ্বাসী (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৯৫৮), ৪.৫.১.২))। 'সৃষ্টিশীল'— 'জেনারেটিভ'—শব্দটি চোমস্কি গ্রহণ করেছেন গণিত থেকে। ভাষাবিজ্ঞানে এ-শব্দটি নির্দেশ করে 'সুস্পষ্টতা', ও 'ভবিষ্যদ্বাণীসক্ষমতা'। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ হচ্ছে সুস্পষ্ট সূত্রসমষ্টি, এবং এ-সূত্রসমূহ বৈজ্ঞানিক অর্থে 'ভবিষ্যদ্বাণী' করতে পারে— অর্থাৎ এ-ব্যাকরণ উপাত্তকে অতিক্রম ক'রে যায়। চোমস্কির (১৯৬৫, ৮) মতে 'সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' হচ্ছে 'সূত্রপ্রণালি, যা সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠুরূপে সৃষ্ট-বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়।' বাক্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে চোমস্কি সাধারণত ব্যবহার করেন 'সৃষ্টি' [জেনারেট] শব্দটি, এবং খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করেছেন 'উৎপাদন'— 'প্রোডিউস'—শব্দটি। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বাক্য সৃষ্টি করে, উৎপাদন করে না। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ প্রতিটি বাক্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, পাঠকের বোধির ওপর কিছুই ছেড়ে দেয় না। এ-ব্যাকরণের সুস্পষ্টতা সম্পর্কে চোমস্কি ও হাল-এর (১৯৬৮, ৬০) বক্তব্য : 'এ-ব্যাকরণের সূত্ররাশি যান্ত্রিকভাবে প্রযুক্ত হয়। এ-সূত্ররাশিকে গ্রহণ করা যেতে পারে আপন বিবেচনা ও প্রকল্পনাশূন্য নির্বোধ রোবোটের উদ্দেশ্যে দেয়া নির্দেশ সমষ্টিরূপেও। সূত্রে থাকবে না কোনো অস্পষ্টতা, ও দ্ব্যর্থতা : কেননা এ-ব্যাকরণে নির্দেশপ্রাপককে বিবেচনা করা হয় আপন বিচারবিবেচনা ব্যবহারে অক্ষম ব'লে, বা অশুদ্ধকে শুদ্ধ করতে অক্ষম ব'লে।' চোমস্কি ও হালের এমন মন্তব্য অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, এবং তাঁরা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকে বাস্তব অর্থে যন্ত্র, যেমন : কম্পিউটর, ভাবতে চান। কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকে বাস্তব অর্থে যন্ত্র ভাবা ঠিক নয়, একে কল্পনা করা যেতে পারে বিমূর্ত যন্ত্ররূপে। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তা ভাষাভাষীর বোধির ওপর নির্ভরশীল নয়, এ-কথাই বোঝাতে চান চোমস্কি ও হাল।

নিচে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের কতিপয় মৌল ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

[ক] সমস্ত, এবং কেবল শুদ্ধ : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভাষার সমস্ত শুদ্ধ এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করে। মনে করা যাক, বাঙলা ভাষার একটি সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বিপুল পরিমাণ বাঙলা বাক্য সৃষ্টি করে। ওই বাক্যরাশির প্রচুর বাক্য বাঙলাভাষী কর্তৃক শুদ্ধ ব'লে গৃহীত। কিন্তু এমনও দেখা যেতে পারে যে ওই ব্যাকরণ এমন কিছু বাক্য সৃষ্টি করে, যা বাঙলাভাষীদের বিবেচনায় 'অশুদ্ধ'। এ-অশুদ্ধ বাক্যরাশিকে পরিহার করার জন্যে বলা হয় যে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভাষার 'সমস্ত, এবং কেবল শুদ্ধ' বাক্য সৃষ্টি করবে; এমন বাক্য সৃষ্টি করতে পারবে না যা 'শুদ্ধ' নয়।

[খ] ভবিষ্যদ্বাণীসক্ষমতা : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ এ-ব্যাকরণ এমন শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যা আগে আর দেখা যায় নি। যে-উপাত্ত ভিত্তি ক'রে রচিত হবে এ-ব্যাকরণ, সে-উপাত্তের বাইরের অসংখ্য শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করতে

হবে এ-ব্যাকরণের। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ উপাত্ত অতিক্রম ক'রে যাবে : তা শুধু বর্ণনা করবে না, বাক্য সৃষ্টি করবে। যদি উপাত্তকে অতিক্রম ক'রে যেতে না পারে, তবে ব্যাকরণ সৃষ্টিশীল হবে না।

[গ] সুস্পষ্টতা : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের সূত্ররাশি সুস্পষ্ট : বাক্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া এতো স্পষ্ট ও অনুপুঙ্খভাবে নির্দেশ করতে হবে যে তার সাহায্যে যেনো যে-কেউ নির্ভুল বাক্য গঠন করতে পারে। ব্যবহারকারীর বোধির ওপর কিছুই ছেড়ে দেয়া যাবে না।

[ঘ] সাংগঠনিক বর্ণনা : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ কেবল বাক্য সৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হবে না; এ-ব্যাকরণ সৃষ্ট প্রতিটি বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে। সাংগঠনিক বর্ণনা হচ্ছে বাক্যের সংগঠনসংক্রান্ত বিবরণ। সাংগঠনিক ব্যাকরণে বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়া হয় না, কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে অত্যাবশ্যকভাবে দেয়া হয় প্রতিটি বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা।

[ঙ] ব্যাকরণ সসীম : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভাষাভাষীর ভাষাবোধকে প্রতিফলিত করে। মানুষের স্মৃতিশক্তি যদিও অমিত, তবুও তা সীমিত; তাই ব্যাকরণ ভাষার অসংখ্য বাক্যের তালিকা হ'তে পারে না। ভাষার সমস্ত বাক্য পৃথক পৃথকভাবে ধারণ করার শক্তি মস্তিষ্কের নেই। মানুষ সীমিত সংখ্যক সূত্রের সাহায্যে সংখ্যাহীন বাক্য সৃষ্টি করে। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণও তেমনি সীমিত সংখ্যক সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করে ভাষার অনন্ত ও অসংখ্য বাক্যসমষ্টি। যদি ব্যাকরণের সূত্র, অর্থাৎ ব্যাকরণ, অসীম হতো, তাহলে বাক্যসৃষ্টি সম্ভবপর হতো না।

[চ] বক্তাশ্রোতানিরপেক্ষতা : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বক্তাশ্রোতানিরপেক্ষ। যেহেতু বলা হয় যে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বাক্য সৃষ্টি করে, তাই অনেকে মনে করে যে এ-ব্যাকরণ বক্তার ব্যাকরণ, শ্রোতার ব্যাকরণ নয়। কিন্তু এ-ব্যাকরণ বক্তাশ্রোতানিরপেক্ষ : একজন 'আদর্শ বক্তাশ্রোতা'র ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য।

৪.২.৪ যোগ্যতার স্তর

কোনো ভাষিক তত্ত্ব থেকে উৎসারিত বিভিন্ন ব্যাকরণ বিভিন্ন রকম সাফল্য অর্জন করতে পারে, এবং ওই সাফল্যকে বিন্যস্ত করা সম্ভব বিভিন্ন 'স্তর'-এ। যদি কোনো ব্যাকরণ প্রাথমিক উপাত্তের বিশ্বস্ত ও যথাযথ বর্ণনা দেয়, তবে বলতে পারি যে ব্যাকরণটি সাফল্যের নিম্নতম স্তরে রয়েছে। যদি কোনো ব্যাকরণ ভাষাভাষীর ভাষাবোধের সার্থক বর্ণনা দেয়, এবং তাৎপর্যমণ্ডিত নির্বিশেষীকরণের সাহায্যে উদঘাটন করে উপাত্তের আন্তর শৃঙ্খলা, এবং যথাযথ বর্ণনা দেয় দৃশ্যমান উপাত্তের, তবে বলতে পারি যে ব্যাকরণটি আয়ত্ত করেছে আরো উন্নত স্তরের সাফল্য। কিন্তু এ-সাফল্যও ব্যাকরণের জন্যে চরম সাফল্য নয়। তৃতীয়, এবং উচ্চতম, স্তরের সাফল্য অর্জিত হয় তখনি, যখন ব্যাকরণটির সাথে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটি সরবরাহ করে ব্যাকরণ

মূল্যায়নপ্রণালি : ওই প্রণালি নির্দেশ করে দেবে বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে উৎকৃষ্টতার কোনগুলো। এ-ক্ষেত্রে ভাষিক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে ভাষাভাষীদের ভাষাবোধ (দ্র চোমস্কি (১৯৬৪, ২৮))। চোমস্কি ব্যাকরণের সাফল্যের বা যোগ্যতার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন : (ক) পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা, (খ) বর্ণনাত্মক যোগ্যতা, এবং (গ) ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা। যদি কোনো ব্যাকরণ প্রাথমিক উপাত্তের যথাযথ বর্ণনা দেয়, তখন বলা যেতে পারে যে ব্যাকরণটি অর্জন করেছে 'পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা'। পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা হচ্ছে ব্যাকরণের সাফল্যের নিম্নতম স্তর : যে-ব্যাকরণ এ-স্তরের সাফল্য আয় করে, তা বিশেষ মূল্যবান নয়। এর চেয়ে উন্নত স্তরের সাফল্য হচ্ছে বর্ণনাত্মক যোগ্যতা। যে-ব্যাকরণ দৃশ্যমান প্রাথমিক উপাত্তকে অতিক্রম ক'রে সম্ভাব্য বাক্যাবলি সম্পর্কে ভাষাভাষীদের বোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, সে-ব্যাকরণই অর্জন করে বর্ণনাত্মক যোগ্যতা। এ-ব্যাকরণ ভাষাভাষীর সৃষ্টিশীলতার সূত্র উদঘাটন করে। উচ্চতম স্তরের সাফল্য—ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা—আয় করা কোনো বিশেষ ব্যাকরণের পক্ষে সম্ভব নয়, এ-স্তরের যোগ্যতা আয় করতে পারে শুধু কোনো একটি ভাষিক তত্ত্ব। ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা অর্জনকারী ভাষিক তত্ত্ব বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাকরণের জন্ম দেয়, এবং সে-সাথে ভাষানিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন বর্ণনাত্মক সাফল্য অর্জনকারী ব্যাকরণের মধ্যে কোনগুলো উন্নত, তা নির্দেশ করে।

সাংগঠনিক ব্যাকরণের লক্ষ্য ছিলো পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা অর্জন। ওই ব্যাকরণ দৃশ্যমান উপাত্তের যথাযথ বর্ণনা দিতে চেয়েছে, কিন্তু উপাত্তকে অতিক্রম ক'রে যেতে চায় নি। প্রথাগত ব্যাকরণের দৃষ্টি ছিলো বর্ণনাত্মক যোগ্যতার দিকে। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য বর্ণনাত্মক যোগ্যতা অর্জন, আর সৃষ্টিশীল ভাষিক তত্ত্বের লক্ষ্য ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা লাভ। ব্যাকরণ যদি ভাষার কোনো বিশেষ স্তরের (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব) বর্ণনায় সাফল্য লাভ করে, কিন্তু ব্যর্থ হয় অন্য স্তরের বর্ণনায়, তবে সে-ব্যাকরণ ব্যর্থ। ভাষার সমস্ত স্তরে বর্ণনাত্মক সাফল্য অর্জন করতে হবে ব্যাকরণকে। এমন বর্ণনা পরিহার্য, যা আপাতদৃষ্টিতে সরল ও সফল; যদি তা ভাষার সমস্ত এলাকা সরল ও সফলভাবে বর্ণনা করতে না পারে, তবে তা পরিহার্য।

৪.২.৫ দুর্বল ও শক্তিমান : ব্যাকরণ ও মূল্যায়নপ্রণালি

কোনো ব্যাকরণ 'দুর্বল'ভাবে সৃষ্টি করে একরাশ বাক্য, আর বাক্যগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করার জন্যে 'শক্তিমান'ভাবে সৃষ্টি করে ওই বাক্যরাশির 'সাংগঠনিক বর্ণনা'। ব্যাকরণের বাক্যসৃষ্টির শক্তিকে চোমস্কি বলেন ব্যাকরণের 'দুর্বল সৃষ্টিশক্তি'; এবং বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দানের শক্তিকে বলেন ব্যাকরণের 'শক্তিমান সৃষ্টিশক্তি'। দুটি ব্যাকরণ যদি একরাশ অভিন্ন বাক্য সৃষ্টি করে, তবে ওই ব্যাকরণ দুটিকে বলা হয় 'দুর্বলভাবে সমতুল্য'। যদি দুটি 'দুর্বলভাবে সমতুল্য' ব্যাকরণ তাদের সৃষ্ট বাক্যরাশির অভিন্ন সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়, তবে ওই ব্যাকরণ দুটিকে বলা হয় 'শক্তিমানভাবে সমতুল্য'। মনে করা যাক দুটি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, এবং ওই ব্যাকরণ

দুটি অভিন্ন বাক্যরাশি সৃষ্টি করে। তাই এ-ব্যাকরণ দুটি 'দুর্বলভাবে সমতুল্য'। এ-দুটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্টতর? ব্যাকরণ দুটিকে মূল্যায়ন করতে ব'সে যদি দেখা যায় যে যদিও উভয়েই সৃষ্টি করে একই রকম বাক্য; কিন্তু একটি ব্যাকরণ দিয়েছে তার সৃষ্ট বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা, কিন্তু অন্যটি কোনো সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় নি; তবে যে-ব্যাকরণটি সাংগঠনিক বর্ণনা দিয়েছে, সেটিকেই উৎকৃষ্টতর ব'লে বিবেচনা করতে হবে।

সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টির ক্ষমতা হচ্ছে ব্যাকরণের 'দুর্বল সৃষ্টিশক্তি'। যে-ব্যাকরণ শুধুমাত্র শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করে, এবং এর বেশি কিছু করে না, সে-ব্যাকরণ 'দুর্বল'। কেননা এ-ব্যাকরণ দৃশ্যমান উপাত্ত বর্ণনা ক'রে অর্জন করে নিম্নতম পর্যায়ের সাফল্য—পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা। তবে এ-নিম্নতম সাফল্য অর্জনেও ব্যাকরণ ব্যর্থ হ'তে পারে দু-ভাবে : প্রথমত—ব্যাকরণটি এমনভাবে রচিত হ'তে পারে যে ওটিকে বাস্তব উপাত্ত দিয়ে পরখ করা অসম্ভব হ'তে পারে। প্রথাগত ব্যাকরণ ব্যর্থ হয় এমনভাবে—এর সূত্র সুস্পষ্ট নয়, তাই তা পরখ করা যায় না। দ্বিতীয়ত—ব্যাকরণটি বিপুল পরিমাণ শুদ্ধ বাক্যের সাথে সৃষ্টি করতে পারে একরাশ অশুদ্ধ বাক্য। যেহেতু ব্যাকরণটি দৃশ্যমান উপাত্তকেও বর্ণনা করতে পারলো না, তাই এটি ব্যর্থ হলো পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা অর্জনে। কিন্তু যদি কোনো ব্যাকরণ পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা আয়ত্ত করে, তবুও তা মূল্যবান হয়ে ওঠে না; কেননা তা দীনভাবে উপাত্ত বর্ণনা করে শুধু। ব্যাকরণ মূল্যবান হয়ে ওঠে যোগ্যতার দ্বিতীয় স্তরে : বর্ণনাত্মক যোগ্যতার স্তরে। যে-ব্যাকরণ উপাত্ত যথাযথ সৃষ্টি করে, এবং সৃষ্টি করে উপাত্তবহির্ভূত বাক্য, এবং প্রতিটি বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়, সে-ব্যাকরণই বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন। যে-ব্যাকরণ বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্বজ, তাই সর্বোত্তম ব্যাকরণ।

৪.২.৬ (ভাষা)বোধ ও (ভাষা)প্রয়োগ

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বোধ হচ্ছে (ভাষা)বোধ, ও (ভাষা)প্রয়োগ। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য হচ্ছে আদর্শ বক্তাশ্রোতার ভাষাবোধের আন্তর সূত্র উদঘাটন : বাস্তবে তিনি কীভাবে ভাষাপ্রয়োগ করেন, তার বর্ণনা দেয়া সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নয়। চোমস্কির (১৯৬৫, ৪) মতে ভাষাবোধ হচ্ছে 'বক্তাশ্রোতার ভাষাজ্ঞান', আর ভাষাপ্রয়োগ হচ্ছে 'বাস্তব পরিস্থিতিতে ভাষাব্যবহার'। 'বক্তাশ্রোতা' শব্দটি নির্দেশ করে যে একজন ভাষাভাষী তাঁর ভাষাজ্ঞানকে দু-ভাবে ব্যবহার করতে পারেন : তিনি বাক্য সৃষ্টি করতে পারেন, এবং অন্যের সৃষ্ট বাক্য অনুধাবন করতে পারেন। কোনো ভাষাভাষী তাঁর ভাষা, বা ভাষার শৃঙ্খলা সম্পর্কে অসচেতনভাবে যা জানেন, তাই তাঁর ভাষাবোধ। ভাষাবোধ সচেতন ব্যাপার নয়, তা অসচেতন। সব ভাষার অধিকাংশ ভাষীই ভাষা আয়ত্ত করেন অসচেতনভাবে। বাস্তব পরিস্থিতিতে যেভাবে কোনো ভাষাভাষী ভাষা ব্যবহার করেন, তাই তাঁর ভাষাপ্রয়োগ। ভাষার বাস্তব প্রয়োগ ভাষাভাষীর আন্তর ভাষাবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, বা প্রতিফলন নয়। কোনো ব্যক্তির ভাষাপ্রয়োগকে তাঁর ভাষাবোধের বহিঃপ্রকাশ ব'লে মনে করা ঠিক নয়। বাস্তব

ভাষাপ্রয়োগে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বহু বক্তা বাক্য শুরু করেন একভাবে, কয়েক শব্দের পরেই পাল্টে দেন বাক্যের ধরন, বা ভাষার নিয়ম থেকে স'রে যান বেশ দূরে, এবং তাঁর উক্তির শেষে তাঁর বক্তব্য যদিও বুঝি আমরা, তবু তাঁর গঠিত বাক্যকে সুষ্ঠু ব'লে গ্রহণ করতে পারি না। তাঁর এ-ত্রুটি প্রয়োগের ত্রুটি, বোধের নয়। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য বাস্তব, অসুষ্ঠু ভাষাপ্রয়োগের অভ্যন্তরে গুপ্ত ভাষাভাষীর ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। ভাষাভাষীর ভাষাবোধের আন্তর সূত্রের সমষ্টি হচ্ছে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ।

ভাষাবোধের সাহায্যে ভাষাভাষী নিত্য নতুন, অভিনব, অশ্রুতপূর্ব বাক্য সৃষ্টি করতে পারেন, এবং অন্যের সৃষ্ট বাক্য বুঝতে পারেন। চোমস্কির মতে সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের কাম্য হচ্ছে 'আদর্শ পরিস্থিতি'তে আদর্শ বক্তাশ্রোতা'র ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। সে-আদর্শ পরিস্থিতিতে এমন কিছু থাকবে না, যা বক্তাশ্রোতাকে বাধা দিতে পারে বাক্যসৃষ্টিতে, ও অনুধাবনে। সৃষ্টিতে, ও অনুধাবনে যদি কোনো মানস, শারীর, বা অন্য কোনো ব্যাঘাত ভাষাভাষীকে বাধা না দেয়, তবে ওই বাস্তব পরিস্থিতিতে তাঁর সৃষ্ট বাক্যকে গ্রহণ করা সম্ভব তাঁর ভাষাবোধের বহিঃপ্রকাশ ব'লে। কিন্তু বাস্তবে এমন আদর্শ পরিস্থিতি দুর্লভ। ভাষাপ্রয়োগে বিঘ্ন ঘটায় মানস, শরীর, ও নানাবিধ বাস্তব ব্যাপার; তাই ভাষাপ্রয়োগকে ভাষাবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ব'লে গ্রহণ করা যায় না। যদি দৃষ্টি দিই ভাষার বাস্তব প্রয়োগে, তাহলে দেখি নিত্যনিয়ত এমন সব বাক্য গঠিত হচ্ছে, যাদের ব্যাকরণসম্মত ব'লে গ্রহণ করা অসম্ভব। (২)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(২) ক আমি আশা করি আপনি... আচ্ছা, সে-দিন কি আপনি এসেছিলেন?

খ দিনকাল এমন পড়েছে...হে হে... নিধিরাম শেপাইদের...শালায় টেকাই কককঠি...কী যেনো বলছিলাম...আপনি নিজেই দেখছেন...চুপ মেরে আছি সবাই...আমি একটা উপন্যাস লেখার কথা ভাবছি...চমৎকার বিষয় পেয়ে গেছি...আমি ঘুমোতে পারি না।

এক রকম বাক্যসংগঠন থেকে মধ্যপথে অন্য রকম বাক্যসংগঠনে চ'লে যাওয়ার নিদর্শন (২ক)। (২খ) বাক্যটিকে দখল ক'রে আছে বাক্যবিপর্যয়, স্মৃতিভ্রংশতা, মনোযোগস্খলন, ভীতি, পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি অভাষিক ব্যাপার। বলা যেতে পারে (২ক, খ) সৃষ্ট হয়েছে ভাষা-সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় ব্যাঘাতবশত। তবে (২ক, খ) বক্তব্যশূন্য নয়; এমন নয় যে শ্রোতা এদের মধ্যে থেকে কোনো মর্ম উদ্ধার করতে পারবেন না। উভয় বক্তব্যই বেশ ভালোভাবে সঞ্চারিত হবে শ্রোতার চিত্তে। (২ক, খ) শ্রোতার কাছে গ্রাহ্য হবে শ্রোতার ভাষাবোধের সহায়তায়। তবে (২ক, খ)র সাহায্যে বক্তার ভাষাবোধ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা কঠিন : (২ক, খ)র বক্তার ভাষাবোধ অবশ্যই গভীর, কিন্তু তাঁর ভাষাপ্রয়োগ বিপর্যস্ত হচ্ছে সম্ভবত মানস, শারীর, ও পরিস্থিতিক কারণে। 'ভাষাবোধ', ও 'ভাষাপ্রয়োগ'-এর সাথে যুক্ত যথাক্রমে 'ব্যাকরণসম্মতি',

ও 'গ্রহণযোগ্যতা' বোধ দুটি (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ১০))। ভাষাবোধের অন্তর্গত বোধ হচ্ছে 'ব্যাকরণসম্মতি', আর ভাষাপ্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত ধারণা হচ্ছে 'গ্রহণযোগ্যতা'। কোনো বাক্য তখনি ব্যাকরণসম্মত, যখন তা গঠিত ব্যাকরণের সূত্রানুসারে; আর সে-বাক্যই গ্রহণযোগ্য বাক্য, যা ব্যাকরণের সূত্রবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও শ্রোতার চিত্তে ভাবসঞ্চার করে, এবং বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন সম্পর্কে আমাদের কিছুটা আভাস দেয়। ব্যাকরণগত দিক দিয়ে চমৎকার সুচারু বাক্যও অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত বাক্যও, বাস্তব প্রয়োগের সময়, গ্রহণঅযোগ্য ব'লে বিবেচিত হতে পারে; আবার ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্যও চমৎকারভাবে গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হতে পারে বাস্তব প্রয়োগের সময়। কী রকম বাক্য বাস্তবে গ্রহণযোগ্য, আর কী রকম বাক্য বাস্তবে গ্রহণঅযোগ্য, তা স্থির করা কঠিন। বাক্যের গ্রহণযোগ্যতা ও গ্রহণঅযোগ্যতা সম্পর্কে প্রায় দু-দশক আগে ইংগ্ভ (১৯৬১) পেশ করেছিলেন তাঁর 'গভীরতাতত্ত্ব'। তাঁর তত্ত্ব আজ আর গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয় না, তবে তাঁর তত্ত্বে মনোযোগ দেয়ার মতো বস্তু রয়েছে। (৩)-এর 'পৌনপুনিক সূত্র'-সম্বলিত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি লক্ষণীয় :

(৩) [ক] ক → খ + গ

[খ] খ → (খ) + ঘ

[গ] খ → ঙ + (খ)

[ঘ] খ → চ + (খ) + ছ

(৩খ, গ, ঘ) সূত্র তিনটি পৌনপুনিক সূত্র। তবে এগুলোর পৌনপুনিকতার পার্থক্য রয়েছে। (৩খ) সূত্রটি বাঁ-দিকে শাখায়নের নিদর্শন : এটি বাম-পৌনপুনিক সূত্র; আর (৩গ) সূত্রটি ডান দিকে শাখায়নের নিদর্শন : এটি ডান-পৌনপুনিক সূত্র। (৩ঘ) সূত্রটি কেন্দ্রে শাখায়নের নিদর্শন : এটি মধ্য-পৌনপুনিক বা স্বগ্রথিত সূত্র। ইংগ্ভ-এর মত হচ্ছে যে বাম-পৌনপুনিক সূত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বাড়ায়, অর্থাৎ 'গভীরতা' সঞ্চার করে। এমন সূত্রের সাহায্যে গঠিত বাক্য, তাঁর মতে, স্মৃতিশক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করে; এবং এ-চাপ যতোই বাড়ে, বাক্য ততোই অবোধ্য হয়ে ওঠে। তাঁর তত্ত্ব বিভ্রান্তিকর এজন্যে যে তাঁর ধারণা যেনো মানবমস্তিষ্ক কম্পিউটরতুল্য : যা বুঝতে কম্পিউটরের বেশি কষ্ট হয়, তা বুঝতে মানুষেরও অধিক কষ্ট হবে, এমন তাঁর ধারণা। অনেক ভাষায় দেখা যায় বাঁ-দিকে শাখায়িত বাক্যের আধিক্য (যেমন : বাঙলা, তুর্কি, ও জাপানিতে), কিন্তু তাতে ওই ভাষাভাষীদের অসুবিধা হয় না। (৩খ) সূত্রটি অর্থাৎ বাম-পৌনপুনিক সূত্র সৃষ্টি করে (৪ক) ধরনের সংগঠন; (৩গ) সূত্রটি, অর্থাৎ ডান-পৌনপুনিক সূত্র সৃষ্টি করে (৪খ) ধরনের সংগঠন; এবং (৩ঘ) সূত্রটি অর্থাৎ স্বগ্রথিত সূত্র সৃষ্টি করে (৪গ) ধরনের সংগঠন :

(৪)
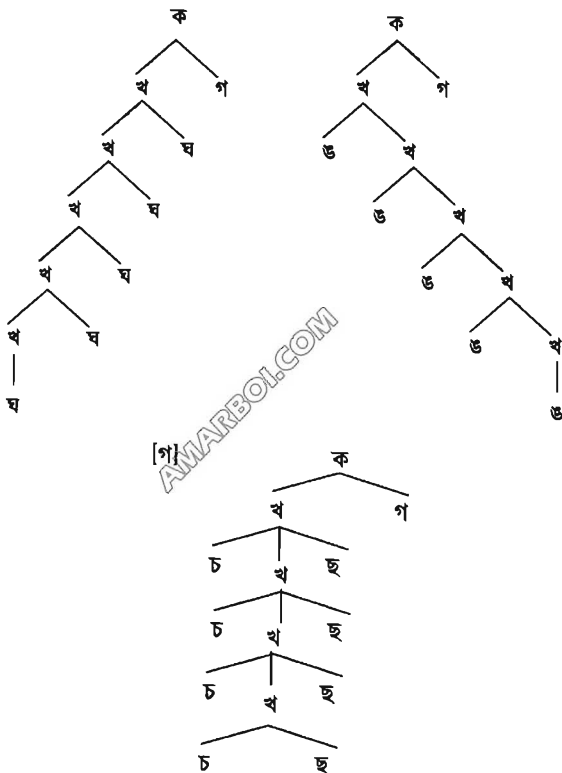
ওপরের তিন রকম সংগঠনের মধ্যে কোন রকম সংগঠন অবোধ্য, কোন রকম সংগঠন দুরূহ, এবং কোন রকম সংগঠন সরল, তা বলা বেশ কঠিন। বাঙলায় বাম-পৌনপুনিক, ও ডান-পৌনপুনিক বাক্যসংগঠন পাওয়া যায়, তবে স্বগ্রথিত বাক্যের উদাহরণ দুর্লভ। (৫)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৫) ক হাসানের বোনের স্বামীর মামীর ভাইয়ের বান্ধবীর বেড়ালের ডাক গানের মতো।

খ যে-মেয়েটি নাচছে, সে যে-ছেলেটিকে চিঠি লিখেছে, সে-ছেলেটি যাকে একটি গোলাপ উপহার দিয়েছে, সে যে-অধ্যাপককে বাঙলাদেশের সেরা কবি মনে করে, তিনি যাকে...

গ সে-গোলাপটি, যা আপনি আমি দেখেছিলেন তুলেছিলাম, চমৎকার।

(৫)-এর বাক্যগুলো পৌনপুনিক সূত্রের সাহায্যে গঠিত : এ-সব বাক্য বিশেষ এক ধরনের বাক্যসংগঠনকে একই ধরনের বাক্যসংগঠনের ওপর পৌনপুনিকভাবে আরোপ করা হয়েছে। (৫ক) বাম-পৌনপুনিকতার নিদর্শন : এ-বাক্যে প্রধান বিশেষ্যপদের আগে সৃষ্টি করা হয়েছে সমসাংগঠনিক সম্বন্ধপদ। বাক্যটি আপাতবোধ্য। সম্বন্ধপদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে এ-আপাতবোধ্যতাও তিরোহিত হতো। (৫খ) ডান-পৌনপুনিকতার নিদর্শন : এ-বাক্যে সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্যের ডানমুখি জাল বিস্তার করা হয়েছে। (৫গ) স্বগ্রথিততার নিদর্শন : এতে একটি মূল বাক্যের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে দুটি সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য। (৫)-এর বাক্য তিনটির মধ্যে এটি কিম্ভূততম : বাস্তবে বাঙলা ভাষায় এমন বাক্য পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওপরের তিনটি বাক্যই ব্যাকরণসম্মত, যদিও এরা সবাই সমপরিমাণে গ্রহণযোগ্য নয়।

বাক্যকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলার জন্যে বাঙলা ভাষায় বেশ কয়েকটি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করা হয়। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৬) ক আমি যে তুমি আসবে জানতাম।

খ আমি জানতাম যে তুমি আসবে।

(৭) ক মেয়েটি, যে এসেছে, রূপসী।

খ যে-মেয়েটি এসেছে, সে রূপসী।

(৬ক) বাক্যটি, যদিও নিখুঁতভাবে ব্যাকরণসম্মত, নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। এ-বাক্যটির মধ্যে ঢুকে আছে একটি পরিপূর্ণ 'সম্পূরক বাক্য' ('তুমি আসবে')। বাঙলা ভাষায় কর্ম-বিশেষ্যপদ, সাধারণত, ক্রিয়ারূপের অব্যবহিত-পূর্বস্থানে বসে : যেমন—'সে বই পড়ে'। (৬ক) বাক্যে 'তুমি আসবে' বাক্যটি 'জানতাম' ক্রিয়ারূপের কর্ম; তাই এটির বসা উচিত ক্রিয়ারূপের অব্যবহিত-পূর্বস্থানে, অর্থাৎ (৬ক) বাক্যে এটি যে-জায়গায় বসেছে, সে-জায়গায়। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ বাক্যের এমন অবস্থানে ব্যবহারিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তাই বাঙলা ভাষায় এমন সম্পূরক বাক্যকে স্থানান্তরিত করা হয়, এবং স্থাপন করা হয় ক্রিয়ারূপের ডান পাশে। (৬ক, খ) বাক্য দুটিকে উপস্থাপন করা যায় যথাক্রমে (৬র্ক, র্খ) পদচিত্রে :

(৬)
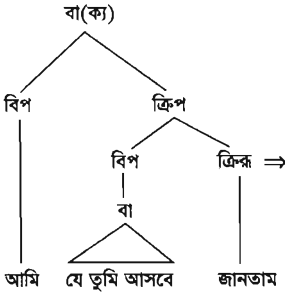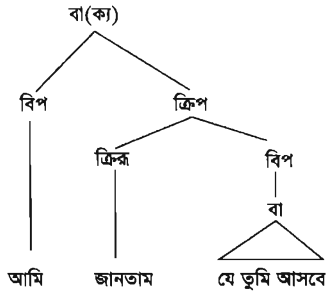
(৬খ)তে সম্পূরক বাক্যটিকে স্থাপন করা হয়েছে ক্রিয়ারূপের ডানে, এবং রচিত হয়েছে চমৎকার গ্রহণযোগ্য একটি বাক্য। (৬ক, খ)র মধ্যে কোনোটিকেই ব্যাকরণবিরোধী নয়, তবে বাস্তবে, একটি অন্যটির চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বা অযোগ্য। (৭ক) একটি 'সম্বন্ধাত্মক বাক্য' : এ-বাক্যে একটি বিশেষ্যপদের গায়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে একটি সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য ('যে এসেছে')। কিন্তু এটি ব্যাকরণসম্মত হওয়া সত্ত্বেও এটির চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এরই রূপান্তর (৭খ)। বাঙলায় বাক্যের অভ্যন্তরে সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্য লালন করা হয় না ব্যবহারিক অসুবিধার জন্যে, এবং এমন খণ্ডবাক্যকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মূল বাক্যের বাঁ-পাশে। (৭খ)তে সম্বন্ধাত্মক খণ্ডবাক্যটিকে মূল বাক্যের বাঁয়ে স্থাপন করা হয়েছে, এবং এর ফলে বাক্যটির রূপ অনেকটা বদলে গেছে। বাস্তবে যদিও (৭খ)ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, তবু (৭ক, খ)র সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উদঘাটন ক'রে দেখানো যায় যে (৭ক)ই হচ্ছে মৌল বাক্য, যার থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে (৭খ) বাক্যটি।

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের লক্ষ্য ভাষাভাষীর ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা; ভাষাপ্রয়োগের প্রণালিবর্ণনা এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য নয়। ভাষাবোধের বহিঃপ্রকাশ যেহেতু বিঘ্নিত হয় নানা অভাষিক কারণে, তাই ভাষাভাষীর ভাষাবোধের আন্তর শৃঙ্খলা উদঘাটনের জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীকে গ্রহণ করতে হয় আদর্শায়িত উপাত্ত, যা অভাষিক বিঘ্ন দ্বারা পীড়িত হয়। আদর্শ উপাত্ত সম্পর্কে চোমস্কির (১৯৬৫, ৩) বক্তব্য : 'ভাষিক তত্ত্বের বিষয় একজন আদর্শ বক্তাশ্রোতা, যে বসবাস করে সুষম ভাষাসমাজে, এবং নিজের ভাষা জানে সুচারুরূপে। সে তার ভাষাজ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের সময় স্মৃতিভ্রংশতা, বিচলন, মনোযোগস্খলন, ভুলভ্রান্তি প্রভৃতি অব্যাকরণিক ব্যাপার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।' ভাষাবোধের সূত্র উদঘাটনের জন্যেই দরকার হয় আদর্শায়িত উপাত্ত।

৪.২.৭ চৈতন্যবাদ

মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান উপাত্ত-ও আচরণবাদী, এবং চৈতন্যবাদবিরোধী; অন্য দিকে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ চৈতন্যবাদী, এবং উপাত্ত-ও আচরণবাদবিরোধী। চৈতন্যবাদ ও উপাত্তবাদের (অভিজ্ঞতাবাদ) দ্বন্দ্ব পশ্চিমে চ'লে আসছে বহু দিন ধ'রে। চৈতন্যবাদের প্রধান পুরুষ দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) ও লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬); আর অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান পুরুষ লক (১৬৩২-১৭০৪) ও হিউম (১৭১১-১৭৭৬)। অভিজ্ঞতাবাদের একরকম পরিণতি হচ্ছে আচরণবাদ, যা বিশশতকী মার্কিন মনস্তত্ত্বশাস্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানও গ্রহণ করে আচরণবাদ। চোমস্কীয় ভাষাবিজ্ঞান আচরণবাদের বিরুদ্ধে এক বিশাল, ও সফল বিদ্রোহ। চোমস্কি প্রথম পর্যায়ের রচনায়, যেমন : *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমুক্ত; কিন্তু ক্রমশ তিনি এগোন দর্শন ও মনস্তত্ত্বের দিকে। তাঁর যাত্রা শুরু হয় 'স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞান' রীতি অবলম্বন ক'রে, এবং তাঁর পরিণতি রচনায়ও ছোঁয়া বোধ করা যায় স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞানের; কিন্তু তিনি যাত্রা শুরুর স্বল্প পরেই স'রে যান স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞান থেকে, এবং ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন, ও মনস্তত্ত্বকে গ্রহণ করেন পরস্পর-লগ্ন ও-নির্ভর বিদ্যারূপে। ভাষাবিজ্ঞান তাঁর কাছে মূল্যবান এজন্যে নয় যে এর কৌশলগুলো চমৎকারভাবে মানুষকে ভাষা আয়ত্তে সাহায্য করতে পারে; ভাষাবিজ্ঞান চোমস্কির কাছে মূল্যবান, কেননা এ-শাস্ত্র মানবমন ও মস্তিষ্কের ওপর মূল্যবান আলোকসম্পাত করতে পারে। চোমস্কি, তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের রচনাবলিতে (১৯৬৬ক, ১৯৬৮), মানবমন-উদ্ভাসী রশ্মিরূপেই গ্রহণ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানকে। চোমস্কির মতে চৈতন্যবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের সাহায্যে, সহায়তা করতে পারে ভাষাবিজ্ঞান। চরম চৈতন্যবাদীদের মতে মানবমন, বা চৈতন্যই সমস্ত জ্ঞানের উৎস; আর অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের জননী। ইউরোপে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মন, ও বাহ্য জগত সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক হয়, এবং এ-বিতর্ক সম্প্রসারিত হয় বিশশতক পর্যন্ত। লক-হিউম প্রমুখের মতে মানবমন হচ্ছে 'শূন্য পৃষ্ঠা'—'তাবুলা রাসা'—যা এক সময় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে ভরাট হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অভিজ্ঞতার আগে মানুষ নির্জ্ঞান; জ্ঞানশূন্য প্রাণীরূপে জন্ম নেয় মানবসন্তান। দেকার্ত-লাইবনিৎস-এর মতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে কতিপয় সহজাত বোধ নিয়ে; আর ওই সহজাত আন্তর বোধরাশিই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। অভিজ্ঞতা, তাঁদের মতে, জ্ঞানের জননী নয়। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তির মূলে আছে অভিজ্ঞতাবাদ। অভিজ্ঞতাবাদ 'শারীরবাদ' ও 'নিয়ন্ত্রণবাদ'-এর সাথে যুক্ত হয়ে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে যে মানুষের জ্ঞান ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেশ-নিয়ন্ত্রিত; আর এ-ব্যাপারে মানুষ, পশু ও যন্ত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শারীরবাদের বক্তব্য হচ্ছে মানুষের শারীর অবস্থা ও আচরণসূত্রের সাহায্যে, পদার্থবিদ্যার সূত্রের মতো, বর্ণনা করা যায় মানুষের তথাকথিত আবেগ-অনুভূতিচিন্তাকে; আর নিয়ন্ত্রণবাদের মূল কথা হচ্ছে মানুষের 'স্বাধীন ইচ্ছা' উপকথামাত্র। মানুষ, অন্য যে-কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো, প্রাক্তন ঘটনা ও ব্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এবং

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসূত্র দ্বারা চালিত। তাই মানুষের নির্বাচন-স্বাধীনতা সর্বাংশে প্রতিভাসমাত্র। মানুষ সম্পর্কে চোমস্কির ধারণা অভিজ্ঞতাবাদী ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত : তাঁর মতে মানুষ সমৃদ্ধ কতিপয় সহজাত ও আন্তর বৈশিষ্ট্যে, যা জ্ঞানার্জনে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ-আন্তর বৈশিষ্ট্যরাজি মানুষকে সাহায্য করে মুক্ত, স্বাধীন, ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে। মানবমন, ও মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চোমস্কি ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেছেন *কার্টেজিয়ান লিংগুইস্টিক্স* (১৯৬৬), ও *ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড মাইন্ড* (১৯৬৮) গ্রন্থে। তিনি মানুষকে মুক্ত করেন আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের 'উদ্দীপক' ও 'সাড়া'র শেকল থেকে।

চৈতন্যবাদ ও আচরণবাদী দ্বন্দ্বের দুটি পৃথক ও পরস্পরলগ্ন দিক আছে : এর একটি দার্শনিক, অন্যটি প্রণালিপদ্ধতিগত (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ২৩))।

দার্শনিক দিক : ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞানের কোনো তাত্ত্বিক উৎসাহ ছিলো না। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো যে ভাষাবর্ণনাই ভাষাবিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। ভাষাবিজ্ঞান তাঁদের কাছে মূল্যবান ছিলো, কেননা তাঁরা মনে করতেন যে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রণালির সহায়তায় ভাষাভাষীরা সহজভাবে ভাষা শিখতে পারে। কিন্তু স্যাপির ব্যতীত আর কারো মনে এ-ধারণা ঢোকে নি যে ভাষাবিদ্যা মূল্যবান, যেহেতু ভাষা মানুষের অনন্য সম্পদ, যা চিন্তার জন্যে অপরিহার্য। ব্লুমফিল্ড *ল্যাংগুয়েজ* (১৯৩৩) গ্রন্থ সংশোধনের সময় পরিণত হয়েছিলেন চরম আচরণবাদীতে। জ্যাক ও জিলের গল্পের (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ৩২)) ভাষ্যদানের সময় তিনি ভাষা সম্পর্কে দুটি তত্ত্বের কথা বলেছেন : একটি 'চৈতন্যবাদ', অন্যটি 'যন্ত্রবাদ'। চৈতন্যবাদ ও যন্ত্রবাদের যে-বিবরণ ব্লুমফিল্ড (দ্র ১৯৩৩, ৩২) দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ : 'চৈতন্যবাদী তত্ত্ব, যা প্রাচীনতর, এবং বিদ্যমান আজো জনপ্রিয় লোকবিশ্বাসে ও বিজ্ঞানীমণ্ডলে, মনে করে যে মানবাচরণ-বৈচিত্র্যের মূলে আছে 'চেতনা', বা 'ঈপ্সা', বা 'মন' নামী এক অ-শারীর বস্তু, যা বিদ্যমান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। চেতনা, চৈতন্যবাদী তত্ত্বানুসারে, বাস্তব পদার্থপুঞ্জ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; সুতরাং তা মেনে চলে অন্য রকম কোনো কার্যকারণশৃঙ্খলা, বা তা কোনোরকম কার্যকারণশৃঙ্খলারই অধীন নয়। জিল কোনো কথা আদৌ বলবে কি-না, বা বললে কী বলবে, তা নির্ভর করে তার মন, বা চেতনার ওপর; আর এ-মন বা চেতনা যেহেতু জাগতিক কার্যকারণশৃঙ্খলার অধীন নয়, তাই আমরা তার আচরণ সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। জড়বাদী (বা যন্ত্রবাদী) তত্ত্ব মনে করে যে ভাষাসহ সমস্ত মানবাচরণবৈচিত্র্যের মূলে আছে মানবশরীর, যা এক অতিশয় জটিল তন্ত্র। মানবাচরণ, যন্ত্রবাদী তত্ত্বানুসারে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে যেমন কার্যকারণশৃঙ্খলা দেখা যায়, ঠিক তেমন শৃঙ্খলারই অধীন।' ব্লুমফিল্ড আক্রমণ চালিয়েছিলেন প্রথাগত চৈতন্যবাদের বিরুদ্ধে; কেননা তা এমন সব উপাত্ত নিয়ে কারবার করে যা বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। ব্লুমফিল্ড মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের মূলে দেখতে চান বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণসম্ভব কোনো-না-কোনো কারণ, আর তা নির্ণয় করতে চান যান্ত্রিকভাবে। এ-তত্ত্ব ভাষায় প্রয়োগ করতে গেলে

ধ'রে নিতে হবে যে মানুষের প্রতিটি উক্তির পেছনে রয়েছে ভাষাবহির্ভূত কোনো কারণ। যদি জানা যায় ওই কারণটি, বা কারণগুলো, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কে কী উক্তি করবে, তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে আচরণবাদ ভাষাসম্পর্কে পোষণ করে নিয়ন্ত্রণবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ-দর্শনে ভাষার সাহায্যে যোগাযোগ রচনায় মানুষের কোনো স্বাধীন শক্তির স্থান নেই। মানুষের ভাষাব্যবহারেও বাস্তব কারণচালিত। এ-তত্ত্ব ভাষার, ও ভাষাভাষীর, সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। কিন্তু যে-তত্ত্ব বিশ্বাসী ভাষার সৃষ্টিশীলতায়, সে-তত্ত্ব অবশ্যই ভাষা ও ভাষাভাষীর সম্পর্ক দেখবে ভিন্নভাবে। মানুষের ভাষাবোধ সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, আর এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য হচ্ছে ভাষাভাষীর ভাষাবোধের সুস্পষ্ট সূত্র রচনা। চোমস্কি মনে করেন যে মানুষের ভাষাবোধ কোনো বাহ্যিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তা স্বাধীন। তাই চোমস্কির প্রস্তাবিত তত্ত্ব চৈতন্যবাদী। কিন্তু এ-চৈতন্যবাদে প্রথাগত চৈতন্যবাদের ঈশিতা, ও আত্মার কোনো স্থান নেই। চোমস্কীয় চৈতন্যবাদ আচরণবাদবিরোধী হ'লেও শারীরবাদের শত্রু নয়। দেকার্ত ও অন্যান্য চৈতন্যবাদীর মতো চোমস্কিও মনে করেন যে মানবাচরণ, অংশত হ'লেও, বাহ্য উদ্দীপক, ও দেহাভ্যন্তর শাসন থেকে মুক্ত।

প্রণালিপদ্ধতিগত দিক : কোনো ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষা, অর্থাৎ ওই ভাষার বাক্যরাশি সম্পর্কে তত্ত্ব। সাংগঠনিকেরা মনে করেছিলেন কতিপয় প্রণালিপদ্ধতির সাহায্যে যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ যান্ত্রিকভাবে রচনা করা সম্ভব (দ্র § ৪.২.১; ৪.২.৪)। ব্যাকরণ রচনায় তাঁরা উপাত্তনির্ভর : উপাত্তের ওপর, 'আরোহী প্রথা'য়, বিভিন্ন প্রণালি প্রয়োগ ক'রে তাঁরা রচনা করতে চেয়েছিলেন ব্যাকরণ। অর্থাৎ ভাষাবর্ণনায় তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন 'অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি'। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ভিন্ন রকম। এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য ভাষাভাষীর আন্তর, অসচেতন ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে উদঘাটন করা। সৃষ্টিশীল ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপাত্তনির্ভর নয়। এ-তত্ত্ব 'অবরোহী' : ডিডাকটিব ক্যালকুলাস-এ যেমন একটি 'অ্যাক্সিঅ্যাম' থেকে উৎসারিত হয় অসংখ্য 'থিঅ্যারাম', সৃষ্টিশীল ব্যাকরণেও তাই ঘটে। একটি অ্যাক্সিঅ্যাম থেকে সূত্র প্রয়োগের সাহায্যে এ-ব্যাকরণে সৃষ্টি করা হয় অগণিত থিঅ্যারাম (বাক্য)। কোনো ভাষার ব্যাকরণ উদ্ভূত হয় ওই ভাষার বাক্যসম্পর্কে ব্যাকরণরচয়িতার তত্ত্ব থেকে। উপাত্তের অজস্র ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে জন্ম নেয় না তত্ত্ব, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করা ভাষাবিজ্ঞানীর চিত্তে আকস্মিকভাবে জ্ব'লে উঠতে পারে তত্ত্ব। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে উপাত্তের ওপর প্রণালির পর প্রণালি প্রয়োগ ক'রে বিভিন্ন ভাষাবস্তু আবিষ্কার করা হয়, কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে প্রণালির প্রচণ্ড প্রয়োগে কোনো কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় না। উপাত্ত-ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীর থাকতে পারে পূর্বধারণা, তিনি স্খলন-পতন-সংশোধনের মাধ্যমে হাজির হ'তে পারেন তাঁর সিদ্ধান্তে বা আকস্মিক প্রেরণায়ও পেতে পারেন কাম্য সত্যকে। তত্ত্ব তিনি কীভাবে পেয়েছেন তা মূল্যবান নয়; মূল্যবান হচ্ছে তাঁর তত্ত্ব বাস্তব উপাত্তের পরখ সহ্য করতে পারে কি-না। তিনি সূত্র প্রয়োগ করে সৃষ্টি করবেন যে-সব থিঅ্যারাম, তাদের অবশ্যই উত্তীর্ণ হ'তে

হবে বাস্তব উপাত্তের পরীক্ষা। তাঁর সূত্ররাশিকে হ'তে হবে ভবিষ্যদ্বাণীসক্ষম। যদি তাঁর সৃষ্ট সমস্ত বাক্য ভাষাভাষী কর্তৃক শুদ্ধ ব'লে গৃহীত হয়, তবেই তিনি সার্থক : কীভাবে তিনি শুদ্ধ বাক্যসৃষ্টির সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তা বিবেচ্য নয়।

সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর ব্যাকরণে ভাষাভাষীর ভাষাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে উৎসাহী। ব্যাকরণ রচনার সময় তিনি কাজে লাগান উপাত্ত-ভাষার বাক্য সম্পর্কে তাঁর নিজের ও ওই ভাষাভাষীর বিচারবিবেচনা। বিভিন্ন বাক্যের ব্যাকরণসম্মতি ও অসম্মতি সম্পর্কে ভাষাভাষীর বোধ, বা ধারণা তাঁকে সাহায্য করে নানাভাবে। তবে তিনি ব্যাকরণ রচনায় ভাষাভাষীর বিশ্লেষণকে গ্রহণ করেন না, কেননা ভাষাভাষীরা ভাষার বাক্য সম্পর্কে চমৎকার অসচেতন বোধসম্পন্ন হ'লেও তাঁরা যে বাক্যবিশ্লেষণদক্ষ হবেন, এমন নয়। যা দরকার, তা হচ্ছে ভাষাভাষীর বাক্যবোধ। ভাষার বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে থাকতে পারে নানা রকম সম্পর্ক,—কোনো বাক্য হ'তে পারে শুদ্ধ, বা অশুদ্ধ, কোনো কোনো বাক্য হ'তে পারে দ্ব্যর্থ, বা নানার্থ : এ-সম্পর্কে ভাষাভাষীরা লালন করে অসচেতন বোধ—তবে সব ভাষীর বোধ সহায়তা নাও করতে পারে। বিভিন্ন বাক্য সম্পর্কে ভাষাভাষীর বোধ গভীরভাবে উদ্ঘাটন করাই ভাষাবিজ্ঞানীর লক্ষ্য; ভাষাভাষীরা কীভাবে বিভিন্ন বাক্য বিশ্লেষণ করবে সে-দিকে তাঁর দৃষ্টি দেয়ার দরকার নেই (ভাষাভাষীমাত্রই ভাষাবিজ্ঞানী নয়)। ভাষার অনেক বাক্য আপাতবিভ্রান্তিকর; ভাষাবিজ্ঞানী সে-সমস্ত বাক্যের আন্তর গঠনপ্রক্রিয়া আবিষ্কার ক'রে ভাষাভাষীর অসচেতন বোধকে শাণিত, ও সচেতন ক'রে তুলতে পারেন। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয়:

(৮) ক হাসান নদী ভালোবাসে।
খ হাসান কি নদী ভালোবাসে?
গ হাসান নদী ভালোবাসে না।
ঘ হাসান কি ভালোবাসে?
ঙ কে নদী ভালোবাসে?
চ হাসান নদী ভালোবাসে, তাই না?
ছ হাসান নদী ভালোবাসে না, তাই নয় কি?

(৯) ক আমি একথা মনে করি যে আজ বৃষ্টি হবে না।
খ আমি মনে করি যে আজ বৃষ্টি হবে না।
গ আমি মনে করি আজ বৃষ্টি হবে না।
ঘ আমি মনে করি না যে আজ বৃষ্টি হবে।
ঙ ? আমি যে আজ বৃষ্টি হবে না মনে করি।

(৮)-এর বাক্যগুলো পরস্পরের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পর্কিত, একথা বাঙলাভাষীদের মনে হওয়া স্বাভাবিক; তবে এ-সম্পর্ক কোথায়, তা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙলাভাষীর কাছে অস্পষ্ট। এ-বাক্যগুলোতে সাংগঠনিক, ও আর্থ সম্পর্ক বিদ্যমান। (৮)-এর বেশ সহজ সরল বাক্যগুলো বাঙলাভাষীরা যেমন বুঝতে পারে, তেমনি যে-কোনো জটিল বাক্যও তারা বুঝতে সক্ষম। যদি বলি : 'যে মেয়েটি নাচছে, তার গ্রীবার লাল তিলটির পাশের হলদে দাগটি নিয়ে যে-মহাকবি পঞ্চাশ সর্গের একটি মহাকাব্য রচনা করতে পারতেন, তিনি আজো তরুণী মাতার গর্ভে ঘুম যাচ্ছেন'—তবে এটিও বোধগম্য হবে। বাক্য বোঝার জন্যে কাউকেই বসতে হয় না কাগজকলম নিয়ে। বাঙলাভাষীরা (৮, ৯)-এর বাক্যগুলো সম্পর্কে যে-জ্ঞান ধারণ করে, তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীকে সাহায্য নিতে হবে বেশ কিছু ভাষিক বোধের : এর মধ্যে আছে 'সরল সংগঠন/বাক্য', 'প্রশ্নবোধক', 'নঞার্থক', 'প্রশ্নবোধক সর্বনাম', 'সংযুক্ত প্রশ্ন', 'সম্পূরকীকরণ' প্রভৃতি। (৮)-এর বাক্যগুলোর সাংগঠনিক সম্পর্ক কীভাবে সুস্পষ্ট সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করা সম্ভব? (৮ক) একটি সরল বিবৃতিধর্মী হ্যাঁ-সূচক সংগঠন; এবং (৮খ) একটি প্রশ্নবোধক বাক্যসংগঠন। (৮ঘ)ও প্রশ্নবোধক, তবে (৮খ)র সাথে পার্থক্য রয়েছে প্রশ্নের প্রকৃতিতে। (৮ঘ)কে দ্ব্যর্থবোধক ব'লেও মনে করা যেতে পারে : এক ভাষ্যে এ-বাক্যের 'কি'-কে বিবেচনা করা যেতে পারে 'প্রশ্ননির্দেশক' রূপে, আবার এটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে প্রশ্নবোধক সর্বনাম ব'লে (এ-দ্ব্যর্থতা মোচনের জন্যে প্রশ্নবোধক সর্বনামের বানান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— 'কী')। (৮ঙ) বাক্যটিও প্রশ্নবোধক, এবং এর সাথে মিল আছে (৮ঘ)র : উভয় বাক্যেই ব্যবহার করা হয়েছে প্রশ্নবোধক সর্বনাম। তবে পার্থক্যও আছে : দুটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে দু-রকম সর্বনাম। (৮চ, ছ) বাক্য দুটির প্রশ্নকে বলতে পারি 'সংযুক্ত প্রশ্ন'। এ-সংগঠন দুটির মধ্যে রয়েছে চমৎকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। (৮চ)র প্রথমাংশ ('হাসান নদী ভালোবাসে') একটি সরল বিবৃতিধর্মী হ্যাঁ-সূচক সংগঠন, আর তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে প্রশ্ন ('তাই না?')। (৮ছ)র প্রথমাংশ ('হাসান নদী ভালোবাসে না') একটি বিবৃতিধর্মী না-সূচক সংগঠন, আর তার সাথে যোগ করা হয়েছে প্রশ্ন ('তাই নয় কি?')। (৯)-এর বাক্যগুলোও পরস্পরসম্পর্কিত। (৯)-এ সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গঠন করা হয়েছে জটিল বাক্য। (৯ক) বাক্যটি বেশ বিস্তৃত : বাক্যটি গঠিত হয়েছে সম্পূরক বাক্য গঠনের জন্যে যে-সমস্ত ভাষাবস্তু দরকার, তার কোনোটিকে পরিত্যাগ না ক'রে (বাস্তব প্রয়োগে 'একথা', ও 'যে' সাধারণত পরিত্যক্ত হয়)। (৯ক) বাক্যটির প্রধান অংশ দুটি : একটিকে বলা যাক 'মৌল সংগঠন' ('আমি মনে করি'), এবং অন্যটিকে বলা যাক 'সহায়ক সংগঠন' ('আজ বৃষ্টি হবে না')। এ-বাক্যে মৌল সংগঠনের শরীরে গেঁথে দেয়া হয়েছে সহায়ক সংগঠনটিকে। বাক্যটিকে মৌল ও সহায়ক সংগঠন দুটিকে যুক্ত ক'রে রাখা হয়েছে সম্পূরক-চিহ্ন 'যে'-র সাহায্যে। বাক্যটির মৌল অংশ হ্যাঁ-সূচক, আর সহায়ক অংশ না-সূচক। (৯খ, গ)তে পরিত্যাগ করা হয়েছে দুটি ভাষাবস্তু ('একথা', ও 'যে'); কিন্তু তাতে কোনো অর্থবদল ঘটেনি।

(৯ঘ)তে দেখতে পাই চমৎকার সাংগঠনিক রূপান্তর; কিন্তু তাতে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয় নি (৯ ক-ঘ সমার্থক)। (৯ ক, খ, গ)তে সংগঠনের প্রথমাংশ হ্যাঁ-সূচক এবং দ্বিতীয়াংশ না-সূচক; কিন্তু (৯ঘ)তে দেখা যাচ্ছে যে সংগঠনটির প্রথমাংশ না-সূচক ('আমি মনে করি না'), আর দ্বিতীয়াংশ হ্যাঁ-সূচক ('আজ বৃষ্টি হবে')। সাংগঠনিক এমন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও (৯ক, খ, গ) এবং (৯ঘ) সমার্থক। এ-বাক্যসমূহের গভীর বর্ণনার সময় দেখানো সম্ভব যে এরা উৎসারিত হয়েছে এক অভিন্ন বাক্যসংগঠন থেকে, এবং আরো দেখানো যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক বাক্যের 'না'-কে স্থানান্তরিত ক'রে দেয়া সম্ভব মৌল বাক্যসংগঠনে। (৯ঙ) বাক্যটি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো যায় যে (৯ঙ)ই হচ্ছে 'গভীর' বাক্যসংগঠন, যার থেকে উৎসারিত হয়েছে (৯)-এর অন্যান্য বাক্য। (৯ঙ) বাক্যে লক্ষণীয় যে এটি একটি সরল কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদসম্বলিত বাক্যের সমতুল্য। এ-বাক্যে একটি সম্পূর্ণ বাক্য ('আজ বৃষ্টি হবে না') ব্যবহৃত হয়েছে কর্মরূপে।

ওপরে (৮, ৯)-এর বাক্যগুলোর যে-অসম্পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হলো, তার সাথে সাংগঠনিক ব্যাকরণের বর্ণনার দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। সাংগঠনিক ব্যাকরণ উপাত্তের ওপর কিছু প্রণালি পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে আবিষ্কার করতে চায় উপাত্তের বাহ্য শৃঙ্খলা; কিন্তু ওপরের বর্ণনা প্রণালিনির্ভর নয়, তা অন্তর্দৃষ্টিনির্ভর। এ-অন্তর্দৃষ্টি আসতে পারে ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীর পূর্বধারণা থেকে, বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য থেকে, বা উপাত্তের ওপর কিছু প্রণালি প্রয়োগের ফলে। সাংগঠনিক ভাষাদর্শনের পরিণতি হচ্ছে প্রণালিপদ্ধতি, আর সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের আরাধ্য হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি। তবে এ-অন্তর্দৃষ্টি ঐশী নয়, বাস্তব উপাত্ত থেকে জন্ম পায় এ-দৃষ্টি : সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের কামনার ধন ছিলো প্রণালিপদ্ধতি, কিন্তু রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে তা ব্যবহার করা হয় অন্তর্দৃষ্টিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্যে। রূপান্তর ব্যাকরণেও ব্যবহৃত হয় নানা প্রণালিপদ্ধতি, কিন্তু সে-সব সাফল্যের সিঁড়ি মাত্র, সাফল্য নয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাকরণ রচনাই সৃষ্টিশীল তত্ত্বের লক্ষ্য।

৪.২.৮ ভাষা-অর্জন ও ভাষিক তত্ত্ব

চোমস্কি ভাষাবিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছেন এমন স্তরে, যাতে ভাষাবিজ্ঞান হয়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমতুল্য। বর্তমানে ব্যাকরণ, অর্থাৎ ভাষিক তত্ত্ব, অনেকাংশে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বের তূল্য : উভয় শাস্ত্রেই অ্যাক্সিইঅ্যাম থেকে সূত্রের সাহায্যে আহরণ করা হয় অসংখ্য থিঅ্যার‍্যাম; এবং উভয় তত্ত্বেই থিঅ্যার‍্যামকে যাচাই ক'রে নিতে হয় পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তের দ্বারা। তবে ভাষাবিজ্ঞান ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এ-পার্থক্যের মূলে আছে উপাত্তের ভিন্নতা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপাত্ত স্থানকালের উর্ধ্বে;—দেশ-কাল-প্রতিবেশের প্রভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপাত্ত ভিন্নতা পায় না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের উপাত্ত বিচিত্র : স্থানকালবশত এ-উপাত্ত এতো, আপাতদৃষ্টিতে, স্বতন্ত্র হ'তে

পারে যে ওই উপাত্তের (ভাষার) মধ্যে কোনো রকম সাদৃশ্য অনেকের চোখে নাও পড়তে পারে। পৃথিবীতে তিন হাজারেরও বেশি ভাষা রয়েছে, আর তাদের বৈচিত্র্যও কম নয়। ভাষাভাষীরা জন্মসূত্রে ভাষাবোধসম্পন্ন হয়ে জন্মায় না, তাদের আয়ত্ত করতে হয় ভাষাবোধ। কোনো একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে ওই ভাষার পরিণত ভাষাভাষীদের ভাষাবোধের তত্ত্ব; আর একটি সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাকরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব, অর্থাৎ তত্ত্বের তত্ত্ব [মেটাথিওরি]। তাই ভাষাভাষীরা বিভিন্ন ভাষার মুখোমুখি হয়ে কীভাবে ভাষাবোধ অর্জন করে, তা ব্যাখ্যার দায়িত্ব পড়ে সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্বের ওপর।

চোমস্কি মনে করেন ভাষাবিজ্ঞান উজ্জ্বল আলো ফেলতে পারে মানবমনের গঠন, ও প্রকৃতির ওপর। কীভাবে ভাষাবিজ্ঞান আলো ফেলতে পারে, তা নির্দেশ করার জন্যে তিনি পেশ করেছেন শিশুদের ভাষা-অর্জনপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত তত্ত্ব। শিশুরা বেশ দ্রুত ভাষা আয়ত্ত করে। ছ-সাত বছরের মধ্যে প্রতিটি শিশু শিখে ফেলে তার ভাষার প্রায়-সমস্ত শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন। ভাষার বিপুল জটিলতাকে শিশুরা কীভাবে এতো অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত ক'রে ফেলে, তা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। কোনো শিশু ছ-সাত বছরের মধ্যে যতো বাক্য-সংগঠন সৃষ্টি করতে পারে, তা যদি কোনো ভাষাবিজ্ঞানী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে চান, তবে তাঁর সারাজীবন, সম্ভবত, কেটে যাবে। যা বিশ্লেষণে দরকার হয় একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সমগ্র জীবন, তা কী ক'রে এতো অল্প সময়ে আয়ত্ত করে একটি নির্জ্ঞান শিশু? শিশুদের ভাষা-অর্জন সম্পর্কে পেশ করা যেতে পারে তিনটি তত্ত্ব :

[ক] কোনো একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ জন্মসূত্রে পুরুষপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

[খ] শিশু ভাষাগতভাবে 'শূন্যপৃষ্ঠা'—'তাবুলা রাসা'—রূপে অর্থাৎ ভাষা-অর্জনের বিশেষ কোনো শক্তি না নিয়ে আবির্ভূত হয়, এবং উপাত্তের মুখোমুখি হয়ে ক্রমশ আবিষ্কার করে উপাত্তের ব্যাকরণ : নিয়মকানুনশৃঙ্খলা।

[গ] শিশু ভাষা-অর্জনের বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

প্রথম তত্ত্বটিকে ভ্রান্ত ব'লে সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব। এ-তত্ত্বানুসারে শিশু জন্ম নেয় একটি বিশেষ ভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে আয়ত্ত করার ক্ষমতা নিয়ে; তার পক্ষে পৈতৃক ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শিশু সে-ভাষাই আয়ত্ত করে যে-ভাষাপ্রতিবেশে সে যাপন করে তার জীবনের প্রথম বছরগুলো। বাঙালি শিশু যদি গ্রিনল্যান্ডে বড়ো হয়, তবে সে আয়ত্ত করবে ওই অঞ্চলেরই ভাষা। দ্বিতীয় তত্ত্বটিও গ্রহণযোগ্য নয়। শিশু যদি ভাষা-অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে না জন্মাতো, তবে ভাষার বিপুল জটিলতাকে বশে আনতে কেটে যেতো তার জন্মজন্মান্তর। বাঙলা ভাষার ধ্বনি-শব্দ-বাক্য গঠনের এতো বিপুল পরিমাণ সূত্র রয়েছে যে তা যদি সচেতনভাবে বিশ্লেষণ ক'রে আয়ত্ত করতে হতো, তবে কারো পক্ষে বাঙলা ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব হতো না। কিন্তু ভাষা-অর্জন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়; যে-

কোনো নির্বোধ ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষকে যদি সচেতনভাবে আয়ত্ত ও আবিষ্কার করতে হতো তার ভাষার শৃঙ্খলা, অর্থাৎ ব্যাকরণ, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই থাকতো ভাষাহীন। অন্যভাবে বলা যায়, ভাষা তবে হয়ে উঠতো ব্যবহারঅযোগ্য, অর্থাৎ পৃথিবীতে ভাষার অস্তিত্বই থাকতো না। তাই ভাষা-অর্জন সম্পর্কিত দ্বিতীয় তত্ত্বটিও গ্রহণঅযোগ্য।

চোমস্কি গ্রহণ করেছেন তৃতীয় তত্ত্বটি : শিশু ভাষা-অর্জনের বিশেষ শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়; এবং এ-তত্ত্বটিই সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে গৃহীত। প্রতিটি মানুষ ভাষা-অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভাষা-অর্জনের ওই 'বিশেষ ক্ষমতা', বা 'শক্তি'টি কী? ভাষা-অর্জনের এ-বিশেষ ক্ষমতা বা শক্তিকে মনে করা যেতে পারে এক সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব বা কাঠামো, যা উপাত্তকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করার প্রণালি উপহার দিতে পারে, এবং পারে তার উপাত্তের (ভাষার) সম্ভাব্য সংগঠন সম্পর্কে একরাশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। মানুষের ভাষা-অর্জনের এ-শক্তিকে, চোমস্কির (১৯৬৪, ২৬; ১৯৬৫, ৩০) অনুসরণে, আমরা বলতে পারি, 'ভাষা-অর্জন কল'। শিশুর ব্যাকরণনির্মাণ প্রক্রিয়াকে দেখানো সম্ভব নিচের চিত্রের সাহায্যে :

(১০)
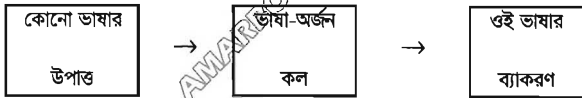
(১০)-এর চিত্রটি জানাচ্ছে যে কোনো ভাষার উপাত্ত যখন শিশুর সামনে পড়ে, তখন সে তার আন্তর ভাষা-অর্জন শক্তি বা 'ভাষা-অর্জন কল'-এর সাহায্যে সহজেই ওই ভাষার ব্যাকরণ রচনা ক'রে নেয়। কিন্তু সে ওই ভাষার সম্পূর্ণ-ব্যাপক-অনুপুঙ্খ ব্যাকরণ শেখে না' ; —সে শুধু ওই ভাষার সে-সমস্ত সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যই আয়ত্ত করে, যে-সব বৈশিষ্ট্য ভাষাটিকে পৃথক ক'রে রেখেছে অন্যান্য ভাষা থেকে। ভাষার যে-সব বৈশিষ্ট্য সমস্ত মানবভাষাতেই উপস্থিত, তাদের বলা হয় 'সর্বজনীন ভাষিক বৈশিষ্ট্য' (দ্র § ৪.২.৯)। শিশুরা সর্বজনীন ভাষিক বৈশিষ্ট্যরাশি পৃথকভাবে আয়ত্ত করে না; কেননা ওই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি জন্মসূত্রেই খচিত হয়ে আছে তার ভাষা-অর্জন কলে বা শক্তিতে। কী কী বৈশিষ্ট্য সমস্ত মানবভাষাতেই পাওয়া যাবে, তা শিশু জন্মসূত্রেই জানে। ভাষা-অর্জনের এ-তত্ত্বকে বলা হয় 'চৈতন্যবাদী তত্ত্ব'। এ-মতের পক্ষে উপস্থিত করা যায় প্রচুর সাক্ষ্য। অন্যান্য জ্ঞান অর্জনে যেমন দরকার হয় মেধা ও বুদ্ধি, ভাষা-অর্জনের বেলায় তেমন মেধা ও চাতুর্যের দরকার হয় না : বেশ নির্বোধ শিশুরাও ভাষা অর্জন করে। ভাষা-অর্জনে প্রতিভা দরকার পড়ে না। তবে ভাষা বিশেষ প্রজাতির দখলে : একমাত্র মানব-প্রজাতিই ভাষাধিকারী। মানুষের বেশ সন্নিকট প্রাণী শিম্পাঞ্জি অনেক সময় চমৎকারভাবে অনুকরণ করতে পারে মানুষের ক্রিয়াকর্ম; কিন্তু ভাষা-অর্জনে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয়

দিয়েছে। প্রতিটি মানবভাষাই বিপুল জটিলতার সমষ্টি। রূপান্তরবাদী সৃষ্টিশীল ব্যাকরণবিদেরা যদিও ইচ্ছে পোষণ করেন প্রতিটি ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকরণ রচনার, তবু আজো পৃথিবীর কোনো ভাষাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হয় নি। কোনো ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার স্বপ্ন হয়তো কোনোদিনই বাস্তবায়িত হবে না। তবু প্রতিটি শিশু, জীবনের প্রথম ছ-সাত বছরের মধ্যে, তার ভাষা সম্পর্কে এতো কিছু শেখে, যা বর্ণনা করতে হ'লে প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীদেরও কয়েক জন্ম অতিবাহিত হয়ে যাবে। তাই বিশ্বাস করতে হয় যে শিশু জন্মসূত্রেই ভাষা-অর্জন-শক্তি নিয়ে অসে।

'বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ' বা 'ভাষা 'ভ'-র ব্যাকরণ', এবং 'সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব' কথা দুটি সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণত সুশৃঙ্খল দ্ব্যর্থবোধকভাবে ব্যবহার করা হয় (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ২৫))। 'বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ', বা 'ভাষা ভ-র ব্যাকরণ' বলতে বোঝানো হয় : (ক) 'ভ' সম্পর্কে পরিণত ভাষাভাষীর আন্তর 'তত্ত্ব', এবং (খ) ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক ওই তত্ত্বের উপস্থাপন। 'সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব' বলতে বোঝানো হয় : (ক) সমস্ত ভাষা সম্পর্কে শিশুর সহজাত 'তত্ত্ব'; (খ) ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক ওই তত্ত্বের উপস্থাপন। তাই সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ভাষা-অর্জনের পেছনে ক্রিয়াশীল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপকৌশলের আলোচনাও বটে। ভাষা-অর্জন-কৌশল মনোভাষাবিজ্ঞান-এর অন্তর্গত ব'লে এখানে সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই (দ্র গ্রিন (১৯৭২))।

সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্বের কাঠামোর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপে নির্দেশ করা সম্ভব :

[ক] এ-তত্ত্ব ভাষায় ধ্বনিরাশির ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ নির্দেশ করবে। অর্থাৎ এ-তত্ত্বে একটি সাধারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক তত্ত্ব থাকবে, যা মানবভাষার সম্ভাব্য বাক্যসমূহ নির্দেশ করবে।

[খ] এ-তত্ত্বকে অবশ্যই 'সাংগঠনিক বর্ণনা' ধারণাটির সংজ্ঞা দিতে হবে। সাংগঠনিক বর্ণনা ভাষার ধ্বনি ও অর্থের অন্বয়কৌশল সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

[গ] এ-তত্ত্বকে অবশ্যই 'সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ'-এর সংজ্ঞা দিতে হবে; এবং মানবভাষার প্রকৃতি অনুসারে সম্ভাব্য সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের সীমা নির্দেশ করতে হবে।

[ঘ] ব্যাকরণ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়ার শক্তি এ-তত্ত্বের থাকতে হবে।

[ঙ] এ-তত্ত্বকে মূল্যায়নপ্রণালিসম্পন্ন হ'তে হবে; অর্থাৎ একাধিক প্রতিযোগী ব্যাকরণের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট, কোনটি ভালো নয়, তা নির্দেশের শক্তি থাকতে হবে এ-তত্ত্বের।

৪.২.৯ ভাষা-সর্বজনীনতা

'ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা'-অভিলাষী (দ্র § ৪.২.৪) ভাষিক তত্ত্ব 'ভাষিক সর্বজনীনতা'য় আস্থাশীল হ'তে বাধ্য। সৃষ্টিশীল ভাষিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতাকামী, তাই তা বিশ্বাস করে ভাষিক

সর্বজনীনতায়, অর্থাৎ সে-সব বৈশিষ্ট্যে, যা সমস্ত পার্থিব মানবভাষায় উপস্থিত থাকতে বাধ্য। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বিশ্বাস করে যে শিশুরা মানবভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সহজাত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৪৭-৫৯))। শিশু যখন কোনো বিশেষ ভাষার মুখোমুখি হয়, তখন তাকে ওই ভাষা সম্পর্কে সব কিছু সচেতনভাবে শিখতে হবে না। কোনো ভাষার সর্বজনীন চারিত্র সম্পর্কে জ্ঞান নিয়েই সে জন্ম নেয়; সুতরাং কোনো একটি বিশেষ ভাষা অর্জনের সময় সে ওই ভাষার সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সচেতনভাবে আয়ত্ত করে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি ওই ভাষাটিকে অন্যান্য ভাষা থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে। যদি ভাষা-আয়ত্তের প্রণালি এমন না হতো, তবে ভাষা-অর্জন অসম্ভব হতো। সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞান এ-তত্ত্বে বিশ্বাসী ব'লে তা বিশ্বের সমস্ত ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারে উৎসাহী। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন বিশ্বের ভাষারাশির অপার বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য। বোআস-ব্লুমফিল্ড ও অন্যান্য সাংগঠনিক বৈসাদৃশ্যই পার্থিব ভাষাসমূহের একমাত্র সাদৃশ্য—এমন ধারণা পোষণ করতেন। ভাষার বহিরঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিসংগঠনে বৈসাদৃশ্য : ইংরেজির সাথে মিল নেই বাঙলার, বাঙলার সাথে মিল নেই জাপানির ইত্যাদি। সাংগঠনিকদের বলা যায় ভেদবাদী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী; বাহ্যিক শাদা-কালো দিয়ে তাঁরা এতো সম্মোহিত ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন যে সর্বজনীন আভ্যন্তর লাল রঙটি তাঁদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো। সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভেদবাদের পর সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা পেশ করেন সম্মিলন ও সর্বজনীনতার তত্ত্ব। তাঁরা ভাষার আপাতবৈষম্যরাশিকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত ভাষার আভ্যন্তর ও আন্তর সাদৃশ্য আবিষ্কারে অভিলাষী।

মানবভাষায় সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। চোমস্কি (১৯৬৫, ২৭-৩০) ভাষার দু-রকম সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন : (ক) বিষয়গত সর্বজনীনতা [সাবস্টেনটিভ ইউনিভ্যারসাল]; এবং (খ) রৌপ, বা সূত্রগত সর্বজনীনতা [ফর্মাল ইউনিভ্যারস্যাল]। বিষয়গত ও রৌপ সর্বজনীনতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

[ক] বিষয়গত সর্বজনীনতা : প্রত্যেক মানবভাষায় রয়েছে কিছু পরিমাণে ধ্বনি, শব্দ এবং প্রত্যেক ভাষায়ই, সম্ভবত, পাওয়া যাবে বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি পদ। সমস্ত ভাষায় বিবৃতি দেয়ার, এবং প্রশ্ন ও আদেশ করার উপায় রয়েছে। ভাষার বিষয়গত সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি 'বিষয়গত সর্বজনীনতা'র অন্তর্গত। শিশু এ-সব বিষয়ের জ্ঞান জন্মসূত্রেই লাভ করে। সে যখন কোনো বিশেষ ভাষা আয়ত্ত করতে চায়, তখন সে শুধু শিখে নেয় ওই বিশেষ ভাষার একান্ত আপন বৈশিষ্ট্যগুলো। 'বিষয়গত সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য'-তত্ত্বানুসারে বিশেষ বিশেষ ভাষা এক সর্বজনীন ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করে তার ভাষাবস্তুরাশি। ব্যাপারটি, ধ্বনিতত্ত্বের উদাহরণের সাহায্যে, ব্যাখ্যা করা যাক। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান পৃথিবীর সব ভাষার নিজস্ব ধ্বনিমূলের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তবে এক ভাষার ধ্বনিমূলের সাথে অন্য ভাষার ধ্বনিমূলের সাদৃশ্যকে প্রায় অস্বীকার করে। কিন্তু পৃথিবীর ভাষাগুলো লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কোটি কোটি ধ্বনি নেই; সীমিত সংখ্যক ধ্বনিই নানাভাবে বিন্যস্ত হয় বিভিন্ন

ভাষায়। মানবভাষায় যতো ধ্বনি(মূল) আছে, তার সবগুলো একত্রে কোনো ভাষাই ব্যবহার করে না। কিছু পরিমাণে ধ্বনি ব্যবহৃত হয় বিশেষ কোনো ভাষায়, আবার বিশেষ কিছু ধ্বনি ব্যবহৃত হয় অন্য ভাষায়। রোমান ইআকবসন ধ্বনিমূল ভেঙে আবিষ্কার করেন ধ্বনির 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'। তাঁর 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য'কে বিবেচনা করা যেতে পারে ভাষার বিষয়গত সর্বজনীনতার নিদর্শন ব'লে। সমস্ত মানবভাষায় যতো ধ্বনি(মূল) ব্যবহৃত হয়, তাদের 'স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য' খুব বেশি নয়। কুড়িটির মতো স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন বিন্যাসে গ'ড়ে উঠেছে মানবভাষার ধ্বনি(মূল)পুঞ্জ। এ-বৈশিষ্ট্যসমূহের সবগুলো কোনো ভাষাই ব্যবহার করে না, এবং কোনো ভাষাই সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' ব'লে মনে করে না। এ-বৈশিষ্ট্যরাশি সর্বজনীন। উদাহরণস্বরূপ 'ঘোষতা'/'অঘোষতা', ও 'মহাপ্রাণতা'/'অল্পপ্রাণতা' বৈশিষ্ট্যগুলোকে নেয়া যাক। বাঙলা ভাষায় ঘোষতা-অঘোষতাবশত পৃথক /খ/, ও /ঘ/, এবং মহাপ্রাণতা-অল্পপ্রাণতাবশত পৃথক /ক/ ও /খ/। বাঙলা ভাষায় ঘোষতা ও মহাপ্রাণতা স্বাতন্ত্রিক। ইংরেজিতে /পি/ ও /বি/ ঘোষতার জন্যে পৃথক ধ্বনি; কিন্তু ইংরেজিতে মহাপ্রাণতা-অল্পপ্রাণতাবশত কোনো স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয় না। তাই ইংরেজিতে ঘোষতা তাৎপর্যপূর্ণ, ও স্বাতন্ত্রিক; কিন্তু মহাপ্রাণতা তাৎপর্যশূন্য। তাই মনে করতে পারি যে মানব ভাষারাশির জন্যে এক সর্বজনীন স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যভাণ্ডার রয়েছে, যা থেকে বিভিন্ন ভাষা নিজের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো সংগ্রহ করে। স্থূল দৃষ্টিতে সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা অসম্ভব, এর জন্যে চাই গভীর দৃষ্টি। ভাষার বিষয়গত সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো ভাষাতেই একত্রে জড়ো হয় না। যে-সব ভাষা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে সাদৃশ্য গভীর; আর যে-সব ভাষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

[খ] রৌপ, বা সূত্রগত সর্বজনীনতা : বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণে নানা রকম সূত্র প্রযুক্ত হয়, এবং একটু মনোযোগ দিলে ওই সূত্র প্রয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে নানা রকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ভাষার জন্যে দরকারী সূত্ররাশির চারিত্রগত সর্বজনীনতাকে চোমস্কি (১৯৬৫, ২৯) বলেন 'রৌপ/সূত্রগত সর্বজনীনতা'। দেখা গেছে যে পৃথিবীর সব ভাষায়ই 'রূপান্তর' ক্রিয়াশীল, এবং সব ভাষায়ই সূত্র প্রয়োগের জন্যে পূরণ করতে হয় কিছু-না-কিছু শর্ত। এসব রৌপ সর্বজনীনতার অন্তর্গত। রূপান্তর ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় নানাবিধ প্রতীক। যেমন : তীরচিহ্ন (→) ব্যবহৃত হয় পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে, প্রথম বন্ধনি (()) ব্যবহৃত হয় ঐচ্ছিকতা নির্দেশের জন্যে (দ্র § ৪.৩.৩)। এসব প্রতীক রৌপ সর্বজনীনতার অন্তর্গত।

ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ভাষার বহিরঙ্গ নির্ভর ক'রে নির্ণয় করা কঠিন। সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানী বিচিত্র ভাষা-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ক'রে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই শনাক্ত করতে পারেন এসব বৈশিষ্ট্য। উপাত্ত নাড়াচাড়া করলেই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি চোখের সামনের ঝকমক ক'রে উঠবে না। ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যরাশি কী নির্দেশ করে? এর উত্তরে উদ্ধার করছি চোমস্কির (১৯৬৫, ৩০) সিদ্ধান্ত : 'সুগভীর এসব রৌপ সর্বজনীনতার উপস্থিতি নির্দেশ করে যে সমস্ত ভাষাই সমরূপী বিন্যাসে ন্যস্ত; কিন্তু এতে একথা মনে করা উচিত নয় যে সমস্ত ভাষা অঙ্গে অঙ্গে সদৃশ, বা সমতুল্য।'

৪.৩ রূপান্তর ব্যাকরণের প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য

বাক্যের গঠনপ্রণালি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ, এবং সুস্পষ্ট সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়ার জন্যে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে নানা রকম চিত্র ও প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যবহৃত হয় গাণিতিক প্রণালিতে, অর্থাৎ এসব ব্যবহারের অবিচল বিধান রয়েছে : ব্যাকরণভেদে এদের তাৎপর্যের ভিন্নতা ঘটে না। রূপান্তর ব্যাকরণ বোঝার জন্যে, এবং রূপান্তর ব্যাকরণ রচনার জন্যে, এসব চিত্র ও প্রতীকের ব্যবহারবিধি নির্ভুলভাবে জেনে নেয়া দরকার। পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদাংশে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হলো (দ্র § ৪. ৩. ১; ৪.৩.২; ৪.৩.)।

৪.৩.১ বৃক্ষচিত্র বা পদচিত্র

সাংগঠনিক অব্যবহিত উপাদান প্রণালিতে বাক্যবর্ণনার সময় সমগ্র বাক্যটিকে প্রথমে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, এবং পরে খণ্ডিত অংশ দুটিকে বারবার দ্বিখণ্ডিত করা হয়। খণ্ডনযজ্ঞ শেষ হয় তখনি, যখন আর খণ্ডনের কোনো উপায় থাকে না। মনে করা যাক— 'ক' একটি বাক্য; এবং একে প্রথমে 'খ' ও 'গ' দু-খণ্ডে ভাগ করা হলো। পরে 'খ'কে 'চ' ও 'ছ', এবং 'গ'-কে 'জ' ও 'ঝ' দু-খণ্ডে ভাগ করা হলো। মনে করা যাক যে এর পরে আর দ্বিখণ্ডন সম্ভব নয়; কেননা 'চ' 'ছ', 'জ' 'ঝ' হচ্ছে অবিভাজ্য শব্দ। আর এ-শব্দগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে, 'অ', 'আ' 'ই', 'ঈ'। 'ক' বাক্যটি খণ্ডনের প্রণালিকে উপস্থাপিত করা যায় (১১)র 'বৃক্ষচিত্র' বা 'পদচিত্র'-এ :

(১১)
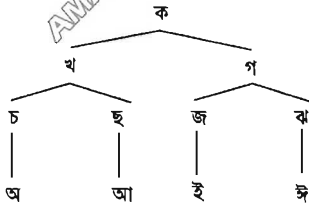
(১১) বিন্দুচিহ্নগুলোকে (.) বলা হয় 'বৃন্ত' [নোড], এবং প্রতিটি বৃন্তের সাথের ব্যঞ্জনবর্ণ হচ্ছে 'বৃন্তনাম' [নোড লেবেল]। চিত্রের স্বরবর্ণসমূহ নির্দেশ করছে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে। চিত্রের উচ্চ ও নিম্ন বৃন্তের মধ্যে 'আধিপত্য'-এর সম্পর্ক বিদ্যমান, অর্থাৎ ওপরের বৃন্তটি আধিপত্য করে নিচের বৃন্তটির ওপর, এবং উল্টোভাবে নিচের বৃন্তটি ওপরের বৃন্তের 'অধীন'। 'আধিপত্য' দু-রকম হতে পারে : হ'তে পারে 'প্রত্যক্ষ', 'বা 'অব্যবহিত'; আবার হ'তে পারে 'পরোক্ষ', বা 'অনব্যবহিত'। (১১)তে 'ক' অব্যবহিতভাবে আধিপত্য করছে 'খ' ও 'গ'-র ওপর; আর পরোক্ষভাবে আধিপত্য করছে অন্যান্য বৃন্তের ওপর। 'খ' ও 'গ' অব্যবহিতভাবে আধিপত্য করছে যথাক্রমে 'চ-ছ', ও 'জ-ঝ'-র ওপর। 'খ' পরোক্ষভাবে

আধিপত্য করছে 'অ-আ'-র ওপর; এবং 'গ' পরোক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'ই-ঈ'-র ওপর। লক্ষণীয় যে 'খ' ও 'গ'-র মধ্যে কোনো অধিপত্যের সম্পর্ক নেই, তেমনি নেই চ-ছ-জ-ঝ, এবং 'অ-আ-ই-ঈ'-র মধ্যে। চিত্রটির নিচ দিকের বৃন্ত থেকে যদি ক্রমশ যাই ওপরের দিকে, তবে দেখি যে নিচের বৃন্তের সাথে ওপরের বৃন্তের 'হচ্ছে'-র সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ 'অ' হচ্ছে 'চ', আর 'আ' হচ্ছে 'ছ'; এবং 'চ+ছ' হচ্ছে 'খ'। আবার 'ই' হচ্ছে 'জ', আর 'ঈ' হচ্ছে 'ঝ'; এবং 'জ+ঝ' হচ্ছে 'গ'। 'খ+গ' হচ্ছে 'ক'। এ ছাড়াও চিত্রটি নির্দেশ করছে 'আগে-পিছে'-র সম্পর্ক : চিত্রের বাঁ দিকের বস্তুকে ধরা হয় ডান দিকের বস্তুর আগে অবস্থিত ব'লে, এবং ডান দিকের বস্তুকে বলা হয় বাঁ দিকের বস্তুর পরে/পেছনে অবস্থিত ব'লে। 'খ' অবস্থিত 'গ'-র আগে, 'চ' অবস্থিত 'ছ'-র আগে ইত্যাদি। রূপান্তর ব্যাকরণেই এমন চিত্র প্রথম ব্যবহৃত হয়। (১১)র চিত্রটির প্রচলিত নাম 'বৃক্ষচিত্র' (কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের বংশলতিকাচিত্র, এবং সাংগঠনিক ব্যাকরণের অব্যবহিত উপাদান নির্দেশক চিত্রের সাথে এর পার্থক্য মৌলিক)। চোমস্কি এ-চিত্রের নাম দিয়েছেন 'পদচিত্র' [ফ্রেজ মার্কার], এবং এ-নামটিই রূপান্তর ব্যাকরণে অধিক ব্যবহার করা হয়। পদচিত্র বাক্যের সাংগঠনিক রূপ সুস্পষ্টভাবেই তুলে ধরে। বাক্যের গঠনকৌশল 'ব্যুৎপত্তি'র (দ্র § ৪.৪) সাহায্যেও দেখানো হয়। তবে ব্যুৎপত্তিতে বিভিন্ন সূত্রের প্রয়োগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখানো হয় ব'লে তা বেশ জটিল; এবং এজন্যে ব্যুৎপত্তিকে সাধারণত পরিহার করা হয়।

৪.৩.২ গ্রন্থি ও সূত্র

গ্রন্থি : এক বা একাধিক শব্দপ্রতীকের সংযুক্ত, গ্রথিত বা শৃঙ্খলিত রূপকে বলা হয় গ্রন্থি [স্ট্রিং]। (১২)র (ক, খ, গ) গ্রন্থির উদাহরণ (দ্র কৌটসৌডাস (১৯৬৬, ৫-৬)) :

(১২) ক বিশেষ্যপদ+ক্রিয়াপদ

খ আমি+বিশেষ্যপদ+ক্রিয়ারূপ

গ আমি+তোমাকে+চিনি

পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয় গ্রন্থি। পদসাংগঠনিক সূত্রের প্রথম গ্রন্থটি গঠিত হয় একটি মাত্র শব্দপ্রতীকে : প্রতীকটি হচ্ছে 'বা' (বাক্য)। প্রথম গ্রন্থটিকে ('বা') বলা হয় 'আদিগ্রন্থি'। আদিগ্রন্থির দু-পাশে ব্যবহার করা হয় বাক্যের 'সীমাচিহ্ন' (#)। মনে করা যাক, আদিগ্রন্থি হচ্ছে 'বা', তবে আদিগ্রন্থিটিকে নির্দেশ করা হবে # বা # রূপে। এ-গ্রন্থিটি ব্যাকরণের প্রথম সূত্রের আগে উপস্থিত থাকে। বাক্যের সীমাচিহ্নরূপে সাধারণত ব্যবহৃত হয় দ্বৈত-ক্রসচিহ্ন (# বা #)। সীমাচিহ্ন নির্দেশ করে যে ব্যাকরণের সূত্রগুলো বাক্যের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রযোজ্য। ব্যাকরণের সমস্ত সূত্র প্রয়োগের ফলে ব্যুৎপত্তির শেষে যে-গ্রন্থিটি পাওয়া যায়, তার নাম 'অন্তগ্রন্থি'। আদি ও অন্তগ্রন্থির মধ্যবর্তী গ্রন্থিগুলোকে 'মধ্যগ্রন্থি' বলা হয়।

সূত্র : সূত্র হচ্ছে এমন নির্দেশ যা সাধারণত একটি গ্রন্থিকে অন্য গ্রন্থিরূপে পুনরায় লেখার নির্দেশ দেয়, বা একটি সংগঠনকে আরেকটি সংগঠনে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেয়। সূত্র দু-রকমের : (ক) পদসাংগঠনিক সূত্র, (খ) রূপান্তর(মূলক) সূত্র। পদসাংগঠনিক সূত্র প্রযুক্ত হয় রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক কক্ষে, এবং রূপান্তর সূত্র ব্যবহৃত হয় রূপান্তর কক্ষে। পদসাংগঠনিক সূত্রকে বলা হয় 'পুনর্লিখন সূত্র'।

[ক] পদসাংগঠনিক সূত্র : পদসাংগঠনিক সূত্রগুলো পুনর্লিখন। সূত্র। পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র হচ্ছে এক রকম নির্দেশ, যা কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থিকে অন্য একটি প্রতীক, বা গ্রন্থিরূপে পুনরায় লেখার নির্দেশ দেয়। যদি আমরা 'ক'-কে মনে করি 'খ'; 'খ'-কে মনে করি 'গ+ঘ', তবে এ-ব্যাপারটিকে (১৩)র পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি :

(১৩) [ক] ক → খ

[খ] খ → গ + ঘ

(১৩)তে ব্যবহৃত তীরটি (→) পুনর্লিখন প্রতীক; এটি এর বাঁ-দিকের প্রতীক, বা গ্রন্থিকে ডান-দিকের প্রতীক, বা গ্রন্থিরূপে পুনর্লিখনের নির্দেশ দেয়। পুনর্লিখন সূত্র ব্যবহার করা হয় বাক্য, বা যে-কোনো ভাষাবস্তুর আভ্যন্তর সংগঠন বর্ণনার জন্যে। যেমন : 'বালকেরা' শব্দের আভ্যন্তর সংগঠন (১৪)র পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি :

(১৪) ক বিশেষ্যপদ → বিশেষ্য + বহুবচন

খ বিশেষ্য → বালক

গ বহুবচন → এরা

(১৪)র সূত্র তিনটির ক্রমিক প্রয়োগে সৃষ্ট হবে 'বালকেরা' শব্দটি।

পদসাংগঠনিক সূত্র বাক্যের পদসংগঠন নির্দেশ করে : এ-সূত্র জানিয়ে দেয় বাক্যের গঠনপ্রকৃতি কী, কী রকম পদসমবায়ে বাক্যটি গঠিত, এবং বাক্যটি গঠনে কোন শব্দাবলি অংশ নিয়েছে। এগুলো সরল গ্রন্থিপরিবর্তনকারী সূত্র : এ-সূত্র একটি গ্রন্থির বদলে আরেকটি গ্রন্থি ব্যবহারের নির্দেশ দেয়, বা একটি গ্রন্থিকে অন্য একটি গ্রন্থিরূপে সম্প্রসারিত করার সংকেত দেয়। এ-সূত্র এমনভাবে রচনা করতে হয়, যাতে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাক্যের 'পদচিত্র' রচনা করতে পারে। পদসাংগঠনিক সূত্র রচনার কতিপয় বিধি রয়েছে। বিধিসমূহের কয়েকটি :

[ক. ১] একটি সূত্রের সাহায্যে মাত্র একটি প্রতীককেই সম্প্রসারিত, বা বদল করতে হবে। তাই (ক) ক → খ; ও (খ) ক → খ+গ রকমের সূত্র রচনা করা যাবে, কিন্তু (গ) ক+খ → গ রকমের সূত্র রচনা করা যাবে না। প্রথম সূত্র দুটি গ্রহণযোগ্য সংগঠন সৃষ্টি করে, এবং তৃতীয় সূত্রটি রচনা করে গ্রহণঅযোগ্য সংগঠন। সূত্র তিনটি নিম্নরূপ সংগঠন সৃষ্টি করবে :

(১৫)

[ক. ২] সে-সব প্রতীককেই সম্প্রসারিত করা, বা পুনর্লিখিত করা চলবে যেগুলো কোনো-না-কোনো সূত্রে তীরের ডান পাশে উপস্থিত (শুধু আদিপ্রতীকটি এর ব্যতিক্রম)। অর্থাৎ পুনর্লিখনের ফলে উদ্ভূত প্রতীকেরই পুনর্লিখন সম্ভব। (১৬)র সূত্রগুলো লক্ষণীয় :

(১৬) [ক] ক → খ + গ

[খ] ক → চ + জ

[গ] গ → ট + ঠ

[ঘ] ম → ত + থ

(১৬)র খণ্ডিত ব্যাকরণটিতে (১৬ক) সূত্রের 'ক' হচ্ছে আদিপ্রতীক, তাই এটি অন্য কোনো সূত্রপ্রয়োগে উদ্ভূত হয় নি। (১৬, খ গ) সূত্রে তীরের বাঁ-দিকে যে-সব প্রতীক আছে, সেগুলো পূর্বে প্রযুক্ত কোনো সূত্রের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। এ-দুটি বিধিসম্মত সূত্র। কিন্তু (১৬ঘ) সূত্রটি বিধিবিরুদ্ধ, কেননা এটিতে এমন একটি প্রতীককে (ম) সম্প্রসারিত করা হয়েছে, যেটি স্বয়ম্ভু; এটি আগের কোনো সূত্রের প্রয়োগে উদ্ভূত হয় নি। (১৬)র সূত্রগুলোকে পদচিত্রে উপস্থাপন করতে গেলে (১৬ঘ) সূত্রে এসে যে-সাংগঠনিক বিপর্যয় দেখা দেবে, তা দেখানো হলো (১৭)র চিত্রে।

(১৭)
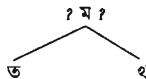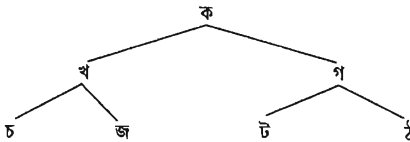
[ক.৩] কোনো 'শূন্য-প্রতীক' দ্বারা প্রতীককে সম্প্রসারিত করা যাবে না। যেমন :

ক → খ সূত্র রচনা করা যাবে না, যদি 'খ' শূন্য হয় (কোনো গ্রন্থি নির্দেশ না করে)। এ-সূত্রটির তাৎপর্য হচ্ছে যে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থি বর্জন করা যাবে না। বর্জনের শক্তি আছে রূপান্তর সূত্রের, পদসাংগঠনিক সূত্রের সে-শক্তি নেই।

[ক. ৪] পুনর্লিখিত গ্রন্থি অবশ্যই মূল গ্রন্থি থেকে ভিন্ন হবে। অর্থাৎ ক → ক জাতীয় সূত্র থাকতে পারবে না। এ-বিধিটি রূপান্তর ব্যাকরণের উদ্ভবকালের বিধি। রূপান্তর ব্যাকরণের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এ-বিধিটিও সংশোধিত হয়। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্র কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থিকে অভিন্ন প্রতীক, বা গ্রন্থিরূপে সম্প্রসারিত করতে পারে। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণে 'পৌনপুনিক সূত্র' ছিলো না, কিন্তু *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে পৌনপুনিক সূত্র গৃহীত হয়, এবং এ-বিধিটিকে শিথিল করা হয়। বর্তমানে সীমিত পরিমাণে (ক) ক → ক + খ;

(খ) ক → খ + ক; এবং (গ) ক → খ + ক + গ জাতীয় পৌনপুনিক সূত্র ব্যবহার করা হয় (দ্র § ৪.২.৬)। ওপরের সূত্র তিনটি যথাক্রমে (১৮ক, খ, গ) রূপী সংগঠন সৃষ্টি করবে।

(১৮)
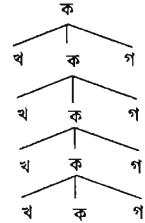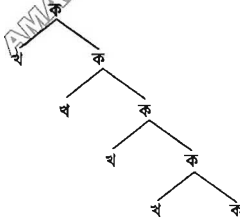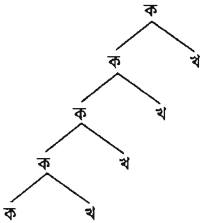
[ক.৫] যদি কোনো সূত্র কোনো প্রতীককে 'খ + গ'-রূপে সম্প্রসারিত করে, তবে পরে এমন কোনো সূত্র থাকতে পারবে না যা 'খ'-কে সম্প্রসারিত করে 'গ'-রূপে, এবং 'গ'-কে সম্প্রসারিত করে 'খ'-রূপে। (১৯)-র সূত্ররাশি লক্ষণীয় :

(১৯) [ক] ক → খ + গ

[খ] খ → গ

[গ] গ → খ

(১৯ক, খ, গ) সূত্রের প্রয়োগে পাওয়া যাবে (২০) পদচিত্রটি :

(২০)
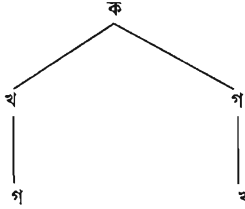
(১৯খ, গ) সূত্র প্রয়োগের ফলে পদচিত্রের 'খ', ও 'গ' বৃন্ত দুটি পরস্পর স্থান বদল করে। স্থান বদল করার ক্ষমতা পদসাংগঠনিক সূত্রের নেই; এ-ক্ষমতা আছে শুধু রূপান্তর সূত্রের।

[ক.খ] প্রতিবেশমুক্ত ও প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক সূত্র : পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র দু-প্রকৃতির হ'তে পারে (দ্র § ৪.৪.১) : (ক) প্রতিবেশমুক্ত সূত্র, ও (খ) প্রতিবেশকাতর সূত্র। যে-সমস্ত পদসাংগঠনিক সূত্রে কোনো প্রতিবেশগত শর্ত আরোপ করা হয় না, তাদের বলা হয় প্রতিবেশমুক্ত সূত্র; এবং যে-সমস্ত সূত্রে প্রতিবেশগত শর্ত আরোপ করা হয়, তাদের বলা হয় প্রতিবেশকাতর সূত্র। মনে করা যাক যে 'ক' গ্রন্থিটিকে সর্বদাই 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করা সম্ভব; তবে পাওয়া যাবে ক → খ সূত্রটি। এ-সূত্রে প্রতিবেশগত কোনো শর্ত নেই, তাই এটি প্রতিবেশমুক্ত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ একটি প্রতীককে বিশেষ শর্তসাপেক্ষেই অন্য একটি প্রতীকরূপে সম্প্রসারিত করা যায়। এ-রকম সম্প্রসারণ নির্দেশের জন্যে সূত্রে শর্ত আরোপ করতে হয়। মনে করা যাক যে 'ক'-কে 'খ'-রূপে তখনি সম্প্রসারণ করা সম্ভব, যখন 'ক'-র ডানে 'গ' থাকে। এ-ব্যাপারটি নির্দেশ করা সম্ভব শুধু প্রতিবেশকাতর, বা প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত সূত্রের সাহায্যে। তখন সূত্রটি লিখতে হবে :

ক → খ/ —গ।

তিন রকম সমতুল্য প্রণালিতে প্রতিবেশকাতরতা দেখানো সম্ভব। প্রতিটি প্রণালিরই নির্দেশ হচ্ছে : 'ক'-কে নির্দেশিত প্রতিবেশে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করুন।' নিচের প্রতিবেশকাতর সূত্রগুলো (এগুলো সমতুল্য, অর্থাৎ একই নির্দেশ দিচ্ছে) লক্ষণীয় :

(২১) [ক] ঙ ক ঙ → ঙ খ ঙ

[খ] ক → খ 'ঙ—ঙ' প্রতিবেশে

[গ] ক → খ/ঙ—ঙ

(২১)-এর প্রতিটি সূত্র একই নির্দেশ দিচ্ছে : নির্দেশটি হচ্ছে 'ক'-কে 'ঙ—ঙ' প্রতিবেশে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করুন।' 'ঙ—ঙ' প্রতিবেশের অর্থ হচ্ছে 'ক'-এর বাঁয়ে-ডানে উভয় দিকেই আছে 'ঙ'। প্রতিবেশকাতর সূত্র রচনায় বর্তমানে (২১গ) প্রণালিটিই শুধু ব্যবহৃত হয়।

প্রতিবেশকাতর সূত্রে সম্প্রসারণীয় প্রতীকের ডানের অথবা বাঁয়ের, অথবা একসঙ্গে উভয় দিকের প্রতিবেশগত শর্ত নির্দেশ করা সম্ভব। (২১)-এর সূত্রগুলোতে ডান ও বাঁ প্রতিবেশ নির্দেশ করা হয়েছে। নিচের সূত্র দুটি লক্ষণীয় :

(২২) [ক] ক → খ / ঙ–

[ক] ক → গ / –ঙ

(২২ক) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে যদি 'ক'-র বাঁয়ে 'ঙ' থাকে, তবে 'ক'-কে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে, এবং (২২খ) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে যদি 'ক'-র ডানে 'ঙ' থাকে, তবে 'ক'-কে 'গ'-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে।

প্রতিবেশকাতর সূত্র সাধারণত ব্যবহার করা হয় একই গ্রন্থি, বা প্রতীকের বিকল্প সম্প্রসারণ নির্দেশের জন্যে। মনে করা যাক 'ক'-র দু-রকম সম্প্রসারণ সম্ভব :

(ক) 'ক'-কে 'খ'-রূপে সম্প্রসারিত করা যায় যখন 'ক'-র বাঁয়ে 'ঙ' থাকে; এবং (খ) অন্য সব প্রতিবেশে 'ক'-কে সম্প্রসারিত করা যায় 'গ'-রূপে। এ-সূত্র দুটিকে প্রকাশ করা যায় (২৩)-এর একটি মাত্র সূত্রে :

(২৩) ক → { খ/ ঙ–
গ }

এ-সূত্রে 'ক'-র দু-রকম সম্প্রসারণ নির্দেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমে নির্দেশ করা হয়েছে শর্তসাপেক্ষ সম্প্রসারণটি, এবং পরে দেখানো হয়েছে শর্তহীন সম্প্রসারণটি। (২৩) সূত্রটির নির্দেশ হচ্ছে : 'ক'-কে 'ঙ—' প্রতিবেশে 'খ'-রূপে, এবং অন্যত্র 'গ'-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে।' যদি এমন হতো যে 'ক'-কে শুধু 'ঙ'—প্রতিবেশে 'খ'-রূপে সম্প্রসারণ করা সম্ভব, এবং অন্যত্র 'গ', বা 'ঘ', বা 'চ' রূপে সম্প্রসারণ করা সম্ভব, তবে সূত্রটি হতো নিম্নরূপ :

(২৪) ক → { খ/ ঙ–
গ
ঘ
চ }

পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র অব্যবহিত উপাদান রীতিরই সুশৃঙ্খল গাণিতিক রূপায়ণ। এ-সূত্ররাশি 'ক্রমবিন্যস্ত' (যে-ক্রমে সূত্ররাশি বিন্যস্ত, সে-ক্রম অনুসারে তাদের প্রয়োগ করতে হবে) হ'তে পারে, এবং 'ক্রমহীন' (সূত্র প্রয়োগের সময় কোনো ক্রম মানার দরকার নেই) হ'তে পারে। 'ক্রমবিন্যাস' হতে পারে দু-রকমের : (ক) আন্তর ক্রমবিন্যাস, এবং (খ) বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস (দ্র § ৪.৪.৩)। সাংগঠনিক সূত্ররাশি রচিত হওয়ার সময় নিজেরাই নিজেদের ওপর

একরকম ক্রম আরোপ করে : যেমন— কোনো একটি প্রতীক সম্প্রসারণের সূত্র প্রযুক্ত হ'তে পারে না, যদি না তার আগে প্রযুক্ত হয় সে-সূত্রটি, যেটির প্রয়োগে উদ্ভূত হয়েছে সম্প্রসারণীয় প্রতীকটি। এমন ক্রমবিন্যাসকে বলা হয় 'আন্তর ক্রমবিন্যাস'। এ-বিন্যাস যেহেতু সহজাত, তাই তা বিশেষ মূল্যবান নয়। মূল্যবান হচ্ছে 'বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস'। বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে উপাত্ত বর্ণনার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীর আরোপিত বিন্যাস, এবং এর সাহায্যেই তিনি প্রকাশ করেন উপাত্ত সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি।

[খ] রূপান্তর(মূলক) সূত্র : রূপান্তর ব্যাকরণের রূপান্তর কক্ষে ব্যবহৃত সূত্ররাশি 'রূপান্তর(মূলক) সূত্র' নামে পরিচিত। রূপান্তর সূত্র এক রকম পুনর্লিখন সূত্র; তবে এ-সূত্র পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। পদসাংগঠনিক সূত্র নির্দেশ করে বাক্যের, বা অন্য কিছুর, আভ্যন্তর সংগঠন; আর রূপান্তর সূত্র বাক্যের আভ্যন্তর, বা গভীর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে 'আহারত' সংগঠন। রূপান্তর সূত্র বারবার বাক্যের গভীর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা হয় বাক্যের 'বহিঃসংগঠন' বা 'বহির্তল'। পুনর্লিখন সূত্র প্রয়োগ করা হয় কোনো প্রতীক, বা গ্রন্থির ওপর; এবং রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ করা হয় সমগ্র বাক্যসংগঠন, বা পদচিত্রের ওপর। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণে 'আবশ্যিক রূপান্তর(মূলক) সূত্র', ও 'ঐচ্ছিক রূপান্তর(মূলক) সূত্র' নামে দু-রকম রূপান্তর সূত্র ছিলো। পরে ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র বাদ দেয়া হয়, এবং সমস্ত রূপান্তর সূত্রই আবশ্যিক হয়ে ওঠে। রূপান্তর ব্যাকরণের প্রথম পর্যায়ে রূপান্তর সূত্রসমূহ সর্বশক্তিমান ছিলো, তারা অসাধ্য সাধন করতে পারতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তর সূত্রের শক্তি সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণে সরল-বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক বাক্যের গভীর সংগঠন থেকে প্রশ্নবোধক, নিষেধাত্মক, ও অন্যান্য বাক্যসংগঠন আহরণ করা হতো। অর্থাৎ রূপান্তর সূত্র বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করতে পারতো। ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪) প্রধান ভূমিকা নেন রূপান্তর সূত্রের শক্তি নিয়ন্ত্রণে। তাঁরা একটি মৌল প্রস্তাব পেশ করেন : 'রূপান্তরসমূহ অর্থসংরক্ষক', বা 'রূপান্তর সূত্র বাক্যের অর্থবদল ঘটাবে না।' রূপান্তর ব্যাকরণে তাঁদের প্রস্তাবিত নীতিটি মৌল নীতি হিশেবে গৃহীত হয়েছে।

ভাষায়, যা বিভিন্ন বাক্যসংগঠনে ক্রিয়াশীল রূপান্তররাশি আবিষ্কার ভাষাবিজ্ঞানীর দায়িত্ব। তবে রূপান্তর সূত্র রচনার কয়েকটি প্রণালি রয়েছে। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণে যে-প্রণালিতে রূপান্তর সূত্র রচিত হতো, বর্তমানে তেমনভাবে রচিত হয় না। নিচে, [খ.১]-এ *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর সূত্র রচনা প্রণালি, এবং [খ.২]-এ *আস্পেক্টস ও আস্পেক্টস*-উত্তর কাঠামোর রূপান্তর সূত্র রচনাপ্রণালি দেখানো হলো :

[খ.১] *সিন্টাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর সূত্র : প্রথমে নির্দেশ করা হয় রূপান্তরটির নাম—যেমন : 'প্রশ্নবোধক রূপান্তর', 'নিষেধাত্মক রূপান্তর' ইত্যাদি; এবং উল্লেখ করা হয় রূপান্তর সূত্রটি 'আবশ্যিক', না 'ঐচ্ছিক'। এর পর দেয়া হয় বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক

বর্ণনা, এবং সাংগঠনিক রূপান্তর নির্দেশ করা হয় 'কভারপ্রতীক'-এর সাহায্যে (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১১১-১১৪))। একটি নমুনা :

নিষেধাত্মক (ঐচ্ছিক) রূপান্তর :

সাংগঠনিক বর্ণনা : # বিপ...ক্রিপ #

সাংগঠনিক রূপান্তর : ঙ^{১}...ঙ^{২} # $\Rightarrow$ ঙ^{১}...ঙ^{২}...না

এখানে 'ঙ^{১}', 'ঙ^{২}' কভারপ্রতীক, অর্থাৎ 'ঙ^{১}' নির্দেশ করছে বাক্যের শুরুর বিশেষ্যপদ (বিপ), 'ঙ^{২}' নির্দেশ করছে ক্রিয়াপদ (ক্রিপ)। সাংগঠনিক রূপান্তর উল্লিখিত সংগঠনে যোগ করেছে নিষেধাত্মক ভাষাবস্তু 'না'। এ-সূত্রের সাহায্যে হ্যাঁ-সূচক বাক্যকে না-সূচক বাক্যে রূপান্তরিত করা হয়।

[খ. ২] *অ্যাস্পেক্টস, ও আস্পেক্টস*-উত্তর কাঠামোর রূপান্তর সূত্র : প্রথমে উল্লেখ করা হয় রূপান্তরটির নাম; এবং অব্যবহিত পরবর্তী পংক্তিতে দেয়া হয় বাক্যটির তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক বর্ণনা। রূপান্তর নির্দেশের সুবিধার জন্যে সংগঠনের বিভিন্ন উপাদান নির্দেশ করা হয় সংখ্যার সাহায্যে। তারপর উল্লেখ করা হয়, যদি থাকে, একরাশি শর্ত। বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা যদি এ-শর্তরাশি পূরণ করে, তবেই রূপান্তর ক্রিয়াশীল হ'তে পারে, নইলে নয়। সব শেষে দেয়া হয় সাংগঠনিক রূপান্তরের ভাষিক নির্দেশ। ওপরে প্রদত্ত নিষেধাত্মক রূপান্তরটিকে *আস্পেক্টস-প্রণালিতে* প্রকাশ করলে পাওয়া যাবে এ-সূত্রটি :

নিষেধাত্মক রূপান্তর :

সাব :	বাক্য [নঞ	বিপ	ক্রিপ] বাক্য
	১	২	৩

শর্ত : (ক) যদি থাকে।

(খ) যদি থাকে।

সারূ : (ক) ১ বর্জন করুন;

(খ) ৩-এর ডানে 'না' যোগ করুন।

রূপান্তর সূত্রের বাক্যসংগঠন পরিবর্তন-শক্তি : বাক্যসংগঠন বদলের অমিত শক্তি রয়েছে রূপান্তর সূত্রের। রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে বাক্যসংগঠনে নতুন বস্তু যোগ করা যায়, সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কোনো উপাদানকে বর্জন করা যায়, উপাদানরাশির পারস্পরিক স্থানবদল করা যায়, এবং যুগপৎ স্থানান্তর-সংযোজন-বর্জন করা যায়। রূপান্তর সূত্রে বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক বর্ণনা থাকে না, থাকে রূপান্তর প্রয়োগের জন্যে তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক বর্ণনা (লক্ষণীয় : পুনর্লিখন সূত্রে ব্যবহার করা হয় একটি তীর ($\rightarrow$), কিন্তু রূপান্তর সূত্রে, সাধারণত,

ব্যবহার করা হয় দ্বৈততীর (⇒); কিন্তু বর্তমানে উভয় সূত্রেই একতীর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে)। রূপান্তর সূত্র সাধারণত 'সংযোজন', 'বর্জন', 'পারস্পরিক স্থানান্তর', এবং 'প্রতিকল্পন' প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করে। সংগঠন রূপান্তরণের উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলো দেখানো হলো :

[ক] সংযোজন : কোনো পদচিত্রে এক বা একাধিক গ্রন্থি সংযোজন করা যেতে পারে। যদি কোনো রূপান্তর সূত্র থাকে চ+ছ⇒চ+ছ+জ, তবে পাওয়া যাবে :

(২৫)
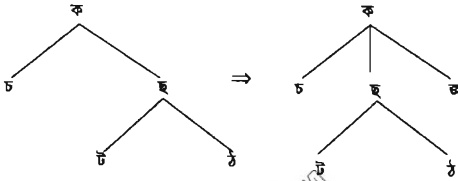
[খ] বর্জন : কোনো পদচিত্র থেকে এক বা একাধিক গ্রন্থি বর্জন করা যেতে পারে। বর্জনের সময় গ্রন্থিটির ওপর আধিপত্যকারী, ও অধীন সমস্ত বৃন্ত পদচিত্র থেকে বর্জন করা হয়। যদি কোনো রূপান্তর সূত্র থাকে চ+ছ ⇒চ, তবে পাওয়া যাবে :

(২৬)
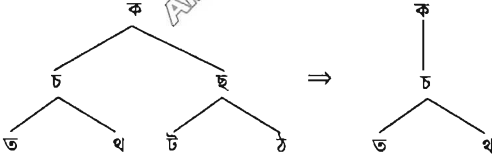
[গ] পারস্পরিক স্থানান্তর : পদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত একাধিক গ্রন্থির স্থান পারস্পরিকভাবে বদল করা যায়। যদি কোনো রূপান্তর সূত্র থাকে চ+ছ⇒ছ+চ, তবে পাওয়া যাবে:

(২৭)
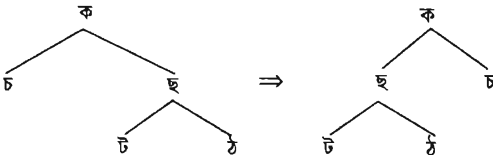
[ঘ] প্রতিকল্পন : পদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক গ্রন্থিকে অন্য এক বা একাধিক গ্রন্থি দ্বারা প্রতিকল্পিত করা যেতে পারে। যদি কোনো রূপান্তর সূত্র থাকে চ+ছ⇒জ+ছ, তবে পাওয়া যাবে :

(২৮)
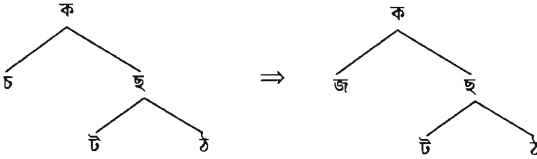
এ-ছাড়া পদচিত্রে যুগপৎ সংযোজন-বর্জন-স্থানান্তর ঘটানো যায়।

৪.৩.৩ প্রতীকরাজি

রূপান্তর ব্যাকরণের সূত্রে তিন রকম প্রতীক ব্যবহৃত হয় : (ক) শব্দপ্রতীক, (খ) অপ্যারেটর [সংকেত], ও (গ) সংক্ষেপক। শব্দপ্রতীক ব্যবহৃত হয় নানা রকম বাক্য-শ্রেণী, শব্দ-শ্রেণী, ভাষা-একক প্রভৃতি নির্দেশের জন্যে; অপ্যারেটর ব্যবহৃত হয় নানা রকম ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সংকেতের জন্যে; এবং সংক্ষেপক ব্যবহৃত হয় একাধিক সূত্রকে এক সূত্রে প্রকাশের জন্যে। অপ্যারেটর ও সংক্ষেপক সূত্রের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রক্রিয়া নির্দেশ করে ব'লে এদের 'গ্রন্থি'র অন্তর্গত বস্তুরূপে বিবেচনা করা হয় না, এবং এদের কোনো নিজস্ব সংগঠন নেই। শুধু শব্দপ্রতীকগুলোই বাক্যের বাস্তব উপাদান।

[ক] শব্দপ্রতীক : বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহকে নির্দেশ করার জন্যে যে-সমস্ত প্রতীক ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় 'শব্দপ্রতীক' [ভ্যাক্যাবিউল্যারি সিম্বল]। শব্দপ্রতীক দু-রকম : (ক) শ্রেণী ও রূপমূল নির্দেশক প্রতীক, এবং (খ) কভারপ্রতীক। [আবরণপ্রতীক]।

[ক. ১] শ্রেণী-ও রূপমূল-নির্দেশক প্রতীক : এ-প্রতীকসমূহ বাক্য, ও বাক্যের 'উচ্চ' উপাদান-শ্রেণী নির্দেশ করে, এবং রূপমূলের মতো 'নিম্ন' উপাদানও নির্দেশ করে। 'উচ্চ' উপাদান নির্দেশক প্রতীককে বলা যায় 'শ্রেণী-প্রতীক', এবং রূপমূল নির্দেশক প্রতীককে বলা যায় 'রূপমূল প্রতীক'। বাক্যের উচ্চ উপাদাননির্দেশক শ্রেণী-প্রতীকসমূহ 'অ-অন্ত্যপ্রতীক' (যে-প্রতীককে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব), এবং বাক্যের নিম্ন উপাদান (রূপমূল) নির্দেশক প্রতীকসমূহ 'অন্ত্যপ্রতীক'(যে-প্রতীককে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে আর সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়)।

শ্রেণী-প্রতীকের (অ-অন্ত্যপ্রতীকের) উদাহরণ : 'বা' (বাক্য), 'বিপ' (বিশেষ্যপদ), 'ক্রিপ' (ক্রিয়াপদ), 'বি' (বিশেষ্য) প্রভৃতি।

রূপমূল প্রতীকের (অন্ত্যপ্রতীকের) উদাহরণ : 'ছেলে', 'মেয়ে', 'সে' প্রভৃতি।

[ক. ২] কভারপ্রতীক [আবরণপ্রতীক] : কভারপ্রতীক শুধু রূপান্তর সূত্রেই ব্যবহৃত হয়। কোনো সংগঠনের একক বা একাধিক গ্রন্থি নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয় এমন প্রতীক। মনে করা যাক, কোনো একটি সংগঠনের আকার হচ্ছে #ক+খ+গ+ঘ#। এ-সংগঠনটির ওপর এমন একটি রূপান্তর সূত্র প্রযুক্ত হবে, যার জন্যে দরকার শুধু সংগঠনের 'ক', ও 'ঘ' গ্রন্থি। এ-গ্রন্থি দুটির মধ্যবর্তী গ্রন্থি সূত্রটির জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। তবে সূত্রটি প্রয়োগের জন্যে জানা দরকার যে 'ক' ও 'ঘ'-র মাঝে কোনো গ্রন্থি আছে, জায়গাটুকু শূন্য নয়। রূপান্তর সূত্রটিতে সংগঠনটির সামগ্রিক বর্ণনা দেয়া যেতে পারে; কিন্তু দিলে তা বাহুল্য হবে। এ-বাহুল্য এড়ানোর জন্যে কাজে লাগানো হয় কভারপ্রতীক, যা কখনো শূন্য গ্রন্থি বা একক বা একাধিক গ্রন্থি নির্দেশ করে। ওপরের সংগঠনটির 'খ+গ' গ্রন্থি নির্দেশের জন্যে 'ঙ'-কে ব্যবহার করতে পারি কভারপ্রতীকরূপে। তাহলে সংগঠনটির বর্ণনা হবে নিম্নরূপ : # ক+ঙ+ঘ#। ইংরেজিতে সাধারণত বর্ণমালার শেষ বর্ণ তিনটিকে কভারপ্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়। বাঙলায় আমি স্বল্পব্যবহৃত কয়েকটি বর্ণ (যেমন : ঙ, ঞ, ক্ষ) কভারপ্রতীকরূপে ব্যবহার করবো।

[খ] অপ্যারেটর [প্রক্রিয়ানির্দেশক সংকেত] : দু-রকম প্রক্রিয়া-গ্রন্থন ও পুনর্লিখন-নির্দেশের জন্যে অপ্যারেটর ব্যবহৃত হয়।

[খ.১] গ্রন্থন প্রতীক : এর মধ্যে পড়ে সংযোগচিহ্ন (+), এবং সীমাচিহ্ন (#)।

[ক] সংযোগচিহ্ন (+) : এ-চিহ্নটি একাধিক গ্রন্থি সংযোগের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এটি সংযুক্ত গ্রন্থিসমূহের সীমাও নির্দেশ করে। যেমন : ক → খ+গ সূত্রটি নির্দেশ করছে যে 'খ', ও 'গ' দুটি পৃথক প্রতীক, এবং এ-দুটি একত্রে একটি গ্রন্থি সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে '+' চিহ্নটিকে বর্জনও করা হয়। যেমন : এ-সূত্রটিকে ক →খ গ রূপেও লেখা যায়।

[খ] দ্বৈতক্রস (#) : এ-চিহ্নটিকে সাধারণত বাক্য, বা অন্য কোনো এককের সীমা নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন : # বিপ+ক্রিপ # নির্দেশ করছে যে দ্বৈতক্রসের মধ্যবর্তী গ্রন্থটি একটি বাক্য।

[খ. ২] পুনর্লিখন প্রতীক : পদসাংগঠনিক সূত্রে পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয় তীরচিহ্ন (→)। পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে অভগ্ন তীর (→), বা ভগ্ন তীর (...>) ব্যবহার করা যেতে পারে। তীরটি নির্দেশ করে যে তীরটির বাঁ দিকের গ্রন্থিকে ডান দিকের গ্রন্থিরূপে লিখতে হবে। তীরটি তার বাঁ ও ডানের গ্রন্থি দুটির মধ্যে সম্পর্কও নির্দেশ করে। পদসাংগঠনিক সূত্রে তীরচিহ্ন নির্দেশ করে 'হচ্ছে' সম্পর্ক। যেমন : ক → খ সূত্রে তীরটি নির্দেশ দিচ্ছে যে 'ক'-কে পুনরায় 'খ'-রূপে লিখতে হবে; এবং নির্দেশ করছে যে 'ক হচ্ছে খ'; বা 'খ হচ্ছে ক'। রূপান্তরসূত্রে তীরচিহ্ন 'আহরিত', বা 'গঠিত', বা 'সৃষ্ট' অর্থ বোঝায়। যেমন : ক+খ⇒খ+ক রূপান্তর সূত্রে তীরটি নির্দেশ করছে যে এর বাঁয়ের সংগঠনকে ডান দিকের সংগঠনে

রূপান্তরিত করতে হবে। তীরটি এখানে ডান-বামের বস্তুদের মধ্যে সম্পর্কও নির্দেশ করছে। তীরটি বোঝাচ্ছে যে ডানের সংগঠনটি বাঁয়ের সংগঠন থেকে 'আহরিত', বা 'গঠিত', বা 'সৃষ্ট'।

রূপান্তর ব্যাকরণে নানা রকম তীর দু-রকম তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়। পুনর্লিখন ও রূপান্তর বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে অভগ্ন (→), বা ভগ্ন একতীর (...>)। শুধু পুনর্লিখন নির্দেশের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে অভগ্ন (→), বা ভগ্ন (...>) একতীর; এবং রূপান্তর জ্ঞাপনের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে অভগ্ন (⇒), বা ভগ্ন (==>) দ্বৈততীর। এ-গ্রন্থে পুনর্লিখনের জন্যে সাধারণত অভগ্ন একতীর (→), এবং রূপান্তর বোঝানোর জন্যে অভগ্ন দ্বৈততীর (⇒) ব্যবহৃত হয়েছে।

[গ] সংক্ষেপক : সংক্ষেপকরূপে ব্যবহৃত হয় তিন রকম বন্ধনি : (ক) প্রথম বন্ধনি (()); (খ) দ্বিতীয় বন্ধনি ({ }); ও (গ) তৃতীয় বন্ধনি ([])। এদের প্রয়োগবিধি :

[গ. ১] প্রথম বন্ধনি (( )) : প্রথম বন্ধনি ঐচ্ছিকতা নির্দেশ করে। যে-সমস্ত সূত্র, দু-একটি প্রতীক বাদে, অভিন্ন, তাদের একত্র করার জন্যে প্রথম বন্ধনি ব্যবহৃত হয়। একত্রিত সূত্রে ভিন্নতানির্দেশক প্রতীকগুলোকে প্রথম বন্ধনিবদ্ধ ক'রে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। সূত্র প্রয়োগের সময় বন্ধনিহীন প্রতীকগুলোকে আবশ্যিকভাবে নিতে হয়, এবং বন্ধনিবদ্ধ প্রতীক(গুলো)কে নেয়া যেতে পারে, বা নাও নেয়া যেতে পারে। যেমন : ক → খ+(গ) সূত্রে দুটি সূত্র একত্রিত। সূত্র দুটি হচ্ছে : ক → খ, এবং ক → খ+গ। ওপরের একত্রিত সূত্রটি নির্দেশ করছে যে 'ক'-কে 'খ'-রূপে অবশ্যই পুনরায় লিখতে হবে, তবে ঐচ্ছিকভাবে 'গ'-কেও নেয়া যেতে পারে, অর্থাৎ 'ক'-কে 'খ+গ' রূপেও পুনরায় লেখা যেতে পারে। প্রথম বন্ধনির কতিপয় প্রয়োগ নিচে দেখানো হলো :

[ক] ক → (খ) গ সূত্রে দুটি সূত্র একত্রিত :

ক → গ

ক → খ + গ

সূত্র দুটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় অবশ্যই *গ*-কে গ্রহণ করতে হবে, তবে ঐচ্ছিকভাবে *খ*-কেও, *গ*-এর বাঁয়ে নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ *খ*-কে বাদ দিয়ে *গ*-কে নেয়া সম্ভব, কিন্তু *গ*-কে বাদ দিয়ে *খ*-কে নেয়া অসম্ভব।

[খ] ক → খ(গ) (ঘ) সূত্রটিতে চারটি সূত্র একত্রিত :

ক → খ

ক → খ + গ

ক → খ + ঘ

ক → খ + গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় *খ*-কে অবশ্যই নিতে হবে, এবং ঐচ্ছিকভাবে *গ* বা *ঘ*-কে বা উভয়কে নেয়া যেতে পারে। সূত্রটি প্রয়োগের সময় সূত্রে উল্লিখিত প্রতীকের ক্রম মানতে হবে।

[গ] ক → খ (গ + ঘ) সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত :

ক → খ

ক → খ + গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় *খ*-কে অবশ্যই নিতে হবে; এবং ঐচ্ছিকভাবে *গ* + *ঘ*-কেও নেয়া যেতে পারে। *গ* + *ঘ*-র কোনো প্রতীককে একা নেয়া যাবে না, নিলে উভয়কেই নিতে হবে।

[ঘ] ক → ((খ) গ) ঘ সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত :

ক → ঘ

ক → গ + ঘ

ক → খ + গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় *ঘ*-কে অবশ্যই নিতে হবে; এবং ঐচ্ছিকভাবে *গ*-কে বা *খ* + *গ*-কেও নেয়া যেতে পারে। এ-সূত্রে *খ*-কে না নিয়েও নেয়া সম্ভব *গ*-কে, কিন্তু *গ*-কে না নিয়ে *খ*-কে নেয়া অসম্ভব।

[ঙ) ক→ (খ) (গ) সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত :

ক →খ

ক → গ

ক → খ+গ

সূত্রটির তীরের ডান দিকে উভয় প্রতীকই ঐচ্ছিক; তবে সূত্রটি প্রয়োগের সময় একটিকে অবশ্যই নিতে হবে, এবং ঐচ্ছিকভাবে দুটিকেই নেয়া সম্ভব।

[গ.২] দ্বিতীয় বন্ধনি ({ }) : কোনো গ্রন্থির বিকল্প সম্প্রসারণ নির্দেশের জন্যে দ্বিতীয় বন্ধনি ({ }) ব্যবহৃত হয়। যে-সমস্ত সূত্র একটি প্রতীক বাদে (বা প্রতীকপরম্পরা বাদে) অভিন্ন, তাদের একত্রে প্রকাশ করার জন্যে দ্বিতীয় বন্ধনি ব্যবহার করা হয়। ভিন্নতাজ্ঞাপক প্রতীকগুলোকে উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত করা হয়, এবং তাদের ঘিরে দেয়া হয় দ্বিতীয় বন্ধনিতে। দ্বিতীয় বন্ধনিবদ্ধ প্রতীকগুলো আবশ্যিক : সূত্র প্রয়োগ করার সময় দ্বিতীয় বন্ধনিস্থ যে-কোনো একটিকে অবশ্যই নিতে হবে, কিন্তু একবারে একাধিক প্রতীক নেয়া যাবে না।

নিচের সূত্রটি লক্ষণীয় :

[ক] $\text{ক} \rightarrow \left\{\begin{matrix} \text{খ} \\ \text{গ} \\ \text{ঘ} \end{matrix}\right\}$ সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত :

ক → খ

ক → গ

ক → ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় *খ*, *গ*, *ঘ*-র কোনো একটিকে অবশ্যই নিতে হবে (এবং যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে)।

[খ] $\left\{\begin{matrix} \text{ক} \\ \text{খ} \end{matrix}\right\} \text{গ} \Rightarrow \text{ট}$ সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত :

ক + গ ⇒ ট

খ + গ ⇒ ট

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় *গ*-কে অবশ্যই নিতে হবে এবং *গ*-র বাঁয়ে *ক*, ও *খ*-এর মাঝ থেকে একটিকে অবশ্যই নিতে হবে। তবে দুটিকে একবারে নেয়া যাবে না।

যদিও দ্বিতীয় বন্ধনির ভেতরে সাধারণত আবশ্যিক প্রতীক স্থাপন করা হয়, তবে ঐচ্ছিক বিকল্প প্রতীকও দ্বিতীয় বন্ধনিতে স্থাপন করা যায়। নিচের সূত্রগুলো লক্ষণীয় :

[গ] $\text{ক} \rightarrow \left(\left\{\begin{matrix} \text{খ} \\ \text{গ} \end{matrix}\right\}\right) \text{ঘ}$ সূত্রটিতে তিনটি সূত্র একত্রিত :

ক → ঘ

ক → খ + ঘ

ক → গ +ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় ঘ-কে অবশ্যই নিতে হবে; এবং ঐচ্ছিকভাবে *খ*, ও *গ*-র যে-কোনো একটিকে নেয়া যেতে পারে।

[ঘ] ক → { খ + গ / ঘ / চ (ছ) } সূত্রটিতে চারটি সূত্র একত্রিত :

ক → খ + গ

ক → ঘ

ক → চ

ক → চ+ছ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় *খ+গ*, অথবা *ঘ*, অথবা *চ*, বা ঐচ্ছিকভাবে *চ + ছ*-কে নিতে হবে।

আরো নানা জটিল সূত্র দ্বিতীয় বন্ধনির সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব।

কোনো গ্রন্থির বিকল্প সম্প্রসারণগুলোকে যে উল্লম্বভাবে স্থাপন করতেই হবে, তা নয়। বিকল্প সম্প্রসারণগুলোকে তীরের ডানে সরলরৈখিকভাবেও বিন্যস্ত করা যায়। তবে এমনভাবে বিন্যাস করা হ'লে সাধারণত দ্বিতীয় বন্ধনি ব্যবহার করা হয় না। যেমন : ক → খ, গ, ঘ। এমন একত্রীকরণ কৌশল সাধারণত শব্দতালিকা তৈরির সময়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন : বি(শেষ্য) → ছেলে, মেয়ে,...। এমন শব্দসূত্র নির্দেশ করে যে সূত্রের একবারের প্রয়োগে তীরের ডান দিকের বস্তুগুলো থেকে মাত্র একটি বস্তু গ্রহণ করা যেতে পারে (দ্র § ৪.৪)।

[গ. ৩] তৃতীয় বন্ধনি : তৃতীয় বন্ধনি সাধারণত রূপান্তর সূত্রে ব্যবহৃত হয়। সমস্থানে বিসদৃশ ও অভিন্ন গ্রন্থিসম্বলিত সূত্রগুলোকে একত্রিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয় তৃতীয় বন্ধনি ([ ])। একত্রিত সূত্রগুলোকে কমপক্ষে দু-স্থানে বিসদৃশ হ'তে হবে। এ-কারণে এমন একটি সূত্রে কমপক্ষে দু-জোড়া তৃতীয় বন্ধনি ব্যবহৃত হয়। সূত্রগুলোর যে-সমস্ত প্রতীক ভিন্ন, একত্রীকরণের সময় সেগুলোকে উল্লম্বভাবে স্থাপন ক'রে তৃতীয় বন্ধনিতে ঘিরে দেয়া হয়। নিচের সূত্রগুলো লক্ষণীয় :

[ক] [ক / খ] গ + ঘ ⇒ [চ / ছ] গ + ঘ

সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত :

ক + গ + ঘ ⇒ চ + গ + ঘ

খ + গ + ঘ ⇒ ছ + গ + ঘ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় বাম বন্ধনিস্থ *ক* পরিবর্তিত হবে *চ*-তে, এবং *খ* পরিবর্তিত হবে *ছ*-তে। এমন সূত্রে বাঁ-দিকের গ্রন্থির তৃতীয় বন্ধনিস্থ যে-বস্তুটিকে নেয়া হবে, ডান দিকের গ্রন্থির তৃতীয় বন্ধনি থেকে নিতে হবে সে-বস্তুটিকে, যেটি আগের বস্তুটির তুল্যস্থানে অবস্থিত।

$$[\text{খ}] \quad \begin{bmatrix} \text{ক} \\ . \\ \text{খ} \end{bmatrix} \text{ গ } \begin{bmatrix} \text{ঘ} \\ \\ \text{ঙ} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \text{চ} \\ \\ \text{ছ} \end{bmatrix} \text{ গ } \begin{bmatrix} \text{ঝ} \\ \\ \text{ঞ} \end{bmatrix}$$

সূত্রটিতে দুটি সূত্র একত্রিত :

ক + গ + ঘ ⇒ চ + গ + ঝ

খ + গ + ঙ ⇒ ছ + গ + ঞ

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে সূত্রটি প্রয়োগের সময় বাঁ-দিকের গ্রন্থি থেকে *ক* নিলে ডান গ্রন্থি থেকে নিতে হবে *চ*, আর বাঁ গ্রন্থি থেকে *খ* নিলে ডান গ্রন্থি থেকে নিতে হবে *ছ*। অনুরূপভাবে *ঘ-ঝ*, এবং *ঙ–ঞ* নিতে হবে।

সূত্র একত্রীকরণের তিন রকম প্রণালি একসঙ্গে ব্যবহৃত হ'তে পারে একই সূত্রে। তাই রচনা করা যেতে পারে নিচের সূত্রটির মতো সূত্র :

$$[\text{গ}] \quad \begin{Bmatrix} \text{ক (খ)} \\ . \\ \text{গ} \end{Bmatrix} \text{ ঘ } \begin{bmatrix} \text{চ} \\ \\ \text{ছ} \end{bmatrix} \Rightarrow \text{ ঘ } \begin{bmatrix} \text{চ} \\ \\ \text{ছ} \end{bmatrix}$$

সূত্রটিতে ছটি সূত্র একত্রিত :

ক + খ + ঘ + চ ⇒ ঘ + চ

ক + ঘ + চ ⇒ ঘ + চ

ক + খ +ঘ + ছ ⇒ ঘ + ছ

ক + ঘ + ছ ⇒ ঘ + ছ

গ + ঘ + চ ⇒ ঘ + চ

গ + ঘ + ছ ⇒ ঘ + ছ

৪.৪ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ

সাংগঠনিক অব্যবহিত উপাদান প্রণালিকে সুশৃঙ্খল রূপ দিলে যা দাঁড়ায়, তাই পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ (দ্র পোস্টাল (১৯৬৪))। সাংগঠনিকেরা বাক্যবর্ণনার জন্যে অব্যবহিত উপাদানতত্ত্ব

গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের তত্ত্বকে সুশৃঙ্খল রূপ দিতে পারেন নি। চোমস্কি (১৯৫৭, ২৬) রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ প্রস্তাবের সময় বাক্যের অব্যবহিত উপাদান নির্ভর ক'রে গঠন করেন সুশৃঙ্খল, সূত্রসমন্বিত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ ব্যবহৃত হয় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের 'ভিত্তি কক্ষ'-এ (দ্র § ৪.৫.১.১; ৪.৬.৩)। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের 'ভিত্তি কক্ষ'ও প্রকৃতিতে রূপান্তরমূলক (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ১২০-১২৩)), তবে আকৃতিতে পদসাংগঠনিক। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ, নানাবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও, বেশ শক্তিশালী; এবং এর সাহায্যে ভাষার সমস্ত বাক্যই সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে অনেকে দাবি করেছেন (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ৩৪-৪৮)) যে এর সাহায্যে ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করতে গেলে মুখোমুখি হ'তে হবে বিপুল জটিলতার; এবং কেউ কেউ দাবি করেছেন যে পৃথিবীতে এমন কিছু ভাষা আছে, যেগুলোর সমস্ত বাক্য পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় (দ্র লায়ন্স (১৯৭০))। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ বাক্যগঠনকারী একগুচ্ছ পুনর্লিখন সূত্রের সমষ্টি। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের শুরুতে থাকে একটি 'আদিপ্রতীক' বা 'আদিগ্রন্থি' (দ্র § ৪.৩.২)—# বাক্য #। আদিপ্রতীকের পরে থাকে বাক্যগঠনকারী একগুচ্ছ সূত্র, যাদের যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করে সৃষ্টি করা যায় বাক্য। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ সৃষ্ট বাক্যসমূহের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় (দ্র § ৪.৩.১)। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের ক্রিয়াকৌশল বোঝানোর জন্যে (২৯)-এ একটি খণ্ডিত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ পেশ করা হলো :

(২৯) বাক্য

ক	বাক্য	→	বিপ + ক্রিপ
খ	ক্রিপ	→	বিপ + ক্রিরূ
গ	বিপ	→	বি
ঘ	ক্রিরূ	→	ক্রিমূ+ক্রিস
ঙ	বি	→	মৌলি, স্মিতা, অনন্য, সে, তারা,...বই, কবিতা, চিঠি, ...
চ	ক্রিমূ	→	পড়
ছ	ক্রিস	→	এ, ছে, বে

[সংক্ষেপসূত্র : বিপ : বিশেষ্যপদ; ক্রিপ : ক্রিয়াপদ; ক্রিরূ : ক্রিয়ারূপ; বি : বিশেষ্য; ক্রিমূ : ক্রিয়ামূল: ক্রিস : ক্রিয়াসহায়ক।]

(২৯)-এর ব্যাকরণটিতে সাতটি পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র আছে। প্রতিটি সূত্র নির্দেশ দিচ্ছে তীরের বাঁ-দিকের প্রতীককে ডান দিকের প্রতীকরূপে পুনরায় লেখার জন্যে। ব্যাকরণটিতে দু-রকমের প্রতীক রয়েছে : যে-সমস্ত প্রতীক তীরের বাঁ-দিকে রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে অ-অন্ত্য প্রতীক; এবং যে-প্রতীকগুলো শুধুই তীরের ডানে বসেছে, কোনো সূত্রেই

তীরের বাঁয়ে বসেনি, সেগুলো হচ্ছে অন্ত্যপ্রতীক (দ্র § ৪.৩.৩)। অন্ত্যপ্রতীকগুলো নির্দেশ করে সে-সব বস্তু, যারা অবিভাজ্য—অর্থাৎ রূপমূল। যেমন : 'সে, পড়, এ' প্রভৃতি। অ-অন্ত্যপ্রতীকগুলো নির্দেশ করে বাক্যের উচ্চ পর্যায়ের পদ, বা ক্যাটেগরি। যেমন : 'বিপ', 'ক্রিপ', 'ক্রিমূ', 'ক্রিরূ' প্রভৃতি। (২৯)-এর সূত্রগুলো যান্ত্রিকভাবে বাক্য সৃষ্টি করতে পারে। এ-সূত্রগুলো যদি একের পর এক প্রয়োগ করি, তাহলে পাওয়া যাবে একটি বাক্যের 'ব্যুৎপত্তি' (৩০) :

(৩০) ব্যুৎপত্তি	গ্রন্থি	প্রযুক্ত সূত্র
# বাক্য #	প্রথম	
# বিপ+ক্রিপ #	দ্বিতীয়	[২৯ক]
# বিপ + বিপ ক্রিরূ #	তৃতীয়	[২৯খ]
# বি+বি+ক্রিরূ #	চতুর্থ	[২৯গ (দু-বার)]
# বি + বি +ক্রিমূ+ ক্রিস #	পঞ্চম	[২৯ঘ]
# মৌলি + বি + ক্রিমূ + ক্রিস #	ষষ্ঠ	[২৯ঙ]
# মৌলি + বই +ক্রিমূ + ক্রিস #	সপ্তম	[২৯ঙ]
# মৌলি + বই +পড় + ক্রিস #	অষ্টম	[২৯চ]
# মৌলি + বই + পড় + ছে #	নবম	[২৯ছ]

(৩০)-এ # নির্দেশ করছে বাক্যের সীমা। ব্যাকরণটির আদিপ্রতীক হচ্ছে 'বাক্য'। তাই (২৯)-সৃষ্ট সমস্ত ব্যুৎপত্তির প্রথম পংক্তিরূপে উপস্থিত থাকবে 'বাক্য' প্রতীকটি। ব্যুৎপত্তির প্রতিটি গ্রন্থি জন্মেছে অব্যবহিত-পূর্ববর্তী গ্রন্থির ওপর একটি ক'রে সূত্র প্রয়োগের ফলে। (২৯ক) সূত্রটি প্রয়োগ ক'রে পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির দ্বিতীয় গ্রন্থিটি, এবং তার ওপর (২৯খ) সূত্রটি প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির তৃতীয় গ্রন্থিটি। তৃতীয় গ্রন্থিটির ওপর (২৯গ) সূত্রটি প্রয়োগ করা হয়েছে দু-বার, এবং পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির চতুর্থ গ্রন্থিটি। চতুর্থ গ্রন্থির ওপর (২৯ঘ) সূত্র প্রয়োগ ক'রে সম্প্রসারণ করা হয়েছে ক্রিরূপ-কে এবং, পাওয়া গেছে ব্যুৎপত্তির পঞ্চম গ্রন্থিটি। পঞ্চম গ্রন্থির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে (২৯ঙ) সূত্র, এবং সৃষ্ট হয়েছে ষষ্ঠ গ্রন্থিটি। (২৯ঙ) সূত্রটি পুনরায় প্রযুক্ত হয়েছে ষষ্ঠ গ্রন্থির ওপর; এবং জন্মেছে ব্যুৎপত্তির সপ্তম গ্রন্থি। সপ্তম গ্রন্থিতে আছে দুটি সম্প্রসারণযোগ্য প্রতীক—ক্রিমূ ও ক্রিস। এ-গ্রন্থির ওপর (২৯চ) সূত্র প্রয়োগ ক'রে সম্প্রসারণ করা হয়েছে ক্রিমূ-কে; এবং সৃষ্ট হয়েছে অষ্টম গ্রন্থি। অষ্টম গ্রন্থিতে সম্প্রসারণযোগ্য প্রতীক আছে মাত্র একটি। অষ্টম গ্রন্থির ক্রিস-কে (২৯ছ)

সূত্রের সাহায্যে সম্প্রসারণ ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে নবম গ্রন্থি। নবম গ্রন্থিটি গঠিত কেবল অন্ত্যপ্রতীকে; এতে এমন কোনো প্রতীক নেই, যা সম্প্রসারণযোগ্য। কোন সূত্র প্রয়োগের ফলে কোন গ্রন্থি পাওয়া গেছে, তা দেখানো হয়েছে ব্যুৎপত্তির ডান দিকের 'প্রযুক্ত সূত্র' স্তম্ভে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সূত্র প্রয়োগের ফলে আমরা উপনীত হই ব্যুৎপত্তির অন্ত্যগ্রন্থিতে; অর্থাৎ সে-গ্রন্থিতে, যাতে সম্প্রসারণযোগ্য কোনো প্রতীক নেই। (৩০) ব্যুৎপত্তির # মৌলি + বই +পড়+ছে # গ্রন্থিটি হচ্ছে অন্ত্যগ্রন্থি। যে-ব্যুৎপত্তির শেষ পংক্তিতে কোনো সম্প্রসারণযোগ্য প্রতীক থাকে না, বা কোনো অ-অন্ত্যপ্রতীক থাকে না, তাকে 'সমাপ্ত ব্যুৎপত্তি' বলা হয়। (৩০) একটি 'সমাপ্ত, বা সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি', কেননা এর শেষ পংক্তিটিতে এমন কোনো প্রতীক নেই, যা সম্প্রসারণযোগ্য। ব্যুৎপত্তিটির অন্ত্যগ্রন্থির ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটি। (২৯)-এর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটির সূত্র প্রয়োগ ক'রে যে-সমস্ত বাক্য পাওয়া যাবে, সেগুলোকে বিবেচনা করতে হবে এ-ব্যাকরণের সৃষ্ট বাক্য ব'লে।

সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ কেবল বাক্য সৃষ্টি করে না, বাক্য সৃষ্টির সাথে সাথে তা বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়। 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটির সংগঠন (৩০)-এর পদচিত্রে উপস্থাপন করা যায় :

(৩১)
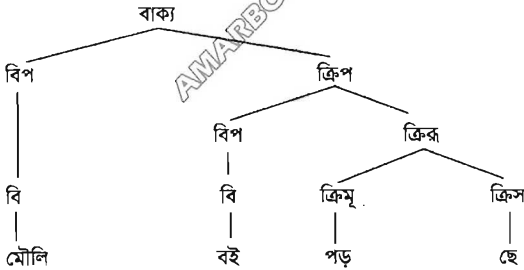
ব্যাকরণের সূত্ররাশিকে, বা সূত্র প্রয়োগে সৃষ্ট ব্যুৎপত্তিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থাপিত করা যায় পদচিত্রে (দ্র § ৪.৩.১)। ব্যাকরণের সূত্ররাশিকে পদচিত্রে উপস্থাপনের প্রণালি, সংক্ষেপে, নিম্নরূপ : প্রথমে নিতে হবে আদিপ্রতীক বাক্যকে; এবং তার ওপর প্রয়োগ করতে হবে ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। বাক্যকে যে-দুটি প্রতীকরূপে সম্প্রসারণ করতে হবে, তাদের বসাতে হবে বাক্য থেকে সামান্য নিচে (দ্র ৩১)। তারপর সরলরেখার সাহায্যে সম্প্রসারিত প্রতীক দুটিকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে হবে বাক্য-এর সাথে। প্রতীক দুটিকেও ব্যাকরণের উপযুক্ত সূত্রের সাহায্যে সম্প্রসারিত করতে হবে অনুরূপভাবে, এবং সম্প্রসারণের ফলে প্রাপ্ত প্রতীককে সরলরেখার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে হবে মূল প্রতীকের সাথে। এমন প্রণালি প্রয়োগ

ক'রে ক'রে এক সময় দেখা যাবে আর সূত্র প্রয়োগ সম্ভব নয়। তখনি রচিত হবে একটি পূর্ণাঙ্গ পদচিত্র। কোনো বাক্যের ব্যুৎপত্তি ও পদচিত্র সমান সংবাদ বহন করে না; পদচিত্রের চেয়ে ব্যুৎপত্তি অনেক বেশি অনুপুঙ্খ : 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটি সম্পর্কে (৩১) পদচিত্রটি যতো তথ্য বহন করে, তার চেয়ে বেশি তথ্য বহন করে (৩০)-এর ব্যুৎপত্তিটি। (৩০)-এ বাক্য সৃষ্টির জন্যে প্রযুক্ত সূত্রগুলোর ক্রম সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত, কিন্তু (৩১)-এ সূত্র প্রয়োগের ক্রম অনির্দেশিত : (৩০)-এর সাহায্যে সহজে রচনা করা সম্ভব (৩১); তবে (৩১)-এর সাহায্যে কোনোক্রমেই (৩০) গঠন সম্ভব নয়। (৩১)-এর পদচিত্রটি বহন করছে 'মৌলি বই পড়ছে' সম্পর্কে কেবল গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ, অপরিহার্য তথ্য; (৩১) বহন করছে এ-বাক্যটির সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য। কোনো অপ্রয়োজনীয় তথ্য এতে নেই। কিন্তু (৩০)-এ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জড়ো হয়ে আছে। ব্যুৎপত্তি গঠন জটিল প্রক্রিয়া ব'লে রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্যের সংগঠন দেখানোর জন্যে সাধারণত পদচিত্রই ব্যবহৃত হয়।

(৩১)-এর পদচিত্রটি ব্যাখ্যা করা যাক। পদচিত্রটিতে 'বাক্য' হচ্ছে 'আদিপ্রতীক' (দ্র § ৪.৩.১; ৪.৩.৩)। 'বিপ', 'ক্রিপ', 'বি', 'ক্রিরূ', 'ক্রিস' প্রভৃতি হচ্ছে 'অ-অন্ত্যপ্রতীক' এবং 'মৌলি', 'বই', 'পড়', 'ছে' প্রভৃতি হচ্ছে 'অন্ত্যপ্রতীক'। 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে 'আধিপত্য' করছে 'বিপ', ও 'ক্রিপ'র ওপর, এবং পরোক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'বাক্য'-এর নিচের সমস্ত প্রতীকের ওপর। 'বিপ', ও 'ক্রিপ' কেউ কারো ওপর আধিপত্য করছে না; তবে 'বিপ' অবস্থিত 'ক্রিপ'র আগে। 'বাক্য' থেকে উৎসারিত ব'লে 'বিপ', ও 'ক্রিপ' পরস্পরের 'ভগিনী'; এবং উভয়েই 'বাক্য'-এর 'কন্যা'। পদচিত্রে দুটি প্রতীকের সংযোগস্থলের নাম হচ্ছে 'বৃন্ত', এবং 'বৃন্ত'-লগ্ন অভিধাটি হচ্ছে 'বৃন্তনাম' (যেমন : 'বিপ', 'ক্রিপ', 'ক্রিরূ' প্রভৃতি)। পদচিত্রের যে-সমস্ত প্রতীক, বা বৃন্ত অন্য কোনো বৃন্তের ওপর আধিপত্য করে না, তারা হচ্ছে 'অন্ত্যবৃন্ত'। পদচিত্রে অন্ত্যবৃন্তগুলো বাঁ-থেকে-ডানে বিন্যস্ত থাকে, এবং গঠন করে পদচিত্রের অন্ত্যগ্রন্থি। (৩১)-এর অন্ত্যগ্রন্থি হচ্ছে মৌলি+বই+পড়+ছে।

(৩১) পদচিত্রটি 'মৌলি বই পড়ছে' বাক্যটির সংগঠন সম্পর্কে কী তথ্য পরিবেশন করছে? পদচিত্রের অন্ত্যগ্রন্থিটি নির্দেশ করছে বাক্যগঠনে অংশী রূপমূলগুলোর সরলরৈখিক বিন্যাস (বাক্যটির ধ্বনিবিন্যাসপ্রসঙ্গ আমি আলোচনায় গ্রহণ করছি না)। পদচিত্রটি বাক্যগঠনে অংশী রূপমূলরাশির সরলরৈখিক বিন্যাস দেখানো ছাড়াও স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে বাক্যটির উপাদানগুলোর ক্রমস্তরিক বিন্যাস। অর্থাৎ বাক্যের উপাদানপুঞ্জ বাক্যে কেবল বাঁ-থেকে-ডানে সরলরেখায় বিন্যস্ত নয়, তারা স্তরক্রমেও বিন্যস্ত। যে-কোনো ভাষাভাষীই অস্পষ্টভাবে বোধ করেন যে বাক্যগঠনে অংশী রূপমূল বা শব্দসমূহ পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না; বরং তারা অব্যবহিত শব্দ, বা রূপমূলের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে নানারকম বড়ো আকারের একক সৃষ্টি করে। বাক্যে যে-সমস্ত অবিভাজ্য সার্থ ভাষাবস্তু, অর্থাৎ রূপমূল, ব্যবহৃত হয়, তাদের বলা হয় 'অন্ত্য উপাদান'। (৩১)-এ 'মৌলি', 'বই', 'পড়', ও 'ছে' অন্ত্য উপাদানের উদাহরণ।

বাক্যে ব্যবহৃত অন্ত্য উপাদানগুলো পাশের উপাদানের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ হতে পারে। যেমন : (৩১)-এ 'পড়', 'ছে'-র সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ, এবং এরা দুটিতে মিলে গঠন করেছে একটি 'উপাদান', বা একক। (৩১) পদচিত্রটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র উপাদানের মিলনে গঠিত বিভিন্ন বৃহত্তর উপাদান, বা 'সংগঠন'ও নির্দেশ করছে। (৩১)-এ যে-সমস্ত (সাধারণত দুটি) বৃন্ত একই বৃন্তে মিলিত, সে-সমস্ত বৃন্ত গঠন করছে উৎস-বৃন্তের নামধারী একক। যেমন : 'ক্রিমূ', ও 'ক্রিস' মিলিত হয়েছে 'ক্রিরূ' বৃন্তে, তাই তারা গঠন করছে 'ক্রিরূ' নামী সংগঠন। যে-সমস্ত উপাদান একই উৎস-বৃন্তের মিলিত হয়, তাদের বলা হয় উৎস-বৃন্তের (অর্থাৎ উৎস-বৃন্তের নামধারী সংগঠনের) অব্যবহিত উপাদান। যেমন : (৩১)-এ 'বাক্য'-এ অব্যবহিত উপাদান হচ্ছে 'বিপ', ও 'ক্রিপ', কেননা তারা 'বাক্য'-বৃন্ত থেকে উৎসারিত, বা বাক্য-বৃন্তে উপনীত। (৩১)-এর বিভিন্ন বৃন্তনাম নির্দেশ করছে বিভিন্ন উপাদানের ক্যাটেগরি। যেমন : 'বই'-এর উৎস-বৃন্তের নাম হচ্ছে 'বি', অর্থাৎ পদচিত্রটি নির্দেশ করছে যে 'বই'-এর পদগত পরিচয় [ক্যাটেগরি] হচ্ছে 'বিশেষ্য'। 'বি'-র (দ্র (৩১)) অব্যবহিত উপরস্থিত বৃন্তনাম হচ্ছে 'বিপ', অর্থাৎ পদচিত্রটি নির্দেশ করছে যে 'বই' বিশেষ্যটি এ-বাক্যে 'বিপ', বা বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে পদচিত্রটি নির্দেশ করছে যে 'পড়' হচ্ছে 'ক্রিয়ামূল', এবং 'ছে' হচ্ছে 'ক্রিয়াসহায়ক', আবার 'ক্রিমূ', ও 'ক্রিস' যৌথভাবে হচ্ছে 'ক্রিয়ারূপ'। অনুরূপভাবে 'বিপ', ও 'ক্রিরূ' যৌথভাবে হচ্ছে ক্রিয়াপদ। অনুরূপভাবে 'মৌলি' হচ্ছে 'বিশেষ্য', এবং 'বিশেষ্যপদ'। দুটি অব্যবহিত উপাদান 'বিপ', ও 'ক্রিপ' মিলিত হয়ে গঠন করেছে সম্পূর্ণ বাক্যটি।

(৩১)-এর 'বিপ', 'ক্রিপ', 'বি', 'ক্রিরূ', 'ক্রিমূ', 'ক্রিস' প্রভৃতিকে বলা হয় 'বাক্যিক ক্যাটেগরি' [সিন্ট্যাক্টিক ক্যাটেগরি]। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের 'পরিচয়', বা 'অভিধা' বহন করে বাক্যিক ক্যাটেগরি। এ ছাড়া আরেক রকমের ক্যাটেগরি রয়েছে : তার নাম 'ভূমিকাগত ক্যাটেগরি' [ফাংশনাল ক্যাটেগরি]। ভূমিকাগত ক্যাটেগরি নির্দেশ করে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের 'ভূমিকা'। 'কর্তা', 'কর্ম', 'প্রত্যক্ষ কর্ম', 'গৌণ কর্ম' প্রভৃতি ভূমিকাগত ক্যাটেগরির উদাহরণ। (৩১) পদচিত্রটিতে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের বাক্যিক ক্যাটেগরি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু তাদের ভূমিকাগত পরিচয় প্রকাশ করা হয় নি। (৩১) পদচিত্রে কোন উপাদানটি 'কর্তা', কোনটি 'কর্ম', তা কীভাবে জানা যাবে? বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকাগত পরিচয়, এক উপায়ে, উল্লেখ ক'রে দেয়া সম্ভব ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্রে। পদসাংগঠনিক সূত্রেই নির্দেশ করে দেয়া যায় যা বিশেষ এক বিশেষ্যপদ হচ্ছে বাক্যের কর্তা বা কর্ম ইত্যাদি। যেমন : রচনা করা সম্ভব (৩২)-এর মতো সূত্র :

(৩২) ক বাক্য $\rightarrow$ বিপ$_{\text{কর্তা}}$ + ক্রিপ

খ ক্রিপ $\rightarrow$ বিপ$_{\text{কর্ম}}$ + ক্রিরূ

(৩২) এর সূত্র দুটি বিশেষ্যপদের ভূমিকাও নির্দেশ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের নির্দেশ নানা কারণে গ্রহণঅযোগ্য। এতে ব্যাকরণের সূত্রই শুধু জটিল হয়ে ওঠে না, বরং এ-

রকম সূত্র বিভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ বোধের প্রকাশ। কোনো পদচিত্রের বিভিন্ন বাক্যিক ক্যাটেগরির ভূমিকাগত পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব পদচিত্র থেকেই। চোমস্কি (১৯৬৫, ৭১) পদচিত্র থেকেই নির্ণয় করতে চেয়েছেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচিতি। তাঁর মতে, যে-বিশেষ্যপদটির ওপর 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে, সেটিই হচ্ছে 'কর্তা', আর যে-বিশেষ্যপদটির ওপর 'ক্রিপ' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে, সেটিই হচ্ছে 'কর্ম'। (৩১)-এ 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে সর্ববামের 'বিপ'র ওপর ('মৌলি'); এবং 'ক্রিপ' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে দ্বিতীয় 'বিপ'র ওপর ('বই')। সুতরাং 'মৌলি', ও 'বই' হচ্ছে যথাক্রমে এ-বাক্যের 'কর্তা' ও 'কর্ম'। চোমস্কির আধিপত্যমূলক প্রণালিতে অবশ্য কর্তা-কর্ম নির্ণয় সব সময়, এবং সব ভাষায়, সম্ভব নয়।

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ হচ্ছে অব্যবহিত উপাদান ব্যাকরণ। তবে এতে অব্যবহিত উপাদানতত্ত্বকে সুস্পষ্ট, সুষ্ঠু, ও সুশৃঙ্খলরূপ দেয়া হয়েছে। এ-ব্যাকরণ বাক্য বর্ণনা করে না, সৃষ্টি করে; এবং সৃষ্ট সমস্ত বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়। এ-ব্যাকরণ বাক্যের উপাদানরাশির যেমন দেয় সরলরৈখিক বর্ণনা, তেমনি তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে উপাদানসমূহের ক্রমস্তরিক সংগঠন। অর্থাৎ বাক্যের 'গভীরতা'ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণে। (২৯)-এর ব্যাকরণটি খণ্ডিত ও দুর্বল : এটিকে সম্প্রসারিত করা যায় নানাভাবে। এটির সৃষ্টিক্ষমতা অতি সামান্য, এবং এটি প্রচুর ত্রুটিপূর্ণ বাক্যও সৃষ্টি করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে কোনো ভাষার 'সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ' বাক্য সৃষ্টি করা সম্ভব কি-না? চোমস্কি (১৯৫৭) মনে করেন যে ইংরেজি ভাষার সমস্ত বাক্য পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব; তবে তাতে নানারকম জটিলতা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, এবং অনেক সময় দিতে হয় ভাষাবোধবিরোধী বর্ণনা। কেউ কেউ অবশ্য দাবি করেছেন যে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সব ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি সম্ভব নয় (দ্র লায়ন্স (১৯৭০))। বাঙলা ভাষার সমস্ত বাক্য, সম্ভবত, পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু তাতে দেখা দেবে বিপুল জটিলতা। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ৩৪-৪৮), পোস্টাল (১৯৬৪); § ৪.৪.৩))। তবে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ ব্যবহার করা হয় রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তি অংশে। ভিত্তি অংশে পদসাংগঠনিক সূত্ররাশি রচনা করে বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন, যার ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায় বাক্যের বহিঃসংগঠন (দ্র § ৪.৫.১.১; § ৪.৬.৩)।

৪.৪.১ প্রতিবেশমুক্ত ও প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ : কর্তাক্রিয়ারূপ সঙ্গতি

দু-রকম—প্রতিবেশমুক্ত ও প্রতিবেশকাতর—পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের পরিচয় আগেই দেয়া হয়েছে (দ্র § ৪.৩.২)। প্রতিবেশমুক্ত সূত্রে একটি প্রতীককে সম্প্রসারিত করা হয় শর্তহীনভাবে; এবং প্রতিবেশকাতর সূত্রে সম্প্রসারিত করা হয় প্রতিবেশগত শর্তসাপেক্ষে।

যে-ব্যাকরণ কেবল প্রতিবেশমুক্ত সূত্রের সমষ্টি, সে-ব্যাকরণ 'প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণ'; আর যে-ব্যাকরণে অন্তত একটি প্রতিবেশকাতর সূত্র ব্যবহৃত, সে-ব্যাকরণ 'প্রতিবেশকাতর, বা প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত ব্যাকরণ'। প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণকেও ধরা হয় একরকম প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণ ব'লে, যাতে 'শূন্য' প্রতিবেশগত শর্ত বিদ্যমান। একই উপাত্ত বর্ণনা সম্ভব উভয় প্রকার ব্যাকরণের সাহায্যে। প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণ প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। এদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর কোনটি? এর কোনো সুস্পষ্ট, পূর্বনির্দিষ্ট উত্তর নেই। যে-ব্যাকরণ ভাষাভাষীর বোধি পরিতৃপ্ত ক'রে বাক্য সৃষ্টি করতে পারবে, সেটিই উৎকৃষ্ট। প্রতিবেশমুক্ত সূত্রের উদাহরণ হচ্ছে (৩৩ক), এবং প্রতিবেশকাতর সূত্রের উদাহরণ হচ্ছে (৩৩খ) :

(৩৩) [ক] ক → খ

[খ] ক → খ/গ—

(৩৩ক)তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে *ক*-কে নিঃশর্তে *খ*-রূপে পুনরায় লেখার জন্যে; কিন্তু (৩৩খ)তে আরোপ করা হয়েছে একটি প্রতিবেশগত শর্ত। (৩৩খ)তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যদি *ক*-এর বাঁয়ে *গ* থাকে, তবে *ক*-কে *খ*-রূপে পুনরায় লিখতে হবে।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায়ই কর্তা ও ক্রিয়ারূপের মধ্যে কোনো-না-কোনো রকম 'সঙ্গতি' [কংকর্ড, এগ্রিমেন্ট] থাকে; এবং বাঙলা ভাষায়ও আছে। বাঙলা ভাষায় কর্তা যে-'পুরুষ+শ্রেণী'র হয়, ক্রিয়াপদও হয় সে-'পুরুষ+শ্রেণী'র। (৩৪)-এর উপাত্ত লক্ষণীয় :

(৩৪) ক আমি/আমরা করি।

ক´ আমি/আমরা করছি।

ক´´ আমি/আমরা করেছি।

খ আপনি/আপনারা করেন।

খ´ আপনি/আপনারা করছেন।

খ´´ আপনি/আপনারা করেছেন।

গ তুমি/তোমরা করো।

গ´ তুমি/তোমরা করছো।

গ´´ তুমি/তোমরা করেছো।

ঘ তুই/তোরা করিস।

ঘ´ তুই/তোরা করছিস।

ঘ´ তুই/তোরা করেছিস।

ঙ তিনি/তাঁরা করেন।

ঙ´ তিনি/তাঁরা করছেন।

ঙ´´ তিনি/তাঁরা করেছেন।

চ সে/তারা করে।

চ´ সে/তারা করছে।

চ´´ সে/তারা করেছে।

(৩৪)-এ ব্যাপক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় নি; শুধুমাত্র বর্তমান কালে বিভিন্ন 'আস্পেক্ট'-এ ক্রিয়ারূপ কর্তার সাথে কী-রকম সঙ্গতি রক্ষা করে, উপাত্তে শুধু তাই দেখানো হয়েছে। এ-উপাত্তে দেখা যায় যে বাঙলা ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার সাথে 'পুরুষ+শ্রেণী'গত সঙ্গতি রক্ষা করে। বাঙলায় 'পুরুষ' আছে তিন রকম : প্রথম পুরুষ ('আমি/আমরা'), দ্বিতীয় পুরুষ ('আপনি/আপনারা', 'তুমি'/'তোমরা', 'তুই'/'তোরা'), এবং তৃতীয় পুরুষ ('তিনি'/'তাঁরা', 'সে'/'তারা')। 'শ্রেণী' রয়েছে তিন রকম : 'সম্মানিত' ('আপনি', 'তিনি'), 'সাধারণ' ('তুমি', 'সে'), এবং 'হীন ('তুই')। 'শ্রেণী' ব্যাপারটি সব পুরুষে প্রযোজ্য নয় : প্রথম পুরুষ শ্রেণীহীন ('আমি' সম্মান-অসম্মাননিরপেক্ষ)। দ্বিতীয় পুরুষে তিনটি 'শ্রেণী'ই বিদ্যমান : 'আপনি', 'তুমি', এবং 'তুই'। তৃতীয় পুরুষে আছে দুটি শ্রেণী : 'তিনি', 'সে'। (৩৪)-এর উপাত্তে দেখা যায় যে ক্রিয়ারূপ কর্তার পুরুষ+শ্রেণী-অনুসারে বিভিন্ন। যেমন : 'আমি করি' : 'তুমি করো'। ক্রিয়ারূপ শুধু শ্রেণীগত কারণেও ভিন্ন হয়; যেমন : 'আপনি করেন' : 'তুমি করো'। এখানে 'আপনি' ও 'তুমি' একই পুরুষের, তবে তাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য রয়েছে ব'লে ক্রিয়ারূপও বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় পুরুষের সম্মানাত্মক ক্রিয়ারূপ ('আপনি করেন'), এবং তৃতীয় পুরুষের সম্মানাত্মক ক্রিয়ারূপ ('তিনি করেন') আকারে অভিন্ন। লিঙ্গানুসারে বাঙলায় ক্রিয়ারূপ ভিন্ন হয় না;—যেমন : 'সে (পুং/স্ত্রী) ক'রে। বচন-অনুসারেও বাঙলা ক্রিয়ারূপ ভিন্ন হয় না;—যেমন : 'আমি/আমরা করি'। বাঙলায় ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার পুরুষ+শ্রেণী (যেখানে প্রযোজ্য)-অনুসারে ভিন্ন হয়। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে 'বাঙলা ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার সাথে পুরুষ ও শ্রেণী (যেখানে প্রযোজ্য)-গত সঙ্গতি রক্ষা করে।'

কর্তা-ক্রিয়ারূপের উল্লিখিত সঙ্গতি কীভাবে সুষ্ঠু, সুস্পষ্ট, সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করা যায়? প্রথাগত ব্যাকরণে ক্রিয়ামূলগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন 'গণ'-এ, তালিকা দেয়া হয় 'ক্রিয়াবিভক্তি'গুলোর, এবং ক্রিয়ারূপ গঠনের একরকম অস্পষ্ট নিয়ম নির্দেশ করা হয়। বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়ারূপ সৃষ্টির সুস্পষ্ট সূত্র বেশ জটিল হ'তে বাধ্য(এ-উক্তি প্রযোজ্য সব ভাষার ক্ষেত্রেই)। এখন আমরা এমন একটি ব্যাকরণ চাই যা (৩৪) উপাত্তের কর্তা ও ক্রিয়ারূপের

সঙ্গতি নির্ভুলভাবে নির্দেশ করবে। কী-রকম ব্যাকরণের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে এ-সঙ্গতি? কর্তা-ক্রিয়ারূপের সঙ্গতি দেখানো যায় প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ-এর সাহায্যে, এবং প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ-এর সাহায্যে, এবং রূপান্তর ব্যাকরণ-এর সাহায্যে। এখানে প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ, ও প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ-এর সাহায্যে কীভাবে (৩৪)-এর উপাত্ত সৃষ্টি করা যায়, এবং সঙ্গতি-সূত্র নির্দেশ করা যায়, তাই বিবেচনা করা হবে। ব্যাকরণের সূত্ররচনার আগে যা বিবেচনা করা দরকার ভালোভাবে :

[ক] 'ক্রিয়ারূপ' বলতে কী বুঝছি আমরা? 'ক্রিয়ারূপ' বলতে বুঝছি 'ক্রিয়ামূল' ও 'ক্রিয়াসহায়ক'-এর মিলনে গঠিত ভাষাবস্তুকে। বাঙলা 'ক্রিয়ারূপ'কে সহজেই ভাগ করা যায় দু-ভাগে : একদিকে থাকে অপরিবর্তনীয় (এদের কখনো কখনো ঘটে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন) 'ক্রিয়ামূল', এবং অন্য দিকে থাকে এমন ভাষাবস্তু, যাকে সাময়িকভাবে নাম দেয়া হয়েছে 'ক্রিয়াসহায়ক' (প্রথাগত ব্যাকরণী নাম 'ক্রিয়াবিভক্তি', যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর)। 'করি', 'করছি', 'করেছি', 'করেন', 'করছেন' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপের নিদর্শন। এদের সহজেই ভাগ করা যায় দু-ভাগে';— যেমন : 'করি' = 'কর' + 'ই'; 'করছি' = 'কর' + 'ছি'; 'করেছি' = 'কর' + 'এছি'। এদের প্রথমাংশ, ক্রিয়ামূল, রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ ছাড়া বদলায় না; এবং দ্বিতীয়াংশ, ক্রিয়াসহায়ক, ('ই', 'ছি', 'এছি' প্রভৃতি), নিয়ত পরিবর্তমান।

[খ] 'ক্রিয়াসহায়ক' কী নির্দেশ করে? একটু মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে তিন রকম 'বোধ'—'কাল', 'ক্রিয়ারীতি' [আস্পেক্ট], ও 'পুরুষ+শ্রেণী'—নির্দেশ করে এ-আপাতঅবিশ্লেষ্য বস্তুরাশি। যেমন : 'করছি'র 'ছি' নির্দেশ করছে 'কাল' (বর্তমান), 'ঘটমান ক্রিয়ারীতি' (অর্থাৎ ক্রিয়াটি ঘটমান), এবং 'পুরুষ' (যিনি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করছেন, তিনি প্রথম পুরুষের)। কয়েকটি উদাহরণ:

করছেন = কর + বর্তমান...ঘটমান ... দ্বিতীয়/তৃতীয় পুরুষ, সম্মানাত্মক

করছো = কর+বর্তমান ... ঘটমান ... দ্বিতীয় পুরুষ, সাধারণ

করছিস = কর+বর্তমান... ঘটমান...দ্বিতীয় পুরুষ, হীন

করছে = কর+বর্তমান ... ঘটমান ... তৃতীয় পুরুষ, সাধারণ

দেখা যাচ্ছে যে 'ছি' নির্দেশ করে 'বর্তমান কাল, ঘটমানতা, ও প্রথম পুরুষ'; 'ছেন' নির্দেশ করে 'বর্তমান কাল, ঘটমানতা, ও দ্বিতীয়/তৃতীয় পুরুষ ও সম্মানাত্মক শ্রেণী' ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'ই', 'এন', 'ছি', 'ছেন' প্রভৃতি কি বিভাজ্য, না অবিভাজ্য? এগুলোকে কি আরো ভেঙে দেখানো সম্ভব এদের কোন অংশ নির্দেশ করে 'কাল', কোন অংশ নির্দেশ করে 'ক্রিয়ারীতি', এবং কোন অংশ নির্দেশ করে 'পুরুষ

(শ্রেণী)'? অনেকের কাছে মনে হ'তে পারে যে এগুলো অবিশ্লেষ্য। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে 'ই'-কে ('করি'='কর'+'ই') : এটি তো গঠিত ক্ষুদ্রতম ধ্বনিতে। এ-ক্ষীণ তনুকে আরো ভাঙা যায় কীভাবে? আর কীভাবেই বা দেখানো যায় এর কোন অঙ্গ পালন করছে কোন ভূমিকা?

বাঙলা 'ক্রিয়ারূপ' বিশ্লেষণ, বা সৃষ্টির জন্যে তিনটি পথ খোলা আছে ভাষাবিজ্ঞানীর সামনে :

(৩৫) [ক] তিনি মনে করতে পারেন যে বাঙলা ক্রিয়ারূপগুলো ('করি', 'করছি', 'করেছি', 'করেন', 'করছেন', 'করেছেন' প্রভৃতি) অবিশ্লেষ্য। ভাষাভাষীরা এগুলো শেখে স্বতন্ত্রভাবে;—তাই ব্যাকরণের কাজ হলো বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়ারূপের তালিকা রচনা করা, এবং কোন কর্তার সাথে কোন ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হ'তে পারে, তা নির্দেশ করা।

[খ] তিনি মনে করতে পারেন যে বাঙলা ক্রিয়ারূপগুলো বিশ্লেষ্য ('করি'='কর'+'ই', 'করছি'='কর'+'ছি' প্রভৃতি), তবে ক্রিয়াসহায়কগুলো ('ই', 'ছি', 'এছি' প্রভৃতি) অবিশ্লেষ্য। ক্রিয়াসহায়কগুলো একদেহে নির্দেশ করে 'কাল'ক্রিয়ারীতি-পুরুষ (শ্রেণী)'। তাই ব্যাকরণের কাজ হলো বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়াসহায়কের তালিকা প্রস্তুত করা, এবং কোন কর্তার সাথে কোন ক্রিয়াসহায়ক ব্যবহৃত হ'তে পারে, তা নির্দেশ করা।

[গ] তিনি মনে করতে পারেন যে বাঙলা ক্রিয়ারূপগুলো বিশ্লেষ্য, এবং ক্রিয়াসহায়কগুলোও বিশ্লেষ্য। তাই ব্যাকরণের কাজ হলো ক্রিয়াসহায়কগুলোকে বিশ্লেষণ করা, এবং ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কী নির্দেশ করে, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা।

সহজেই বোঝা যায় যে প্রথম সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত। বাঙলাভাষীরা প্রতিটি ক্রিয়ারূপকে পৃথকভাবে আয়ত্ত করে না। বাঙলা ক্রিয়ারূপ গঠনের রয়েছে আন্তর সূত্র, যার সাহায্যে বিচিত্র ক্রিয়ারূপ গঠন করা যায়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ করা যায় স্বাভাবিক ভাষাবোধসম্পন্ন বাঙলাভাষীর ক্রিয়ারূপসম্পর্কিত ধারণার প্রকাশ ব'লে। সাধারণ বাঙলাভাষীর কাছে ক্রিয়ারূপ বিশ্লেষণযোগ্য বস্তু; ক্রিয়াসহায়ক অবিশ্লেষ্য। ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কী নির্দেশ করে, তা বলা সাধারণ বাঙলাভাষীর পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি স্বাভাবিক ভাষাবোধসম্মত, এবং প্রথম সিদ্ধান্তের চেয়ে অনেক উন্নত। তৃতীয় সিদ্ধান্তটি সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী : এ-সিদ্ধান্ত সাধারণ ভাষাবোধকে অতিক্রম ক'রে গেছে। এ-সিদ্ধান্তটি সুগভীর ভাষাবোধের নিদর্শন। ভাষাবিজ্ঞানী যদি তাঁর এ-বোধকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, দেখিয়ে দিতে পারেন যে ক্রিয়াসহায়ক বিশ্লেষ্য, এবং ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কী নির্দেশ করে, তা যদি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, তবে তাঁর ব্যাকরণই হবে উৎকৃষ্টতম।

(৩৫ক)র সিদ্ধান্তকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে শুধু প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে। এ-ব্যাকরণে থাকবে না কোনো প্রতিবেশকাতর সূত্র, এর সমস্ত সূত্র প্রতিবেশমুক্ত। (৩৫ক)র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (৩৪) উপাত্তের প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ হবে (৩৬) :

(৩৬) প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ [এক]

ক বাক্য →
{
বিপ-প্রপু + ক্রিরূ-প্রপু
বিপ-দ্বিপু-সম্মান + ক্রিরূ-দ্বিপু-সম্মান
বিপ-দ্বিপু-সাধারণ + ক্রিরূ-দ্বিপু-সাধারণ
বিপ-দ্বিপু-হীন + ক্রিরূ-দ্বিপু-হীন
বিপ-তৃপু-সম্মান + ক্রিরূ-তৃপু-সম্মান
বিপ-তৃপু-সাধারণ + ক্রিরূ-তৃপু-সাধারণ
}

খ	বিপ-প্রপু	→	আমি, আমরা
গ	বিপ-দ্বিপু-সম্মান	→	আপনি, আপনারা
ঘ	বিপ-দ্বিপু-সাধারণ	→	তুমি, তোমরা
ঙ	বিপ-দ্বিপু-হীন	→	তুই, তোরা
চ	বিপ-তৃপু-সম্মান	→	তিনি, তাঁরা
ছ	বিপ-তৃপু-সাধারণ	→	সে, তারা
জ	ক্রিরূ-প্রপু	→	করি, করছি, করেছি,...
ঝ	{ক্রিরূ-দিপু-সম্মান / ক্রিরূপ-তৃপু-সম্মান}	→	করেন, করছেন, করেছেন,...
ঞ	কিরূ-দ্বিপু-সাধারণ	→	করো, করছো, করেছো,...
ট	ক্রিরূ-দ্বিপু-হীন	→	করিস, করছিস, করেছিস,...
ঠ	ক্রিরূ-তৃপু-সাধারণ	→	করে, করছে, করেছে,...

[সংক্ষেপসূত্র : বিপ-প্রপু : বিশেষ্যপদ-প্রথম পুরুষ; বিপ-দ্বিপু-সম্মান : বিশেষ্যপদ-দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মানাত্মক; বিপ-দ্বিপু-সাধারণ : বিশেষ্যপদ-দ্বিতীয় পুরুষ-সাধারণ প্রভৃতি; ক্রিরূ-প্রপু : ক্রিয়ারূপ-প্রথম পুরুষ; ক্রিরূ-দ্বিপু-সম্মান : ক্রিয়ারূপ-দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মানাত্মক; ক্রিরূ-দ্বিপু-সাধারণ : ক্রিয়ারূপ-দ্বিতীয় পুরুষ-সাধারণ প্রভৃতি।

(৩৫ক)র সিদ্ধান্ত অনুসারে রচিত (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি (৩৪) উপাত্তের সমস্ত বাক্য নির্ভুলভাবে সৃষ্টি করবে। তবে উপাত্তবহির্ভূত কোনো বাক্য এ-ব্যাকরণ সৃষ্টি করবে না; অর্থাৎ এ-ব্যাকরণটি, সৃষ্টিশীল নয়, বর্ণনামূলক। (৩৬)-এর ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের যে-পদসাংগঠনিক বর্ণনা দেবে, তা দেখা যাবে (৩৭) পদচিত্রে :

(৩৭)
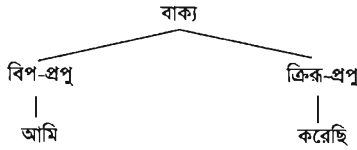
(৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি মর্মমূলে ত্রুটিপূর্ণ : এটি রচিত হয়েছে ভ্রান্ত বিশ্লেষণ ভিত্তি ক'রে। (৩৬ক) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে বাঙলায় ছ-রকম বাক্যসংগঠন রয়েছে, এবং তারা পরস্পরসম্পর্কশূন্য। এ-ব্যাকরণ অনুসারে বাঙলা ভাষার প্রতিটি বাক্য পুরুষ(শ্রেণী) ভিত্তিতে ছ-ভাগে বিভক্ত; আবার বিশেষ্যপদ ও ক্রিয়াপদসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত পুরুষ(শ্রেণী)-অনুসারে। এ-বিশ্লেষণ ভ্রান্ত। এটির মতে বাঙলা ক্রিয়ারূপগুলো অবিভাজ্য : ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়কের সমবায়ে ক্রিয়ারূপ গঠনের কোনো উপায় নেই বাঙলায়। (৩৬)-এর ব্যাকরণটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে বাঙলাভাষীরা বাঙলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়ারূপ পৃথক ও অবিভাজ্য শব্দ রূপে আয়ত্ত ক'রে থাকে। এ-ধারণাও ভ্রান্ত। বাঙলা বিশেষ্য ও সর্বনাম বচনভেদে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু এ-ব্যাকরণ বচনভেদ স্বীকার করে না। এ-ব্যাকরণে 'আমি/আমরা', 'তুমি/তোমরা'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (৩৬) ব্যাকরণটি (৩৪) উপাত্তের বিভিন্ন ভাষাবস্তুর তালিকামাত্র, যাতে বিভিন্ন ভাষাবস্তুর সহাবস্থানের সূত্র রচনা করা হয়েছে। ব্যাকরণটি অবশ্য (৩৪) উপাত্তের বাক্যগুলো নির্ভুলভাবে সৃষ্টি করে, তাই এটি অর্জন করেছে পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা (দ্র § ৪.২.৪)। কিন্তু ভাষাবোধবিরোধী প্রক্রিয়ায় বাক্য সৃষ্টি করে ব'লে এটি অত্যন্ত দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যাকরণ।

এবার (৩৫খ) সিদ্ধান্ত অনুসারে (৩৪) উপাত্তের বাক্যরাশি সৃষ্টির জন্যে একটি পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনা করা যাক। (৩৫খ) সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাঙলা ক্রিয়ারূপ দু-অংশে—ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়ক—বিভাজ্য। ক্রিয়াসহায়ক অবিভাজ্য : তা অভগ্নরূপে যুগপৎ বহন করে কাল-ক্রিয়ারীতি-পুরুষ(শ্রেণী)। (৩৫খ)র একটি চমৎকার বোধ হচ্ছে যে ক্রিয়াসহায়কের ব্যবহার নির্ভরশীল বাক্যের কর্তার ওপর : বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদ যে-পুরুষ(শ্রেণী)র ক্রিয়াসহায়কও হবে সে-পুরুষ(শ্রেণী)র। অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়াসহায়কের নিয়ন্ত্রক। (৩৫খ) সিদ্ধান্ত

নির্দেশ করছে যে বাঙলা ক্রিয়ারূপ কর্তার সাথে পুরুষ(শ্রেণী)-গত 'সঙ্গতি' রক্ষা করে। আরো যথাযথভাবে বলতে পারি যে সম্পূর্ণ ক্রিয়ারূপটি কর্তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে না, কর্তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে শুধু ক্রিয়াসহায়কটি। এ-সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়ারূপের বা ক্রিয়াসহায়কের ব্যবহার কর্তার ওপর নির্ভরশীল ব'লে দরকার হবে প্রতিবেশকাতর সূত্র : এ-বোধ প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ-বোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে চাই প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ। এ-ব্যাকরণটি (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণটি থেকে আন্তর গুণেই উৎকৃষ্ট, কেননা এতে যে-বোধ প্রকাশিত, তা অনেক গভীর ও বাঙলাভাষীর বোধিসম্মত। (৩৫খ) সিদ্ধান্ত অনুসারে (৩৪)-এর উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে দরকার হবে (৩৮)-এর প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ [এক] :

(৩৮) প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ [এক]

ক বাক্য → বিপ+ক্রিপ

খ ক্রিপ → ক্রিরূ

গ ক্রিরূ → ক্রিমূ+ক্রিস

ঘ বিপ → { বিপ-প্রপু / বিপ-দ্বিপু-সম্মান / বিপ-দ্বিপু-সাধারণ / বিপ-দ্বিপু-হীন / বিপ-তৃপু-সম্মান / বিপ-তৃপু-সাধারণ }

ঙ বিপ-প্রপু → আমি, আমরা

চ বিপ-দ্বিপু-সম্মান → আপনি, আপনারা

ছ বিপ-দ্বিপু-সাধারণ → তুমি, তোমরা

জ বিপ-দ্বিপু-হীন → তুই, তোরা

ঝ বিপ-তৃপু-সম্মান → তিনি, তাঁরা

ঞ বিপ-তৃপু-সাধারণ → সে, তারা

ট ক্রিমূ → কর

(৩৮)একটি প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ, কেননা এতে একটি প্রতিবেশকাতর সূত্র, (৩৮ঠ), ব্যবহৃত। (৩৪) উপাত্তের সমস্ত বাক্য সৃষ্ট হবে এটির সূত্র প্রয়োগে, এবং (৩৮ট) সূত্রে যদি সন্নিবিষ্ট হয় আরো ক্রিয়ামূল, তবে এটি উপাত্তবহির্ভূত প্রচুর বাক্য সৃষ্টি করবে। নানা দিকে (৩৮) ব্যাকরণটি উৎকৃষ্টতর (৩৬) ব্যাকরণ থেকে। এ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্রটি, (৩৮ক), উপাত্তের সমস্ত বাক্যের জন্যে নির্দেশ করছে মাত্র একটি মৌল সংগঠন—বিপ +ক্রিপ—অর্থাৎ (৩৪) উপাত্তের সমস্ত বাক্যের সংগঠন অভিন্ন। (৩৬)-এর ব্যাকরণটি যেখানে দেখিয়েছিলো ছ-রকম সংগঠন, সেখানে এটি দেখাচ্ছে এক রকম সংগঠন। আগের ব্যাকরণের মতে যে-সমস্ত বাক্য সম্পর্কশূন্য, এ-ব্যাকরণের মতে সে-সমস্ত বাক্য সংগঠনগতভাবে অভিন্ন। (৩৮)-এর বোধ উৎকৃষ্ট ভাষাবোধের নিদর্শন, তাই এটি (৩৬) থেকে উৎকৃষ্টতর। (৩৮) ব্যাকরণের (৩৮ঘ) সূত্রটি বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদগুলোকে, পুরুষ (শ্রেণী) অনুসারে, ভাগ করেছে ছটি শ্রেণীতে; অর্থাৎ বাঙলায় বিশেষ্যপদ তাৎপর্যপূর্ণ ছ-শ্রেণীভুক্ত। (৩৮গ) সূত্রটি ক্রিয়ারূপকে ভাগ করেছে দু-অংশে : 'ক্রিমূ', 'ক্রিস' অংশে। (৩৮) ব্যাকরণটি বড়ো সাফল্য হচ্ছে এটি ক্রিয়াসহায়কগুলোকে কর্তা-বিশেষ্যপদের পুরুষ(শ্রেণী)র ওপর নির্ভরশীল ব'লে নির্দেশ করেছে। (৩৮ঠ) সূত্রটি লক্ষণীয় : এ-সূত্রটি ক্রিয়াসহায়ককে কোন

প্রতিবেশে কী-রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে, তা সুস্পষ্টভবে নির্দেশ করছে। সূত্রটিতে একত্রিত হয়েছে অনেকগুলো বিকল্পসূত্র। সূত্রটি নির্দেশ করছে যে ক্রিয়াসহায়কের বাঁ দিকে যদি থাকে প্রথম পুরুষসূচক বিশেষ্যপদ (অর্থাৎ কর্তা-বিশেষ্যপদটি যদি প্রথম পুরুষ হয়) তবে ক্রিয়াসহায়কের রূপ হবে 'ই', বা 'ছি', বা 'এছি'; যদি ক্রিয়াসহায়কের বাঁ দিকে থাকে সম্মানাত্মক দ্বিতীয়, বা তৃতীয় পুরুষসূচক বিশেষ্যপদ, তবে ক্রিয়াসহায়কের রূপ হবে 'এন', বা 'ছেন', বা 'এছেন' ইত্যাদি (৩৮) ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের (৩৯)-রূপী সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে :

(৩৯)
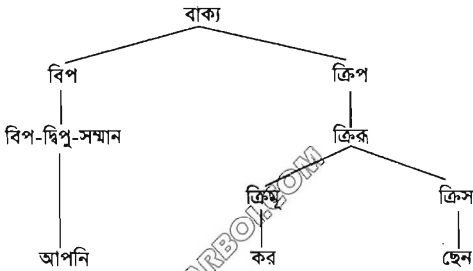
(৩৯) এর অন্ত্যগ্রন্থির ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'আপনি করছেন' বাক্যটি। অন্যান্য সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যাবে (৩৪) উপাত্তের অন্যান্য বাক্য। (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণ, ও (৩৮)-এর প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণ একই উপাত্ত সৃষ্টি করে; তাই ব্যাকরণ দুটি দুর্বলভাবে সমতুল্য (দ্র § ৪.২.৫)। কিন্তু (৩৭), ও (৩৯)-এর তুলনা ক'রে বোঝা যায় যে এরা সৃষ্ট বাক্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়; অর্থাৎ এরা শক্তিমানভাবে সমতুল্য নয়। এদের সৃষ্টিশক্তি ভিন্ন। ব্যাকরণ মূল্যায়নের মানদণ্ড প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে (৩৮) ব্যাকরণটি (৩৬) থেকে অনেক উন্নত (দ্র § ৪.২.৫)। (৩৬)-এর পদসাংগঠনিক প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে বাঙলাভাষীরা পুরুষ(শ্রেণী)-অনুসারে বাঙলা বাক্যের শ্রেণীকরণ ক'রে থাকে, এবং বিশেষ্যপদগুলোকেও শ্রেণীবিন্যস্ত ক'রে থাকে পুরুষ(শ্রেণী)-অনুসারে (দ্র ৩৬ক, ৩৬খ—ছ)। ব্যাকরণটি এ-দাবি ভাষাবোধবিরোধী, ও ভ্রান্ত। (৩৮)-এর প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণটি পুরুষ(শ্রেণী)কে সমগ্র বাক্যের নয়, বিশেষ্যপদের বৈশিষ্ট্য ব'লে নির্দেশ করেছে (৩৮ঘ) সূত্রে, এবং (৩৮ঠ) সূত্রে নির্দেশ করেছে যে 'সঙ্গতি' বোধটি নির্ভরশীল বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের পুরুষ(শ্রেণী)র ওপর। ব্যাকরণটি সঙ্গতিবিষয়ক এ-ব্যাখ্যা ভাষাবোধসম্মত, সুতরাং মূল্যবান। এ-সব কারণে (৩৮)-এর প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণটি (৩৬)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণটির চেয়ে অনেক বেশি বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন

(দ্র § ৪.২.৪; § ৪.২.৫)। সুতরাং (৩৬) পরিত্যাজ্য, এবং (৩৮) গ্রহণযোগ্য। তবে এটিও ত্রুটিমুক্ত নয়। এটিতে বিশেষ্যপদের বচনগত ভেদ নির্দেশ করা হয়নি, সঙ্গতি সূত্রটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নি, এবং ক্রিয়াসহায়ক কী-কী বোধ প্রকাশ করে, তাও নির্দেশ করা হয় নি। প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণ যে সর্বদাই প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণের চেয়ে উৎকৃষ্ট, তা নয়। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক সূত্র সাধারণত পরিহার করা হয়, এবং প্রতিবেশকাতর সূত্রের দায়িত্ব পালনে নিয়োগ করা হয় রূপান্তর সূত্র। ব্যাকরণের 'ভিত্তিকক্ষ'কে রাখা হয় যথাসম্ভব 'সাধারণ' বা প্রতিবেশকাতর সূত্রমুক্ত। সঙ্গতি সূত্র প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে রূপান্তর সূত্রের ব্যবহার।

(৩৫গ)র সিদ্ধান্তকেও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে শুধু প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে। (৩৫গ)র সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বাঙলা ক্রিয়ারূপ দু-অংশে— ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়ক— বিভক্ত; এবং ক্রিয়াসহায়ক বিভক্ত তিন অংশে : 'ক্রিয়ারীতি', 'কাল', ও 'পুরুষ'(শ্রেণী)' এ-তিন অংশে। এর মধ্যে 'পুরুষ(শ্রেণী)' অংশ নির্দেশ করে বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের সাথে 'পুরুষ(শ্রেণী)'-গত সঙ্গতি'। অর্থাৎ ক্রিয়ারূপের দ্বিতীয়াংশ ক্রিয়াসহায়কের 'পুরুষ(শ্রেণী)' হয় কর্তা-বিশেষ্যপদের 'পুরুষ(শ্রেণী)র অনুরূপ। (৩৫গ) সিদ্ধান্ত ক্রিয়াসহায়ককে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতে অভিলাষী; এবং ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশ কী-ভূমিকা পালন করে, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে উৎসাহী। ক্রিয়াসহায়কের দ্বিতীয়াংশ নির্দেশ করে 'কাল' (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি), প্রথমাংশ নির্দেশ করে 'ক্রিয়ারীতি' (সরল, ঘটমান, ঘটিত প্রভৃতি), এবং তৃতীয়াংশ নির্দেশ করে বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের সাথে 'পুরুষ(শ্রেণী)'-গত সঙ্গতি। অর্থাৎ ক্রিয়াসহায়ক বিভক্ত তিনখণ্ডে। এবার (৩৫গ)র সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ, (৪০), রচনা করা যাকে :

(৪০) প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ [দুই]

ক	বাক্য	→	বিপ+ক্রিপ
খ	ক্রিপ	→	কিরূ
গ	ক্রিরূ	→	ক্রিমূ+ক্রিস
ঘ	বিপ	→	বি
ঙ	বি	→	পু(রুষ)
চ	পু	→	{প্রপু, দ্বিপু, তৃপু}

ছ	দ্বিপু	→	{দ্বিপু-সম্মান, দ্বিপু-সাধারণ, দ্বিপু-হীন}
জ	তৃপু	→	{তৃপু-সম্মান, তৃপু-সাধারণ}
ঝ	ক্রিস	→	ক্রিরী+কাল+সঙ্গতি
ঞ	কাল	→	বর্তমান
ট	ক্রিরী	→	{সরল, ঘটমান, ঘটিত}
ঠ	সঙ্গতি	→	সঙ্গতি পু(শ্রেঞ)/পু(শ্রেঞ)—
ড	প্রপু	→	আমি, আমরা
ঢ	দ্বিপু-সম্মান	→	আপনি, আপনারা
ণ	দ্বিপু-সাধারণ	→	তুমি, তোমরা
ত	দ্বিপু-হীন	→	তুই, তোরা
দ	তৃপু-সম্মান	→	তিনি, তাঁরা
ধ	তৃপু-সাধারণ	→	সে, তারা
ন	ক্রিমূ	→	কর
প	বর্তমান	→	φ
ফ	সরল	→	φ
ব	ঘটমান	→	ছ
ভ	ঘটিত	→	এছ
ম	সঙ্গতি-প্রপু	→	ই
য	{সঙ্গতি-দ্বিপু-সম্মান, সঙ্গতি-তৃপু-সম্মান}	→	এন
র	সঙ্গতি-দ্বিপু-সাধারণ	→	ও
ল	সঙ্গতি-দ্বিপু-হীন	→	ইস
শ	সঙ্গতি-তৃপু-সাধারণ	→	এ

(৪০)-এর প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি (৩৪) উপাত্তের সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করবে। এটির (৪০নং) সূত্রে যদি সরবরাহ করা হয় আরো কিছু ক্রিয়ামূল, তবে এটির সৃষ্টিক্ষমতা বেড়ে যাবে বহুগুণে, এবং সৃষ্টি করবে উপাত্তবহির্ভূত প্রচুর বাক্য। (৪০)-এর ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যরাশির যে-সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে, তা (৩৬), ও (৩৮)-এর ব্যাকরণের থেকে ভিন্ন, ও উন্নত। প্রথমে (৪০)-এর সূত্রগুলো পর্যালোচনা করা যাক। (৪০ক) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে (৩৪) উপাত্তের, এবং বাঙলা ভাষার, সমস্ত বাক্যের মৌল সংগঠন হচ্ছে 'বিপ+ক্রিপ'। (৪০খ) 'ক্রিপ'কে সম্প্রসারিত করেছে 'ক্রিরূ'রূপে; এবং (৪০গ) 'ক্রিরূ'কে সম্প্রসারিত করেছে দুটি—'ক্রিমূ', ও 'ক্রিস'-অংশে। (৪০ঘ) 'বিপ'কে সম্প্রসারিত করেছে 'বি'-রূপে, এবং (৪০ঙ) 'বি'কে সম্প্রসারিত করেছে 'পু(রুষ)'-রূপে। (৪০চ) নির্দেশ করছে যে বাঙলায় পুরুষ তিন প্রকার : প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, ও তৃতীয় পুরুষ। (৪০ছ, জ) সূত্রে দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পুরুষকে যথাক্রমে তিনটি, ও দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। লক্ষণীয় যে প্রথম পুরুষকে কোনো 'শ্রেণী'তে ভাগ করা হয়নি; কেননা বাঙলায় প্রথম পুরুষ শ্রেণীনিরপেক্ষ। (৪০ঝ) সূত্রটি 'ক্রিস'কে ভাগ করেছে তিনটি ক্রমবিন্যস্ত খণ্ডে : 'ক্রিরী+কাল+সঙ্গতি'। সূত্রটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে বাঙলা ক্রিয়াসহায়ক তিন অংশে বিভক্ত : এর প্রথমাংশ নির্দেশ করে 'ক্রিয়ারীতি', দ্বিতীয়াংশ নির্দেশ করে 'কাল', এবং তৃতীয়াংশ নির্দেশ করে কর্তার সাথে 'সঙ্গতি'। (৪০ঞ) সূত্রটি 'কাল'কে সম্প্রসারিত করেছে শুধু 'বর্তমান' রূপে। (৩৪)-এর উপাত্তে একটিমাত্র কালের পরিচয় রয়েছে; কিন্তু সমগ্র বাঙলা ভাষা উপাত্তরূপে গ্রহণ করলে 'কাল'কে, সম্ভবত, চার রকমে (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, নিত্য-অতীত) সম্প্রসারণ করতে হবে। (৪০ঞ) সূত্রটি উপাত্তকে অতিক্রম করে নি। (৪০ট) সূত্রটি 'ক্রিরী'কে সম্প্রসারিত করেছে তিন রকমে : 'সরল', 'ঘটমান', ও 'ঘটিত' রূপে। সূত্রটি নির্দেশ করছে যে তিন রীতিতে বাঙলায় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (৪০ঠ) সূত্রটি অভিনব, এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এটি কর্তার সাথে ক্রিয়াসহায়কের সঙ্গতিবিধি নির্দেশ করছে। (৪০ঠ) সূত্রটি একটি 'স্কিমা' : এতে অসংখ্য সূত্র প্রকাশ করা হয়েছে একসূত্রে। সূত্রটির নির্দেশ : 'সঙ্গতি বাঁ দিকের বিশেষ্যপদের (অর্থাৎ কর্তার) যে-পুরুষ (শ্রেণী), 'সঙ্গতির'র ও তা-ই হবে 'পুরুষ (শ্রেণী)'। অর্থাৎ কর্তা-বিশেষ্যপদের পুরুষ(শ্রেণী) যদি হয় 'ঞ', তবে সঙ্গতির পুরুষ(শ্রেণী)ও হবে 'ঞ'। অর্থাৎ পুরুষ যদি হয় 'প্রথম', তবে সঙ্গতির পুরুষও হবে 'প্রথম' (প্রথম পুরুষের কোনো শ্রেণী নেই), বা কর্তার পুরুষ যদি হয় 'দ্বিতীয়', এবং শ্রেণী যদি হয় 'সম্মান', তবে সঙ্গতি পুরুষ(শ্রেণী) হবে 'দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মান' ইত্যাদি। (৪০ঠ) সূত্রটি যদিও বাস্তবে ছটি সূত্রকে প্রকাশ করেছে একসূত্রে, তবে প্রকৃতিতে এটি একসূত্রে প্রকাশ করেছে অসংখ্য সূত্র। যদি বাঙলায় 'পুরুষ'-এর সংখ্যা হতো দশ কোটি, এবং 'শ্রেণী'র সংখ্যা হতো পনেরো কোটি, তবে তাদের তালিকা করা অসম্ভব হতো : কিন্তু এ-সূত্রটি নির্ভুলভাবে নির্দেশ করতো সঙ্গতিবিধি। (৪০ড-ন) সূত্রগুলো বেশ সরল; এ-সূত্ররাশি বিভিন্ন ক্যাটেগরির অন্ত্যউপাদান

নির্দেশ করছে। (৪০প-শ) সূত্ররাশিও বেশ সরল, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-সূত্রসমূহ সাধারণ ভাষাভাষীর ভাষাবোধের চেয়ে অনেক গভীর বোধের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। এ-সূত্ররাশি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে ক্রিয়াসহায়কের কোন অংশের কী রূপ। (৪০প) নির্দেশ করছে যে 'বর্তমান' কালের জন্যে বাঙলায় কোনো ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয় না, বা 'শূন্য' ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয়। (৪০ফ) নির্দেশ করছে যে 'সরল' ক্রিয়ারীতিও নির্দেশিত হয় 'শূন্য' ভাষাবস্তুর সাহায্যে : অর্থাৎ 'সরল' ক্রিয়ারীতি নির্দেশের জন্যে কোনো ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয় না। (৪০ব, ভ) নির্দেশ করছে যে 'ঘটমান', ও 'ঘটিত' ক্রিয়ারীতির জন্যে, যথাক্রমে, ব্যবহৃত হয় 'ছ', এবং 'এছ'। (৪০ম-শ) নির্দেশ করছে সঙ্গতির জন্যে কী ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হয় বাঙলায়। (৪০য) নির্দেশ করছে যে দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মান, ও তৃতীয় পুরুষ-সম্মান শ্রেণীর জন্যে ব্যবহৃত হয় 'এন'; (৪০র) নির্দেশ করছে যে দ্বিতীয় পুরুষ-সাধারণ কর্তার সাথে সঙ্গতির জন্যে ব্যবহৃত হয় 'ও'; (৪০ম) নির্দেশ করছে যে প্রথম পুরুষসূচক কর্তার সাথে সঙ্গতির জন্যে ব্যবহৃত হয় 'ই'; (৪০ল) নির্দেশ করছে যে দ্বিতীয় পুরুষ-হীন কর্তার সাথে সঙ্গতির জন্যে বসে 'ইস'; এবং (৪০শ) নির্দেশ করছে যে তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ কর্তার সাথে সঙ্গতির জন্যে ব্যবহৃত হয় 'এ'। এ-ব্যাকরণটি ক্রিয়াসহায়কের তিন অংশের ভূমিকা, ও রূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশ করে। (৪০)-এর প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের নিম্নরূপ সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে :

(৪১)
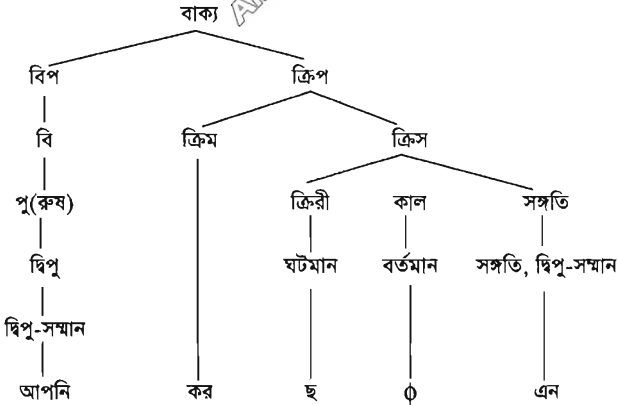
(৪১-এর অন্তগ্রন্থি # আপনি + কর + ছ + + এন # -এর ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'আপনি করছেন' বাক্যটি। (৪০)-এর অন্যান্য সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যাবে (৩৪) উপাত্তের অন্যান্য বাক্য।

(৩৬, ৩৮, ৪০)-এর ব্যাকরণ তিনটি, যেহেতু অভিন্ন উপাত্ত সৃষ্টি করে, দুর্বলভাবে সমতুল্য; কিন্তু এরা সৃষ্ট বাক্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় ব'লে শক্তিমানভাবে সমতুল্য নয়। (৩৭, ৩৯, ৪১)-এর পদচিত্রগুলোর তুলনা করলে বোঝা যায় যে (৩৭)-এর সাংগঠনিক বর্ণনা ভাষাবোধবিরোধী, ও ভ্রান্ত; (৩৯)-এর সাংগঠনিক বর্ণনা স্বাভাবিক ভাষাবোধসম্মত, ও (৩৭)-এর বর্ণনার চেয়ে উন্নত; এবং (৪১)-এর সাংগঠনিক বর্ণনা সুগভীর ভাষাবোধের নিদর্শন, এবং উৎকৃষ্টতম। (৪০)-এর প্রতিবেশকাতর ব্যাকরণটি (৩৪) উপাত্তের বাক্যরাশি সৃষ্টির সাথে সাথে দিয়েছে বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক বর্ণনা, যাতে অনেক আপাতঅদৃশ্য ক্যাটেগরি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। (৩৬, ৩৮, ৪০)-এর মধ্যে তৃতীয়টি শ্রেষ্ঠ। তবে এটি (৩৪)-এর উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ নয়। এ-ব্যাকরণেরও রয়েছে নানা ত্রুটি। সঙ্গতিসূত্র উদঘাটনের জন্যে পদসাংগঠনিক সূত্র বিশেষ উপযুক্ত নয়; এর জন্যে দরকার রূপান্তর সূত্র।

৪.৪.২ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনার কৌশল

কোনো উপাত্তের ব্যাকরণ আবিষ্কারের কোনো স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রণালি নেই। বিশ্লেষকের কাছে উপাত্তের আন্তর শৃঙ্খলা যেভাবে ধরা দেয়, সেভাবেই তিনি রচনা করেন সূত্রাবলি, অর্থাৎ ব্যাকরণ। যাঁর দৃষ্টি যতো গভীর ও ব্যাপক, তাঁর রচিত ব্যাকরণও ততোই গভীর ও ব্যাপক। একই উপাত্তের শৃঙ্খলা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হ'তে পারে, তাই রচিত হ'তে পারে একই উপাত্তের বিভিন্ন ব্যাকরণ। কোনো উপাত্তের ব্যাকরণ হচ্ছে ওই উপাত্ত সম্পর্কে বিশ্লেষকের তত্ত্ব; তাই তাঁর তত্ত্ব যতো উন্নত হবে, ব্যাকরণও হবে তেমনি উন্নত। ব্যাকরণ আবিষ্কার প্রণালি যান্ত্রিক নয়; তবে ব্যাকরণ রচনার সহায়ক কিছু প্রণালিপদ্ধতি, যার সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষক প্রকাশ করেন তাঁর ধারণা, রয়েছে। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনার রয়েছে সহায়ক কিছু প্রণালি। ব্যাকরণ রচনার দুটি দিক : (ক) তত্ত্বগত দিক, ও (খ) প্রণালিপদ্ধতিগত দিক। প্রথম দিকে ভিন্নতা ঘটতে পারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে; কিন্তু প্রণালিপদ্ধতিগত দিকে ব্যক্তিভেদে ভিন্নতা ঘটে না।

ব্যাকরণ রচনার জন্যে প্রথমে দরকার উপাত্ত। উপাত্তে থাকা দরকার উপাত্ত-ভাষার বিচিত্র ব্যাকরণসম্মত বাক্য, এবং বিচিত্র ব্যাকরণবিরোধী বাক্য। যদি কোনো ভাষার বিচিত্র ব্যাকরণসম্মত বাক্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, তবে ওই উপাত্ত নির্ভর ক'রেও রচনা করা সম্ভব মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাকরণ। কোনো উপাত্তের পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনার জন্যে নিম্নলিখিত কৌশলরাশির সাহায্য নেয়া যেতে পারে (দ্র কৌটসৌডাস) (১৯৬৬, ৪২) :

[ক] প্রথমে শনাক্ত করতে হবে উপাত্ত-বাক্যের রূপমূলসমূহ, এবং রচনা করতে হবে, প্রয়োজনবোধে, অর্থসহ রূপমূল-তালিকা। প্রতিটি রূপমূলকে ফেলতে হবে কোনো-না-কোনো 'পদ-শ্রেণী'তে : যেমন— বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি।

[খ] উপাত্ত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে স্থির করতে হবে কোন শ্রেণীর পদ হ'তে পারে কর্তা, কর্ম, বা বিশেষ্যপদ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন শ্রেণীর পদ বাক্যে কী ভূমিকা পালন করে, তা স্থির করতে হবে। বিভিন্ন পদকে, ভূমিকা অনুসারে, দিতে হবে নাম। এর পরে নির্ণয় করতে হবে বাক্য-শ্রেণী। উপাত্তে কতো রকম সংগঠনের বাক্য রয়েছে, তা স্থির করতে হবে। মনে করা যাক, কিছু বাক্য রয়েছে, যাদের সংগঠন হচ্ছে 'বিপ+ক্রিরূ' : এদের ফেলতে হবে এক শ্রেণীতে; আবার কিছু বাক্য রয়েছে, যাদের সংগঠন 'বিপ+বিপ+ক্রিরূ' : এদের ফেলতে হবে অন্য শ্রেণীতে। এ-ভাবে শনাক্ত করতে হবে উপাত্তের সমস্ত বাক্যের সংগঠন-শ্রেণী।

[গ] বাক্য-শ্রেণী নির্ণয়ের পরে দেখতে হবে কোন শ্রেণীর বাক্যে কোন কোন পদ-শ্রেণী ব্যবহৃত হয়। এজন্যে প্রতিটি শ্রেণীর বাক্যসমূহকে দীর্ঘতম থেকে ক্ষুদ্রতম ক্রমে সাজাতে হবে, এবং দেখতে হবে বাক্যের কোন স্থানে কোন পদ-শ্রেণী বসে। পদসমূহকে স্তম্ভরূপে সাজাতে হবে, এবং একই রকম পদ-শ্রেণীসমূহকে বিন্যস্ত করতে হবে একই স্তম্ভে।

[ঘ] লক্ষ্য করতে হবে বাক্যে কোন উপাদান 'আবশ্যিক', এবং কোন উপাদান 'ঐচ্ছিক'। বাক্যে উপাদানসমূহের সহাবস্থানের আর কোনো বিধিনিষেধ রয়েছে কি-না, তাও দেখতে হবে।

[ঙ] বাক্যের বিভিন্ন উপাদান মিলে কীভাবে বাক্যিক ক্যাটেগরি রচনা করে, তা দেখতে হবে। যেমন : 'নির্দেশক+বিশেষ্য' গঠন করতে পারে 'বিপ'; আবার শুধু 'ক্রিরূ'ই গঠন করতে পারে 'ক্রিপ'; আবার 'বিপ+ক্রিরূ' গঠন করতে পারে 'ক্রিপ' ইত্যাদি।

[চ] বাক্য-শ্রেণীগুলোর তুলনা ক'রে সেগুলোর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে হবে।

[ছ] এবার রচনা করতে হবে সূত্র, এবং দেখতে হবে সূত্রগুলো কেমন পদচিত্র রচনা করে।

[জ] সবশেষে পরখ করতে হবে সূত্রগুলো নির্ভুল উপাত্ত সৃষ্টি করে কি-না। যদি করে, তবে চমৎকার; নইলে সংশোধন করতে হবে সূত্ররাশি।

মনে করা যাক, আমাদের রয়েছে মাত্র তিনটি বাক্যের উপাত্ত, (৪২); আমাদের এ-উপাত্তের জন্যে একটি পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ রচনা করতে হবে।

(৪২) ক একটি মেয়ে একটি বই পড়ছে।

খ একটি ছেলে আসছে।

গ সে নাচছে।

(৪২) উপাত্তের বাক্য তিনটি সৃষ্টির জন্যে রচনা করতে হবে একটি পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ। সূত্র এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে (৪২)-এর বাক্য তিনটি নির্ভুলভাবে গঠিত হয়। ওপরে আলোচিত প্রণালিসমূহ অনুসরণে :

(৪৩) [ক] প্রথমে শনাক্ত করতে হবে (৪২)-এর বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত রূপমূলগুলো, এবং নির্দেশ করতে হবে, নিম্নরূপে, তাদের পদ-শ্রেণী :

রূপমূল	পদ-শ্রেণী
মেয়ে	বিশেষ্য (মনুষ্যবাচক)
বই	বিশেষ্য (অপ্রাণীবাচক)
ছেলে	বিশেষ্য (মনুষ্যবাচক)
সে	বিশেষ্য : সর্বনাম (মনুষ্যবাচক)
পড়	ক্রিয়ামূল
আস	ক্রিয়ামূল
নাচ	ক্রিয়ামূল
এক	সংখ্যা
টি	অনুসর্গ
ছে	ক্রিয়াসহায়ক

[খ] ৪২)-এর তিনটি বাক্যকে প্রথমে ফেলা যায় দু-শ্রেণীতে : (৪২ক) বাক্যটির সংগঠন হচ্ছে *কর্তা + কর্ম + ক্রিরূ*; এবং (৪২খ, গ)র সংগঠন হচ্ছে *কর্তা + ক্রিরূ*।

[গ] ক-শ্রেণীর বাক্য / খ-শ্রেণীর বাক্য

কর্তা	কর্ম	ক্রিরূ	কর্তা	ক্রিরূ
সং+অনু+বি	সং+অনু+বি	ক্রিমূ+ক্রিস	সং+অনু+বি	ক্রিমূ+ক্রিস
			বি	ক্রিমূ+ক্রিস

(৪২ক) বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদ গঠিত একটি সংখ্যাসূচক শব্দ ও একটি অনুসর্গ ও একটি বিশেষ্য। এর মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ ও অনুসর্গটি গঠন করে একটি উপাদান : এর নাম দেয়া যাক *নি*(র্দেশক)। এ-নির্দেশক ও বিশেষ্য মিলে গঠন করে বিশেষ্যপদ (*বিপ*)। তাই কর্তা-বিশেষ্যপদের সংগঠন হচ্ছে *নি+বি*। কর্ম-বিশেষ্যপদের সংগঠনও একই রকম। (৪২খ) বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের সংগঠনও অনুরূপ। (৪২গ) বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদটি একটি সর্বনাম : এটিকেও ধ'রে নিচ্ছি বিশেষ্য ব'লে, তবে এটির আগে কোনো নির্দেশক বসে না। ক্রিয়ারূপের সংগঠন তিনটি বাক্যেই *ক্রিমূ+ক্রিস*।

[ঘ] (৪২)-এর বাক্যগুলোতে দেখা যায় যে নির্দেশক ছাড়া আর সমস্ত বস্তুই আবশ্যিক। *নি* বসে শুধু বিশেষ্যের আগে, সর্বনামের আগে বসে না।

বাক্যে কর্তা-ক্রিয়ার মধ্যে কোনো সঙ্গতি সূত্র আছে কি-না, তা দেখতে হবে। তিনটি বাক্যেই দেখা যাচ্ছে যে *ক্রিস* হচ্ছে *ছে*। অর্থাৎ এ-উপাত্তে কর্তা-ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতির কোনো বিশেষ বিধি নেই।

দেখতে হবে বাক্যে ব্যবহৃত পদ-শ্রেণীর সহাবস্থানের কোনো বিশেষ বিধি—*সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন*—রয়েছে কি-না। এর নাম দেয়া যাক 'সঙ্গতিবিধি'। সঙ্গতিবিধি নির্ণয় বেশ কঠিন, এবং সূত্রে তা প্রকাশ করা কঠিনতর। যেমন : বলতে পারি 'একটি ছেলে (মেয়ে) আসছে (নাচছে, পড়ছে)' : বা 'সে আসছে (নাচছে, পড়ছে)'। কিন্তু বলতে পারি না '*একটি বই আসছে', বা '*একটি বই নাচছে', বা '*একটি ছেলে একটি মেয়ে পড়ছে' বা '*একটি মেয়ে একটি ছেলে নাচছে' ইত্যাদি। এ-রকম বাক্য বিসঙ্গত। বিসঙ্গতি এড়ানো যায় কীভাবে? (৪২) এর সব বাক্যের কর্তাই মনুষ্যবাচক, এবং (৪২খ) বাক্যের কর্মবিশেষ্যটি অপ্রাণীবাচক। তাই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে উপাত্তের বাক্যে শুধু মনুষ্যবাচক বিশেষ্যই বসতে পারে কর্তারূপে, আর কর্মরূপে বসতে পারে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য। উপাত্তের ক্রিয়ামূল তিনটি লক্ষণীয় : এগুলোর মধ্যে 'আস', ও 'নাচ' অকর্মক ক্রিয়ামূল, অর্থাৎ এগুলোর সাথে কোনো কর্ম ব্যবহৃত হ'তে পারে না। 'পড়' ক্রিয়ামূলটি ঐচ্ছিকভাবে সকর্মক; অর্থাৎ এটির সাথে কর্ম থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে।

[ঙ] (৪২) উপাত্তের (ক) বাক্যের সংগঠন : বাক্য = বিপ + ক্রিপ; ক্রিপ = বিপ + ক্রিরূ; বিপ = নি + বি; ক্রিরূ = ক্রিমূ + ক্রিস; নি = সং + অনু। (৪২ খ, গ) বাক্যের সংগঠন : বাক্য = বিপ + ক্রিপ; ক্রিপ = ক্রিরূ; ক্রিরূ = ক্রিমূ + ক্রিস; বিপ =(নি) + বি; নি = সং + অনু।

[চ] উপাত্তের বাক্য তিনটির মধ্যে বাহ্যপার্থক্য থাকলেও তারা আন্তর সংগঠনে অভিন্ন। এদের সংগঠন হচ্ছে *বিপ+ক্রিপ*।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ অনুসারে (৪২) উপাত্তের ব্যাকরণ হবে (৪৪) :

(৪৪) ক বাক্য → বিপ + ক্রিপ

খ ক্রিপ → { বিপ + ক্রিরূ$_{সক}$ / ক্রিরূ$_{অক}$ }

গ বিপ → { নি + বি / # সর্ব(নাম) }

ঘ	নি	→	সং + অনু
ঙ	ক্রির্$_{সক}$	→	ক্রিমূ$_{সক}$ + ক্রিস
চ	ক্রির্$_{অক}$	→	ক্রিমূ$_{অক}$+ক্রিস
ছ	বি	→	{ বি$_{মনুষ্য}$ / বি$_{অপ্রাণী}$ }
জ	বি$_{মনুষ্য}$	→	মেয়ে, ছেলে,...
ঝ	বি$_{অপ্রাণী}$	→	বই,....
ঞ	সর্ব	→	সে
ট	ক্রিমূ$_{সক}$	→	পড়,...
ঠ	কিমূ$_{অক}$	→	আস, নাচ,...
ড	সং	→	এক,...
ঢ	অনু	→	টি
ণ	ক্রিস	→	ছে

(৪৪)-এর ব্যাকরণটি নির্ভুলভাবে সৃষ্টি করবে (৪২)-এর বাক্য তিনটি, এবং 'একটি ছেলে বই পড়ছে', 'সে একটি বই পড়ছে', 'একটি মেয়ে আসছে', 'সে আসছে', 'একটি মেয়ে নাচছে', 'একটি ছেলে নাচছে' প্রভৃতি উপাত্ত-অতিরিক্ত বাক্য। ব্যাকরণটি কোনো ব্যাকরণ বিরুদ্ধ বাক্য, যেমন : '*একটি মেয়ে সে (তা)কে পড়ছে', '*সে একটি মেয়ে(কে) পড়ছে', '*একটি মেয়ে একটি বই নাচছে' প্রভৃতি সৃষ্টি করবে না। ব্যাকরণটি উপাত্ত অতিক্রম ক'রে যায় ব'লে এটি একটি সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। (৪৪)-এর সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করা যাক। (৪৪ক) সূত্রটি উপাত্তের বাক্যগুলোর মৌল সংগঠনরূপে নির্দেশ করছে বিপ+ক্রিপ-কে। (৪৪খ) সূত্রটি ক্রিপ-কে সম্প্রসারিত করছে দু-রূপে : এ-সূত্রটি নির্দেশ করছে যে ক্রিয়াপদ দু-রকম হ'তে পারে। এরকম ক্রিয়াপদ গঠিত হয় বিশেষ্যপদ ও সকর্মক ক্রিয়ারূপের সমবায়ে, এবং অন্য রকম ক্রিয়াপদ গঠিত হয় শুধুই অকর্মক ক্রিয়ারূপে। (৪৪গ) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে বিশেষ্যপদ দু-রকম : এ রকম বিশেষ্যপদ গঠিত হয় নির্দেশক ও বিশেষ্যের সমবায়ে, এবং এমন বিপ বসতে পারে কর্তা ও কর্ম উভয়রূপে; আর অন্য রকম বিশেষ্যপদ গঠিত হয় শুধুই সর্বনামে, এবং এমন বিপ বসে শুধু বাক্যের শুরুতে, অর্থাৎ কর্তারূপে (সর্ব—নির্দেশ করছে যে সর্বনাম বসে বাক্যের বাম সীমান্তে, অর্থাৎ কর্তারূপে)। (৪৪ঘ) নির্দেশ করছে যে নির্দেশক

গঠিত হয় সংখ্যা ও অনুসর্গের সমবায়ে'। (৪৪ঙ, চ) সূত্র দুটি ক্রিয়ারূপের গঠনপ্রণালি নির্দেশ করছে : (৪৪ঙ) নির্দেশ করছে যে সকর্মক ক্রিয়ারূপ গ'ড়ে ওঠে সকর্মক ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়কে; আর (৪৪চ) জানাচ্ছে যে অকর্মক ক্রিয়ারূপ গ'ড়ে ওঠে অকর্মক ক্রিয়ামূল ও ক্রিয়াসহায়কে। (৪৪ছ) নির্দেশ করছে দু-রকম বিশেষ্য : এ-সূত্রানুসারে মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বসে শুধু কর্তারূপে ($^{\text{বি}}$মনুষ্য জানাচ্ছে যে মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বসতে পারে বাক্যের বাম সীমান্তে, অর্থাৎ কর্তারূপে), এবং অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য বসতে পারে অন্যত্র। (৪৪ জ–ণ) সূত্রগুলো বেশ সরল : এগুলো বিভিন্ন উচ্চ ক্যাটেগরির অন্ত্য উপাদান নির্দেশ করে। (৪৪) ব্যাকরণটি শুধু বাক্য সৃষ্টি করে না, সৃষ্ট বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনাও দেয়। ব্যাকরণটি সৃষ্ট বাক্যের (৪৫) রূপ সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে :

(৪৫)

বাক্য

বিপ ক্রিপ

নি বি বিপ ক্রিসহায়ক

সং অনু $^{\text{বি}}$মনুষ্য নি বি ক্রিমূসক ক্রিস

এক টি মেয়ে সং অনু $^{\text{বি}}$অপ্রাণী পড় ছে
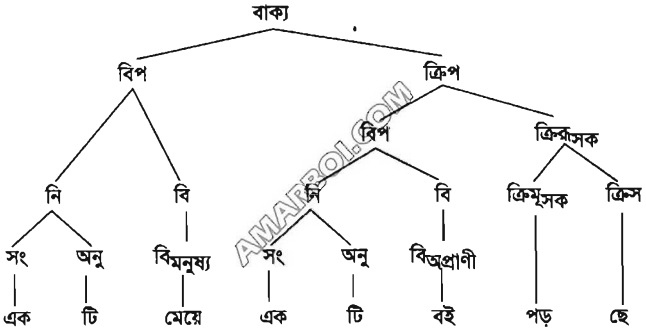
এক টি বই

(৪৫)-এর অন্ত্যগ্রন্থি [এক+টি+মেয়ে] [এক+টি+বই] [পড়+ছে]-র ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৪৩ক) । অন্যান্য সূত্র প্রয়োগে পাওয়া যাবে অন্যান্য বাক্য।

৪.৪.৩ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ আন্তর শক্তিতে দুর্বল। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে অনেক ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি অসম্ভব (দ্র লায়ন্স (১৯৭০)), এবং সমস্ত ভাষায়ই অনেক বাক্য আছে, যাদের পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় অত্যন্ত জটিল ও বোধি-বিরোধী প্রক্রিয়ায় (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, পরিচ্ছেদ ৫,৮), পোস্টাল (১৯৬৪ক, খ))। কোনো ভাষিক তত্ত্বের ব্যর্থতা দু-উপায়ে প্রমাণ করা যায়। প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে দেখিয়ে যে তত্ত্বটির সাহায্যে ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়; এবং দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে দেখিয়ে দেয়া যে তত্ত্বটির সাহায্যে সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করা যায় বেশ জটিল, বিভ্রান্তিকর, ও অপরিচ্ছন্ন প্রক্রিয়ায়।

প্রথম উপায়টি কোনো তত্ত্বকে বাতিল ক'রে দেয় সরাসরি, এবং দ্বিতীয় উপায়টি তুলে ধরে তত্ত্বের আন্তর অশক্তি। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে যে-কোনো ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করতে গেলে দেখা যায় যে ব্যাকরণের সূত্ররাশি হয়ে উঠছে ভয়াবহ জটিল, এবং বাক্য সৃষ্টিও সর্বদা ভাষাবোধ অনুসারে হচ্ছে না। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের নানা সীমাবদ্ধতার কয়েকটি :

[ক] বিচ্ছিন্ন উপাদান নির্দেশে ব্যর্থতা

[খ] সাংগঠনিক সাদৃশ্য প্রদর্শনে ব্যর্থতা

[গ] বাক্যিক দ্ব্যর্থতানিরসনে ব্যর্থতা

[ক] বিচ্ছিন্ন উপাদান নির্দেশে ব্যর্থতা : পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ অব্যবহিত উপাদানভিত্তিক, যার মৌল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বাক্যের বিভিন্ন উপাদান, বা একক অব্যবহিতরূপে—পাশাপাশি—বিরাজ করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে অনেক সংগঠনের উপাদানগুলো পাশাপাশি অবস্থান না ক'রে বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বা বিলগ্ন উপাদানের স্বাভাবিক পদচিত্ররূপ দেয়ার শক্তি পদসাংগঠনিক—অব্যবহিত উপাদান—ব্যাকরণের নেই। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৪৬) ক *সে হেসে উঠলো।*

খ *উঠলো সে হেসে।*

(৪৬ক)তে 'হেসে উঠলো'কে বোধ করি একটি একক বা উপাদানস্বরূপে, যাতে 'হেসে' ও 'উঠলো' অবস্থিত অব্যবহিতরূপে। কিন্তু (৪৬খ)তে পাই অন্য বিন্যাস। এ-বাক্যে 'উঠলো সে' বা 'সে হেসে' উপাদান যে নয়, তা বুঝি সহজেই; এবং বুঝি যে 'হেসে উঠলো'র দ্বিতীয়াংশই এ-বাক্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসেছে বাক্যের শুরুতে। 'উঠলো...হেসে'কে কোনো স্বাভাবিক উপায়ে পদচিত্রে উপস্থাপন করা অসম্ভব (দ্র হকেট (১৯৫৮, ১৫৫))। (৪৬)-এর উদাহরণ বেশ সহজ সরল। দীর্ঘ ও জটিল বাক্যে উপাদানের অংশরাশি নানাভাবে বিচ্ছিন্ন-বিলগ্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে এদিকে সেদিকে। বাঙলায় যেহেতু শব্দক্রম বদলানোর স্বাধীনতা বেশি, তাই উপাদানের অঙ্গ-বিলগ্নতার সম্ভাবনা বাঙলায় ব্যাপক। বাঙলা সম্বন্ধাত্মক ও অন্যান্য বাক্যে প্রায়ই থাকে বিচ্ছিন্ন উপাদান :

(৪৭) ক যে-মেয়েটি নাচছে, আমি তাকে চিনি।

খ আমি যে-মেয়েটি নাচছে, তাকে চিনি।

গ তুমি যে আসবে না হলুদ চাঁদের তলে, তা কে জানে না?

ঘ কে জানে না তা যে তুমি হলুদ চাঁদের তলে আসবে না?

পদসাংগঠনিক রীতিতে (৪৭)-এর বাক্যগুলোর উপাদান নির্দেশ, স্বাভাবিক উপায়ে, সম্ভব নয়। (৪৭ক, গ) বাক্য দুটিতে উপাদানের অঙ্গ বিলগ্ন হয়ে আছে, এবং (৪৭খ,ঘ)তে

উপাদানের বিলগ্ন অংশগুলোকে সংলগ্ন করা হয়েছে। (৪৭ক)র তিনটি প্রধান উপাদান হচ্ছে 'আমি', 'যে-মেয়েটি নাচছে, তাকে', এবং 'চিনি'। এদের মাঝে দ্বিতীয়টি বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। (৪৭গ)র প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে 'কে', 'তা যে তুমি হলুদ চাঁদের তলে আসবে না', এবং 'জানে না'; কিন্তু বাক্যটিতে দ্বিতীয় উপাদানটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিচ্ছিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক পদচিত্ররূপ দেয়া অসম্ভব। বিচ্ছিন্ন উপাদানকে বশে আনার জন্যে দরকার রূপান্তর ব্যাকরণ।

[খ] সাংগঠনিক সাদৃশ্য প্রদর্শনে ব্যর্থতা : অব্যবহিত উপাদানভিত্তিক পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ বৈসাদৃশ্যবাদী। এ-ব্যাকরণ সম্পর্কিত, কিন্তু সাংগঠনিক রূপে ভিন্ন, একাধিক বাক্যের বৈসাদৃশ্যই সুস্পষ্টভাবে দেখাতে পারে; কিন্তু তাদের আভ্যন্তর সাদৃশ্য ও নৈকট্য দেখাতে পারে না। দুটি সরল উদাহরণ :

(৪৮) ক আমি তোমাকে চাই।

খ চাই তোমাকে আমি।

বাঙলাভাষীদের কাছে সহজেই মনে হবে যে (৪৮ক, খ) বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে; সুতরাং ব্যাকরণের দায়িত্ব হচ্ছে এদের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। (৪৯)-এর প্রতিবেশমুক্ত ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে (৪৮ক) :

(৪৯)	ক	বাক্য	→	বিপ১ + ক্রিপ
	খ	ক্রিপ	→	বিপ২ + ক্রিরূ
	গ	বিপ১	→	আমি
	ঘ	বিপ২	→	তোমাকে
	ঙ	ক্রিরূ	→	চাই

ব্যাকরণটি, ত্রুটিহীন না হ'লেও সৃষ্টি করবে (৪৮ক), এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে বাক্যটির :

(৫০)
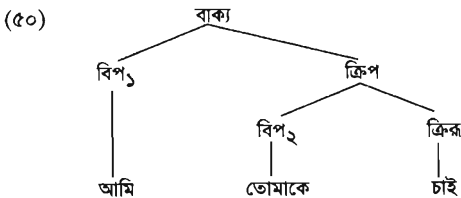
এ-সাংগঠনিক বর্ণনা মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য, কেননা এতে উচ্চ ক্যাটেগরিগুলোকে ভালোভাবেই দেখানো হয়েছে। (৪৯) ব্যাকরণটি সৃষ্টি করে মাত্র একটি বাক্য; এর সাহায্যে

(৪৮খ) বাক্যটি গঠন করা সম্ভব নয়। যদি একই ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করতে চাই (৪৮ক, খ), তবে দরকার হবে (৫১)র প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণটি :

(৫১)	ক	বাক্য	→	বিপ$_১$ + ক্রিপ
	খ	ক্রিপ	→	বিপ$_২$ + ক্রিরূ
	গ	বিপ$_১$	→	ক্রিরূ/— ক্রিরূ
	ঘ	ক্রিরূ	→	বিপ$_১$/ক্রিরূ—
	ঙ	বিপ$_১$	→	আমি
	চ	বিপ$_২$	→	তোমাকে
	ছ	ক্রিরূ	→	চাই

(৫১)র সূত্রগুলো বাহ্যিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত (অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে প্রয়োগ করতে হবে (দ্র § ৪.৩.২))। এ-সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে হবে নিম্নরূপে। প্রথমে, অনিবার্যভাবে, প্রযুক্ত হবে (৫১ক) সূত্র। এর পরে ঠিক করতে হবে বিপ$_১$ ও ক্রিপ-র মধ্যে কোনটিকে আমরা প্রথমে সম্প্রসারিত করতে চাই। মনে করা যাক, প্রথমে সম্প্রসারিত করতে চাই বিপ$_১$-কে। তাহলে আমাদের যেতে হবে (৫১ঙ) সূত্রে কেননা এ-ক্ষেত্রে (৫১খ-ঘ) সূত্র প্রযোজ্য নয়। (৫১ঙ) প্রয়োগের পর প্রয়োগ করতে হয় (৫১চ, ছ); কিন্তু তা প্রয়োগ সম্ভব নয় ব'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে (৫১খ) সূত্রে, এবং প্রয়োগ করতে হবে সূত্রটি। এটি প্রয়োগের পর প্রয়োগ করতে হবে (৫১চ,ছ)। এ-সূত্রগুলো প্রয়োগেই ব্যুৎপত্তি সমাপ্ত হবে, এবং পাওয়া যাবে (৫০) পদচিত্রটি, এবং গঠিত হবে (৪৮ক) বাক্যটি। এবার (৫১)র সূত্ররাশি অন্য ক্রমানুসারে প্রয়োগ করা যাক। এবার প্রথমে, অনিবার্যভাবে, প্রয়োগ করতে হবে (৫১ক), এবং এর পরে প্রয়োগ করতে হবে (৫১খ)। (৫১খ) সূত্র প্রয়োগ করলে আমরা বাধ্য হবো—ক্রমবিন্যাসনীতি অনুসারে—এর পরবর্তী সমস্ত সূত্র প্রয়োগ করতে। এ-সমস্ত সূত্র প্রয়োগে গঠিত হবে (৪৮খ) বাক্যটি, যার (৫১)-নির্দেশিত পদচিত্ররূপ হবে (৫২) :

(৫২)
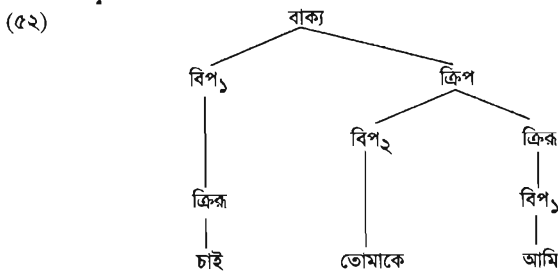
(৫২) পদচিত্রটি ভ্রান্ত। এর শক্তিমান সৃষ্টিশক্তিতে মারাত্মক ত্রুটি লুকিয়ে আছে। (৫১) ব্যাকরণটি (৪৮খ) বাক্যের যে-সাংগঠনিক বর্ণনা দিচ্ছে, তা ভাষাবোধবিরোধী; তাই এ-ব্যাকরণটি বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। ব্যাকরণটির সূত্রগুলো কেমন ত্রুটিপূর্ণ, তা দেখা যাক : (৫১গ) সূত্রটি বলছে যে বিশেষ্য পদ হচ্ছে ক্রিয়ারূপ, যদি বিপ-র ডানে থাকে ক্রিয়ারূপ; আবার (৫১ঘ) সূত্রটি বলছে যে ক্রিয়ারূপ হচ্ছে বিশেষ্যপদ, যদি ক্রিরূ-র বাঁয়ে থাকে ক্রিয়ারূপ। এ-ধারণা খুবই ভ্রান্ত। ব্যাকরণটিকে এ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করা যায়, যদি এর সূত্রগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে তারা বাক্যের উপদানগুলোকে পারস্পরিকভাবে স্থানান্তরিত করতে পারবে না। কিন্তু এমন নিয়ন্ত্রণে ব্যাকরণটি (৪৮ক, খ) বাক্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানোর সমস্ত শক্তি হারাবে। তাই দেখতে পাচ্ছি যে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ অত্যন্ত সহজ সরল সম্পর্কিত বাক্যের মধ্যেও সাদৃশ্য দেখাতে পারে না ভাষাবোধসম্মত উপায়ে।

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ যেমন পারে না সম্পর্কিত, অথচ আপাতবিসদৃশ সংগঠনসম্পন্ন বাক্যের সাদৃশ্য দেখাতে, তেমনি তা পারে না আপাতসদৃশ, অথচ যুক্তিগতভাবে বিসদৃশ, বাক্যের স্বাতন্ত্র্য দেখাতে। ইংরেজিতে প্রচুর বাক্য রয়েছে, যা বাহ্যসাদৃশ্যসম্পন্ন, কিন্তু আন্তর ব্যবধান তাদের মধ্যে দুস্তর (দ্র চোমস্কি (১৯৬৪ক, ৩৪))। বাঙলায়ও পাওয়া যায় প্রচুর বাক্য, যাদের বহিরঙ্গগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অন্তরঙ্গে রয়েছে বিপুল বৈসাদৃশ্য। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয়।

(৫৩) ক সে দেখে এলো।

খ সে দেখে ফেললো।

সংগঠনে আপাতসদৃশ হওয়া সত্ত্বেও (৫৩)র বাক্য দুটি বিসদৃশ : 'দেখে এলো' নির্দেশ করে 'দেখার পরে আসা', আর 'দেখে ফেললো' নির্দেশ করে 'আকস্মিকভাবে দেখা', বা এরকম কিছু। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে এগুলোর আন্তর ব্যবধান দেখানো সম্ভব নয়, এর জন্যে দরকার রূপান্তর ব্যাকরণ।

[গ] বাক্যিক দ্ব্যর্থতানিরসনে ব্যর্থতা : অদ্ব্যর্থ শাব্দ উপাদানে গঠিত কোনো বাক্য যদি সাংগঠনিক কারণে দ্ব্যর্থ (একাধিক (দুই, তিন,..) অর্থবহ) হয়, তবে ওই দ্ব্যর্থতাকে বলা যায় 'বাক্যিক দ্ব্যর্থতা', বা 'সাংগঠনিক দ্ব্যর্থতা'। এমনভাবে দ্ব্যর্থ বাক্যকে বলতে পারি 'সাংগঠনিকভাবে দ্ব্যর্থ' বাক্য। বাক্যিক দ্ব্যর্থতা, অনেক সময়, জন্ম নেয় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বিভিন্ন উপাদানবিন্যাসের ফলে। একটি সরল উদাহরণ :

(৫৪) ক পুরোনো বইয়ের দোকান

খ (পুরোনো বইয়ের) দোকান

গ পুরোনো (বইয়ের দোকান)

'পুরোনো বইয়ের দোকান' বিশেষ্যপদটির দুটি অর্থ : এর এক অর্থ হচ্ছে যে (ক) 'দোকানটিতে পুরোনো বই বিক্রি হয়'; এবং এর অন্য অর্থ হচ্ছে (খ) 'বইয়ের দোকানটি পুরোনো'। অদ্ব্যর্থকরণের এক উপায় হচ্ছে 'বন্ধনিকরণ'। 'পুরোনো বইয়ের দোকান' বিশেষ্য-পদটির প্রথম অর্থ স্পষ্ট হয়েছে (৫৪খ)র বন্ধনিকরণের ফলে; এবং দ্বিতীয় অর্থটি স্পষ্ট হয়েছে (৫৪গ)র বন্ধনিকরণের ফলে। কিন্তু বাক্যিক দ্ব্যর্থতা সব সময় এমন সরল নয়। তা এতো জটিল হয়ে উঠতে পারে যে অব্যবহিত উপাদানভিত্তিক বন্ধনিকরণপ্রণালি দ্ব্যর্থতামোচনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। কিছুটা জটিল উদাহরণ :

(৫৫) ক আকাশের মতো নীল সমুদ্র দুলছে।

খ তোমার মতো লাল তিল আমি আর দেখি নি।

(৫৫ক) বাক্যটি ত্রিমুখি দ্ব্যর্থতার নিদর্শন। বাক্যটিতে কোনো দ্ব্যর্থ শব্দ নেই, তাই বাক্যটি দ্ব্যর্থ সাংগঠনিক কারণে। আমার বোধে বাক্যটির তিন রকম অর্থ নিম্নরূপ : (ক) সমুদ্র আকাশের মতো নীল, এবং দুলছে,; (খ) সমুদ্র(টি) নীল, ও আকাশের মতো, এবং দুলছে, এবং (গ) আকাশ যেমন দোলে, নীল সমুদ্র তেমনভাবে দুলছে। বাস্তবে আমরা অবশ্য বাক্যটির তিন অর্থের মাঝ থেকে ছেঁকে নিই প্রথম অর্থটি। (৫৫খ) বাক্যটি বহুমুখিভাবে দ্ব্যর্থ। আমার কাছে (৫৫খ)র যে-অর্থগুলো ধরা দিয়েছে : (ক) তোমার তিল যেমন লাল, তেমন লাল তিল আমি আর দেখি নি; (খ) তুমি একটি লাল তিল, এবং এমন লাল তিল আমি আর দেখি নি; (গ) তুমি যেমন লাল, তেমন লাল তিল আমি আর দেখি নি। বাক্যটি নেড়েচেড়ে আরো কয়েকটি অর্থ পাওয়া সম্ভব। (৫৫খ) বাক্যের শব্দবিন্যাস যদিও বিশেষভাবে নির্দেশ করে দ্বিতীয় অর্থটি, তবু বাস্তবে, বাস্তব কারণে, আমরা গ্রহণ করি বাক্যটির প্রথম অর্থটি। অব্যবহিত উপাদানভিত্তিক পদসাংগঠনিক রীতিতে (৫৫)র বাক্যগুলোর দ্ব্যর্থতা মোচন অসম্ভব। আরো কয়েকটি উদাহরণ :

(৫৬) ক আপনার বইটি চমৎকার।

খ তোমার পায়ের দাগ অবিনশ্বর।

গ স্নান করার সময় হাসান শরমিনকে দেখেছে।

(৫৬খ)র নিরীহ বাক্যটিও বহুমুখিভাবে দ্ব্যর্থ। 'আপনার বইটি' বলতে বুঝতে পারি 'যে-বইটি আপনি লিখেছেন', বা 'আপনি যে-বইটির মালিক', বা 'আপনি যে-বইটি উপহার দিয়েছেন', বা 'এ-মুহূর্তে যে-বইটি আপনার হাতে আছে' প্রভৃতি। (৫৬খ)র 'তোমার পায়ের দাগ' দ্বিমুখিভাবে দ্ব্যর্থ। বাক্যটির এক অর্থ হচ্ছে 'তোমার পায়ে যে-দাগটি আছে, সেটি অবিনশ্বর'; এর অন্য অর্থহচ্ছে 'তোমার পা যে-দাগ—মাটিতে, পাথরে, গ্রানাইটে, বা কারো চিত্তে —এঁকেছে, তা অবিনশ্বর।' (৫৬গ)ও দ্বিমুখিভাবে দ্ব্যর্থ : এর এক অর্থ 'হাসান যখন স্নান

করছিলো, তখন সে শরমিনকে দেখেছে'; এর অন্য অর্থ হচ্ছে 'শরমিন যখন স্নান করছিলো, তখন তাকে হাসান দেখেছে।' এ-বাক্যগুলোকে পদসাংগঠনকি ব্যাকরণের সাহায্যে দ্ব্যর্থতা থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। (৫৬)র বাক্যগুলোর উপাদানগুলোকে বন্ধনিবদ্ধ করা যায় নিম্নরূপে :

(৫৭) ক (আপনার বইটি) চমৎকার)

খ ((তোমার (পায়ের দাগ)) অবিনশ্বর)

গ ((স্নান করার সময়) ((হাসান) (শরমিনকে (দেখেছে))))

এভাবে ছাড়া অন্য অন্য কোনো রূপে (৫৬)র বাক্যগুলোর বন্ধনিকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলোর প্রতিটিই একাধিক অর্থবহ। এ-বাক্যগুলোর দ্ব্যর্থতামোচনের জন্যে দরকার রূপান্তর ব্যাকরণ। আরো একটি দ্ব্যর্থ বাক্যের উদাহরণ দেয়া যাক :

(৫৭) ঘ জেনারেল রহমান তাঁর বউকে ভালোবাসেন ব'লে মারেন না।

বাক্যটির সরলার্থ হচ্ছে : 'যেহেতু জেনারেল রহমান তাঁর বউকে ভালোবাসেন, তাই তিনি তাঁর বউকে মারেন না।' কিন্তু বাক্যটির ভেতর লুকিয়ে আছে অন্য একটি কুটিল ইঙ্গিত-অর্থ যে 'জেনারেল রহমান তাঁর বউকে মারেন, তবে ভালোবাসেন ব'লে নয়, মারেন অন্য কারণে।'—এ-বাক্যের দ্ব্যর্থতানিরসনের শক্তি নেই পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের।

পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে যে এ-ব্যাকরণের সাহায্যে কোনো ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি করা অসম্ভব। অর্থাৎ বাক্যসৃষ্টিতে-বা বিশ্লেষণে পদসাংগঠনিক তত্ত্ব ব্যর্থ, তাই দরকার এর চেয়ে শক্তিমান তত্ত্ব। চোমস্কি (১৯৫৭) বিপুল উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে বাক্যসৃষ্টিতে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ অক্ষম, তাই দরকার নতুন তত্ত্ব ও ব্যাকরণ। চোমস্কি নিজেই পেশ করেন সে-শক্তিমান তত্ত্ব, যার নাম *রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ*।

৪.৫.০ *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণ

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের উন্মেষ ঘটে চোমস্কির *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* (১৯৫৭) গ্রন্থে। এ-গ্রন্থে চোমস্কি রূপান্তর ব্যাকরণের যে-কাঠামো পেশ করেন, তাকে বলবো *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণ। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণ বিগত দু-দশকে নানাভাবে শোধিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, তবে এর মৌল বক্তব্য—ভাষায় 'রূপান্তর' সক্রিয়—সমস্ত রূপান্তর ব্যাকরণেই রক্ষিত। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্যে রূপান্তর ব্যাকরণের আদিকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান অপরিহার্য; তাই প্রথমে আমি *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবরণ দেবো (দ্র § ৪.৫.০-৪.৫.৩); এবং পরে দেবো সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের পরিচয় (দ্র § ৪.৬-৪.৭)।

ভাষায় 'সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ' বাক্যসৃষ্টির জন্যে চোমস্কি *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ পরখ করেন তিন রকম ব্যাকরণ :(ক) *সসীম অবস্থার ব্যাকরণ*, (খ) *পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ*, ও (গ) *রূপান্তর ব্যাকরণ*। এদের প্রথমটি সবচেয়ে দুর্বল। চোমস্কি (১৯৫৭, ১৮-২১) নানা

যুক্তির সাহায্যে দেখান যে কোনো অসীম ভাষার সমস্ত বাক্যসৃষ্টির শক্তি সসীম অবস্থার ব্যাকরণ-এর নেই। এ-ব্যাকরণের মূলকথা হচ্ছে 'বাঁ-থেকে-ডান দিকে নানারকম 'বাছাই'-এর সাহায্যে সৃষ্ট হয় বাক্য', অর্থাৎ বাক্য গঠনের জন্যে প্রথমে বাছাই করতে হয় বাক্যের প্রথম শব্দটি, এর পরে অব্যবহিতপূর্ব শব্দের নিয়ন্ত্রণ অনুসারে বাছাই করতে হয় শব্দ। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে একটি বাক্য—'একটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে' নেয়া যাক। উদাহরণ-বাক্যটির গঠনপ্রক্রিয়া সসীম অবস্থার ব্যাকরণ বর্ণনা করবে এভাবে : যে-সব শব্দ বাঙলা বাক্যে প্রথম ভাষাবস্তুরূপে বসতে পারে, সেগুলোর তালিকা থেকে উদাহরণ-বাক্যের প্রথম শব্দরূপে নির্বাচন করা হবে 'একটি'কে, তার পরে নির্বাচন করা হবে 'পাখি' শব্দটি। 'পাখি' শব্দটি নেয়ার কারণ হলো যে-সমস্ত শব্দ 'একটি'র পরে বসতে পারে সেগুলোর একটি হচ্ছে 'পাখি'। এর পরে নেয়া হবে 'উত্তর'; কেননা 'একটি পাখি'র পর বাঙলায় 'উত্তর' ব্যবহৃত হ'তে পারে। এভাবে পূর্ববর্তী শব্দের নিয়ন্ত্রণে পরবর্তী শব্দ চয়ন ক'রে সসীম অবস্থার ব্যাকরণ সৃষ্টি করবে 'একটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে' বাক্যটি। এ-বাক্যগঠনের জন্যে যে-সমস্ত পদ নেয়া হয়েছে, তা না নিয়ে নেয়া যেতো অন্য সম্ভবপর শব্দ। যেমন : 'একটি'র বদলে নেয়া যেতো 'পাঁচটি'; এবং গঠন করা যেতো 'পাঁচটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে' বাক্যটি। সসীম অবস্থার ব্যাকরণ-এর চিত্ররূপ হবে (৫৮)।

(৫৮)র ব্যাকরণটিকে কল্পনা করা যেতে পারে এক বিমূর্ত যন্ত্ররূপে, যা এক *অবস্থা* থেকে যায় অন্য এক *অবস্থায়*। এটির কাজ আরম্ভ হয় *শুরু* অবস্থায়, এবং সমাপ্ত হয় *শেষ* অবস্থায়। যন্ত্রটি প্রত্যেক অবস্থায় সক্রিয় হয়, এবং প্রত্যেক অবস্থা থেকে বেছে নেয়, বা সৃষ্টি করে, একটি ক'রে শব্দ। এ-প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যে-কোনো শব্দপরম্পরাকে এ-যন্ত্রের সৃষ্ট ব্যাকরণসম্মত বাক্য ব'লে গ্রহণ করা যায়। (৫৮) ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে অল্প কয়েকটি বাক্য। এর সৃষ্টিশক্তি বেড়ে যাবে বহুগুণে, যদি এর সাথে যোগ করা হয় *লুপ* বা পৌনপুনিক শক্তি (যেমনভাবে চিত্রের চতুর্থ অবস্থার সাথে যোগ করা হয়েছে 'চমৎকার, কালো, লাল' শব্দের লুপ)। ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে 'একটি পাখি উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে', 'একটি চমৎকার পাখি উত্তর

(৫৮)
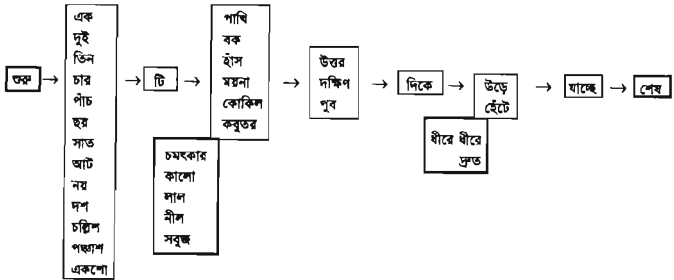
দিকে উড়ে যাচ্ছে', 'দুটি কালো পাখি দক্ষিণ দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে' প্রভৃতি বাক্য। এ-ব্যাকরণটির সৃষ্ট বাক্যরাশি বেশ সহজ সরল। এটির সাহায্যে বাঙলার সমস্ত বাক্য দূরে থাকে, বাঙলা ভাষার এক খণ্ডাংশের সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করতে গেলে ব্যাকরণটিকে ভয়াবহভাবে জটিল ক'রে তুলতে হবে। সসীম অবস্থার ব্যাকরণের ভাষিক তত্ত্বই ভ্রান্ত, তাই এর সাহায্যে কোনো ভাষার সমস্ত বাক্য স্বাভাবিক ও ভাষাবোধসম্মত উপায়ে সৃষ্টি করা অসম্ভব। সসীম অবস্থার ব্যাকরণ বাক্যসৃষ্টিতে ব্যর্থ ব'লে চোমস্কি বর্জন করেন এ-ব্যাকরণ।

চোমস্কি (১৯৫৭, ২৬-৪৮) সসীম অবস্থার ব্যাকরণ বর্জন করার পর পরখ করেন পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ (দ্র § ৪.৪-৪.৪.৩)। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ সসীম অবস্থার ব্যাকরণের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান, এবং এ-ব্যাকরণ অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে বাক্যসৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব ভাষার প্রায় সমস্ত বাক্য, এবং দেয়া সম্ভব বাক্যের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা, তবু আন্তর অশক্তিবশত এর পক্ষে ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠু ও বোধিসম্মত উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় (দ্র § ৪.৪.৩)। ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি করার জন্যে দরকার পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অধিকতর শক্তিমান ব্যাকরণ। চোমস্কি *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ পেশ করেন সে-শক্তিমান ব্যাকরণকাঠামো, যার নাম রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। রূপান্তর ব্যাকরণ পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন, তাই এর সাহায্যে কাটিয়ে ওঠা যায় পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা। চোমস্কি অবশ্য পদসাংগঠনিক ব্যাকরণকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি, বরং একে গ্রহণ করেছেন রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তি রূপে, এবং এর সাথে যুক্ত করেছেন রূপান্তরতত্ত্ব। পদসাংগঠনিক সূত্র ও রূপান্তর সূত্রের সমবায়ে গঠিত রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ।

৪.৫.১ *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের সংগঠন

সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের রয়েছে তিনটি কক্ষ; (ক) পদসাংগঠনিক কক্ষ,(খ) রূপান্তর(সাধক) কক্ষ, (গ) রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ। এ-তিন কক্ষের সমবায়ে গঠিত *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণ। এ-ব্যাকরণের রূপ (৫৯)। এ-ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক কক্ষ একগুচ্ছ পদসাংগঠনিক সূত্রের সমষ্টি; রূপান্তর কক্ষ একগুচ্ছ রূপান্তর সূত্রের সমষ্টি; আর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ একগুচ্ছ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রের সমষ্টি।

পদসাংগঠনিক সূত্ররাশি গঠন করে বাক্যের *আন্তর সংগঠন*, বা *আভ্যন্তর সংগঠন* (*গভীর সংগঠন*, বা *গভীর তল* নাম *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় নি); আর রূপান্তর-সূত্র(রাশি) আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয়ে গঠন করে বাক্যের *আহরিত সংগঠন*, বা

রূপান্তরিত সংগঠন। আহরিত সংগঠনের ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয় বাক্যের ধ্বনিরূপ।

(৫৯)
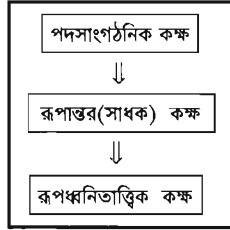
৪.৫.১.১ পদসাংগঠনিক কক্ষ

সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক কক্ষ একগুচ্ছ প্রতিবেশমুক্ত, বা প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সমষ্টি। এ-সূত্রগুলো নির্দেশ করে ভাষার 'মৌল বাক্য'-এর অব্যবহিত উপাদান। এ-সূত্রগুলো যে-সংগঠন সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয় বাক্যের *আভ্যন্তর সংগঠন*, পরবর্তীকালে এর নাম হয় *গভীর সংগঠন* বা *গভীর তল*, এবং আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে যে-সংগঠন পাওয়া যায়,তার নাম *আহরিত সংগঠন* বা *রূপান্তরিত সংগঠন*, পরে এর নাম হয় *বহিঃসংগঠন*, বা *বহির্তল*। পদসাংগঠনিক সূত্র ভাষার সমস্ত, ও সব রকম বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করে না; সৃষ্টি করে বিশেষ এক শ্রেণীর বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন। চোমস্কি (১৯৫৭, ৪৫, ১০৭) ভাষার সমস্ত বাক্যকে ভাগ করেছেন দু-ভাগে : (ক) *মৌল বাক্য*, এবং (খ) *আহরিত বাক্য*, বা *অমৌল বাক্য*।

[ক] মৌল বাক্য : ভাষার বিচিত্র শ্রেণীর বাক্য পর্যবেক্ষণ করলে এক শ্রেণীর বাক্য পাই, যা বেশ সহজ সরল। এসব বাক্যে কোনো জটিল বিশেষ্যপদ, বা ক্রিয়াপদ থাকে না; থাকে না কাল-ঘটিত কোনো জটিলতা, বা প্রশ্নবোধক, বা নিষেধাত্মক জটিলতা। এমন বাক্য গঠন করে যে-কোনো ভাষার এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ। চোমস্কি এমন সহজ সরল বাক্যকে গ্রহণ করেছেন মৌল বাক্য বলে। সাধারণত সরল-বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক কর্তৃবাচ্য-এর বাক্যকে ধরা হয় মৌল বাক্য—কার্নেল সেন্টেন্স—ব'লে। পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয় মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন।

[খ] আহরিত বাক্য : মৌল বাক্য ছাড়া ভাষার অন্যান্য বাক্য 'অমৌল', বা আহরিত বাক্য। মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর নানাবিধ রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয় অমৌল বাক্য।

(৬০)-এর বাক্যগুলো লক্ষণীয় :

(৬০) ক মেয়েটি বই পড়ে।

খ মেয়েটি বই পড়ে না।

গ মেয়েটি কি বই পড়ে?

ঘ মেয়েটি বই পড়ে ও গান গায়।

ঙ আমি জানি যে মেয়েটি বই পড়ে।

ওপরের বাক্যগুলোর মধ্যে (৬০ক) সরলতম : এটি একটি সরল-বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক-কর্তৃবাচ্য বাক্য, যার ক্রিয়ারূপটিও সরল। এর তুলনায় অন্যান্য বাক্য জটিলতর : (৬০খ) নিষেধাত্মক, (৬০গ) প্রশ্নবোধক, (৬০ঘ) বাক্যে ক্রিয়াপদটি যৌগিক, এবং (৬০ঙ) একটি জটিল বাক্য। (৬০ঙ) দুটি মৌল বাক্যের ('আমি জানি', এবং 'মেয়েটি বই পড়ে') যোগফল। এ-বাক্যগুলোর মধ্যে (৬০ক)কে গ্রহণ করা যায় মৌল বাক্য রূপে, এবং এর ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা যায় অন্যান্য—অমৌল—বাক্য।

পদসাংগঠনিক কক্ষের সূত্রগুলো গঠন করে ভাষার সমস্ত মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন; এবং ওই আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয় অন্যান্য বাক্য। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণে রূপান্তর ছাড়াই সৃষ্টি করা হয় বাক্য; কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণে অন্তত একটি রূপান্তর সূত্র, সব বাক্যেই, প্রযুক্ত নয়। তাই রূপান্তর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্রগুলো কোনো বাক্যই সম্পূর্ণরূপে গঠন করে না, তা শুধু বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি ক'রেই বিরত হয়, এবং ওই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করে রূপান্তর সূত্র; এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। রূপান্তর কক্ষে দু-রকম সূত্র—*আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র*, ও *ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র*—রয়েছে। কোনো আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর কোন ধরনের—আবশ্যিক, বা ঐচ্ছিক—সূত্র প্রযুক্ত হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর ক'রে মৌল ও অমৌল বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া যায় :

[ক] মৌল বাক্য : পদসাংগঠনিক সূত্র ও আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র (এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র) প্রয়োগ ক'রে, এবং কোনো ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ না ক'রে যে-সমস্ত বাক্য সৃষ্ট হয়, তাদের বলা হয় ভাষার মৌল বাক্য।

[খ] অমৌল, বা আহরিত বাক্য : মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর অন্তত একটি ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে যে-সমস্ত বাক্য সৃষ্ট হয়, তাদের বলা হয় ভাষার অমৌল, বা আহরিত বাক্য।

যে-সমস্ত বাক্য অভিন্ন আভ্যন্তর সংগঠন থেকে উৎসারিত, তাদের বিবেচনা করা হয় *সম্পর্কিত বাক্য* ব'লে। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক সূত্রের কাজ

হচ্ছে ভাষার মৌল বাক্যরাশির আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করা। পরে অবশ্য (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫)) বাদ দেয়া হয়েছে ভাষার বাক্যসমূহের মৌল ও অমৌল বিভাগ।

৪.৫.১.২ রূপান্তর কক্ষ

রূপান্তর কক্ষের রূপান্তর সূত্র প্রযুক্ত হয় পদসাংগঠনিক কক্ষের সূত্র কর্তৃক সৃষ্ট মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর, এবং নানাভাবে রূপান্তরিত হয় ওই আভ্যন্তর সংগঠন। রূপান্তর সূত্র প্রয়োগের ফলে গঠিত সংগঠনকে বলা হয় *আহরিত সংগঠন*, বা *রূপান্তরিত সংগঠন*। রূপান্তর সূত্র অত্যন্ত শক্তিমান, তা বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনকে নানাভাবে পরিবর্তিত করে। রূপান্তর সূত্র বাক্যের দৃশ্যমান উপাদানের ওপর প্রযুক্ত হয় না, প্রযুক্ত হয় বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর, বা *মধ্য-সংগঠন*-এর ওপর। যেমন : 'আমি যাই' বাক্য থেকে 'আমি যাই না' বাক্যটি, রূপান্তর সূত্র প্রয়োগের ফলে, গঠিত : এ-কথার অর্থ এ নয় যে প্রথম বাক্যটির ভাষাবস্তুর ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যটি। এর অর্থ হচ্ছে প্রথম বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর *নিষেধ রূপান্তর* সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যটি। রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ সম্পর্কে চোমস্কির (১৯৫৭, ৪৪) মন্তব্য : 'ব্যাকরণিক রূপান্তর প্রযুক্ত হয় বিশেষ পদসাংগঠনসম্পন্ন কোনো গ্রন্থির, বা একাধিক গ্রন্থির ওপর, এবং তাকে রূপান্তরিত করে নতুন, আহরিত পদসংগঠনসম্পন্ন, গ্রন্থিতে।

সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস কাঠামোর ব্যাকরণে দু-রকম রূপান্তর সূত্র হয়েছে (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ৪৫)) : (ক) *আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র* এবং (খ) *ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র*।

[ক] আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র : যে-(সমস্ত) রূপান্তর সূত্র ভাষার যে-কোনো বাক্য সৃষ্টির জন্যে আবশ্যিকভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তাই আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র। আবশ্যিক রূপান্তর সূত্রের সংখ্যা খুব কম। যেমন : বাঙলা ভাষায় যে-কোনো বাক্যসৃষ্টির জন্যে বাক্যের ক্রিয়ারূপ ও কর্তার মধ্যে পুরুষ(শ্রেণী)গত (দ্র § ৪.৪.১) সঙ্গতি রক্ষা করতে হয়। এ-সঙ্গতি নির্দেশ করা যেতে পারে রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে। তাই বাঙলা ভাষায় কর্তা-ক্রিয়ারূপ সঙ্গতিসূত্রকে গ্রহণ করা যায় আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র রূপে। এ ছাড়া আর কোনো আবশ্যিক রূপান্তর বাঙলায় নেই। আবশ্যিক রূপান্তর সূত্রজ বাক্য মৌল বাক্য (দ্র. § ৪.৫.১.১)।

[খ] ঐচ্ছিক রূপান্তর : যে-(সমস্ত) রূপান্তর সূত্র আবশ্যিক নয়, যেগুলো প্রয়োগ করা হয় বিশেষ বিশেষ বাক্যসৃষ্টির জন্যে, তাই ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র। যেমন : *নিষেধ রূপান্তর*, বা *প্রশ্ন রূপান্তর*, বা *আদেশ রূপান্তর* প্রভৃতি সব বাক্য সৃষ্টির জন্যে প্রযুক্ত হয় না। নিষেধাত্মক বাক্যসৃষ্টির জন্যে দরকার হয় নিষেধ রূপান্তর, প্রশ্নবোধক বাক্যসৃষ্টির জন্যে দরকার হয় প্রশ্ন রূপান্তর, এবং আদেশাত্মক বাক্যসৃষ্টির জন্যে দরকার হয় আদেশ রূপান্তর। এসব, এবং এমন অনেক বিশেষ শ্রেণীর বাক্যসৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত, রূপান্তরই ঐচ্ছিক রূপান্তর।

কোনো রূপান্তর সূত্র প্রযুক্ত হ'তে পারে মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর; আবার অনেক রূপান্তর সূত্র রয়েছে, যা প্রযুক্ত হয় একাধিক আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর। রূপান্তর সূত্রের এমন প্রয়োগ অনুসারে রূপান্তর সূত্রকে (সাধারণত ঐচ্ছিক রূপান্তর এ-পর্যায়ে পড়ে) ভাগ করা হয়ে থাকে দু-শ্রেণীতে; (ক) *এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর*, এবং (খ) *একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর*।

[ক] এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর : যে-সমস্ত রূপান্তর মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয়, সেগুলোকে বলা হয় এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর। যেমন : কোনো মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর নিষেধ রূপান্তর, বা প্রশ্ন রূপান্তর, বা আদেশ রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে আহরণ করা যায় যথাক্রমে নিষেধাত্মক বাক্য, প্রশ্নবোধক বাক্য, আদেশাত্মক বাক্য ইত্যাদি। এসব বাক্য গঠনের জন্যে মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় রূপান্তর সূত্র। এমন রূপান্তর এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর-এর নিদর্শন। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৬১) ক মেয়েটি বই পড়ে [*নিষেধ রূপান্তর*] ⇒ মেয়েটি বই পড়ে না।

খ মেয়েটি বই পড়ে [*প্রশ্ন রূপান্তর*] ⇒ মেয়েটি কি বই পড়ে?

গ মেয়েটি বই পড়ে [*প্রশ্ন রূপান্তর*] ⇒ কে বই পড়ে?

(৬১ক)তে মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ('মেয়েটি বই পড়ে' বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের) ওপর নিষেধ রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে পাওয়া গেছে একটি নিষেধাত্মক বাক্য। (৬১খ, গ)তেও রূপান্তর প্রয়োগ করা হয়েছে মাত্র একটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর।

[খ] একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর : যে-সমস্ত রূপান্তর একাধিক আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর যুগপৎ প্রযুক্ত হয়, তাদের বলা হয় একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর। এ-সমস্ত রূপান্তর একাধিক আভ্যন্তর সংগঠনকে নানাভাবে মিশিয়ে নতুন বাক্যসংগঠন সৃষ্টি করে। একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর ব্যাকরণকে দেয় বাক্যসৃষ্টির পৌনপুনিক শক্তি। একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তরসমূহ তাদের সৃষ্ট সংগঠনগুলোর ওপর এমনভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে, যার ফলে গঠিত হ'তে পারে অসংখ্য বাক্যসংগঠন। মনে করা যাক, দুটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হলো একটি রূপান্তর, ফলে গঠিত হলো একটি নতুন সংগঠন। এখন এ-নতুন সংগঠনটিকে ব্যবহার করা যায় ওই রূপান্তরটির আংশিক কাঁচামালরূপে, এবং গঠন করা যায় আরেকটি নতুন সংগঠন। এ-প্রক্রিয়া চালানো যায় অসংখ্যবার, এবং গঠন করা যায় অসংখ্য নতুন এবং দীর্ঘতর বাক্য।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনুসারে দু-রকম বাক্যকে বিবেচনা করা হয় একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তরজাত ব'লে। এগুলো হচ্ছে (ক) *যুগ্ম*, বা *যৌগিক বাক্য* : যা গঠিত হয় এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের যোগে ; এবং (খ) *গ্রথিত*, বা *জটিল বাক্য* : যা গঠিত হয় এক বাক্যের শরীরে আরেক বাক্য গেঁথে দেয়ার ফলে। যৌগিক বাক্য গঠনের জন্য যে-রূপান্তর ব্যবহার করা হয়,তাকে বলা হয় *যৌগিক রূপান্তর*, আর গ্রথিত বা জটিল বাক্য সৃষ্টির জন্যে যে-রূপান্তর ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা যায় *গ্রন্থন রূপান্তর*, বা *জটিল রূপান্তর*। রূপান্তরের প্রকৃতি অনুসারে ভাষার বাক্যসমূহকে ভাগ করা যায় তিন ভাগে। যে-সমস্ত বাক্য এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর প্রয়োগে গঠিত, তা *সরল বাক্য*; যে-সমস্ত বাক্য যৌগিক রূপান্তর প্রয়োগে গঠিত, তা *যৌগিক বাক্য*; আর যে-সমস্ত বাক্য জটিল রূপান্তর প্রয়োগে গঠিত, তা *জটিল বাক্য*। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৬২) ক
মেয়েটি রূপসী
মেয়েটি নর্তকী
] [*যৌগিক রূপান্তর*] ⇒ মেয়েটি রূপসী এবং মেয়েটি নর্তকী।

খ
আমি জানি
মাধুরী রূপসী
] [*গ্রন্থন রূপান্তর*] ⇒ আমি জানি যে মাধুরী রূপসী।

(৬২ক)তে দুটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর যৌগিক রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাচ্ছে তৃতীয় একটি বাক্য; এবং (৬২খ)তে দুটি আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর গ্রন্থন রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে—অর্থাৎ প্রথমটির শরীরে দ্বিতীয়টিকে গেঁথে—পাওয়া যাচ্ছে তৃতীয় একটি বাক্য।

সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস কাঠামোর ব্যাকরণে রূপান্তর সূত্র বাক্যের অর্থবদল ঘটায়। যেমন : 'মেয়েটি বই পড়ে' বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে 'মেয়েটি বই পড়ে না' গঠন করলে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। রূপান্তর ব্যাকরণের সম্প্রসারণের সাথে সাথে রূপান্তর সম্পর্কে যোগ করা হয়েছে নতুন ধারণা, এবং পরিত্যাগ করা হয়েছে অনেক পুরানো ধারণা। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক রূপান্তরের ভেদ স্বীকার করা হয় না, এবং এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক ও একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তরের ভেদও স্বীকার করা হয় না। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোতে রূপান্তর সূত্র অতি শক্তিমান; তার সাহায্যে যে-কোনো আভ্যন্তর সংগঠন থেকে আহরণ করা যায় যেমন-ইচ্ছে বাক্য। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামো সংশোধনের সময় রূপান্তর সূত্রের শক্তি হ্রাস করা হয় (দ্র § ৪.৬.১)। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় যে 'রূপান্তর অর্থ সংরক্ষণশীল'; অর্থাৎ রূপান্তর সূত্র আভ্যন্তর বাক্যের অর্থবদল ঘটাবে না। তাই বর্তমানে 'মেয়েটি বই পড়ে' বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন থেকে 'মেয়েটি বই পড়ে না', বা 'মেয়েটি কি বই পড়ে?' বা 'কে বই পড়ে?' প্রভৃতি বাক্য আহরণ করা যায় না।

৪.৫.১.৩ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ

রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগে বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন রূপান্তরিত হয়, এবং সৃষ্ট হয় আহরিত সংগঠন। কিন্তু আহরিত সংগঠনে পাওয়া যায় না গঠিত বাক্যের ধ্বনিরূপ, এবং পাওয়া যায় না বাক্যের শব্দরাশির গ্রহণযোগ্য বাস্তব রূপ। রূপান্তর সূত্র সৃষ্টি করে নতুন পদচিত্র, বা পদসংগঠন, এবং উপহার দেয় নতুন অন্ত্যগ্রন্থি। তাই রূপান্তর সূত্র প্রয়োগে সৃষ্ট অন্ত্যগ্রন্থির ওপর প্রয়োগ করতে হয় রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র, যা বাক্যের শব্দরাশিকে দেয় বাস্তবসম্মত রূপ, এবং নির্দেশ করে বাক্যের ধ্বনিরূপ। আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রয়োজনীয় সমস্ত রূপান্তর প্রয়োগের পর পাওয়া যেতে পারে (৬৩)র মতো একটি গ্রন্থি :

(৬৩) [[# মেয়ে + টি # # বই # # পড় + এ # # না #]]

(৬৩) গ্রন্থিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়;—এতে দেখানো দরকার বাক্যটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য (বাক্যটির পদসাংগঠনিক রূপ কী, এর কোন ধ্বনির কী বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি (দ্র চোমস্কি ও হাল (১৯৬৮), ৮ (৪, ৫ সংখ্যক উদাহরণ)))। (৬৩) গ্রন্থিটির ওপর প্রয়োজনীয় রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে বাক্যটির ধ্বনিরূপ, বা লিখিত রূপ : 'মেয়েটি বই পড়ে না'। (৬৩)কে বলতে পারি 'বাক্যিক বহিঃসংগঠন', আর এর ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে এর চূড়ান্ত রূপ : ধ্বনিরূপ, অথবা লিখিত রূপ।

(৫৯) চিত্রে *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণের সরল সংগঠন দেখানো হয়েছে। (৫৯)-এ ব্যাকরণকে বিভক্ত করা হয়েছে তিনটি কক্ষে; কিন্তু সহজেই এ-কক্ষ তিনটিকে পরিণত করা যায় দু-কক্ষে। পদসাংগঠনিক কক্ষ ও রূপান্তর কক্ষকে বিবেচনা করা যায় বাক্যিক কক্ষ-এর দুটি উপকক্ষ ব'লে। § ৪.৫.১.১-৪.৫.১.৩ পরিচ্ছেদাংশগুলোতে *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণের কলাকৌশলের যে-বিবরণ দেয়া হয়েছে, সে-অনুসারে এ-ব্যাকরণের পূর্ণ রূপ দেখানো যায় (৬৪) রূপে :

(৬৪)

পদসাংগঠনিক কক্ষ — পদসাংগঠনিক উপকক্ষ
⇓
আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র
⇓
মৌ ল গ্র ন্থি
⇓
ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র
(বাক্যিক কক্ষ; আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র, ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র — রূপান্তর উপকক্ষ)

জ টি ল গ্র ন্থি
⇓
রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র — রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ
⇓
ধ্ব নি রূ প
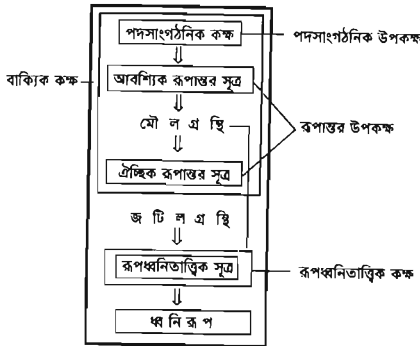
বাক্যিক কক্ষ এ-ব্যাকরণের প্রাণ। বাক্যিক কক্ষের ভিত্তি হচ্ছে পদসাংগঠনিক (উপ)কক্ষ, যা একগুচ্ছ পুনর্লিখন সূত্রের সমষ্টি। পদসাংগঠনিক সূত্র কর্তৃক গঠিত আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয় রূপান্তর সূত্র, এবং পাওয়া যায় আহরিত সংগঠন। আহরিত সংগঠনের ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যায় বাক্যের ধ্বনিরূপ।

৪.৫.২ *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* প্রণালিতে বাক্যবিশ্লেষণ

চোমস্কির *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* (১৯৫৭) প্রকাশের পর এ-গ্রন্থে প্রস্তাবিত ব্যাকরণকাঠামোর ভিত্তিতে রচিত হয় ইংরেজি ও অন্যান্য অনেক ভাষার খণ্ডিত ব্যাকরণ (দ্র গ্লিটম্যান (১৯৬১), লিজ (১৯৬০), ক্লিমা (১৯৬৪), ম্যাথিউজ (১৯৬৪))। ১৯৫৭-১৯৬৫ সময়কালে এ-ব্যাকরণকাঠামো সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হ'তে থাকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে (দ্র ক্যাটজ ও ফোডোর (১৯৬৩), ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪), চোমস্কি (১৯৬৫)), এবং ভাষা সৃষ্টি বা বর্ণনার জন্যে এ-কাঠামোকে আর ব্যবহার করা হয় না। এখন আর *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষাসৃষ্টি বা বর্ণনার চেষ্টা করা হয় না কোথাও। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* ব্যাকরণকাঠামো বর্তমানে পরিত্যক্ত। তবে এ-কাঠামোকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে চোমস্কীয় রূপান্তর ব্যাকরণের নতুন কাঠামো, যার নাম *আস্পেক্টস*-কাঠামোর ব্যাকরণ (দ্র § ৪.৬)। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণ বর্তমানে যদিও পরিত্যক্ত, তবু এ-ব্যাকরণের বাক্যসৃষ্টির কৌশল দেখানোর জন্যে বাঙলা ভাষার এক তুচ্ছ খণ্ডাংশ এখানে *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর প্রণালিতে বর্ণনা করা হবে। প্রথম নেয়া যাক উপাত্ত (৬৫) :

(৬৫) ক একটি মেয়ে বই পড়ছে।
ক' মেয়েটি বই পড়ছে।
খ একটি মেয়ে বই পড়ছে না।
খ' মেয়েটি বই পড়ছে না।
গ দুটি মেয়ে বই পড়ছে।
গ' মেয়ে দুটি বই পড়ছে।
ঘ দুটি মেয়ে বই পড়ছে না।
ঘ' মেয়ে দুটি বই পড়ছে না।

(৬৫) উপাত্তে আছে আটটি বাক্য। আমাদের দায়িত্ব এ-উপাত্তের ব্যাকরণ রচনা করা। এ-উপাত্ত পদসাংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যেও সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু এখানে আমাদের দায়িত্ব *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের সাহায্যে এ-উপাত্ত সৃষ্টি। প্রথম স্থির

করতে হবে (৬৫) উপাত্তে মৌল বাক্য কোনগুলো; এবং সে-বাক্যগুলোর আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করতে হবে পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে। পরে পদসাংগঠনিক সূত্রের রচিত আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করতে হবে অমৌল বাক্যগুলো। তাই (৬৫) উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে প্রথমে নিতে হবে দু-বিষয়ে সিদ্ধান্ত :

[ক] (৬৫) উপাত্তে মৌল বাক্য কোনগুলো, অর্থাৎ শনাক্ত করতে হবে উপাত্তের মৌল বাক্যগুলো।

[খ] স্থির করতে হবে কী কী রূপান্তর—আবশ্যিক, ও ঐচ্ছিক—বাক্যগুলোতে ক্রিয়াশীল।

[ক] উপাত্তের মৌল বাক্য : (৬৫ক, ক´)র মধ্যে (৬৫ক)কে ('একটি মেয়ে বই পড়ছে') গ্রহণ করা যায় মৌল বাক্য রূপে। এ-বাক্যটির সংগঠন হচ্ছে : নির্দেশক + বিশেষ্য + বিশেষ্য + ক্রিয়ারূপ'। এটিতে আছে দুটি বিপ ('একটি মেয়ে', 'বই'); তার মধ্যে প্রথম বিশেষ্যপদের বাঁয়ে আছে নির্দেশক। (৬৫ক´) বাক্যটির সংগঠনও অনুরূপ, এবং আপাতদৃষ্টিতে সরলতর; তবে এটিতে নির্দেশকটি ('টি') বসেছে প্রথম বিপ-র ডানে। 'একটি মেয়ে' হচ্ছে একটি 'অনির্দিষ্ট বিপ' এবং 'মেয়েটি' হচ্ছে 'নির্দিষ্ট বিপ'। বাঙলায় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের বাঁয়ে বসে নির্দেশক, এবং নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের ডানে বসে নির্দেশক। অনির্দিষ্টতা ও নির্দেশকের বিশেষ্যের বাঁয়ে অবস্থানকে ধরছি সরল ব'লে; এবং নির্দিষ্টতা ও নির্দেশকের বিশেষ্যের ডানে অবস্থানকে ধরছি জটিল ব'লে। তাই (৬৫ক, ক´)র মধ্যে প্রথমটিকে ধরছি মৌল বাক্য ব'লে। (৬৫)র অন্যান্য বাক্যের মধ্যে (৬৫গ) বাক্যটি ('দুটি মেয়ে বই পড়ছে') (৬৫ক)র সমতুল্য : এ-বাক্য দুটির সংগঠন অভিন্ন। এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে (৬৫ক)তে যেখানে বসেছে 'এক', (৬৫গ)তে সেখানে বসেছে 'দু'। এ-বাক্য দুটিকে গ্রহণ করতে পারি (৬৫) উপাত্তের মৌল বাক্য ব'লে, এবং এদের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে আহরণ করা যায় অন্যান্য বাক্য। (৬৫খ, খ´) বাক্য দুটি বেশ জটিল : এ-বাক্যযুগল নিষেধাত্মক। (৬৫ঘ, ঘ´) বাক্যযুগলও নিষেধাত্মক। (৬৫গ´) বাক্যটির প্রথম বিশেষ্যপদটি নির্দিষ্ট, এবং তাই এটি (৬৫ক, গ)র চেয়ে জটিল। (৬৫ক, গ) বাক্য দুটি সরল, বিবৃতিধর্মী, হ্যাঁ-সূচক, অনির্দিষ্ট কর্তা-বিশেষ্যপদ সম্বলিত বাক্য। এ-বাক্য দুটি উপাত্তের সরলতম, সুতরাং, মৌল বাক্য। অন্যান্য বাক্য অমৌল, বা রূপান্তরের সাহায্যে গঠিত।

[খ] উপাত্তের বাক্যে ক্রিয়াশীল রূপান্তরসমূহ : উপাত্তে থাকতে পারে আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র, এবং ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র। বাঙলায় রয়েছে মাত্র একটি আবশ্যিক রূপান্তর সূত্র : কর্তা-ক্রিয়া সঙ্গতিসূত্র। কিন্তু এ-উপাত্তে যেহেতু সব বাক্যেই তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ শ্রেণীর কর্তা-বিশেষ্যপদ ব্যবহৃত, তাই বাঙলা ভাষার সঙ্গতি সূত্রটি এ-উপাত্তে ধরা পড়ে নি। তবু মনে করা যাক, এ-উপাত্তে কর্তা-ক্রিয়ারূপ সঙ্গতির একটি আবশ্যিক সূত্র রয়েছে (সূত্রটি হচ্ছে : ক্রিয়ারূপ

বাক্যের কর্তার পুরুষ (শ্রেণী)র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে)। তাই এ-উপাত্তে পাওয়া যাচ্ছে একটি আবশ্যিক সূত্র। এখন দেখা যাক, এ-উপাত্তে কী কী ঐচ্ছিক রূপান্তর সক্রিয়। দুটি ঐচ্ছিক রূপান্তর চোখে পড়ে এ-উপাত্তে। এদের মধ্যে একটি খুব স্পষ্ট; এবং সেটির নাম দিতে পারি নিষেধ রূপান্তর। (৬৫খ, খ´, ঘ, ঘ´) বাক্যগুলো নিষেধাত্মক। এ-বাক্যগুলোকে আহরণ করতে হবে মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর নিষেধ রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে। দ্বিতীয় ঐচ্ছিক রূপান্তরটি অস্পষ্ট, সহজে চোখে পড়ে না; এর নাম দিতে পারি *নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর*। (৬৫)র বাক্যগুলোর কয়েকটি বাক্যের কর্তা অনির্দিষ্ট ('একটি মেয়ে', 'দুটি মেয়ে'), এবং কয়েকটি বাক্যের কর্তা নির্দিষ্ট ('মেয়েটি', 'মেয়ে দুটি')। অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক ('একটি', 'দুটি') থাকে বিশেষ্যের বাঁয়ে, এবং নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক থাকে বিশেষ্যের ডানে। সুতরাং অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদকে *নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর সূত্র* প্রয়োগ ক'রে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে পরিণত করা যায়। পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় অনির্দিষ্ট, ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ। কিন্তু অমনভাবে সৃষ্টি করলে মনে হবে যে বাঙলা অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্পষ্টভাবে আমি বোধ করি যে বাঙলা অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এদের সংগঠন প্রায় অভিন্ন : পার্থক্য শুধু এখানে যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক বসে বিশেষ্যের বাঁয়ে, আর নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে বসে বিশেষ্যের ডানে। অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের এ-সম্পর্ক উদঘাটন করা যে-কোনো বর্ণনাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাকরণের কর্তব্য। সুতরাং এ-উপাত্তে ক্রিয়াশীল রূপান্তর সূত্র পাওয়া যাচ্ছে তিনটি :

[ক] কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সঙ্গতি সূত্র (*আবশ্যিক*]

[খ] নিষেধ রূপান্তর [*ঐচ্ছিক*]

[গ] নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর [*ঐচ্ছিক*]

আমরা জানি যে রূপান্তর ব্যাকরণে পদসাংগঠনিক ও রূপান্তর— দু-ধরনের সূত্রই প্রযুক্ত হয় ক্রমানুসারে (দ্র § ৪.৩.২; ৪.৪.৩)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ-সূত্র তিনটির প্রয়োগক্রম কী হবে? সঙ্গতি সূত্রটি প্রযোজ্য সব বাক্যে, তাই এটিকে স্থান দেয়া যায় সবার শেষে। নিষেধ রূপান্তর, ও নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর-এর মধ্যে কোনটি আগে প্রযুক্ত হবে? সূত্রের ক্রমরক্ষা অবশ্য সর্বদা দরকারি নয় (এখানেও নয়), তবে অনেক সময়, বাহ্যিক ক্রমবিন্যস্ত সূত্রের ক্রম বিনষ্ট হ'লে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্য তৈরি হয়। এ-উপাত্তের নিষেধ রূপান্তর ও নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর-এর প্রয়োগের ক্রমও নির্ণয় করা যায়। (৬৫গ´, ঘ´) বাক্য দুটি তুলনা করা যাক : উভয় বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদই নির্দিষ্ট; কিন্তু (৬৫গ´) বাক্যটি 'হ্যাঁ-সূচক' এবং (৬৫ঘ´) বাক্যটি 'না-সূচক'।

আমরা স্থির করেছি যে 'হ্যাঁ-সূচক', ও 'না-সূচক'—উভয় রকম বাক্যেই থাকতে পারে। যদি উপাত্ত থেকে জটিল, না-সূচক বাক্য অর্জন করি, তবুও থাকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ, এবং নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর। তাই নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর প্রযুক্ত হবে নিষেধ রূপান্তর-এর আগে। (৬৫) উপাত্ত সৃষ্টির জন্যে রূপান্তর সূত্রক্রম হবে নিম্নরূপ :

[ক] নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর [ঐচ্ছিক]

[খ] নিষেধ রূপান্তর [ঐচ্ছিক]

[গ] কর্তা-ক্রিয়া (রূপ) সঙ্গতি সূত্র [আবশ্যিক]

(৬৫) উপাত্তের মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টির জন্যে দরকার হবে পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ (৬৬) :

(৬৬)	ক	বাক্য	→	বিপ + ক্রিপ
	খ	ক্রিপ	→	বিপ + ক্রিরূ
	গ	ক্রিরূ	→	ক্রিমূ + ক্রিস
	ঘ	ক্রিস	→	ক্রিরী + কাল + সঙ্গতি
	ঙ	বিপ	→	{ নি + বি$_{\text{মনুষ্য}}$/— | বি$_{\text{বস্তু}}$ }
	চ	নি	→	সংখ্যা + অনু
	ছ	বি$_{\text{মনুষ্য}}$	→	{ বি-প্রপু | বি-দ্বিপু | বি-তৃপু }
	জ	বি-দ্বিপু	→	{ বি-দ্বিপ-সম্মান | বি-দ্বিপু-সাধারণ | বি-দ্বিপু-হীন }
	ঝ	বি-তৃপু	→	{ বি-তৃপু-সম্মান | বি-তৃপু-সাধারণ }
	ঞ	ক্রিরী	→	{ সরল | ঘটমান | ঘটিত }

ট	কাল	→	বর্তমান
ঠ	ক্রিমূ	→	পড়
ড	বিবস্তু	→	বই
ঢ	বি-প্রপু	→	আমি, আমরা
ণ	বি-দ্বিপু-সম্মান	→	আপনি, আপনারা
ত	বি-দ্বিপু-সাধারণ	→	তুমি, তোমরা
থ	বি-দ্বিপু-হীন	→	তুই, তোরা
দ	বি-তৃপু-সম্মান	→	তিনি, তাঁরা
ধ	বি-তৃপু-সাধারণ	→	মেয়ে, সে, তারা
ন	সংখ্যা	→	এক, দু
প	অনু	→	টি
ফ	সরল	→	∅
ব	ঘটমান	→	ছ্
ভ	ঘটিত	→	এ ছ্
ম	বর্তমান	→	∅

এ-সূত্রগুলো গঠন করবে (৬৫)র মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন, এবং তার ওপর প্রয়োজনীয় রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা যাবে অন্যান্য বাক্য (এ-সূত্রগুলো উপাত্ত-অতিরিক্ত বহু বাক্য সৃষ্টি করবে। উপাত্তে আছে শুধু তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ বিশেষ্য, কিন্তু এখানে বাঙলা ভাষার সব রকম বিশেষ্যপদ সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। উপাত্তে শুধু ঘটমান ক্রিরী রয়েছে; কিন্তু (৬৬) ব্যাকরণে তিন প্রকার —'সরল', 'ঘটমান', 'ঘটিত' —ক্রিরী সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যাকরণটি প্রচুর শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টির সাথে সাথে বেশ কিছু অশুদ্ধ বাক্যও সৃষ্টি করবে। (৬৬ঙ) সূত্রটি সংশোধনযোগ্য। সূত্রটি নির্দেশ করছে যে মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বসতে পারে কর্তারূপে, এবং বস্তুবাচক বিশেষ্য কর্মরূপে। সূত্রটিতে আরো একটি শর্ত আরোপ করা দরকার যে কর্তা যদি সর্বনাম হয়, তবে তার বাঁয়ে *নি* (নির্দেশক) বসতে পারে না, কিন্তু তা যদি বিশেষ্য হয়, তবে নির্দেশক বসবে। (৬৬) ব্যাকরণের সূত্র প্রয়োগের সময় এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে)। এ-ব্যাকরণের সাহায্যে বাক্যসৃষ্টির জন্যে একটি রূপান্তর আবশ্যিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে, এবং সে-রূপান্তরটি হচ্ছে *কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সঙ্গতি রূপান্তর*। ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে আভ্যন্তর সংগঠন (৬৭) :

(৬৭)
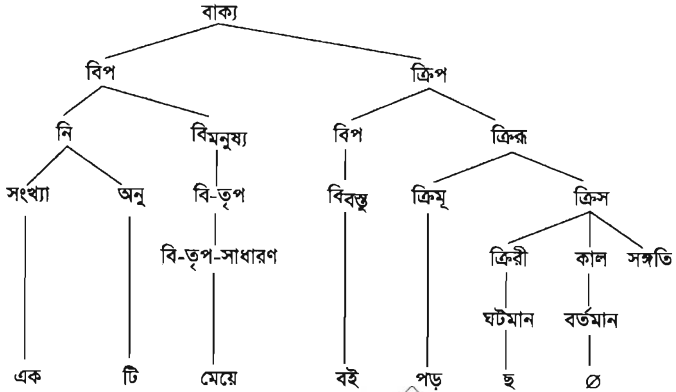
(৬৭)র অন্ত্যগ্রন্থি # এক+টি+মেয়ে+বই+পড়+ছ+∅#)। (৬৭)তে সঙ্গতি রূপান্তর এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে 'একটি মেয়ে বই পড়ছে'; অর্থাৎ (৬৫ক) বাক্যটি। (৬৭)র আভ্যন্তর সংগঠনটির ওপর তিনটি রূপান্তর সূত্র প্রযুক্ত হ'তে পারে : নির্দিষ্টায়ন, নিষেধ, ও সঙ্গতি রূপান্তর। এখন আমাদের কর্তব্য এ-রূপান্তরগুলোর সূত্র রচনা করা।

[ক] নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর সূত্র : (৬৭)র কর্তা-বিশেষ্যপদটির (বাক্য-শুরুর বিশেষ্য-পদটির) সংগঠন নি+বি$_{\text{মনুষ্য}}$। এটি একটি অনির্দিষ্ট বিপ। এ-বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের বাঁয়ে আছে নি, যার সংগঠন সং+অনু। এ-অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদটিকে কীভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে পরিণত করা যায়? বাঙলা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে *নি* থাকে বিশেষ্যের বাঁয়ে : যেমন—'একটি মেয়ে', 'দুটি মেয়ে', 'পাঁচটি পাখি' প্রভৃতি। কিন্তু নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে *নি* থাকে বিশেষ্যের ডানে : যেমন—'মেয়েটি', 'মেয়ে দুটি', 'পাখি পাঁচটি'। কিন্তু এর মধ্যে একটি চমৎকার ব্যাপার লুকিয়ে আছে। *নি* যদি গঠিত হয় সংখ্যা 'এক' এবং 'টি'-তে, তবে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের ডানে *নি* বসার সময় *নি*-র 'এক' সংখ্যাটি লোপ পায়। লোপ পায়, কেননা 'এক' সংখ্যাটি 'পুনরুদ্ধারযোগ্য'। কিন্তু *নি*-র সংখ্যাটি যদি হয় অন্য কোনো সংখ্যা—যেমন : 'দু', 'তিন', 'চার' প্রভৃতি—, তবে তা, পুনরুদ্ধারঅযোগ্য ব'লে, লোপ পায় না। যেমন : 'একটি মেয়ে' ⇒ 'মেয়ে একটি' ⇒ 'মেয়েটি' 'দুটি মেয়ে' ⇒ 'মেয়ে দুটি'। সুতরাং নির্দিষ্টায়ন সূত্রকে পেশ করা যায় এ-ভাবে : 'অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের বাঁয়ে অবস্থিত নির্দেশকটিকে স্থানান্তরিত করুন বিশেষ্যের ডানে; এবং নির্দেশকটির সংখ্যা যদি 'এক' হয় তবে তা বিলোপ

করুন, অন্যথায় তা রক্ষা করুন।' কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণসম্মত সূত্র রচনা করতে হ'লে (৬৭) পদচিত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, এবং সংগঠনটিকে বর্ণনা করতে হবে সূত্রটির জন্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। দেখা যাবে যে-বিশেষ্যপদের ওপর নির্দিষ্টায়ন সূত্র প্রযোজ্য, সে-বিশেষ্যপদের ডান-বাঁয়ের কোনো উপাদান এ-সূত্র প্রয়োগে কোনো রকম শর্ত আরোপ করে না। এ-সূত্রটি প্রয়োগের সময় বাক্যের অন্যান্য পদের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া যায়। নির্দিষ্টায়ন সূত্রটি হবে নিম্নরূপ :

(৬৮) নির্দিষ্টায়ন রূপান্তর সূত্র [ঐচ্ছিক]

[ক] ঙ — সং + অনু — বি — ঙ ⇒ ঙ — বি — সং — অনু — ঙ

[খ] ঙ — বি — সং + অনু — ঙ ⇒ ঙ — বি + অনু — ঙ

শর্ত : যদি সংখ্যা = এক

সূত্রটি দুটি অংশে — 'ক', ও 'খ'— বিভক্ত। সূত্রটিতে তীরের বাঁ-পাশে আছে আভ্যন্তর সংগঠনের বর্ণনা, এবং ডানে দেখানো হয়েছে সাংগঠনিক রূপান্তর। (৬৮ক) নির্দেশ দিচ্ছে যে সং + অনু — বি রূপ সংগঠন পাওয়া গেলে (সংগঠনের বাঁয়ে-ডানে যা-ই থাকুক (কভারপ্রতীক 'ঙ'-দ্বারা নির্দেশিত)) তাকে বি — সং + অনু রূপী সংগঠন রূপান্তরিত করতে হবে। (৬৮খ) নির্দেশ করছে আরো রূপান্তর। এটি প্রযুক্ত হবে (৬৮ক) সূত্রের উপাদানের ওপর। এটি নির্দেশ করছে যে যদি বি—সং+অনু রূপী কোনো সংগঠনে সং হয় 'এক', তবে তাকে পরিত্যাগ ক'রে সংগঠনটিকে বি+অনু রূপ দিতে হবে। (৬৮ক) সূত্রটি (৬৯ক) পদচিত্রকে (অর্থাৎ ৬৭-র কর্তা-বিশেষ্যপদটিকে) রূপান্তরিত করবে (৬৯খ)তে; এবং (৬৮খ) সূত্রটি (৬৯খ)কে রূপান্তরিত করবে (৬৯গ)তে।

(৬৯)
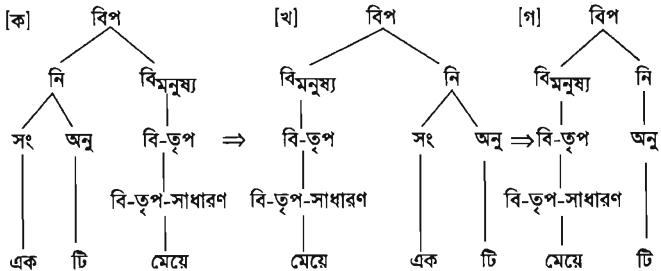
(৬৮) সূত্রের সাহায্যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে পরিণত করা যায়।

[খ] নিষেধ রূপান্তর সূত্র : নিষেধ রূপান্তরের কাজ হলো হ্যাঁ-সূচক বাক্যকে না-সূচক বাক্যে রূপান্তরিত করা। (৬৬) ব্যাকরণের সূত্রগুলো গঠন করে হ্যাঁ-সূচক বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন (দ্র ৬৭))। এ-সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে একে না-সূচক বাক্যসংগঠনে রূপান্তরিত করতে হবে। (৬৫)র উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ক'রে বুঝি যে হ্যাঁ-সূচক বাক্যের ডান প্রান্তে 'নিষেধ চিহ্ন' না যোগ করে গঠন করতে হয় নিষেধাত্মক বাক্য।

নিষেধাত্মক বাক্যগঠনের সূত্রটি, সরল গদ্যে, হবে এমন : 'হ্যাঁ-সূচক বাক্যের ডান প্রান্তে *না* যোগ করুন।' এ-নির্দেশের রূপান্তর ব্যাকরণসম্মত সূত্র হবে (৭০) :

(৭০) নিষেধ রূপান্তর সূত্র [*ঐচ্ছিক*]

বিপ — ক্রিপ# ⇒ # বিপ — ক্রিপ — *না*

(৭০) সূত্রটি আভ্যন্তর সংগঠনে যোগ করে একটি নতুন ভাষাবস্তু—*না*; এবং এটি যুক্ত হয় বাক্যের ডান প্রান্তে। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণের পদচিত্রে রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে কোনো রকম ভাষাবস্তু যোগ করা নিষিদ্ধ, তবে *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* ব্যাকরণের পদচিত্রে ভাষাবস্তু-যোগ-করা রূপান্তর প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। (৭০) সূত্রটি (৬৭) পদচিত্রটিকে রূপান্তরিত করবে (৭১)-এ :

(৭১)
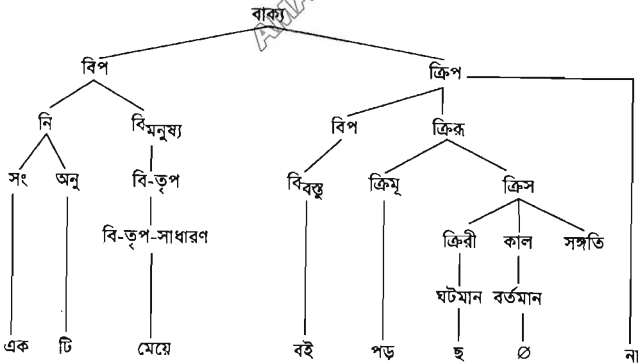
(৭১)-এর অন্ত্যগ্রন্থি হচ্ছে এক+টি+মেয়ে+বই+পড়্+ছ+∅ +না। (৭১)-এ কর্তা-ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি সূত্র প্রয়োগ করা দরকার গ্রহণযোগ্য বাক্যগঠনের জন্যে। সঙ্গতি সূত্র প্রয়োগের পর যে-আহরিত সংগঠন পাওয়া যাবে, তার ওপর প্রয়োগ করতে হবে

রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র—বাক্যের ধ্বনিরূপ পাওয়ার জন্যে। যদি সঙ্গতি সূত্র প্রয়োগ ছাড়াই (৭১)-এর ওপর প্রয়োগ করি রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র, তবে পাওয়া যাবে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্য '*একটি মেয়ে বই পড়ছ না'।

[গ] কর্তা-ক্রিয়া (রূপ) সঙ্গতি সূত্র [*আবশ্যিক*] : (৬৫) উপাত্তে যদিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নি, তবুও আমরা জানি যে বাঙলায় ক্রিয়ারূপ কর্তার সাথে পুরুষ(শ্রেণী)গত সঙ্গতি রক্ষা করে (দ্র § ৪.৪.১)। এ-সূত্রটিকে, সরল গদ্যে, পেশ করা যায় এ-ভাবে : 'কর্তা-বিশেষ্য যে-পুরুষ(শ্রেণী)র, ক্রিয়ারূপও হবে সে-পুরুষ(শ্রেণী)র।' সূত্রটির সারকথা যতো সহজ সরল, বাস্তবে সূত্রটি ততো সহজ সরল নয়। কেননা ব্যাকরণে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হবে কেমন কর্তার জন্যে কেমন, বা কী ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হবে সঙ্গতিজ্ঞাপনের জন্যে। সূত্রটি নানাভাবে রচনা করা যায় : (ক) রূপান্তর সূত্রের মধ্যেই দেখিয়ে দেয়া যায় কোন পুরুষ(শ্রেণী)র কর্তার সাথে সঙ্গতির জন্যে কী ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হবে; (খ) সূত্রে শুধু সঙ্গতির সারকথা নির্দেশ করা যায়, এবং সহায়ক একটি সূত্রে সঙ্গতিজ্ঞাপক বস্তুরাশির দীর্ঘ তালিকা দেয়া যায়। দ্বিতীয় প্রণালি অনুসারে সূত্রটি হবে নিম্নরূপ :

(৭২) কর্তা-ক্রিয়া(রূপ) সঙ্গতি সূত্র [*আবশ্যিক*]

সংগঠনিক বর্ণনা : [ঙ—সঙ্গতি—ঙ]

সাংগঠনিক রূপান্তর :

[ক] সঙ্গতি ⇒ { সং-প্রপু/প্রপু—
সং-দ্বিপু-সম্মান/দ্বিপু-সম্মান—
সং-দ্বিপু-সাধারণ/দ্বিপু-সাধারণ—
সং-দ্বিপু-হীন/দ্বিপু-হীন—
স-তৃপু-সম্মান/তৃপু-সম্মান—
সং-তৃপু-সাধারণ/তৃপু-সাধারণ }

[খ] সং-প্রপু → ই

সং-দ্বিপু-সম্মান, সং-তৃপু-সম্মান → এন

সং-দ্বিপু-সাধারণ → ও

সং-দ্বিপু-হীন → ইস

সং-তৃপু-সাধারণ → এ

সঙ্গতি সূত্রটিকে ভাগ করা হয়েছে দু-ভাগে : (৭২ক) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে কর্তা যদি হয় প্রথম পুরুষের, তবে সঙ্গতিও হবে প্রথম পুরুষের; কর্তা যদি হয় দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মান শ্রেণীর, তবে সঙ্গতিও হবে দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মান শ্রেণীর ইত্যাদি। (৭২খ) অংশটি নির্দেশ করছে সঙ্গতির জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভাষাবস্তু। প্রথম পুরুষ কর্তার সাথে সঙ্গতির জন্যে দরকার 'ই'; দ্বিতীয় পুরুষ-সম্মান, ও তৃতীয় পুরুষ-সম্মান কর্তার সাথে সঙ্গতির জন্যে দরকার অভিন্ন ভাষাবস্তু—'এন' ইত্যাদি। (৭২ক, খ) সূত্র (৭১) সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে (৭৩) পদচিত্র।

(৭৩)
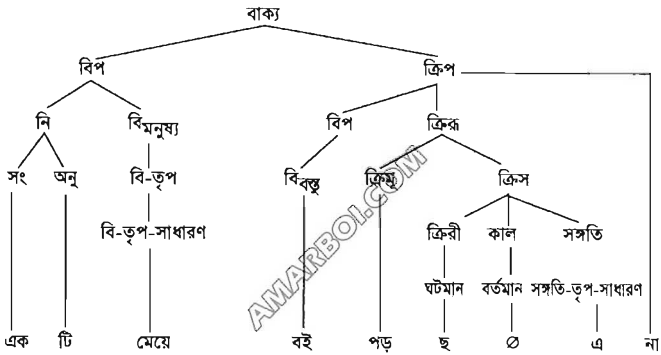
(৭৩) পদচিত্রটি দুটি রূপান্তর—নিষেধ ও সঙ্গতি—প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট। রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে এটিতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে দুটি ভাষাবস্তু—'এ', ও 'না'। (৭৩)-এর অন্ত্যগ্রন্থির ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'একটি মেয়ে বই পড়ছে না', অর্থাৎ (৬৫খ) বাক্যটি।

(৬৬) ব্যাকরণটি সৃষ্টি করবে (৬৫) উপাত্তের মৌল বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠন; এবং এটির ওপর শুধু কর্তা-ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি সূত্র, (৭২),এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫ক)। আভ্যন্তর সংগঠন (৬৭)র ওপর নির্দিষ্টায়ন সূত্র (৬৮), এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫ক´)। আভ্যন্তর সংগঠন (৬৭)র ওপর নিষেধ রূপান্তর (৭০), এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫খ)। (৬৭)র ওপর (৬৮) ও (৭০) ও (৭২), এবং রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫খ´)। (৬৭) পদচিত্রে সংখ্যারূপে নির্বাচন করা হয়েছে 'এক'; কিন্তু এর বদলে 'দু'-কেও নির্বাচন করা যায়। (৬৬)র সূত্র প্রয়োগের সময় সংখ্যা হিশেবে 'দু'-কে গ্রহণ ক'রে যে-পদচিত্র পাওয়া

যাবে, তার ওপর প্রয়োজনীয় রূপান্তর প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (৬৫ গ, গঁ, ঘ, ঘঁ) বাক্যগুলো।

৪.৫.৩ স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব : বাক্য ও অর্থ

চোমস্কি (১৯৫৭, ১৩-১৭, ৯২-১০৫) বারবার দাবি করেছেন যে বাক্যতত্ত্ব স্বায়ত্তশাসিত; এবং তিনি বাক্যসৃষ্টি ও বর্ণনায় অর্থের ভূমিকা অস্বীকার করেছেন। তাঁর এ-দাবি তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ (১৯৫৭)। এ-বইতে তিনি যে-ব্যাকরণকাঠামো পেশ করেন, তাতে আছে মাত্র দুটি কক্ষ—বাক্য কক্ষ ও রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ (দ্র § ৪.৫.১; ৪.৫.১.৩); তাতে কোনো আর্থ কক্ষ নেই। চোমস্কির চিন্তায় বাক্য ভাষার কেন্দ্রবস্তু; তিনি বাক্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়াসূত্র রচনা করতে চেয়েছেন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিহার ক'রে। তাঁর তত্ত্বে বাক্যগঠনপ্রক্রিয়া অর্থ-স্বাধীন। রূপান্তর ব্যাকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপান্তর ব্যাকরণে যুক্ত হয় একটি আর্থকক্ষ, কিন্তু তাতেও অর্থ অধিকার ক'রে থাকে অপ্রধান ভূমিকা (দ্র ক্যাটজ ও ফোডোর (১৯৬৩), ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪), চোমস্কি (১৯৬৫), হেবেইনরেইখ (১৯৬৬))। চোমস্কিকে বলা যায় 'সাংগঠনিক রূপান্তরবাদী'; তাঁর অর্থচিন্তার সাথে সাংগঠনিকদের অর্থচিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। সাংগঠনিকেরা অর্থনিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন ভাষা-উপাত্ত, চোমস্কিও অর্থমুক্তভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বাক্য, অর্থাৎ উভয় ব্যাকরণই 'ফর্মাল', বা রৌপ। এ-বিষয়ে তিনি সাংগঠনিকদের সাথে তাঁর আদিসম্পর্ক কোনোদিন ছিন্ন করতে পারেন নি। অর্থ ও বাক্যের যে-দাঙ্গা চ'লে আসছিলো বহু দিন ধ'রে, তিনি তা থামাতে পারেন নি। যেহেতু তিনি ব্যাকরণকে মনে করেন অর্থ-স্বাধীন; তাই তাঁর ধারার রূপান্তর ব্যাকরণকে বলা হয় 'স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব' [অ্যাটন্যামাস সিন্ট্যাক্স]। অর্থকে তিনি সংশ্লিষ্ট মনে করেছেন ভাষাব্যবহারের সাথে, এবং ব্যাকরণের দায়িত্ব ব'লে স্থির করেছেন ভাষার সমস্ত ব্যাকরণসম্মত বাক্যসৃষ্টি। ভাষার আধার-আধেয়র বৈপরীত্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন চোমস্কি, এবং দাবি করেছেন যে আধারের বিশ্লেষণ চলা উচিত আধেয়রিক্তভাবে। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ তিনি যে ব্যাকরণকাঠামো গঠন করেছেন, সে-সম্পর্কে চোমস্কির(১৯৫৭, ৯৩) মত হচ্ছে যে ওই ব্যাকরণকাঠামো 'সম্পূর্ণভাবে রৌপ,এবং অর্থবিরহিত'। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* (১৯৫৭), ও অন্যান্য রচনায় তিনি শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করাকে ব্যাকরণের দায়িত্ব ব'লে মনে করেন। চোমস্কি-উত্তর রূপান্তরবাদীরা অর্থরিক্তভাবে বাক্যসৃষ্টিকে ভ্রান্ত ব'লে মনে করেন। (দ্র ফিলমোর (১৯৬৮), ল্যাকফ (১৯৬৫, ১৯৭১), ম্যাক্কলি (১৯৬৮, ১৯৭০); § ৪.৭)। ভাষার 'রূপ' বা 'আধার'কে আমি অর্থনিরপেক্ষভাবে বর্ণনার পক্ষপাতী নই, আমি মনে করি যে অর্থই ভাষার প্রাণবস্তু, এবং বাক্য ও অর্থ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ; তবুও ভাষার রূপ, বা আধারকে যে অর্থনিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করা যায়, তা নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে দেখানো হলো।

প্রথাগত ব্যাকরণে বহুব্যবহৃত দুটি ভাষিক ধারণা হচ্ছে *বিশেষ্য* ও *কর্তা*। প্রথাগত ব্যাকরণে বিশেষ্যের সংজ্ঞা দেয়া হয় এভাবে; 'কোনো ব্যক্তি, বস্তু, বা স্থানের নামকে বিশেষ্য

বলে।' বিশেষ্য একটি বাক্যিক ক্যাটেগরি, কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে তার দেয়া হয় আর্থ সংজ্ঞা। কিন্তু এ-আর্থ ও মুক্ত সংজ্ঞার সাহায্যে কোনো একটি শব্দ বিশেষ্য কি-না, তা সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি বিশেষ্যের সংজ্ঞায় উল্লেখিত 'বস্তু' বলতে আমরা 'বাস্তব পদার্থ' বুঝি, তবে বিশেষ্যরূপে পরিগণিত বহু বিশেষ্যকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন : 'প্রেম', 'স্নেহ', 'স্বপ্ন', 'সরলতা' প্রভৃতি বিশেষ্য অ-পদার্থ। আবার 'বস্তু'র পরিধি যদি এমনভাবে বাড়িয়ে দিই যে বিশ্বের সমস্ত কিছুকেই 'বস্তু' বলা যায়, তবে সংজ্ঞাটি হয়ে ওঠে বৃত্তাকার ও অসার। যেহেতু 'বস্তু' কী,তা নির্ণয়ের কোনো স্বাধীন মানদণ্ড নেই, তাই বিশেষ একটি শব্দ কোনো বস্তু নির্দেশ করছে কি-না, তা বোঝার জন্যে আমাদের আগেই জেনে নিতে হয় ওই বিশেষ শব্দটি বিশেষ্য কি-না। এমন কোনো আর্থ বৈশিষ্ট্য নেই, যা সমস্ত বিশেষ্যে, বা অন্যান্য পদে উপস্থিত। বিশেষ্য কোনো আর্থ ক্যাটেগরি নয়। তাই বিশেষ্য নির্ণয়ের জন্যে সাহায্য নিতে হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বোধের, যার নাম *বণ্টন*। শুদ্ধ বাক্যের যে-সমস্ত *প্রতিবেশ*-এ কোনো একটি ভাষাবস্তু ব্যবহৃত হ'তে পারে, সে-সমস্ত প্রতিবেশের সমষ্টি হচ্ছে ওই ভাষাবস্তুটির বণ্টন। বণ্টন নির্ণয়ের জন্যে সাহায্য নেয়া হয় *প্রতিকল্পন* প্রণালির। নিচের উদাহরণটি লক্ষণীয় :

(৭৪) একটি { ছেলে, মেয়ে, / কুকুর, বেড়াল / ঘোড়া, যুবতী } তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো।

(৭৪)-এর বাক্যে দেখা যায় নির্দেশক 'একটি'-র পর 'ছেলে, মেয়ে, কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, যুবতী' প্রভৃতি ভাষাবস্তু বসতে পারে; কিন্তু (৭৪) বাক্যে 'একটি'-র পর, অর্থাৎ 'একটি—' প্রতিবেশে 'চমৎকার', 'ভয়াবহভাবে', 'অত্যন্ত' প্রভৃতি ভাষাবস্তু বসতে পারে না। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে বাঙলায় এমন একটি ভাষাবস্তু-শ্রেণী রয়েছে, যা 'একটি'-র পর ব্যবহৃত হ'তে পারে; ওই ভাষাবস্তু-শ্রেণীর নাম দেয়া যায় 'বিশেষ্য'। বণ্টনিক প্রণালিতে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি পদনির্ণয়ের তাৎপর্য হচ্ছে যে ব্যাকরণের ভাষাবস্তুরাশির ভূমিকা বিচার না ক'রে ওই ভাষাবস্তুগুলোর পদনির্ণয় অসম্ভব। বিশেষ্যের সংজ্ঞা দেয়া যায় এভাবে : 'যে-সব ভাষাবস্তু 'একটি'-র পরে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তাই বিশেষ্য।' এমন সংজ্ঞায়ও বিপত্তি দেখা দিতে পারে। যেমন : আমরা বলতে পারি 'আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি'; তাই 'স্বপ্ন'কে গ্রহণ করতে হয় বিশেষ্যরূপে; কিন্তু আমরা বলতে পারি না '*একটি স্বপ্ন তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো।' আমরা বলতে পারি '/ক/ একটি ধ্বনিমূল'; তাই 'ধ্বনিমূল' শব্দটিকে গ্রহণ করতে হয় বিশেষ্যরূপে; কিন্তু বলতে পারি না '*একটি ধ্বনিমূল তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো।' তাই বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করতে হবে একটি ব্যাপক শ্রেণীকে, যার সদস্যসমূহকে আবার বিন্যস্ত

করতে হবে, বণ্টনিক প্রণালিতে, নানা উপশ্রেণীতে। এমন শ্রেণীকরণ ও শ্রেণীনির্ণয়ে অর্থের কোনো ভূমিকা নেই।

কর্তা-বিষয়ক উদাহরণের সাহায্যেও দেখানো যায় যে বাক্যিক ও আর্থ ধারণার মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। বিশেষ্য, বা বিশেষ্যপদ হচ্ছে *বাক্যিক ক্যাটেগরি*, এবং কর্তা হচ্ছে *ভূমিকাগত ক্যাটেগরি*। এক একটি বাক্যিক ক্যাটেগরি পালন করে নানাবিধ ভূমিকাগত ক্যাটেগরির দায়িত্ব। (৭৫)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৭৫) ক হাসান হাসিনাকে ভালোবাসে।

খ হাসান হাসিনাকে খুন করেছে।

ওপরের বাক্য দুটিকে 'হাসান' ও 'হাসিনা'কে, বিশেষ রকম বণ্টন অনুসারে, শনাক্ত করতে হয় বিশেষ্যপদরূপে; কিন্তু বাক্য দুটিতে এদের ভূমিকাগত পরিচয় অন্য রকম। উভয় বাক্যেই হাসান কর্তা, এবং হাসিনা কর্ম। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে কর্তার সংজ্ঞা দেয়া হয় এভাবে : 'বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহাই ক্রিয়ার কর্তা' (দ্র মুনীর ও অন্যান্য (১৯৭২, ২৮৫))। কর্তার এ-সংজ্ঞা আর্থ, এবং বিভ্রান্তিকর। অনেক বাক্যে কর্তা যদিও ক্রিয়া সম্পন্ন করে, কিন্তু প্রচুর বাক্যে কর্তা কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করে না। (৭৫ক) বাক্যের কর্তা হাসান কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করে না; কিন্তু (৭৫খ) বাক্যের কর্তা হাসান সত্যই ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বাঙলায় কর্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগত ক্যাটেগরি, কিন্তু আর্থ সংজ্ঞার সাহায্যে কর্তানির্ণয় অসম্ভব। বাঙলা বাক্যের কর্তা, সম্পূর্ণরূপে, আর্থ নয়, বাক্যিক। বাঙলা ভাষায় লক্ষ্য করা যায় যে বাক্যের ক্রিয়ারূপ বাক্যের বিশেষ একটি বিশেষ্যপদের সাথে পুরুষ(শ্রেণী)গত সঙ্গতি রক্ষা করে (দ্র § ৪.৪.১)। যে-বিশেষ্যপদটির সাথে ক্রিয়ারূপ পুরুষ(শ্রেণী)গত সঙ্গতি রক্ষা করে, সে-বিশেষ্যপদটিই বাক্যের কর্তা। এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে অর্থবিরহিত। প্রশ্ন উঠতে পারে : বাক্যের কোন বিশেষ্যপদের সাথে ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি রক্ষা করবে? এ-প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া সম্ভব (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩)।

বাক্য বা অর্থের দাঙ্গা ভাষাবিজ্ঞানের এক বড়ো সমস্যা। সাংগঠনিকেরা ভাষাবর্ণনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন অর্থকে; চোমস্কিও অর্থরহিতরূপে বাক্যসৃষ্টির পক্ষপাতী। ফোডোর ও ক্যাটজ (১৯৬৩) একটি শ্লোগান চালু করেছিলেন যে 'ভাষাবর্ণনা থেকে ব্যাকরণ বিয়োগ করলে যা থাকে, তাই অর্থতত্ত্ব।' রূপান্তর ব্যাকরণের বিবর্তনের সাথে তরুণ রূপান্তরবাদীদের অভিনিবেশ আকৃষ্ট হয় অর্থতত্ত্বের দিকে। ফিলমোর (১৯৬৬খ, ১৯৬৮ক) প্রস্তাব করেন আর্থ *কারক ব্যাকরণ* (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩), এবং আরো পরে *সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব*বাদীরা দাবি করেন যে অর্থই ভাষার মূলবস্তু (দ্র ল্যাকফ (১৯৬৫, ১৯৭১), ম্যাকলি (১৯৬৮, ১৯৭০); § ১.৭))। ফলে ভাঙন ধরে রূপান্তরবাদী শিবিরে। চোমস্কি ও তাঁর অনুসারীরা অর্থনিরপেক্ষ সীমিত শক্তিসম্পন্ন রূপান্তর ও *বাক্যিক গভীর তল* নিয়ে বাক্যসৃষ্টি করতে থাকেন, এবং উপাধি

পান *স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ববাদী*, এবং *শব্দবাদী* (দ্র চোমস্কি (১৯৭০খ), জ্যাকেনডফ (১৯৭২))। যাঁরা অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে বাক্যিক গভীর তল পরিহার ক'রে শক্তিশালী রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে বাক্যসৃষ্টির সাধনা করতে থাকেন, তাঁরা অভিধা পান *সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদী*, এবং *রূপান্তরবাদী*। চোমস্কি রূপান্তর ব্যাকরণের স্রষ্টা, এবং সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আদিবিপ্লবী, কিন্তু তিনি তাঁর পরিণততম রচনায়ও লালন করেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাব (অর্থতত্ত্ব বিষয়ে)। রূপান্তর ব্যাকরণের তীব্র অগ্রগতির সাথে রূপান্তর ব্যাকরণের প্রথম ও প্রধান তাত্ত্বিক হয়ে ওঠেন সংশোধনবাদী; এবং অতিতীব্র তত্ত্ব নিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকেন তরুণ বিপ্লবীরা।

৪.৬.১ *আস্পেক্টস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণ

১৯৫৭-উত্তরকালে রূপান্তর ব্যাকরণের দ্রুত সংশোধন, সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এতে প্রধান ভূমিকা নেন চোমস্কি নিজে; এবং তাঁর সাথে যুক্ত হন আরো কয়েকজন প্রতিভাবান ভাষাবিজ্ঞানী, যাঁরা *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণ উন্নয়নে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোয় রচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে রবার্ট বি লিজ-এর *দি গ্রামার অফ ইংলিশ নোমিনালাইজেশন* (১৯৬০)। ১৯৬৩-১৯৬৪ বছর দুটি রূপান্তর ব্যাকরণের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : ১৯৬৩ সালে বেরোয় ক্যাটজ ও ফোডোর-এর বিখ্যাত নিবন্ধ 'দি স্ট্রাকচার অফ এ সিম্যানন্টিক থিওরি' (১৯৬৩); এবং ১৯৬৪ সালে বেরোয় ক্যাটজ ও পোস্টাল-এর গ্রন্থ *অ্যান ইন্টেগ্র্যাটেড থিওরি অফ লিংগুইস্টিক ডেসক্রিপশন্স* (১৯৬৪), যার ওপর ভিত্তি ক'রে গঠিত হয় *আস্পেক্টস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের আর্থকক্ষ। ক্যাটজ ও ফোডোর-এর নিবন্ধ (১৯৬৩) রচিত হয় *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণকে আর্থকক্ষ দিয়ে সাহায্য করার জন্যে। এ-নিবন্ধের একটি অংশের নাম 'ভাষিক বর্ণনা থেকে ব্যাকরণ বাদ দিলে যা থাকে, তাই অর্থতত্ত্ব'; অর্থাৎ ব্যাকরণ=বাক্যতত্ত্ব + ধ্বনিতত্ত্ব। তাঁদের নিবন্ধে দুটি স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় : (ক) অর্থতত্ত্ব ভাষিক বর্ণনার অপরিহার্য অঙ্গ, এবং (খ) বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব, ব্যাকরণের দু-অংশ হ'লেও, পরস্পরপৃথক, ও স্বায়ত্তশাসিত। ক্যাটজ ও পোস্টাল -এর (১৯৬৪) গ্রন্থে সম্প্রসারিত হয় ক্যাটজ ও ফোডোর-এর (১৯৬৩) বক্তব্য, এবং একটি সুষ্ঠু, যোগ্য ব্যাকরণকাঠামো গঠনের জন্যে পেশ করা হয় মূল্যবান প্রস্তাব। এ-গ্রন্থের যে-সব প্রস্তাব চোমস্কি তাঁর *আস্পেক্টস অফ দি থিওরি অফ সিন্ট্যাক্স* (১৯৬৫) গ্রন্থে গ্রহণ করেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

[ক] সমস্ত ঐচ্ছিক এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর পরিত্যাগ করা হয় (অর্থাৎ প্রশ্ন রূপান্তর, নিষেধ রূপান্তর, আদেশ রূপান্তর প্রয়োগের *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*সম্মত রীতি পরিত্যাগ করা হয়)। এ-সমস্ত রূপান্তর প্রয়োগের জন্যে বাক্যের গভীর তল-এ স্থাপন করা হয় 'প্রশ্ন', 'নিষেধ', 'আদেশ', প্রভৃতি বিমূর্ত বস্তু, এবং এ-সমস্ত রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগ নির্ভরশীল হয়ে ওঠে উল্লিখিত বিমূর্ত বস্তুরাশির বাক্যের গভীর তলে

উপস্থিতির ওপর। এ-বিমূর্ত বস্তুরাশি অর্থবহ : যেমন—কোনো বাক্যের গভীর তলে 'প্রশ্ন' বিমূর্ত বস্তুটি উপস্থিত থাকলে বুঝতে হবে যে বাক্যটি প্রশ্নবোধক; তাই ওই গভীর সংগঠনটির ওপর প্রয়োগ করা হবে প্রশ্ন রূপান্তর সূত্র। এ-গ্রন্থের প্রস্তাব—'রূপান্তর সূত্র অর্থসংরক্ষক' বা 'রূপান্তর সূত্র বাক্যার্থ পরিবর্তন করবে না'—মৌল নীতিরূপে গৃহীত হয় *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে।

[খ] ক্যাটজ ও পোস্টাল যে অর্থতত্ত্ব পেশ করেন, তাকে ব্যাকরণের অংশ করার জন্যে তাঁরা প্রস্তাব করেন এক নতুন ব্যাকরণকাঠামো, যা পূর্ণ রূপ পায় চোমস্কির *আস্পেক্টস অফ দি থিওরি অফ সিন্ট্যাক্স* (১৯৬৫) গ্রন্থে। এ-ব্যাকরণকাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ব্যাকরণের সমস্ত রূপান্তর সূত্র অর্থসংরক্ষক। সুতরাং এতে বাক্যের সমগ্র অর্থ নির্ণীত হয় বাক্যের গভীর তলে।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় চোমস্কির *আস্পেক্টস* অফ দি থিওরি অফ সিন্ট্যাক্স। এ-গ্রন্থের প্রস্তাবিত ব্যাকরণকাঠামো পরিচিত *স্ট্যান্ডার্ড থিওরি* নামে (দ্র চোমস্কি (১৯৭২), ৬৬))। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* ও *আস্পেক্টস* ব্যাকরণকাঠামোর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান; উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশি, এবং একমাত্র সাদৃশ্য হচ্ছে উভয় কাঠামোই রূপান্তরবাদী। *আস্পেক্টস* ব্যাকরণকাঠামো অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন, এবং ভাষাসৃষ্টির জন্যে অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। *আস্পেক্টস*-এ গৃহীত প্রধান পরিবর্তনসমূহ :

[ক] রূপান্তর সূত্র বাক্যার্থ সংরক্ষক।

[খ] ভাষায় কোনো স্বাধীন মূল্য নেই ব'লে 'মৌল বাক্য' ধারণা পরিত্যগ করা হয় (§ ৪.৫.১.১))।

[গ] ব্যাকরণের পৌনপুনিক শক্তির অধিকার অর্পিত হয় পদসাংগঠনিক সূত্রের ওপর (অর্থাৎ ক →ক জাতীয় সূত্র গ্রহণ করা হয় (দ্র § ৪.৩.২))।

[ঘ] যেহেতু পদসাংগঠনিক সূত্রের ওপর অর্পিত হয় পৌনপুনিক শক্তি, তাই ব্যাকরণ থেকে পরিত্যাগ করা হয় একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক সূত্র (দ্র § ৪.৫.১.২)। চক্রাবর্তন নীতি অনুসারে আভ্যন্তর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় রূপান্তর সূত্র (দ্র § ৪.৬.১১.২)।

চোমস্কির *আস্পেক্টস* ব্যাকরণকাঠামো ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষাবর্ণনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ক্রমশ এ-কাঠামোর ব্যাকরণের বিরুদ্ধে দেখা দিতে থাকে তীব্র আপত্তি, এবং চোমস্কি সামান্য পরিমাণে সংস্কার করেন তাঁর মানতত্ত্ব : স্ট্যান্ডার্ড থিওরি। চোমস্কির মানতত্ত্ব মর্মমূলে বহন করেছেন আত্মবিনাশের বীজ, আর এ-বীজ সরবরাহ করেছিলেন ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪)। তাঁদের প্রস্তাবিত, এবং চোমস্কি কর্তৃক গৃহীত নীতি : 'বাক্যের সমগ্র অর্থ নির্ণীত হবে বাক্যের গভীর তলে'—এ-ব্যাকরণকাঠামোকে ক'রে তুলেছে

আত্মবিনাশী। যদি বাক্যের সমগ্র অর্থ গভীর তলে নির্ণয় করতে হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয় অত্যন্ত গভীর ও বিমূর্ত তল, যা চোমস্কি কল্পনা করেন নি, এবং কখনো মেনে নেন নি। এমন সুগভীর ও বিমূর্ত তল হয়ে ওঠে বাক্যের অর্থের বিমূর্ত ও অ-বাক্যিক উপস্থাপন। বাক্যের অর্থ চূড়ান্তরূপে গভীর তলে নির্ণয় করতে হ'লে ছেড়ে দিতে হয় চমস্কীয় *বাক্যিক গভীর তল*, গ্রহণ করতে হয় *আর্থ গভীর তল*। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা বিমূর্ত, সুগভীর, আর্থ তলের সন্ধানী। কিন্তু চোমস্কি অতো গভীরে যেতে চান না, কেননা তাতে তাঁর বাক্য বিপদগ্রস্ত হয়। তীব্র চাপে চোমস্কি (১৯৭২) তাঁর মানতত্ত্ব সামান্য সংস্কার করেন এবং ওই সংস্কৃত তত্ত্বের নাম দেন *অ্যাক্সটেন্ডেড স্ট্যান্ডার্ড থিওরি* [সম্প্রসারিত মানতত্ত্ব]।

সম্প্রসারিত মানতত্ত্বে তিনি যে-সংস্কার গ্রহণ করেন, তা সরলভাবে প্রকাশ করা যায় এভাবে : 'শুধু গভীর তল নয়, বহির্তলও, অনেকাংশে বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে।' কিন্তু তাঁর সম্প্রসারিত মানতত্ত্ব বিশেষ সাড়া জাগায় নি। এ-তত্ত্বে তাঁর প্রধান অনুসারী জ্যাকেনডফ (১৯৭২)।

৪.৬.২ *আস্পেক্টস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের সংগঠন

আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণ ত্রিকক্ষিক : (ক) বাক্যিক কক্ষ : বাক্যসৃষ্টিকারী সূত্রসমষ্টি; (খ) আর্থকক্ষ : সৃষ্ট বাক্যের অর্থনির্ণায়ক সূত্রসমষ্টি; এবং (গ) ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ : সৃষ্ট বাক্যের ধ্বনিরূপে-নির্ণায়ক সূত্রসমষ্টি। এ-ব্যাকরণকাঠামোর সরল রূপ (৭৬)।

(৭৬)

বাক্যিক কক্ষ	⇐	আর্থকক্ষ
⇓		
ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ		
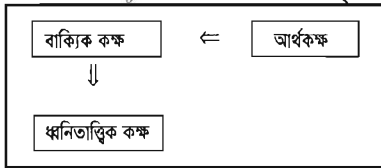
বাক্যিক কক্ষের সূত্রগুলো সৃষ্টি করে ভাষার সমস্ত বাক্য। এটি হচ্ছে রূপান্তর ব্যাকরণের প্রধান, এবং সৃষ্টিশীল কক্ষ। চোমস্কি বাক্যিক কক্ষের ওপরই আরোপ করেছেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব; এবং এ-কক্ষের কার্যকলাপ বর্ণনায়ই নিয়োগ করেছেন তাঁর প্রায় সমস্ত শক্তি। আর্থকক্ষ তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়; এটি তিনি ব্যাকরণে যুক্ত করেন প্রধানত ক্যাটজ ও পোস্টালের (১৯৬৪) পরামর্শে। আর্থকক্ষের ক্রিয়াকলাপ চোমস্কি অভিনিবেশের সাথে কখনোই বর্ণনা করেন নি;—তিনি যেনো এ-কক্ষটির শক্তি আবিষ্কারের ভার ছেড়ে দিয়েছেন অন্যদের ওপর। ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ *আস্পেক্টস*-এ বিশেষ গুরুত্ব পায় নি; তবে পরে হালের সহায়তায়

(দ্র চোমস্কি ও হাল (১৯৬৮)) এ-কক্ষের ভূমিকা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। আর্থকক্ষ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ সৃষ্টিশীল নয়, বাক্যকক্ষের সৃষ্ট বাক্যের আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাষ্য দেয়া এ-কক্ষ দুটির দায়িত্ব। তাই এ-কক্ষ দুটি ভাষ্যাত্মক। আর্থকক্ষের সূত্রগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে বাক্যকক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট বাক্যের অর্থ নির্ধারণ; ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষের সূত্রগুলোর দায়িত্ব সৃষ্ট বাক্যরাশির ধ্বনিরূপ নির্ণয়। বাক্যকক্ষের সূত্রগুলো প্রতিটি বাক্যের জন্যে নির্দেশ করে দুটি তল, বা সংগঠন : এদের প্রথমটি হচ্ছে *গভীর তল*, বা *গভীর সংগঠন*, যা বহন করে বাক্যের সমগ্র অর্থ ; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে *বহির্তল*, বা *বহিঃসংগঠন*, যা নির্দেশ করে বাক্যের ধ্বনিরূপ। আর্থকক্ষের সূত্র প্রযুক্ত হয় বাক্যের গভীর তলের ওপর, এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষের সূত্র প্রযুক্ত হয় বাক্যের 'বহির্তলে'র ওপর। কোনো বাক্যের গভীর তল, ও বহির্তল যে অভিন্ন হবে, তা নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভীর তল ও বহির্তল আকৃতিতে ভিন্ন হয়। বাক্যের গভীর তল সাধারণত বেশ.ব্যাপক, তা ধারণ করে বাক্যের অর্থের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান; এবং গভীর তলের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ করার ফলে বাক্যের সংগঠন বিচিত্ররূপে বদলে যায়। গভীর তলে প্রতিটি বাক্য অদ্ব্যর্থ; কিন্তু বহির্তলে তা দ্ব্যর্থ হ'তেও পারে।

আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণ তিনটি কক্ষে বিভক্ত; এবং এদের প্রধানতম কক্ষ-বাক্যকক্ষ বা বাক্যিক কক্ষ—আবার বিভক্ত দুটি উপকক্ষে :

[ক] ভিত্তি উপকক্ষ

[খ] রূপান্তর (মূলক) উপকক্ষ

ভিত্তি কক্ষটি, পুনরায়, বিভক্ত দু-ভাগে:

[ক] পদসাংগঠনিক উপকক্ষ

[খ] আভিধানিক উপকক্ষ

ভিত্তি কক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রগুলো বা ভিত্তিসূত্রগুলো সৃষ্টি করে একরাশ ভিত্তিগ্রন্থি, এবং প্রতিটি ভিত্তিগ্রন্থির সাথে সংযুক্ত থাকে একটি ক'রে পদচিত্র। ভিত্তিসূত্রগুলো প্রযুক্ত হওয়ার ফলে গঠিত হয় *ভিত্তি পদচিত্র*, এবং ওই ভিত্তি পদচিত্রের উপান্ত্যগ্রন্থিতে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন শব্দ। অভিধান থেকে যে-সমস্ত সূত্রের সাহায্যে পদচিত্রের উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দ সরবরাহ করা হয়, তাদের বলা হয় *শাব্দসূত্র*। উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দ সরবরাহের ফলে রচিত হয় অন্ত্যগ্রন্থি। ভিত্তিসূত্র ও শাব্দসূত্র প্রয়োগের ফলে অন্ত্যগ্রন্থিসম্বলিত যে-পদচিত্র পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে বাক্যের গভীর তল, বা গভীর সংগঠন। গভীর তল নির্দেশক পদচিত্রকে বলা হয় ভিত্তি পদচিত্র। বাক্যের অগভীর সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় আর্থকক্ষের সূত্র, এবং নির্ণয় করা হয় বাক্যের অর্থ। এ-গভীর সংগঠন (বা তল)-এর ওপর প্রয়োগ করা হয় রূপান্তর কক্ষের রূপান্তর সূত্র; এবং বদলে যায় বাক্যের গভীর সংগঠন। গভীর তলের ওপর রূপান্তর সূত্র

প্রয়োগ ক'রে যে-আহরিত, বা *রূপান্তরিত তল* পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে বাক্যের বহির্তল, বা বহিঃসংগঠন। বাক্যের গভীর তলকে বহির্তলে রূপান্তরিত করাই হচ্ছে রূপান্তর সূত্রের কাজ। রূপান্তর সূত্র অবশ্য বাক্যের ধ্বনিরূপ নির্দেশ করে না, নির্দেশ করে বাক্যের *বাক্যিক বহির্তল*, যা বাস্তবে অগ্রাহ্য। বাক্যিক বহির্তলের ওপর (রূপ) ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যায় বাক্যের ধ্বনিরূপ। *আস্পেক্টস* কাঠামোর রূপান্তর ব্যাকরণের বিস্তৃত সংগঠন নিম্নরূপ :

(৭৭)
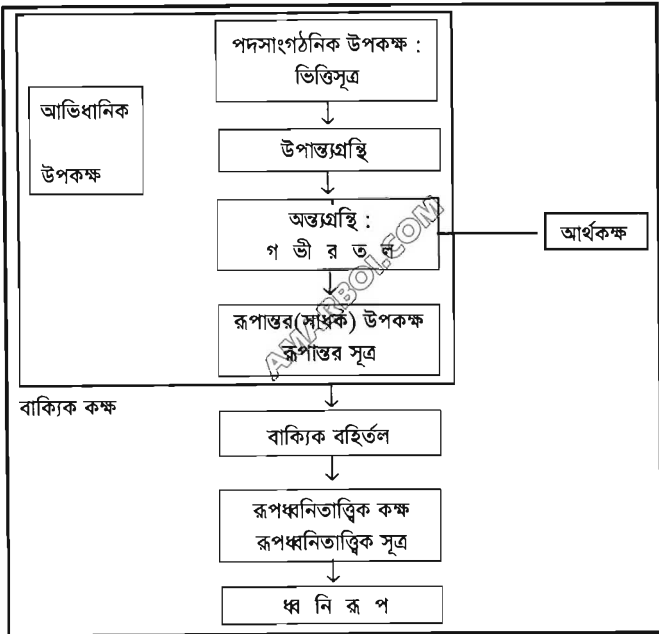
এ-ব্যাকরণও স্বায়ত্তশাসিত। এ-ব্যাকরণের সৃষ্ট বাক্যের গভীর তল স্বায়ত্তশাসিত, এবং বাক্যের গভীর তলই বাক্যের সমগ্র অর্থ, ও *ব্যাকরণিক সম্পর্ক* নির্দেশ করে। এ-ব্যাকরণের আর্থ-ও ধ্বনি-সূত্রগুলো ভাষ্যাত্মক। আর্থকক্ষ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ এ-ব্যাকরণে এমনভাবে বিন্যস্ত যাতে বোঝা যায় যে ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে কোনো শাশ্বত ধ্রুব সম্পর্ক নেই। চোমস্কীয় *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণেও বাক্যকক্ষ প্রধান, ও সৃষ্টিশীল, কক্ষ।

৪.৬.৩ ভিত্তিকক্ষ : আভ্যন্তর, বা গভীর সংগঠনের (তলের) বৈশিষ্ট্য

রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তি : এ-কক্ষের (পদসাংগঠনিক; ভিত্তি) সূত্ররাশি গঠন করে ব্যাকরণ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বাক্যের *আভ্যন্তর সংগঠন* (*তল*), বা, *গভীর সংগঠন* (*তল*)। চোমস্কি ভিত্তিকক্ষের সূত্র কেমন হবে, তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন; এবং তিনি, অনেক ক্ষেত্রে, একই সমস্যা সমাধানের জন্যে পেশ করেছেন একাধিক বিকল্প প্রস্তাব (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৬৩-১২৭))। ভিত্তিকক্ষের সূত্রগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এ-সূত্রগুলোই গঠন করে বাক্যের গভীর তল, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংগঠনিক বর্ণনা দেয় গভীর তলের; এবং বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকা—কর্তা, কর্ম প্রভৃতি—নির্ণয় করে। পদসাংগঠনিক সূত্রের সুষ্ঠুতা ও সফলতার ওপরেই নির্ভর করে ব্যাকরণের মৌল সাফল্য। *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের স্বরূপ, বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার জন্যে একটি উদাহরণ নেয় যাক :

(৭৮) ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে।

(৭৮) বাক্যটি বেশ সহজ সরল। প্রথাগত ব্যাকরণ এ-বাক্যটি সম্পর্কে কী কী তথ্য পরিবেশন করবে? প্রথাগত ব্যাকরণ বাক্যটি বর্ণনা করতে গিয়ে সম্ভবত পরিবেশন করবে (৭৯)র তথ্য (দ্র চোমস্কি (১৯৬০, ৬৩-৬৪)):

(৭৯) [ক] (৭৮)-এর গ্রন্থিটি একটি বাক্য (বা); 'একটি মেয়েকে ভালোবাসে' হচ্ছে (একটি) ক্রিয়াপদ (ক্রিপ), এবং এটি গঠিত হয়েছে একটি ক্রিয়ারূপ (ক্রিরূ)'ভালোবাসে' ও একটি বিশেষ্যপদ (বিপ) 'একটি মেয়েকে'র সমবায়ে। 'ছেলেটি' একটি বিশেষ্যপদ (বিপ)। বিশেষ্যপদ 'ছেলেটি' গঠিত হয়েছে বিশেষ্য 'ছেলে' ও অনুসর্গ (অনু) 'টি'র মিলনে। 'একটি মেয়েকে' বিশেষ্যপদটিতে 'একটি' হচ্ছে নির্দেশক (নি), যা গঠিত হয়েছে সংখ্যাশব্দ (সং) 'এক', ও অনুসর্গ 'টি'র মিলনে। 'মেয়েকে' অংশটি গঠিত হয়েছে বিশেষ্য (বি) 'মেয়ে', ও বিভক্তি (বিভ) 'কে'র মিলনে।

[খ] (৭৮) বাক্যের বিশেষ্যপদ 'ছেলেটি' পালন করছে বাক্যের কর্তার ভূমিকা; অর্থাৎ এটি কর্তা; এবং ক্রিয়াপদ 'একটি মেয়েকে ভালোবাসে' পালন করছে বিধেয়র ভূমিকা, অর্থাৎ এটি বিধেয়। 'একটি মেয়ে(কে)' পালন করছে ক্রিয়াপদের কর্মের ভূমিকা, অর্থাৎ এটি কর্ম; এবং ক্রিয়ারূপ 'ভালোবাসে'র ক্রিয়ামূল (ক্রিমূ) রূপে কাজ করছে 'ভালোবাস'; এবং 'এ' কাজ করছে ক্রিয়াসহায়ক (ক্রিস) রূপে। ব্যাকরণিক সম্পর্কে কর্তা-ক্রিয়া বিদ্যমান 'ছেলেটি' ও 'ভালোবাস'-এর মধ্যে;

এবং ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্ক বিদ্যমান 'ভালোবাস' ও 'একটি মেয়ে'র মধ্যে। অর্থাৎ ব্যাকরণ বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচয় নির্দেশ করে।

[গ] 'ছেলে' ও 'মেয়ে' *মনুষ্যবাচক* বিশেষ্য (এরা পৃথক 'বেড়াল', কুকুর' প্রভৃতি *অমনুষ্যবাচক* বিশেষ্য থেকে); এবং এরা *সাধারণ* বিশেষ্য (এরা ভিন্ন *নামবাচক* বিশেষ্য 'হাসান', 'সুচিত্রা' থেকে); এবং ভিন্ন সর্বনাম 'সে', 'তিনি' প্রভৃতি থেকে)। এরা সংখ্যাবাচক বিশেষ্য (অর্থাৎ এরা ভিন্ন 'তেল', 'পানি' প্রভৃতি *অগণনীয়* বিশেষ্য থেকে; এবং 'সরলতা', 'প্রীতি' প্রভৃতি *বিমূর্ত* বিশেষ্য থেকে); এরা *প্রাণীবাচক* বিশেষ্য (অর্থাৎ এরা পৃথক 'কলম', 'কাগজ' প্রভৃতি *বস্তুবাচক* বিশেষ্য থেকে); এবং এদের মধ্যে 'ছেলে' *পুংলিঙ্গ*, আর 'মেয়ে' *স্ত্রীলিঙ্গ*। 'ভালোবাস' একটি সকর্মক ক্রিয়ামূল (এটি ভিন্ন *অকর্মক* ক্রিয়ামূল 'কাঁদ' থেকে) এবং এটি কর্ম ছাড়াও ব্যবহৃত হ'তে পারে (এটি পৃথক সে-সব ক্রিয়ামূল থেকে, যারা সর্বদা সকর্মক); এবং এটি, সাধারণত, *ঘটমান* ক্রিয়ারীতি গ্রহণ করে না (এটি ভিন্ন 'পড়', 'বল' প্রভৃতি ক্রিয়ামূল থেকে)। এটি সাধারণত প্রাণীবাচক, বিশেষভাবে, মনুষ্যবাচক কর্তা গ্রহণ করে; এবং মনুষ্যবাচক, বস্তুবাচক, প্রাণীবাচক, বিমূর্ত সব রকম কর্ম গ্রহণ করে।

(৭৯)তে (৭৮) বাক্যটি সম্পর্কে তিন প্রকার তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে : (৭৯ক) পরিবেশন করছে *বাক্যিক ক্যাটেগরি*গত বা পদগত তথ্য; (৭৯খ) পরিবেশন করছে *ভূমিকা*গত তথ্য, এবং (৭৯গ) পরিবেশন করছে *উপপদ*গত—পদের আন্তর বৈশিষ্ট্যবিষয়ক তথ্য। (৭৮) বাক্যটি বর্ণনার জন্যে এসব তথ্য অপরিহার্য। চোমস্কি মনে করেন যে এসব তথ্য অতিশয় মূল্যবান; তাই যে-কোনো ব্যাকরণের (৭৮) বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯)র তথ্য পরিবেশন করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : উল্লিখিত তথ্য কীভাবে পরিবেশন করা সম্ভব বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনায়, এবং সুস্পষ্টভাবে সূত্রের সাহায্যে কীভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব এ-রকম সাংগঠনিক বর্ণনা? এ-প্রশ্নের, চোমস্কীয় রীতিতে, উত্তর দেয়া হচ্ছে নিম্নে (দ্র § ৪.৬.৪-৪.৬.৬)।

৪.৬.৪ পদশ্রেণীকরণ

(৭৮) বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯ক)তে পরিবেশিত তথ্যসমূহ প্রণিধানযোগ্য : (৭৯ক)তে (৭৮) গ্রন্থিটিকে ভাগ করা হয়েছে ধারাবাহিক কয়েকটি উপগ্রন্থিতে; এবং প্রত্যেকটি উপগ্রন্থিকে দেয়া হয়েছে কোনো-না-কোনো পদগত অভিধা (যেমন : *ক্রিপ*, *বিপ*, *ক্রিরূ* প্রভৃতি)। (৭৯ক)তে পরিবেশন করা হয়েছে যেসব তথ্য, তা পরিবেশন করা যায় (৭৮) গ্রন্থিটির 'বন্ধনিকরণ'-এর সাহায্যে; এবং সেসব তথ্য, অবিকলভাবে, উপস্থাপিত করা যায় (৮০) পদচিত্রে :

(৮০)
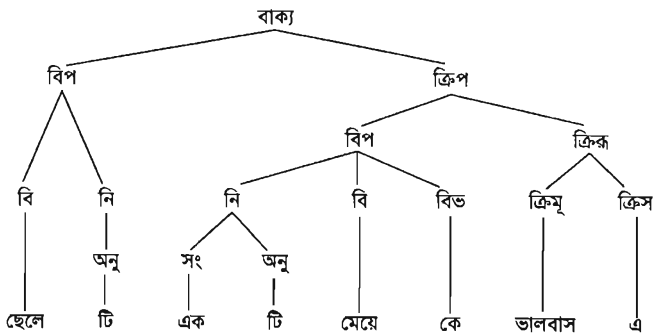
(৮০) পদচিত্রটিকে বলা যায় (৭৮) বাক্যের ভিত্তি পদচিত্র, বা মৌল পদচিত্র, বা গভীর সংগঠন (তল)। যে-পদসংগঠনিক ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে (৮০), তাতে ব্যবহৃত হয় দু-ধরনের প্রতীক :

[ক] ক্যাটেগরি প্রতীক বা পদপ্রতীক : যেমন : বাক্য, ক্রিপ, বিপ, বি, ক্রিমূ প্রভৃতি।

[খ] শব্দপ্রতীক : যেমন : ছেলে, টি প্রভৃতি ভাষাবস্তু নির্দেশক প্রতীক।
শব্দপ্রতীকগুলোকে আবার ভাগ করা যায় দু-ভাগে :

[খ.১] শব্দ (বস্তু) : যেমন : ছেলে, মেয়ে, ভালোবাস প্রভৃতি।

[খ.২] ব্যাকরণিক (বস্তু) : যেমন : ঘটমান, সরল, ঘটিত প্রভৃতি।

পদচিত্রে ব্যবহৃত (যেমন : (৮০)তে ব্যবহৃত) প্রতীকগুলো সম্পর্কে সরল স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন জাগতে পারে মনে : প্রশ্নটি হচ্ছে—পদচিত্রে ব্যবহৃত শব্দ ও প্রতীকগুলোর কোনো ভাষানিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য কি-না; না-কি এগুলো বিশেষ ব্যাকরণের প্রয়োজনে তৈরি স্মৃতিসহায়ক সংকেত মাত্র? এ-প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেয় ভাষার *সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য*-এর,এবং *সর্বজনীন ব্যাকরণ*-এর দিকে (দ্র § ৪.২.৯)।

পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব (৮০) রূপ পদচিত্র (দ্র § ৪.৩.২; ৪.৪)। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করে বাক্য। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ যদিও ভাষার সমস্ত বাক্য সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি করতে অক্ষম (দ্র § ৪.৪.৩), তবু পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে বাক্যের সংগঠন সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা যায়। তাই রূপান্তর ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষের ভিত্তি উপকক্ষরূপে ব্যবহার করা হয়

পদসাংগঠনিক সূত্র। অর্থাৎ রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ হচ্ছে একগুচ্ছ পদসাংগঠনিক সূত্রের সমষ্টি। (৮০) পদচিত্রটি সৃষ্টি করার জন্যে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ ব্যবহার করবে (৮১)র পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রগুলো :

(৮১)

[ক] বাক্য → বিপ + ক্রিপ

ক্রিপ → বিপ + ক্রিরূ

বিপ → { নি(র্দেশক) + বি / বি + নি(র্দেশক) }

ক্রিরূ → সংখ্যা + ক্রিস

নি → { অনু/বি— / সংখ্যা + নি }

[খ] বি → ছেলে, মেয়ে

ক্রিমূ → ভালোবাস

ক্রিস → এ

নি → টি

সংখ্যা → এক

(৮১)র সূত্রগুলোকে দু-ভাগে সাজানো হয়েছে : (৮১ক) ও (৮১খ); কেননা এ-দুভাগের সূত্রের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রয়েছে। (৮১ক)র সূত্রগুলো হচ্ছে ক্যাটেগরি সূত্র—পদগত সূত্র—, যা নির্দেশ করে বাক্যের উচ্চ ক্যাটেগরি। (৮১খ)র সূত্ররাশি শাব্দসূত্র, যা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ নির্দেশ করে। (৭৮) বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯ক)তে যে-তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, সে-সব তথ্য (৮১)র ব্যাকরণটি পরিবেশন করেছে (৮১ক) গুচ্ছের সূত্রের সাহায্যে, অর্থাৎ ক্যাটেগরি সূত্রের সাহায্যে। তাই রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে দেয়া যায় বাক্যের ক্যাটেগরিগত বর্ণনা।

৪.৬.৫ ভূমিকাগত পরিচয়

(৭৮) বাক্যটি সম্পর্কে (৭৯খ) যে-সমস্ত তথ্য পরিবেশন করে, তা (৭৯ক)তে পরিবেশিত তথ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (৭৯ক)তে পাওয়া যয় (৭৮) বাক্যটির ক্যাটেগরিগত তথ্য, বা বর্ণনা ; (৭৯খ)তে পাওয়া যায় বাক্যের কোন ক্যাটেগরি কোন ভূমিকা পালন করছে, তার

বিবরণ। *কর্তা* ধারণাটি জ্ঞাপন করে *ব্যাকরণিক* ভূমিকা; আর বিশেষ্যপদ বোধটি জ্ঞাপন করে *ব্যাকরণিক ক্যাটেগরি* বা *পদ*। কর্তা হচ্ছে একটি *সাম্পর্কিক ধারণা*। প্রথাগত ব্যাকরণ (৭৮) বাক্যটির 'ছেলেটি' সম্পর্কে জানাবে যে এটি একটি বিশেষ্যপদ (বিপ), এবং এটি পালন করে বাক্যের কর্তার ভূমিকা। কর্তা-কর্ম-বিধেয় প্রভৃতি হচ্ছে ভূমিকাগত বা সাম্পর্কিক ধারণা, যা পৃথক বিশেষ্যপদ-ক্রিয়াপদ প্রভৃতি ক্যাটেগরিতগত ধারণা থেকে। বাক্যে কোনো বিশেষ্যপদ পালন করে কর্তা-ভূমিকা, কোনোটি পালন করে কর্ম-ভূমিকা; এবং এক বা একাধিক বিশেষ্যপদ, ও একটি ক্রিয়ারূপ পালন করে বিধেয়-ভূমিকা। (৭৯খ)তে (৭৮) বাক্যটি সম্পর্কে পেশ করা হয়েছে যে-সব তথ্য, তা যদি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় (৮১)র সূত্রে, তবে (৭৮) বাক্যের গভীর সংগঠনের পদচিত্র হবে (৮২) :

(৮২)
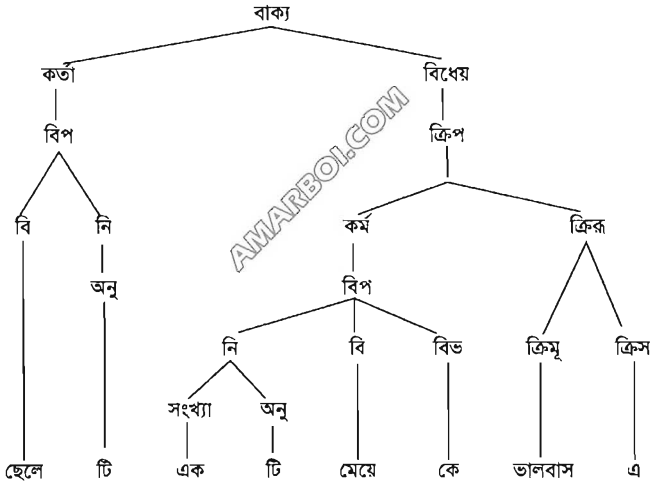
(৮২) পদচিত্রটি বাক্যের কর্তা, বিধেয়, কর্ম প্রভৃতি ভূমিকা নির্দেশ করছে। চোমস্কির (১৯৬৫, ৬৯) মতে পদচিত্রে বাক্যের ভূমিকাগত পরিচয় দেখানো ভুল। কেননা এতে জট পাকিয়ে যায় বাক্যের ক্যাটেগরিগত এবং ভূমিকাগত ধারণার মধ্যে। এতে কর্তা, কর্ম, বিশেষ্যপদ, ক্রিয়াপদ প্রভৃতিকে মনে হয় একই রকমের ক্যাটেগরি; এবং এর ফলে বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে এ-প্রণালিতে প্রশ্রয় পায় বাহুল্য। কর্তা, বিধেয়, কর্ম ধারণাগুলো যেহেতু সাম্পর্কিক, বা ভূমিকাগত বোধ, তাই এসব

(৮০) পদচিত্রেই প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই এসব বোধ পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা, এবং পদচিত্রে উপস্থিত করা অপ্রয়োজনীয়। বিভিন্ন পদের ভূমিকাগত পরিচয় বাক্যের গভীর সংগঠনের পদচিত্রেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চোমস্কি (১৯৬৫, ৭০-৭১) বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকা পদচিত্রে উপস্থিত করতে চান না, তিনি তা নির্দেশ করতে চান পদচিত্রের বিশেষ ব্যাখ্যার সাহায্যে। তাঁর মতে, বাক্যের গভীর তলীয় কর্তা হচ্ছে সে-বিশেষ্যপদটি, যেটির ওপর ব্যাকরণের আদিপ্রতীক 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে; এবং কর্ম হচ্ছে সে-বিশেষ্যপদটি, যেটির ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে 'ক্রিয়াপদ'। যেমন : (৮০) পদচিত্রে 'বাক্য' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'ছেলেটি' বিশেষ্যপদের ওপর; তাই 'ছেলেটি' হচ্ছে বাক্যের কর্তা; এবং 'ক্রিপ' প্রত্যক্ষ ভাবে আধিপত্য করছে 'একটি মেয়ে(কে)' বিশেষ্যপদের ওপর, তাই এ-বিশেষ্যপদটিই হচ্ছে কর্ম। আধিপত্য নীতি অনুসারে চোমস্কি (১৯৬৫, ৭১) বিভিন্ন ভূমিকার সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপে :

(৮৩)	[ক]	(বাক্যের)	কর্তা	[বিপ, বাক্য]
	[খ]	(বাক্যের)	বিধেয়	[ক্রিপ, বাক্য]
	[গ]	(ক্রিপ-র)	মুখ্য কর্ম	[বিপ, ক্রিপ]
	[ঘ]	(ক্রিপ-র)	মুখ্য ক্রিয়া :	[ক্রিমূ, ক্রিপ]

(৮৩ক) নির্দেশ করছে যে 'বাক্য'-এর প্রত্যক্ষ অধীন 'বিপ' হচ্ছে বাক্যের কর্তা; (৮৩খ) নির্দেশ করছে যে 'বাক্য'-এর প্রত্যক্ষ অধীন 'ক্রিপ' হচ্ছে বাক্যের বিধেয়; (৮৩গ) নির্দেশ করছে 'ক্রিপ'র প্রত্যক্ষ অধীন 'বিপ' হচ্ছে ক্রিয়াপদের মুখ্য কর্ম, এবং (৮৩ঘ) নির্দেশ করছে যে 'ক্রিপ'র প্রত্যক্ষ অধীন 'ক্রিমূ' হচ্ছে ক্রিয়াপদের মুখ্য ক্রিয়া। এ-নীতি অনুসারে (৮০) পদচিত্রের বিভিন্ন পদের ভূমিকা সহজে ও স্বাভাবিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। তাই ব্যাকরণের পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদের ভূমিকা নির্দেশ করা, এবং ভূমিকাগুলোকে পদচিত্রে উপস্থিত করা ভ্রান্ত বর্ণনা—যেহেতু তা ক্যাটেগরি ও ভূমিকার মধ্যে জট পাকায়, এবং ব্যাকরণে বাহুল্যকে প্রশ্রয় দেয়। চোমস্কির নির্দেশিত কর্তা হচ্ছে যৌক্তিক কর্তা, আর তা উপস্থিত থাকে বাক্যের গভীর তলে। চোমস্কির আধিপত্য নীতি অনুসারে বাক্যের বিভিন্ন পদের ভূমিকা নির্ণয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। *কারক ব্যাকরণ* অনুসারে বাক্যের গভীর তলে কর্তাকর্ম প্রভৃতি সম্পর্ক থাকে না; এ-ব্যাকরণ অনুসারে ভূমিকাগত পরিচয়গুলো হচ্ছে বাক্যের অগভীর তলের পরিচয়। (দ্র ফিলমোর (১৯৬৮))।

৪.৬.৬ বাক্যিক বৈশিষ্ট্য

(৭৮) বাক্যের যে-সমস্ত অন্ত্য উপাদান, বা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর প্রকৃতির, বা বৈশিষ্ট্যের যে-বিবরণ দেয়া হয়েছে (৭৯গ)তে, তা কী পরিমাণে পরিবেশন করা উচিত ব্যাকরণের বাক্যকক্ষে, সে-সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া বেশ কঠিন। (৭৯গ)তে করা হয়েছে

শব্দের *উপশ্রেণীকরণ*। এ-উপশ্রেণীকরণের দায়িত্ব কতোখানি বহন করবে বাক্যকক্ষ, আর কতোটা বইবে আর্থকক্ষ, তা নির্ণয় করাও কঠিন। চোমস্কি (১৯৬৫, ৭৫) এ-দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চান বাক্যকক্ষের ওপরই, কেননা, তাঁর মতে, বাক্যার্থ নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা বাক্যকক্ষের দায়িত্ব। চোমস্কীয় ব্যাকরণের আর্থকক্ষ ভাষ্যাত্মক। যখন সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে উপশ্রেণীকরণের সমস্ত দায়িত্ব বহন করবে বাক্যকক্ষ, তখন দেখা দেয় নতুন সমস্যা। সমস্যাটি হচ্ছে : শব্দ উপশ্রেণীকরণের সুষ্ঠুতম উপায় কী? চোমস্কি লক্ষ্য করেছেন যে শব্দের এমন উপশ্রেণীকরণের জন্যে প্রচলিত *শাখায়নপ্রণালি* ব্যবহার করা অসম্ভব; অর্থাৎ পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে শব্দের উপশ্রেণীকরণ সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ শুধু 'বিশেষ্য' শব্দগুলোকে গ্রহণ করা যাক। প্রথাগত ব্যাকরণে, সাধারণত (৮৪)র বৈশিষ্ট্য, বা বোধ অনুসারে বিশেষ্যের *উপবিভাগ*, বা *উপশ্রেণীকরণ* করা হয় :

(৮৪) নাম বিশেষ্য (সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য) বনাম সাধারণ বিশেষ্য (জাতিবাচক বিশেষ্য); মূর্ত বিশেষ্য বনাম বিমূর্ত বিশেষ্য; সংখ্যাবাচক বিশেষ্য বনাম পরিমাণবাচক বিশেষ্য; প্রাণীবাচক বিশেষ্য বনাম অপ্রাণী (বস্তু)বাচক বিশেষ্য; মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বনাম অমনুষ্যবাচক বিশেষ্য; পুং বনাম স্ত্রী বনাম ক্লীব বিশেষ্য ইত্যাদি। এখন অনুধাবন করা যাক (৮৫) পদচিত্রটির চারিত্র (দ্র § ৪.৩.১) :

(৮৫)
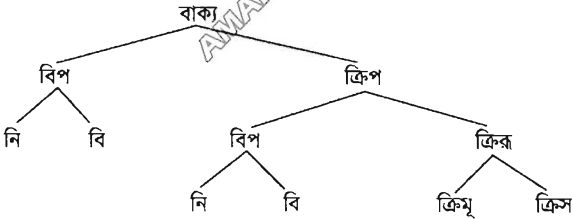
(৮৫) পদচিত্রটিতে স্থূল বৃন্তগুলো (বি, বি, ক্রিমূ) নির্দেশ করছে শব্দপ্রতীক। (৮৫) পদচিত্রটি নির্দেশ করছে *ক্রমস্তরিক বিন্যাসনীতি* : অর্থাৎ একটি বস্তুর নিচে আরেকটি বস্তু, এবং সেটির নিচে আরেকটি ইত্যাদি। মনে করা যাক, (৮৪)র বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে আমরা পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উপশ্রেণীকরণ করতে চাই বিশেষ্যগুলোকে। যদি শব্দকে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে চাই, তাহলে মেনে নিতে হবে যে শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও, (৮৫) পদচিত্রের মতো, ক্রমস্তরিকভাবে বিন্যস্ত। এ-প্রণালিতে শব্দসমূহকে বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিন্যস্ত করার জন্যে দরকার হবে (৮৬)র সূত্রের মতো সূত্র :

(৮৬) ক বিশেষ্য → { বি-নামবাচক / বি-সাধারণ }

খ বি-নামবাচক → { বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক / বি-নামবাচক, অপ্রাণীবাচক }

গ বি-সাধারণ → { বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক / বি-সাধারণ, অপ্রাণীবাচক }

ঘ বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক → { বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক / বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক অমনুষ্যবাচক }

ঙ বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক → { বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক / বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, অমনুষ্যবাচক }

প্রভৃতি

(৮৬)র সূত্রগুলো 'ঢাকা', 'হাসান', 'পুশি', 'ছেলে', 'চিতাবাঘ', 'বই' বিশেষ্যগুলোর নিম্নরূপে স্তরক্রম নির্দেশ করবে :

(৮৭)
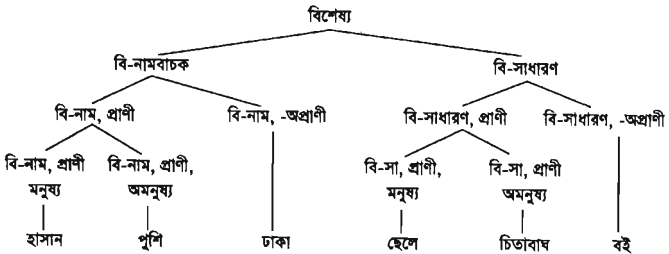
এ-প্রণালির উপশ্রেণীকরণের বিরুদ্ধে নিম্ন আপত্তিগুলো মনে আসে :

[ক] (৮৬)র পাঁচটি সূত্র নির্দেশ করছে অতি সামান্য কয়েকটি সম্পর্ক। বিশ্বের সমস্ত বিশেষ্য যদি এমন ক্রমস্তরিক প্রণালিতে উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয়, তবে পুনর্লিখন সূত্রের পরিমাণ হবে বিপুল, এবং সূত্রগুলো হয়ে উঠবে অত্যন্ত জটিল।

[খ] স্তর-এর—*হায়ারার্কির*—উচ্চতম বস্তুর নির্বাচন করতে হবে চরম স্বেচ্ছাচারিতায়। (৮৬ক)তে বিশেষ্যকে প্রথমে ভাগ করা হয়েছে *বি-নামবাচক* (নামবাচক বিশেষ্য) ও *বি-সাধারণ* (সাধারণ বিশেষ্য) ভাগে। কিন্তু-এ বিভাজনের মানদণ্ড স্বেচ্ছাচারী : কোনো ধ্রুব আদর্শ অনুসারে এ-উপশ্রেণীকরণ করা হয়নি—কেননা কোনো ধ্রুব মানদণ্ড নেই। বিশেষ্যরাশিকে প্রথমে মূর্ত ও বিমূর্ত, বা প্রাণী ও অপ্রাণী, বা অন্য কোনোভাবেও দু-ভাগে ভাগ করা যেতো।

[গ] (৮৬ঘ, ঙ) সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক; বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, অ-মনুষ্যবাচক প্রভৃতি উপশ্রেণী। এ-উপশ্রেণীগুলোর মধ্যে নানারকম সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পদসাংগঠনিক সূত্র এ-উপশ্রেণীগুলোকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে, যাতে মনে হয় এদের মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই; যেনো এগুলো সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে পৃথক। এমন নির্দেশ বোধবিরোধী।

[ঘ] মনে করা যাক, ব্যাকরণের কোনো একটি সূত্র প্রযোজ্য সমস্ত প্রাণীবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু (৮৬)র রীতিতে বিশেষ্যগুলোর উপশ্রেণীকরণ করলে সহজ সরলভাবে এ-সূত্র রচনা করা যাবে না। সূত্রটিতে বলতে হবে যে এ-সূত্র প্রযোজ্য 'বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক', 'বি-নামবাচক, প্রাণীবাচক, অমনুষ্যবাচক', 'বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক', 'বি-সাধারণ, প্রাণীবাচক, অমনুষ্যবাচক' প্রভৃতি বিশেষ্যের ক্ষেত্রে। এতে ব্যাকরণ হয়ে উঠবে বাহুল্যভারাক্রান্ত, এবং তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণীকরণের শক্তিহীন। পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে *তির্যক শ্রেণীকরণ* অসম্ভব।

এ-সমস্ত কারণে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উপশ্রেণীকরণ করা সম্ভব নয়।

উপশ্রেণীকরণের সমস্যা সমাধানের জন্যে চোমস্কি (১৯৬৫, ৮০-৮১) গ্রহণ করেন ধ্বনিতত্ত্বে ব্যবহৃত *স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ম্যাট্রিক্স*-এর সাহায্য)। রোমান ইআকবসন-অনুসারী ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি-এককগুলোর তির্যক শ্রেণীকরণ করা হয় বিভিন্ন স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। এতে এক-একটি ধ্বনি-একককে বিবেচনা করা হয় একগুচ্ছ স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের সমষ্টিরূপে, এবং এর ফলে কোনো এককের এমনকি একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রযোজ্য সূত্রও স্পষ্টভাবে রচনা করা যায়। চোমস্কি, অনুরূপভাবে, ভাষায় ব্যবহৃত এক-একটি শব্দকে গ্রহণ করেন একগুচ্ছ বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিরূপে। এ-বৈশিষ্ট্যগুলোর সমষ্টিকে চোমস্কি (১৯৬৫, ৮২) বলেন *মিশ্রপ্রতীক*। এখানে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো শুধু বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায়। বাক্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নরূপে উপবিভক্ত করা যায় :

(৮৮)
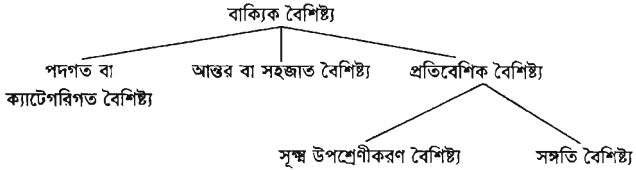
পদগত বা ক্যাটেগরিগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে শব্দের পদগত পরিচয়। তাই বিশেষ্য, ক্রিয়া, বা বিশেষণ-এর *পদগত* বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [+বি], [+ক্রি], এবং [+বিণ] (ভাষাবিজ্ঞানের প্রচলিত রীতি হচ্ছে বাক্যিক, আর্থ, ধ্বনিতাত্ত্বিক বা অন্যান্য যে-কোনো বৈশিষ্ট্যকে চতুষ্কোণ বন্ধনিতে আবদ্ধ করা (যেমন [+বি])। শব্দের দ্বিতীয় বাক্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে *আন্তর*, বা *সহজাত বৈশিষ্ট্য*। এখানে বিশেষ্যের সহজাত বৈশিষ্ট্যবিষয়ক আলোচনাতেই আমি সীমিত থাকবো। (৮৪)র বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে এ-বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেকগুলো *দ্বিমুখি* [বাইনারি] : অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটি বৈশিষ্ট্য কোনো বিশেষ্যের আছে-কি-নেই, তা+(যোগ), ও—(বিয়োগ) চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়। এ-প্রণালিতে নামবাচক বিশেষ্য ও সাধারণ বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায় [±সাধারণ] রূপে। অর্থাৎ যে-বিশেষ্যের আছে [+ সাধারণ] বৈশিষ্ট্য, তা *সাধারণ বিশেষ্য*, এবং যে-বিশেষ্যের আছে [—সাধারণ] বৈশিষ্ট্য, তা *নামবাচক বিশেষ্য*। এমন দ্বিমুখি বৈপরীত্য-জ্ঞাপক সহজাত বৈশিষ্ট্যের আরো উদাহরণ হচ্ছে : [± মূর্ত], [± প্রাণী], [±পুং], [± মনুষ্য], [± সংখ্যা] ইত্যাদি। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সাথে স্তরক্রমিকভাবে অন্বিত; অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য [+ক] যুক্তিসঙ্গতভাবে জ্ঞাপন করে অন্য একটি বৈশিষ্ট্য [+খ]। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৮৯)	চ	ছ	জ
ক	[+মনুষ্য]	[+প্রাণী]	[+মূর্ত]
খ	[—মূর্ত]	[—প্রাণী]	[—মনুষ্য]

(৮৯) উদাহরণ 'চ' জ্ঞাপন করছে 'ছ' ও 'জ'; অর্থাৎ যদি জানা যায় যে কোনো একটি বিশেষ্য মনুষ্যবাচক [+মনুষ্য], তবে সঙ্গতভাবে বোঝা যায় যে সেটি অবশ্যই প্রাণীবাচক [প্রাণী], এবং মূর্ত [+মূর্ত]; যদি জানা যায় যে বিশেষ্যটি বিমূর্ত [—মূর্ত], তবে সঙ্গতভাবেই বোঝা যায় যে ওটি অবশ্যই অপ্রাণীবাচক [—প্রাণী], এবং অমনুষ্যবাচক-[—মনুষ্য]। এ-ব্যাপারটি অভিধানের *বাহুল্য সূত্র*-এর সাহায্যে নিম্নরূপে নির্দেশ করা যায় :

$$(৯০)\quad ক \quad [+ মনুষ্য] \quad \rightarrow \begin{bmatrix} + মূর্ত \\ + প্রাণী \\ + মনুষ্য \end{bmatrix}$$

খ [− মূর্ত] → [− মনুষ্য, − প্রাণী, − মূর্ত]

(৯০) রূপ বাহুল্য সূত্র ব্যাকরণকে মুক্তি দেয় অপ্রয়োজনীয় তথ্যভার, ও জটিলতা বহন করার দায় থেকে। নিচের সহজাত বৈশিষ্ট্যের ম্যাট্রিক্সটি লক্ষণীয় (বাহুল্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে গোলাকার বন্ধনিতে ঘিরে দেয়া হয়েছে) :

(৯১)

	মেয়ে	হাসিনা	বেড়াল	প্রেম
বি	+	+	+	+
সাধারণ	+	−	+	+
সংখ্যাবাচক	(+)	(−)	(+)	−
মূর্ত	(+)	(+)	(+)	−
প্রাণীবাচক	(+)	(+)	(+)	(−)
মনুষ্যবাচক	+	+	−	(−)

অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য এমন স্তরক্রমিকভাবে অন্বিত থাকে না। (৯২)র উদাহরণগুলোতে [± মনুষ্য ও [± পুং] বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্পর্ক বিচার্য :

(৯২)	ক	[+মনুষ্য]	[+পুং]	'ছেলে', 'ভদ্রলোক' প্রভৃতি।
	খ	[+মনুষ্য]	[−পুং]	'মেয়ে', 'মহিলা' প্রভৃতি।
	গ	[−মনুষ্য]	[+পুং]	'সিংহ', 'ষাঁড়' প্রভৃতি।
	ঘ	[−মনুষ্য]	[−পুং] :	'গাভী', 'বাঘিনী' প্রভৃতি।

(৯২)র বিশেষ্যগুলোর সাদৃশ্য সহজাত বৈশিষ্ট্যর দ্বিমুখিতার সাহায্যে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে : 'ছেলে' ও 'মেয়ে'র মধ্যে সাদৃশ্য [+মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যে, এবং বৈসাদৃশ্য [±পুং] বৈশিষ্ট্যে; এবং 'ছেলে'র সাথে 'সিংহ'-এর সাদৃশ্য [+পুং] বৈশিষ্ট্যে, বৈসাদৃশ্য [± মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যে ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বৈশিষ্ট্য ভিত্তি ক'রে ভাষার শব্দপুঞ্জ বর্ণনা করলে শব্দপুঞ্জের স্তরক্রমিক ও তির্যক শ্রেণীগত সম্পর্ক সহজেই নির্দেশ করা যায়। বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সহজেই নির্দেশ করা যায় কাঙ্ক্ষিত শ্রেণীটিকে, এবং বিরত থাকা যায় অবাঞ্ছিত কোনো শ্রেণীর উল্লেখ থেকে। যেমন : যদি উল্লেখ করতে হয় মনুষ্যবাচক বিশেষ্যরাশিকে, তবে শুধু [+মনুষ্য] বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেই সমগ্র মনুষ্যবাচক বিশেষ্যশ্রেণী পাওয়া যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে *প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য*, যার একটি হচ্ছে সূক্ষ্ম *উপশ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য*, এবং অন্যটি হচ্ছে *সঙ্গতি বৈশিষ্ট্য*। সূক্ষ্ম উপশ্রেণীতে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে কী-রকম বাক্যকাঠামোতে কোনো একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হ'তে পারে। (৯৩)র উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৯৩) ক * ছেলেটি মারামারি করছে।

খ * তিনি তিন ঘণ্টাব্যাপী মারা গেলেন।

ওপরের বাক্য দুটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ : (৯৩ক) বাক্যটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ, কেননা 'মারামারি কর' ক্রিয়ার জন্যে দরকার [+বহুবচন] বিশেষ্যপদ, কিন্তু এটিতে বসেছে [–বহুবচন] বিশেষ্যপদ। (৯৩খ) বাক্যটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কেননা 'মারা যা' ক্রিয়া কালব্যাপ্তিবোধক ক্রিয়াবিশেষণের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে না; কিন্তু এ-বাক্যে তা উপস্থিত হয়েছে ওই নিষিদ্ধ ক্রিয়াবিশেষণের ('তিন ঘণ্টাব্যাপী') সাথে। বাক্যে বিভিন্ন পদের সহাবস্থানের নীতি নির্দেশ করে সূক্ষ্ম উপশ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য। তাই ব্যাকরণে প্রতিটি পদের সূক্ষ্ম উপশ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা দরকার। 'মারামারি কর' ক্রিয়ার জন্যে দরকার বহুবচন কর্তা-বিশেষ্যপদ; তাই এটির 'সূ-উ-বৈ' হচ্ছে [+বিপ বহুবচন]; 'মারা যা' ক্রিয়া যেহেতু কালব্যাপ্তিবোধক ক্রিয়াবিশেষণের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে না, তাই এর 'সূ-উ-বৈ' হচ্ছে (–ক্রিবিণ কালব্যাপ্তি)। 'সূ-উ-বে'-কে নির্দেশ করা হয় *স্থানিক বৈশিষ্ট্য* ব'লে। স্থানিক কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে : যদি কোনো ক্যাটেগরি প্রতীক 'খ' প্রত্যক্ষভাবে 'অধীন' হয় কোনো অ-অন্ত্যপ্রতীক 'ক'-এর তবে 'ক' (এবং কেবল 'ক') অন্য যে-সব ক্যাটেগরির ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করে, তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ করা হবে 'খ'-র। (৯৪) চিত্রটি লক্ষণীয় :

(৯৪)
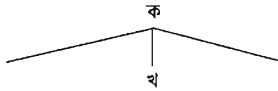
(৯৪)-এ 'ক' প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে 'খ'-র ওপর। 'খ'-র সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ করা হবে 'ক' অন্য যে-সব ক্যাটেগরির ওপর আধিপত্য করে, তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে (অর্থাৎ নির্দেশ করা হবে 'খ' অন্য ক্যাটেগরির সাথে সহাবস্থান করতে পারে কি-না)। সাধারণত ক্রিয়ার উপশ্রেণীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 'সূ-উ-বৈ'; তবে বিশেষ্যের উপশ্রেণীকরণেও এ-বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো হয়। উপশ্রেণীকরণে পদের গুরুত্ব সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। চোমস্কির (১৯৬৫, ১১৬) মতে বিভিন্ন ক্যাটেগরি, বা পদের মধ্যে বিশেষ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; তাই বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য অনুসারে করতে হবে ক্রিয়া, বা অন্য পদের সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ। চোমস্কির এ-মত ইদানীং মানা হয় না। একথা সম্প্রতি সর্বজনস্বীকৃত যে

বাক্যে ক্রিয়াই সবচেয়ে শক্তিমান ও গুরুত্বপূর্ণ; তাই ক্রিয়া অনুসারে সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ করতে হবে বিশেষ্যের ও অন্যান্য পদের (দ্র স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩, ৭১৮-৭৪৭))।

'সঙ্গতি বৈশিষ্ট্য'রাশি আর্থ বৈশিষ্ট্য, এবং এগুলো বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের আর্থ সঙ্গতি নির্দেশ করে। বর্তমানে এ-বৈশিষ্ট্যগুলো বিচারের ভার দেয়া হয় আর্থকক্ষের ওপর, কিন্তু চোমস্কি ব্যাকরণের বাক্যকক্ষের সূত্রের সাহায্যে সঙ্গতি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। সঙ্গতি বৈশিষ্ট্যের বিপর্যয়ে জন্মে বিসঙ্গত বাক্য। কয়েকটি উদাহরণ :

(৯৫) ক * টাইপরাইটারটি স্বপ্ন দেখছে।

খ * ডক্টর হক হাত দিয়ে লাথি মারলেন।

গ *আমি একটি যুবতী গাইবো।

ঘ *এ-গাধাটি অর্থনীতিতে পিএইচডি।

ঙ * রাজিয়া অস্তমিত হচ্ছে।

(৯৫)র বাক্যগুলো বিসঙ্গতির নিদর্শন, এবং প্রথাগত ব্যাকরণ ও চোমস্কীয় *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ। বাক্যগুলোতে কোনো বাক্যিক ত্রুটি নেই, আছে আর্থ ত্রুটি : কবিতায় এমন বাক্য অবিরল পাওয়া যায়। (৯৫ক) বাক্যটি ত্রুটিপূর্ণ; কেননা 'স্বপ্ন দেখ' ক্রিয়ার জন্যে দরকার [+মনুষ্য] কর্তা, কিন্তু এতে ব্যবহৃত হয়েছে [–প্রাণীবাচক], অর্থাৎ বস্তুবাচক কর্তা; তাই বাক্যটি হয়েছে বিসঙ্গত। অন্যান্য বাক্যও বিসঙ্গত কোনো-না-কোনো সঙ্গতি বৈশিষ্ট্য বিপর্যয়ের জন্যে। চোমস্কির মতে (৯৫) ধরনের বাক্য ব্যাকরণ কিছুতেই সৃষ্টি করবে না; তাই ব্যাকরণের বাক্যকক্ষ সঙ্গতি সূত্রের সাহায্যে এমন বাক্যসৃষ্টি রোধ করবে। কিন্তু চোমস্কি-উত্তরদের মতে এমন বাক্য ব্যাকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করবে, এবং বাক্যের সঙ্গতি-বিসঙ্গতি নির্ণয় করবে ব্যাকরণের আর্থকক্ষ, কেননা এ-বিচ্যুতি বাক্যিক নয়, আর্থ (দ্র ম্যাকক্লি (১৯৭০))। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য § ৪.৬.৯.৫।

অভিধানে প্রতিটি শব্দকে স্থান দেয়া হবে তার সমস্ত বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে : চোমস্কির (১৯৬৫, ৮২) ভাষায় *মিশ্রপ্রতীক* রূপে (দ্র § ৪.৬.৮))। উদাহরণস্বরূপ 'পাখি' শব্দটির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগত বিবরণ দেয়া হবে অভিধানে :

(৯৬) পাখি |অর্থাৎ শব্দটির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য|

[+ বিশেষ্য, +সাধারণ, +সংখ্যাবাচক, –মনুষ্য]

[+...(এর সূ-উ-বৈ)]

[+...(সঙ্গতি বৈশিষ্ট্য)]

[+...(আর্থ বৈশিষ্ট্য)]

৪.৬.৭ ভিত্তিকক্ষের সংগঠন : পদসাংগঠনিক উপকক্ষের বৈশিষ্ট্য

আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ দুটি উপকক্ষে বিভক্ত : (ক) পদসাংগঠনিক উপকক্ষ; এবং (খ) আভিধানিক উপকক্ষ। পদসাংগঠনিক উপকক্ষটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ-কক্ষের সূত্ররাশি সৃষ্টি করে বাক্যের আদিরূপ। পদসাংগঠনিক উপকক্ষে আছে দু-ধরনের সূত্র :

[ক] পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র

[খ] মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র

[ক] পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র : *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রগুলো সরল পুনর্লিখন সূত্র (দ্র § ৪.৩.২; § ৪.৫.১.১)। এ-সূত্রগুলো বাক্যকে উচ্চ ক্যাটেগরিসমূহ পর্যন্ত পুনর্লিখনের সাহায্যে সম্প্রসারিত করে। উদাহরণস্বরূপ (৭৮)-এর 'ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যটিকে পুনরায় নেয়া যাক। এ-বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে রচিত হয়েছিলো ব্যাকরণ (৮১)। এ-ব্যাকরণের সূত্রগুলো দু-ভাগে—(৮১ক) ও (৮১খ) — বিভক্ত করা হয়েছিলো। (৮১ক) সূত্রগুলোকে বলা হয় পদগত সূত্র, এবং (৮১খ) সূত্রগুলোকে বলা হয় শাব্দসূত্র। *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণ বাক্যসৃষ্টির জন্যে (৮১ক)রূপ সূত্র ব্যবহার করে; কিন্তু (৮১খ)-রূপ সূত্র ব্যবহার করে না। আলোচনার সুবিধার জন্যে (৮১ক) সূত্রগুলোকে (৯৭)রূপে নিম্নে উপস্থিত করা হলো :

(৯৭) বাক্য → বিপ + ক্রিপ

ক্রিপ → বিপ + ক্রিরূ

বিপ → { নি + বি + বিভ / বি + নি }

ক্রিরূ → ক্রিমূ + ক্রিস

নি → { অনু/বি— / সং + অনু }

(৯৭)-এর সূত্রগুলো 'বাক্য'কে সরল পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে উচ্চ ক্যাটেগরি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে। এর পরে ক্যাটেগরিগুলোকে পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে সম্প্রসারিত করতে হ'লে সে-সব সূত্রে নির্দেশ করা হবে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন অন্ত্য ক্যাটেগরি। কিন্তু *আস্পেক্টস* ব্যাকরণ তা থেকে বিরত থাকবে। পদসাংগঠনিক সূত্রের

অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব তুলে নেবে। পদসাংগঠনিক উপকক্ষের দ্বিতীয় শ্রেণীর সূত্র—মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র।

[খ] মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র : শব্দের বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিকে চোমস্কি (১৯৬৫, ৮৪) বলেন মিশ্রপ্রতীক (দ্র § ৪.১.৬))। মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্রগুলো বিভিন্ন উচ্চ ক্যাটেগরিকে এক গুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিরূপে গঠন করে। মিশ্রপ্রতীক সৃষ্টি করতে হ'লে বিভিন্ন শব্দকে ভাঙতে হবে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে, এবং এক প্রকার জটিল পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে বিভিন্নভাবে গুচ্ছবদ্ধ করতে হবে ওই বৈশিষ্ট্যরাশিকে। উদাহরণস্বরূপ 'বিশেষ্য'কে ভাঙা যায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যে (দ্র § ৪.৬.৬) :

(৯৮) [বিশেষ্য]; [সাধারণ]; [সংখ্যা]; [প্রাণী]; [মনুষ্য]; [বিমূর্ত]

এ-বৈশিষ্ট্যগুলোর দ্বিমুখি বিন্যাসের সাহায্যে এদের আবদ্ধ করা যায় বিভিন্ন গুচ্ছে (দ্র § ৪.৬.৬)। শব্দের বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্যে গুচ্ছিত, বা মিশ্রিত করার জন্যে যে-সূত্র ব্যবহৃত হয়,তাই মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র। (৯৯)-এর বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নরূপ সূত্রের সাহায্যে গুচ্ছিত করা যায় মিশ্রপ্রতীকে :

(৯৯) ক বি → [+বি, ±সাধারণ]
খ [+সাধারণ] → [±সংখ্যা]
গ [+সংখ্যা] → [± প্রাণী]
ঘ [—সাধারণ] → [±প্রাণী]
ঙ [+প্রাণী] → [±মনুষ্য]
চ [−সংখ্যা] → [±বিমূর্ত]

(৯৯)র সূত্রগুলো একরকম জটিল পুনর্লিখন সূত্র, যা ব্যাখ্যার বিশেষ বিধি রয়েছে। (৯৯ক) সূত্রটি নির্দেশ করছে যে *বি*-কে মিশ্রপ্রতীক, [+বি,+সাধারণ] ও [+বি,−সাধারণ]-এর মধ্যে যে-কোনো একটি দ্বারা প্রতিকল্পিত করতে হবে, বা যে-কোনো একটি রূপে সম্প্রসারিত করতে হবে। যদি *বি*-কে সম্প্রসারিত করা হয় [+বি, সাধারণ] রূপে, তবে (৯৯খ) সূত্রের সাহায্যে একে পুনরায় সম্প্রসারিত করতে হবে নিম্নের দুটি মিশ্রপ্রতীক রূপে : [+বি,+সাধারণ,+সংখ্যা], এবং [+বি, সাধারণ,−সংখ্যা]। এ-প্রণালিতে প্রয়োগ করতে হবে (৯৯চ) অবধি প্রযোজ্য সমস্ত সূত্র, এবং ফলে রচিত হবে নানা মিশ্রপ্রতীক : বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ। (৯৯)র সূত্রগুলো প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (১০০)র মিশ্রপ্রতীকগুলো :

(১০০) ক [+বি,+সাধারণ, +সংখ্যা,+প্রাণী,+মনুষ্য) : 'ছেলে', 'মেয়ে' প্রভৃতি।
খ [+বি,−সাধারণ,+প্রাণী,+মনুষ্য) : 'হাসান', 'হাসিনা' প্রভৃতি।

গ [+বি,+সাধারণ,–সংখ্যা+বিমূর্ত] : 'কবিত্ব', 'সরলতা' প্রভৃতি।

ঘ [+বি,+সাধারণ,–সংখ্যা,–বিমূর্ত] : 'মদ', 'পানি' প্রভৃতি।

ঙ [+বি,+সাধারণ,+সংখ্যা,– প্রাণী] : 'বই', 'কলম' প্রভৃতি।

চ [+বি,–সাধারণ,–প্রাণী : 'ঢাকা', 'রাড়িখাল' প্রভৃতি।

ছ [+বি,–সাধারণ,+প্রাণী,– মুনষ্য] : 'পুশি', 'মহেশ' প্রভৃতি।

(১০০)র মিশ্রপ্রতীকগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে এগুলো হচ্ছে শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছ।

আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রগুলো ব্যাকরণের আদিপ্রতীক 'বাক্য'কে সম্প্রসারিত করে উচ্চ ক্যাটেগরি পর্যন্ত, এবং পরে মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্ররাশি গঠন করে উচ্চ ক্যাটেগরিগুলোর মিশ্রপ্রতীক। পদসাংগঠনিক সূত্র ও মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সুত্রের সাহায্যে যে-গ্রন্থি রচিত হয়, তার নাম *উপান্ত্যগ্রন্থি*। ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের দায়িত্ব শেষ হয় উপান্ত্যগ্রন্থি সৃষ্টি ক'রেই। এ-কক্ষের সূত্রের সাহায্যে অন্ত্যগ্রন্থি সৃষ্টি করা হয় না। এ-ব্যাকরণে অন্ত্যগ্রন্থি সৃষ্টির ভার অর্পণ করা হয়েছে ভিত্তিকক্ষের আরেক উপকক্ষ *আভিধানিক উপকক্ষ*-এর ওপর (দ্র § ৪.৬.৮)। মনে করা যাক (৭৮)-এর 'ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যটি সৃষ্টি করতে হবে *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণের সাহায্যে। কী-রকম সূত্র দরকার হবে বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে? এ-ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রগুলো হবে (৯৭) (অবশ্য ভিন্ন বিশ্লেষণে ভিন্ন পদসংগঠনও দেখানো সম্ভব)। এ-সূত্রের পরে মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্রের সাহায্যে মিশ্রপ্রতীকে পরিণত করতে হবে সমস্ত উচ্চ ক্যাটেগরিকে, অর্থাৎ বি, ক্রিমূ, সং, অনু, বিভ, ক্রিস প্রভৃতি ক্যাটেগরিকে। এ-সমস্ত ক্যাগেটরিকে মিশ্রপ্রতীকে পরিণত করা হবে নিম্নরূপ সূত্রের সাহায্যে (এখানে, ক্যাটেগরিগুলোকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে না ভেঙে শুধু মিপ্র-সংকেতের সাহায্যে মিশ্রপ্রতীক বোঝানো হলো) :

(১০১) বি → [মিপ্র]

ক্রিমূ → [মিপ্র]

সং → [মিপ্র]

অনু → [মিপ্র]

বিভ → [মিপ্র]

ক্রিস → [মিপ্র]

(৯৭) ও (১০১)-এর সাহায্যে *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণ 'ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যের নিম্নরূপ পদচিত্র, এবং উপান্ত্যগ্রন্থি সৃষ্টি করবে :

(১০২)
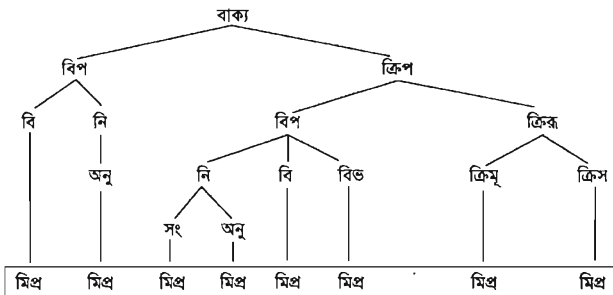
(১০২)-এর আবদ্ধ গ্রন্থিটি উপান্ত্যগ্রন্থি। এতে কোনো অন্ত্যপ্রতীক, বা শব্দ নেই; যা আছে তা হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটেগরির সাথে যুক্ত গুচ্ছগুচ্ছ বৈশিষ্ট্য, বা মিশ্রপ্রতীক (ব্যাকরণে মিশ্রপ্রতীকগুলোকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হয়)। একরাশ মিশ্রপ্রতীকসম্বলিত উপান্ত্যগ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে শেষ হয় ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষের দায়িত্ব। এ-কক্ষের সূত্র উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দ প্রবিষ্ট করে না। উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দ সরবরাহের দায়িত্ব আভিধানিক উপকক্ষের (দ্র § ৪.৬.৮)।

৪.৬.৮ আভিধানিক উপকক্ষ

আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকক্ষ আভিধানিক উপকক্ষ। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণে পদসাংগঠনিক সূত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা হয় অন্ত্য উপাদান। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণের নিম্নরূপ পদসাংগঠনিক শাব্দসূত্র ব্যবহৃত হয় (দ্র § ৪.৫.১.১) :

(১০৩) ক বি → ছেলে, মেয়ে

খ ক্রিমূ → ভালোবাস, দেখ

গ সং → এক, দুই

ঘ অনু → টি, টা

ঙ ক্রিস → এ, ছে

কিন্তু *অ্যাস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে পদসাংগঠনিক উপকক্ষ থেকে বর্জন করা হয় এসব শাব্দসূত্র; এবং এসব সূত্রের দায়িত্ব, নতুন প্রণালিতে, অর্পণ করা হয় আভিধানিক উপকক্ষের ওপর। আভিধানিক উপকক্ষের ওপর ন্যস্ত হয় বিপুল দায়িত্ব, যা আগে অনেক সরলরূপে বহন করতে হতো পদসাংগঠনিক সূত্ররাশিকে।

আভিধানিক উপকক্ষকে বলা যেতে পারে একটি ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ *অভিধান* বা *শব্দকোষ*। এ-অভিধান বা শব্দকোষ হচ্ছে ভাষার শব্দরাশির তালিকা। তবে অভিধানে শব্দ সন্নিবিষ্ট করতে হবে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৮৪, ১৬৪-১৯২), হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩))। অভিধান সম্পর্কে চোমস্কির (১৯৬৫, ৮৪) সিদ্ধান্ত : 'অভিধান (বা শব্দকোষ) হচ্ছে একরাশ শব্দ-ভুক্তি, যাতে প্রতিটি শব্দ-ভুক্তি হচ্ছে (ধ্ব, ব)-র যুগল যাতে 'ধ্ব' হচ্ছে শব্দটির ধ্বনিরূপ নির্দেশক স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের ম্যাট্রিক্স, এবং 'ব' হচ্ছে একগুচ্ছ বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি (অর্থাৎ একটি মিশ্রপ্রতীক)।' অভিধানে সংকলিত হবে ভাষার সমস্ত শব্দ, এবং প্রতিটি শব্দের সাথে যুক্ত থাকবে তার ধ্বনিগত, আর্থ ও বাক্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। রূপান্তর ব্যাকরণের সহযোগী অভিধানের রূপ কেমন হবে, তা বিস্তৃত আলোচনা দাবি করে (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫), ভেইনরাইখ (১৯৬৬), ফিলমোর (১৯৬৯, ১৯৭১), বোথা (১৯৬৮), স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩), হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩))। *অ্যাস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে বাক্যসৃষ্টিতে অভিধান পালন করে ব্যাপক ভূমিকা। বলা যেতে পারে যে অভিধান ভাষার প্রতিটি শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে, এবং ব্যাকরণের পদসাংগঠনিক উপকক্ষ, বাক্যসৃষ্টির জন্যে, অভিধানের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করে অভিধানভুক্ত শব্দপুঞ্জ। অভিধানের দায়িত্ব কেবল শব্দের তালিকা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেই শেষ হয় না, অভিধান সুস্পষ্ট নিয়মানুসারে পদসাংগঠনিক উপকক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দ সরবরাহ করে (দ্র § ৪.৬.৭) উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দসংক্রামের ফলে গঠিত হয় অন্ত্যগ্রন্থি। অভিধান থেকে উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দসংক্রামের দু-রকম রীতি নির্দেশ করেছেন চোমস্কি (১৯৬৫, ৮৪: ১২২)। রীতি দুটি হচ্ছে :

[ক] মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন রীতি বা প্রণালি

[খ] ডামিপ্রতীক প্রতিকল্পন রীতি বা প্রণালি

[ক] মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন রীতি বা প্রণালি : এ-রীতিটি চোমস্কির প্রিয়, এবং *অ্যাস্পেক্টস* কাঠামোতে গৃহীত; কিন্তু জটিল ব'লে এটিকে পরিত্যাগ করেছেন চোমস্কি-উত্তর রূপান্তরবাদীরা। § ৪.৬.৭-এ দেখানো হয়েছে যে পদসাংগঠনিক উপকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্র ও মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র রচনা করে একরাশ মিশ্রপ্রতীকসম্বলিত উপান্ত্যগ্রন্থি (দ্র

পদচিত্র (১০২))। এ-জাতীয় পদচিত্রে বিভিন্ন ক্যাটেগরির সাথে সংলগ্ন হয়ে থাকে ক্যাটেগরিগুলোর বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ, বা মিশ্রপ্রতীক। অভিধানে থাকে প্রতিটি শব্দের মিশ্রপ্রতীক-সম্বলিত তালিকা। শাব্দসূত্রের সাহায্যে উপান্ত্যগ্রন্থির মিশ্রপ্রতীক ও অভিধানে সন্নিবিষ্ট শব্দের মিশ্রপ্রতীকের অভিন্নতা যাচাই ক'রে অভিধান থেকে উপান্ত্যগ্রন্থিতে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন শব্দ। এ-প্রণালিতে শব্দসংক্রামের রীতিই হচ্ছে মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন প্রণালি। চোমস্কি (১৯৬৫, ৮৪) এ-প্রণালিতে শব্দসংক্রামের যে-সূত্র রচনা করেছেন, তা নিম্নরূপ :

> যদি 'ক' হয় কোনো উপান্ত্যগ্রন্থির মিশ্রপ্রতীক, এবং (ধ্ব, ব) হয় কোনো শব্দ-ভুক্তি, এবং 'ব' যদি ভিন্ন না হয় 'ক' থেকে, তবে 'ক'-র বিকল্পে 'ধ্ব' ব্যবহার করা যাবে।

আপাতদুরূহ এ-সূত্রটির সরল অর্থ হচ্ছে যে পদচিত্রে ঝুলন্ত কোনো মিশ্রপ্রতীক যদি অভিধানে সন্নিবিষ্ট কোনো শব্দের মিশ্রপ্রতীকের সাথে অভিন্ন হয়, তবে পদচিত্রের মিশ্রপ্রতীকটির স্থানে ব্যবহার করা যাবে অভিধানের শব্দটি। উপান্ত্যগ্রন্থিতে অভিধান থেকে শব্দসংক্রামের ফলে গঠিত হয় অন্ত্যগ্রন্থি। অন্ত্যগ্রন্থিসম্বলিত পদচিত্র হচ্ছে বাক্যের গভীর সংগঠন, বা গভীর তল।

মনে করা যাক, অভিধানে 'ছেলে', ' মেয়ে', 'ভালোবাস', 'এক', 'টি' প্রভৃতি শব্দের নিম্নরূপ এন্ট্রি আছে :

(১০৪)	ছেলে	[+বি,+সাধারণ,+সংখ্যা,+প্রাণী, +মনুষ্য,+পুং]
	মেয়ে	[+বি,+সাধারণ,+সংখ্যা,+প্রাণী, +মনুষ্য,−পুং]
	ভালোবাস	[+ক্রিমূ,+সকর্মক,+....]
	এক	[+সংখ্যা,+একবচন,+....]
	টি	[+অনু,− সম্মান,+....]
	কে	[+বিভ,+কর্ম+....]
	এ	[+ক্রিস,+সরল,+তৃপু.−সম্মান]

(১০১)-এর মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্রগুলো 'ছেলেটি একটি মেয়েকে ভালোবাসে' বাক্যটি সৃষ্টির জন্যে রচনা করবে (১০৪)-এর ভুক্তিসমূহের সংলগ্ন মিশ্রপ্রতীক (১০১)-এ শুধু *মিপ্র* সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এ-সূত্রগুলোকে নির্দেশ করতে হবে মিশ্রপ্রতীকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য)। (৯৭) ও (১০১) সূত্রের সাহায্যে রচিত হবে (১০৫)-এর উপান্ত্যগ্রন্থিসম্বলিত পদচিত্র :

(১০৫)
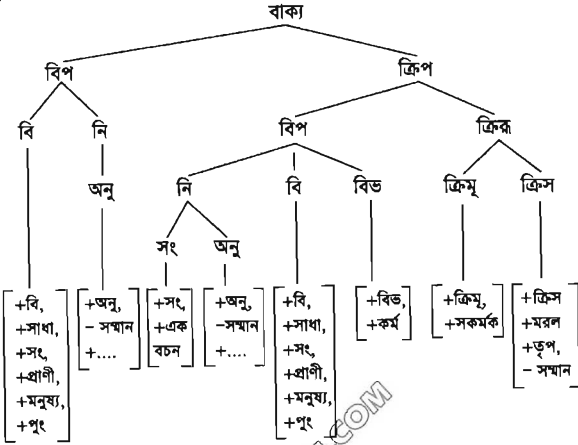
(১০৫) পদচিত্রটিতে বিভিন্ন ক্যাটেগরির সাথে ঝুলছে বাক্যিক বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ (মিশ্রপ্রতীক)। (১০৪) অভিধানে আছে মিশ্রপ্রতীকসম্বলিত কয়েকটি শব্দের তালিকা। দেখা যাবে যে (১০৪)-এর 'ছেলে' শব্দের সাথে সংলগ্ন মিশ্রপ্রতীক ও (১০৫)-এর সর্ববামের বি-র সাথে সংলগ্ন মিশ্রপ্রতীক অভিন্ন। সুতরাং বি-র সাথে সংলগ্ন মিশ্রপ্রতীকের বদলে, চোমস্কির মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন রীতি অনুসারে, ব্যবহার করতে পারি 'ছেলে' শব্দটিকে। এভাবে প্রতিকল্পিত করতে পারি (১০৫)-এর অন্যান্য মিশ্রপ্রতীক। এমন প্রতিকল্পনের ফলে (১০৫) পরিণত হবে (১০৬)-এ :

(১০৬)
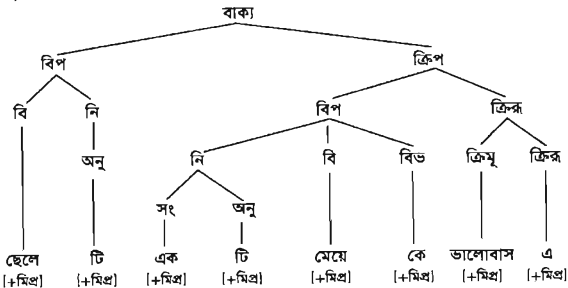
(১০৬)-এর শব্দসম্বলিত গ্রন্থিটি হচ্ছে অন্ত্যগ্রন্থি, এবং (১০৬) একটি গভীর তল। এ-সংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হবে রূপান্তর উপকক্ষের রূপান্তর সূত্র।

(খ) ডামিপ্রতীক প্রতিকল্পন রীতি বা প্রণালি: এ-রীতি গ্রহণ করলে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ সরল হয়ে ওঠে, কিন্তু অভিধানের দায়িত্ব বাড়ে; এবং ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের রূপ বদলে যায়। এ-প্রণালিতে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ বিভক্ত দুটি উপকক্ষে : (ক) পদসাংগঠনিক উপকক্ষ এবং (খ) আভিধানিক উপকক্ষ। পদসাংগঠনিক উপকক্ষটি হচ্ছে একগুচ্ছ প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক সূত্রের সমষ্টি। মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্র, যথাসম্ভব, পরিহার করা হয় পদসাংগঠনিক উপকক্ষ থেকে। তাই পদসাংগঠনিক সূত্রগুলো পুনর্লিখনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করে 'বাক্য'কে—উচ্চ ক্যাটেগরি পর্যন্ত—, এবং গঠন করে উপান্ত্যগ্রন্থি। উচ্চ ক্যাটেগরিগুলোকে মিশ্রপ্রতীকরূপে সম্প্রসারিত করা হয় না, সম্প্রসারিত করা হয় *ডামি* (Δ)-প্রতীকরূপে। : এ-প্রতীকটি নির্দেশ করে বিভিন্ন ক্যাটেগরির অবস্থান। তাই এ-ব্যাকরণে (১০১)-এর মিশ্রপ্রতীক গঠনকারী সূত্রের বদলে ব্যবহার করা হয় (১০৭)রূপ ডামিপ্রতীক নির্দেশক সূত্র :

(১০৭)	ক	বি	→ Δ
	খ	ক্রিমূ	→ Δ
	গ	সং	→ Δ
	ঘ	অনু	→ Δ
	ঙ	বিভ	→ Δ
	চ	ক্রিস	→ Δ

এ-ডামিপ্রতীকগুলো (Δ) বিভিন্ন পদ, বা ক্যাটেগরির অবস্থান নির্দেশ করে। (৯৭) ও (১০৭)-এর সূত্র প্রয়োগে যাওয়া যাবে ডামিপ্রতীকসম্বলিত উপান্ত্যগ্রন্থি (১০৮) :

(১০৮)
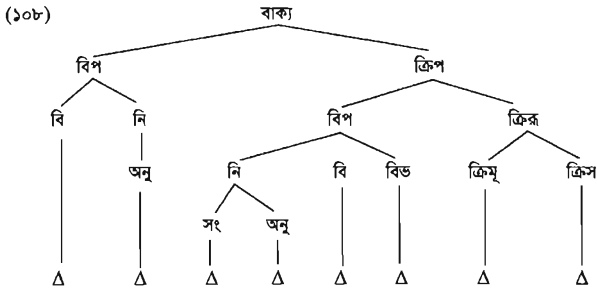
(১০৮)-এর ডামিপ্রতীকগুলো নির্দেশ করছে নানা শূন্যস্থান, যেখানে ব্যবহৃত হ'তে পারে নানাবিধ শব্দ। অভিধান থেকে এ-শূন্যস্থানসমূহে সরবরাহ করতে হবে শব্দ; এবং গঠিত হবে অন্ত্যগ্রন্থি (ও গভীর তল)। কিন্তু কী নীতি অনুসারে পদচিত্রে সরবরাহ করা হবে শব্দ? এ-বিষয়ে চোমস্কি (১৯৬৫, ১২২) প্রস্তাবিত নীতি নিম্নরূপ :

> প্রতিটি শব্দ-ভুক্তি হচ্ছে (ধ্ব, ব)-এর যুগল, যেখানে 'ধ্ব' হচ্ছে ধ্বনিতাত্ত্বিক ম্যাট্রিক্স এবং 'ব' হচ্ছে মিশ্রপ্রতীক। মিশ্রপ্রতীক 'ব' বহন করে সমস্ত সহজাত বৈশিষ্ট্য ও প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য। আমরা 'ব'-কে গ্রহণ করতে পারি বিশেষ একরকম প্রাতিকল্পনিক রূপান্তরের সাংগঠনিক বর্ণনা 'সাংব' রূপে। এ-রূপান্তর পদচিত্র 'প'-র অন্তর্গত যে-কোনো ডামিপ্রতীক (Δ)-এর বদলে ব্যবহার করতে পারে (ধ্ব, ব), যদি পদচিত্র 'প' পূরণ করে 'ব'-র সাংগঠনিক বর্ণনাভুক্ত শর্তাবলি।

এ-নীতি অনুসারে অভিধানে অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি শব্দের সাথে যুক্ত থাকবে একটি ক'রে মিশ্রপ্রতীক, যাতে শব্দটির বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ দেয়া হবে, এবং সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হবে শব্দটি কী-রকম পদচিত্রের কোন স্থানে ব্যবহৃত হ'তে পারে (অর্থাৎ কী-রকম বাক্যের কোন স্থানে বসতে পারে)। প্রতিটি শব্দ বইবে সে-পদচিত্রের সাংগঠনিক বর্ণনা, যাতে শব্দটি ব্যবহৃত হ'তে পারে। যদি শব্দের মিশ্রপ্রতীকে নির্দেশিত সাংগঠনিক বর্ণনা, এবং ব্যাকরণ-সৃষ্ট কোনো পদচিত্রের সাংগঠনিক বর্ণনা অভিন্ন হয়, তবে শব্দটিকে, মিশ্রপ্রতীকে উল্লেখিত নির্দেশ অনুসারে, পদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত যোগ্য ডামিপ্রতীকের (Δ) বদলে করা যাবে। এ-প্রণালিতে পদসাংগঠনিক কক্ষ সরল রূপ ধারণ করে, কিন্তু অভিধান বহন করে ব্যাপক দায়িত্ব। অভিধানে প্রতিটি শব্দের সমস্ত বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে হয়, এবং শব্দটি কোন প্রতিবেশে ব্যবহারযোগ্য, তাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হয়। এ-প্রণালি অনুসারে (১০৪) অভিধানকে সরবরাহ করতে হবে সহজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সমস্ত প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য। (১০৪) থেকে (১০৮)-এ শব্দসংক্রামের সময় বিচার করতে হবে কোন শব্দটি এ-পদচিত্রের কোন ডামিপ্রতীককে অপসারিত করতে পারে। দেখা যাবে (১০৮)-এর প্রথম *বি*-র সাথে সংলগ্ন ডামিপ্রতীককে বদলানো সম্ভব 'ছেলে' দ্বারা, *অনু* বদলানো সম্ভব 'টি' দ্বারা, *সং* বদলানো সম্ভব 'এক' দ্বারা ইত্যাদি। এ-ভাবে প্রতিকল্পনের সাহায্যে রচিত হবে অন্ত্যগ্রন্থিসম্বলিত পদচিত্র। (১০৬)। সাম্প্রতিক রূপান্তর ব্যাকরণে এ-প্রণালিটি গৃহীত।

পদচিত্রের উপান্ত্যগ্রন্থিতে শব্দসংক্রাম বিষয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে পদচিত্রের উপান্ত্যগ্রন্থিতে কি একবারেই শব্দ সরবরাহ করা হবে, না বিভিন্ন রূপান্তর প্রয়োগের পরেও শব্দ সরবরাহ করা যাবে? চোমস্কি চান একবারে উপান্ত্যগ্রন্থিতে সমস্ত শব্দ সরবরাহ করতে (যেমন :

(১০৮)-এ, একবারে, প্রতিটি ডামিপ্রতীকের বদলে শব্দ বসিয়ে পাওয়া যায় (১০৬), কিন্তু সাম্প্রতিক ব্যাকরণে পদচিত্রে একাধিকবার শব্দ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা চান অসংখ্যবার, প্রতিটি রূপান্তরের পরে, শব্দ সরবরাহ করতে, কিন্তু মধ্যপন্থীরা চান অন্তত দু-বার শব্দ সরবরাহ করতে (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩)। তাই অভিধানকে ভাগ করা হয় দু-ভাগে : একভাগের শব্দ পদচিত্রে সরবরাহ করা হয় পদসাংগঠনিক সূত্র প্রয়োগের পরেই;— এর নাম প্রথম *শব্দসংক্রাম*, এবং দ্বিতীয় ভাগের শব্দ সরবরাহ করা হয় সমস্ত রূপান্তর সূত্র প্রয়োগের পরে : এর নাম *দ্বিতীয় শব্দসংক্রাম*। তবে এও দাবি করা হয় যে বাক্যের গভীর তলে শব্দ বাস্তব অবয়বে অবস্থান করে না, অবস্থান করে 'বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ'-রূপে : এবং সমস্ত রূপান্তর প্রয়োগের পর, বহির্তলে, সেগুলো পরিগ্রহ করে বাস্তব রূপ।

৪.৬.৯ আর্থকক্ষ

রূপান্তর ব্যাকরণে আর্থকক্ষ চোমস্কির সৃষ্ট নয় : এ-কক্ষ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের কৃতিত্ব অন্যদের। *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* কাঠামোর ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষের সহায়ক কক্ষরূপে আর্থকক্ষের প্রস্তাব, সবার আগে, পেশ করেন ক্যাটজ ও ফোডোর (১৯৬৩)। তাঁরা বাক্যে আর্থনির্ণয়ের, বিশেষত দ্ব্যর্থতানির্ণয়ের, কিছু কৌশলও বের করেন। রূপান্তর ব্যাকরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে আর্থকক্ষের প্রস্তাব দেন ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪), এবং তাঁদের প্রস্তাবানুসারে রূপান্তর ব্যাকরণ পরিগ্রহ করে নতুন—*আস্পেক্টস* কাঠামোর—রূপ। রূপান্তর ব্যাকরণের আর্থকক্ষকে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন অন্যরা (দ্র হেবইনরাইখ (১৯৬৬), বিওয়াইরিশ (১৯৭০)। সাম্প্রাতিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে বাক্য ও অর্থের সম্পর্কের সমস্যা : কোথায় যে এক কক্ষের সমাপ্তি এবং অন্য কক্ষের আরম্ভ, তা নির্ণয় করা কঠিন। অথতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তাই নিচে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে (দ্র § ৪.৬.৯.১–৪.৬.১০)।

৪.৬.৯.১ আর্থজ্ঞান

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্থকে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার বিষয় ব'লে মনে করেন নি। ব্লুমফিল্ড মনে করতেন যে অর্থ নির্ণীত হয় সম্পূর্ণভাবে অভাষিক ব্যাপার দ্বারা; সুতরাং অর্থতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রে পরিণত এবং তাকে ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হ'লে, সমগ্র বিশ্বকে, প্রথমে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালিতে বর্ণনা করা দরকার। সাংগঠনিকেরা এ-ধারণা থেকে কখনো মুক্তি পান নি। চোমস্কির সংগোপন মর্মে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাব সক্রিয়, তাই অর্থতত্ত্ব তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তিনি রূপান্তর ব্যাকরণের ভাষ্যাত্মক কক্ষরূপে গ্রহণ করেছেন আর্থকক্ষকে, এবং এ-কক্ষের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন অন্যরা। 'অর্থের অর্থ কী?', বা 'অর্থ কী?'—এমন বড়ো প্রশ্নে না জড়িয়ে

রূপান্তরবাদীরা উত্থাপন করেছেন সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র প্রশ্ন, এবং চেষ্টা করেছেন তার উত্তর দিতে। তাঁরা বাক্যার্থনির্ণয়ের প্রণালি বের করতে চেয়েছেন, এবং জানতে চেয়েছেন— 'সমার্থকতা কী?', 'দ্ব্যর্থতা কী?', 'স্ববিরোধিতা কী?', 'অসঙ্গতি কী?', বা কাকে বলা যায় 'বিশ্লেষণাত্মকতা', 'ব্যত্যয়' ইত্যাদি (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ১৩৪)? এসব প্রশ্ন ভিত্তি ক'রে তাঁরা রচনা করতে চেয়েছেন যোগ্যতাসম্পন্ন অর্থতত্ত্ব।

৪.৬.৯.২ শব্দের আর্থসংগঠন

রূপান্তরবাদীরা শব্দকে বিশ্লিষ্ট করেছেন বিভিন্ন আর্থ বৈশিষ্ট্যে, কেননা প্রতিটি শব্দ যে-অর্থ বহন করে, তা হচ্ছে একগুচ্ছ আর্থবৈশিষ্ট্যের সমষ্টি (দ্র § ৪.৬.৬)। (১০৯)-এর বাক্যগুলো লক্ষণীয় (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ১৩৪):

(১০৯) ক কুমারী হচ্ছে সাবালক, অবিবাহিত, স্ত্রীলিঙ্গবাচক, মনুষ্য।

খ এ-গাভীটি কুমারী।

গ ডক্টর হাসানের ছেলেটি কুমারী।

ঘ ডক্টর হাসানের স্ত্রী কুমারী।

ঙ হাসিনা বিবাহিত কুমারী।

চ হাসিনা অবিবাহিত কুমারী।

(১০৯ক)কে ধরতে পারি *কুমারী* শব্দের মোটামুটি আভিধানিক অর্থ ব'লে। (১০৯ক) নির্দেশ করছে *কুমারী* শব্দের চারটি সহজাত বৈশিষ্ট্য : 'সাবালক', 'অবিবাহিত', 'স্ত্রীলিঙ্গবাচক', এবং 'মনুষ্য'। এ-বৈশিষ্ট্যগুলো ইঙ্গিত করছে যে *কুমারী* শব্দের অর্থ কোনো অবিভাজ্য ব্যাপার নয়। এ-শব্দটির অর্থ চারটি *আর্থবৈশিষ্ট্য*-এর ('সাবালক', 'অবিবাহিত', 'স্ত্রীলিঙ্গবাচক', 'মনুষ্য') সমষ্টি। এভাবে (১০৯খ-চ)র অন্যান্য শব্দের অর্থও বিশ্লিষ্ট করা যায় বিভিন্ন আর্থবৈশিষ্ট্যে, এবং তার সাহায্যে (১০৯খ-চ) বাক্যগুলোর অস্বাভাবিকতার প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। (১০৯খ)র কর্তা-বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য [−মনুষ্য], এবং বিধেয়-বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য [+মনুষ্য]; এবং কর্তা-বিশেষ্য ও বিধেয়-বিশেষ্যের [−মনুষ্য] ও [+মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যের বিরোধিতায় বাক্যটি অস্বাভাবিক অর্থ ধারণ করেছে। (১০৯গ) বাক্যের অস্বাভাবিকতার জন্যে দায়ী [+পুং] ও [−পুং] বৈশিষ্ট্যের বিরোধিতা; (১০৯ঘ)র স্ববিরোধিতার জন্যে দায়ী [+বিবাহিত] ও [−বিবাহিত] বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধতা; (১০৯ ঙ)র স্ববিরোধিতার জন্যে দায়ী [+বিবাহিত] ও [−বিবাাহিত] বৈশিষ্ট্যের বিরোধিতা, এবং (১০৯চ)র বাহুল্যের জন্যে দায়ী [−বিবাহিত] ও [−বিবাহিত] বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ।

বিভিন্ন একককে *বৈশিষ্ট্য*-এ ভাঙলে সুফল পাওয়া যায় প্রচুর: তাই রূপান্তর ব্যাকরণ ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব সর্বত্র বিভিন্ন একককে ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যে ভাঙার পক্ষপাতী। নিচের আর্থবৈশিষ্ট্য-ম্যাট্রিক্সটি লক্ষণীয় (এতে × = বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; ০=বৈশিষ্ট্যটি অনির্দেশিত; ± = দ্বিমুখি বৈশিষ্ট্য নির্দেশক (অর্থাৎ +পু=পুরুষ,−পুং=স্ত্রী); এবং ∫ =বাহুল্য বৈশিষ্ট্য (যা অন্য বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জ্ঞাপন করা যায়)) :

(১১০)

	অশ্ব	গবাদি	মনুষ্য	পুং	সাবালক
ঘোড়া	×	∫	∫	০	০
গাভী	∫	×	∫	−	+
ষাঁড়	∫	×	∫	+	+
মানুষ	∫	∫	+	০	০
পুরুষ	∫	∫	+	+	+
মহিলা	∫	∫	+	−	+
ছেলে	∫	∫	+	+	০
মেয়ে	∫	∫	+	-	০
শিশু	∫	∫	+	০	-

(১১০)-এর ম্যাট্রিক্সটি নির্দেশ করছে যে আর্থবৈশিষ্ট্যভিত্তিক অর্থ বিশ্লেষণ পরিমিতি নীতির নিদর্শন : ওপরে নটি শব্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ভিত্তি ক'রে। এগুলোর মধ্যে আবার তিনটি বৈশিষ্ট্য পালন করছে প্রধান ভূমিকা, এবং তাদের সহায়তায় যে-কোনো শব্দকে অন্য শব্দ থেকে পৃথক ব'লে নির্দেশ করা সম্ভব হচ্ছে। এ-প্রণালিতে তির্যক-শ্রেণীকরণও সহজ : বিভিন্ন শব্দের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখানো যায়। যেমন : 'গাভী' ও 'ষাঁড়'-এর পার্থক্য কেবল [±পুং] ঘটিত, এবং 'পুরুষ' ও 'মহিলা'র পার্থক্য কেবল [±পুং] ঘটিত, এবং 'গাভী' ও 'মহিলা'র পার্থক্য [× গবাদি, +মনুষ্য] ঘটিত।

আর্থ বৈশিষ্ট্যরাশিকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নির্দেশ করা সম্ভব *দ্বিমুখি বৈপরীত্য* নীতির সাহায্যে। তাই 'ছেলে', ও 'মেয়ে'র পার্থক্য নির্দেশ করা যায় শুধু [+পুং] ও [−পুং] বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যসূত্রে। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, দ্বিমুখি বৈপরীত্য নীতি সাহায্য করতে পারে না। যেমন: 'আয়তন' বোঝানোর জন্যে দরকার হয়, কম পক্ষে, তিন রকম বৈশিষ্ট্য (দৈর্ঘ, প্রস্থ, বেধ); এবং দেখা যায় যে অনেক বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সাথে জড়িত *সাম্পর্কিক* সূত্রে। 'বোন' শব্দটির আর্থসংগঠন নির্দেশের জন্যে [+মনুষ্য,−পুং, ০ সাবালক] বৈশিষ্ট্যগুলোই যথেষ্ট নয়, এটির আর্থসংগঠন নির্দেশের জন্যে দরকার হবে এরকম সাম্পর্কিক বৈশিষ্ট্য : ['ক' সন্তান 'খ'-র] (দ্র বিওয়াইরিশ (১৯৭০))।

যোগ্যতাসম্পন্ন একটি আর্থতত্ত্ব কতগুলো *আর্থবৈশিষ্ট্য* ব্যবহার করবে (দ্র ক্যাটজ (১৯৭২))৷ একটি যোগ্যতাসম্পন্ন *আর্থতত্ত্ব কাঠামো* রচনার জন্যে সম্ভবত নিম্নের বৈশিষ্ট্যরাশিকে গ্রহণ করতে হবে :

(১১১) [± মনুষ্য, ± সাবালক, ± পদার্থ, ± বস্তু, ± নির্মিত বস্তু]

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যরাশি ব্যবহার করতে হয় 'ছেলে', 'মেয়ে', 'পুরুষ', 'নারী', 'জন্তু', 'চেয়ার', 'পাথর', 'স্বপ্ন' প্রভৃতি শব্দের আর্থ স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের জন্যে (১১১)তে যে-বৈশিষ্ট্যতালিকা দেয়া হয়েছে, তা সৃশৃঙ্খল, বা ক্রমবিন্যস্ত নয়। তবে এ-বৈশিষ্ট্যরাশির কোনো কোনোটি, সঙ্গত-বা যুক্তিগত-ভাবে নির্দেশ করে অন্য এক, বা একাধিক বৈশিষ্ট্য। যেমন বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের বেলায়, তেমনি আর্থ বৈশিষ্ট্যের বেলায়ও এ-রকম যুক্তিগত নির্দশন, সহজভাবে, প্রকাশ করা যায় নিম্নরূপ বাহুল্যসূত্রের সাহায্যে (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ১৩৭); § ৪.৬.৬) :

(১১২)র সূত্রগুলোর বক্তব্য উপস্থাপিত করা যায় (১১৩)রূপ চিত্রে, এবং স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব বৈশিষ্ট্যগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ১৩৮) :

(১১৩)

লক্ষণীয় যে (১১৩) চিত্রের অন্ত্যগ্রন্থির বৈশিষ্ট্যগুলো (১১২)র কোনো সূত্রে তীরের ডান দিকে উপস্থিত হয় না (শুধু যখন তা কোনো সূত্রে তীরের বাঁয়ে বসে, সে-সূত্রেই শুধু তীরের ডানে বসে, অন্য কোনো সূত্রে তীরের ডানে বসে না)। এ-বৈশিষ্ট্যগুলো *তির্যক বৈশিষ্ট্য*, এবং এগুলোকে কোনো সাধারণ সূত্রের সাহায্যে যৌক্তিক প্রণালিতে নির্দেশ করা যায় না। অন্যদিকে, [± বস্তু] বৈশিষ্ট্যটি কোনো সূত্রে তীরের বাঁয়ে বসে নি; এটি হচ্ছে (১১২)র বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিমূর্ততম বৈশিষ্ট্য। অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো এটির সাথে স্তরক্রমিকভাবে অন্বিত। (± প্রাণীবাচক) বৈশিষ্ট্যটি যুগপৎ তির্যক ও স্তরক্রমিক।

রূপান্তর ব্যাকরণে ভাষার শব্দরাজির আর্থসংগঠন নির্দেশ করা হয় বিভিন্ন আর্থবৈশিষ্ট্যের সহায়তায়। এতে জটিলতা প্রচুর (ভাষা খুব সরল ব্যাপার নয়)। প্রশ্ন সহজেই উঠবে যে কোনো ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডারের আর্থসংগঠন বর্ণনার জন্যে কতোগুলো, এবং কী-কী বৈশিষ্ট্য দরকার? এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া এ-রচনায় অসম্ভব (দ্র ক্যাটজ ও ফোডোর (১৯৬৩), হ্বেইনরাইখ (১৯৬৬), বিওয়াইরিশ (১৯৭০), লিজ (১৯৭৪), ল্যাংগেনডোয়েন (১৯৬৯); ক্যাটজ (১৯৭২)।

৪.৬.৯.৩ আর্থ ও বাস্তব জ্ঞান

আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণের সাথে সংলগ্ন আর্থতত্ত্ব কাঠামোকে বলা যায় *সমবায়ী কাঠামো* : পদচিত্রের বিভিন্ন ভাষাবস্তুর সমবায়ে সুস্পষ্ট সূত্রের সাহায্যে কীভাবে অর্থগতভাবে সুগঠিত বাক্য সৃষ্টি করা যায়, তা ব্যাখ্যা করা এ-তত্ত্বের লক্ষ্য। এ-আর্থতত্ত্ব আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় একটি প্রশ্নের মুখোমুখি : আর্থজ্ঞান ও বাস্তব (জাগতিক) জ্ঞান-এর মধ্যে কোনখানে টানা যায় সুস্পষ্ট সীমারেখা? নিচের বাক্যগুলো বিবেচ্য:

(১১৪) ক এ-গাধাটি সমরশাস্ত্রবিদ।

খ টাইপরাইটারটি ধ্রুপদী নর্তকী।

গ তোমার লাল পেন্সিলটি গর্ভবতী।

(১১৪)র বাক্য তিনটি আন্তরবিরোধগ্রস্ত। 'গাধা'র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [−মনুষ্য], 'সমর-শাস্ত্রবিদ'-এর বৈশিষ্ট্য, সম্ভবত, [+ মনুষ্য]; 'টাইপরাইটার'-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [−প্রাণী], 'নর্তকী'র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [+ মনুষ্য]; 'পেন্সিল'-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [−প্রাণী], আর 'গর্ভবতীর'র বৈশিষ্ট্য [-পুং]। এবার লক্ষণীয় (১১৫)র বাক্য তিনটি;

(১১৫) ক ডক্টর রহমান স্বপ্ন দেখেছেন যে এ-গাধাটি সমরশাস্ত্রবিদ।

খ আমি মনে করি যে টাইপরাইটারটি শুধু ধ্রুপদী নর্তকই নয়, পাকা রাজনীতিবিদও।

গ কল্পনা করো যে তোমার লাল পেন্সিলটি গর্ভবতী।

(১১৫)র বাক্যগুলো (১১৪)র বাক্যগুলোর মতো অতো উদ্ভট নয়; কেননা (১১৫)তে (১১৪)র বাক্যগুলোকে গেঁথে দেয়া হয়েছে 'কল্পজগত-রচয়িতা' ক্রিয়া 'স্বপ্ন দেখ' ; 'মনে কর', 'কল্পনা কর' ইত্যাদির সাথে। তাই আর্থতত্ত্বকে হ'তে হবে সে-শক্তিসম্পন্ন, যা বাস্তব, পরাবাস্তব, বা বাস্তব-পরাবাস্তব ইত্যাদি জগতের জন্যে সম্ভবপর বাক্যার্থ নির্ণয় করতে পারে, এবং তাদের 'সত্যতা', বা 'তাৎপর্যপূর্ণতা' নির্দেশ করতে পারে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১১৬) ক ডক্টর হাসান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি।

খ দুয়ে-দুয়ে পাঁচ।

এ-বাক্য দুটিতে কোনো আর্থ ত্রুটি নেই, আছে বাস্তব সত্যের বিরোধিতা। 'ডক্টর হাসান' বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি কি-না, তা জানার দরকার আর্থতত্ত্বের নেই; তেমনি নির্ভুল যোগ অঙ্ক শেখার দায়িত্বও নেই আর্থতত্ত্বের। এটি জাগতিক জ্ঞানের অধীন, ভাষার অধীন নয়। যদিও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের জন্যে দরকার ব্যাপক বাস্তব জ্ঞান, তবে বাস্তব জ্ঞান অপরিহার্য নয়। যদি বাস্তব জ্ঞান অপরিহার্য হতো তবে সমগ্র জাগতিক জ্ঞানার্জনের আগে ভাষা ব্যবহারের অধিকার কেউ পেতো না।

৪.৬.৯.৪ প্রজেকশন সূত্র

§ ৪.৬.৮.-এ অভিধান থেকে পদচিত্রের দু-রকম প্রণালিতে—মিশ্রপ্রতীক প্রতিকল্পন ও ডামিপ্রতীক প্রতিকল্পন—শব্দসংক্রামের কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। মনে করা যাক, আমরা গ্রহণ করেছি শব্দসংক্রামের দ্বিতীয় প্রণালিটি। এ-প্রণালিতে পদচিত্রের Δ-প্রতীককে প্রতিকল্পিত করা হয় অভিধানের শব্দসংলগ্ন মিশ্রপ্রতীকের সাংগঠনিক বর্ণনা অনুসারে। ধরা যাক যে সঙ্গতিসূত্র (দ্র § ৪.৬.৬; § ৪.৬.৯.৫) আর্থ, তাই ক্যাটেগরি-প্রতীকের নিচে সঙ্গতিসূত্রে বিবেচনা না ক'রেই, সরবরাহ করা যায় বিভিন্ন শব্দ। ক্যাটজ ও ফোডার (১৯৬৩) এবং ক্যাটজ ও পোস্টাল (১৯৬৪) প্রস্তাব করেছিলেন এক-শ্রেণীর *আর্থ প্রজেকশন সূত্র*, যার সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোর আর্থসংগঠন ও পদচিত্রের (গভীর তলের) বাক্যিক সংগঠনের সংশ্লেষ সাধন ক'রে নির্ধারণ করা যায় বাক্যার্থ। (১১৭)র বিমূর্ত পদচিত্রটি অবলম্বন ক'রে বর্ণনা করা যাক প্রজেকশন সূত্রের প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ। (১১৭)র ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে বিবেচনা করতে হবে বাক্যিক ক্যাটেগরি, এবং স্বরবর্ণগুলোকে বিবেচনা করতে হবে আর্থবৈশিষ্ট্যগুচ্ছ, বা আর্থমিশ্রপ্রতীক ব'লে। ধ'রে নিতে হবে যে 'অ-আ-ই-ঈ-উ',-কে পদচিত্রে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে তাদের বাক্যিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে। আর্থ প্রজেকশন সূত্রের কাজ শুরু হয় পদচিত্রের নিম্নতম বৃন্তে, এবং ক্রমশ ওঠে উচ্চতম বৃন্তে। (১১৭)তে প্রজেকশন সূত্র (? প্রক্ষেপণ সূত্র) প্রথমে কাজ শুরু করবে 'চ-ছ', ও 'ট-ঠ' বৃন্তে।

(১১৭)
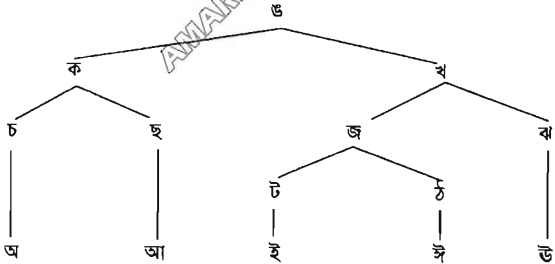
'চ-ছ' যে-আর্থবৈশিষ্ট্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে, তাদের প্রক্ষেপ করা ও মেশানো হবে 'ক'-বৃন্তে (অর্থাৎ ক=চ (অ)+ছ (আ))। 'ট-ঠ' যে-আর্থবৈশিষ্ট্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে, তাদের প্রক্ষেপ করা ও মেশানো হবে 'জ'-বৃন্তে (অর্থাৎ জ=ট (ই)+ঠ (ঈ))। এর ফলে পাওয়া যাচ্ছে 'ক', এবং 'জ'-র *আহরিত অর্থ*। এরপর 'জ' ও 'ঝ' যে-আর্থবৈশিষ্ট্যের ওপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করছে, তাদের প্রক্ষেপ করা হবে ও মেশানো হবে 'খ'-বৃন্তে (অর্থাৎ খ=জ ((ট(ই)+(ঠ(ঈ)+ঝ(উ))। শেষে 'ক', ও 'খ'-র আহরিত অর্থকে প্রক্ষেপ করা এবং মেশানো হবে সর্বোচ্চ বৃন্ত 'ঙ'তে; এবং পাওয়া যাবে বাক্যের সম্পূর্ণ

অর্থ (অর্থাৎ ঙ = ক+খ)। যে প্রক্রিয়ায় (১১৭)র অর্থ আহরণ করা হলো, তাকে বলা হবে (১১৭)র *আর্থ উপস্থাপন*। কোনো বৃন্তে পৌঁছে যদি দেখা যায় যে বাক্যের সঙ্গতি বিনষ্ট হচ্ছে, তখন বাক্যের অর্থআহরণ-প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১১৮) ক আমি একটি নর্তকীকে পড়ছি।

খ কবিতাটি আমাকে খুন করেছে।

(১১৮)তে বিপ হচ্ছে 'আমি', আর ক্রিপ হচ্ছে 'একটি নর্তকীকে পড়ছি'। এ-বাক্যে ক্রিয়াপদের অর্থ আহরণ করতে গেলেই দেখা যাবে সঙ্গতি বিপন্ন হয়ে গেছে। 'একটি নর্তকীকে' সুগঠিত বাক্যিক ও আর্থ মানদণ্ডে, এবং 'পড়ছি'ও সুগঠিত; কিন্তু 'একটি নর্তকীকে' এবং 'পড়ছি'র অর্থ মেশাতে গেলে দেখা যাবে ক্রিয়াপদটি আর্থ নীতি বিনষ্ট করেছে। 'পড়' ক্রিয়ামূলের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে 'বই', 'কবিতা', 'গল্প' প্রভৃতি পাঠযোগ্য বিশেষ্য, কিন্তু এখানে অপাঠ্য বিশেষ্য ব্যবহারের ফলে বাক্যটি অর্থগতভাবে অস্বাভাবিক। তাই একে, গ্রহণ করার জন্যে, দিতে হবে সম্প্রসারিত ও আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা। (১১৮খ)তে ক্রিয়াপদটি 'আমাকে খুন করেছে' সুগঠিত বাক্যিক ও আর্থ মানদণ্ডে, কিন্তু বাক্যের কর্তা-বিশেষ্যপদের অর্থের সাথে ক্রিয়াপদের অর্থ মেশাতে গেলে ধরা পড়বে যে বাক্যটির অর্থ রীতিবিরোধী। 'খুন কর' ক্রিয়ার সাথে দরকার [+মনুষ্য] বিশেষ্য, কিন্তু এতে আছে [−প্রাণীবাচক±বিমূর্ত] বিশেষ্য; তাই ঘটেছে আর্থ বিপত্তি।

৪.৬.৯.৫ সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন : সঙ্গতিবিধি

চোমস্কির (১৯৬৫, ১১৩-১২০, ১৫৩-১৬৩) মতে বাক্যের (আর্থ)সঙ্গতি রক্ষা করা ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষের দায়িত্ব। চোমস্কি বাক্যের সঙ্গতি সম্পর্কে যে-মত পোষণ করতেন *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* (১৯৫৭) গ্রন্থে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতে উপনীত হন তিনি *আস্পেক্টস অফ দি থিওরি অফ সিন্ট্যাক্স* (১৯৬৫) গ্রন্থে। ১৯৫৭তে তিনি (১১৯)-এর বাক্য দুটিকে ব্যাকরণসম্মত মনে করেছেন, কিন্তু তাঁর ১৯৬৫র মানদণ্ডে এ-বাক্য দুটি ব্যাকরণবিরোধী (বাক্য দুটি চোমস্কির (১৯৫৭, ১৫; ১৯৬৫, ১৫৭) ইংরেজি বাক্যের নিষ্প্রভ বাঙলা অনুবাদ : এর মধ্যে প্রথম বাক্যটি বিশ্বজোড়া খ্যাতি আয় করেছে) :

(১১৯) ক রঙহীন সবুজ ভাবনাগুলো প্রচণ্ডভাবে ঘুমোচ্ছে।

খ জন আন্তরিকতাকে সন্ত্রস্ত করেছে।

তিনি মনে করেন যে এমন বিসঙ্গত বাক্যসৃষ্টি বন্ধ করা ব্যাকরণের দায়িত্ব; এবং তিনি এমন বাক্যসৃষ্টি রোধ করার বেশ জটিল প্রক্রিয়াও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে চোমস্কির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উঠেছে প্রবল আপত্তি; প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন যে বিসঙ্গত বাক্য যেহেতু ব্যাকরণগতভাবে সুষ্ঠু, তাই এমন বাক্য ব্যাকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করবে। ব্যাকরণের আর্থ কক্ষ বিবেচনা করবে বিসঙ্গতির প্রকৃতি ও মাত্রা। নিচের বাক্য দুটি লক্ষণীয় :

(১২০) ক হাসান স্বপ্ন দেখেছে যে শহীদ মিনার শ্লোগান দিচ্ছে।

খ হাসিনা মনে করে যে পরমাণুদের লাল ওষ্ঠ আছে।

অ্যাস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণ কিছুতেই ওপরের বাক্য দুটির অন্তর্গত গ্রথিত বাক্য দুটি— 'শহীদ মিনার শ্লোগান দিচ্ছে', 'পরমাণুদের লাল ওষ্ঠ আছে'—সৃষ্টি করবে না। অভিধানে 'শহীদ মিনার' শব্দটির সাথে যে-মিশ্রপ্রতীক থাকবে, তাতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ থাকবে যে এর সাথে 'শ্লোগান দে' ক্রিয়া বসতে পারে না; কেননা 'শহীদ মিনার'-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (−প্রাণী), এবং 'শ্লোগান দে'-র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে [+মনুষ্য]। এমন সঙ্গতি সূত্রের সাহায্যে রোধ করা যাবে 'পরমাণুদের লাল ওষ্ঠ আছে' বাক্যটি। কিন্তু (১২০)-এ দেখছি যে 'কল্পজগত-রচয়িতা' ক্রিয়ার সাথে বেশ স্বাভাবিকভাকেই 'শহীদ মিনার শ্লোগান দিচ্ছে' জাতীয় বিসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করা যায় (স্বপ্নের ওপর হাত আছে কার? মনে করতেও বাধা কী?)। তাই দাবি করতে পারি যে বিসঙ্গত বাক্য ব্যাকরণ সৃষ্টি করবে অবশ্যই, এবং তার বিসঙ্গতির প্রকৃতি ও মাত্রা পরিমাপ করবে ব্যাকরণের আর্থকক্ষ।

চোমস্কি যে-প্রক্রিয়ায় বিসঙ্গত বাক্য রোধ করতে চান, সে-প্রক্রিয়াও সুষ্ঠু নয়। তাঁর মতে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে : যেমন বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মধ্যে। কিন্তু দেখা যায় যে এ-সঙ্গতি নীতি বিশেষ শব্দকে অতিক্রম ক'রে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পদের মধ্যে। (১২১)-এর বাক্য দুটি বিবেচ্য :

(১২১) ক আমাদের প্রধান মন্ত্রী তিন সন্তানের পিতা।

খ *আমাদের প্রধান মন্ত্রী, যিনি অত্যন্ত রূপসী, তিন সন্তানের পিতা।

প্রথম বাক্যটি অর্থগতভাবে সঙ্গত; কেননা 'মন্ত্রী' ও 'পিতা'র মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যগত বিসঙ্গতি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি বিসঙ্গত, যদিও এখানে 'মন্ত্রী' ও 'পিতা'র মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ বেধেছে সম্বন্ধাত্মক বাক্যের ('যিনি অত্যন্ত রূপসী') স্ত্রীলিঙ্গসূচক বিশেষণটির উপস্থিতিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে সঙ্গতি কেবল দুটি শব্দের মধ্যে রক্ষিত হ'লেই চলে না, তা রক্ষা করতে হয় আরো বড়ো এককের মধ্যে। (১২১খ)তে সঙ্গতি থাকা দরকার 'আমাদের প্রধান মন্ত্রী, যিনি অত্যন্ত রূপসী' এবং 'পিতা'র মধ্যে। নিচের বাক্যগুলো লক্ষণীয় :

(১২২) ক ভালোবাসা আণবিক শক্তিচালিত সবুজ সাবমেরিন।

খ তিন শোক আগে আমি তোমাকে দেখেছিলাম।

গ হাসান বিশ্বাস করে যে স্বপ্ন হচ্ছে হলদে রঙের ছোটো পাখি, যা কলাভবনের সিঁড়ি দিয়ে প্রত্যেক দিন ওঠা-নামা করে।

এমন বিসঙ্গত বাক্য ব্যাকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করবে, কিন্তু তা বিচারের ভার থাকবে ব্যাকরণের আর্থকক্ষের ওপর। ভাষা শুধু বাস্তব ও সুসঙ্গত কথা প্রকাশের মাধ্যম নয়, তা অবাস্তব ও বিসঙ্গতকেও প্রকাশ করে। আর সবাই যে অভিন্ন বাস্তবতায় বসবাস করবে, তাও নয়। (১২২)-এর মতো বাক্য যে বলে, তাকে ভাষা-সংশোধনের ক্লাশে পাঠানোর কোনো দরকার নেই, পাঠানো দরকার প্রকাশকের কাছে, বা চেতনা-চিকিৎসাশালায়।

৪.৬.১০ শুদ্ধতার সূত্র : মাত্রা ও সীমা

শুদ্ধতার সমস্য ভাষাশাস্ত্রের সমান বয়সী। একরকম ঐশী শুদ্ধতার কামনায় প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত হয়েছিলো ভাষাশাস্ত্র (*ব্যাকরণ* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শুদ্ধ শব্দনির্মাণবিদ্যা') এবং পাশ্চাত্যেও ভাষাশাস্ত্র জন্মেছিলো শুদ্ধতাকাতরতা থেকে। পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যাকরণের নাম *গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি*, যার অর্থ হচ্ছে 'বর্ণকলা'। দিওনিসিউস থ্রাক্স তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন গ্রিক বর্ণমালার শুদ্ধ বিন্যাস শেখানোর জন্যে। প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার কথ্যরূপের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে লিখিত রূপের ওপর এবং লিখিত রূপকেই মনে করেছে বিশুদ্ধ। দেশেদেশে, কালকালান্তরে, লিখিত ধ্রুপদী সাহিত্যের ভাষাকে মনে করা হয়েছে শুদ্ধতার 'মানরূপ'; এবং সাধারণ-অসাধারণ সব ভাষাভাষী শুদ্ধতার আদর্শ দেখার জন্যে তাকিয়েছে ধ্রুপদী সাহিত্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষার দিকে। এ-'ধ্রুপদী সাহিত্য ফ্যালাসি' দেখা গেছে পশ্চিমে-পুবে, অতীতে ও বর্তমানে : থ্রাক্স-এর কাছে তাঁর সমকালীন আলেকজান্দ্রিয়ার লৌকিক কথ্যভাষার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ও স্বর্গীয় মনে হয়েছে হোমারের ভাষাকে, সংস্কৃত ভাষাশাস্ত্রীগণ চারপাশের অপভ্রংশের অশ্লীল কোলাহলের চেয়ে অনেক বেশি শুদ্ধ, ও ঐশী, মনে করেছেন বৈদিক ভাষাকে। জনসন-এর কাছে উৎকৃষ্টতম ইংরেজির উদাহরণ হচ্ছে প্রাক-রেস্টোরেশন যুগের সাহিত্যসম্রাটদের রচনা (স্যামুয়েল জনসন তাঁর অভিধানে লিখেছেন : 'আমি পরম আগ্রহে উদাহরণ আহরণের চেষ্টা করেছি রেস্টোরেশন-পূর্ব যুগের লেখকদের রচনা থেকে, যাঁদের রচনাবলিকে আমি মনে করি পরিস্রুত ইংরেজির অমল উৎস, শুদ্ধশৈলীর অনিন্দ্য ঝর্না'), আমাদের অনেকের কাছে বিদ্যাসাগরই শুদ্ধতার অবিচল মানরূপ। যাঁরা শুদ্ধতার অবিচল মানদণ্ডে বিশ্বাসী, তাঁরা অগ্রাহ্য করেন ভাষাপরিবর্তন প্রক্রিয়াকে। বিদ্যাসাগরের ভাষার সাথে যখন কোনো মিল পান না পানের দোকানির ভাষার, যখন রবীন্দ্রনাথের ভাষার সাথে বৈসাদৃশ্য দেখতে পান বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবসংরক্ষণশাস্ত্রের অধ্যাপকের, তখন তাঁরা দ্বিতীয় জনের ভাষাকে 'অশুদ্ধ', 'হীন', 'প্রাকৃত', 'ভ্রষ্ট', 'ইতর' প্রভৃতি আখ্যা দেন। ইংরেজির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক বেশ গুরুত্বপূর্ণ : এ-শতকে স্থির করা হ'তে থাকে ইংরেজির শুদ্ধ মান। তাঁরা চেয়েছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্য ভিত্তি ক'রে শুদ্ধ ইংরেজির এক অবিচল পরম মান প্রতিষ্ঠা করতে। সুইফট-এর মতে ইংরেজি ভাষার মহান লেখকদের রচনাও পৃষ্ঠাপরম্পরায় অশুদ্ধ, ড্রাইডেন-এর মতে শুদ্ধ ইংরেজির পতন শুরু হয় চসার-উত্তর যুগে। পাদ্রি লোথ, যাঁর ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষাকে সারা আঠারো শতকব্যাপী শাসন করেছে, ইংরেজিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন পুরোহিতের মতো : ইংরেজি ভাষা

তাঁর বহু দীক্ষা আজো চিত্তে ও শরীরে বহন করছে। আমাদের অঞ্চলে শুদ্ধতার ঐশী ঝোঁক বেশ প্রবল। এ-দেশে ধর্মাঙ্গরূপে ভাষাশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিলো, তাই অনেকে ধর্মীয় উৎসাহে শুদ্ধতার বিগত মান অবিচল রাখতে চান। তবে আমাদের শুদ্ধতাবোধ, প্রধানত ও সাধারণত, রূপতত্ত্ব ও উচ্চারণতত্ত্ব-নির্ভর। শুদ্ধতার সমস্যাটি বেশ ব্যাপক ও জটিল : এক পণ্ডিত কর্তৃক আরেক পণ্ডিতের ভাষা নিন্দায় ও সংশোধনে তা সমাপ্ত হয় না।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অনুশাসন ও ধ্রুপদী বিশুদ্ধতার বিরোধী। তাঁরা ভাষার কথ্যরূপকে প্রধান রূপ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন; এবং 'শুদ্ধতা'কে তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ব'লে মনে করতেন না। সামান্য অভিনিবেশে বোঝা যায় যে সাহিত্যের ভাষা চারপাশের অবিরাম উচ্চারিত ভাষার প্রতিনিধি নয়। ভাষাবিজ্ঞানী যখন কোনো ভাষা-অঞ্চলে যান, তখন তিনি মুখোমুখি হন একরাশ *উপভাষার* প্রাকৃত কোলাহলের; খুঁজে পান তিনি আঞ্চলিক ভাষারীতি, শ্রেণীক ভাষারীতি, ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের পরিভাষাকীর্ণ ভাষারীতি। গৃহকর্তা যে-ভাষা ব্যবহার করেন, গৃহিণী অবিকল সে-ভাষা ব্যবহার করেন না; ঝি যে-ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে, ভৃত্য সে-ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে না। এতো ভাষারীতির মধ্যে শুদ্ধ কোনটি, অশুদ্ধ কোনগুলো? তবে সব ভাষারই পাওয়া যায় একটি *মানরূপ*, যা ব্যবহৃত হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে। ওই রূপটি একত্রে সংযুক্ত ক'রে রাখে বিভিন্ন উপভাষা-ব্যবহারকারী জনগণকে। অনেক সমাজে দ্বিভাষা-ত্রিভাষাও দেখা যায়, যাদের এক-একটি ব্যবহৃত হয় এক-এক কাজে। কোনো দেশে, বা ভাষা-অঞ্চলে ব্যবহৃত *মানভাষারূপ*টি কোনো আন্তর বা সহজাত গুণে অন্য রূপের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। নানা সামাজিক-আর্থ-রাষ্ট্রিক কারণে বিভিন্ন প্রতিযোগী উপভাষার মধ্যে একটি প্রাধান্য পায়, এবং গৃহীত হয় মানভাষারূপরূপে। এই মানভাষারূপটিকে ভাষাভাষীরা 'উন্নত' 'শুদ্ধ' ভাষারূপ ব'লে মনে করে। (১২৩)-এর উদাহরণগুলো লক্ষণীয়:

(১২৩) ক আমি যাচ্ছি।

খ আমি যাইতাছি।

গ আমি যাইতে আছি।

এ-বাক্য তিনটি সমার্থক, কিন্তু ভাষাবস্তুতে ভিন্ন। এদের মধ্যে কোনোটির এমন কোনো আন্তর, বা সহজাত গুণ নেই, যার ভিত্তিতে একটিকে নির্দেশ করা যায় অন্য দুটির চেয়ে শুদ্ধতর ব'লে। তবে সামাজিকভাবে (১২৩ক)কে মনে করা হবে অধিকতর উন্নত, কেননা এ-বাক্যটি যে-ভাষারীতির অন্তর্গত, তা রাষ্ট্রিক-সামাজিক কারণে অন্য বাক্য দুটির ভাষারীতি থেকে সামাজিকভাবে উন্নত ব'লে বিবেচিত, এবং মর্যাদামণ্ডিত।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান উপাত্তনির্ভর; কিন্তু উপাত্তচয়নের বিভিন্ন রাস্তা খোলা আছে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীর সামনে। তিনি তাঁর উপাত্ত থেকে বিশেষ সমাজ বা শ্রেণীনিয়ন্ত্রিত লক্ষণগুলোকে পরিত্যাগ ক'রে রচনা করতে পারেন কোনো ভাষার *সাংগঠনিক ব্যাকরণ*, আবার

তিনি উপাত্তকে বিশ্বস্তভাবে রক্ষা ক'রে রচনা করতে পারেন ভাষার *ব্যবহারিক ব্যাকরণ*। ব্যবহারিক ব্যাকরণ রচনার সময় তাঁকে সাহায্য নিতে হবে সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বের, এবং দেখাতে হবে বিশেষ কোনো প্রয়োগ কেনো অন্য কোনো প্রয়োগের থেকে সামাজিকভাবে উন্নত, বা উৎকৃষ্ট, বা মর্যাদামণ্ডিত ব'লে বিবেচিত। বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞান ও সমাজভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত উপাত্ত আদর্শায়নের মাত্রার ওপর : প্রথমটি প্রাথমিক উপাত্তকে যে-পরিমাণে আদর্শায়িত করে—ভাষার ব্যাপক ও আদর্শ রূপকে ধারণ করার জন্যে—সে-পরিমাণ আদর্শায়ন সমাজভাষাবিজ্ঞান কামনা করে না।

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ সৃষ্টি করতে চায় ভাষার সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্বের সাথে মিল আছে অষ্টাদশ শতকের ব্যাকরণতত্ত্বের : উভয়ই ভাষাকে মনে করে সূত্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাপার ব'লে, এবং উভয়তত্ত্বই, ব্যাকরণ রচনায়, ব্যবহার করে অবরোহী প্রণালি। তবে রূপান্তর ব্যাকরণ, প্রথাগত ব্যাকরণের মতো, আনুশাসনিক নয়;—ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্দেশ করা এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য নয়। রূপান্তর ব্যাকরণের অধিকার রয়েছে, অন্য যে-কোনো শাস্ত্রের ন্যায়, উপাত্ত-আদর্শায়নের। রূপান্তর ব্যাকরণ সাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অনেক শক্তিমান, ও যোগ্যতাসম্পন্ন : সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান যেখানে ভাষার বিভিন্ন সামাজিক-শ্রেণীক রূপবৈচিত্র্য নির্দেশ ও বর্ণনা ক'রেই ক্ষান্ত হয়, রূপান্তর ব্যাকরণ সেখানে ওই রূপবৈচিত্র্যের কারণ 'ব্যাখ্যা' করতে পারে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয়:

(১২৪) ক ডক্টর হাসান চমৎকার মানুষ।

খ তিনি একনায়কদের উত্থানপতন সম্পর্কে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন।

খ´ সে একনায়কদের উত্থানপতন সম্পর্কে একটি চমৎকার বই লিখেছে।

(১২৪ক, খ) সামাজিক ও ভাষিক মানদণ্ডে ত্রুটিহীন; কিন্তু (১২৪ক, খ´), অনেকের কাছে, সামাজিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ব'লে মনে হবে। প্রথম বক্তা, যিনি (১২৪ক, খ) ব্যবহার করেন, তিনি 'ডক্টর হাসান'কে [+সম্মান] বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে করেন, এবং তাঁর প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করেন [+সম্মান] সর্বনাম 'তিনি', এবং ক্রিয়ারও [+সম্মান] রূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা, যিনি ব্যবহার করেন (১২৪ক, খ´), তিনি 'ডক্টর হাসান'কে সম্মানিত ব্যক্তি মনে করলেও তাঁর প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করেন [−সম্মান] সর্বনাম ' সে', এবং ক্রিয়ারও [−সম্মান] রূপ ব্যবহার করেন। (১২৪ক, খ´) কি অশুদ্ধ? সাংগঠনিক ব্যাকরণ প্রয়োগ দুটির শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে এদের নিরাসক্ত বর্ণনা দেবে, কেননা দুটি প্রয়োগই বাঙলা ভাষায় সুলভ। কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণ ঢুকবে আরো গভীরে। রূপান্তর ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবে এদের সামাজিক-ভাষিক মূল্য। রূপান্তর ব্যাকরণ (১২৪)-এর উপাত্ত থেকে আবিষ্কার করবে [+সম্মান] সম্পর্কে দুটি সূত্র এবং সূত্র দুটিকে বিন্যস্ত করবে বিশেষ ক্রমে। [+সম্মান] বিশেষ্যপদের প্রতি [+সম্মান] সর্বনামের সাহায্যে নির্দেশ করাকে বলা যাক 'সূত্র-১',

এবং [+সম্মান] বিশেষ্যপদের প্রতি [−সম্মান] সর্বনামের সাহায্যে নির্দেশ করাকে বলা যাক 'সূত্র-২'। তারপরে ব্যাখ্যা করা যায় যে 'সূত্র-১' হচ্ছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ও শ্রদ্ধেয় সূত্র; কিন্তু 'সূত্র-২', যদিও শ্রদ্ধেয় নয়, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় সাম্প্রতিক বাঙলা ভাষায়। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্ব, তাই, সমাজ-ভাষাবৈজ্ঞানিক উপাত্তও সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

রূপান্তর ব্যাকরণ উপাত্ত-আদর্শায়নের পক্ষপাতী; এবং কোনো ভাষা-উপাত্ত ব্যাখ্যার সময় এ-তত্ত্ব বিভিন্ন উপভাষার কোলাহল থেকে ছেঁকে নেয় একটি আদর্শ ভাষারীতি (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৩); § ৪.২.৬)। প্রতিটি ভাষারীতির নিজস্ব শৃঙ্খলা রয়েছে, কোনো রীতিই বিশৃঙ্খল নয়। কোনো ভাষারীতির শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা কী-উপায়ে নির্ণয় করা সম্ভব? প্রশ্নটির সুস্পষ্ট উত্তর দেয়া কঠিন। শুদ্ধতা নির্ণয়ের কোনো ঐশী মানদণ্ড আছে কি? গণতান্ত্রিক প্রণালিতে কি শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব? চোমস্কি যে-সমস্ত বাক্যকে শুদ্ধ মনে করেছেন, ভোট নিয়ে দেখা গেছে অনেকে সে-সব বাক্যকে মনে করেন অশুদ্ধ; আবার চোমস্কি কর্তৃক অশুদ্ধ ব'লে ঘোষিত বহু বাক্যকে অনেকে সানন্দে শুদ্ধ ব'লে গ্রহণ করেছেন (দ্র হিল (১৯৬১))। নিচের বাক্যগুলো লক্ষণীয়:

(১২৫) ক হাসিনা যুক্তরাজ্যের রানী।

খ হাসান মাও সেতুংয়ের পিতা।

(১২৬) ক *টিছেলে ভালো।

খ *কেতোমা চাই।

(১২৭) ক *আমি হাঁটছি যে তুমি আসবে।

খ *আমি খুঁড়ছি যে তুমি মন্ত্রী হবে।

(১২৮) ক মেয়েটি অস্তমিত হচ্ছে।

খ ওই রঙটি নীরব।

(১২৯) ক ত্রিভুজ গোলাকার।

খ বৃত্তটি নীরব ও ধূর্ত।

(১২৫ক, খ) অসত্য তবে ব্যাকরণসম্মত; কিন্তু (১২৬-১২৯)-এর বাক্যগুলোকে কোনো-না-কোনো রকমে ব্যাকরণবিরুদ্ধ মনে করা হয়। *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে (১২৬-১২৮)-এর বাক্যগুলোকে মনে করা হয় *বাক্যিক সূত্রবিরোধী* ব'লে: এবং (১২৯)-এর বাক্যগুলোকে মনে করা হয় *আর্থসূত্রবিরোধী* ব'লে। এ-বাক্যগুলোর 'অশুদ্ধতা'র মাত্রা সমান নয়। চোমস্কি (১৯৬৫, ১৪৮-১৫৩) বাক্যগুলোর ব্যাকরণবিরুদ্ধতার প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ণয় করতে চেয়েছেন। (১২৬)-এর বাক্যগুলোকে বলা যেতে পারে 'পদগত বিপর্যয়'জাত; অর্থাৎ

এগুলোতে বিভিন্ন পদের বিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ ('টি ছেলে → ছেলেটি')। (১২৭)-এ বাক্য দুটি 'সূক্ষ্ম উপশ্রেণীগত বিপর্যয়'জাত। এ-বাক্য দুটিতে এমন ক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়েছে উপবাক্য, যা উপবাক্য গ্রহণে অসমর্থ (বলতে পারি 'আমি জানি যে তুমি আসবে', বা 'আমি জানি যে তুমি মন্ত্রী হবে')। (১২৮)-এর বাক্য দুটি 'সঙ্গতিনীতি'-বিরোধী। (১২৯)-এর বাক্য দুটিকেও সঙ্গতিবিরোধী মনে করা হয়। বিভিন্ন ব্যাকরণবৈরিতা পর্যবেক্ষণ ক'রে নির্ণয় করা সম্ভব অশুদ্ধতার *শ্রেণী* ও *মাত্রা*। দেখা গেছে যে-সব বাক্য বাক্যিক ক্রটিপূর্ণ, তাদের বিপর্যয়ের মাত্রা আর্থ ক্রটিপূর্ণ বাক্যের চেয়ে অধিক। তাই ব্যাকরণে বাক্যিক-আর্থধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যরাশিকে এমন স্তরক্রমে বিন্যস্ত করা সম্ভব, যার সাহায্যে বাক্যে বিচ্যুতির মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে বিচ্যুতির মাত্রা নির্ণয় সম্পর্কে নানাবিধ প্রস্তাব সত্ত্বেও শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার মাত্রা নির্ণয়ের কোনো সুষ্ঠু প্রণালি আজো গ'ড়ে ওঠে নি (দ্র হ্বেইনরাইখ (১৯৬৬))। বাক্যে আর্থক্রটির চেয়ে বাক্যিক ক্রটি বেশি মারাত্মক : ভাষায় নিয়মকানুন ভালোভাবে না জানলে ঘটে বাক্যিক ক্রটি, এবং নিয়ম জানার পর অবিরাম ঘটানো যায় আর্থক্রটি।

৪.৬.১১ রূপান্তর উপকক্ষ

ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের সূত্র প্রয়োগে সৃষ্ট গভীর সংগঠন, বা তলের ওপর প্রযুক্ত হয় রূপান্তর উপকক্ষের রূপান্তরসাধক সূত্র, এবং গভীর সংগঠন নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে রচিত হয় বাক্যের বহিঃসংগঠন বা বহির্তল (দ্র § ৪.৩.২)। রূপান্তর সূত্রের সারকথা হলো যে রূপান্তর বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত করবে না। *আস্পেক্টস কাঠামোর* ব্যাকরণের রূপান্তর সূত্র বাক্যের গভীর সংগঠনের কোনো প্রতীককে বর্জন করতে পারে, বা গভীর সংগঠনে যুক্ত করতে পারে নতুন প্রতীক, পারে বিভিন্ন প্রতীককে স্থানান্তরিত করতে, এবং এক প্রতীকের বদলে অন্য প্রতীক ব্যবহার করতে। রূপান্তর সূত্র প্রণয়ন নির্ভর করে বিশ্লেষকের বোধ ও ব্যাখ্যার ওপর : তিনিই স্থির করবেন কোন সমস্যাটিকে তিনি কীভাবে আক্রমণ করতে চান। মনে করা যাক, একজন বিশ্লেষকের উপাত্ত হচ্ছে *বাঙলা প্রশ্নবোধক বাক্য* : অর্থাৎ তিনি বিশ্লেষণ করতে চান বাঙলা প্রশ্নবোধক বাক্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া। তবে তাঁকেই স্থির করতে হবে কী উপায়ে তিনি এ-বাক্য শ্রেণী সৃষ্টি করবেন। তিনি হয়তো প্রথমে সংগ্রহ করবেন প্রশ্নবোধক বাক্যউপাত্ত, এবং পর্যবেক্ষণ করবেন কী উপায়ে এ-বাক্যসমূহ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ তিনি দাঁড় করাবেন বাঙলা প্রশ্নবোধক বাক্য সম্পর্কে একটি তত্ত্ব। তিনি তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে রচনা করবেন পদসাংগঠনিক সূত্র, এবং রূপান্তর সূত্র। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখাবেন কীভাবে তাঁর সূত্র প্রয়োগে বাঙলা ভাষার সমস্ত শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ প্রশ্নবোধক বাক্য সৃষ্টি হ'তে পারে।

রূপান্তর সূত্র রচনার কতকগুলো কৌশল রয়েছে (দ্র § ৪.৩.২))। যে-সমস্ত কৌশল *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণের সাথে জড়িত, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো § ৪.৬.১১.১ পরিচ্ছেদাংশে।

৪.৬.১১.১ রূপান্তর সূত্র রচনাপ্রণালি

প্রতিটি রূপান্তর সূত্র দ্বি-আংশিক: রূপান্তর সূত্রের প্রথমাংশকে বলা হয় সাংগঠনিক বর্ণনা, বা *সাংগঠনিক সংকেত*; এবং দ্বিতীয়াংশকে বলা হয় *সাংগঠনিক রূপান্তর*। সাংগঠনিক বর্ণনা (সাংব) হচ্ছে বাক্যের গভীর, বা মধ্য-সংগঠনের *বুলিয়ান বিশ্লেষণ*, যাতে বাক্যটির সংগঠনকে ভাগ করা হয় কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ উপগ্রন্থিতে (অর্থাৎ কী রকম সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রযুক্ত হবে, তা নির্দেশ করা হয়); এবং সাংগঠনিক রূপান্তর-এ (সাংরূ) নির্দেশ করা হয় বাক্যটির আভ্যন্তর সংগঠন কীরূপে রূপান্তরিত হবে। *আস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে, সাধারণত, সাংগঠনিক বর্ণনায় নির্দেশ করা হয় বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনের রূপ; সাংগঠনিক রূপান্তরে, সরল গদ্যে, নির্দেশ দেয়া হয় রূপান্তর সাধনের, এবং অনেক সময় সূত্রের সাথে পেশ করা হয় একগুচ্ছ শর্ত (দ্র § ৪.৩.২)। একটি রূপান্তর সূত্রের নমুনা (১৩০) :

(১৩০) কর্তা-ক্রিয়ারূপ সঙ্গতিসূত্র

খ যদি ৩ কোনো যুগ্ম বিপ হয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নিচের স্তরক্রমে ৫ যেনো উচ্চতম হয় :

শর্ত : ক ৩ বাক্য ১-এর কর্তা।

খ ১ আধিপত্য করে ৩ ও ৮-এর ওপর।

সূত্রটি সাম্প্রতিকতম প্রণালিতে রচিত। সূত্রটি নির্দেশ করছে কীভাবে বাক্যের ক্রিয়ারূপ বাক্যের কর্তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করবে। সাংগঠনিক বর্ণনায় দেয়া হয়েছে বাক্যটির তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ : বের ক'রে নেয়া হয়েছে সঙ্গতি সূত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় কর্তা-বিশেষ্যপদটিকে, এবং ক্রিয়ামূলের ক্রিয়াসহায়কটিকে। গ্রন্থিগুলোকে সহজে নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে সংখ্যা। যেমন : কর্তাবিশেষ্যপদটির সংগঠন দেখানো হয়েছে ৩,৪,৫,ও ৬ সংখ্যার সাহায্যে; এবং ৪ ও ৬ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় ব'লে, এ-সংখ্যা দুটিকে রাখা হয়েছে উহ্য। কর্তাবিশেষ্যপদ ৩-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি হচ্ছে *বি* (বিশেষ্য)। এর নিচে দেখানো হয়েছে মিশ্রপ্রতীক, এবং মিশ্রপ্রতীকে সে-সব বৈশিষ্ট্যই উল্লেখিত হয়েছে, যা সঙ্গতি সূত্রের জন্যে প্রয়োজনীয়। 'α' [আলফা], ও 'β' [বিটা] নির্দেশ করছে বিশেষ্যের 'পুরুষ'গত বৈশিষ্ট্য (তা 'প্রথম', 'দ্বিতীয়', 'তৃতীয়' যা-ই-হোক), এবং 'শ্রেণী'গত বৈশিষ্ট্য। [+কর্তা] নির্দেশ করছে যে-বিশেষ্যটি কর্তাবিশেষ্যপদের মুখ্য উপাদান। ৮-এ নির্দেশ করা হয়েছে ক্রিয়াসহায়কের বৈশিষ্ট্য। সাংগঠনিক রূপান্তর দেখানো হয়েছে দু-ভাগে। সাংরূ-র প্রথমাংশ নির্দেশ করছে যে ৫-এর পুরুষ(শ্রেণী)গত বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে হবে ৮-এর ওপর, অর্থাৎ কর্তাবিশেষ্যের পুরুষ(শ্রেণী)গত বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে হবে ক্রিয়াসহায়কের ওপর। যদি কর্তাবিশেষ্যপদের বৈশিষ্ট্য হয় [+প্রথম পুরুষ], তবে ক্রিস-র বৈশিষ্ট্য হবে [+প্রথম পুরুষ]; যদি কর্তাবিশেষ্যপদের বৈশিষ্ট্য হয় [+দ্বিতীয় পুরুষ, +সম্মান], তবে ক্রিস-র বৈশিষ্ট্যও হবে [+দ্বিতীয় পুরুষ,+সম্মান] ইত্যাদি। সাংরূ-র দ্বিতীয়াংশ নির্দেশ করছে যুগ্ম কর্তাবিশেষ্যপদের সাথে ক্রিয়ারূপের সঙ্গতি। বাঙলা ভাষায় তিন "পুরুষ-'এর সমবায়ে গ'ড়ে উঠতে পারে কর্তাবিশেষ্যপদ, এবং ওই পরিস্থিতিতে ক্রিয়ারূপ তিন পুরুষের সাথেই সঙ্গতি রক্ষা করে না। সঙ্গতি রক্ষা করে সাংরূ (খ)-তে প্রদর্শিত স্তরক্রমানুসারে। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১৩১) ক সে ও আমি যাবো।

খ তুমি ও আমি যাবো।

গ সে ও তুমি ও আমি যাবো।

ঘ সে ও তুমি যাবে।

ওপরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে কর্তাবিশেষপদ যদি [+তৃতীয় পুরুষ] ও [+প্রথম পুরুষ]-এর সমবায়ে গঠিত হয়, তবে ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি রক্ষা করে প্রথম পুরুষ-এর সাথে; যদি কর্তাবিশেষ্যপদ [+দ্বিতীয় পুরুষ] ও [+প্রথম পুরুষ]-এর সমবায়ে গঠিত হয়, তবে ক্রিয়ারূপ সঙ্গতি রক্ষা করে প্রথম পুরুষ–এর সাথে ইত্যাদি। অথাৎ ক্রিয়ারূপ যুগ্ম বিশেষ্যপদের সে-বিশেষ্যপদটির সাথেই সঙ্গতি রক্ষা করে, যা 'সাংরূ' (খ)-তে প্রদর্শিত স্তরক্রমে উচ্চে অবস্থান করে। সাংগঠনিক রূপান্তর সূত্রটি প্রয়োগের জন্যে দুটি শর্তও আরোপ করা হয়েছে সূত্রটিতে।

রূপান্তর ব্যাকরণে সূত্র অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে রচনা করতে হয়, যাতে যে-কেউ যান্ত্রিকভাবে ওই সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করতে পারে শুদ্ধ, এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য। সূত্রে কোনো অস্পষ্টতা, বা স্ববিরোধ থাকতে পারবে না। রূপান্তর ব্যাকরণের চরম লক্ষ্য কোনা ভাষার সমস্ত সূত্র উদঘাটন, এবং তাদের বিশেষ ক্রমে বিন্যস্ত করা।

৪.৬.১১.২ চক্রাবর্তন নীতি : সাইক্লিক প্রিন্সিপল

আস্পেক্টস কাঠামোর ব্যাকরণে, ও *আস্পেক্টস*-উত্তর রূপান্তর ব্যাকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে রূপান্তর সূত্রগুলো বাহ্যিক ক্রমবিন্যস্ত (দ্র § ৪.৩.২), এবং তা প্রযুক্ত হয় *চক্রাবর্তন* প্রণালিতে। প্রয়োগযোগ্য সমস্ত সূত্র, কোনো সংগঠনে, সূত্রস্তূপরূপে প্রযুক্ত হয় না, প্রযুক্ত হয় এক বিশেষ পরম্পরায়; এবং চলতে থাকে ওই পরম্পরার চক্রাবর্তন। চক্রাবর্তন নীতি বর্ণনার জন্যে উদাহরণের সাহায্য নেয়া দরকার। মনে করা যাক :

[ক] এমন একটি বাক্য সংগঠন রয়েছে, যা গ'ড়ে উঠেছে 'বাক্য$_১$', 'বাক্য$_২$', 'বাক্য$_৩$', ও 'বাক্য$_৪$'-এর সমবায়ে; এবং এগুলোর মধ্যে 'বাক্য$_৪$' গ্রথিত 'বাক্য$_৩$'-এ 'বাক্য$_৩$' গ্রথিত 'বাক্য$_২$'-এ, আর 'বাক্য$_২$' গ্রথিত 'বাক্য$_১$'-এ।

[খ] আমাদের ব্যাকরণে আছে পাঁচটি রূপান্তর সূত্র, যা 'রূসূ^{১}', 'রূসূ^{২}', 'রূসূ^{৩}', 'রূসূ^{৪}', 'রূসূ^{৫}'—এ-ক্রম অনুসারে প্রযুক্ত হয়।

এ-সিদ্ধান্ত ভিত্তি ক'রে রূপান্তর সূত্র প্রয়োগের চক্রাবর্তন নীতি বর্ণনা করা যায় (১৩২) পদচিত্রটির সাহায্যে। (১৩২) এমন একটি বাক্যসংগঠন, যা গ'ড়ে উঠেছে একটি বাক্যসংগঠনের শরীরে আরেকটি বাক্যসংগঠন গেঁথে দেয়ার ফলে। আমাদের ব্যাকরণে পাঁচটি রূপান্তর সূত্র রয়েছে। এ-সূত্রগুলো কী রীতিতে (১৩২)-এ প্রযুক্ত হবে? রূপান্তর ব্যাকরণের নীতি হচ্ছে যে রূপান্তর সূত্র প্রথমে প্রযুক্ত হবে নিম্নতম বাক্যসংগঠনে (এ-ক্ষেত্রে 'বাক্য৪'-এ) এবং সে-সংগঠনে প্রয়োগযোগ্য সমস্ত সূত্র প্রয়োগের পর সূত্র প্রযুক্ত হবে অব্যবহিত উচ্চ সংগঠনে, এবং তারপরে অব্যবহিত উচ্চ সংগঠনে, এবং শেষে প্রযুক্ত হবে সর্বোচ্চ সংগঠনে। (১৩২)-এ রূপান্তর সূত্র প্রথমে প্রযুক্ত হবে 'বাক্য$_৪$'-এ (যদি 'বাক্য$_৪$'-এর সংগঠন রূপান্তর সূত্রটি প্রয়োগের যোগ্য হয়, তবেই সূত্র প্রযুক্ত হবে; নইলে নয়)। প্রয়োগযোগ্য সমস্ত সূত্র 'বাক্য$_৪$-'এ প্রযুক্ত হ'লে বলা হবে যে সূত্রপ্রয়োগের প্রথম *চক্র/বৃত্ত* সম্পূর্ণ হলো। এবার সূত্র প্রযুক্ত হবে 'বাক্য$_৩$'-এ (এতে গৃহীত হবে 'বাক্য$_৪$'-ও)। প্রয়োগযোগ্য সূত্র প্রয়োগের পর যেতে হবে 'বাক্য$_২$'এ (এতে গৃহীত হবে 'বাক্য$_৩$', 'বাক্য$_৪$'), এবং প্রয়োগযোগ্য সূত্র প্রয়োগের পরে যেতে হবে উচ্চতম বাক্য, 'বাক্য$_১$'-এ (এতে গৃহীত হবে 'বাক্য$_১$'-এর অধীন সমস্ত বাক্য), এবং প্রয়োগ করতে হবে প্রয়োগযোগ্য সূত্রাবলি। সূত্রের *শেষ চক্র* সম্পূর্ণ হ'লে রচিত হবে বাক্যের বহিঃসংগঠন। চক্রাকারে বা বৃত্তাকারে সূত্র প্রয়োগের এ-নীতির নাম চক্রাবর্তন নীতি।

(১৩২)
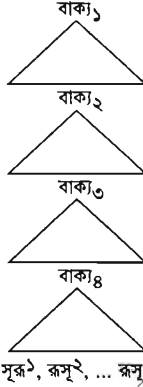
সূত্রপ্রয়োগের চক্রাবর্তন নীতি রূপান্তর ব্যাকরণের একটি চমকজাগানো কৌশল নয়; বিভিন্ন বাক্য গঠনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে এ-নীতি গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। চক্রাবর্তন নীতিকে স্পষ্টভাবে সক্রিয় দেখা যায় *আত্মবাচক সর্বনামীকরণ* ও *কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন* প্রক্রিয়া দুটির টানাপোড়েনে। নিচের বাক্য দুটি লক্ষণীয় :

(১৩৩) ক আমি মনে করি যে হাসান মেধাবী।

খ আমি হাসানকে মেধাবী মনে করি।

(১৩৩ক, খ) সমার্থক; সুতরাং মনে করতে পারি যে বাক্য দুটি উৎসারিত হয়েছে অভিন্ন গভীর সংগঠন থেকে। বাক্য দুটির গভীর তল ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে (১৩৩গ)কে:

(১৩৩) গ বাক্য$_১$[আমি একথা] বাক্য$_২$[হাসান মেধাবী] বাক্য$_২$ [মনে করি] বাক্য$_১$

(১৩৩গ)তে প্রবিষ্ট করতে হবে সম্পূরক-চিহ্ন *যে*, এবং পাওয়া যাবে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বাক্য 'আমি একথা যে হাসান মেধাবী মনে করি'। 'একথা'কে তার অধীন বাক্যসহ (বাক্য$_২$) সমগ্র বাক্যের ডানে স্থানান্তরিত করলে পাওয়া যাবে 'আমি মনে করি একথা যে হাসান মেধাবী', এবং 'একথা' বর্জন করলে পাওয়া যাবে (১৩৩ক)। (১৩৩খ) বাক্যটি কীভাবে গঠিত হবে? (১৩৩খ)তে 'হাসান'; উপস্থিত কর্মরূপে; কিন্তু (১৩৩গ)তে 'হাসান' উপস্থিত কর্তারূপে। (১৩৩গ)তে প্রযুক্ত হ'তে পারে *কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন* সূত্রটি : এ-সূত্র নিম্নবাক্যের কর্তাকে উর্ধ্ব বাক্যের কর্মরূপে উন্নীত করে। এমন উন্নয়নে পাওয়া যাবে (১৩৩ঘ) :

(১৩৩) ঘ বাক্য$_{১}$[আমি বাক্য$_{২}$[হাসানকে মেধাবী] বাক্য$_{২}$ [মনে করি] বাক্য$_{১}$

(১৩৩ঘ) সংগঠনটি সৃষ্টি করবে (১৩৩খ)। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয়।

(১৩৪) ক হাসান$_{১}$ মনে করে যে সে$_{১}$ মেধাবী।

খ *হাসান মনে করে যে নিজ মেধাবী।

গ হাসান নিজেকে মেধাবী মনে করে।

(১৩৪ক)তে 'হাসান$_{১}$' ও 'সে$_{১}$' সমনির্দেশক; অর্থাৎ অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে (অভিন্নতা বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে 'সমনির্দেশক সূচি'.... $_{১...১}$)। (১৩৪খ) বাক্যটি অশুদ্ধ। (১৩৪ক, গ) সমার্থক; এবং সহজেই মনে হয় যে এ-বাক্য দুটি উৎপন্ন হয়েছে কোনো অভিন্ন গভীর উৎস থেকে। (১৩৪ক, গ)র গভীর সংগঠন রূপে গ্রহণ করতে পারি (১৩৪ঘ)কে :

(১৩৪) ঘ বাক্য$_{১}$ [হাসান$_{১}$ একথা বাক্য$_{২}$ [আমি$_{১}$ মেধাবী] বাক্য$_{২}$ [মনে করে] বাক্য$_{১}$

(১৩৪ঘ)তে সম্পূরক-চিহ্ন *যে* ঢুকিয়ে, বাক্য$_{২}$-সহ 'একথা'কে সমগ্র সংগঠনের ডানে স্থানান্তরিত ক'রে, এবং *পরোক্ষ উক্তি গঠনসূত্র* প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে 'হাসান মনে করে একথা যে সে মেধাবী: এবং 'একথা' বর্জন ক'রে পাওয়া যাবে (১৩৪ক)। *আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ* সূত্রের শর্ত হচ্ছে এ-সূত্র প্রয়োগের জন্যে একই সরল বাক্যে থাকতে হবে দুটি সমনির্দেশক বিশেষ্যপদ। (১৩৪ঘ)তে 'হাসান' ও 'আমি' সমনির্দেশক, কিন্তু এরা ভিন্ন সরল বাক্যের সদস্য। সুতরাং (১৩৪ঘ)তে আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্য (১৩৪খ)। আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগের জন্যে (১৩৪ঘ)র 'বাক্য$_{২}$'-এর কর্তা 'আমি'কে উন্নীত করতে হবে 'বাক্য$_{১}$'-এর কর্মরূপে। কর্মে-উন্নয়নের পরে যেহেতু 'হাসান' ও 'আমি' সমনির্দেশক, তাই আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রযুক্ত হবে 'বাক্য$_{১}$'-এর। এর ফলে পাওয়া যাবে 'হাসান নিজেকে মেধাবী মনে করে', অর্থাৎ (১৩৪গ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন ও আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ সূত্র দুটি প্রয়োগের ক্রম হচ্ছে :

[ক| কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন

[খ| আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ

এরা প্রযুক্ত হয় চক্রাবর্তন নীতি অনুসারে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে যে সূত্র প্রয়োগের উল্লিখিত ক্রম সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। ফলে দেখা দেবে *ক্রমবিন্যাসগত বিরোধ*। এ-বিরোধ নিরসনের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে রূপান্তর সূত্র চক্রাবর্তন নীতি অনুসারে প্রযুক্ত হয়।

৪.৬.১২ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ

বাক্যের বহিঃসংগঠন ও মধ্যসংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা হয় বাক্যের *বাক্যিক বহিঃসংগঠন*, বা *বাক্যিক বহির্তল*, এবং ওই বহিঃসংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয় (রূপ)ধ্বনিতাত্ত্বিক **কক্ষ**-এর রূপধ্বনিততাত্ত্বিক সূত্রাবলি। ফলে পাওয়া যায় বাক্যের *ধ্বনিরূপ*। রূপান্তর ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষ বাক্যের বাস্তব বহিঃসংগঠন সৃষ্টি করে না। বাক্যের বাস্তব বহিঃসংগঠন, বা ধ্বনিরূপ পাওয়ার জন্যে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষের সূত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক। বাক্যিক বহিঃসংগঠনকে বলা যেতে পারে *ধ্বনিতাত্ত্বিক গভীর সংগঠন*, যার ওপর *সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব*-এর রীতি অনুসারে প্রয়োগ করা হয় রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। রূপান্তর ব্যাকরণের ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষও, আর্থকক্ষের মতো, সৃষ্টিশীল নয়; এ-কক্ষ ভাষাত্মক। বাক্যিক কক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট বাক্যের ধ্বনিরূপ নির্দেশ করাই এ-কক্ষের সূত্রের দায়িত্ব। রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব, যার নাম *সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব*, বা *সুশৃঙ্খল ধ্বনিতত্ত্ব*, নানা দিকে ভিন্ন সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্ব থেকে। সাংগঠনিকদের মতে ধ্বনিমূল অবিভাজ্য, কিন্তু রূপান্তরবাদীদের মতে ধ্বনিমূল বিভাজ্য (ধ্বনিমূল শব্দটিকেই পরিহার করেন রূপান্তরবাদীরা)। একেকটি ধ্বনি, সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বে, একগুচ্ছ *স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য*-এর সমষ্টি। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব উৎসারিত হয়েছে ইআকবসনীয় ধ্বনিতত্ত্ব থেকে (দ্র ইআকবসন ও হাল (১৯৫৬))। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বের প্রধান পুরুষ চোমস্কি, হাল, পোস্টাল প্রমুখ (দ্র হাল (১৯৫৯), ম্যাথিউজ (১৯৬৫), চোমস্কি ও হাল (১৯৬৮), পোস্টাল (১৯৬৮))। ধ্বনিতত্ত্ব আমার বিষয় নয়, তাই এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো না (দ্র § ৪.৬.১২.১-৪.১২.২))।

৪.৬.১২.১ বহিঃসংগঠন ও ধ্বনিসূত্র

বহিঃসংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট হয় বাক্যের বাক্যিক বহিঃসংগঠন; এবং ওই বহিঃসংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয় ধ্বনিসূত্র। প্রতিটি বাক্যিক বহিঃসংগঠন হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সার্থ ভাষা-এককের—বলা যাক রূপমূল-এর—সমষ্টি (চোমস্কি ও হালের ভাষায় *ফর্মেটিভ*-এর)। প্রতিটি রূপমূল বহিঃসংগঠনে, বহন করে নিজের সমগ্র পরিচয় : রূপমূলটির পদগত পরিচয় কী, তার বিমূর্ত গভীর তলীয় রূপ কী, এবং রূপমূলটির বাক্যিক ও আর্থ বৈশিষ্ট্য কী, সব তথ্য বাক্যের বহিঃসংগঠনে রূপমূলটির সাথে যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি শব্দ—*মেয়ে*—নেয়া যাক। অভিধানে পরিবেশিত হবে শব্দটির বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিগঠন-সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য; এবং সে-সমস্ত তথ্য বাক্যের বহিঃসংগঠনে শব্দটির সাথে উপস্থিত থাকবে। রূপান্তরবাদী তত্ত্ব অনুসারে যে-কোনো এককই হচ্ছে একগুচ্ছ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। তাই *মেয়ে* শব্দটিকে ধরতে পারি একরাশ বাক্যিক, আর্থ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, যা বাস্তব রূপ পায় *মেয়ে* শব্দে। প্রতিটি বাক্যের বহিঃসংগঠন, ধ্বনিসূত্র প্রয়োগের জন্যে, সরবরাহ করে প্রতিটি বাক্য সম্পর্কে বিপুল তথ্য। প্রতিটি বহিঃসংগঠন হচ্ছে রূপমূলের

গ্রন্থি। বহিঃসংগঠনকে নির্দেশ করতে হবে কীভাবে ওই গ্রন্থি বিভক্ত *পদ*-এ। প্রতিটি পদ হচ্ছে রূপমূলের উপগ্রন্থি। বাক্যের বহিঃসংগঠন-গ্রন্থিকে বিভিন্ন পদে বিভক্ত করতে হ'লে দরকার বহিঃসংগঠন-গ্রন্থির তাৎপর্যপূর্ণ বন্ধনিকরণ। বন্ধনিকরণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একই রূপমূল একাধিক পদের অংশরূপে গৃহীত না হয়। মনে করা যাক, 'ক', 'খ', 'গ' হচ্ছে বহিঃসংগঠন-গ্রন্থির তিনটি রূপমূল। 'ক খ গ'-গ্রন্থির বহিঃসংগঠনে একবার 'ক খ'-কে একটি পদ, এবং একইসঙ্গে 'খ গ'-কে আরেকটি পদ রূপে নির্দেশ করা যাবে না। এদের পদবিন্যাস হ'তে পারে ((ক খ) গ), বা (ক (খ গ)); কিন্তু যুগপৎ উভয় বিন্যাস দেখানো যাবে না। বহিঃসংগঠনকে যেমন বিভক্ত করতে হবে বিভিন্ন পদে, তেমনি বিভিন্ন পদের জন্যে নির্দেশ করতে হবে যোগ্য অভিধা; এবং ওই অভিধা—যেমন : বিপ, ক্রিপ প্রভৃতি পদনির্দেশক বন্ধনির সাথে নির্দেশ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ একটি অতি সরল বাক্য নেয়া যাক :

(১৩৫) আমি তোমাকে ভালোবাসি।

(১৩৫) বাক্যে, বা গ্রন্থিতে 'আমি', এবং 'তোমাকে'র আভ্যন্তর সংগঠনের অভিধা হচ্ছে বিশেষ্যপদ; এবং 'তোমাকে ভালোবাসি'র অভিধা হচ্ছে ক্রিয়াপদ। এমনভাবে বাক্যের প্রতিটি পদের অভিধা নির্দেশ করতে হবে। এ-অভিধাগুলো সর্বজনীন (দ্র § ৪.২.৯)। বাঙলা ব্যাকরণ (১৩৫) বাক্যটির যে-বহিঃসংগঠন সৃষ্টি করবে, তাকে (১৩৬), এবং (১৩৭) রূপে উপস্থাপিত করা যায় (উভয় উপস্থাপন সমতুল্য) :

(১৩৬)
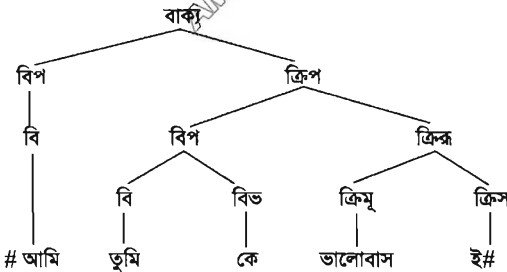
(১৩৭) বাক্য[বিপ[বি[+আমি+]বি]বিপ ক্রিপ[বিপ[বি[+তুমি+] +বি

বিভ[+কে+] বিভ]বিপ ক্রিরূ[ক্রিমূ[+ভালোবাস+] ক্রিমূ ক্রিস[+ই+]ক্রিস

]ক্রিরূ]ক্রিপ] বাক্য

পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদখচিত (১৩৬, ১৩৭)রূপ বহিঃসংগঠনের ওপর প্রযুক্ত হয় রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। এদের ওপর ধ্বনিসূত্র প্রয়োগ ক'রে পাওয়া যাবে (১৩৫)।

৪.৬.১২.২ স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য

সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের একটি মৌল ধারণা হচ্ছে যে ধ্বনিমূল অভিভাজ্য; এবং ওই তত্ত্বে ধ্বনিমূল নির্ণীত হয় নঞার্থকভাবে। কোনো ধ্বনিমূলের প্রধান চারিত্র হচ্ছে যে সেটি অন্য ধ্বনিমূল নয়। ধ্বনিমূলের স্তরে সাংগঠনিকেরা সাদৃশ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন বৈসাদৃশ্যের ওপর; কিন্তু ধ্বনিমূলের চেয়ে নিম্নস্তরে (যেমন : সহধ্বনির স্তরে) সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের উভয় দিকেই মনোযোগ দেয়া হয়। ধ্বনিমূল অবিভাজ্য—এ-পরমাণুবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক আগে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পেশ করেন ক্রবেৎস্কয় ও রোমান ইআকবসন। তাঁদের মতে, ধ্বনিমূল অবিভাজ্য নয়, বিভাজ্য। বিভিন্ন ধ্বনিমূল হচ্ছে একগুচ্ছ *স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য*-এর সমষ্টি। রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বের একটি মৌল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে *দ্বিমুখি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য*-এর রয়েছে এক সর্বজনীন ভাণ্ডার, যার থেকে বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। সর্বজনীন ধ্বনিভাণ্ডারের সমস্ত স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনো ভাষাই গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে এক খণ্ডাংশ।

সর্বজনীন স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিভাণ্ডারের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা নির্ণয় করা, এবং প্রতিটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা বেশ দুরূহ কাজ; এ-বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করতে হ'লে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব গভীর অভিনিবেশের সাথে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। সর্বজনীন ধ্বনিবৈশিষ্ট্যরাশিকে অবশ্যই মেটাতে হবে নিচের শর্ত তিনটি :

[ক] যে-কোনো ভাষার ধ্বনিক ব্যাপারসমূহের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেয়ার শক্তি থাকতে হবে বৈশিষ্ট্যগুলোর।

[খ] যে-কোনো ভাষার শব্দপুঞ্জের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের শক্তি থাকতে হবে এদের।

[গ] *রূপধ্বনিমূল*সমূহের স্বাভাবিক *শ্রেণী* বিন্যাসের শক্তি থাকতে হবে এদের।

চোমস্কি ও হাল (১৯৬৮, ২৯৩-৩১৯) সর্বজনীন ধ্বনিবৈশিষ্ট্যপুঞ্জের ধ্বনিক উপাদান সম্পর্কে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। চোমস্কি ও হালের (১৯৬৮) প্রস্তাবিত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১৩৮) [±রণনশীল] : [+রণনশীল] ধ্বনি সৃষ্টি হয় স্বরযন্ত্রের সে-অবস্থায়, যাতে স্বতস্ফূর্তভাবে ঘোষধ্বনি সৃষ্টি সম্ভব; আর স্বরযন্ত্রের যে-অবস্থায় স্বতস্ফূর্তভাবে ঘোষধ্বনি সৃষ্টি সম্ভব নয়, তখন জন্মে [−রণনশীল] ধ্বনি (বিঘ্নিতধ্বনি)। স্বরধ্বনি, শ্রুতিধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি, ও তরলধ্বনিসমূহ রণনশীল; আর স্পৃষ্টধ্বনি, ঘৃষ্টধ্বনি অরণনশীল।

[±স্বরিত] : [+স্বরিত] ধ্বনি সৃষ্ট হয় যখন মুখগহ্বরে রুদ্ধতার সৃষ্টি হয় না; এবং স্বরতন্ত্রি এমন অবস্থায় থাকে, যাতে স্বতস্ফূর্ত ঘোষায়ন সম্ভব। [−স্বরিত] ধ্বনি সৃষ্টির সময় উল্লিখিত একটি, বা উভয় শর্তই অপূর্ণ থাকে। ঘোষ স্বরধ্বনি ও তরলধ্বনিসমূহ [+স্বরিত]; আর শ্রুতিধ্বনি, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, এবং অঘোষ স্বরধ্বনি ও তরল ধ্বনি [−স্বরিত]।

[± ব্যঞ্জন] : স্বরতন্ত্রি-অঞ্চলের মধ্য-এলাকায় চরম প্রতিবন্ধকতার ফলে উৎপন্ন হয় [+ব্যঞ্জন] ধ্বনি; আর [−ব্যঞ্জন] ধ্বনিসমূহ সৃষ্টির সময় এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা ঘটে না। ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে যেমন সংকীর্ণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হ'তে হবে; এবং প্রতিবন্ধকতার অবস্থান হবে স্বরতন্ত্রি-অঞ্চলের মধ্য-এলাকা।

[±করোনাল] : জিভের পাতা তার 'নিরপেক্ষ' বা স্বাভাবিক অবস্থান থেকে উচ্চে উঠিয়ে সৃষ্টি করা হয় [+করোনাল] ধ্বনি; আর [−করোনাল] ধ্বনি জিভের পাতার নিরপেক্ষ অবস্থানকালে সৃষ্ট হয়। দন্ত্য, দন্তমূলীয়, এবং তালব্য-দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনিরাশি [+করোনাল], এবং জিভের পাতার সাহায্যে উচ্চারিত তরলধ্বনিসমূহও [+করোনাল]। আলজিহ্বা [রর] এবং ওষ্ঠ ও জিভের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনসমূহ [−করোনাল]। ভারতীয় কোনো কোনো ভাষার তথাকথিত মূর্ধন্য স্বরধ্বনি, এবং ইংরেজি কোনো কোনো উপভাষার [র]-পূর্ববর্তী অবস্থানমূহ করোনাল। অমূর্ধন্য স্বরধ্বনিরাশি অবশ্য অকরোনাল।

[±অগ্রবর্তী] : মুখগহ্বরে তালব্য-দন্তমূলীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধকতার ফলে উৎপন্ন হয় [+অগ্রবর্তী] ধ্বনি; এবং [−অগ্রবর্তী] ধ্বনি উৎপন্ন হয় এমন কোনো প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিতে। ইংরেজি [শ] ধ্বনি যে-অঞ্চলে উচ্চারিত, সেটিই হচ্ছে তালব্য-দন্তমূলীয় অঞ্চল। স্বরধ্বনি সর্বদাই [−অগ্রবর্তী]। প্রথাগত পরিভাষায় যে-সব ধ্বনিকে বলা হয় তালব্য, জিহ্বামূলীয়, বা গলনালীয় ধ্বনি, সে-সব ধ্বনি [−অগ্রবর্তী]; আর ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, ও দন্তমূলীয় ধ্বনিসমূহ [−অগ্রবর্তী]।

[±উচ্চ] : জিভ-দেহ স্বাভাবিক, বা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে উচ্চে উঠিয়ে সৃষ্টি করা হয় [+উচ্চ] ধ্বনিসমূহ; আর অনুচ্চ, বা [−উচ্চ] ধ্বনিসমূহ উচ্চারিত হয় জিভ-দেহ উচ্চে না-উঠিয়ে।

[±নিম্ন] : জিভ-দেহ স্বাভাবিক, বা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে নিচে নামিয়ে সৃষ্টি করা হয় [+নিম্ন] ধ্বনিসমূহ; আর অনিম্ন, বা [−নিম্ন] ধ্বনিসমূহ উচ্চারিত হয় জিভ-দেহ নিচে না-নামিয়ে।

[±পশ্চাৎ] : জিভ-দেহ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে উচ্চারিত হয় [+পশ্চাৎ] ধ্বনি; আর অপশ্চাৎ, বা [−পশ্চাৎ] ধ্বনি সৃষ্টি করা হয় জিভ-দেহ পেছনে

সরিয়ে না-নিয়ে [±উচ্চ], [±নিম্ন], [±পশ্চাৎ] বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বরধ্বনিগুলোকে এখানে যেভাবে শনাক্ত করা হয়েছে, তার সাথে প্রথাগত ধ্বনিতাত্ত্বিক বইয়ের বর্ণনার বিশেষ অমিল নেই। তবে এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে 'নিম্ন', 'উচ্চ' বৈশিষ্ট্য দুটি এমন ধ্বনির অস্তিত্ব বাতিল করে, যা একই সঙ্গে [+নিম্ন,+উচ্চ]: কেননা একই সময়ে জিভ-দেহ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে ওপরে ওঠানো এবং নামানো অসম্ভব।

[±বর্তুল] : ওষ্ঠরন্ধ্রকে সংকীর্ণ ক'রে সৃষ্টি করা হয় [+বর্তুল] ধ্বনি; আর অবর্তুল, বা [−বর্তুল] ধ্বনি উচ্চারণের সময় এমন কোনো রন্ধ্রসংকীর্ণতা ঘটে না। সব শ্রেণীর ধ্বনিই বর্তুলতার সাথে জড়িত। শ্রুতিধ্বনি ও অনিম্ন স্বরধ্বনিগুলোতে বর্তুলতা সাধারণত 'পশ্চাৎ' বৈশিষ্ট্যের সাথে সদাজড়িত থাকে : পশ্চাৎধ্বনিমাত্রই বর্তুলধ্বনি; আর অপশ্চাৎ ধ্বনি মাত্রই অবর্তুল।

[±বন্টনিত] : বায়ুপ্রবাহরেখার ব্যাপক স্থানব্যাপী সংকীর্ণতার ফলে জন্মে

[+বন্টনিত] ধ্বনি; আর বায়ুপ্রবাহরেখার স্বপ্ন স্থানব্যাপী সংকীর্ণতার ফলে জন্মে [−বন্টনিত] ধ্বনি।

[+আবৃত] : [+আবৃত] ধ্বনি উৎপন্ন হয় সংকীর্ণায়িত ও দৃঢ়ীভূত দেয়ালসম্পন্ন গলনালি এবং উচ্চায়িত স্বরতন্ত্রির সাহায্যে। পশ্চিম আফ্রিকার কতিপয় ভাষায় এ-বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

[±নাসিক্য] : কোমল তালুর নিম্নায়নের ফলে নাসাপথ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত হয় [+নাসিক্য] ধ্বনি; আর অনাসিক্য, বা [−নাসিক্য] ধ্বনি সৃষ্টি হয় কোমল তালুর উচ্চ অবস্থান কালে, যাতে ফুসফুসতাড়িত বাতাস কেবল মুখগহ্বর দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারে। যে-নাসিক্যধ্বনি দুটি সুলভ, সে-দুটি হচ্ছে অগ্রবর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জন [ম], ও [ন], যাতে স্পৃষ্ট উচ্চারণের ওপর আরোপিত হয় নাসিক্যীভবন। অধিকাংশ ভাষাতেই এগুলো পাওয়া যায়। অনগ্রবর্তী নাসিক্যধ্বনি কম সুলভ। অন্য ধরনের নাসিক্যধ্বনি বেশ দুর্লভ।

[±পার্শ্বিক] : এ-বৈশিষ্ট্য শুধু করোনাল ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [+পার্শ্বিক] ধ্বনি উৎপন্ন হয় জিভের মধ্যাংশের এক ধার, বা উভয় ধার নিচে নামিয়ে। এর ফলে মাঢ়ীর দাঁতের কাছ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায় মুখ থেকে। কিন্তু [−পার্শ্বিক] ধ্বনি উচ্চারণের সময় এমন কোনো পার্শ্ব পথ খোলা থাকে না।

[±প্রলম্বিত] : [+প্রলম্বিত] ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রি-এলাকায় প্রতিবন্ধকতা বা সংকীর্ণতা এমন হয় না, যাতে বাতাস নির্গমন বন্ধ হয়ে যেতে পারে; কিন্তু [−প্রলম্বিত], অর্থাৎ স্পৃষ্ট ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখগহ্বরে বায়ুপ্রবাহ সুচারুরূপে রোধ করা হয়।

[±অবিলম্ব মুক্তি] : স্বরতন্ত্রি-এলাকায় রুদ্ধতার ফলে যে-সমস্ত ধ্বনি জন্মে, এ-বৈশিষ্ট্য তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বরতন্ত্রি-অঞ্চলে রুদ্ধতার মুক্তি ঘটে সাধারণত দু-রকমে : স্পৃষ্টধ্বনি সৃষ্টির সময় রুদ্ধতামোচন ঘটে অবিলম্বে; কিন্তু ঘৃষ্টধ্বনি উচ্চারণের সময় রুদ্ধতামোচনে বিলম্ব ঘটে।

[±দৃঢ়] : [+দৃঢ়] ধ্বনি উচ্চারিত হয় স্বেচ্ছাকৃত, যথাযথ, সুস্পষ্ট পেশল প্রচেষ্টায়; আর অদৃঢ়, বা [−দৃঢ়] ধ্বনি উচ্চারিত হয় দ্রুত, এবং অনেকটা অস্পষ্টভাবে।

[±ঘোষ] : [+ঘোষ] ধ্বনি উচ্চারণের নময় স্বরতন্ত্রি কম্পিত হয়; আর অঘোষ বা [−ঘোষ] ধ্বনি উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রি কাঁপে না।

[±নাদ] : [+নাদ] ধ্বনিসমূহ কলরোলময় ও কর্কশ; আর [−নাদ] ধ্বনিসমূহ তেমন নয়।

চোমস্কি ও হাল (১৯৬৮, ২৯৮-৩১৯) উল্লিখিত স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যগুলো প্রস্তাব করেছেন (আরো বৈশিষ্ট্য সম্ভবত দরকার হবে)। কোনো ভাষাই ওপরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে না, ব্যবহার করে এক বিশেষ অংশ। যে-সমস্ত ভাষা অধিক পরিমাণে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, তাদের সাদৃশ্য অধিক, এবং যে-সমস্ত ভাষা অধিক পরিমাণে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, তাদের বৈসাদৃশ্য অধিক।

ধ্বনি-প্রতিলিপিতে যে-কোনো উক্তিকে উপস্থাপিত করা হয় পৃথক, স্বতন্ত্র ধ্বনিখণ্ড বা এককের পরম্পরারূপে। এ-ধ্বনিখণ্ডগুলোর প্রতিটি, রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে, হচ্ছে একগুচ্ছ ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের (যেমন : [+ঘোষ], [+নাসিক্য] প্রভৃতি) সমাহার। চোমস্কি ও হাল (১৯৬৮, ২৯৪) প্রস্তাব করেছেন যে ধ্বনি-প্রতিলিপিকে গ্রহণ করা যেতে পারে একটি দ্বিরায়তনিক—দ্বিমাত্রিক—ম্যাট্রিক্স ব'লে, যাতে স্তম্ভগুলো নির্দেশ করে ধ্বনিখণ্ড, আর পংক্তিগুলো নির্দেশ করে বিভিন্ন ধ্বনিবৈশিষ্ট্য। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্বের মৌলনীতিগুলো প্রকাশ করা যায় নিম্নরূপে :

[ক] ধ্বনিতত্ত্বের মৌলবস্তু হচ্ছে স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যরাশি। ধ্বনিমূলসমূহ, যথাযথভাবে বলা যায়, *রূপধ্বনিমূল*সমূহ হচ্ছে স্বাতন্ত্রিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্যগুচ্ছ।

[খ] রূপধ্বনিমূল বিমূর্ত একক, এবং তাদের এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিন্যাস সর্বাধিক সাধারণীকৃত সূত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়।

[গ] ধ্বনিতত্ত্বে *বাহুল্য সূত্র* পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

[ঘ] বিমূর্ত ধ্বনিমূলিক উপস্থাপনকে সূত্রের সাহায্যে যুক্ত করা হয় *ধ্বনিক উপস্থাপন*-এর সাথে।।

[ঙ] সাংগঠনিক ধ্বনিমূলের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অস্তিত্ব নেই।

[চ] ব্যাকরণের ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ সম্পূর্ণরূপে ভাষ্যাত্মক। এ-কক্ষে কাঁচামালরূপে গৃহীত হয় বাক্যকক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট বাক্যিক বহিঃসংগঠন।

৪.৭ জেনারেটিভ সিম্যান্টিক্স : সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব

চোমস্কির মানতত্ত্বে—*অ্যাস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে—গৃহীত ক্যাটজ-পোস্টাল নীতিকে—'গভীর সংগঠনেই নির্ণীত হবে বাক্যের সমগ্র অর্থ' চূড়ান্ত পর্যন্ত টেনে নিলে যে-ব্যাকরণ-কাঠামো উদ্ভূত হ'তে পারে, তাই *জেনারেটিভ সিম্যান্টিক্স* বা *সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব*। চোমস্কি (১৯৬৫, ১৯৭১) মানতত্ত্বে, এবং সম্প্রসারিত মানতত্ত্ব-এ যেমন সুষমামণ্ডিত ব্যাকরণকাঠামো পেশ করেছেন (দ্র § ৪.৬.২; § ৪.৬.৩), তেমন সুষমামণ্ডিত ও সমন্বিত ব্যাকরণকাঠামো আজো পেশ করতে পারেনি সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা; তবে তাঁরা চোমস্কীয় ব্যাকরণকাঠামোর বিরুদ্ধে এমন তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন যে চোমস্কীয় ব্যাকরণকাঠামো সম্প্রতি সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছে। চোমস্কি স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ববাদী, এবং তাঁর ব্যাকরণ বাক্যতত্ত্বভিত্তিক; কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা সৃষ্টিশীল বাক্যতত্ত্বে অবিশ্বাসী, এবং তাঁদের ব্যাকরণ অর্থতত্ত্বভিত্তিক। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের উন্মেষ ঘটে জর্জ ল্যাকফ-এর প্রভাবশালী গবেষণাগ্রন্থ *ইররেগুলারিটি ইন সিন্ট্যাক্স* (১৯৭০; গ্রন্থটি রচিত হয়েছিলো ১৯৬৫তে)-এ; এবং ক্রমশ এ-তত্ত্ব শক্তিমান হয়ে ওঠে ল্যাকফ (১৯৭১ক, ১৯৭১খ), ম্যাক্কলি (১৯৬৮ক, ১৯৬৮খ, ১৯৬৮গ, ১৯৭০ক, ১৯৭০খ, ১৯৭১খ) পোস্টাল (১৯৭০), রস (১৯৬৭, ১৯৭০) প্রমুখের রচনায় (কারক ব্যাকরণস্রষ্টা ফিলমোর-এর রচনাবলি এঁদের প্রভূত প্রভাবিত করে)। স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্বের সাথে সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের মৌল পার্থক্য ভাষার কেন্দ্রবস্তু শনাক্তিতে : চোমস্কির মতে বাক্যই ভাষার কেন্দ্রবস্তু, তাই ভাষাস্রষ্টা ব্যাকরণের গভীর সংগঠন হওয়া উচিত বাক্যিক; আর সৃষ্টিশীল আর্থতত্ত্ববাদীদের মতে অর্থ ভাষার কেন্দ্রবস্তু, তাই ভাষাস্রষ্টা ব্যাকরণের গভীর সংগঠনের হওয়া উচিত আর্থ। চোমস্কীয় ব্যাকরণে অর্থতত্ত্ব ভাষ্যাত্মক, কিন্তু সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণে আর্থকক্ষ সৃষ্টিশীল। সৃষ্টিশীল আর্থতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা এ-রচনার সাধ্যের বাইরে; কেননা তাঁরা আজো কোনো সুষ্ঠু সুষমামণ্ডিত ব্যাকরণকাঠামো পেশ করেন নি; এবং তাঁরা যে-রীতিতে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন, তা অতিশয় জটিল ও দুরূহ;—রূপান্তর ব্যাকরণে সুদক্ষ না হ'লে তাঁদের যুক্তি-কৌশল-প্রকরণ সবই অবোধ্য র'য়ে যাবে। আমি এখানে সংক্ষেপে সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের ব্যাকরণকাঠামোর রূপরেখা তুলে ধরবো।

চোমস্কির *অ্যাস্পেক্টস* কাঠামোর ব্যাকরণে, ও সম্প্রসারিত মানতত্ত্বে প্রতিটি বাক্যের জন্যে নির্দেশ করা হয় একটি বাক্যিক গভীর তল (সংগঠন); এবং একটি বাক্যিক বহির্তল বা বহিঃসংগঠন (দ্র § ৪.৬.২; § ৪.৬.৩; § ৪.৬.৭)। প্রতিটি বাক্যের গভীর তল ও বহির্তলকে সংযুক্ত করা হয় একরাশ রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে। প্রতিটি বাক্যের অর্থ নির্ণীত হয় গভীর তলে (সম্প্রসারিত মানতত্ত্বে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে বাক্যের বহির্তলও কিছু পরিমাণে অর্থনিয়ন্ত্রণ

করবে)। ব্যাকরণে একটি ভাষ্যাত্মক আর্থকক্ষ রয়েছে, যার সূত্রগুলো বাক্যিক গভীর তলের ওপর প্রয়োগ ক'রে নির্ণয় করা হয় ব্যাক্যার্থ। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা চোমস্কীয় বাক্যিক গভীর তলে অবিশ্বাসীই শুধু নন; তাঁরা দাবি করেন যে ওই বাক্যিক গভীর তল অপ্রয়োজনীয়; —কেননা তা নানারকম বাহুল্যের জননী। তাঁরা দাবি করেন যে বাক্যিক গভীর তল ব'লে কিছু নেই। বাক্যিক গভীর তলের বিকল্পে তাঁরা প্রস্তাব করেন একরকম সংগঠন, যার নাম *আর্থ উপস্থাপন*। আর্থ উপস্থাপন বাক্যের সমগ্র অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভেঙে গঠন করে বাক্যের অতি বিমূর্ত আর্থ সংগঠন; এবং ওই আর্থ সংগঠনের ওপর শক্তিশালী রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে তাঁরা সৃষ্টি করেন বাক্যের বহির্তল। স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব ও সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের সমরে প্রথম শহীদ হচ্ছে চোমস্কীয় গভীর তল। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব কাঠামোর ব্যাকরণে রয়েছে অতি বিমূর্ত আর্থ উপস্থাপন, শক্তিশালী রূপান্তর সূত্র এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের ব্যাকরণকাঠামো সরলতর। সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণকাঠামোর সংগঠন (১৩৯) :

(১৩৯)

(১৩৯)-এ দেখা যাচ্ছে যে এ-ব্যাকরণে কোনো বাক্যিক গভীর সংগঠন নেই; এবং নেই, চোমস্কীয় ব্যাকরণের মতো, কোনো আর্থকক্ষ। বরং এতে আর্থ উপস্থাপন অধিকার করেছে চোমস্কীয় ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষ ও গভীর সংগঠনের স্থান (দ্র § ৪.৬.৭)। চোমস্কীয় ব্যাকরণ ও সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণের পার্থক্য এখানে: চোমস্কীয় ব্যাকরণ বাক্যের গভীর সাংগঠনিক বিশ্লেষণ ও তার আর্থভাষ্য বা উপস্থাপনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; কিন্তু সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণ এ-পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ক'রে দেয়। অর্থাৎ চোমস্কীয় ব্যাকরণ বাক্যতত্ত্বভিত্তিক, আর এ-ব্যাকরণ অর্থতত্ত্বভিত্তিক। বাক্যতত্ত্বভিত্তিক ব্যাকরণ বাক্যতত্ত্বের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাস করে, কিন্তু অর্থতত্ত্বভিত্তিক ব্যাকরণ বাক্যতত্ত্বের স্বায়ত্তশাসনে অনাস্থাবাদী (দ্র § ৪.৫.৩)। চোমস্কীয় ব্যাকরণে ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্রাবলি আভিধানিক উপকক্ষের সহায়তায় রচনা করে বাক্যের গভীর তল; এবং ওই গভীর তলের ওপর প্রযুক্ত হয় আর্থকক্ষের ভাষ্যাত্মক সূত্র; এবং নির্ণীত হয় বাক্যার্থ। কিন্তু সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণ বাক্যের বাক্যিক

গভীর তলকে সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে পেশ করে বাক্যের আর্থ উপস্থাপন। ওই আর্থ উপস্থাপনের ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করে বাক্যের বহির্তল। সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণের আর্থ উপস্থাপন এক অত্যন্ত বিমূর্ত ব্যাপার; তাতে বাক্যকে বিভক্ত করা হয় নানাবিধ আর্থপরমাণুতে, এবং ওই আর্থপরমাণুরাশিকে শক্তিশালী রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে রূপ দেয়া হয় বাক্যের। তাঁদের বাক্যবিশ্লেষণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল সিম্বলিক লজিক-এর ওপর।

চোমস্কীয় ব্যাকরণ বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হয় *সংখ্যাশব্দ* [কোয়ান্টিফায়ার]-সম্বলিত বিশেষ্যপদমণ্ডিত একশ্রেণীর বাক্য নিয়ে, যা পরোক্ষ বাচ্যরূপে ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করে প্রত্যক্ষ বাচ্যরূপ থেকে। চোমস্কি এ-সমস্যা সমাধানের জন্যে স্বীকার ক'রে নেন যে বাক্যের বহির্তলও অনেকাংশে বাক্যার্থ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা বাক্যের সমস্ত অর্থ গভীর তলেই নির্ণয় করার জন্যে প্রস্তাব দিতে থাকেন গভীর-গভীরতর-গভীরতম তলের, যেখানে বাক্যসংগঠন সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়ে টিকে থাকে শুধু আর্থপরমাণু। চোমস্কি অতো গভীরে যেতে অনিচ্ছুক, কেননা বাক্যসংগঠন বিলোপকারী কোনো কিছু তিনি মেনে নিতে পারেন না। চোমস্কি বাক্যসৃষ্টির জন্যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিভিন্ন *বৈশিষ্ট্য*-এর (দ্র § ৪.৬.৬), যাতে প্রতিটি শব্দকে ধরা হয় একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি ব'লে। চোমস্কীয় তত্ত্বে প্রতিটি একক বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ হ'লেও তিনি তাদের বাক্যের গভীর তলে বিভিন্ন সংগঠনে ভাঙতে চান নি। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা দাবি করতে থাকেন যে চোমস্কিকথিত বৈশিষ্ট্যের মতো কিছু উপাদান বাক্যের আর্থ উপস্থাপনে বিশেষ সংগঠনরূপে উপস্থিত থাকে। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা তাই বাক্যকে যেমন বিচূর্ণ করেন বিভিন্ন যৌক্তিক অংশে, তেমনভাবে জীর্ণ করেন শব্দপুঞ্জকেও। অর্থাৎ তাঁরা চোমস্কীয় অভিধানকে পরিত্যাগ করেন। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যাক একটি সরল বাক্য (১৪০):

(১৪০) হাসান হাসিনাকে ভালোবাসে।

চোমস্কি এ-বাক্যটির জন্যে যে-গভীর সংগঠনের প্রস্তাব করবেন, তা বাক্যটির বাস্তব রূপ থেকে খুব সুদূর নয়। (১৪০) বাক্যটির চোমস্কীয় গভীর তল হবে :

(১৪১)
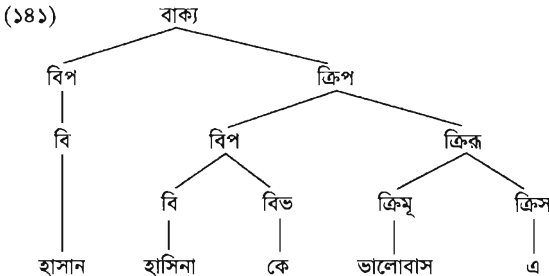
এ-গভীর সংগঠন বেশি গভীর নয়; এর সাথে বহিঃসংগঠনের দূরত্ব সামান্য। কিন্তু সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিক ব্যাকরণে (১৪০)-এর আর্থ উপস্থাপন হবে, অনেকটা (১৪২) (দ্র ম্যাক্কলি (১৯৬৮খ, ১৯৭৩ক)) :

(১৪২)
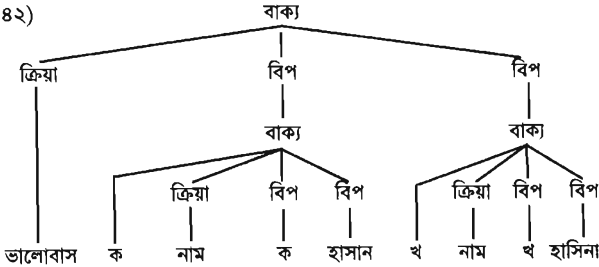
(১৪২) সুদূর (১৪০) থেকে, এবং গভীর তল (১৪১) থেকে। কিন্তু এটিও যথেষ্ট গভীর নয়; তাই সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা প্রবেশ করবেন, অনেকটা, (১৪৩)-এর মতো দূর গভীরে :

(১৪৩)
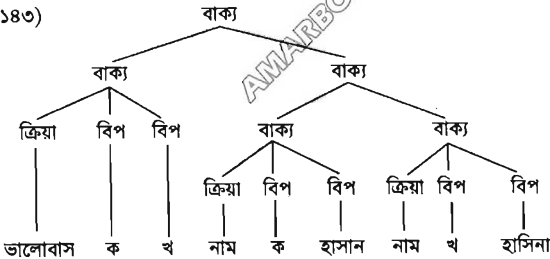
(১৪৩)ও সম্ভবত যথেষ্ট গভীর নয় : 'ভালোবাস' ক্রিয়াকে ভেঙে ফেলা যায় নানা আর্থপরমাণুতে। (১৪৩)-এর ওপর নানাবিধ রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা হবে (১৪০)।

চোমস্কীয় ব্যাকরণে ভিত্তিকক্ষের পদসাংগঠনিক সূত্র কর্তৃক সৃষ্টি উপান্ত্যগ্রন্থিতে অভিধান থেকে শব্দ সরবরাহ করা হয় একবারে—কোনো রূপান্তর সূত্র প্রয়োগের আগে। প্রতিটি শব্দকে চোমস্কীয় ব্যাকরণে বিবেচনা করা হয় নানাবধি বাক্যিক-আর্থ-ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছ বলে। প্রতিটি শব্দের সাথে যুক্ত আর্থবৈশিষ্ট্যগুচ্ছ ব্যাকরণের আর্থকক্ষের সূত্রাবলি কর্তৃক গঠিত হয়; এবং নির্দেশিত হয় বাক্যার্থ। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ববাদীরা শব্দের আর্থবৈশিষ্ট্যসমূহকে 'গুচ্ছ'-এ আবদ্ধ না রেখে তাদের বিভক্ত করেন আর্থপরমাণুতে; এবং ওই পরমাণুরাশিকে বিন্যস্ত

করেন বাক্যসংগঠনের মতো সংগঠনে। চোমস্কীয় রীতিতে তাঁরা পদচিত্রের উপান্ত্যগ্রন্থিতে একবারে শব্দ সরবরাহ করেন না; বরং শব্দের আর্থপরমাণু-সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ করে গঠন করেন শব্দের পূর্ণ অর্থবাহ একটি সংগঠন; এবং বাক্যসৃষ্টির এক পর্যায়ে আর্থপরমাণু-সংগঠনকে প্রতিকল্পিত করেন উপযুক্ত বাস্তব শব্দের সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ একটি শব্দ—*মহিলা*—নেয়া যাক। *মহিলা* শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে এভাবে : মহিলা হচ্ছে সাবালক, স্ত্রীলিঙ্গসূচক, মনুষ্য। চোমস্কীয় অভিধানে *মহিলা* শব্দটি তার বাক্যিক-আর্থ-ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ গৃহীত হবে; এবং এর আর্থবৈশিষ্ট্যরূপে দেখানো হবে এ-বৈশিষ্ট্যরাশি : মহিলা : [+সাবালক,+স্ত্রী+মনুষ্য]। চোমস্কীয় তত্ত্বে মহিলা শব্দের অর্থ তা, যা নির্দেশিত হয় [+সাবালক,+স্ত্রী,+মনুষ্য] বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে। চোমস্কীয় তত্ত্বে আর্থবৈশিষ্ট্য অনুসারে শব্দার্থ নির্ণীত হয়, তবে বাক্যের গভীর তলে শব্দপুঞ্জকে আর্থবৈশিষ্ট্যের সংগঠন, বা পদচিত্ররূপে উপস্থান করা হয় না। কিন্তু সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বে *মহিলা* শব্দসম্বলিত কোনো বাক্যসৃষ্টির সময় *মহিলা* শব্দটিকে দেখানো হবে বাক্যের মূল *বক্তব্য* [প্রোপোজিশন]-এর বহির্ভূত একটি বক্তব্যরূপে, এবং *মহিলা* শব্দটির আর্থপরমাণুরাশিকে বিন্যস্ত করা হবে একটি বিমূর্ত সংগঠনরূপে। সৃষ্টিশীল আর্থতাত্ত্বিকেরা *মহিলা* শব্দটির জন্যে, সম্ভবত, প্রস্তাব করবেন নিম্নরূপ সংগঠন (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ৪৮৬)) :

(১৪৪)
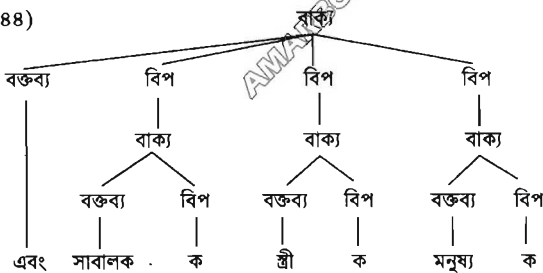
(১৪৪) অত্যন্ত বিমূর্ত : এটি ধারণ করে আছে *মহিলা* শব্দের আর্থপরমাণুরাশি। এ-সংগঠনের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ করে গঠন করা হবে এমন সংগঠন, যা এর তুলনায় অনেক বেশি মূর্ত, এবং এক সময়ে সে-সংগঠনের বদলে ব্যবহার করা হবে বাস্তব শব্দ *মহিলা*। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব যে-বিমূর্ততামুখি, চোমস্কির ব্যাকরণ তার তুলনায় অনেক মূর্ত। সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব বাক্যকে বিচূর্ণ ক'রে ফেলে গভীর তলে, যেখানে টিকে থাকে শুধু ক্ষীণ আর্থপরমাণুরাশি। এ-তত্ত্ব যেনো হানা দিতে চায় মস্তিষ্ক পর্যন্ত : হয়তো আমাদের মস্তিষ্ক বহন করে নানাবিধ আর্থপরমাণু, যা নানা রূপান্তর প্রয়োগে পরিণত হয় সংগঠনমণ্ডিত বাস্তব বাক্যে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙলা বিশেষ্যপদ

৫.০ ভূমিকা

বিশেষ্য ও বিশেষ্যপদের যে-সংজ্ঞা প্রথাগত ব্যাকরণে পাওয়া যায়, তা আর্থ ও অপরিচ্ছন্ন (দ্র § ২.৩,০; § ২.৪.০);—তার সাহায্যে বিশেষ্য ও বিশেষ্যপদ, উভয়ই, শনাক্ত করা কঠিন, এবং অনেক সময় অসম্ভব।[১] সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথাগত ব্যাকরণকে অবৈজ্ঞানিক ব'লে পরিত্যাগ করেছিলেন; এবং যে-কোনো ক্যাটেগরি নির্ণয়ে তাঁরা আর্থ মানদণ্ড বর্জন করেছিলেন। এমনকি 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ', 'ক্রিয়া' প্রভৃতি নামে অর্থের প্রভাব আছে বলে এসব নামও পরিহার করেছিলেন তাঁরা (দ্র ফ্রিজ (১৯৫২, ৬৫-৮৬))। রূপান্তরবাদী সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথাগত ব্যাকরণকে অতো অবহেলা করেন নি; তাঁরা অনেক বোধ আহরণ করেছেন প্রথাগত ব্যাকরণ থেকে। অবশ্য তাঁরা প্রথাগত ব্যাকরণের ত্রুটি সম্পর্কে অন্ধ নন, বরং ভালোভাবেই জানেন কোথায় ত্রুটি লুকিয়ে আছে প্রথাগত ব্যাকরণের অভ্যন্তরে। এ-পরিচ্ছেদটি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকাঠামোভিত্তিক : এটি বোঝার জন্যে রূপান্তর ব্যাকরণে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান আবশ্যক। এ-পরিচ্ছেদের বিশেষ্য ও বিশেষ্যপদ ধারণার সাথে প্রথাগত ব্যাকরণের বিশেষ্য ও বিশেষ্যপদ ধারণার দূর সাদৃশ্য আছে, তবে বৈসাদৃশ্য রয়েছে ব্যাপক। তাই এ-পরিচ্ছেদ পাঠের সময় প্রথাগত ব্যাকরণ দ্বারা তাড়িত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর্থ মানদণ্ডে বিশেষ্য শনাক্তি যেমন শক্ত, তেমনি কঠিন বিশেষ্যপদ নির্ণয়।[২] বিশেষ্য ও বিশেষ্যপদ শনাক্তির জন্যে দরকার রৌপ মানদণ্ড : বিশেষ বিশেষ প্রতিবেশে ব্যবহৃত ভাষাবস্তুই বিশেষ্য (বি) ও বিশেষ্যপদ (বিশ)। বিশেষ্য একরকম *শাব্দ ক্যাটেগরি*, যা পদে বা বাক্যাংশে বসে কোনো বিশেষ প্রতিবেশে; আর বিশেষ্যপদ একরকম *বাক্যিক ক্যাটেগরি*, যা বাক্যের বিশেষ প্রতিবেশে বসে, এবং অখণ্ড এককরূপে কাজ করে (দ্র § ৩.১; § ৩.২; § ৪.৪)। এখানে বিশেষ্য ও বিশেষ্যপদের রৌপ ও আর্থ উভয় দিকেই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

বিশেষ্যপদের প্রধান বস্তু বা *শির* হচ্ছে বিশেষ্য (বি)। প্রথাগত ব্যাকরণের বিশেষ্য ও সর্বনামের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ রক্ষা করা হয়; এবং এদের পরস্পরসম্পর্কশূন্য ক্যাটেগরি ব'লে মনে হয়। কিন্তু রূপান্তরবাদীরা দেখিয়েছেন যে বিশেষ্য (বি) ও সর্বনাম (সর্ব), কতিপয় পার্থক্য

সত্ত্বেও, একই ক্যাটেগরির সদস্য (দ্র স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩, ১৬৪-২২৯))। আমি বিশেষ্য ও সর্বনামকে একই ক্যাটেগরি হিশেবে ধরবো; এবং এদের শাব্দ ক্যাটেগরিগত অভিধা দেবো *বিশেষ্য*। এখানে আমার লক্ষ্য বিভিন্ন রকম বাঙলা বিশেষ্যপদ বিশ্লেষণ, এবং সেগুলোর সৃষ্টির সূত্র রচনা। বাঙলা ভাষার সমস্ত গ্রহণযোগ্য বিশেষ্যপদের সূত্র রচনাই আমার লক্ষ্য; তবে অসাবধানতাবশত কিছু বিশেষ্যপদ থেকে যেতে পারে, যা আমার প্রস্তাবিত সূত্রের সাহায্যে সৃষ্ট নাও হতে পারে। রূপান্তর ব্যাকরণে প্রতিটি বাক্যিক ক্যাটেগরির সংগঠন উপস্থাপিত করা হয় পদচিত্র-এ, যাতে থাকে নানাবিধ বৃন্ত (দ্র § ৪.৩.১)।

বিশেষ্যপদসাংগঠনের প্রধান বস্তু, বা শির হচ্ছে বিশেষ্য (বি); আর ওই বিশেষ্যবৃন্তটিকে দু-ধরনের ভাষাবস্তু দিয়ে পূরণ করা সম্ভব। এক ধরনের ভাষাবস্তু হচ্ছে বিশেষ্য, যাদের *আন্তর* বা *সহজাত বৈশিষ্ট্য* [+বি,−সর্ব]। এ-বৈশিষ্ট্য দুটি নির্দেশ করছে যে বিশেষ্য নামী ভাষাবস্তুরাশি সহজাতভাবেই বিশেষ্য, আর সহজাতভাবেই সর্বনাম নয়। আরেক ধরনের ভাষাবস্তু দিয়ে বিশেষ্যবৃন্ত পূরণ করা যায় : তা হচ্ছে সর্বনাম, যাদের আন্তর বা সহজাত বৈশিষ্ট্য [+বি,+সর্ব]। এ-ভাষাবস্তুগুলো সহজাতভাবে বিশেষ্য ও সর্বনাম। বিশেষ্য ও সর্বনামের মধ্যে মিল এখানে যে এরা উভয়ই বিশেষ্য [+বি]; আর এদের পার্থক্য হচ্ছে বিশেষ্য [−সর্ব], সর্বনাম [+সর্ব]। বিশেষ্য ও সর্বনামকে বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠন, বা গভীর সংগঠন-এ অভিন্ন ক্যাটেগরিরূপে গ্রহণ করা হবে। এদের পার্থক্য [সর্ব] বৈশিষ্ট্যটির মূল্যের ওপর নির্ভরশীল। [সর্ব] বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ্যের জন্যে ঋণাত্মকভাবে চিহ্নিত [−সর্ব]; আর সর্বনামের জন্যে ধনাত্মকভাবে চিহ্নিত [+সর্ব]।

৫.১. বিশেষ্যের উপশ্রেণীকরণ

বাঙলা বিশেষ্যপদ সৃষ্টির জন্যে আমি যে-ব্যাকরণকাঠামো ব্যবহার করছি, তা ব্যাকরণের *ভিত্তিকক্ষ*-এর পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে বিশেষ্য, বা বিশেষ্যের *মিশ্রপ্রতীক* সৃষ্টি করে না (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৮৪); § ৪.৬.৪)। এ-ব্যাকরণ বাক্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে *অভিধান*-এ সংকলিত শব্দসমূহ ব্যবহার করে। চোমস্কির (১৯৬৫, ৮৪, ১১২) প্রস্তাব অনুসারে আমি ধ'রে নিচ্ছি যে এ-ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের উপকক্ষরূপে একটি *আভিধানিক* উপকক্ষ রয়েছে, যাতে বাঙলা ভাষার সমস্ত শব্দ যথোপযুক্ত বৈশিষ্ট্যনির্দেশসহ সংকলিত হয়েছে। বাঙলা বিশেষ্যসমূহের উপশ্রেণীকরণের জন্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যরাশি, কমপক্ষে, দরকার :

(১) [সাধারণ, সংখ্যাবাচক, মনুষ্য, প্রাণী, সম্মান, হীন, পুং, মূর্ত, স্থান]

বাঙলা ভাষার সমস্ত বিশেষ্য উপশ্রেণীকরণ করার জন্যে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য দরকার, (১) তার সম্পূর্ণ তালিকা নয়; আরো অনেক বৈশিষ্ট্য দরকার হবে সমস্ত বাঙলা বিশেষ্যের উপশ্রেণীকরণের জন্যে। কোনো শব্দের বৈশিষ্ট্যনির্দেশের বিশেষ রীতি রয়েছে। বিশেষ্যের আন্তর বা সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোনো বিশেষ বিশেষ্যের জন্যে কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে

ধনাত্মকভাবে চিহ্নিত করতে হবে : যেমন—*ভদ্রলোক* বিশেষ্যের জন্যে [পুং] বৈশিষ্ট্যটিকে চিহ্নিত করতে হবে ধনাত্মকভাবে [+পুং]; আবার এ-বৈশিষ্ট্যটিকে অন্য কোনো বিশেষ্যের জন্যে হয়তো চিহ্নিত করতে হবে ঋণাত্মকভাবে : যেমন—*মহিলা* হচ্ছে [−পুং], অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। এ-বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো বিশেষ্যর ক্ষেত্রে বিবেচিত হ'তে পারে অদরকারী ব'লে: যেমন—*কবিতা* বিশেষ্যটির জন্যে [পুং] বৈশিষ্ট্যটি অবান্তর ও অদরকারী, কেননা ওই জাতীয় বস্তু লিঙ্গহীন। (২)-এর বিশেষ্যসমূহ লক্ষণীয় ;—এতে একগুচ্ছ বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে (*বাহুল্য বৈশিষ্ট্য* বাদ দেয়া হয়েছে)[৩] :

(২)	ভদ্রলোক	:	[+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,+সম্মান,+পুং]
	মহিলা	:	[+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,+সম্মান,−পুং]
	ছেলে	:	[+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,−সম্মান,+পুং]
	মেয়ে	:	[+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,−সম্মান,−পুং]

(২)-এর বিশেষ্যগুলো কতিপয় অভিন্ন, ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যখচিত। *ভদ্রলোক* ও *মহিলা* বিশেষ্য দুটির পার্থক্য কেবলমাত্র [পুং] বৈশিষ্ট্যটির বিপরীত মূল্যের ওপর নির্ভরশীল : *ভদ্রলোক*-এর বৈশিষ্ট্য [+পুং]; আর *মহিলার* বৈশিষ্ট্য [−পুং]। (২)-এর বিশেষ্যগুলোকে যে-বৈশিষ্ট্যগুলো অভিন্ন, সেগুলো হচ্ছে [+মনুষ্য, +সাধারণ, +সংখ্যা]; এবং এ-কারণে এরা একই উপশ্রেণীর সদস্য। [পুং] বৈশিষ্ট্যটি বাংলা বাক্যে গৌণ ভূমিকা পালন করে; তবে এটি বিশেষ্যের, বিশেষ করে মনুষ্যসূচক বিশেষ্যের উপশ্রেণীকরণে একান্ত দরকারী,—কেননা অনেক বাক্যে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে এটির প্রয়োজন। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৩) ক মহিলা রূপসী।

খ *ভদ্রলোক রূপসী।

(৪) ক মহিলা অধ্যাপিকা।

খ *ভদ্রলোক অধ্যাপিকা।

(৩,৪খ) বাক্য দুটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ : বিশেষণ *রূপসী* ও বিধেয়বিশেষ্য *অধ্যাপিকা* [+পুং] কর্তাবিশেষ্যের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না। [সম্মান] বৈশিষ্ট্যটি বাক্যিক ও আর্থ কারণে দরকারী। বাঙলায় ক্রিয়ারূপের অন্তর্গত ক্রিয়াসহায়ক বাক্যের কর্তার সাথে পুরুষ(শ্রেণী)গত সঙ্গতি রক্ষা করে (দ্র § ৪.৪.১))। ওই সঙ্গতি রক্ষার জন্যে জানা দরকার বাক্যের কর্তা কোন শ্রেণীর;—তা কি [+সম্মান), না [−সম্মান], না [+হীন]? এবার বিচার করা যাক (৫)-এর বিশেষ্যগুলো :

(৫) পাখি [+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,−মনুষ্য]
বই [+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,−প্রাণী,−মূর্ত]
জল [+বি,−সর্ব,+সাধারণ,−সংখ্যা,−প্রাণী,+মূর্ত]
স্বপ্ন [+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,−প্রাণী,−মূর্ত]
পথ : [+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,−প্রাণী,+মূর্ত,+স্থান]

যে-বৈশিষ্ট্য (৫)-এর সব বিশেষ্যেই উপস্থিত, তা হচ্ছে [+সাধারণ]; আর এটি (২)-এর বিশেষ্যসমূহেও উপস্থিত। অর্থাৎ [সাধারণ] বৈশিষ্ট্যটির মূল্যে (২) ও (৫)-এর বিশেষ্যরাশি অভিন্ন; কিন্তু এদের মধ্যে ভিন্নতা অন্য বৈশিষ্ট্যের মূল্যে। (২) ও (৫)-এর বিশেষ্যসমূহ ভিন্ন [মনুষ্য, প্রাণী] বৈশিষ্ট্যের মূল্যে : (২)-এর সমস্ত বিশেষ্যই [+মনুষ্য], আর (৫)-এর সমস্ত বিশেষ্যই [−মনুষ্য]; আর (২)-এর বিশেষ্যরাশি যেহেতু [+মনুষ্য], তাই তারা [+প্রাণী]। কিন্তু (৫)-এর বিশেষ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র *পাখিই* [+প্রাণী], আর সমস্ত বিশেষই [−প্রাণী]। বাঙলা ভাষার এক সাধারণ নিয়মানুসারে (৫)-এর সমস্ত বিশেষ্যই [−সম্মান]; অর্থাৎ এগুলো সম্মানবাচক নয়। এবার বিবেচনা করা যাক নামবিশেষ্য-শ্রেণী। (৬)-এর একগুচ্ছ নামবিশেষ্যের ([−সাধারণ]) তালিকা, তাৎপর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ, পেশ করা হলো:

(৬) রবীন্দ্রনাথ [+বি,−সর্ব,−সাধারণ,−সংখ্যা,+মনুষ্য,+পুং]
সুফিয়া আহমেদ : [+বি,−সর্ব,−সাধারণ,−সংখ্যা,+মনুষ্য,−পুং]
হাসান [+বি,−সর্ব,−সাধারণ,−সংখ্যা,+মনুষ্য,+পুং]
কেতকী [+বি,−সর্ব,−সাধারণ,−সংখ্যা,+মনুষ্য,−পুং]
পুশি [+বি,−সর্ব,−সাধারণ,−সংখ্যা,−মনুষ্য,]
ঢাকা [+বি,−সর্ব,−সাধারণ,−সংখ্যা,−প্রাণী,+মূর্ত,+স্থান]

(৬)-এর বিশেষ্যগুলোর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য [−সাধারণ]; অর্থাৎ এরা নামবাচক বিশেষ্য। [+মনুষ্য,−সাধারণ] বিশেষ্যের সাথে [+মনুষ্য,+সাধারণ] বিশেষ্যের অভিন্নতা আছে অনেক বৈশিষ্ট্যে; এবং অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে [−মনুষ্য,−প্রাণী,−সাধারণ] বিশেষ্যের সাথে [−মনুষ্য,−প্রাণী,+সাধারণ] বিশেষ্যের। [সম্মান] বৈশিষ্ট্যটি [+মনুষ্য,−সাধারণ] বিশেষ্যের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মনুষ্যনামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব'লে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। যেমন : 'রবীন্দ্রনাথ'-এর বৈশিষ্ট্য [+সম্মান]; আর 'হাসান'-এর বৈশিষ্ট্য [−সম্মান]। তবে আমি ধ'রে নিচ্ছি যে [±সম্মান] কোনো নামবাচক বিশেষ্যরই সহজাত বা আন্তর বৈশিষ্ট্য নয়। নামবাচক বিশেষ্যের সম্মান-অসম্মান বৈশিষ্ট্য সামাজিক বিচারের ওপর নির্ভরশীল; তাই একই নামের দু-ব্যক্তি বিপরীত মর্যাদার অধিকারী হ'তে পারে। কিন্তু বাক্যে ব্যবহারের সময়

মনুষ্যনামবাচক বিশেষ্যের [সম্মান] বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে, এবং উপযুক্ত মূল্য নির্দেশ করতে হবে; কেননা বাঙলা বাক্যে ক্রিয়াসহায়ক বাক্যের কর্তাবিশেষ্যপদের সাথে পুরুষ(শ্রেণী)গত সঙ্গতি রক্ষা করে। যদি বাক্যের কর্তাবিশেষ্যপদের শ্রেণীপরিচয় [+সম্মান], না [−সম্মান] জানা না যায়, তবে বাক্যের গ্রহণযোগ্য ক্রিয়ারূপ গঠন করা অসম্ভব। [−সাধারণ, +স্থান] ও [−সাধারণ, −মনুষ্য] ও [−সাধারণ, +মনুষ্য] বিশেষ্যের মধ্যে যে-সব বৈশিষ্ট্য অভিন্ন, তা হচ্ছে [−সাধারণ,− সংখ্যা]। স্থানবাচক ও অমনুষ্যবাচক নামবিশেষ্য সহজাতভাবেই [−সম্মান]। এ-পরিচ্ছেদাংশে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো একই সঙ্গে বাক্যিক ও আর্থ।

৫.২ বিশেষ্যপদের সাধারণ চারিত্র

বাঙলা ভাষার কিছু বিশেষ্যপদ গঠিত হয় শুধুমাত্র একটি নিঃসঙ্গ বিশেষ্যে : এরকম পদগঠনে শুধু শিরবিশেষ্য ছাড়া আর কোনো উপাদান বা ভাষাবস্তু দরকার হয় না। (৭)-উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৭) ক পাখি গান গায়।

খ পাখিরা গান গায়।

গ হাসিনা বই পড়ছে।

(৭) উদাহরণে 'পাখি', 'গান', 'পাখিরা', 'হাসিনা', 'বই' প্রভৃতি *বিপ*তে শিরবিশেষ্যাতিরিক্ত কোনো উপাদান বা ভাষাবস্তু নেই : এ-বিপগুলোর প্রত্যেকটি গ'ড়ে উঠেছে মাত্র একটি বিশেষ্যে। (৭ক)র 'পাখি' বিপটি মাত্র একটি বিশেষ্যে গঠিত, এবং এ-বিপটি জাতিবাচক। 'পাখি' বিপটি (৭ক)তে সমগ্র পাখিজাতিকে নির্দেশ করছে। (৭খ)র 'পাখিরা' বিপটি বহুবচনাত্মক; আর এ-বহুবচনতা এ-বিপতে রূপতাত্ত্বিকভাবে প্রদর্শিত। এটিও জাতিবাচক বিশেষ্যপদ। 'পাখি' বিশেষ্যটি [+সংখ্যাবাচক]; আর এটির সাথে, বাঁয়ে, একটি নির্দেশক (নি) বসতে পারে : যেমন— '*একটি* পাখি', '*অনেক* পাখি', '*সমস্ত* পাখি' প্রভৃতি। (৭গ)র 'হাসিনা' [−সাধারণ]; অর্থাৎ নামবাচক বিশেষ্য। এটির সাথে বাঁয়ে বা ডানে কোথাও কোনো নির্দেশক বসতে পারে না। তাই '* *একটি* হাসিনা', '* *অনেক* হাসিনা', '* *সমস্ত* হাসিনা', '*হাসিনা*টি*', '*হাসিনা*সমূহ*' ব্যাকরণবিরুদ্ধ। (৭খ)র 'গান' বিপটিও নির্দেশকহীন, মাত্র একটি বিশেষ্যে গঠিত। এ-বিপটি নির্বিশেষ : এখানে 'গান' কোনো বিশেষ গান নির্দেশ করে না। (৭গ)র 'বই' বিশেষ্যপদটিও গড়া মাত্র একটি বিশেষ্যে। এটি অবশ্য জাতিবাচক নয় : এ-বিশেষ্যপদটি আকারে মৌলরূপধারী হ'লেও এর বচন অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। (৭গ)র বাক্য হাসিনার পঠিত বইয়ের কোনো সুস্পষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করে না, যদিও বাস্তব কারণে আমরা বুঝি হাসিনা মাত্র একটি বই পাঠরত। কিন্তু এখানে বই অনেক হ'তেও পারে : পাঠাগারে একরাশ বই একসাথে পাঠরত হাসিনাকে দেখেও (৭গ) বাক্য ব্যবহার সম্ভব। তাই আমরা ধরতে বাধ্য যে (৭গ)র 'বই' বিশেষ্যপদের বহুবচন অস্বচ্ছ : তা একবচন হ'তে পারে, এবং হ'তে পারে

বহুবচন। সুতরাং দেখতে পাই যে বাঙলা বিশেষ্যপদ শুধুমাত্র একটি শিরবিশেষ্যে গ'ড়ে উঠতে পারে, যখন (ক) বিশেষ্যটি নামবিশেষ্য [−সাধারণ,−সর্ব], বা সর্বনাম [+বি,+সর্ব]; (খ) বিশেষ্যপদটি জাতিবাচক (তবে সব জাতিবাচক বিশেষ্যপদই নির্দেশকহীন নয়); এবং (গ) বিশেষ্যপদটির বচন অস্পষ্ট-অস্বচ্ছ। ওপরে আলোচিত বিশেষ্যপদগুলো নির্দেশকহীন (তবে আমি পরে দেখাবো যে 'পাখিরা' বিশেষ্যপদটি আসলে নির্দেশকযুক্ত (দ্র § ৫.৪.৪)। এবার (৮)-এর বিপগুলো বিবেচ্য :

(৮) ক একজন ভদ্রলোক।

খ দুটি পাখি।

গ পাখি দুটি।

ওপরের বিশেষ্যপদগুলোতে শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে নির্দেশক বসেছে। (৮)-এর বিশেষ্যপদগুলোর 'একজন', 'দুটি' প্রভৃতি উপাদানের নাম দিচ্ছি 'নির্দেশক' (দ্র § ৫.৪.৩)। নির্দেশক গ'ড়ে ওঠে দুটি উপাদানের সমবায়ে : প্রথমে থাকে 'এক', 'দুই', 'তিন' প্রভৃতির মতো *সংখ্যাশব্দ* বা *পরিমাপক*, এবং পরে থাকে 'টা', 'টি', 'খানা', 'জন' প্রভৃতির মতো ভাষাবস্তু, যাদের নাম দিচ্ছি *অনুসর্গ* (অনু)। (৮ক,খ)তে নির্দেশক বসেছে বিশেষ্যের বাঁয়ে, আর (৮গ)তে বসেছে বিশেষ্যের ডানে। লক্ষণীয় যে-সমস্ত বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের বাঁয়ে বসে নির্দেশক, সে-বিপগুলো অনির্দিষ্ট; আর যে-সমস্ত বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের ডানে বসে নির্দেশক, সেগুলো নির্দিষ্ট। বাঙলা নির্দিষ্টতা-অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপনের কৌশল ইংরেজির কৌশল থেকে অনেক ভিন্ন : যাকে প্রথাগত ব্যাকরণে *আর্টিক্যল* বলা হয়, তেমন বস্তু বাঙলায় নেই (দ্র § ৫.৪.৩)। এবার বিচার করা যাক (৯)-এর বিপরাশি :

(৯) ক ও(ই) ছেলেটি।

খ সে(ই) মহিলা।

গ এ(ই) মেয়েরা।

(৯)-এর বিপগুলো নির্দিষ্ট, এবং প্রতিটিই নির্দেশকযুক্ত। 'ও(ই)', 'সে(ই)', 'এ(ই)' ভাষাবস্তুগুলোকে প্রথাগত ব্যাকরণে *নির্দেশক সর্বনাম* বলা হয়। নামটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ-ভাষাবস্তুগুলোকে বলতে পারি *সংকেতশব্দ* [ডিএক্সিস]। (৯ক)তে সংকেতশব্দ 'ও(ই)' অবস্থিত শিরবিশেষ্য 'ছেলে'র বাঁয়ে, আর অনুসর্গ 'টি' বসেছে শিরবিশেষ্যের ডানে, শরীরলগ্ন হয়ে। (৯খ)তে সংকেতশব্দ 'সে(ই)' বসেছে শিরবিশেষ্য 'মহিলা'র বাঁয়ে, আর এতে শিরবিশেষ্যের ডানে কোনো অনুসর্গ বসে নি। (৯গ) একটি রূপতাত্ত্বিকভাবে বহুবচনিত বিশেষ্যপদ; এতে শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে সংকেতশব্দ 'এ(ই)' বসেছে, এবং এর ডানে কোনো অনুসর্গ বসে নি। (৯গ) আপাতদৃষ্টিতে (৯খ)র মতো; কিন্তু আমি পরে দেখাবো যে (৯ক)র সাথেই এর সাদৃশ্য অধিক (দ্র § ৫.৪.৩)।

বাঙলা বিশেষ্যপদ *পৌনপুনিক* হ'তে পারে; অর্থাৎ একাধিক সরল বিশেষ্যপদ পরস্পরসংযুক্ত হয়ে গ'ড়ে তুলতে পারে বিপ। (১০) উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১০) ক হাসান ও হাসিনা।

খ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

(১০)-এ একাধিক সরল বিশেষ্যপদকে ও সংযোজকের সাহায্যে সংযুক্ত ক'রে যৌগিক বিশেষ্যপদ গঠন করা হয়েছে। বাঙলা বিশেষ্যপদে বিশেষণ বসতে পারে; এবং তা, সাধারণত, বিশেষ্যের অব্যবহিত বাঁয়ে বসে। যেমন :

(১১) ক একটি নীল পাখি।

খ নীল পাখিটি।

গ নীল একটি পাখি।

(১১ক, খ)তে নীল বিশেষণটি বসেছে শিরবিশেষ্যের অব্যবহিত বাঁয়ে, আর (১১গ)তে বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে ব্যবধান রচনা ক'রে বসেছে নির্দেশক 'একটি'। (১১ক, গ) মৌল অর্থে অভিন্ন; তবে (১১গ)তে বাক্যারম্ভে বিশেষণ স্থাপনে সূক্ষ্ম আর্থ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আমার প্রস্তাবিত ব্যাকরণে বিশেষণ অবশ্য বিশেষ্যপদের গভীর সংগঠনে শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে অবস্থিত থাকে না, বিশেষণ উদ্ভূত হয় বিধেয়বিশেষণরূপে, এবং একটি রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে।[৪] এ-পরিচ্ছেদাংশে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ্যপদ পেশ করা হলো বিশ্লেষণ ছাড়াই। পরবর্তী পরিচ্ছেদাংশসমূহে বিশেষ্যপদ সৃষ্টির কৌশল বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

৫.৩ বচন

লায়ন্স-এর (১৯৬৮,২৮১) মতে বচন বিশেষ্যের একটি *ক্যাটেগরি* (বা গুণ বা বৈশিষ্ট্য)। বাঙলায় বচন-ক্যাটেগরি দু-ভাগে বিভক্ত : বাঙলা বিশেষ্য একবচনাত্মক হ'তে পারে বা হ'তে পারে বহুবচনাত্মক। বচন-বৈশিষ্টটি প্রযোজ্য শুধুমাত্র [+সংখ্যা] বিশেষ্যের ক্ষেত্রে। তবে অনেক সংখ্যাবাচক বিশেষ্যসম্বলিত বিশেষ্যপদের বচন অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ থাকতে পারে, যেমন অস্বচ্ছ অস্পষ্ট (৭গ)র 'বই' বিশেষ্যপদটির বচন। বাঙলায় বিশেষ্যের বহুবচনতা প্রধানত দু-ভাবে প্রকাশ করা হয় : (ক) মৌল বিশেষ্যরূপের সাথে বহুবচনচিহ্ন যোগ ক'রে; এবং সংখ্যাশব্দের সাহয্যে।[৫]

৫.৩.১ বহুবচনচিহ্ন যোগে বহুবচনত্ব জ্ঞাপন

এ-প্রক্রিয়ায় বহুবচনত্ব প্রকাশ করা হয় বিশেষ্যশব্দের ([+বি,−সর্ব], এবং [+বি,+সর্ব]) বহুবচনরূপের সাহায্যে। বহুবচনরূপ গঠন করা হয় বিশেষ্যের মৌল রূপের ডানপাশে বহুবচনচিহ্ন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে। (১২)র উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১২)	মৌলরূপ		বহুবচনচিহ্ন		বহুবচনরূপ
	বালক	+	এরা	→	বালকেরা
	মেয়ে	+	রা	→	মেয়েরা
	পাখি	+	গুলো	→	পাখিগুলো
	পণ্ডিত	+	গণ	→	পণ্ডিতগণ

(১২)তে দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ্যের মৌলরূপের ডানপাশে বহুবচনচিহ্ন যোগ করে বহুবচনরূপগুলো গঠন করা হয়েছে। চলতি কথ্য বাঙলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় চারটি বহুবচনচিহ্ন : *রা, এরা, দের, গুলো*। এ ছাড়াও ব্যবহৃত হয় *সমূহ, গণ, বর্গ, পুঞ্জ, রাশি* প্রভৃতি বহুবচনচিহ্ন : এগুলো সাধারণত ব্যবহৃত হয় অতিশয় শালীন উক্তিতে, ও সংস্কৃতমুখি রচনায়। আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো *রা, এরা, দের,* ও *গুলোর* মধ্যে।

রা, ও *এরা,* যাদের বিবেচনা করা যায় একই আদর্শ রূপমূলের দু-রকম উৎসারণ ব'লে, পালন করে দু-রকম ভূমিকা : এগুলো ব্যবহৃত হয় (ক) যদি শিরবিশেষ্যটি হয় [+মনুষ্য]; এবং (খ) বিশেষ্যপদটি যদি জাতিবাচক হয়। *গুলোর* ভূমিকাও দু-রকম : এটি সাধারণত বসে (ক) [−মনুষ্য] ও [−প্রাণী] বিশেষ্যের সাথে, এবং (খ) বিশেষ্যপদটি যদি *বিশেষ* হয়, *নির্বিশেষ* না হয়। *রা, এরা, দের*কে জাতিবাচক ও নির্বিশেষ বিশেষ্যপদে [−মনুষ্য] বিশেষ্যের সাথেও ব্যবহার করা যায়। [+মনুষ্য,−সম্মান] বিশেষ্যসম্বলিত বিশেষ বিশেষ্যপদেও বহুবচনচিহ্নরূপে *গুলো* ব্যবহার করা যায়, তবে এটিকে [+সম্মান] বিশেষ্যের সাথে ব্যবহার করা হয় না।[৬] (১৩)র উদাহরণ বিবেচ্য :

(১৩) ক মন্ত্রীরা কফি খান।

খ *মন্ত্রীগুলো কফি খান।

(১৪) ক পাখিরা গান গায়।

খ পাখিগুলো গান গায়।

(১৩ক)র 'মন্ত্রীরা' বিপটি জাতিবাচক ও [+সম্মান], তাই এতে বহুবচন চিহ্নরূপে বসেছে *রা* : (১৩খ)র 'মন্ত্রীগুলো' রীতিবিরুদ্ধ, কেননা 'মন্ত্রী' বিশেষ্যটি আজো [+সম্মান] ব'লে বিবেচিত। (১৪ক)র 'পাখিরা' বিশেষ্যপদের 'পাখি' [−মনুষ্য], তবু বিশেষ্যপদটি যেহেতু জাতিবাচক, তাই এতে বহুবচনচিহ্নরূপে *রা* বসেছে। (১৪খ)তে বহুবচনচিহ্নরূপে বসেছে *গুলো*, এবং বিশেষ্যপদটি বিশেষ একগোত্র পাখির প্রতি নির্দেশ করছে।

বাঙলা বহুবচনচিহ্ন *রা, এরা, দের* বাক্যিক নিয়ন্ত্রণাধীন : (ক) *রা, এরা* বহুবচনচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয় কর্তাবিশেষ্যপদে; আর (খ) *দের* বসে অন্যত্র, অর্থাৎ সে-সব বিশেষ্যপদে, যা বাক্যের কর্তা নয়। *গুলোর* ব্যবহার এমন শর্তাধীন নয়। যেমন :

(১৫) ক মহিলারা এলেন।

খ *মহিলাদের এলেন।

(১৬) ক হাসান মেয়েদের পছন্দ করে।

খ *হাসান মেয়েরাকে পছন্দ করে।

(১৭) ক পাখিগুলো উড়ছে।

খ আমি পাখিগুলো ধরবো।

(১৫ক)র 'মহিলারা' বিপটি বাক্যের কর্তা, এবং ব্যাকরণসম্মত; আর (১৫খ)র 'মহিলাদের', যদিও রূপগতভাবে সুগঠিত, ব্যাকরণবিরুদ্ধ। (১৬ক)র 'মেয়েদের' বাক্যের কর্ম, এবং ব্যাকরণসম্মত; আর (১৬খ)র 'মেয়েরা' রূপগতভাবে সুগঠিত হলেও এখানে এর ব্যবহার ব্যাকরণবিরুদ্ধ। (১৭)তে দেখা যাচ্ছে যে *গুলো* কর্তা ও কর্ম উভয় রকম বিশেষ্যপদেই বহুবচনচিহ্নরূপে বসতে পারে।

রা, ও *এরার* ব্যবহার ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবেও নিয়ন্ত্রিত : (ক) স্বরান্ত্য বিশেষ্যের সাথে ব্যবহৃত হয় *রা*; আর (খ) ব্যঞ্জনান্ত্য বিশেষ্যের সাথে বসে *এরা*।[৭] (১৮)র উদাহরণ লক্ষণীয় :

(১৮) ক {বালক / রাজনীতিবিদ} {এরা / *রা}

খ {মেয়ে / মহিলা} {রা / *এরা}

(১৮)তে দেখা যাচ্ছে যে স্বরান্ত্য বিশেষ্যের সাথে *রা*, আর ব্যঞ্জনান্ত্য বিশেষ্যের সাথে *এরা* গ্রহণযোগ্য; এবং এর বিপরীত ব্যবহার গ্রহণঅযোগ্য।

রা, এরা, দের, ও *গুলোই* বাঙলা ভাষার প্রকৃত বহুবচনচিহ্ন; তবে আরো কিছু রূপ, বেশ সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে, বহুবচনত্ব প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ওই রূপসমূহের মধ্যে অনেকগুলো মুক্ত রূপ হিশেবে ব্যবহৃত হয় : এবং এদের অধিকাংশই *মৃত রূপক*। এগুলো সাধারণত তৎসম শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিব্যঞ্জক এ-রূপগুলোর মধ্যে আছে : *গণ, বর্গ, সমূহ, রাশি, পুঞ্জ, গুচ্ছ, আবলি, কুল, জাল, দল, পাল, মণ্ডলি, মালা, রাজি, বৃন্দ* প্রভৃতি। প্রকৃত বহুবচনচিহ্ন ও সমষ্টিব্যঞ্জক রূপগুলোর আভিধানিক ভুক্তি হবে অনেকটা নিম্নরূপ :

(১৯) [ক] প্রকৃত বহুবচনচিহ্ন:

রা [+বহুবচনচিহ্ন,+মনুষ্য,−ব্যঞ্জন−,+কর্তা]

এরা [+বহুবচনচিহ্ন,+মনুষ্য,−ব্যঞ্জন−,+কর্তা]

দের [+বহুবচনচিহ্ন,+মনুষ্য,−কর্তা]

গুলো [+বহুবচন,−সম্মান]

[খ] সমষ্টিব্যঞ্জক রূপ :

গণ	[+বহুবচনচিহ্ন,+মনুষ্য+তৎসম]
বর্গ	[+বহুবচনচিহ্ন,+মনুষ্য+তৎসম,+মৃত রূপক]
সমূহ	[+বহুবচনচিহ্ন,−মনুষ্য−প্রাণী,+তৎসম]
রাশি	[+বহুবচনচিহ্ন,−প্রাণী,+তৎসম,+মৃত রূপক]
পুঞ্জ	[+বহুবচনচিহ্ন,−প্রাণী,+তৎসম,+মৃত রূপক]
গুচ্ছ	[+বহুবচনচিহ্ন,−প্রাণী, তৎসম,+মৃত রূপক]
আবলি :	[+বহুবচনচিহ্ন,−মনুষ্য,−প্রাণী,+তৎসম,+মৃত রূপক]
কুল	[+বহুবচনচিহ্ন,−মনুষ্য,+তৎসম,+মৃত রূপক]
জাল	[+বহুবচনচিহ্ন,−প্রাণী,+তৎসম,+মৃত রূপক]
দল	[+বহুবচনচিহ্ন,−প্রাণী, +তৎসম,+মৃত রূপক]
পাল	[+বহুবচনচিহ্ন,−মনুষ্য,+তৎসম,+মৃত রূপক]
মণ্ডলি	[+বহুবচনচিহ্ন,+মনুষ্য,+তৎসম,+মৃত রূপক]
মালা	[+বহুবচনচিহ্ন,−প্রাণী,+তৎসম,+মৃত রূপক]
রাজি	[+বহুবচনচিহ্ন,−প্রাণী,+তৎসম,+মৃত রূপক]
বৃন্দ	[+বহুবচনচিহ্ন,+মনুষ্য,+তৎসম,+মৃত রূপক]
শ্রেণী	[+বহুবচনচিহ্ন,+তৎসম,+মৃত রূপক]

৫.৩.২ *সংখ্যাশব্দ* বা *পরিমাপক*-এর সাহায্যে বহুবচনত্ব জ্ঞাপন

আঙ্কিক সংখ্যাশব্দ (বা পরিমাপক) *এক, দুই, তিন* প্রভৃতি এবং সমষ্টিব্যঞ্জক *সংখ্যাশব্দ* (বা *পরিমাপক*) *অনেক, বহু, সব, সমস্ত* প্রভৃতির সাহায্যেও বাঙলায় বহুবচনত্ব জ্ঞাপন করা হয়। এমন ক্ষেত্রে সংখ্যায়িত বিশেষ্যটির সাথে কোনো বহুবচনচিহ্ন যুক্ত হয় না।[৮] যেমন :

(২০) ক দুজন মহিলা।

খ *দুজন মহিলারা।

(২১) ক তিনটি পাখি।

খ *তিনটি পাখিগুলো।

(২২) ক বহু লোক।

খ *বহু লোকেরা।

(২০, ২১, ২২ক) উদাহরণে শিরবিশেষ্যের বহুবচনত্ব প্রকাশ পেয়েছে যথাক্রমে *দু, তিন,* ও *বহু* সংখ্যাশব্দের সাহায্যে;—এখানে বিশেষ্যের সাথে কোনো বহুবচনচিহ্ন যোগ করা হয়নি। (২০, ২১, ২২খ) বিপসমূহ ব্যাকরণবিরুদ্ধ, যেহেতু এ-বিপসমূহে সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনচিহ্ন উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে। বচন-ক্যাটেগরি [−সংখ্যা] বিশেষ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা এক বিশ্বজনীন ব্যাপার যে [+সাধারণ,−সংখ্যা] বিশেষ্য গোণা যায় না, এবং বহুবচনিত করা যায় না; তবে এদের পরিমাপ করা যায়। নিচের উদাহরণ দ্রষ্টব্য :

(২৩) ক *দুধগুলো।

খ *একটি দুধ।

গ দু-সের দুধ।

(২৩ক, খ)তে দেখা যাচ্ছে যে [+সাধারণ,−সংখ্যা] বিশেষ্য গোণা যায় না, বহুবচনিতও করা যায় না। (২৩গ) জানাচ্ছে যে এর পরিমাপ সম্ভব। [+সাধারণ,−সংখ্যা] বিশেষ্যের মতো [−সাধারণ,−সংখ্যা] বিশেষ্যকে বহুবচনিত করা যায় না, এবং গোণা যায় না। যেমন :

(২৪) ক *একটি হাসিনা।

খ *হাসিনারা।

গ হাসিনারা আসবে।

(২৪ক) জানাচ্ছে যে নামবাচক বিশেষ্য গোণা যায় না, আর (২৪খ) জানাচ্ছে যে নামবাচক বিশেষ্যকে বহুবচনিতও করা যায় না। (২৪গ)তে নামবাচক বিশেষ্য 'হাসিনা'কে বহুবচনিত করা হয়েছে। তবে আর্থবিচারে 'হাসিনারা' বহুবচন নয়; 'হাসিনারা' এখানে 'একাধিক হাসিনা' নির্দেশ করছে না; প্রকাশ করছে 'হাসিনা ও অন্যান্য' জাতীয় অর্থ।

৫.৪ বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠন বা গভীর তল

বাঙলা বিশেষ্যপদ সৃষ্টির সূত্র রচনা আমার লক্ষ্য। রূপান্তর ব্যাকরণ অনুসারে প্রতিটি বিশেষ্যপদের দুটি *সংগঠন* বা *তল* বিদ্যমান : একটি হচ্ছে *আভ্যন্তর সংগঠন*, বা *গভীর তল*, অন্যটি *বহিঃসংগঠন*, বা *বহির্তল*। রূপান্তর ব্যাকরণে ভিত্তিকক্ষের পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয় গভীর তল, আর আভ্যন্তর সংগঠন বা গভীর তলের ওপর রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ করে সৃষ্টি করা হয় বাক্য, বা অন্য কোনো সংগঠনের বহিঃসংগঠন, বা বহির্তল। বাঙলা বিশেষ্যপদ সৃষ্টির জন্যে যে-পদসাংগঠনিক সূত্র দরকার তবে, তা নিম্নরূপ অর্থাৎ (২৫) হচ্ছে বাঙলা বিশেষ্যপদের পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ।[৯]

(২৫) বিশেষ্যপদের ব্যাকরণ :

ক বিপ → { সংযোগ + বিপ + বিপ* / বাক্য / (বিক) + বি + (বাক্য) }

খ বিক → (খণ্ড) + ({ নির্দিষ্ট / সংকেত }) + (নির্দেশক)

গ সংকেত → (প্রদর্শক + (ক্রমসংখ্যা)

ঘ নির্দেশক → { সংখ্যা + (অনুসর্গ) / • / বহুবচন }

এ-সূত্রগুলো বাঙলা ভাষার সমস্ত বিশেষ্যপদ সৃষ্টি করবে। বিশেষ্যপদের আবশ্যিক উপাদান হচ্ছে শিরবিশেষ্য (বি); তবে এটিকেও পরিস্থিতিবিশেষ বর্জন করা যায়। বিশেষ্যপদের অন্যান্য উপাদান নির্বাচনে শিরবিশেষ্য (বি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী পরিচ্ছেদাংশগুলোতে আমি (২৫)-এর সূত্রের সাহায্যে কীভাবে নানারকম বাঙলা বিশেষ্যপদ সৃষ্টি করা যায়, তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবো।

৫.৪.১ বিপ → বি

এ-সূত্রটির সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় সে-সমস্ত বিশেষ্যপদ, যা গঠিত মাত্র একটি শিরবিশেষ্যে;— যাতে শিরবিশেষ্য ছাড়া অন্য কোনো উপাদান ব্যবহৃত হয় না। (২৬)-এর উদাহরণ লক্ষণীয় :

(২৬) ক পাখি গান গায়।

খ হাসিনা বই পড়ে।

গ আমি যাবো।

(২৬ক)র 'পাখি' বিশেষ্যপদটি বিশেষকহীন; এতে আছে শুধু একটি শিরবিশেষ্য, যা মৌলরূপে উপস্থিত। এ-বিশেষ্যপদটি জাতিবাচক। বাঙলা ভাষায় জাতিবাচক সমস্ত বিপ-ই যে বিশেষকহীন হবে, তা নয়; হবে (২৬ক)র 'পাখি'র মতো বিশেষ্যপদরাশি জাতিত্ব নির্দেশ করে,

যদি বাক্যের 'কাল' ও 'ক্রিয়ারীতি' যথাক্রমে 'বর্তমান' ও 'সরল' হয়।[১০] বিপ → বি সূত্রের সাহায্যে গঠন করতে পারি এমন বিপ। বাঙলায় [−সাধারণ] বিশেষ্য ও একবচনের সর্বনাম কোনো বিশেষক (বিক) গ্রহণ করে না। (২৬খ)র 'হাসিনা' একটি নামবাচক [−সাধারণ] বিশেষ্য, আর (২৬গ)র 'আমি' একবচনাত্মক সর্বনাম। আলোচ্য সূত্রের সাহায্যে (২৬খ, গ)র বিশেষ্যপদগুলো সৃষ্টি হবে। (২৬খ)র 'বই' বিশেষ্যপদে কোনো বিশেষক নেই, এর বচনও অস্পষ্ট; তবে এর বচন পরিস্থিতি থেকে বোধ্য। আলোচ্য সূত্রটি সৃষ্টি করে নিম্নরূপ বিশেষ্যপদ : (ক) যে-সমস্ত বিপ বিশেষকহীন এবং জাতিবাচক; (খ) যে-সমস্ত বিপ বিশেষকহীন ও অস্পষ্ট বচনসম্পন্ন, এবং (গ) যে-সমস্ত বিশেষ্যপদে শিরবিশেষ্যরূপে থাকে নামবাচক বিশেষ্য ও একবচনের সর্বনাম। বিপ → বি সূত্রটি নিম্নরূপ সংগঠন সৃষ্টি করবে :

৫.৪.২ বি(শেষ)ক : বিক

বিশেষক (বিক) বিশেষ্যপদের এমন একটি বৃত্ত (বা উপাদান), যা বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্য ছাড়া অন্য সব উপাদান বহন করে, বা উপাদানের ওপর আধিপত্য করে। বিক-এর সমস্ত উপাদানই ঐচ্ছিক। কিন্তু বিশেষ্যপদ গঠনের সময় যদি বিশেষক নেয়া হয়, তবে এর কমপক্ষে একটি উপাদান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বিশেষক নিজেই অবশ্য বিশেষ্য পদের ঐচ্ছিক উপাদান।

৫.৪.৩ নির্দেশক → সংখ্যা+(অনুসর্গ)

(২৭)-এর উদাহরণগুলো লক্ষণীয়[১১]:

(২৭) ক একজন ভদ্রলোক।
খ দুটি মেয়ে।
গ তিনখানা শাড়ি।

(২৭)-এর সমস্ত বিপ-ই অনির্দিষ্ট। প্রথম *একজন, দুটি, তিনখানা* প্রভৃতি উপাদান বিচার করা যাক। এ-বস্তুগুলো গঠিত হয়েছে সংখ্যাশব্দ ও অনুসর্গের মিলনে। 'একজন'-এ সংখ্যাশব্দ 'এক', অনুসর্গ 'জন'; 'দুটি'তে সংখ্যাশব্দ 'দু', অনুসর্গ 'টি'; 'তিনখানা'তে সংখ্যাশব্দ 'তিন', অনুসর্গ 'খানা'। নির্দেশকের কাজ হলো শিরবিশেষ্যের সংখ্যা, পরিমাণ,

নির্দিষ্টতা-অনির্দিষ্টতা, বিশেষত্ব-নির্বিশেষত্ব প্রভৃতি প্রকাশ করা। 'নির্দেশক' গঠিত হয় 'সংখ্যাশব্দ' ও 'অনুসর্গ'-এর মিলনে। অনুসর্গ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক, এবং এদের আচরণ প্রচণ্ড খামখেয়ালিপূর্ণ।

সংখ্যাশব্দ ধারণাটি বেশ স্পষ্ট। এর মধ্যে আছে 'এক' 'দু(ই)', 'তিন' প্রভৃতি আঙ্কিক সংখ্যা, এবং 'বহু', 'অনেক', 'সকল, 'সব', 'কয়েক' প্রভৃতি সমষ্টিব্যঞ্জক শব্দ। সংখ্যাপদ—যার অন্যনাম হ'তে পারে *পরিমাপক*—সম্পর্কে আলোচনা আসবো এ-পরিচ্ছেদাংশের শেষাংশে। প্রথমে আমি বিচার করতে চাই অনুসর্গ-এর আকৃতি ও ব্যবহার। *টা, টি, জন, খানা, খানি* প্রভৃতি বদ্ধরূপকে প্রথাগত ব্যাকরণে *পদাশ্রিত নির্দেশক* বলা হয়; এবং ইংরেজি *আর্টিক্যালের* সমান্তরাল মনে করা হয় (দ্র রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯, ১০০-১০১), সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ১৫৩-২৫৭))। এগুলোকে, বিশেষ করে, 'টা', ও 'টি'কে, সাধারণত ইংরেজি নির্দিষ্টতাসূক আর্টিক্যাল *দি*র বাঙলা প্রতিরূপ ব'লে মনে করা হয়।[১২] এ-ধারণা ভ্রান্ত, গ্রহণঅযোগ্য; কেননা এগুলো নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট উভয় শ্রেণীর বিশেষ্যপদেই ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্টতা-অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন ছাড়া অন্য ভূমিকাও এরা পালন করে : ইংরেজি *আর্টিক্যাল* নৈর্ব্যক্তিক, বাঙলা 'টা', 'টি' প্রভৃতি অনুসর্গ বেশ ব্যক্তিক, কেননা এদের মধ্য দিয়ে বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্য সম্পর্কে বক্তার মনোভাবও প্রকাশ পায়। প্রথাগত ধারণা হচ্ছে 'টা', 'টি' প্রভৃতি অনুসর্গ বিশেষ্যের ডানে যোগ করা হয় নির্দিষ্টতা প্রকাশের জন্যে। এ-ধারণা আপাতসুষ্ঠু, তবে একটু ভেতরে ঢুকলে তা আর মানা যায় না। নিম্ন উদাহরণ লক্ষণীয়:

(২৮) ক একটি বই।

খ বইটি।

(২৮খ) বিশেষ্যপদটি নির্দিষ্ট, এতে অনুসর্গ *টি* শিরবিশেষ্যের ডানে, ঘনিষ্ঠভাবে, বসেছে। (২৮খ) যেহেতু নির্দিষ্ট, তাই প্রথাগত ধারণা জন্মেছে যে এটি ইংরেজি *দি*র সমতুল্য-সমান্তরাল নির্দিষ্টতাসূচক বাঙলা আর্টিক্যল। (২৮ক) বিশেষ্যপদটি অনির্দিষ্ট; এতেও ব্যবহৃত হয়েছে অনুসর্গ *টি*;—তবে এখানে *টি* যুক্ত হয়েছে সংখ্যাশব্দ 'এক'-এর সাথে। (২৮ক) বিপটি যেহেতু অনির্দিষ্ট, তাই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, 'টি' (বা 'টা', খানা', 'জন' প্রভৃতি) নির্দিষ্টতাসূচক আর্টিক্যল নয়। অনুসর্গ বসে নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট উভয় শ্রেণীর বিশেষ্যপদেই। বাঙলা বহুলব্যবহৃত অনুসর্গগুচ্ছ হচ্ছে : *টা, টি, জন, খানা, খানি*। আমি আগেই বলেছি যে অনুসর্গ বিশেষ্যপদের ঐচ্ছিক উপাদান; তবে যদি কোনো [+বিশেষ] সংখ্যাশব্দ নেয়া হয়, তাহলে অনুসর্গ ব্যবহার আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কোন অনুসর্গটি ব্যবহৃত হবে, তা নিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ্যের সহজাত বৈশিষ্ট্য ও বক্তার মনোভাবের দ্বারা। যেমন : যদি বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্য [−মনুষ্য] হয়, তবে অনুসর্গরূপে 'টা' বসতে পারে; কিন্তু বিশেষ্যটি যদি [+মনুষ্য] হয়, এবং

তখনও যদি নির্দেশকের উপাদানরূপে 'টা' ব্যবহার করা হয়, তাহলে বোঝা যায় যে বক্তা শিরবিশেষ্য সম্পর্কে হীন মনোভাব পোষণ করে। 'টি' বসতে পারে [−সম্মান] বিশেষ্যের সাথে, অর্থাৎ সম্মানিত নয় এমন বিশেষ্যের সাথে। অনুসর্গ 'জন' বসে যদি শিরবিশেষ্যটি [+মনুষ্য], বা [+সম্মান] হয়। 'খানা, খানি' বসে সে-সব [−প্রাণী,+মূর্ত] বিশেষ্যের সাথে, যা আকারে ছোটো, এবং অনেকটা চতুষ্কোণ। এ-সমস্ত অনুসর্গ, 'খানি' বাদে, [+সংখ্যা] বিশেষ্যের সাথে বসে, [−সংখ্যা] বিশেষ্যের সাথে বসে না। (২৯) উদাহরণ বিবেচ্য :

(২৯) ক এক {টি, টা, *জন, *খানা, *খানি} {পাখি, নদী}।
খ দু {জন, *টি, *টা, *খানা, *খানি} {ভদ্রলোক, মহিলা }।
গ তিন {টি, টা, খানা, খানি, *জন|} {বই, শাড়ি, *দুধ}।

(২৯ক)র 'একটি পাখি, একটা পাখি, একটি নদী, একটা নদী' শুদ্ধ; আর *একজন পাখি, *একজন নদী, *একখানা পাখি, *একখানা নদী, *একখানি নদী, *একখানি পাখি' রীতিবিরুদ্ধ। রীতিবিরুদ্ধ অনুসর্গ ব্যবহারে তারকাখচিত বিশেষ্যপদগুলো গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। 'পাখি' [−মনুষ্য,−সম্মান], তাই এর সাথে বসতে পারে 'টি' ও 'টা'; কিন্তু 'জন' বসতে পারে না। আবার 'পাখি' যেহেতু [+প্রাণী], তাই এর সাথে 'খানা, 'খানি' বসতে পারে না। [−প্রাণী] বিশেষ্য 'নদীর সাথে 'টা', 'টি' বসতে পারে; 'জন' পারে না; এবং 'খানা', 'খানি'ও বসতে পারে না যদি 'নদী'কে সত্যিকারভাবেই 'নদী' বুঝতে চাই। আবেগজড়ানো 'একখানি ছোট নদী'র মতো উক্তিতে 'নদী' প্রায় দেয়ালে টাঙানো ছবিতে পর্যবসিত হয়। এতেই বোঝা যায় কীভাবে অনুসর্গ প্রকাশ করে বক্তার গোপন মনোভাব। (২৯খ)তে দেখা যায় যে [+সম্মান] বিশেষ্যের সাথে 'জন' ব্যবহার করা যায় অনুসর্গরূপে, 'টা', 'টি', 'খানা', 'খানি' ব্যবহার করা যায় না। [+সম্মান] বিশেষ্যের সাথে 'টা', 'টি' ব্যবহারে বিশেষ্যপদ হয়ে ওঠে সম্মানহানিকর, আর 'খানা', 'খানি' ব্যবহারে 'ভদ্রলোক', 'মহিলা'র মতো জীবন্ত শ্রদ্ধেয় মনুষ্যও পরিণত হন নিষ্প্রাণ বস্তুতে। '*একটি ভদ্রলোক', যদিও বাক্যিকভাবে সুগঠিত, গ্রহণঅযোগ্য; আর *একখানি মহিলা'ও গ্রহণঅযোগ্য। (২৯গ)তে দেখা যায় যে [−প্রাণী] বিশেষ্য—যেমন : 'বই', 'শাড়ি' প্রভৃতির সাথে 'টি', 'টা', 'খানা', 'খানি' ব্যবহার সম্ভব। তবে 'টা', 'টি' ব্যবহারে (যেমন : 'একটি শাড়ি', 'একটি বই') বিশেষ্যপদের গায়ে কোনো আবেগছাপ লাগে না; কিন্তু 'খানা', 'খানি' ব্যবহারে (যেমন : 'একখানা বই', 'একখানি শাড়ি') বিশেষ্যপদে আবেগের ছোঁয়া লাগে।

আমি বলেছি যে *নির্দেশক*-এর একটি ঐচ্ছিক উপাদান হচ্ছে *অনুসর্গ*। নির্দেশক আধিপত্য করে সংখ্যাশব্দ ও অনুসর্গ-এর ওপর। অনুসর্গের ব্যবহার প্রধানত নির্ভরশীল সংখ্যাশব্দের ওপর; তবে কোনো একটি বিশেষ অনুসর্গের ব্যবহার নির্ভর করে শিরবিশেষ্যের ওপর। অবশ্য অনুসর্গের আচরণ এতো সূক্ষ্ম ও বিচিত্র খামখেয়ালিপূর্ণ যে অনুসর্গের আচরণের সুস্থির সূত্র রচনা দুরূহ। তাই মনে করতে পারি যে অনুসর্গের ব্যবহার-অব্যবহার সম্পূর্ণ বিশেষ্যপদের

ওপর নির্ভরশীল। তবে অনুসর্গ ব্যবহারে সংখ্যাশব্দের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকগভীর। বাঙলা সংখ্যাশব্দ (পরিমাপক) বিশ্লেষণের জন্যে নিচের বাক্যিক-আর্থ *বৈশিষ্ট্য*গুলো দরকার :

(৩০) [±নির্দিষ্ট], [±বিশেষ]

কতিপয় সংখ্যাশব্দ [+নির্দিষ্ট], কতকগুলো [−নির্দিষ্ট,+বিশেষ], কতকগুলো [−নির্দিষ্ট,−বিশেষ] আবার কতকগুলো [−নির্দিষ্ট, ± বিশেষ]। সংখ্যাশব্দ 'প্রত্যেক', 'প্রতি' [+ নির্দিষ্ট], আঙ্কিক সংখ্যারাশি, অর্থাৎ 'এক', 'দুই', 'তিন' প্রভৃতি [−নির্দিষ্ট, ± বিশেষ], 'কয়েক', 'অনেক' [−নির্দিষ্ট ± বিশেষ], 'বহু', 'সকল', 'সব', 'সমস্ত' [−নির্দিষ্ট,− বিশেষ্য]। অনুসর্গ ব্যবহারের সাধারণ বিধি : যদি কোনো বিশেষ্যপদে [+নির্দিষ্ট], বা [+বিশেষ] সংখাশব্দ ব্যবহার করা হয়, তবে তার সাথে অনুসর্গ ব্যবহার করতে হবে; আর যদি সংখ্যাশব্দ [− বিশেষ] হয়, তবে তার সাথে অনুসর্গ ব্যবহার করা যাবে না (এ-সূত্রের কিছু ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে)। (৩১-৩৬)-এর উদাহরণ বিবেচ্য :

(৩১)	ক	একটি পাখি উড়ছে।
	খ	*এক পাখি উড়ছে।
(৩২)	ক	একটি মেয়ে হাসানকে ডেকেছিলো।
	খ	এক মেয়ে হাসানকে ডেকেছিলো।
(৩৩)	ক	তিনজন রূপসীর গোপন কথা।
	খ	তিন রূপসীর গোপন কথা।
(৩৪)	ক	দশজন অধ্যাপক।
	খ	*দশ অধ্যাপক।
(৩৫)	ক	অনেক লোক।
	খ	*সব পাখি।

(৩১ক)তে দেখা যাচ্ছে 'একটি পাখি' ব্যাকরণসম্মত; এবং (৩১খ)তে দেখা যাচ্ছে *এক পাখি' ব্যাকরণসম্মত নয়। 'এক' সংখ্যাশব্দটি এখানে [+বিশেষ], অর্থাৎ বিশেষ কোনো 'পাখি'র প্রতি নির্দেশ করছে; তাই এর সাথে অনুসর্গ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। যদি নির্বিশেষ, [−বিশেষ], পাখির মতো নির্দেশ করা হয়, তবে অনুসর্গহীন সংখ্যাশব্দসম্পন্ন বিশেষ্যপদ পাওয়া যেতে পারে; যেমন— 'একলা এক পাখির ঠোঁটে' বা 'একদা এক রাজ্যে'। (৩২ক)র 'একটি মেয়ে' বিশেষ্যপদে অনুসর্গ 'টি' বসেছে। এ-বিশেষ্যপদটি অনির্দিষ্ট এবং [+বিশেষ]। (৩২খ)র 'এক মেয়ে' বিশেষ্যপদে কোনো অনুসর্গ নেই, আর বিশেষ্যপদটি নির্বিশেষ, [−বিশেষ] : অর্থাৎ এ-বিশেষ্যপদের 'মেয়ে'টি কোনো বিশেষ মেয়ে নয়। তবে (৩২ক, খ)র বিশেষ্যপদ দুটির আর্থপার্থক্য এতো সূক্ষ্ম যে (৩২খ)কে (৩২ক)র স্টাইলিক বিকল্প মনে করা সম্ভব। (৩৩ক)র 'তিনজন রূপসী' বিশেষ্যপদে অনুসর্গরূপে বসেছে 'জন', আর (৩৩খ)র 'তিন রূপসী'তে কোনো অনুসর্গ নেই। যখন অনুসর্গ 'জন' ব্যবহার করা হয়, তখন বিশেষ্যপদটি [+বিশেষ]

ব'লে প্রতিভাত হয়; আর অনুসর্গশূন্য বিশেষ্যপদটিকে [−বিশেষ] মনে হয়। (৩৩খ) ধরনের বিশেষপদ সাধারণত শিরোনাম, ও বাগ্বিধিরূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন : 'পাঁচ চোরের গল্প', 'সাত রাজার ধন', 'তিন কন্যা', যাতে বিশেষ্যসমূহ নির্বিশেষ। এখন (৩৪ক)র 'দশজন অধ্যাপক' বিশেষ্যটির বিচার করা যাক। (৩৪ক)র সংখ্যাশব্দ 'দশ' [+বিশেষ], সুতরাং এর সাথে একটি অনুসর্গ ব্যবহৃত হবে। 'অধ্যাপক' [+সম্মান] বিশেষ্য, সুতরাং এর সাথে অনুসর্গরূপে বসতে পারে শুধু 'জন'। (৩৪ক)তে এ-বিধি মান্য করা হয়েছে ব'লে বিশেষ্যপদটি চমৎকার। (৩৪খ)তে সংখ্যাশব্দের সাথে কোনো অনুসর্গ নেই ব'লে বিশেষ্যপদটিকে গ্রহণঅযোগ্য বোধ হয়। (২৩খ) থেকে অনুসর্গ বাদ দেয়াতে বিশেষ্যপদটি নির্বিশেষ, [−বিশেষ], হয়ে উঠেছে; কিন্তু এটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে অনুসর্গচ্যুতির ফলে : কেননা এতে বিশেষ্যপদটির সম্মানহানি ঘটেছে। 'অনেক', 'সব' প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ যখন [+সংখ্যা] বিশেষ্যের সাথে বসে, তখন তা [−বিশেষ]; এবং এগুলোর সাথে কোনো অনুসর্গ যুক্ত হয় না। (৩৫, ৩৬খ) ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কেননা এখানে রীতিবিরুদ্ধভাবে অনুসর্গ বসেছে। এখন কালবাচক বিশেষ্যসম্পন্ন কয়েকটি বিশেষ্যপদ পর্যবেক্ষণ করা যাক :

(৩৭) ক তিন বছর কেটে গেলো।
খ তিনটি বছর কেটে গেলো।

(৩৮) ক আমি দু-দিন ধ'রে এখানে আছি।
খ আমি দুটি দিন ধ'রে এখানে আছি।

(৩৭ক)র 'তিন বছর' বিশেষ্যপদে কোনো অনুসর্গ নেই; (৩৭খ)র 'তিনটি বছর' বিশেষ্যপদে আছে। (৩৮ক)র 'দু-দিন'-এ কোনো অনুসর্গ নেই, কিন্তু (৩৮ক)র 'দুটি দিন'-এ আছে। কালবাচক শিরবিশেষ্যসম্পন্ন বিশেষ্যপদে নির্দেশকে সাধারণত কোনো অনুসর্গ বসে না; তবে (৩৭, ৩৮খ)তে দেখা যাচ্ছে যে এমন বিশেষ্যপদের নির্দেশকে অনুসর্গ ব্যবহার করা যায়। 'তিন বছর' ও 'তিনটি বছর' এবং 'দু-দিন' ও 'দুটি দিন'-এ আর্থপার্থক্য অতি সূক্ষ্ম : এমন বিশেষ্যপদে অনুসর্গ ব্যবহার করা হয় জোর আরোপের জন্যে। 'তিন বছর' বললে সময়ের দীর্ঘতার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয় না; কিন্তু 'তিনটি বছর' বললে সময়দীর্ঘতার ওপর জোর পড়ে, যেনো বক্তা বছর-বছর ধ'রে গুণে যাচ্ছে। তবে অনুসর্গহীন কালবাচক বিশেষ্যসম্পন্ন বিশেষ্যপদকে [−বিশেষ], আর অনুসর্গযুক্ত বিশেষ্যপদকে [+বিশেষ] বলে বিবেচনা করা যায়। (৩৯) উদাহরণ বিবেচ্য :

(৩৯) ক সে হাসানের জীবনের সুন্দর তিন বছর নষ্ট করেছে।
খ সে হাসানের জীবনের সুন্দর তিনটি বছর নষ্ট করেছে।

(৩৯ক)র 'সুন্দর তিন বছর'-এ কোনো অনুসর্গ নেই, তাই উল্লিখিত সময়কে নির্বিশেষ 'তিন বছর' ব'লে বোধ হয়। (৩৯খ)র 'সুন্দর তিনটি বছর'-এ অনুসর্গ আছে; তাই মনে হয় বিশেষ্যপদটি যেনো নির্দেশ করছে বিশেষ, গুরুত্বপূর্ণ, তিনটি বছরের প্রতি।

আমার বিবেচনায় যে-সব সংখ্যাশব্দ [+নির্দিষ্ট], সেগুলো সম্পর্কে এখানে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। যখন কোনো [+নির্দিষ্ট] সংখ্যাশব্দ নেয়া হয়, তখন যদি বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্যটি [−সম্মান] হয়, তবে সংখ্যাশব্দের সাথে একটি অনুসর্গ ব্যবহার অনেকটা বাধ্যতামূলক। (৪০, ৪১) উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৪০) ক প্রত্যেক ছেলে চাঁদ দেখেছে।
খ প্রত্যেকটি ছেলে চাঁদ দেখেছে।

(৪১) ক *প্রতি ছেলে চাঁদ দেখেছে।
খ প্রতিটি ছেলে চাঁদ দেখেছে।

(৪০ক)র 'প্রত্যেক ছেলে' বিশেষ্যপদের নির্দেশকে কোনো অনুসর্গ নেই; (৪০খ)র 'প্রত্যেকটি ছেলে'তে আছে। (৪০খ)র বিশেষ্যপদের নির্দিষ্টতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। (৪১ক)র 'প্রতি ছেলে' বিশেষ্যপদের নির্দেশকে কোনো অনুসর্গ নেই; বিশেষ্যপদটি গ্রহণঅযোগ্য। (৪১খ)র 'প্রতিটি ছেলে' বিশেষ্যপদে অনুসর্গ আছে : বিশেষ্যপদটি শুদ্ধ।'[১৩] এ-পরিচ্ছেদাংশে আমি অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছি; এবং দেখাতে চেয়েছি কীভাবে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের নির্দেশকের উপাদানগুলো পরস্পরের সাথে বসে (নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ সম্পর্কে দ্র § ৫.৪.৫)। নির্দেশকসম্বলিত অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক বসে শিরবিশেষ্যর বাঁয়ে। আলোচ্য সূত্রটি : নির্দেশক → সংখ্যা + (অনুসর্গ) সৃষ্টি করে অনির্দিষ্ট বিশেষ [+বিশেষ] ও নির্বিশেষ [−বিশেষ] বিশেষ্যপদ। উদাহরণস্বরূপ : (২৭ক) বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠন বা গভীর তল হচ্ছে (৪২) :

(৪২)
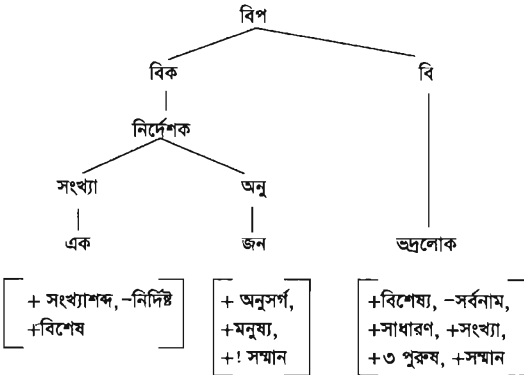
(৪২) একটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদসংগঠন ('জন'-এর মিশ্রপ্রতীকে '+!' চিহ্ন নির্দেশ করছে যে 'জন' অনুসর্গটি যদিও মনুষ্যবাচক শিরবিশেষ্যের সাথে ব্যবহার সম্ভব, তবু এটিকে সম্মানসূচক শিরবিশেষ্যের সাথে ব্যবহার করাই সঙ্গত)। (৪২) পদচিত্রে ব্যাকরণের প্রথম শব্দসংক্রাম সূত্র প্রথমে সরবরাহ করবে শিরবিশেষ্য ('ভদ্রলোক'), তারপরে সংখ্যা ('এক'), এবং সবশেষে অনু ('জন')।[১৪] এর কারণ হলো অনুসর্গের ব্যবহার শিরবিশেষ্য ও সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (৪২)-এ যেহেতু সংখ্যারূপে 'এক' নেয়া হয়েছে [+বিশেষ]রূপে, তাই একটি অনুসর্গ নিতেই হবে। এখানে অনুসর্গ অবশ্যই হবে 'জন', যেহেতু বিশেষ্যপদটির শিরবিশেষ্যের একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে [+সম্মান]। (৪২) যেহেতু অনির্দিষ্ট, তাই সংগঠনটি আর রূপান্তরিত হবে না। এটির ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যাবে (২৭ক)র বিশেষ্যপদ 'একজন ভদ্রলোক'। অভিধানে অনুসর্গ ও সংখ্যাশব্দের নিম্নরূপ পরিচয়সম্বলিত ভুক্তি থাকবে :

(৪৩)	টা	[+অনুসর্গ,+সংখ্যা,−সম্মান]
	টি	[+অনুসর্গ,+সংখ্যা,−সম্মান]
	জন	[+অনুসর্গ,+সংখ্যা,+মনুষ্য,+!সম্মান]
	খানা	[+অনুসর্গ,+সংখ্যা,−প্রাণী,(+আবেগ)]
	খানি	[+অনুসর্গ,+সংখ্যা,−প্রাণী,(+আবেগ)]
	এক	[+সংখ্যাশব্দ,−নির্দিষ্ট+বিশেষ,−বহুবচন]

৫.৪.৪ নির্দেশক বহু(বচন)

বাঙলা ভাষায় বহুবচন নির্দেশের দুটি উপায় আগেই বর্ণনা করা হয়েছে (দ্র § ৫.৩; ৫.৩.১; ৫.৩.২)। এক উপায়ে বহুবচন নির্দেশ করা হয় বহুবচনাত্মক সংখ্যাশব্দ 'দু', 'তিন', 'বহু' প্রভৃতির সাহায্যে, আর অন্য উপায়ে বহুবচন নির্দেশ করা হয় বহুবচনচিহ্ন ব্যবহার ক'রে।

(৪৪)	ক	দুটি মেয়ে।
	খ	মেয়েরা।

(৪৪ক)তে সংখ্যাশব্দ *দু* বিশেষপদটির শিরবিশেষ্যের বহুবচনত্ব নির্দেশ করেছে, যদিও এখানে শিরবিশেষ্যের মৌলরূপ রক্ষিত। (৪৪খ)তে কোনো সংখ্যাশব্দ নেই; এখানে বহুবচনত্ব নির্দেশিত হচ্ছে বহুবচনচিহ্ন *রা*র সাহায্যে। আমার বিশ্লেষণে *নির্দেশক*-এর একটি উপাদান হচ্ছে *সংখ্যাশব্দ*। বিশেষ্যপদের নির্দেশকে ব্যবহৃত সংখ্যাশব্দটি যদি বহুবচনাত্মক হয় (অর্থাৎ একাধিক সংখ্যা—'দুই', 'তিন', 'বহু', 'অনেক'—জ্ঞাপন করে), তবে বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্যটি বহুবচনাত্মক বলে গণ্য হয়। একটি সাধারণ সূত্রানুসারে এমন বিশেষ্যপদে বিশেষ্যের (বি) ডানে কোনো বহুবচনচিহ্ন যুক্ত হবে না। এবার বিচার করা যাক, আমার প্রস্তাবিত ব্যাকরণ কীভাবে (৪৪খ)র মতো বহুবচনচিহ্নযুক্ত বিশেষ্যপদ সৃষ্টি করবে। আগেই

দেখিয়েছি যে-সমস্ত বিশেষ্যপদের বহুবচন অস্পষ্ট, তাতে কোনো 'বিশেষক' (বিক), বা 'নির্দেশক' (নি) থাকে না (দ্র § ৫.২)। (৪৪ক)তে বচন নির্দেশিত হয় সংখ্যাশব্দের সাহায্যে : এমন বিশেষ্যপদে 'সংখ্যা' 'নির্দেশক'-এর একটি উপাদান। সামান্য মনোযোগ দিলে বোঝা যায় : বাঙলায় যেহেতু বহুবচনত্ব প্রকাশ পায় সংখ্যাশব্দ, ও বহুবচনচিহ্নের সাহায্যে, তাই সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনকে বিবেচনা করা উচিত একই রকম ক্যাটেগরি হিশেবে। তাই আমি ধ'রে নিচ্ছি যে (৪৪খ)র মতো বিশেষ্যপদের বহুবচনত্ব পদের আভ্যন্তর সংগঠন বা গভীর তলে নির্দেশিত হয় 'নির্দেশক' দ্বারা। এ-বিশ্লেষণ উন্নত, কেননা এ-প্রণালিতে বাঙলা ভাষার সব রকম বহুবচনাত্মক বিশেষ্যপদ একই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা সম্ভব। একবচনত্ব প্রকাশ পায় সংখ্যাশব্দ 'এক'-এর দ্বারা; এবং বহুবচনত্ব প্রকাশিত হয় অন্যান্য সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনচিহ্নের সাহায্যে। বাঙলার বহুবচনাত্মক সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনচিহ্ন একই বিশেষ্যপদে ব্যবহৃত হয় না : এ-ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বিশেষ্যপদস্রষ্টা সূত্র-৪ এর সাহায্যে। এখানে যে-সূত্রটি আলোচনা করছি, সেটির সাহায্যে গঠিত হবে রূপতাত্ত্বিকভাবে গঠিত বহুবচনাত্মক বিশেষ্যপদ (৪৪খ)র মতো বিশেষ্যপদ। 'বহু(বচন)' রূপটি বিশেষ্যপদের গভীর তলে বিমূর্ত সংকেতরূপে কাজ করে, এবং জানায় যে বিশেষ্যপদটি বহুবচনাত্মক। (৪৪খ)র গভীর তল হবে (৪৫) :

(৪৫)
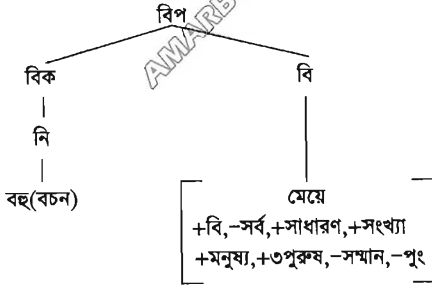
(৪৫)-এ বহুবচন সংকেতটি শিরবিশেষ্যের বহুবচনত্ব নির্দেশ করছে। (৪৫)রূপ গভীর তলে কোনো বহুবচনচিহ্ন যোগ করা হবে না, কেননা বাঙলার বহুবচনচিহ্নের রূপ বিশেষ্যপদের ভূমিকাগত পরিচয় ও বিশেষ্যের ধ্বনিক আকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বাক্যের ব্যুৎপত্তির পরবর্তী পর্যায়ে একটি 'বহুবচন-খণ্ড-রূপান্তর' ([+বহুবচন-খণ্ড]) শিরবিশেষ্যের [α মনুষ্য, β সম্মান] বৈশিষ্ট্য, ও বিশেষ্যপদের ভূমিকাগত পরিচয় নকল করে নেবে; এবং চোমস্কি-সংযোজনরীতিতে বিশেষ্যপদের ডান-উপাদানরূপে সংযোজিত হবে। এ-রূপান্তর গভীর তলীয়

সংকেত *বহুবচন* ও তার ওপর আধিপত্যকারী বৃন্ত বিলোপ করবে; এবং শিরবিশেষ্যটিকে চিহ্নিত করবে [+বহুবচন]রূপে। এমন রূপান্তর (৪৫)কে রূপান্তরিত করবে (৪৬)-এ :
(৪৬)
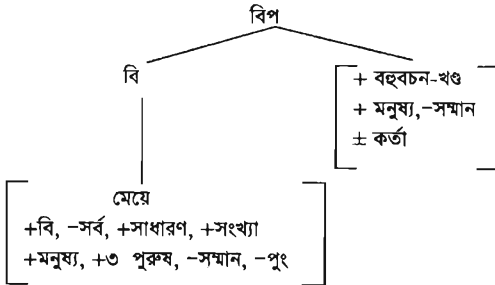
দ্বিতীয় শব্দসংক্রামনীতি বহুবচনখণ্ডের নিচে উপযুক্ত বহুবচনচিহ্ন যুক্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : যদি (৪৬)-এর শিরবিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য হয় [+কর্তা], তবে পাওয়া যাবে (৪৭); আর (৪৬)-এর শিরবিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য যদি হয় [−কর্তা], তবে পাওয়া যাবে (৪৮)— দ্বিতীয় শব্দসংক্রামের পরে।

(৪৭)
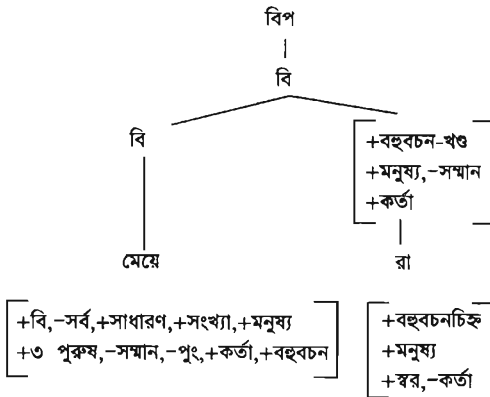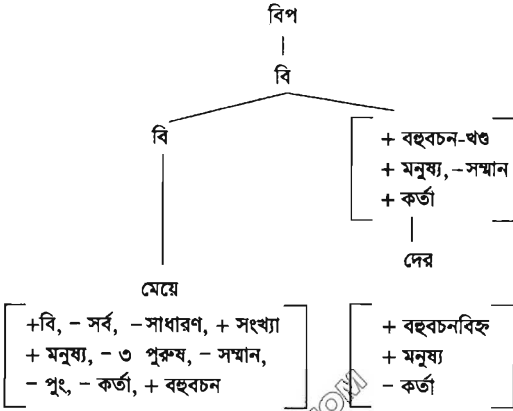
(৪৭) সৃষ্টি করবে কর্তাবিশেষ্যপদ *মেয়েরা*—অর্থাৎ (৪৪ক); (৪৮) সৃষ্টি করবে কর্তা নয় এমন বহুবচনাত্মক বিশেষ্যপদ *মেয়েদের*। বহুবচন-খণ্ড-রূপান্তর তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন কোনো বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠনে বিমূর্ত সংকেত *বহুবচন* বিরাজ করে। সূত্র-৪ নির্দেশ দেয় যে *বহুবচন* ও সংখ্যা+(অনু) একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারে না। তবে 'বিশেষক'-এর অন্যান্য উপাদান *বহুবচন*-এর সাথে নেয়া যায়। (৪৯) উদাহরণ দ্রষ্টব্য :

(৪৯) ক ওই পাখিগুলো।

খ এ(ই) ছেলেরা।

'এই', 'ওই' ইত্যাদি ভাষাবস্তুর নাম দিতে পারি *সংকেত* [ডিএকটিক]। (৪৯)-এ দেখা যাচ্ছে বিশেষ্যপদে 'সংকেত', ও 'বহুবচন' একই সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারে।

৫.৪.৫ বিপ → (নির্দিষ্ট)+(নির্দেশক)+বি

নির্দিষ্টতা-অনির্দিষ্টতার মানদণ্ড অনুসারে বিশেষ্যপদ দু-রকম : (ক) অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ, ও (খ) নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ। এ-অংশে আমার আলোচনার বিষয় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠন (গভীর তল) ও বহিঃসংগঠন (বহির্তল)। এ-ব্যাকরণ কী প্রক্রিয়ায় এমন বিশেষ্যপদ সৃষ্টি করে, তাও দেখানো হবে। প্রথম বিবেচ্য নিচের উদাহরণগুলো :

(৫০) ক একটি ছেলে।

খ ছেলেটি।

(৫১) ক দুটি ছেলে।
খ ছেলে দুটি।

(৫২) ক এ একটি ছেলে।
খ এ-ছেলেটি।

(৫৩) ক ?এ দুটি ছেলে।
খ এ-ছেলে দুটি।

(৫০, ৫১ক) বিশেষ্যপদ দুটি অনির্দিষ্ট; (৫০, ৫১খ) নির্দিষ্ট (৫০, ৫১ক)র বিশেষ্যপদে নির্দেশক 'একটি', ও 'দুটি' অবস্থিত শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে। (৫০খ)তে অনুসর্গ 'টি' যুক্ত শিরবিশেষ্যের ডানে; আর (৫১খ)তে নির্দেশক 'দুটি' অবস্থিত শিরবিশেষ্যের ডানে। এ-উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে বাঙলায় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক বসে শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে, এবং নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে নির্দেশক বসে শিরবিশেষ্যের ডানে।

বাঙলায় এমন কোনো ভাষাবস্তু নেই, যাকে বলা যায় নির্দিষ্টতা-বা অনির্দিষ্টতা-জ্ঞাপক *আর্টিক্যল*। বিশেষকসম্বলিত বাঙলা বিশেষ্যপদসমূহ নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট বলে প্রতিভাত হয় নিম্নরীতিতে: (ক) বিশেষ্যপদে ব্যবহৃত সংখ্যাশব্দের বৈশিষ্ট্য অনুসারে (যেমন : 'প্রত্যেক', 'প্রতি' প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ সহজাতভাবে 'নির্দিষ্ট'); (খ) সংকেত-এর (এ(ই), ও(ই), সে(ই) প্রভৃতি) বৈশিষ্ট্য অনুসারে; এবং (গ) শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে ও ডানে নির্দেশকের অবস্থান অনুসারে। আমি প্রস্তাব করতে চাই যে নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট উভয় প্রকার বিশেষ্যপদের গভীর তলে নির্দেশক অবস্থিত থাকে শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে। বিশেষ্যপদটি অনির্দিষ্ট না নির্দিষ্ট, তা বোঝা যাবে—(ক) বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠনে (গভীর তলে) বিমূর্ত প্রতীক 'নির্দিষ্ট'র উপস্থিত-অনুপস্থিতি অনুসারে। (যে বিশেষ্যপদের গভীর তলে 'নির্দিষ্ট' উপস্থিত, তা নির্দিষ্ট; অন্য বিশেষ্যপদ অনির্দিষ্ট); এবং (খ) *সংকেত*, ও *সংখ্যাশব্দ*-এর সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুসারে (যে-বিশেষ্যপদের গভীর তলে 'নির্দিষ্ট'-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংখ্যাশব্দ বা সংকেত উপস্থিত, তা নির্দিষ্ট; অন্য বিশেষ্যপদ অনির্দিষ্ট)। 'নির্দেশক+বি'-ধরনের বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠনে 'নির্দিষ্ট'-রূপ সংকেতের উপস্থিতি জানাবে যে বিশেষ্যপদটি নির্দিষ্ট; আর এর অনুপস্থিতি জানাবে বিশেষ্যপদটি অনির্দিষ্ট। যদি কোনো বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠনের 'নির্দিষ্ট' প্রতীকটি উপস্থিত থাকে, তবে একটি সূত্রের সাহায্যে নির্দেশকটিকে স্থানান্তরিত করা হবে শিরবিশেষ্যের ডানে। এ-উপায়ে বিশেষ্যপদ গঠনকারী পদসাংগঠনিক সূত্ররাশি সরল হয়ে ওঠে; এবং সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয় অনির্দিষ্ট ও তার সমান্তরাল নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদের সম্পর্ক। এ-জন্যে আমি প্রস্তাব করি *নির্দেশক-স্থানান্তর* নামক একটি সূত্র, যা বিশেষ্যপদ নির্দিষ্টায়নের জন্যে শিরবিশেষ্যের বামপার্শ্বস্থ নির্দেশককে ডানপার্শ্বে স্থানান্তরিত করে। আমার প্রস্তাব অনুসারে (৫০খ) বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠন বা গভীর তল হচ্ছে (৫৪)।

(৫৪)
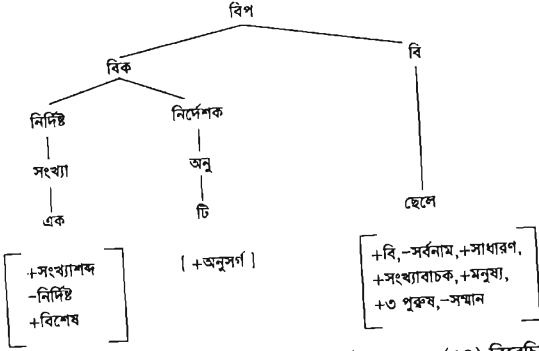
মনে করা যাক (৫৪)তে 'নির্দিষ্ট'-রূপ কোনো সংকেত নেই। তাহলে (৫৪) বিবেচিত হতো অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ সংগঠন ব'লে; এবং এটি হতো (৫০ক) পদের আভ্যন্তর সংগঠন। (৫৪)তে যেহেতু 'নির্দিষ্ট' উপস্থিত, তাই এটি নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ। আগেই আমি বলেছি যে-সংখ্যাশব্দ বা পরিমাপক [+নির্দিষ্ট], বা [−নির্দিষ্ট] হ'তে পারে (দ্র § ৫.৪.৩)। 'নির্দিষ্ট' প্রতীকটি সংখ্যাশব্দের চয়ন নিয়ন্ত্রণ করে : যদি বিশেষ্যপদের অভ্যন্তর সংগঠনে 'নির্দিষ্ট' নেয়া হয়, তবে তার সাথে একটি [+নির্দিষ্ট], বা [+বিশেষ] সংখ্যাশব্দ নিতে হবে। (৫৪)তে সংখ্যাশব্দটি [+বিশেষ]। (৫৪)তে *নির্দেশক-স্থানান্তর সূত্র* প্রযুক্ত হবে। এ-সূত্রটি নির্দেশককে শিরবিশেষ্যের ডানে বসাবে, সংখ্যাশব্দের [−নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্যকে [+ নির্দিষ্ট]তে পরিবর্তিত করবে, শিরবিশেষ্যটিকে [+ নির্দিষ্ট]রূপে চিহ্নিত করবে, এবং বিমূর্তপ্রতীক 'নির্দিষ্ট'কে বিলোপ করবে। এ-রূপান্তর সূত্র প্রয়োগে (৫৪) রূপান্তরিত হবে (৫৫)তে :

(৫৫)
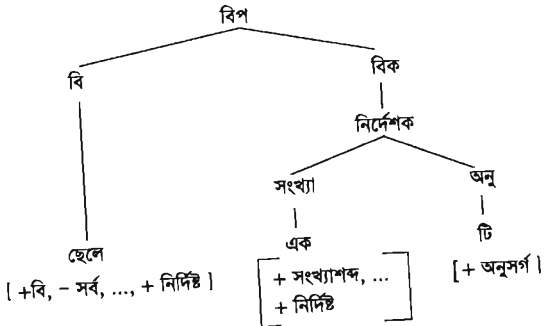
(৫৫)তে নির্দেশকটি শিরবিশেষ্যের ডানে স্থানান্তরিত হয়েছে; শিরবিশেষ্যটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। [+নির্দিষ্ট]রূপে; সংখ্যাশব্দের [−নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত করা হয়েছে [+নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্যে; এবং আভ্যন্তর সংগঠনে উপস্থিত নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক বিমূর্ত প্রতীক 'নির্দিষ্ট'কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। (৫৫) সৃষ্টি করবে '*ছেলে একটি' বিশেষ্যপদ। এটি রীতিবিরুদ্ধ, যেহেতু এতে সংখ্যাশব্দ *এক* উপস্থিত। একটি সাধারণ সূত্র হচ্ছে যে নির্দেশক স্থানান্তরের পর সংখ্যাশব্দ বিলুপ্ত হবে, যদি সংখ্যাশব্দের আন্ত্যউপাদান হয় *এক*। *এক* পুনরুদ্ধারযোগ্য ব'লেই বিলুপ্ত হয়। অন্যান্য সংখ্যাশব্দ পুনরুদ্ধারযোগ্য নয়, এবং নির্দেশক স্থানান্তরের পরে বিলুপ্ত হয় না। *এক* বিলোপের ফলে (৫৫) রূপান্তরিত হবে (৫৬)য় :

(৫৬)
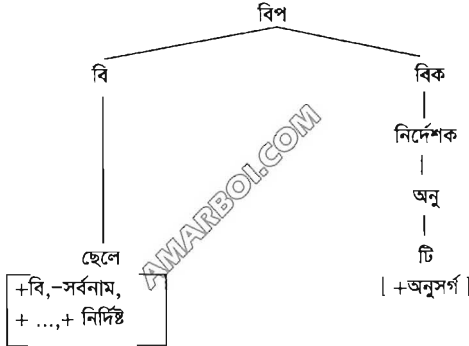
(৫৬)তে নির্দেশকের সংখ্যা উপাদানটি পরিত্যক্ত হয়েছে, অবশিষ্ট আছে শুধু অনুসর্গ উপাদানটি। তাই *টি* এখানে একই সঙ্গে অনুসর্গ, নির্দেশক, ও বিশেষকের ভূমিকা পালন করছে। (৫৬), রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রে প্রয়োগের পর, সৃষ্টি করবে *ছেলেটি*, অর্থাৎ (৫০খ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙলায় একই বচনের অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ পরস্পরসম্পর্কিত। আমি বলেছি যে নির্দেশক স্থানান্তরের পর সংখ্যাশব্দ বিলুপ্ত হয়, যদি তা হয় *এক*; অন্যথায় তা বিলুপ্ত হয় না। নিচের উদাহরণ বিবেচ্য :

(৫৭) ক একজন ভদ্রলোক।

খ *ভদ্রলোক একজন।

গ *ভদ্রলোকজন।

ঘ ভদ্রলোক।

(৫৮) ক দু-জন ভদ্রলোক।

খ ভদ্রলোক দুজন।

(৫৭ক) একটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ—এতে নির্দেশক 'একজন', শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে অবস্থিত। (৫৭খ)তে নির্দেশক অবস্থিত শিরবিশেষ্যের ডানে—এ-বিশেষ্যপদটি গ্রহণঅযোগ্য। (৫৭গ)তে নির্দেশক স্থানান্তরের পর সংখ্যাশব্দ *এক* বিলোপ করা হয়েছে, তবুও বিশেষ্যপদটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ। (৫৭ঘ) বিশেষ্যপদে কোনো নির্দেশক নেই—এটি নির্দিষ্ট, ও ব্যাকরণসম্মত। (৫৮ক)তে বিশেষ্যপদটি অনির্দিষ্ট; এতে নির্দেশক অবস্থিত 'বি'র বাঁয়ে। (৫৮খ)তে নির্দেশক 'বি'র ডানে : বিশেষ্যপদটি নির্দিষ্ট, ও ব্যাকরণসম্মত। (৫৭) উদাহরণ শিরবিশেষ্যটি [+সম্মান]; সংখ্যা হচ্ছে *এক*, আর অনুসর্গ *জন*। (৫৮)তে শিরবিশেষ্য [+সম্মান], সংখ্যা *দু*, অনুসর্গ *জন*। (৫৮খ)তে নির্দশক-স্থানান্তর সূত্র প্রযুক্ত হয়েছে, আর এ-সূত্র প্রযুক্ত হয়েছে (৫৭ঘ)তেও। (৫৭ঘ)তে নির্দেশক স্থানান্তরের পর বিলোপ করা হয়েছে সম্পূর্ণ নির্দেশকটি, যেহেতু এতে সংখ্যা *এক* আর অনুসর্গ *জন*। নির্দেশকের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে তখনই, যখন শিরবিশেষ্য [+সম্মান], সংখ্যা *এক*, আর অনুসর্গ *জন*। অন্যান্য অনুসর্গ ও বিশেষ্যের ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যাশব্দটিই—যদি তা *এক* হয়—লোপ পায়। নিচের উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৫৯) ক একখানা শাড়ি।

খ শাড়িখানা।

(৬০) ক দুখানা শাড়ি।

খ শাড়ি দুখানা।

(৫৯, ৬০ক) অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ, আর এতে নির্দেশক অবস্থিত শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে। (৫৯খ)তে নির্দেশক স্থানান্তরের পর *এক* বিলোপ ক'রে পাওয়া গেছে 'শাড়িখানা'; কিন্তু (৬০খ)তে নির্দেশক স্থানান্তরের পর সংখ্যা—যেহেতু *দু*—বিলোপ হয় নি।

আমি বলেছি যদি বিশেষ্যপদের গভীর সংগঠনে নির্দিষ্টজ্ঞাপক প্রতীক 'নির্দিষ্ট' নেয়া হয়, তবে নির্দেশকে নিতে হবে একটি [+বিশেষ] সংখ্যাশব্দ। (৬১)র উদাহরণ বিবেচ্য :

(৬১) ক বহু লোক।

খ *লোক বহু।

(৬১ক)তে ব্যবহৃত সংখ্যাশব্দ বহু [−বিশেষ], অর্থাৎ নির্বিশেষ। (৬১ক)তে নির্দেশক স্থানান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে গঠন করা যায় (৬১খ)। (৬১খ) অশুদ্ধ। তাই 'নির্দিষ্ট' প্রতীকের সাথে কোনো নির্বিশেষ সংখ্যাশব্দ নেয়া যাবে না। 'প্রত্যেক', 'প্রতি' প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ আন্তর বৈশিষ্ট্যেই [+নির্দিষ্ট] : এ-সংখ্যাগুলো 'নির্দিষ্ট' বিমূর্ত-প্রতীকের সাথে নেয়া যায়। তবে এগুলো

যেহেতু সহজাতভাবেই [+নির্দিষ্ট], তাই এগুলো ব্যবহৃত হ'লে নির্দেশক-স্থানান্তর সূত্র প্রযুক্ত হবে না। (৬২) উদাহরণ লক্ষণীয় :

(৬২) ক প্রতিটি মেয়ে।

খ *মেয়ে প্রতিটি।

(৬২ক)তে 'প্রতিটি' অবস্থিত শিরবিশেষ্যের বাঁয়ে : বিশেষ্যপদটি নির্দিষ্টতা অর্জন করেছে 'প্রতি'র সহজাত নির্দিষ্টতাগুণবশত। এমন ক্ষেত্রে যদি নির্দেশক-স্থানান্তর সূত্র প্রযুক্ত হয়, তবে পাওয়া যাবে (৬২খ)র মতো ব্যাকরণবিরুদ্ধ বিশেষ্যপদ।

এখন বিচার করা যাক (৫২, ৫৩) উদাহরণ। '*এ একটি ছেলে', '*এ দুটি ছেলে' অশুদ্ধ বিশেষ্যপদ।[১৫] এ-বিশেষ্যপদ দুটিতে ব্যবহৃত হয়েছে 'নির্দিষ্ট সংকেতসূচক প্রদর্শক' *এ(ই)*। *এ(ই)* সহজাতভাবে [+নির্দিষ্ট] ব'লে এর ব্যবহার বিশেষ্যপদ দুটিকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদে পরিণত করেছে। এমন বিশেষ্যপদ যেহেতু নির্দিষ্ট, তাই এতে নির্দেশক-স্থানান্তর সূত্র প্রযুক্ত হবে। এমন বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠনে বিমূর্তপ্রতীক 'নির্দিষ্ট' স্থাপনের দরকার নেই। 'সংকেতসূচক প্রদর্শক'-এর [+নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্য নির্দেশক স্থানান্তর সূত্র ক্রিয়াশীল করার জন্যে যথেষ্ট। যেমন : (৫২খ)র আভ্যন্তর বা গভীর সংগঠন হচ্ছে (৬৩)।

(৬৩)
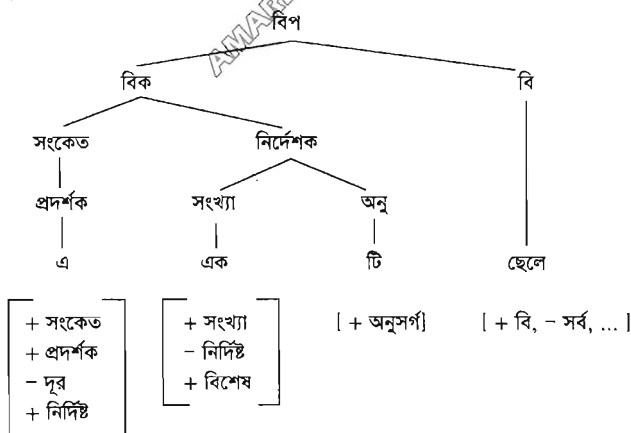
নির্দেশক স্থানান্তর, ও *এক*-বিলোপের ফলে (৬৩) রূপান্তরিত হবে (৬৪)তে :

(৬৪)

```
                         বিপ
        ┌─────────────────┼─────────────────┐
       বিক                বি                বিক
        |                 |                 |
      সংকেত               |              নির্দেশক
        |                 |                 |
     প্রদর্শক              |               অনু
        |                 |                 |
        এ               ছেলে               টি
```
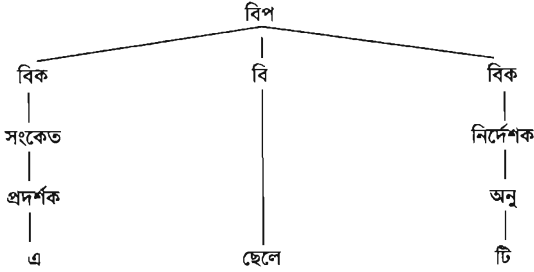
(৬৪) সৃষ্টি করবে 'এ-ছেলেটি' বিপ; অর্থাৎ (৫২খ)। এ-ধরনের বিশেষ্যপদ সম্পর্কে আরো আলোচনার জন্যে দ্র § ৫.৪.৬।

৫.৪.৬ বিপ → (সংকেত)+(নির্দেশক)+বি

সংকেত উপাদানটির অন্তর্গত উপাদান হচ্ছে *এ(ই), ও(ই), সে(ই)* প্রভৃতি *সংকেতসূচক প্রদর্শক*, এবং বিভিন্ন *ক্রম (নির্দেশক)* সংখ্যা : প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি। বাঙলায় সংকেত-শব্দরাশি, সাধারণত, নির্দেশকসহ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

(৬৫) ক ওই ছেলেটি।

খ ?ওই ছেলে।

(৬৫ক)তে 'প্রদর্শক', ও 'নির্দেশক' উপস্থিত; (৬৫খ)তে 'প্রদর্শক' আছে, 'নির্দেশক' নেই। (৬৫ক) সর্বাংশে শুদ্ধ, (৬৫খ) ত্রুটিপূর্ণ। *এ(ই), ও(ই), সে(ই)* সংকেতসূচক প্রদর্শকগুলো সহজাতভাবে নির্দিষ্ট; তবে এগুলো, সাধারণত, কোনো নির্দেশক ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। সে-কারণে অর্থগতভাবে সুচারু হওয়া সত্ত্বেও (৬৫খ) বাক্যিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সংকেতবাচক প্রদর্শকসম্বলিত বিশেষ্যপদের নির্দিষ্টতা প্রকাশিত হয় প্রদর্শকের [+নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্য দ্বারাই। যে-সব বিশেষ্যপদে [−নির্দিষ্ট] সংকেত ব্যবহৃত হয়, সে-সব বিশেষ্যপদ অনির্দিষ্ট। [+নির্দিষ্ট] সংকেতযুক্ত বিশেষ্যপদে সংকেতের [+নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্যটিই বিমূর্তপ্রতীক 'নির্দিষ্ট'-এর ভূমিকা পালন করে। সুতরাং [+নির্দিষ্ট] সংকেতযুক্ত বিশেষ্যপদের আভ্যন্তর সংগঠনে বিমূর্তপ্রতীক 'নির্দিষ্ট' স্থাপনের দরকার নেই। সংকেতের [+নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্যটি নিয়ন্ত্রণ করবে সংখ্যাশব্দের নির্বাচন; এবং ক্রিয়াশীল ক'রে তুলবে নির্দেশক-*স্থানান্তর* সূত্রটিকে (দ্র § ৫.৪.৫)। যে-সমস্ত ভাষাবস্তুকে *সংকেতসূচক প্রদর্শকরূপে* গণ্য করি, সেগুলো :

(৬৬) এ(ই) : [+সংকেত,+প্রদর্শক,−দূর, +নির্দিষ্ট]
ও(ই) : [+সংকেত,+প্রদর্শক,+দূর(দৃষ্টিসীমান্তর্গত),+নির্দিষ্ট]
সে(ই) : [+সংকেত,+প্রদর্শক,+দূর(দৃষ্টিসীমাবহির্ভূত),+নির্দিষ্ট]
কোন : [+সংকেত,+প্রদর্শক,+নির্দিষ্ট,+প্রশ্ন]

সংকেতসূচক প্রদর্শক *বহুবচন* উপাদানের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে (দ্র § ৫.৪.৪)। যেমন :

(৬৭) ক এ-মেয়েরা।
খ ওই পাখিগুলো।

আমি ধ'রে নিয়েছি যে বিশেষ্যপদের আবশ্যিক উপাদান হচ্ছে *বি* (শিরবিশেষ্য); তবে বাস্তবে অনেক বিশেষ্যপদ পাওয়া যাবে, যাতে কোনো শিরবিশেষ্য নেই। উদাহরণ :

(৬৮) ক এটি বই।
খ এগুলো বই।
গ ওগুলো ফুল।

এটি, এগুলো, ওগুলো প্রভৃতি বিশেষ্যপদে, আপাতদৃষ্টিতে, মনে হয় যে কোনো শিরবিশেষ্য নেই। এগুলো দেখে মনে হয় যে সংকেতসূচক প্রদর্শকের সাথে অনুসর্গ যুক্ত হ'তে পারে, এবং সংকেতসূচক শব্দকে বহুবচনিতও করা যায়।[১৬] এমন বোধ বিভ্রান্তির ফল। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে এ-বিশেষ্যপদগুলোতে শিরবিশেষ্য ছিলো, কিন্তু বিশেষ কারণে তাদের বিলোপ ঘটেছে। (৬৮)র বাক্যগুলোর কর্তাবিশেষ্যপদে শিরবিশেষ্য লোপ পেয়েছে, কেননা প্রতিটি বাক্যের বিধেয়বিশেষ্যপদ জানিয়ে দেয় কর্তাবিশেষ্যপদের সংকেতসূচক প্রদর্শকগুলো কিসের প্রতি নির্দেশ করছে। (৬৮)র বাক্যগুলো যথাক্রমে (৬৯)-এর বাক্যগুলোর সাথে সম্পর্কিত :

(৬৯) ক এ-জিনিশটি বই।
খ এ-জিনিশগুলো বই।
গ ও-জিনিশগুলো ফুল।

(৬৯)-এর কর্তাবিশেষ্যপদগুলোর শিরবিশেষ্য বিলোপ ক'রে 'অনুসর্গ', ও 'বহুবচনচিহ্ন'কে সংকেতসূচক প্রদর্শকের সাথে, রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রানুসারে, সংযুক্ত করলে গঠিত হয় (৬৮)র বিশেষ্যপদগুলো। ওপরের শিরবিশেষ্যলোপ প্রক্রিয়াটি তুলনীয় প্রতিবেশগত কারণে শিরবিশেষ্যচ্যুতির সাথে, এবং শিরবিশেষ্যের শাব্দ অভিন্নতাজাত চ্যুতির সাথে। নিচের উদাহরণ বিবেচ্য :

(৭০) ক আমি এটি চাই।

খ আমি সেটি চাই।

(৭১) ক হাসানের একটি বই আছে, আর হাসিনারও একটি বই আছে।

খ হাসানের একটি বই আছে, আর হাসিনারও একটি আছে।

(৭০ক, খ)র এটি, সেটি বিশেষ্যপদে কোনো শিরবিশেষ্য নেই : বক্তাশ্রোতা উভয়ের কাছেই নির্দেশিত বিশেষ্যটির পরিচয় স্পষ্ট ব'লে শিরবিশেষ্যটির উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু দরকার হ'লে নির্দেশিত বিশেষ্যটি সরবরাহ করা হবে। (৭১ক)তে 'একটি বই' বিশেষ্যপদটি দু-বার ব্যবহৃত : শাব্দ অভিন্নতাবশত সম্মুখমুখি বিশেষ্যচ্যুতির ফল পাই (৭১খ)র 'একটি' বিশেষ্যপদ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে-সমস্ত বিশেষ্যপদে আপাতদৃষ্টিতে কোনো শিরবিশেষ্য নেই ব'লে মনে হয়, সেগুলোতেও আছে বিলুপ্ত শিরবিশেষ্য।

সংকেতসূচক ভূমিকা পালন করে ব'লে আঙ্কিক ক্রমসংখ্যারাশিকে— *প্রথম, দ্বিতীয়* প্রভৃতি— গ্রহণ করেছি সংকেতসূচকরূপে। সংকেতসূচক প্রদর্শক ও সংকেতসূচক ক্রমসংখ্যা, খুব কম ক্ষেত্রে হ'লেও, সহাবস্থান করতে পারে।

(৭২) ক ওই প্রথম মেয়েটি।

খ সেই দশম চিঠিটি।

(৭২)-এ প্রদর্শক, ক্রমসংখ্যা, নির্দেশক একসঙ্গে উপস্থিত; তাই এখানে নির্দেশক স্থানান্তর সূত্র প্রযোজ্য। নিম্নউদাহরণে ক্রমসংখ্যা ও নির্দেশক একত্রে অবস্থিত;— এ-বিশেষ্যপদগুলো স্বাভাবিকতর :

(৭৩) ক প্রথম মেয়েটি।

খ দশম চিঠিটি।

ক্রমসংখ্যারাশির আভিধানিক ভুক্তি হবে নিম্নরূপ :

(৭৪) প্রথম : [+সংকেত, +ক্রমসংখ্যা, +নির্দিষ্ট]

দ্বিতীয় : [+সংকেত, +ক্রমসংখ্যা, +নির্দিষ্ট]

৫.৪.৭ খণ্ড

খণ্ড-উপাদানটি নিম্নরূপ বিশেষ্যপদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত :

(৭৫) ক তিনটি ফুলের মধ্যে একটি।

খ তিনটি ফুলের মধ্যে একটি ফুল।

(৭৬) ক মেয়েদের মধ্যে দুজন।

খ মেয়েদের মধ্যে দুজন মেয়ে।

ওপরের প্রত্যেক গুচ্ছের বিশেষ্যপদগুলো সমার্থক; তবে এদের মধ্যে সামান্য সাংগঠনিক পার্থক্য রয়েছে। (৭৫,৭৬ক)তে শিরবিশেষ্য নেই, (৭৫, ৭৬খ)তে শিরবিশেষ্য আছে। (৭৫,৭৬ক) সংক্ষিপ্ততর (৭৫,৭৬খ) থেকে; এবং বাস্তব প্রয়োগের সময় সাধারণত (৭৫,৭৬ক)ই ব্যবহৃত হয়। (৭৫,৭৬খ) সাধারণত ব্যবহৃত হয় না, কেননা এতে একই উপাদানের অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি ঘটেছে। (৭৫,৭৬ক) আহরিত হয়েছে যথাক্রমে (৭৫,৭৬খ) থেকে। (৭৫খ)র সম্ভাব্য অগভীর সংগঠন হচ্ছে (৭৭)।

(৭৭)
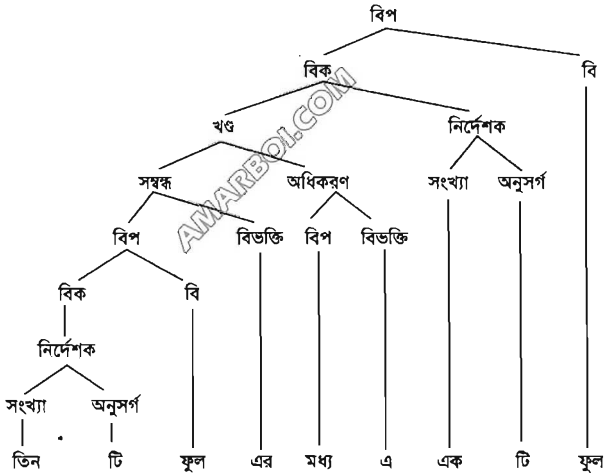
(৭৭)-এ উচ্চতম বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্য (বি) ও সম্বন্ধ-বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্য অভিন্ন; এবং উভয় বিশেষ্যের বাঁয়েই আছে *বিশেষক*। এমন সংগঠনে শিরবিশেষ্যলোপ ঘটতে পারে সম্মুখ-পশ্চাৎ উভয় অভিমুখেই। যদি বিলোপক্রিয়া সম্মুখমুখি হয়, তবে পাওয়া যাবে (৭৫ক); আর পশ্চাৎমুখি হ'লে পাওয়া যাবে 'তিনটির মধ্যে একটি ফুল' বাক্যাংশটি। যখন উচ্চতম বিশেষ্যপদ ও সম্বন্ধ-বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্য অভিন্ন হয়, এবং বিলোপযোগ্য বিশেষ্যপদে সংখ্যা-ও অনুসর্গ-সম্বলিত বিশেষক থাকে, তখনই এমন বিলোপ ঘটে।

৫.৪.৮ বিপ→সংযোগ + বিপ + বিপ*

বাক্যের গভীর সংগঠনে একাধিক বিশেষ্যপদের সংযোগসাধনের জন্যে দরকার এ-সূত্রটি। এ-সূত্রটি যৌগিক বিশেষ্যপদ সৃষ্টি করে। সংযোজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন রূপান্তরবাদী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। একদলের মতে সব রকম সংযোজন বা যৌগিক প্রক্রিয়াই বাক্যিক (দ্র গ্লিটম্যান (১৯৬৫), বেল্লার্ট (১৯৬৬), শান (১৯৬৬); স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩)); অন্য একদলের মতে সব রকম সংযোজনই পদগত (দ্র উইরজবিকা (১৯৬৭), ডহার্টি (১৯৭০, ৭১), ম্যাক্কলি (১৯৬৮))। তৃতীয় একদলের মতে বাক্যিক ও পদগত—উভয় রকম যৌগিকতাই আভ্যন্তর সাংগঠনিক (দ্র স্মিথ (১৯৬৫), ল্যাকফ ও পিটার্স (১৯৬৬), রস (১৯৭০))। ল্যাকফ ও পিটার্স (১৯৬৬) দেখিয়েছেন যে বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনে পদগত যৌগিকতা স্বীকার না করলে *সুষম বিধেয়* ([সিমেট্রিক্যাল প্রেডিকেট] নামী একরকম বিধেয়বিশেষ্যপদ সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি বাক্যিক ও পদগত উভয় রকম যৌগিকতাকেই আভ্যন্তর সাংগঠনিক ব'লে মেনে নিচ্ছি। আলোচ্য সূত্রটি নির্দেশ করছে যে আভ্যন্তর সাংগঠনে দুই বা দুয়ের অধিক বিশেষ্যপদকে সংযোজিত করা যায়। এ-সূত্রের *সংযোগ* বৃত্তটিকে পূরণ করা সম্ভব *ও, আর, এবং, বা, অথবা* প্রভৃতি সংযোজক দ্বারা। এগুলোর সহজাত বৈশিষ্ট্য [+সংযোজক]। সূত্রটির দ্বিতীয় বিশেষ্যপদে সংযুক্ত তারকা চিহ্নটি (*) পৌনপুনিকতাচিহ্ন-তারকাটি নির্দেশ করছে আভ্যন্তর সংগঠনে অসংখ্য বিশেষ্যপদ যোগ করে রচনা করা যায় একটি বিশেষ্যপদ; তবে সংযোজনের জন্যে কমপক্ষে দুটি বিশেষ্যপদ অবশ্যই নিতে হবে। এ-সূত্রটি (৭৮)রূপ আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টি করবে।

(৭৮)
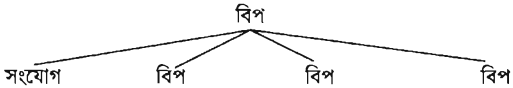
একটি সর্বজনীন নীতি অনুসারে (৭৮)রূপ সংগঠন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তরিত হবে (৭৯)রূপ সংগঠনে।

(৭৯)
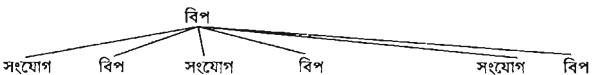
যুগ্ম আভ্যন্তর সংগঠন রূপান্তরণের উল্লিখিত প্রক্রিয়া ল্যাকফ ও পিটার্স-এর (১৯৬৬, ১১৪) প্রক্রিয়া থেকে কিছুটা ভিন্ন। তাঁদের নীতি অনুসারে (৭৮)রূপান্তরিত হবে (৮০)তে।

(৮০)
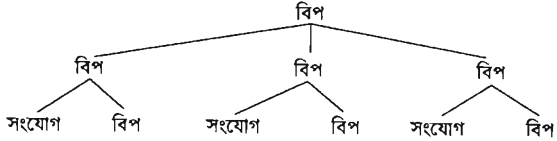
তাঁদের নীতির সাথে আমার নীতির স্বাতন্ত্র্য এখানে : আমার মতে যৌগিক বিশেষ্যপদে ব্যবহৃত *ও, আর, এবং, বা, অথবা* প্রভৃতি সংযোজক উচ্চতম বিশেষ্যপদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত; কিন্তু ল্যাকফ পিটার্স-এর মতে এসব সংযোজক উচ্চতম বিশেষ্যপদের সাথে সম্পর্কিত থাকে মধ্যবর্তী আরেক বিশেষ্যপদের মাধ্যমে। (৭৯)তে, 'সংযোগ' উপাদানটি সংগঠনের উচ্চতম প্রতীকের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত; আর (৮০)তে 'সংযোগ' উপাদানটি প্রতীকের অধীনস্থ 'বিপ'র অধীন। আমি অবশ্য বোধ করি যে বাঙলা যৌগিক বিশেষ্যপদ (৭৯) ও (৮০) উভয় আকৃতিরই হ'তে পারে।

(৭৯) পদচিত্রে বিশেষ্যপদের শুরুতেই অবস্থিত একটি সংযোজক। প্রারম্ভিক সংযোজক বর্জন না করলে জন্ম নেবে (৮১)র মতো অশুদ্ধ বিশেষ্যপদ।

(৮১) ক *এবং হাসান এবং হাসিনা।

খ *অথবা ছেলেটি অথবা মেয়েটি।

(৮১)র বিশেষ্যপদ দুটি প্রারম্ভিক সংযোজকের উপস্থিতিবশত অশুদ্ধ। এমন অশুদ্ধতারোধের জন্য একটি সূত্র, যা বিশেষ্যপদের প্রারম্ভিক সংযোজক লোপ করবে (এ-সূত্রটিকে স্টাইলগত কারণে অমান্য করা সম্ভব)। আমাদের আরো একটি (ঐচ্ছিক) সূত্র দরকার : দুয়ের অধিক বিশেষ্যপদ যুক্ত হ'লে এ-সূত্রটি সর্বশেষ সংযোজক বাদে সমস্ত সংযোজক বর্জন করতে পারবে, এবং ঐচ্ছিকভাবে সমস্ত সংযোজক বর্জন করতে পারবে। এ-সূত্র প্রয়োগ না করলে পাওয়া যাবে (৮২ক)র মতো বিশেষ্যপদে, আর প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে (৮২খ, গ)।

(৮২) ক একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ও একটি বেড়াল।

খ একটি ছেলে, মেয়ে ও একটি বেড়াল।

গ একটি ছেলে, একটি মেয়ে, একটি বেড়াল।

বাঙলায় *ও, আর, এবং, বা, অথবা* বাক্য-সংযোজক ও বিশেষ্যপদ-সংযোজক উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। *কিন্তু* সংযোজকটি ব্যবহৃত হয় কেবল বাক্য-সংযোজকরূপেই। (৮৩)র উদাহরণ বিবেচ্য:

(৮৩) ক হাসান {ও, আর, এবং, বা, অথবা, *কিন্তু} হাসিনা যাবে।

খ হাসান {ও, আর, এবং বা, অথবা, *কিন্তু} হাসিনা যাবে।

গ হাসান যাবে, কিন্তু হাসিনা যাবে না।

(৮৩ক)তে দেখা যায় যে *কিন্তু* ছাড়া আর সমস্ত সংযোজক দিয়েই বিশেষ্যপদ সংযুক্ত করা যায়; (৮৩খ)তে দেখা যায় যে বৈপরীত্যহীন বাক্য সংযুক্ত করা যায় *কিন্তু* ছাড়া আর সমস্ত সংযোজক দিয়েই। (৮৩গ)তে দেখা যায় যে বৈপরীত্যসূচক বাক্য সংযুক্ত করা যায় *কিন্তু* দিয়ে।

আভ্যন্তর সংগঠনে বিশেষ্যপদ সংযোজনের সূত্র রাখার মূলে আছে ল্যাকফ ও পিটার্স কথিত *সুষম বিধেয়পদ*। (৮৪ক) বাক্যটি (৮৪খ)র আভ্যন্তর সংগঠনে সংযুক্ত বাক্য থেকে আহরণ করা অসম্ভব।

(৮৪) ক হাসান ও হাসিনা এক রকম।

খ *হাসান এক রকম ও হাসিনা এক রকম।

(৮৪খ) থেকে (৮৪ক) আহরণ করা যায় না, কেননা (৮৪খ) প্রায় নিরর্থক। বিধেয় বিশেষ্য 'একরকম'-এর জন্যে দরকার এমন একটি কর্তাবিশেষ্যপদ, যা আভ্যন্তর সংগঠনেই বহুবচনাত্মক। তাই মনে করতে পারি যে 'হাসান ও হাসিনা' বিশেষ্যপদটি আভ্যন্তর সাংগঠনিক যুগ্ম।

৫.৪.৯ বিপ→ বাক্য

এ-সূত্রটি দরকার *অসমাপিকা সম্পূরকীকরণ*-এর জন্যে (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩, § ১০.৩))। আভ্যন্তর সংগঠনে সমস্ত গ্রন্থনপ্রক্রিয়াকেই এ-ব্যাকরণে ধরা হয়েছে বিশেষ্য পদী-গ্রন্থন ব'লে এবং আধিপত্যকারী বিশেষ্যপদগুলো বাক্যের আভ্যন্তর সংগঠনে থাকে কোনো-না-কোনো 'কারক'-এর অধীন। অসমাপিকা সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ায় উপবাক্যের ক্রিয়ার তে-অসমাপিকাভবনের ফলে উপবাক্যটি হ্রস্বত্ব লাভ করে। (৮৫)র উদাহরণগুলো লক্ষণীয়:

(৮৫) ক ডাক্তার হাসানকে দেখতে লাগলেন।

খ [ডাক্তার লাগলেন [ডাক্তার হাসানকে দেখা]}

(৮৬)

প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে (৮৫ক) সরল বাক্য। বাক্যটির ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় এটি একটি মিশ্র বাক্য, যাতে একটি মুখ্য বাক্যের শরীরে গ্রথিত হয়েছে একটি উপবাক্য। (৮৫ক) আহরিত (৮৫খ)র আভ্যন্তর সংগঠন থেকে। (৮৫খ)র মধ্যসংগঠন, অনেকটা, (৮৬)।

(৮৬) পদচিত্রে প্রধান বাক্যের ক্রিয়ামূল তে-অসমাপিকার জন্যে চিহ্নিত; অর্থাৎ এ-ক্রিয়ার সাথে সহাবস্থানরত উপবাক্য হ্রস্বীভূত হবে;— উপবাক্যের ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হবে ক্রিয়াসহায়ক তে। এজন্যে (৮৬)র উপবাক্যের ক্রিয়াসহায়ক শূন্য; অর্থাৎ উপবাক্যটি কাল ও ক্রিয়ারীতিরহিত। (৮৬)তে প্রধান ও উপবাক্যের কর্তা সমনির্দেশক : একই ব্যক্তির প্রতি নির্দেশ করে। তাই বিপ-১-এর সাহায্যে বিলোপ করা হবে বিপ-২। এজন্যে উপবাক্যে, কর্তা-ক্রিয়ারূপ-সঙ্গতিসূত্র প্রযুক্ত হবে না; এর পরিবর্তে ক্রিয়াসহায়করূপে বসবে তে। এভাবে পাওয়া

যাবে 'ডাক্তার লাগলেন হাসানকে দেখতে' বাক্যটি। এ-বাক্যটিও (৮৫ক) সমার্থক। পরিশেষে সমাপিকা ক্রিয়ারূপটিকে বাক্যান্তে বসিয়ে পাওয়া যাবে (৮৫ক) বাক্য 'ডাক্তার হাসানকে দেখতে লাগলেন'।

৫.৪.১০ বিপ→ বিক+বি+বাক্য

এ-সূত্রটি দরকার *বিশেষ্যপদীয় সম্পূরকীকরণ*-এর জন্যে (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩, § ১০.৩))। বিশেষ্যপদীয় সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার আভ্যন্তর সংগঠন, অনেকটা, (৮৭)।

(৮৭)
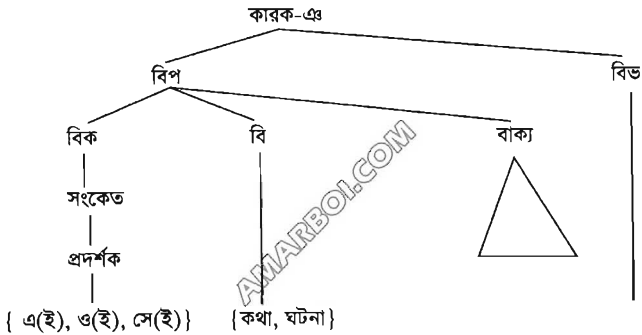
এ-সংগঠন কিপারস্কি ও কিপারস্কি-প্রস্তাবিত (১৯৭১) *ফ্যাক্টিভ সম্পূরকীকরণ*-এর সমান্তরাল। তাঁদের বিশ্লেষণে সংগঠনের যে-স্থানে *দি ফ্যাক্ট* বসে, বাঙলার জন্যে আমি সেখানে *এ-কথা, এ-ঘটনা* জাতীয় বিশেষ্যপদ ব্যবহারের পক্ষপাতী। (৮৮)র উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(৮৮) ক হাসান মনে করে যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে।

খ হাসান মনে করে একথা যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে।

(৮৮ক, খ) সমার্থক; তবে (৮৮খ)তে বিমূর্ত বিশেষ্যপদ *একথা* উপস্থিত, (৮৮ক)তে অনুপস্থিত। আমি মনে করি যে 'আগামীকাল বৃষ্টি হবে' উপবাক্যটি *একথা* বিশেষ্যপদে সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ায় গ্রথিত। ঐচ্ছিকভাবে এ-বিমূর্ত বিশেষ্যপদটিকে বর্জন করলে পাওয়া যায় (৮৮ক)।

৫.৫ প্রধান সূত্রসমূহের সারাংশ

(৮৯) বহুবচন-খণ্ড রূপান্তর সূত্র

সাংগঠনিক বর্ণনা : বিপ [এও বহুবচন বি]

১ ২ ৩ ৪

[+বি, ± সর্বনাম
+সংখ্যা
α মনুষ্য, β প্রণী
μ শ্রেণী
π কর্তা]

সাংগঠনিক রূপান্তর :

[ক] [+বহুবচন-খণ্ড] নামে একটি বৃন্ত সৃষ্টি ক'রে চোমস্কি-সংযোজন প্রক্রিয়ায় ৪-এর ডান-কন্যারূপে যুক্ত করেন।

{খ} ৪-এর [α মনুষ্য], [β প্রাণী], [μ শ্রেণী, [π কর্তা], বৈশিষ্ট্যরাশি [+বহুবচন-খণ্ড]-এ যুক্ত করুন।

[গ] ৪-এ [+বহুবচন] বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত ক'রে ৩ লোপ করুন।

শর্ত: ৩ এবং ৪ ১-এর উপাদান।

(৮৯) সূত্রটি (৯০) পদচিত্রকে (৯১)-এ রূপান্তরিত করবে।

(৮৯)
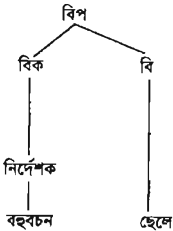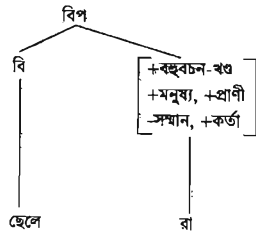
(৯১) পদচিত্রে বহুবচনচিহ্ন *রা* সংযুক্ত হবে দ্বিতীয় শব্দসংক্রাম সূত্রের সাহায্যে।

(৯২) নির্দেশক স্থানান্তর সূত্র

সাংগঠনিক বর্ণনা :	বিপ	[এঃ	{নির্দিষ্ট / সংকেত}	নির্দেশক	[সংখ্যা	অনুসর্গ]	বি
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

সাংগঠনিক রূপান্তর :

[ক] ৭-এর ডান-ভগিনীরূপে ৪-কে যুক্ত করুন।

[খ} ৭-এর মিশ্রপ্রতীক [+নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত করুন, এবং ৫-এর [নির্দিষ্ট] বৈশিষ্ট্যকে [+নির্দিষ্ট]তে পরিণত করুন।

[গ] ৩ যদি *নির্দিষ্ট* হয়, তবে ৩ বর্জন করুন।

শর্ত: [ক] ৩ যদি *সংকেত* হয়, তবে এটিকে অবশ্যই [+নির্দিষ্ট] বৈশিষ্টমণ্ডিত হ'তে হবে।

[খ] ৫-কে অবশ্যই [+বিশেষ্য হ'তে হবে।

[গ] ৫ যদি [+নির্দিষ্ট] হয়, তবে এ-সূত্র প্রযুক্ত হবে না।

(৯৩) এক, ও জন বিলোপ সূত্র

সাংগঠনিক বর্ণনা :	বিপ	[এঃ	বি	নির্দেশক	[সংখ্যা	অনুসর্গ]]
	১	২	৩	৪	৫	৬

সাংগঠনিক রূপান্তর :

[ক] ৫ যদি *এক* সংখ্যার ওপর আধিপত্য করে, তবে ৫ বর্জন করুন।

[খ] সমস্ত উপাদানসহ ৪ বর্জন করুন, যদি ৫=*এক*, এবং ৬=*জন*।

শর্ত : ৩ ও ৫-এর বৈশিষ্ট্য [+নির্দিষ্ট]।

(৯২) সূত্রটি (৫৪) পদচিত্রকে (৫৫) পদচিত্রে পরিণত করবে; এবং (৯৩) সূত্রটি (৫৫)কে রূপান্তরিত করবে (৫৬)তে।

টীকা

[১] গ্রিক-লাতিন ও সংস্কৃত ভাষিক তত্ত্ব থেকে উৎসারিত আনুশাসনিক ব্যাকরণই প্রথাগত ব্যাকরণ (দ্র পরিশিষ্ট : এক)। প্রথাগত ব্যাকরণ আনুশাসনিক : ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্দেশ করাই এর কাজ। পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যাকরণরচয়িতা থ্রাক্স-এর ব্যাকরণের নাম *গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি*—বর্ণবিদ্যা। থ্রাক্স তাঁর ব্যাকরণপুস্তক রচনা করেছিলেন গ্রিক ভাষা শুদ্ধরূপে লেখার প্রণালি শেখানোর জন্যে। সংস্কৃত *ব্যাকরণ* শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ শব্দনির্মাণবিদ্যা'।

পতঞ্জলি *ব্যাকরণ* শব্দের বদলে ব্যবহার করেছিলেন আত্মবিশ্লেষণাত্মক অভিধা *শব্দানুশাসন*। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণ আর্থ মানদণ্ড-নির্ভর, তা রৌপ নয়। 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ', 'সর্বনাম' প্রভৃতি ক্যাটেগরির যে-সংজ্ঞা বিভিন্ন ব্যাকরণপুস্তকে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্যে তার আদি-উন্মেষ ঘটেছিলো আরিস্ততল-থ্রাক্স-প্রিস্কিআন-এর রচনায়; এবং এ-অঞ্চলে ঘটেছিলো পাণিনিপূর্ব ব্যাকরণবিদদের রচনায়। কিন্তু আর্থ মানদণ্ড ভিত্তি ক'রে বিভিন্ন ক্যাটেগরি নির্ণয় অসম্ভব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯, ১৫০) প্রদত্ত বিশেষ্যের সংজ্ঞা নিম্নরূপ : 'যে-শব্দ, দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট, চক্ষু কর্ণ মন আদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অথবা ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত অনুভূতি-সাপেক্ষ কোনও পদার্থের নাম; এবং যাহাকে বাক্য-মধ্যে অবস্থিত অথবা উহ্য, গুণ-বা ধর্ম-বাচক অন্য কোনও শব্দাবলী-দ্বারা নিজ জাতি বা শ্রেণী হইতে পৃথক বা বিশিষ্ট করা যায়; সেইরূপ শব্দকে নাম বা বিশেষ্য বলে।' এ-সংজ্ঞাটি আর্থ-এর সাহায্যে পৃথিবীর সব কিছুকেই বিশেষ্য ব'লে চিহ্নিত করা যায়। 'পদার্থ' কাকে বলে? 'সোনা' নিশ্চয়ই পদার্থ, তাই 'সোনা' বিশেষ্য। কিন্তু 'প্রেম', বা 'স্বপ্ন' কি পদার্থ? তাহলে 'প্রেম', 'স্বপ্ন' কি বিশেষ্য নয়? জটিলতায় না জড়িয়ে বলা যায় যে সুনীতিকুমারের সংজ্ঞার সাহায্যে বিশেষ্য শনাক্তি অসম্ভব। তাই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা আর্থ মানদণ্ড পরিহার ক'রে গ্রহণ করেছিলেন রৌপ মানদণ্ড।

[২] *বিশেষ্যপদ* একটি বাক্যিক ক্যাটেগরি বা একক; প্রথাগত ব্যাকরণের *পদ* ধারণার সাথে এর সম্পর্ক সামান্য। প্রতিটি বাক্যকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কয়েকটি এককে বিভক্ত করা সম্ভব, এবং ওই এককগুলোকে বলতে পারি *পদ*, বা *ফ্রেজ*। বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে ছোটো নিঃসঙ্গ একটি বিশেষ্য, বা 'নির্দেশক+বিশেষ্য', বা 'প্রদর্শক+বিশেষ্য'। এমনকি এক একটি বড়ো বাক্যও বৃহত্তর বাক্যে বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

[৩] আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান কোনো ভাষাবস্তুকেই অবিভাজ্য মনে করে না; বরং মনে করে যে ভাষার প্রতিটি বস্তু বা এককই একগুচ্ছ *গুণ*, বা *বৈশিষ্ট্য*-এর সমাহার। ধ্বনিতত্ত্বেই প্রথম বৈশিষ্ট্য-এর ব্যবহার শুরু হয়। বৈশিষ্ট্যতত্ত্ব-এর আদিপ্রস্তাবক ইআকবসন ও ক্রবেৎস্কয়। উদাহরণস্বরূপ /প/ ধ্বনিটি নেয়া যাক : এটিকে ভেঙে দেখিয়ে দেয়া যায় যে এটি কয়েকটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যের সমাহার। চোমস্কি বৈশিষ্ট্যতত্ত্ব ব্যবহার করেন বাক্যতত্ত্বে; এবং দেখান যে প্রতিটি শব্দকে ভাঙা সম্ভব কতিপয় বাক্যিক-আর্থ বৈশিষ্ট্যে। যেমন : *ভদ্রলোক* শব্দটি [+বি,−সর্ব,+সাধারণ,+সংখ্যা,+সম্মান,+পুং] প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সমাহার। এ-বৈশিষ্ট্যরাশি কখনো *ক্রমস্তরিক*ভাবে এবং কখনো *তীর্যক*ভাবে সম্পর্কিত থাকে। সে-সব বৈশিষ্ট্যই ক্রমস্তরিক, যাদের একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্দেশ করে অন্যটি। যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্দেশসম্ভব বৈশিষ্ট্যকে বলে *বাহুল্যবৈশিষ্ট্য*। যেমন: *ভদ্রলোক* হচ্ছে 'মানুষ';—তাই আর বলা দরকার করে না যে এটি 'প্রাণী'ও। সবাই জানে যে 'মানুষ'-মাত্রই 'প্রাণী'। তাই এখানে 'প্রাণী' বাহুল্যবৈশিষ্ট্য।

[৪] বিশেষ্যপদের বহিঃসংগঠনে দেখা যায় বিশেষণ বিশেষ্যের বাঁয়ে অবস্থিত থাকে: যেমন—'একজন রূপসী মহিলা' বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্যের অব্যবহিত বাঁয়ে অবস্থিত বিশেষণ *রূপসী*। রূপান্তরবাদীরা এমন বহিঃসংগঠন ভেদ করে ঢুকতে চান গভীর সংগঠনে, এবং খুঁজে পান আরেক রকম সংগঠন, যার সাথে চমৎকার মিল আছে বিশেষণসম্বলিত বিশেষ্যপদের। 'একজন মহিলা রূপসী' বাক্যটির সাথে মিল আছে 'একজন রূপসী মহিলা' বিশেষ্যপদের। তাই রূপান্তরবাদীরা মনে করেন যে বিশেষণ বাক্যের গভীর সংগঠনে উপস্থিত থাকে বিধেয়বিশেষণরূপে এবং নানা রূপান্তরস্তর পেরিয়ে বহিঃসংগঠনে দেখা দেয় বিশেষ্যপদের শিরবিশেষ্যের বামবস্তুরূপে।

[৫] বিশেষ্যে বাঁ পার্শ্বে বিশেষণদ্বৈতের সাহায্যে বাঙলায় বহুবচনত্ব প্রকাশ করা হয়। যেমন :

ক ছোটো ছোটো বাড়ি।

খ লাল লাল ফুল।

ওপরের উদাহরণে বিশেষণের দ্বৈত প্রয়োগ ঘটেছে; তবে শিরবিশেষ্য রয়েছে মৌলরূপে, কোনো বহুবচনচিহ্ন যোগ করা হয়নি। এ-ধরনের বিশেষ্যপদ আমাদের ব্যাকরণ সৃষ্টি করবে পূর্ণ বাক্য থেকে।

[৬] এ-নিয়মের বিচ্যুতিও ঘটে। রবীন্দ্রনাথের *শব্দতত্ত্ব*-এর কোনো এক সংস্করণের ভূমিকায় দেখেছিলোম 'শেকসপিয়র বার্নার্ড শ প্রভৃতি লেখকগুলি'র মতো প্রয়োগ।

[৭] ব্যঞ্জনান্ত বিশেষ্যের সাথে যুক্ত হবে বহুবচনচিহ্ন *এরা*, আর স্বরান্ত বিশেষ্যের সাথে যুক্ত হবে *রা*—এ-নিয়মটি বহুলপ্রতিপালিত। কিন্তু ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলিতে সাধারণত এ-সূত্রটিই মান্য করেছেন, তবে অমান্যও করেছেন তিনি প্রচুর। যেমন : বহুবচনের ব্যাকরণ রচনার সময় তিনি অসচেতনভাবে অমান্য করেছেন এ-সূত্র। রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮, ৮৭-৮৮) থেকে উদ্ধৃতি : 'বহুবচনে 'মানুষরা' ব'লে থাকি অথচ 'ঘোড়ারা' বলতে কানে *ঠেকে* অথচ 'ঘোড়াদের' বলা চলে। মোটের উপর এ কথা খাটে যে সচেতন জীবদের নিয়ে বহুবচনে রা এবং সম্বন্ধে ও কর্মকারকে দের চিহ্ন ব্যবহার হয়ে থাকে। 'মোষেরা খুব বলবান জীব', বা 'ময়ূরদের পুচ্ছ লম্বা' এটা নিয়মবিরুদ্ধ নয়।' রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনান্ত শব্দে *রা থেকে এরায়* অবিরাম যাওয়া আসা করতেন। বাঙলাদেশে এ-সূত্রটি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। বাঙলাদেশে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে *রা* ব্যবহারের আধিক্য চোখে পড়ে (যেমন : 'ভদ্রলোকেরা', 'শিক্ষকরা'); আবার স্বরান্ত শব্দে যোগ করা হয় অনেক সময় *এরা*। যেমন : *জীবনানন্দ* বিশেষ্যটির বাঙলাদেশে বহুবচনরূপ হবে *জীবনানন্দেরা*, এর সম্বন্ধরূপ হবে *জীবনানন্দের*; যদিও সূত্রানুসারে হওয়া উচিত যথাক্রমে *জীবনান্দরা, ও জীবনানন্দর*। 'অশ্ব' শব্দটির সূত্রানুসারে বহুবচন ও সম্বন্ধরূপ হওয়া উচিত যথাক্রমে 'অশ্বরা' ও 'অশ্বর'; কিন্তু

বাঙলাদেশে এর রূপ হবে 'অশ্বেরা', ও 'অশ্বের'। বর্তমানে সূত্র দ্বিগুণ জটিল হয়ে উঠেছে : ঘটছে *রা, এরা* সূত্রের পারস্পরিক স্থানান্তর।

[৮] আঙ্কিক বা সমষ্টিব্যঞ্জক সংখ্যাশব্দযুক্ত বিশেষ্যপদের বাঙলায় শিরবিশেষ্যের সাথে কোনো বহুবচনচিহ্ন যুক্ত হয় না; কিন্তু এ-সূত্রের বিপর্যয় এখন পৌনপুনিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তবে আঙ্কিক সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনচিহ্নের সহাবস্থান বেশ কম : তাই; '*দশটি মেয়েরা', '*সাতটি পাখিগুলো', বা '*পাঁচজন মহিলারা' জাতীয় বিচ্যুতি বিশেষ চোখে পড়ে না। কিন্তু সমষ্টিব্যঞ্জক সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনচিহ্নের সহাবস্থান নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ-দুর্ঘটনার কারণ ইংরেজির প্রভাব;—ইংরেজি শিক্ষিতরা ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়মে *অনেক ছেলেরা', '*বহু মেয়েরা', *সব ভদ্রলোকেরা' জাতীয় বিশেষ্যপদ প্রায়ই গঠন করে। এ-প্রবণতা কখনোকখনো মারাত্মক আকার পায়, এবং বিশেষ্যপদে স্তূপীকৃত হয় বহুবচনচিহ্ন। তাই পাওয়া যায় '*সম্মানিত অতিথিবৃন্দগণ', '*শিক্ষকবর্গগণ', '*বহু ছাত্রবৃন্দগণ'-এর মতো বিভীষিকা। বাঙলা ভাষার বহু প্রখ্যাত লেখকের রচনায় সমষ্টিব্যঞ্জক সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনচিহ্নের সহাবস্থান প্রচুর মেলে। বাঙলায় অবশ্য সমষ্টিব্যঞ্জক সংখ্যাশব্দ ও বহুবচনচিহ্নের সহাবস্থান সর্বদা অশুদ্ধ নয়; অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণসম্মতভাবেই ক্যাটেগরি দুটি একই বিশেষ্যপদে বসতে পারে। 'সব তরুণীরাই তোমাকে চায়' বাক্যের 'সব তরুণীরা' অশুদ্ধ নয়; কেননা 'সব' এখানে বহুবচন প্রকাশ করছে না, বরং নির্দেশ করছে সমস্তত্ব। 'সব তরুণীরা' এখানে প্রকাশ করছ 'তরুণীদের মধ্যে সবাই' অর্থ। রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮, ৮৮) এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন; 'সব' প্রয়োগের সঙ্গেসঙ্গে 'গুলো' প্রয়োগটাও যোগ দিতে চায়, যেমন : সব চৌকিগুলোই ভাঙা, সব ভিখিরিগুলোই চেঁচাচ্ছে। এখানে 'সব' বোঝাচ্ছে একান্ততা, আর 'গুলো' বোঝাচ্ছে বহুবচন।'

[৯] বাক্য বা অন্য কোনো সংগঠনের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হয় *পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ* (দ্র § ৪.৪)। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেছিলেন যে বাক্যের বিভিন্ন শব্দ পরস্পরবিচ্ছিন্নভভাবে না ব'সে বিভিন্ন গুচ্ছে বিন্যস্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। এ-তত্ত্বকে সুশৃঙ্খল ও গাণিতিক রূপ দিয়ে চোমস্কি সৃষ্টি করেন পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ। পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ একরাশ পুনর্লিখন সূত্রের সমষ্টি, যা বাক্য বা অন্য কোনো সংগঠন সৃষ্টি করে, এবং সৃষ্ট সংগঠনের স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা দেয়। রূপান্তর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষে বাক্যের বা অন্য কোনো সংগঠনের আভ্যন্তর সংগঠন সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হয় পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ।

[১০] প্রথাগত ব্যাকরণে *কাল* [টেনস] ও *ক্রিয়ারীতিকে* [আসপেক্ট] অভিন্ন ব'লে ভাবা হয়; কিন্তু কাল ও ক্রিয়ারীতির মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কাল নির্দেশ করে কোনো ক্রিয়া সংগঠনের সময়, আর ক্রিয়ারীতি নির্দেশ করে ক্রিয়াসংগঠনের প্রক্রিয়া। যেমন : 'করছে' ক্রিয়ারূপটিতে 'কাল' হচ্ছে 'বর্তমান', আর 'ক্রিয়ারীতি' হচ্ছে 'ঘটমান'।

[১১] প্রথাগত ব্যাকরণে ব্যবহৃত *অনুসর্গ* ও *নির্দেশক*-এর সাথে এর সম্পর্ক নেই। এখানে *বহুবচনচিহ্ন* অভিধাটি সম্পর্কেও মন্তব্য করতে চাই। প্রথাগত ব্যাকরণে *বিভক্তি* অভিধাটির অপব্যবহার করা হয় নানাভাবে : যা কারকজ্ঞাপন করে, তাও বিভক্তি; যা বহুবচন নির্দেশ করে তাও বিভক্তি; যা ক্রিয়ারূপে কাল ও ক্রিয়ারীতি নির্দেশ করে, তাও বিভক্তি। আমি শুধুমাত্র কারকজ্ঞাপন ভাষাবস্তুদের নাম হিশেবে ব্যবহার করতে চাই *বিভক্তি* শব্দটি।

[১২] ইংরেজি ব্যাকরণের আদলে অনেক দিন ধ'রে বাঙলা ব্যাকরণ রচিত হচ্ছে ব'লে *টা, টি* প্রভৃতি সম্পর্কে এ-ধারণাটি বেশ গভীরভাবে ঢুকে গেছে বাঙালির মজ্জায়। 'টা', 'টি' প্রভৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের (১৯৩৮, ১০০-১০১) ভাষ্য নিম্নরূপ : 'বাংলায় নির্দেশকরূপে প্রধানত ব্যবহার হয় : টি, টা, খানি, খানা। ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ the। ইংরেজিতে the বসে শব্দের পূর্বে, বাংলায় নির্দেশক শব্দ বসে শব্দের পরে, বস্তুবাচক বা জীববাচক শব্দের অনুসঙ্গে।' রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিভ্রান্ত, ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণরচয়িতারা যে সেখানে ভ্রান্তিতে ডুবে যাবেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

[১৩] *প্রতি, প্রত্যেক*যুক্ত বিশেষ্যপদে অনুসর্গ *টি* যুক্ত হয় *প্রতি, প্রত্যেক*-এর সাথে; এটাই নিয়ম। কিন্তু স্টাইলিক অনিয়ম পাওয়া যাবে বেশ। *শেষের কবিতায়* (দ্র রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৬, ৫৪)) পাওয়া যাবে এমন ব্যবহার : 'স্মিতহাস্যমিশ্রিত *প্রত্যেক কথাটি* লাবণ্যের ঠোঁট দুটির উপর কিরকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল।'

[১৪] রূপান্তর ব্যাকরণে *আভিধানিক উপকক্ষ থেকে ভিত্তিকক্ষ* কর্তৃক সৃষ্ট আভ্যন্তর পদচিত্রে শব্দ সরবরাহের রীতিকে বলা হয় *শব্দসংক্রাম*। অভিধানিক উপকক্ষে ভাষার শব্দরাজি বিন্যস্ত থাকে শব্দাবলির বিস্তৃত ধ্বনিক-আর্থ-বাক্যিক বিবরণসহ, এবং আভ্যন্তর পদচিত্রে বিশেষ রীতিতে শব্দ সরবরাহ করা হয় (দ্র § ৪.৬.৮)।

[১৫] অসাবধান উক্তিতে 'এ দুটি ছেলে'র মতো বিশেষ্যপদ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, কেননা এতে কোনো আর্থত্রুটি ঘটে না। কিন্তু এমন সংগঠন বাক্যিক ত্রুটিযুক্ত।

[১৬] প্রথাগত ব্যাকরণে *এগুলো, ওগুলো, সেগুলো* প্রভৃতিকে ইংরেজি ভাষা ও ব্যাকরণের প্রভাবে যথাক্রমে *এ, ও, সের* বহুবচন মনে করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতাদের ধারণা ইংরেজি 'দিস', 'দ্যাট'-এর যেহেতু বহুবচনরূপ আছে, তাই বাঙলায় ওই বস্তুগুলোর সমান্তরাল রূপেরও বহুবচনরূপ থাকবে। তবে *এগুলো, ওগুলো, সেগুলো* যথাক্রমে *এ, ও, সের* বহুবচন নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাক্য সর্বনামীয়করণ

৬.০ ভূমিকা

কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন যে বিশেষ্যপদের যেমন সর্বনামীয়করণ সম্ভব, তেমনই, অনেক ক্ষেত্রে, বাক্যেরও সর্বনামীয়করণ সম্ভব। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ্যপদকে সর্বনামে রূপান্তরিত করতে পারি। *সাধারণ সর্বনামীয়করণ*-এর একটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যক শর্ত হলো কোনো একটি বাক্যে একাধিক *সমনির্দেশক* বিশেষ্যপদ থাকতে হবে। সাধারণ এবং অন্যান্য সর্বনামীয়করণ সম্পর্কে আমি অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩))। ইংরেজি ভাষায় সাধারণ *ইট ও সো* বাক্যসর্বনাম হিশেবে ব্যবহৃত হয়। কুশিং (১৯৭২) থেকে নেয়া (১)-এর উদাহরণগুলোতে বাক্যসর্বনাম হিশেবে *ইট ও সো*র ব্যবহার লক্ষণীয়।

(১) ক নোআম সেইড দ্যাট ডিপ স্ট্রাকচার এক্সিস্টস, অ্যান্ড আই বিলিভ {ইট, *সো}।

খ জর্জ আস্কড মি হোয়েদার ডিপ স্ট্রাকচার এক্সিস্টস; আই সেইড দ্যাট আই বিলিভড {সো, *ইট}।

বাঙলা ভাষায়ও এক ধরনের বাক্যের বদলে ব্যবহার করা যায় *বিমূর্ত সর্বনাম তা*। বাঙলা ভাষায় (২)-এর উদাহরণগুলোর মতো অসংখ্য বাক্য পাওয়া যায় :

(২) ক মাতিন মনে করে যে *পৃথিবীটা একটা মারবেল*, আর মিনুও *তা* মনে করে।

খ কেরামত আলি ঘোষণা করেছে যে *সে জাতির পিতা*, কিন্তু বাঙালিরা *তা* মনে করে না।

(২ক)তে 'পৃথিবীটা মারবেল' ও 'তা', এবং (২খ)তে ' সে জাতির পিতা' ও 'তা' সমনির্দেশক বা অভিন্নার্থক। সুতরাং আমরা মনে করতে পারি যে এ-বাক্য দুটিতে 'তা' বাক্য *সর্বনামীয়করণ*-এর ফলে উৎপন্ন হয়েছে।

৬.১ বিমূর্ত সর্বনাম *তা*

বাঙলায় একটি সর্বনাম রয়েছে, যেটির রূপ হচ্ছে *তা*। এটিকে আমি বিমূর্ত সর্বনাম নামে অভিহিত করেছি। এটির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে [±বিমূর্ত,−সংখ্যাবাচক]। এটি বিমূর্ত বা মূর্ত

অগণনীয় (সংখ্যাবাচক নয়) বস্তুদের নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি চমৎকার একান্ত বাঙলা সর্বনাম; ইংরেজিতে এটির সমান্তরাল কোনো সর্বনাম নেই। এটির বাক্যগত এবং অর্থগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমাদের অতিশয় সতর্ক থাকতে হবে, নইলে আমরা বিশেষভাবে বিভ্রান্ত হ'তে পারি। যদি বিশেষ সতর্ক না হই, তাহলে আমরা এ-সর্বনামটির আকৃতির সাথে অন্যান্য সর্বনামের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র দ্বারা গঠিত আকৃতির মিল দেখে সহজেই বিচলিত ও বিভ্রান্ত হবো। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এ-বিষয়টি স্পষ্ট ক'রে দেখানো যেতে পারে। বাঙলা ভাষায় মনুষ্যবাচক *সে* সর্বনামটি বিশেষ পরিচিত, এবং বহুলব্যবহৃত। এ-সর্বনামটির শেষে বিভক্তিপ্রত্যয় ইত্যাদি যোগ করলে এটি একটি বিকল্প রূপ ধারণ করে। (৩)-এর উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(৩) সে+ কে → তাকে, *সেকে।

সে+র → তার, *সের। .

সে+রা → তারা, *সেরা।

সে+দের → তাদের, * সেদের।

(৩)-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে *সের* সঙ্গে কোনো রকমের বিভক্তিপ্রত্যয় যোগ করলেই সর্বনামটি একটি বিকল্প রূপ (*তা*) ধারণ করে। *সের* বিকল্প রূপ এবং বিমূর্ত সর্বনামটির মূলরূপ অভিন্ন। এ-আকৃতিগত অভিন্নতা এতোদিন ধ'রে আমাদের বিভ্রান্ত করেছে এবং সতর্ক না হলে ভবিষ্যতেও বিভ্রান্ত হবো। 'তাকে', 'তার', 'তারা', 'তাদের' ইত্যাদি শব্দরূপে, যে- 'তা' রূপটি আমরা দেখতে পাই, তা রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র দ্বারা গঠিত বাহ্যিক স্তরের রূপ মাত্র। এ-'তা' কখনো গভীর স্তরে থাকে না। এটি হলো মনুষ্যবাচক সর্বনাম 'সে'র বিশেষ পরিস্থিতিতে বিকল্প রূপ। আমরা একটি অতি সরল সূত্র দ্বারা 'সে'র এ-বিকল্প রূপটি পেতে পারি। সূত্রটি হলো : মানুষ্যবাচক সর্বনাম 'সে'র কোনো বিভক্তিপ্রত্যয় যুক্ত হ'লে সর্বনামটি 'তা'তে রূপান্তরিত হয়।

সাধু বাঙলায় তিনটি বিমূর্ত সর্বনাম রয়েছে : *ইহা, উহা,* এবং *তাহা*। এগুলোর মধ্যে একমাত্র *তাহাই তা* রূপে চলতি বাঙলায় টিকে আছে। বিমূর্ত সর্বনাম *তা* গভীর তল এবং বহির্তল, উভয় তলেই ব্যবহৃত হয়। এটিকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত কোনো কিছু নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা যায়, এবং প্রসঙ্গবহির্ভূত কোনো বিমূর্ত বস্তুর প্রতি নির্দেশ করার জন্যেও ব্যবহার করা যায়। এছাড়া ভাবনা বা বোধের অভিন্নতা জ্ঞাপনের জন্যেও ব্যবহার করা যায়। এ-সর্বনামটির ব্যবহারবিধি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। (৪)-এর উদাহরণে *তা* প্রসঙ্গবহির্ভূত কোনো বিমূর্ত বস্তুর প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৪)-এর বাক্যগুলো লক্ষণীয় :

(৪) ক আমি *তা* ভুলি নি।

খ আমি *তা* মনে রাখবো।

ওপরের বাক্য দুটিতে *তা* বাক্যবহির্ভূত কোনো কিছুর প্রতি নির্দেশ করছে। কী নির্দেশ করছে, তা শুধু বক্তা আর শ্রোতাই জানেন। এ-বাক্য দুটিতে *তা* গভীরতলীয় সর্বনাম : কেননা এখানে *তা* কোনো বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণের ফল নয়। (৫)-এর বাক্য দুটিতে *তা* বহির্তলের সর্বনাম; কেননা এখানে *তা* সর্বনামীয়করণ রূপান্তরজাত।

(৫) ক *যা* পেয়েছি, *তা* অবিস্মরণীয়।

খ আমি *যা* চাই, *তা* সিংহাসন নয়।

(৫)-এর বাক্য দুটিতে *তা* বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণের ফল। (৫)-এর বাক্য দুটি (৬)-এর বাক্য দুটির সাথে, যথাক্রমে, সম্পর্কিত :

(৬) ক *যে-{ জিনিশ, বস্তু}* পেয়েছি, *সে(ই)-{ জিনিশ, বস্তু}* অবিস্মরণীয়।

· খ আমি *যে-{ জিনিশ, বস্তু}* চাই, *সে(ই)-{ জিনিশ, বস্তু}* সিংহাসন নয়।

ওপরের বাক্য দুটিতে 'যে-জিনিশ' ও 'সে(ই)-জিনিশ', এবং 'যে-বস্তু' ও 'সে(ই)-বস্তু সমনির্দেশক। তাই সর্বনামীয়করণ নিয়মের দ্বারা আমরা ডান দিকের বিশেষ্যপদগুলোকে বিমূর্ত সর্বনামে পরিণত করতে পারি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনেক বাক্যে *তা* কোনো কোনো বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণের ফলও হ'তে পারে।

বাঙলা বিমূর্ত সর্বনামটি (*তা*) সাধারণত কোনো বিমূর্ত বস্তু বা ভাবনা নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি দিয়ে মূর্ত বস্তুদেরও নির্দেশ করা যায়। কিন্তু এ-সর্বনামটি দিয়ে যখন কোনো মূর্ত বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, তখন নির্দেশিত বস্তুটি স্বমহিমায় নির্দেশিত না হয়ে কেবলমাত্র 'বস্তু'স্বরূপে নির্দেশিত হয়। নির্দেশের এ-বৈশিষ্ট্যই এ-সর্বনামটিকে তুলনাহীন ক'রে রেখেছে। আমরা যদি এ-সর্বনামটি দিয়ে নারী, পশু, বই ইত্যাদি মূর্ত প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক বস্তুদের নির্দেশ করি, তাহলে নির্দেশিত নারী, পশু, বই ইত্যাদি নারী, পশু, বই হিশেবে নির্দেশিত হয় না; বরং নির্দেশিত হয় বস্তু হিশেবে। অর্থাৎ এ-সর্বনামটি সব কিছুকেই বস্তু হিশেবে নির্দেশ করে। বস্তুত্ব যেহেতু একটি বিমূর্ত বোধ, সেহেতু এ-সর্বনামটিকে *বিমূর্ত সর্বনাম* নামে অভিহিত করা উচিত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আপাতসরল, অথচ বিশেষভাবেই জটিল, এ-সর্বনামটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। (৭)-এর উদাহরণগুলো বিবেচ্য :

(৭) ক আমি বাদলকে একটি কার্ড পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে {তা, সেটি} পায় নি।

খ যদি তুমি আজ সন্ধ্যায় একজন বান্ধবী চাও, তবে তুমি {তা, *তাকে} পাবে।

(৭ক)তে *তা* 'একটি কার্ড'কে নির্দেশ করেছে, আর (৭খ)তে *তা* অনির্দিষ্ট যে-কোনো একজন বান্ধবীকে নির্দেশ করছে। 'একটি কার্ড' হচ্ছে এক রকমের মূর্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, আর 'একজন বান্ধবী' হচ্ছে রক্তমাংসের এক মানুষী। তাই দেখা যাচ্ছে, বিমূর্ত এ-সর্বনামটি দিয়ে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত বস্তু বা প্রাণীদেরও নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু আমরা যদি (৭ক)তে 'তা' দিয়ে 'একটি কার্ড'কে নির্দেশ করার সাথে 'সেটি' দিয়ে 'একটি কার্ড'কে নির্দেশ করার তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে এ-দুরকমের নির্দেশের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এ-পার্থক্য অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও আমরা ব্যবহারের সময় এ-পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন নই। আমরা সচেতন নই, তাতে বিশেষ কিছু যায়-আসে না; কেননা আমরা ব্যবহারকালে অসচেতনভাবেই এদের সুষ্ঠু প্রয়োগ করি। (৭ক)তে *তা* দিয়ে 'একটি কার্ড'কে নির্দেশ করার সময় আমরা কার্ডটিকে কার্ড হিশেবে না ধ'রে ধরি বস্তুস্বরূপে; কিন্তু আমরা যখন 'সেটি' ব্যবহার করি 'একটি কার্ড'কে নির্দেশ করার জন্যে, তখন কার্ডটিকে কার্ড হিশেবেই ধরা হয়, বস্তুস্বরূপে নয়। (৭খ)তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'তাকে' (⇐ '*সেকে') দিয়ে একটি অনির্দিষ্ট ও নির্বিশেষ মনুষ্যবাচক বিশেষ্যপদের ('একজন বান্ধবী') প্রতি নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু আমরা এ-বিশেষ্যপদটির প্রতি বিমূর্ত সর্বনাম '*তা*' নির্দেশ করতে পারি। (৭খ)তে 'একজন বান্ধবী' একটি মনুষ্যবাচক বিশেষ্যপদ; কিন্তু *তা* দিয়ে এ-আকর্ষণীয় সঙ্গিনীর প্রতি নির্দেশ করার সাথেসাথে সে বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। সে আর জীবন্ত সান্ধ্যসহচরী থাকে না, পরিণত হয় এক রোমাঞ্চকর উপহার সামগ্রীতে।

বাক্য এক রকম বিমূর্ত বস্তু। তই বাঙলাতে এ-বিমূর্ত সর্বনাম *তা*-ই বাক্যসর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। এ-সর্বনামটির কোনো বহুবাচনিক রূপ নেই। এর একমাত্র রূপ হচ্ছে *তা*। এ-একরূপ দিয়েই এটি একবচন ও বহুবচনবাচক বিশেষ্যপদের প্রতি নির্দেশ করে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(৮) ক আপনার *সিদ্ধান্তটি* চমৎকার, আর *তা* মানবিকও বটে।

খ আপনার *সিদ্ধান্তসমূহ* চমৎকার, আর *তা* মানবিকও বটে।

গ আপনার সিদ্ধান্তসমূহ চমৎকার, আর (* *তা*গুলো, * *তা*সমূহ, * *তা*রা] মানবিকও বটে

(৮ক)তে *তা* একটি একবাচনিক বিশেষ্যপদের প্রতি, এবং (৮খ)তে তা একটি বহুবাচনিক বিশেষ্যপদের প্রতি নির্দেশ করেছে। (৮গ)তে ব্যাকরণবিরুদ্ধ, কেননা *তা* এখানে কতিপয় ব্যাকারণবিরুদ্ধ বহুবাচনিক রূপ ধারণ করেছে।

বিমূর্ত সর্বনাম তার বাক্যিক ও আর্থ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(৯) তা : [+বিশেষ্য, +সর্বনাম, −প্রশ্নবোধক, ±নির্দিষ্ট, −মনুষ্যবাচক, ±বিমূর্ত, −সংখ্যাবাচক, −উত্তম, −মধ্যম,+ প্রথম,−সম্মানবাচক]

ওপরে *তা*র যে-বৈশিষ্ট্যগুলো সাংকেতিকভাবে দেয়া হলো, সেগুলো ব্যাখ্যা করে দেয়া যেতে পারে। বিশেষ্যর বাম পার্শ্বে যোগচিহ্ন জানাচ্ছে যে *তা* একটি বিশেষ্য এবং সর্বনামের প্রারম্ভে যোগচিহ্নও জানাচ্ছে যে এটি একটি সর্বনাম। 'প্রশ্নবোধক'-এর আগে বিয়োগ চিহ্ন জানাচ্ছে যে *তা* প্রশ্নবোধক নয়। 'নির্দিষ্ট'-এর আগে যৌথ যোগবিয়োগ চিহ্ন জানাচ্ছে যে সর্বনামটি ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্টতা, আর ক্ষেত্রবিশেষে অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ জানাচ্ছে যে *তা* মনুষ্যবাচক নয়, এটি একাধারে মূর্ত ও বিমূর্ত, এটি সংখ্যাবাচক নয় (অর্থাৎ-এর কোনো বহুবাচনিক রূপ নেই), এটি উত্তম বা মধ্যম পুরুষবাচক নয়, এটি প্রথম পুরুষবাচক, এবং এটি সম্মানবাচক নয়।

৬.২ বাক্য সর্বনামীয়করণের বিধিনিষেধ

বাক্য সর্বনামীকরণ নামে একটি প্রক্রিয়া বাঙলায় রয়েছে;—এ-প্রক্রিয়া ক্ষেত্রবিশেষে, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে, কোনো কোনো বাক্যকে সর্বনামে রূপান্তরিত করে। এ-প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় (২) উদাহরণের সর্বনাম *তা*। এখন আমি বের করতে চেষ্টা করবো কোন অভিমুখে এ-প্রক্রিয়া কাজ করে। অর্থাৎ দেখতে চেষ্টা করবো বাক্য সর্বনামীয়করণ সম্মুখমুখি না পশ্চাতমুখি নিয়ম। নিচের বাক্যগুলো বিবেচ্য :

(১০) ক তুমি জান যে *রাজনীতিবিদেরা স্বার্থপর*, আর আমিও জানি যে *রাজনীতিবিদেরা স্বার্থপর*।

খ তুমি জানো যে *রাজনীতিবিদেরা স্বার্থপর*, আর আমিও *তা* জানি।

গ *তুমি *তা* জানো, আর আমিও জানি যে *রাজনীতিবিদেরা স্বার্থপর*।

(১১) ক যদি বাদল জানতো যে *নাজু আসবে*, তবে সে আমাকে বলতো যে *নাজু আসবে*।

খ যদি বাদল জানতো যে *নাজু আসবে*, তবে সে আমাকে *তা* বলতো।

গ যদি বাদল *তা* জানতো, তবে সে আমাকে বলতো যে *নাজু আসবে*।

(১০ক) একটি যৌগিক সংযুক্ত বাক্য। এ-বাক্যটিতে দুটি সমনির্দেশক (অর্থাৎ সমার্থক ও সমাকৃতিক) সম্পূরক বাক্য রয়েছে। (১০ক)র প্রথম সংযোজকের সম্পূরক বাক্য হচ্ছে *রাজনীতিবিদেরা স্বার্থপর*, এবং দ্বিতীয় সংযোজকেরও সম্পূরক বাক্য *রাজনীতিবিদেরা স্বার্থপর*। এ-সম্পূরক বাক্য দুটি অর্থে ও আকৃতিতে অভিন্ন। (১০ক)তে আমরা প্রথম সংযোজকের সম্পূরক বাক্য দিয়ে দ্বিতীয় সংযোজকের সম্পূরক বাক্যটিতে সর্বনামে পরিণত করতে পারি। এখানে সর্বনামীয়করণ সম্ভব, কেননা আলোচ্য সম্পূরক বাক্য দুটি অর্থে ও আকারে অভিন্ন। যদি আমরা দ্বিতীয় সংযোজকের সম্পূরক বাক্যটিতে বাক্য সর্বনামীয়করণবশত বিমূর্ত সর্বনাম

তাতে পরিণত করি, তাহলে (১০খ) বাক্যটি পাই। যেহেতু (১০খ) একটি বিশুদ্ধ বাক্য, তাই ধ'রে নিতে পারি যে (১০ক)র মতো যৌগিক সংযুক্ত বাক্যে বাক্যসর্বনামীয়করণ প্রক্রিয়া সম্মুখাভিমুখে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বাক্যসর্বনামীয়করণ প্রক্রিয়া (১০ক)তে পশ্চাতাভিমুখে প্রয়োগ করি; অর্থাৎ আমরা যদি (১০ক)র দ্বিতীয় সংযোজকের সম্পূরকের সাহায্যে প্রথম সংযোজকের সম্পূরক বাক্যটিকে সর্বনামে পরিণত করি, তাহলে পাই অশুদ্ধ বাক্য (১০গ)। তাই দেখতে পাচ্ছি যে (১০ক)র মতো যৌগিক সংযুক্ত বাক্যে বাক্য সর্বনামীয়করণ প্রক্রিয়া কেবল সম্মুখাভিমুখেই প্রযুক্ত হয়; একে পশ্চাতাভিমুখে প্রয়োগ করা যায় না।

(১১ক) বাক্যটিতে বলতে পারি অধীনতামূলক সংযুক্ত বাক্য (১১ক)তে দুটি সম্পূরক বাক্য (*নাজু আসবে*) রয়েছে। এ-বাক্য দুটিও সমার্থক ও সমাকৃতিক। তাই (১১ক)তে বাক্য সর্বনামীয়করণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। (১১ক) বাক্যে আমরা যদি সর্বনামীয়করণ সূত্র সম্মুখাভিমুখে প্রয়োগ করি, তাহলে (১১খ) বাক্যটি পাই; আর এ-সূত্র যদি পশ্চাতাভিমুখে প্রয়োগ করি, তাহলে লাভ করি (১১গ) বাক্যটি। (১১খ, গ) উভয়ই শুদ্ধ বাক্য। যেহেতু (১১খ, গ) উভয়ই ব্যাকরণসম্মত, তাই বলতে পারি যে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র অধীনতামূলক সংযুক্ত বাক্যে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ—উভয়াভিমুখেই প্রয়োগ করা সম্ভব।

বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রযুক্ত হয় সম্পূরক বাক্যে, প্রধান বাক্যে নয়। ওপরে আমরা দেখেছি যে বাক্য সর্বনামীয়করণ সম্পূরক বাক্যে প্রযুক্ত হয়। এখন (১২)র বাক্যগুলো বিবেচ্য :

(১২) ক *বাদল জানে* যে নাজু আসবে, এবং *বাদল জানে* যে মাতিন আসবে।

খ *বাদল জানে* যে নাজু আসবে, এবং *তা* যে মাতিন আসবে।

(১২ক)তে প্রথম সংযোজকের প্রধান বাক্য *বাদল জানে*, আর দ্বিতীয় সংযোজকের প্রধান বাক্য *বাদল জানে* সমার্থক ও সমাকৃতিক। এদের মধ্যে সম্মুখাভিমুখে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগের ফলে দ্বিতীয় সংযোজকের প্রধান বাক্য বিমূর্ত সর্বনাম *তাতে* পরিণত হয়েছে, এবং (১২খ)র ব্যাকরণবিরুদ্ধ বাক্যটি জন্মেছে।

কোনো বাক্যে যদি দুটি *সমনির্দেশক* (সমার্থক ও সমাকৃতিক) সম্পূরক বাক্য থাকে, তাহলে সে-বাক্যে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ-শর্ত মিটলেই কোনো বাক্যে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব, নইলে নয়। বাক্য সর্বনামীয়করণের শর্ত (১৩)তে দেয়া হলো।

(১৩) বাক্য সর্বনামীয়করণের শর্ত :

> যদি কোনো বাক্যে দুটি সমার্থক এবং সমাকৃতিক সম্পূরক বাক্য থাকে, তাহলে ওই সম্পূরক বাক্য দুটির মধ্যে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ-সূত্রটি বাধ্যতামূলক নয়, তবে বাঞ্ছনীয় সূত্র। বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র যৌগিক

> সংযুক্ত বাক্যে কেবল সম্মুখাভিমুখে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এবং অধীনতামূলক সংযুক্ত বাক্যে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয়াভিমুখেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬.৩ বাঙলা সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার রূপরেখা

সম্পূরকীকরণ একটি অতি জটিল প্রক্রিয়া, এবং এ-জটিলতার সম্পূর্ণ রহস্যভেদ বর্তমান পরিচ্ছেদের সাধ্যাতীত। তাই এ-আলোচনা প্রয়োজনানুসারে সীমিত রাখা হবে। সম্পূরকীকরণ হচ্ছে এক বাক্যে আরেক বাক্য সংযোজনপ্রক্রিয়া। একটি সংযোজিত বাক্য বাক্যসংগঠনের রূপান্তরের ফলে নানারূপে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং তা বাক্যের বহির্তলে একটি পূর্ণ বাক্যের মতো দেখাতে নাও পারে। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণবইগুলো সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবেই নীরব (দ্র সুনীতিকুমার (১৯৩৯))। আমি এমন কোনো রচনা পাই নি, যাতে বাঙলা সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্যও আলোচনা আছে। কোনো রকমের জটিলতায় ঢোকার আগে আমি এমন কিছু বাক্যের উদাহরণ দিতে চাই, যেগুলোতে সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। (১৪, ১৫, ১৬)র বাক্যগুলো লক্ষণীয়।

(১৪) ক বাদল মনে করে যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে।
খ বাদল মনে করে এ-কথা যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে।

(১৫) ক আমি দুঃখিত যে দরজাটি বন্ধ।
খ আমি দুঃখিত এ-জন্য যে দরজাটি বন্ধ।

(১৬) ক এ-ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ যে সে গতকাল এসেছিলো।
খ এ-ঘটনা যে সে গতকাল এসেছিলো তাৎপর্যপূর্ণ।

(১৪, ১৫, ১৬ক) বাক্যগুলোর প্রতিটিতে একটি করে সম্পূরক বাক্য সংযোজিত বা গ্রথিত রয়েছে। এ-সম্পূরক বাক্যগুলো আসলে *এ-কথা, এ-ঘটনা, এ-বিষয়* ইত্যাদি রকমের বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সম্প্রসারিত অঙ্গ। এ-বিমূর্ত বিশেষ্যপদসমূহ গভীর তলে *নিরপেক্ষ* কারক রূপে অবস্থিত। (১৪, ১৫, ১৬ক) বাক্যসমূহকে, যথাক্রমে, (১৪, ১৫, ১৬খ) বাক্যসমূহ থেকে আহরণ করা হয়েছে। আমি যে-বিমূর্ত বিশেষ্যপদসমূহের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি, সেগুলো (১৪, ১৫, ১৬খ) বাক্যে উপস্থিত। (১৪খ)তে আমরা পাচ্ছি *এ-কথা*, (১৫খ)তে পাচ্ছি *এ-জন্য*, আর (১৬খ)তে পাচ্ছি *এ-ঘটনা*। ওপরের বাক্যগুলোতে সম্পূরক বাক্যগুলো যথাক্রমে এ-বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলোরই সম্প্রসারিত অঙ্গ বা সম্প্রসারণ। আমরা যদি ওপরের (খ) উদাহরণগুলো থেকে সম্পূরক বাক্যগুলো বাদ দিই, তাহলে নিচের বাক্যগুলো পাই :

(১৪) খ' বাদল মনে করে এ-কথা।

(১৫) খ' আমি দুঃখিত এ-জন্য।

(১৬) খ' এ-ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ।

(১৪খ)তে *এ-কথা* হলো কর্ম (১৫খ)তে *এ-জন্য* হলো কর্ম, এবং (১৬খ)তে *এ-ঘটনা* হচ্ছে কর্তা। তবে এ-বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলো অর্থগত দিক দিয়ে প্রায় শূন্য, তাই এগুলোর জন্যে অর্থসম্ভার দরকার। এগুলোর অর্থহীনতা ঘোচানোর জন্যে অর্থসম্ভার বহন করে সম্পূরক বাক্যগুলো। ওপরের বাক্যসমূহে সম্পূরক বাক্যগুলোর কাজ হলো অর্থশূন্য বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলোকে অর্থসম্ভার দিয়ে সাহায্য করা। এ-শ্রেণীর সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়াকে আমি *বিশেষ্যপদীয় সম্পূরকীকরণ* ব'লে অভিহিত করবো। এ-জাতীয় সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ায় সম্পূরক বাক্যগুলো কোনো-না-কোনো বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সম্প্রসারণ বা সম্প্রসারিত অঙ্গ।

রোজেনবাম (১৯৬৭) ইংরেজি সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার যে-বিশ্লেষণ দিয়েছেন, সে-বিশ্লেষণকে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী আজকাল সন্দেহের চোখে দেখছেন, এবং অনেকে ওই বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে তা বাতিল করে দিয়েছেন (দ্র স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩))। কিপারস্কি ও কিপারস্কি (১৯৭১) চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে ইংরেজি সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার যথার্থ বিশ্লেষণ দিতে হ'লে প্রধান বাক্যের বিধেয় বা ক্রিয়াপদের অর্থের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁরা ইংরেজি বিধেয়পদগুলোকে *ফ্যাক্টিভ* ও *ননফ্যাক্টিভ* এ-দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন, এবং দেখিয়েছেন যে বিধেয়সমূহের [±ফ্যাক্ট] বৈশিষ্ট্য সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ার গভীর বিশ্লেষণ দিতে পারে। সুতরাং তাঁরা ফ্যাক্টিভ ও ননফ্যাক্টিভ সম্পূরক বাক্যের জন্যে পৃথক গভীর তলীয় সংগঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে ফ্যাক্টিভ সম্পূরক বাক্যের গভীর তলীয় আকার হলো (১৭ক), আর ননফ্যাক্টিভ সম্পূরক বাক্যের গভীর তলীয় আকার হলো (১৭খ)।
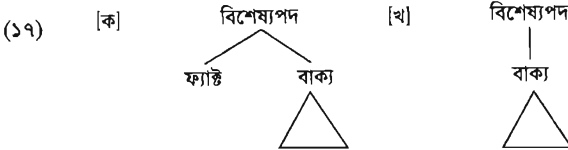
বাঙলা ভাষায় ফ্যাক্টিভ ও ননফ্যাক্টিভ, উভয় রকমের বিধেয়পদই রয়েছে। এ ছাড়াও আমাদের এমন কিছু বিধেয়পদ রয়েছে, যেগুলো ফ্যাক্টিভ-ননফ্যাক্টিভ বৈশিষ্ট্য-নিরপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'তাৎপর্যপূর্ণ' ও 'দুঃখিত' হচ্ছে ফ্যাক্টিভ, আর 'সম্ভবপর' ও 'সত্য' হচ্ছে ননফ্যাক্টিভ। কিপারস্কি ও কিপারস্কি (১৯৭১) দাবি করেছেন ফ্যাক্টিভ বিধেয় একমাত্র তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন বক্তা তাঁর ব্যবহৃত বিধেয়ের অন্তর্গত *বক্তব্যটিকে* সত্য বলে *পূর্বধারণা* করেন। আর ননফ্যাক্টিভ বিধেয় তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন বক্তা তাঁর বক্তব্যটিকে শুধুমাত্র সত্য ব'লে মনে করেন, বা বিশ্বাস করেন; কিন্তু বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে

বক্তা কোনো পূর্বধারণা পোষণ করেন না। কিপারস্কিরা কোন বিধেয়পদ ফ্যাক্টিভ আর কোনটি ননফ্যাক্টিভ, তা নির্ণয়ের কিছু উপায়ও দিয়েছেন। এ-বৈশিষ্ট্যনির্ণায়ক উপায়গুলোর মধ্যে 'নেতিকরণ' পরীক্ষা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বাক্যে ব্যবহৃত বিধেয়পদটি যদি ফ্যাক্টিভ হয়, তাহলে ওই বাক্যের 'ইতিবাচক' ও 'নেতিবাচক' উভয়রূপেই বক্তব্য সম্বন্ধে বক্তার পূর্বধারণা অভিন্ন বা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু বিধেয়পদটি যদি ননফ্যাক্টিভ হয়, তাহলে প্রধান বাক্যের বিধেয়পদটিকে নেতিকরণের সাথে সাথে বক্তব্যটি সম্বন্ধে বক্তার ধারণা বদলে যায়। (১৮, ১৯)-এর বাক্যগুলো লক্ষণীয় :

(১৮) ক আমি দুঃখিত যে বৃষ্টি হচ্ছে।

খ আমি দুঃখিত নই যে বৃষ্টি হচ্ছে।

(১৯) ক আমি মনে করি যে মাধুরী রূপসী।

খ আমি মনে করি না যে মাধুরী রূপসী।

(১৮ক) একটি ইতিবাচক বাক্য; এ-বাক্যটির প্রধান বাক্যের বিধেয়পদ হচ্ছে *দুঃখিত*। এ-বাক্যের বক্তব্য ('বৃষ্টি হচ্ছে') সম্বন্ধে বক্তার পূর্বধারণা হলো যে বক্তব্যটি সত্য। বৃষ্টি যে হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নেই। আমরা যদি (১৮ক)র প্রধান বিধেয়পদটিকে নেতিবাচক করে দিই, তাহলে (১৮খ) বাক্যটি পাই। (১৮খ)তে বৃষ্টি যে হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে শুধু বৃষ্টি হওয়া সম্বন্ধে বক্তার বিনয়ী মনোভাবটি বদলে গেছে। (১৮)র উভয় বাক্যেই বৃষ্টি যে হচ্ছে, এ-সম্বন্ধে বক্তা নিশ্চিত। এ-কারণেই *দুঃখিত* বিধেয়পদটি ফ্যাক্টিভ। (১৯ক) একটি ইতিবাচক বাক্য; এ-বাক্যটির প্রধান বক্যের বিধেয়পদ হচ্ছে *মনে কর*। এ-বাক্যের বক্তব্য সম্বন্ধে বক্তার দৃঢ় আস্থা নেই; অর্থাৎ বক্তা মাধুরীর রূপলাবণ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নন,. বক্তা এখানে কোনো রকম পূর্বধারণা বাদে শুধুমাত্র মনে করেন যে মাধুরী রূপসী। আমরা যদি (১৯ক)র প্রধান বিধেয়পদটিকে নেতিবাচক করে দিই, তাহলে (১৯খ) বাক্যটি পাই। (১৯খ)তে দেখতে পাচ্ছি যে *মনে কর* বিধেয়পদটিকে নেতিকরণের সাথেসাথে মাধুরীর রূপ সম্বন্ধে বক্তার মনোভাব বা ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। বক্তা আর মাধুরীকে রূপসী বলে মনে করেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে *মনে কর* এমন একটি বিধেয়পদ, যেটি দিয়ে বক্তব্য সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত পূর্বধারণা করা যায় না। এ-কারণেই *মনে কর* একটি ননফ্যাক্টিভ বিধেয়পদ।

কিপারস্কি ও কিপারস্কি (১৯৭১) ফ্যাক্টিভ ও ননফ্যাক্টিভ—এ-দু-রকমের সম্পূরক বাক্যের জন্যে দু-রকমের গভীর তলের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু বাঙলা ভাষায় ফ্যাক্টিভ ও ননফ্যাক্টিভ এ-দু-রকমের সম্পূরক বাক্যের মধ্যে কোনো আপাতপার্থক্য দেখা যায় না (তবে বাঙলায় এ-দু-রকমের সম্পূরক বাক্যের মধ্যে সুদূরপ্রসারী পার্থক্য রয়েছে। (§ ৬.৪-এ এ-পার্থক্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে)। কিপারস্কি ও কিপারস্কি (১৯৭১) প্রস্তাবিত ফ্যাক্টিভ বাক্যের

গভীর তল বাঙলা ভাষার ফ্যাক্টিভ ও ননফ্যাক্টিভ উভয় প্রকার সম্পূরক বাক্যের জন্যেই প্রয়োজন। আমি মনে করি যে বাঙলা ভাষায় ফ্যাক্টিভ ও ননফ্যাক্টিভ উভয় প্রকার সম্পূরক বাক্যই কোনো-না-কোনো বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সম্প্রসারিত অঙ্গ। কিপারস্কিদের প্রদত্ত ফ্যাক্টিভ সম্পূরক বাক্যের গভীর তলের যে-স্থান *দি ফ্যাক্ট* বিশেষ্যপদ দিয়ে পূর্ণ করা হয়, সে-স্থানে বাঙলায় ফ্যাক্টিভ ও ননফ্যাক্টিভ উভয় প্রকারের সম্পূরক বাক্যে ব্যবহৃত হয় *এ-ঘটনা, এ-কথা, এ-বিষয়, এ-জন্য* প্রভৃতি বিমূর্ত বিশেষ্যপদ। অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিশেষ্যের আপাতঅভাবে এ-বিশেষ্যপদের স্থান অধিকার করে *এ(ই)* নির্দেশকটি। আমি মনে করি যে উপরোক্ত রকমের বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলোই হচ্ছে বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যের *শির*। এ-সকল বিমূর্ত বিশেষ্যপদ বাক্যের গভীর তলে কোনো-না-কোনো কারকরূপে চিহ্নিত হয়। এ-সকল বিশেষ্যপদের কারক নির্ণীত হয় বাক্যের ক্রিয়াপদের সাথে তাদের সম্পর্কের দ্বারা। বাক্যের গভীর তলে এ-বিশেষ্যপদগুলো সাধারণত *নিরপেক্ষ* কারক সম্পর্কে ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কিত থাকে, তবে এগুলোর অন্যান্য, যেমন করণ বা অধিকরণ, কারকসম্পর্কও থাকতে পারে।'[১]

বাঙলা বিশেষ্যপদীয় সম্পূরকীকরণের গভীর তল হচ্ছে (২০) :

(২০)
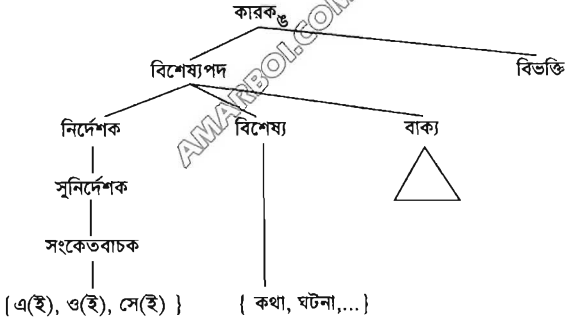
(২০)-এ কারক$_{ঙ}$ বিমূর্ত বিশেষ্যপদটির কারকসম্পর্ক নির্দেশ করছে। ঙ একটি বহুবোধক সংকেতচিহ্ন। (২০)-এর নির্দেশক বৃন্তটিকে বাঙলায় সাধারণত *এ(ই)* সংকেতবাচক *সুনির্দেশকটি* দিয়ে পূর্ণ করা হয়, তবে এটিকে অন্যান্য সুনির্দেশক, যেমন : *ও(ই), সে(ই),* দিয়েও পূর্ণ করা যেতে পারে। এ-তিনটি সুনির্দেশকের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে বক্তা তাঁর বক্তব্যটিকে কতোখানি নিজের নিকটবর্তী মনে করেন, তার ওপর। (২১)-এর উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(২১) ক আমি জানতাম {এ, ?ও, ?সে}-কথা যে তুমি আসবে।

খ আমি বলি নি {এ, ও, সে}-কথা যে তারা মিথ্যাবাদী।

(২১ক)র সম্পূরক বাক্যটি বক্তার প্রত্যক্ষ বোধ বা উক্তি, অন্য কারো বোধ, উক্তি বা রটনা নয়। এজন্যে আলোচ্য বিমূর্ত বিশেষ্যপদটিতে *এ* সুনির্দেশটির ব্যবহার স্বাভাবিক। (২১ক) বাক্যটিতে অস্বাভাবিক লাগে যদি আমরা দূরত্বজ্ঞাপক সুনির্দেশক *ও(ই)* বা *সে(ই)* ব্যবহার করি। এর কারণ হলো (২১ক)র সম্পূরক বাক্য *তুমি আসবে* হচ্ছে বক্তার প্রত্যক্ষ বোধ, তাই এ-বক্তব্যটি বক্তার 'নিকটবর্তী'। (২১খ) বাক্যে প্রধান বাক্যের কর্তা তাঁর উক্তি বলে রটানো একটি বক্তব্যকে অস্বীকার করছেন। এ-উক্তি যেহেতু তাঁর নয়, সেহেতু এটি তাঁর থেকে 'দূরবর্তী'। এ-জন্যেই (২১খ)তে এ(ই), ও(ই), সে(ই)র মাঝ থেকে যে-কোনো একটি সুনির্দেশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যগুলোর শির যে-বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলো, সেগুলোকে পরিস্থিতিবিশেষে ও কতিপয় শর্তসাপেক্ষে, বাক্য থেকে লোপ করা যেতে পারে। এগুলো যদি কোনো বাক্যের কর্তা না হয়, তবে এগুলোকে বাক্য থেকে পরিত্যাগ করা যায়, এবং সাধারণত পরিত্যাগ করা হয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(২২) ক বাদল লিখেছে একথা যে সে বাড়ি যাবে।
খ বাদল লিখেছে যে সে বাড়ি যাবে।

(২৩) ক একথা যে সে মন্ত্রী হবে বিস্ময়কর।
খ একথা বিস্ময়কর যে সে মন্ত্রী হবে।
গ * যে সে মন্ত্রী হবে বিস্ময়কর।
ঘ সে যে মন্ত্রী হবে, {একথা, তা} বিস্ময়কর।

(২২ক) বাক্যে *একথা* কর্ম; এ-বাক্যাটি থেকে *একথা* বিশেষ্যপদটিকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। (২২ক) থেকে *একথা* বাদ দিলে আমরা (২২খ) বাক্যটি পাই। (২৩ক)তে *একথা* কর্তা আর এজন্যেই এটিকে লোপ করা সম্ভব নয়। যদি (২৩ক) থেকে *একথা* লোপ করি, তাহলে অশুদ্ধ (২৩গ) বাক্যটি পাই। বাঙলায় যদি সম্পূরক বাক্যটি কর্তাবিশেষ্যপদের সম্পূরক হয়, তাহলে সম্পূরক বাক্যটিকে সাধারণত বাক্য-শেষে স্থানান্তরিত করা হয়। (২৩ক)র সম্পূরক বাক্যটিকে বাক্য-শেষে স্থানান্তরিত করলে (২৩খ) বাক্যটিকে পাওয়া যায়। (২৩ক) থেকে সম্পূরক বাক্যটিকে বাক্যাগ্রে স্থানান্তরিত করলে পাওয়া যায় (২৩ঘ)র বাক্য দুটি (দ্র § ৬.৪)। বাঙলা ভাষায় সাধারণত কোনো খণ্ডবাক্য বা বাক্যকে কর্তা হিশেবে ব্যবহার করা যায় না। ইংরেজিতে খণ্ডবাক্যকে বাক্যের কর্তা হিশেবে ব্যবহার করা যায়। বাঙলা ভাষায় যে বাক্যমূলক কর্তা ব্যবহার সম্ভব নয়, তা দেখা যেতে পারে (২৩গ) বাক্যে, যেটিতে '*যে সে মন্ত্রী হবে' বাক্যটিই পুরো বাক্যটির কর্তা হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-বাক্যটি ব্যাকরণবিরুদ্ধ, কেননা এটি থেকে বিমূর্ত বিশেষ্যপদ *একথা*কে লোপ করা হয়েছে।

এখন আমি ফিরে যাবো (১৪)-(১৬)র বাক্যগুলোর কাছে এবং দেখাবো কী প্রক্রিয়ায় এ-বাক্যগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এ-উদাহরণগুলোতে প্রত্যেক যুগ্মের (ক) বাক্যটি আহরিত বা সৃষ্ট

হয়েছে (খ) বাক্যটি থেকে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে (১৪খ)র মধ্যবর্তী গভীর তল হলো (২৪)।

(২৪)
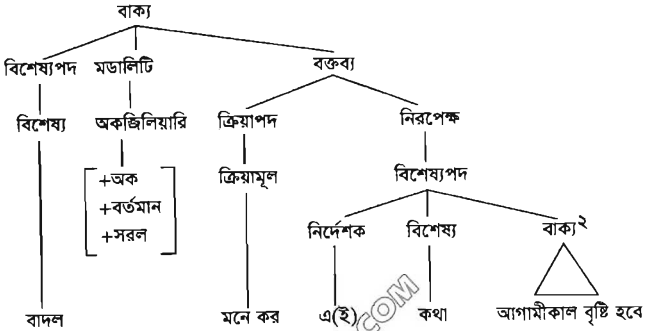
বাঙলা ভাষায় *সম্পূরকী* হচ্ছে *যে*। এটি রূপে-ধ্বনিতে সম্বন্ধবাচক সুনির্দেশক *যে* ও অগৌরববাচক সম্বন্ধাত্মক সর্বনাম *যের* সাথে অভিন্ন। এ-সম্পূরকীটিকে কেবল বিশেষ্যপদীয় সম্পূরকীকরণের সময় ব্যবহার করা হয়, আর এটিকে স্থাপন করা হয় সম্পূরক বাক্যের বাম পার্শ্বে। (২৪)-এ সম্পূরকীটিকে স্থাপন করা হবে সম্পূরক বাক্য *আগামীকাল বৃষ্টি হবের* বাম পার্শ্বে। বিভিন্ন রূপান্তরের পর (২৪) 'বাদল মনে করে এ(ই)কথা যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে' বাক্যটি সৃষ্টি করবে। (২৪) থেকে আমরা *এ(ই)-কথা* বিশেষ্যপদটিকে বাদ দিতে পারি। এটিকে পরিত্যাগ করলে পাওয়া যাবে 'বাদল মনে করে যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে' অর্থাৎ (১৪ক)র বাক্যটি। যদি আমরা *একথা* এবং *যে* উভয়কেই ত্যাগ করি তাহলে পাবো 'বাদল মনে করে আগামীকাল বৃষ্টি হবে' বাক্যটি।

(২৪)-এ *কর্ম স্থানান্তর* নামে একটি রূপান্তর প্রয়োগ করা যায়। এ-সূত্রটি প্রধান ক্রিয়াপদকে প্রধান বক্তব্যের শেষে স্থাপন করে, এবং সম্পূরক বাক্যটিকে প্রধান বাক্যের দক্ষিণতম অঙ্গ হিসেবে স্থাপন করে। এ-সূত্রের প্রয়োগে (২৪) থেকে পাবো 'বাদল একথা মনে করে যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে' বাক্যটি। এ-বাক্যটি ও এটির গঠন 'বাদল মনে করে একথা যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে' বাক্যটি ও তার গঠন থেকে সরলতর ও স্বাভাবিকতর।

এখন এমন একটি বাক্য বিবেচনা করবো, যাতে বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যের আশ্রয় যে-বিমূর্ত বিশেষ্যপদ, তা বাক্যের বহির্তলে কর্তা হিসেবে উপস্থিত। (১৬খ) হচ্ছে এমন বাক্য, যাতে বিমূর্ত বিশেষ্যপদটি বাক্যের কর্তা। (১৬খ)র মধ্যম তল হলো (২৫)

(২৫)
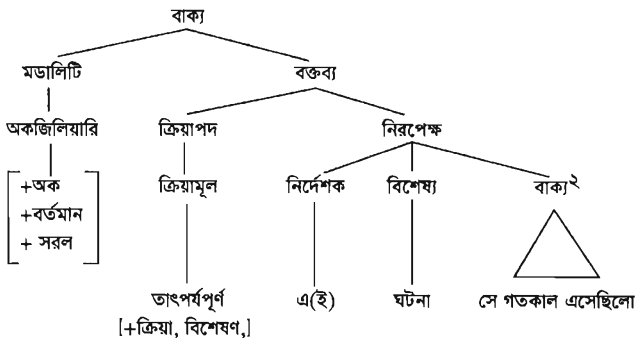
(২৫)-এ একটিমাত্র কারক রয়েছে : *নিরপেক্ষ* কারক। এতে একটি কারক থাকায় ওটির বিশেষ্যপদটিই বাক্যের কর্তা হবে। কর্তা চিহ্নিত করার যে-নিয়ম বাঙলায় রয়েছে, সে-নিয়ম নিরপেক্ষ কারকের অন্তর্গত বিশেষ্য পদটিকে বাক্যের কর্তা হিশেবে চিহ্নিত করবে, এবং কর্তা স্থাপনের সূত্র ওই বিশেষ্যপদটিকে ব্যক্যারম্ভে স্থানান্তরিত ও স্থাপন করবে। সম্পূরকীটিকে সম্পূরক বাক্যের বাঁ দিকে স্থাপন করা হবে। এ-সকল রূপান্তরের দ্বারা (২৫) রূপান্তরিত হবে (২৬)-এ।

(২৬)
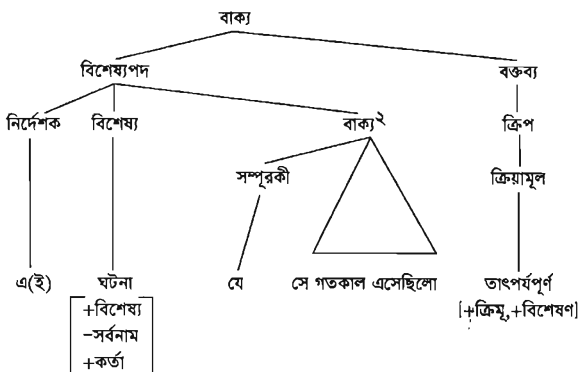
(২৬) সৃষ্টি করবে 'এ-ঘটনা যে সে গতকাল এসেছিলো তাৎপর্যপূর্ণ' বাক্যটি, অর্থাৎ (১৬খ)র বাক্যটি। এটি একটি শুদ্ধ, তবে অস্বস্তিকর বাক্য, অর্থাৎ এটি যদিও ব্যাকরণসম্মত, তবু এটি বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক বাক্য নয়। বাঙলাভাষীদের পক্ষে এ-বাক্যটির ব্যবহার একরকম দুর্লভ ব্যাপার। (২৬)-এ বাক্যের কর্তা একটি সম্পূরক বাক্য বহন করছে, এবং বাক্যের প্রারম্ভে রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষা এমন একটি প্রক্রিয়ার ব্যবহার করে, যাকে বলতে পারি কর্তা থেকে স্থানান্তর। এ-প্রক্রিয়াটি কর্তার অধীনস্থ সম্পূরক বাক্যকে বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত করে। যদি (২৬)-এর সম্পূরক বাক্যটিকে বাক্যশেষে স্থানান্তরিত করি, তাহলে পাই 'এ-ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ যে সে গতকাল এসেছিলো', অর্থাৎ (১৬ক)র বাক্যটি। (১৬ক) বাক্যটি (১৬খ) বাক্যটি থেকে অনেক বেশি স্বস্তিকর ও স্বাভাবিক। বাঙলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে এ-ভাষা সাধারণত *অধীন বাক্যকে* প্রধান বাক্যের শুরু বা শেষে স্থানান্তরিত করে।

আমি এখন অন্য একরকমের সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়া বিবেচনা করবো। এ-প্রক্রিয়া বিশেষ্যপদীয় সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়া থেকে নানাভাবে পৃথক। এ-ধরনের সম্পূরক বাক্যকে বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যের মতো কোনো বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সম্প্রসারণ ব'লে বিবেচনা করা যায় না। এ-সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ায় আমরা সম্পূরকীটিকে (*যে*) ব্যবহার করতে পারি না। এ-প্রক্রিয়ায় আবশ্যিকভাবে সম্পূরক বাক্যে *তে-অসমাপিকাভবন* ক্রিয়াশীল হয়। এ-রকম সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়াকে *অসমাপিকা সম্পূরকীকরণ* বলতে পারি। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচ্য :

(২৭) ক ডাক্তার বাদলকে দেখতে লাগলেন।

খ *ডাক্তার লাগলেন এ-কাজে যে ডাক্তার বাদলকে দেখলেন।

গ *ডাক্তার লাগলেন যে ডাক্তার বাদলকে দেখলেন।

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে (২৭ক)র মতো বাক্যকে সরল বাক্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এবং 'দেখতে লাগ', 'করতে লাগ', 'বলতে থাক' প্রভৃতি ভাষাবস্তুদের এক-একটি ক্রিয়ামূল ব'লে ধরা হয়। কিন্তু (২৭ক) ধরনের বাক্যকে কিছুতেই সরল বাক্য হিশেবে ধরা যেতে পারে না; এবং 'দেখতে লাগ'-এর মতো বস্তুদেরও একক ক্রিয়ামূল হিশেবে বিবেচনা করা অনুচিত। (২৭ক) হচ্ছে অসমাপিকা সম্পূরকীকরণ প্রক্রিয়ায় গঠিত একটি মিশ্র বাক্য। এ-রকম মিশ্র বাক্যে প্রধান ক্রিয়ামূলটি সাধারণত হয় 'মডাল-আসপেকশ্চুয়াল'। এ-রকম ক্রিয়ামূল্যের উদাহরণ হচ্ছে লাগ্, পার্, থাক্ ইত্যাদি। এ-সকল ক্রিয়ামূল অনিবার্যভাবে সম্পূরক বাক্যের ক্রিয়াকে তে-অসমাপিকা ক্রিয়াপদে পরিণত করে। অসমাপিকা সম্পূরক বাক্যের গভীর তল হচ্ছে (২৮)।

(২৮)

বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যের গভীর তলের সাথে অসমাপিক্য সম্পূরক বাক্যের গভীর তলের পার্থক্য এখানে যে দ্বিতীয় ধরনের বাক্যে *একথা, এ-ঘটনা* ধরনের বিমূর্ত বিশেষ্যপদ উপস্থিত থাকে না।

(২৭ক) বাক্যটির মধ্যম তল হলো (২৯)।

(২৯)

বাক্য
বিশেষ্যপদ মডালিটি বক্তব্য
বিশেষ্য অকজিলিয়ারি ক্রিয়াপদ নিরপেক্ষ
[+অক, + অতীত, + সরল]
ক্রিয়ামূল বিশেষ্যপদ
বাক্য ২
বিপ মডালিটি বক্তব্য
বি অকজিলিয়ারি ক্রিপ ড্যাটিভ
বিপ বিভক্তি
বি

ডাক্তার লাগ ডাক্তার দেখ বাদল

[+ ক্রিমূ, –বিশেষণ,
+ আসপেকচুয়াল,
+ বাক্য, তে-অসমাপিকাভবন,
+ প্রধান ও সম্পূরক বাক্যের কর্তা সমনির্দেশক]
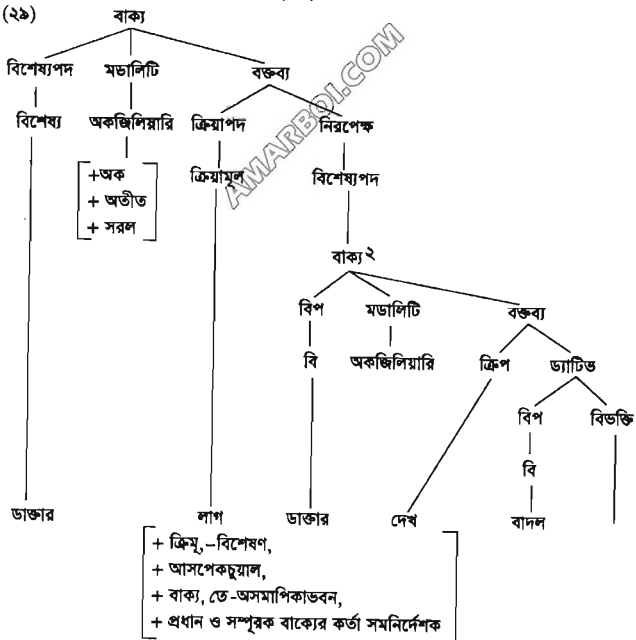
(২৯)-এ সম্পূরক বাক্যের অকজিলিয়ারিটিকে অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে, কেননা প্রধান বাক্যের ক্রিয়াটির (*লাগ*) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সম্পূরক বাক্যের ক্রিয়াকে অসমাপিকায় পরিণত করে। সম্পূরক বাক্যের কর্তা এবং প্রধান বাক্যের কর্তা সমনির্দেশক, অর্থাৎ একই ব্যক্তি। এ-কারণে সম্পূরক বাক্যের কর্তাটি লোপ পাবে। আর এ-রকম সম্পূরকীকরণ যেহেতু সম্পূরকী স্থাপন করতে দেয় না, সেহেতু *সম্পূরকীস্থাপন* (*যে-স্থাপন*) প্রক্রিয়াও এখানে কার্যকর হবে না। তাই কর্তা ও অকজিলিয়ারির মধ্যে সঙ্গতিসূত্র কার্যকর হ'তে পারবে না। এর বদলে সম্পূরকের অকজিলিয়ারিতে অসমাপিকার চিহ্ন *তে* বসবে। এসব সূত্র প্রয়োগের ফলে (২৯) রূপান্তরিত হবে (৩০)-এ।

(৩০)

বাক্য
বিশেষ্যপদ বক্তব্য
বিশেষ্য ক্রিয়াপদ বক্তব্য[২]
ক্রিমূ অকজিলিয়ারি ড্যাটিভ ক্রিয়াপদ
[+অক, +অতীত, +সরল, +প্রথম, +সম্মান] বিপ বিভক্তি ক্রিমূ অকজিলিয়ারি
বিশেষ্য
ডাক্তার লাগ লেন বাদল কে দেখ তে
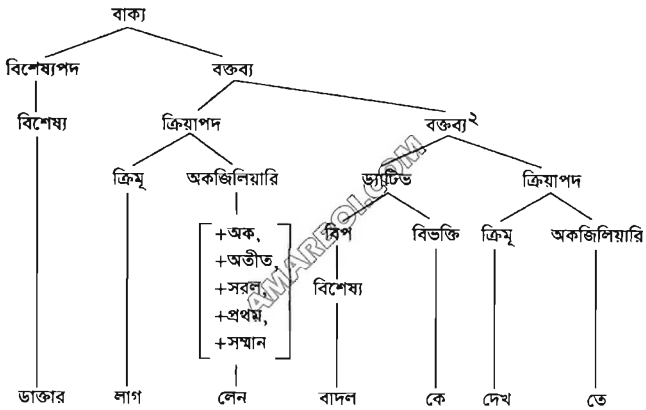
আমরা (৩০) থেকে পাবো 'ডাক্তার লাগলেন বাদলকে দেখতে', অর্থাৎ ভিন্নাকারে (২৭ক) বাক্যটি। বাঙলায় সমাপিকা ক্রিয়াপদ সাধারণত বাক্য-শেষে বসে। যদি (৩০)-এর বাক্যের ক্রিয়াপদটিকে বাক্য-শেষে স্থানান্তরিত করি, তাহলে (২৭ক) বাক্যটি পাই। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে (২৭ক)র মতো বাক্যকে *সরল বাক্য* ব'লে গণ্য করা হয়, কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে যে এরকম বাক্যকে সরল বাক্য ব'লে বিবেচনা করা যেতে পারে না। এরকম বাক্য মূলত *মিশ্র বাক্য*। এ-সকল বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের বাহ্যিক রূপ দেখে ভ্রান্তি জন্মে যে 'করতে লাগ', বা 'বলতে থাক'-এর মতো সংলগ্ন ক্রিয়ারূপগুলো যেনোবা এক-একটি ক্রিয়ামূল। আমার বিশ্লেষণে এরা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ারূপ, যারা অনেকটা আকস্মিকভাবে পরস্পরসংলগ্ন হয়ে বিভ্রান্তি উৎপাদন করে।

৬.৪ বাক্য সর্বনামীয়করণ

আমি এ-পর্যন্ত ধ'রে নিয়েছি যে *বাক্য সর্বনামীয়করণ* নামে একটি সূত্র বা প্রক্রিয়া বাঙলায় রয়েছে। এ-সূত্রটি (১৩)তে দেয়া শর্তানুসারে একটি সম্পূরক বাক্যের সাহায্যে অপর একটি সম্পূরক বাক্যকে বিমূর্ত সর্বনামে (*তা*) পরিণত করে। এ-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সম্পূরক বাক্যগুলোকে সমার্থক ও সমাকৃতিক হ'তে হবে। যখন দুটি সম্পূরক বাক্য সমার্থক ও সমাকৃতির হয়, তখন আমি তাদের *সমনির্দেশক* বলবো।

বাক্য সর্বনামীয়করণের সূত্রটি নিম্নরূপ :

(৩১) বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র

> যদি কোনো বাক্যে দুটি সম্পূরক বাক্য থাকে, এবং সেগুলো যদি (১৩)তে দেয়া শর্ত পূরণ করে, তাহলে একটির সাহায্যে অন্যটিকে সর্বনামে রূপান্তরিত করা যায়। সর্বনামীয়কৃত সম্পূরক বাক্যটি বাক্যের বহির্তলে বিমূর্ত সর্বনাম *তা* রূপে দেখা দেয়।

আমি প্রথমে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্রটি বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যে প্রয়োগ করবো, এবং দেখাবো(২)-এর মতো বাক্যগুলো কীভাবে উৎপন্ন হয়। এ-ধরনের বাক্যকে দুভাবে গঠন করা যেতে পারে। প্রথম উপায়টি হচ্ছে বাক্য সর্বনামীয়করণ। আমরা প্রথমে দেখবো কীভাবে সর্বনামীয়করণ সূত্র দ্বারা এরকম বাক্য গঠন করা যায়। নিচের বাক্যগুলো বিবেচ্য :

(৩২) ক হাসান মনে করে একথা যে *বাঙালিরা অসুখী*, আর কেতকীও মনে করে একথা যে *বাঙালিরা অসুখী*।

খ হাসান মনে করে (একথা) যে *বাঙালিরা অসুখী*, আর কেতকীও *তা* মনে করে।

গ *হাসান *তা* মনে করে, আর কেতকীও মনে করে (একথা) যে *বাঙালিরা অসুখী*।

(৩২ক) একটি যৌগিক সংযুক্ত বাক্য। এটিতে দুটি সমনির্দেশক সম্পূরক বাক্য (বাঙালিরা অসুখী) রয়েছে। যদি বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র (৩২ক)তে সম্মুখমুখে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আমরা (৩২খ) বাক্যটি পাই। এটি একটি ব্যাকরণসম্মত বাক্য। বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্রটি যদি (৩২ক)তে পশ্চাতাভিমুখে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আমরা (৩২গ)র অশুদ্ধ বাক্যটি পাই। তবে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র (৩২ক) বাক্যের সন্নিকতটম গভীর তলে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। যদি আমরা সূত্রটি (৩২ক)র সন্নিকটতম গভীর তলে প্রয়োগ করি, তাহলে (৩২ঘ)র অশুদ্ধ বাক্যটি পাবো।

(৩২) ঘ *হাসান মনে করে একথা যে *বাঙালিরা অসুখী*, আর কেতকীও একথা *তা* মনে করে।

(৩২ঘ) বাক্যটির অশুদ্ধির কারণ হলো সর্বনামীয়কৃত বাক্যে বিমূর্ত বিশেষ্যপদ 'একথা'র উপস্থিতি। যদি এ-বিশেষ্যপদটি এ-বাক্যে না থাকতো, তাহলে (৩২ঘ) শুদ্ধ বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে সর্বনামীয়করণসম্ভব বাক্য থেকে বিমূর্ত বিশেষ্যপদ ও সম্পূরকীয় (*যে*) লোপের পরেই শুধু বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে। বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্রের প্রয়োগের ফলে একটি সম্পূরক বাক্য বিমূর্ত সর্বনাম *তাতে* পরিণত হয়। বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগের সময় (৩২ক)র মধ্যম তল হবে (৩৩)।

(৩৩)

বাক্য

বাক্য^{১} সংযুক্ত বাক্য^{২}

বিশেষ্যপদ বক্তব্য বিশেষ্যপদ বক্তব্য

বিশেষ্য ক্রিপ নিরপেক্ষ বিশেষ্য পৌনপুনিক ক্রিপ নিরপেক্ষ

বিপ বিপ

নির্দেশক বি বাক্য^{৩} বাক্য^{৪}

হাসান মনে করে এ(ই) কথা বাঙালিরা অসুখী কেতকী মনে করে বাঙালিরা অসুখী
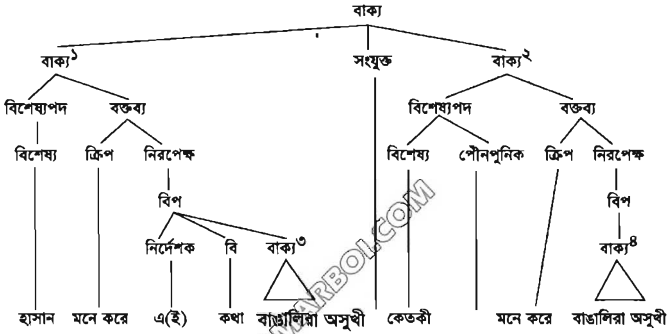
(৩৩) সংগঠনে বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র সম্মুখাভিমুখে প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ এ-সূত্রটি বাক্য$_{৩}$-এর সাহায্যে বাক্য$_{৪}$-কে বিমূর্ত সর্বনামে পরিণত করবে। বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র বাক্য$_{৪}$-এর বাক্যপরিচিতি লোপ করে দেবে, আর ওই বাক্যের ওপরস্থ বিশেষ্যপদের নিচে [+সর্বনাম,+বাক্য] বৈশিষ্ট্যসমূহ সংকলিত করবে। বাক্য সর্বনামীকরণ ও অন্যান্য রূপান্তর প্রয়োগের ফলে (৩৩) রূপান্তরিত হবে (৩৪)-এ।

(৩৪) সৃষ্টি করবে 'হাসান মনে করে এ(ই) কথা যে বাঙালিরা অসুখী, আর কেতকীও তা মনে করে তা', অর্থাৎ ভিন্নাকারে (৩২খ) বাক্যটি। (৩৪)-এ আমরা যদি বাক্য$_{২}$-এর সমাপিকা ক্রিয়ারূপটিকে বাক্য-শেষে বসাই, তাহলে (৩২ক) বাক্যটি পাবো। এছাড়া অন্যান্য রূপান্তরের সাহায্যে আমরা (৩৪) থেকে (৩৫)-এর বাক্যগুলোও পাবো।

(৩৫) ক হাসান মনে করে বাঙালিরা অসুখী, আর কেতকীও তা মনে করে।

খ হাসান একথা মনে করে যে বাঙালিরা অসুখী, আর কেতকীও তা মনে করে।

গ হাসান মনে করে বাঙালিরা অসুখী, আর কেতকীও তা মনে করে।

(৩৪)
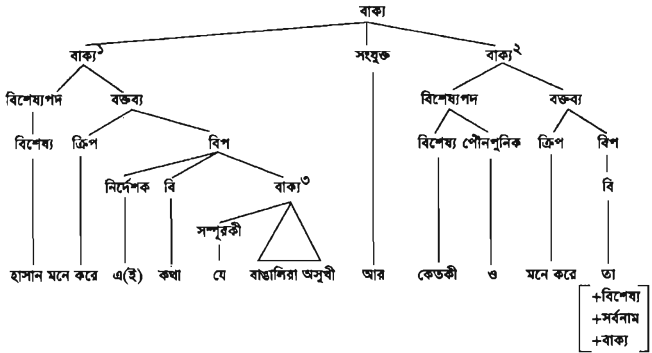
আমি ওপরে যে-বিশ্লেষণ দিয়েছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে বাঙলায় বাক্য সর্বনামীয়করণ নামে একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। এ-প্রক্রিয়া বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটি সম্পূরক বাক্যের সাহায্যে অপর একটি সমনির্দেশক সম্পূরক বাক্যকে বিমূর্ত সর্বনামে পরিণত করে। এখন আমি এমন এক বিকল্প বিবেচনা করবো, যার সাহায্যে বিমূর্ত সর্বনাম *তা* উৎপন্ন হ'তে পারে, এবং অপর এক বাক্যের প্রতি নির্দেশ করতে পারে। এ-প্রক্রিয়ায় *তা* বাক্য সর্বনামীয়করণের ফলে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্ট হয় অন্য এক উপায়ে। আমি পুনরায় (৩২খ) বাক্যে *তা* সর্বনামটির উদ্ভবের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করবো। ওপরের বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে *তা* সর্বনামটি সম্মুখমুখি সম্পূরক বাক্যের সর্বনামীয়করণের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু বিকল্প এক উপায়ে আমরা (৩২ক) থেকে (৩৬)-এর বাক্যগুলো পেতে পারি।

(৩৬) ক হাসান মনে করে একথা যে বাঙালিরা অসুখী, আর কেতকীও মনে করে একথা।

খ হাসান মনে করে একথা যে বাঙালিরা অসুখী, আর কেতকীও মনে করে তা।

গ হাসান মনে করে একথা যে বাঙালিরা অসুখী, আর কেতকীও মনে করে।

আমরা যদি (৩২ক) বাক্যের সম্মুখস্থ সংযোজকের অন্তর্গত সম্পূরক বাক্যটিকে সম্পূরকীসহ পরিত্যাগ করি (কেননা এটি প্রথম সংযোজকের অন্তর্গত সম্পূরক বাক্যের সাথে সমার্থক ও সমাকৃতিক), তাহলে (৩৬ক) বাক্যটি পাই। (৩৬ক) বাক্যের সম্মুখস্থ সংযোজকে 'একথা' বিশেষ্যপদটি উপস্থিত রয়েছে। এ-বাক্যে 'একথা' নির্দেশ করছে 'বাঙালিরা অসুখী' বাক্যের প্রতি। এখন আমরা যদি (৩৬ক)র সম্মুখস্থ সংযোজকের 'একথা' বিশেষ্যপদটিকে বিমূর্ত সর্বনাম *তা*তে পরিণত করি, তাহলে পাই (৩৬খ) বাক্যটি। (৩৬খ)র উপাদানগুলোকে

পুনর্বিন্যাস করার পর পাই (৩৬গ) বাক্যটি। এ-বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে যে (৩২ক) থেকে (৩২খ) ও (৩৫গ) পাওয়ার জন্যে বাক্য সর্বনামীয়করণ রূপান্তরের কোনো প্রয়োজন নেই। এ-বাক্যগুলোকে সহজেই সৃষ্টি করতে পারি, যদি (৩২ক)র সম্মুখস্থ সংযোজকের সম্পূরক বাক্যটিকে পরিত্যাগ করি এবং 'একথা' বিশেষ্যপদটিকে সর্বনামে রূপান্তরিত করি। আমার দ্বিতীয় সমাধানই অধিকতর গ্রহণীয়, কেননা তা সরলতর ও স্বাভাবিকতর।

বাঙলা ভাষায় এক শ্রেণীর বাক্য রয়েছে, যাতে বিমূর্ত সর্বনাম *তা* ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ওই *তা*কে কোনোক্রমেই বাক্য সর্বনামীয়করণের ফলে উৎপন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। এ-শ্রেণীর বাক্যগুলো প্রমাণ করে যে ওপরের বাক্যগুলোকে *তা* বাক্য সর্বনামীয়করণের ফলে উদ্ভূত হয়নি। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করুন :

(৩৭) ক কেতকী যে রূপসী, *তা* আমি জানি।

খ তুমি মিথ্যাবাদী, *তা* আমি বলিনি।

গ বাদল যে বাড়ি গেছে, *তা* তাৎপর্যপূর্ণ।

ওপরের প্রতিটি বাক্যে সম্পূরক বাক্য রয়েছে একটি ক'রে, তাই এগুলোতে *তা* বাক্য সর্বনামীয়করণ ফলে উদ্ভূত হ'তে পারে না। এ-বাক্যগুলো কিপারস্কিদের (১৯৭১, ৩৬১) নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলোর মতো।

(৩৮) ক বিল রিজেন্টস্ *ইট* দ্যাট পিপ্‌ল আর অলওয়েজ কমপ্যারিং হিম টু মোৎসার্ট।

খ দে ডিড নট মাইন্ড *ইট* দ্যাট এ ক্রাউড ওয়াজ বিগিনিং টু গ্যাদার ইন দি স্ট্রিট।

কিপারস্কি ও কিপারস্কি (১৯৭১) দাবি করেছেন যে (৩৮)-এর বাক্য দুটিতে *ইট* উদ্ভূত হয়েছে ফ্যাকটিভ সম্পূরক বাক্যের আশ্রয় *দি ফ্যাক্ট*-এর সর্বনামে রূপান্তরের ফলে। স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩, ৫৫১-৫৩) কিপারস্কিদের দাবির বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। আমি মনে করি যে (৩৭)-এর বাক্যগুলোতে তা উদ্ভূত হয়েছে বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যের আশ্রয় বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলোর সর্বনামে রূপান্তরের ফলে। বাঙলাভাষী মাত্রেই বুঝতে পারবেন যে (৩৭)-এর বাক্যগুলোর সাথে (৩৯)-এর বাক্যগুলো সম্পর্কিত।

(৩৯) ক { আমি জানি একথা যে কেতকী রূপসী।
আমি একথা জানি যে কেতকী রূপসী।

খ { আমি বলি নি একথা যে তুমি মিথ্যাবাদী।
আমি একথা বলি নি যে তুমি মিথ্যাবাদী।

গ { এ-ঘটনা যে বাদল বাড়ি গেছে তাৎপর্যপূর্ণ।
এ-ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ যে বাদল বাড়ি গেছে।

ওপরের বাক্যসমূহের সম্পূরক বাক্যগুলো 'একথা', 'এ-ঘটনা' ইত্যাদি বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সম্প্রসারণ। বাঙলা ভাষায় একটি নিয়ম রয়েছে, যা বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যকে বাক্যারম্ভে স্থানান্তরিত করে। এ-নিয়মটি সাধারণত অন্য একটি নিয়মের সাথে মিলিত হয়ে প্রযুক্ত হয়। এ-অন্য নিয়মটি সাধারণত সম্পূরক বাক্যের মধ্যে, কোনো একটি প্রধান উপাদানের আগে, সম্পূরকী *যে* স্থাপন করে। সম্পূরকীটিকে সম্পূরক বাক্যের অভ্যন্তরে সাধারণত তখনই স্থাপন করা হয়, যখন বক্তা সম্পূরক বাক্যের বক্তব্যে বিশেষভাবে বিশ্বাস করেন। অন্যথায় সম্পূরকীটিকে পরিত্যাগ ক'রে সম্পূরক বাক্যটিকে সমগ্র বাক্যের প্রারম্ভে স্থাপন করা হয়। আমি মনে করি যে প্রধান বাক্যের বিধেয়পদটি যদি ফ্যাকটিভ হয়, তাহলেই শুধু সম্পূরকীটিকে সম্পূরক বাক্যের অভ্যন্তরে স্থাপন করা সম্ভব। এখানে এ-প্রক্রিয়ার সমস্ত জটিলতার মধ্যে আমি যাবো না। তবে ওপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়াসমূহ (৩৯)-এর বাক্যগুলোকে, যথাক্রমে, (৪০)-এর বাক্যগুলোকে রূপান্তরিত করবে।

(৪০) ক কেতকী যে রূপসী
কেতকী রূপসী } , একথা আমি জানি।

খ ?তুমি যে মিথ্যাবাদী
তুমি মিথ্যাবাদী } , একথা আমি বলি নি।

গ বাদল যে বাড়ি গেছে
বাদল বাড়ি গেছে } , এ-ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ।

(৪০)-এর প্রত্যেক যুগ্মের প্রথম বাক্যান্তর্গত সম্পূরক বাক্যে অভ্যন্তরে সম্পূরকী *যে* উপস্থিত। এটির উপস্থিতি জানাচ্ছে বক্তা সম্পূরক বাক্যটির বক্তব্যের সত্যতায় বিশেষভাবেই আস্থাশীল। ওপরের যে-বাক্যগুলোতে *যে* উপস্থিত নেই, সেগুলোর সত্যতায় বক্তা বিশেষ আস্থাশীল নন। (৪০খ)র '?তুমি *যে* মিথ্যাবাদী, একথা আমি বলি নি' বাক্যটি অর্থের দিক দিয়ে স্ববিরোধী। এটির সম্পূরক বাক্যে *যে*-র উপস্থিতিতে আমরা বোধ করি যে বক্তা শ্রোতাকে সত্যই মিথ্যাবাদী ব'লে মনে করেন, আবার নেতিবাচক প্রধান বাক্যটি এ-বিশ্বাসকে অস্বীকার করছে। (৪০)-এর বাক্যগুলোর প্রধান বাক্যে আমরা 'একথা', 'এ-ঘটনা' ইত্যাদি বিমূর্ত বিশেষ্যপদের উপস্থিতি দেখতে পাই। এ-বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলোকে ঐচ্ছিকভাবে আমরা বিমূর্ত সর্বনাম *তা*-তে পরিণত করতে পারি। আমরা যদি এ-সকল বিমূর্ত বিশেষ্যপদকে বিমূর্ত সর্বনাম *তা*-তে পরিণত করি, তাহলে (৪০) থেকে, যথাক্রমে, (৪১)-এর বাক্যগুলো পাই।

(৪০) ক কেতকী যে রূপসী
কেতকী রূপসী } , *তা* আমি জানি।

খ ?তুমি যে মিথ্যাবাদী
তুমি মিথ্যাবাদী } , *তা* আমি বলি নি।

গ   বাদল যে বাড়ি গেছে }
বাদল বাড়ি গেছে } , *তা* তাৎপর্যপূর্ণ।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে (৩৭) ও (৪১)-এ তা উদ্ভূত হয়েছে বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যের আশ্রয় যে-বিমূর্ত বিশেষ্যপদ, সেগুলোর সর্বনামে রূপান্তরের ফলে। এ-বাক্যগুলো আমাদের দাবি সমর্থন করছে যে (৩২খ) ও (৩৬খ, গ)র *তা* বাক্য সর্বনামীয়করণের ফলে উদ্ভূত হয় নি। এ-সকল বাক্যে *তা*-র উদ্ভব ঘটেছে বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যের বিমূর্ত বিশেষপদগুলোর সর্বনামে রূপান্তরের ফলে। আমরা বলতে পারি যে-সকল বাক্যে সমনির্দেশক বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্য থাকে, সেগুলোতে কখনো বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রযুক্ত হয় না। সুতরাং আমরা (২৩ ও (৩১)-এর প্রদত্ত সূত্রগুলো পরিত্যাগ করতে পারি। ওগুলোর পরিবর্তে আমদের প্রয়োজন (৪২)-এর সূত্রটি।

(৪২) সম্পূরক বাক্য লোপ, এবং বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণ

> যদি কোনো বাক্যে দুটি সমনির্দেশক বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্য থাকে, তাহলে তাদের একটিকে লোপ করে ওই বাক্যটির আশ্রয় যে-বিমূর্ত বিশেষ্যপদ, সেটিকে বিমূর্ত সর্বনাম *তা*-তে পরিণত করা যায়। এ-সূত্র যৌগিক সংযুক্ত বাক্যে সম্মুখাভিমুখে, আর অধীনতামূলক সংযুক্ত বাক্যে সম্মুখ-পশ্চাৎ, উভয়াভিমুখেই প্রযুক্ত হয়।

আমি এবার কতিপয় *অসমাপিকা সম্পূরকীকরণমূলক* বাক্য বিবেচনা করবো, এবং অনুসন্ধান করবো কী উপায়ে এ-সকল বাক্যে বিমূর্ত সর্বনাম *তা*-র উদ্ভব ঘটে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষণীয় :

(৪৩) ক   মাতিন *গান গাইতে* পরে, আর মিনুও *তা* পারে।

খ   মাতিন *গান গাইতে* পারে, আর মিনুও *গান গাইতে* পারে।

গ   বাক্য [বাক্য [মাতিন পারে বাক্য [*মাতিন গান গায়*]] সংযুক্ত বাক্য [মিনু পারে বাক্য [*মিনু গান গায়*]]]

(৪৩ক) বাক্যে *তা* প্রথম সংযোজকের *গান গাইতে*র প্রতি নির্দেশ করছে। (৪৩ক) বাক্যটি (৪৩খ) বাক্যটির সাথে সম্পর্কিত। এ-বাক্যের উভয় সংযোজকেই বিশেষ্যীকৃত বাক্য 'গান গাইতে' উপস্থিত। আমরা যেভাবে (৪৩ক) বাক্যটির অর্থ বুঝি, তাতে মনে হয় যে (৪৩খ)র দ্বিতীয় সংযোজকের 'গান গাইতে'র সর্বনামীয়করণের ফলেই (৪৩ক)র *তা* উদ্ভূত হয়েছে। (৪৩ক, খ) অসমাপিকা সম্পূরকীকরণের ফলে সৃষ্ট দুটি বাক্য। সুতরাং এ-সকল বাক্যের গভীর তলে 'একথা', 'এ-ঘটনা' ইত্যাদি বিমূর্ত বিশেষ্যপদ উপস্থিত থাকতে পারে না (দ্র § ৬.৩)। এ-কারণেই আমরা দাবি করতে পারি না যে (৪৩ক)তে *তা* বিমূর্ত বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং (৪৩ক) বাক্যে *তা* উদ্ভূত হতে পারে শুধুমাত্র (৪৩খ)র দ্বিতীয় সংযোজকের 'গান গাইতে'র সর্বনামীয়করণের ফলে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো

যে আমরা 'গান গাইতে'র সর্বনামীয়করণকে বাক্য সর্বনামীয়করণ বলে বিবেচনা করবো কি-না। 'গান গাইতে' কোনো পূর্ণ বাক্য নয়, এটি *বিশেষ্যীকরণ*-এর ফলে উদ্ভূত একটি বিমূর্ত বিশেষ্যপদ। সুতরাং এর সর্বনামীয়করণকে বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণ ব'লে বিবেচনা করাই সঙ্গত। আমি মনে করি যে (৪৩খ) বাক্যের প্রথম সংযোজকের বিশেষ্যীকৃত বিশেষ্যপদ 'গান গাইতে'র সাহায্যে দ্বিতীয় সংযোজকের বিশেষ্যীকৃত বিশেষ্যপদ 'গান গাইতে'র সর্বনামীকরণের ফলেই (৪৩ক)র *তা* উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে-সকল বাক্য অসমাপিকা সম্পূরকীকরণের ফলে উদ্ভূত, সে-সকল বাক্যে বিমূর্ত সর্বনাম 'তা' বাক্য সর্বনামীকরণের ফলে উদ্ভূত হয় না। এরকম বাক্যে (দ্র (৪৩ক)) *তা* উদ্ভূত হয় বিশেষ্যীকৃত বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণের ফলে। আমরা আগেই দেখেছি বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্যেও বাক্য সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রযুক্ত হয় না। এখন দেখছি অসমাপিকা সম্পূরকীকরণজাত বাক্যেও এ-সূত্র ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে বাঙলা ভাষায় বাক্য সর্বনামীয়করণ নামে কোনো সূত্র বা প্রক্রিয়া নেই। আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল বাক্যকে বাক্য সর্বনামীয়করণজাত ব'লে মনে হয়, সেগুলো আসলে বিমূর্ত বিশেষ্যপদ বা বিশেষ্যীকৃত বিশেষ্যপদের সর্বনামীয়করণের ফলে উদ্ভূত।

টীকা

[১] এ-বিমূর্ত বিশেষ্যপদগুলো সাধারণত বাক্যের গভীর তলে নিরপেক্ষ কারক সম্পর্ক ধারণ করে, আর এগুলো বাক্যের বহির্তলে কর্ম হিশেবে উপস্থিত হয়। নিচের বাক্যগুলো লক্ষণীয় :

(ক) অ আমি বিশ্বাস করি একথা যে সে সৎ।
আ আমি বিশ্বাস করি একথায় যে সে সৎ।
ই আমি বিশ্বাস করি যে সে সৎ।

(খ) অ আমি দুঃখিত এ-তে যে সে আসে নি।
আ আমি দুঃখিত এ-কারণে যে সে আসে নি।
ই আমি দুঃখিত যে সে আসে নি,

(কঅ) এবং (কআ) বাক্য দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম আর্থপার্থক্য রয়েছে। (কঅ) বাক্যে বিমূর্ত বিশেষ্যপদ 'একথা' সম্ভবত 'নিরপেক্ষ' কারক, আর (কআ) বাক্যে 'একথা' সম্ভবত অধিকরণ কারক। (কআ)র বহির্তলের রূপ হচ্ছে (কই) বাক্যটি। এটি থেকে বিমূর্ত বিশেষ্যপদটিকে বাদ দেয়া হয়েছে। (খআ) বাক্যে আমি 'এ-তে' বিশেষ্যপদটিতে কোনো উপযুক্ত বিশেষ্য সরবরাহ করতে পারি নি। তবে আমি বোধ করি যে এ-বিশেষ্যপদটিতে 'কারণ', 'কাজ' ইত্যাদি বিশেষ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এ-বাক্যগুলোতে 'এ-তে', এবং 'এ-কারণে' বিশেষ্যপদ দুটিকে *বিমূর্ত করণ কারক* ব'লে মনে হয়। (খই) বাক্যটি হচ্ছে (খঅ) ও (খআ) বাক্য দুটির বহির্তলীয় রূপ।

পরিশিষ্ট

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রথাগত ব্যাকরণ

৭.০ ভূমিকা

প্রাচীন গ্রিক-লাতিন ও সংস্কৃত ভাষাচিন্তা থেকে উৎসারিত ব্যাকরণ হচ্ছে *প্রথাগত ব্যাকরণ*। পাশ্চাত্যে গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণ আধিপত্য করেছে বিশশতকের চতুর্থ দশকের মধ্যাংশ পর্যন্ত, এবং আমাদের অঞ্চলে প্রাচীন সংস্কৃত তত্ত্বজাত ব্যাকরণের আধিপত্য আজো অব্যাহত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণের মধ্যে সাদৃশ্য বিপুল : এ-ব্যাকরণ আর্থ-মানদণ্ড ভিত্তি ক'রে ভাষা বর্ণনা করতে ইচ্ছুক; কিন্তু ভাষাবর্ণনার সময় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে শুদ্ধ শব্দ গঠনপ্রণালির ওপর। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথাগত ব্যাকরণের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে খ্যাতি আয় করেছিলেন; এবং তাঁরা রটিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রথাগত ব্যাকরণ অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং পরিহার্য। প্রথাগত ব্যাকরণকে অখ্যাতি থেকে সম্প্রতি উদ্ধার করেছেন রূপান্তরবাদী সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা (দ্র চোমস্কি ১৯৫৭, ১৯৬৪, ১৯৬৫); এবং তাঁরা দেখিয়েছেন যে বিপুল বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও প্রথাগত ব্যাকরণ সাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অনেক উন্নত। এ-পরিচ্ছেদে আমার উদ্দেশ্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রথাগত ব্যাকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা। 'তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব' নামী পরিচ্ছেদাংশটিকে (দ্র § ৭.৪) পরিত্যাগ করা উচিত ছিলো; কিন্তু এটিকে গ্রহণ করেছি, কেননা এটির সংযোজনে প্রাচীন কাল থেকে উনিশশতকের শেষাংশ পর্যন্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাষাবিশ্লেষণ কৌশলের একটি পূর্ণ চিত্র রচিত হয়েছে।

৭.১.০ গ্রিক ব্যাকরণ

'অন্যরা যা ধ্রুব ব'লে মেনে নিতো, তার সম্পর্কে বিস্ময়বোধের প্রতিভা ছিলো গ্রিকদের' : এ-সরল-গভীর উক্তিটি দিয়ে ভাষাতত্ত্বে গ্রিকদের অবদান আলোচনা শুরু করেন ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ৪)। ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও সংগঠন সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করেছেন প্রাচীন গ্রিকরা। পাশ্চাত্যের প্রথাগত ব্যাকরণ গ্রিকদের দান। গ্রিকদের মনে ভাষা সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন জেগেছিল, পাশ্চাত্যের ভাষাবিষয়ক প্রশ্ন তাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে কয়েক হাজার বছর। পুরুষ, বচন, লিঙ্গ, কারক, ভাব ও অন্যান্য বহু ভাষিক ধারণা ও পারিভাষিক শব্দের স্রষ্টা গ্রিকরা। তবে তাঁরা স্বায়ত্তশাসিত ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন নি, ব্যাকরণ চর্চা তাঁদের নিকট ছিলো দর্শনচর্চার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর তুল্য উদাহরণ পাই প্রাচীন ভারতবর্ষে : প্রাচীন ভারতে ভাষাতত্ত্বের

ব্যাপক চর্চা হয়েছে, স্বায়ত্তশাসিত শাস্ত্ররূপে নয়, ধর্মের অঙ্গরূপে। ভারতে ব্যাকরণচর্চা ছিলো বেদচর্চার অত্যাবশ্যক অংশ : বেদের ষড়াঙ্গের চার অঙ্গই ভাষাতাত্ত্বিক (দ্র § ৭.৫)। শুধু ভাষা নয়, বস্তুবিশ্বের গঠনপ্রণালি সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন জেগেছিলো গ্রিকদের মনে। সক্রেটিস-পূর্ব কালে গ্রিসে ভাষাবিশ্লেষণে যাঁরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের বলা হয় সোফিস্ট।[১]

৭.১.১ সোফিস্টগণ

প্রণালিপদ্ধতিপ্রবণ বর্তমান কালের সাথে মিল পাওয়া যায় খ্রিপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রিসের, যেখানে বুদ্ধির চর্চা করেছিলেন সোফিস্টরা। তাঁরা ছিলেন খুবই বিজ্ঞানমনস্ক, তাই পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন সবকিছু : সঙ্গীত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন বাস্তবসম্মত প্রণালিপদ্ধতি। তাঁরা মনে করতেন যে, বাগ্মিতার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছে 'বর্তুল বাক্য', যাতে বাক্য পরম্পরায় ব্যবহৃত হয় সমমাপের শব্দ, পদ, দল। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো, যেমন আজকাল যান্ত্রিক প্রণালিপ্রধান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জন্ম নিচ্ছে।[২] সোফিস্টরা অনেক ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য আয় করেছিলেন। পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দরাশির বিরাট অংশ তাঁদের সৃষ্টি। তত্ত্বের চেয়ে বাস্তব প্রয়োগে অধিক উৎসাহী ছিলেন তাঁরা। তাঁরা বিখ্যাত বক্তাদের ভাষণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, বিভিন্ন এককে বিভক্ত করতেন, এবং ছাত্রদের অনুরূপ বক্তৃতা দিতে নির্দেশ দিতেন। সর্বপ্রথম বিভিন্ন রকম বাক্যশনাক্তি, বিভাজন ও শ্রেণীকরণের গৌরব সাধারণত দেয়া হয় প্রোতাগোরাসকে। অনেকের মতে তিনি চার শ্রেণীর বাক্য শনাক্ত করেন : প্রার্থনা, প্রশ্ন, বিবৃতি ও অনুজ্ঞা। আবার অনেকের মতে তিনি বাক্যরাশিকে সাত শ্রেণীতে ভাগ করেন : পরোক্ষোক্তি, প্রশ্ন, উত্তর, অনুজ্ঞা, প্রতিবেদন, প্রার্থনা ও আমন্ত্রণ। আরিস্ততলের মতে প্রোতাগোরাসই সবার আগে লিঙ্গ ও কাল নির্দেশ করেন। সোফিস্টরা ধ্বনিমূল শনাক্ত করতে না পারলেও দলের গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। তাঁরা ভাষাবিশ্লেষণের জন্যে ভাষাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেন নি, তবে তাঁরা ধ্বনিক, ব্যাকরণিক ও শাব্দ স্তরের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তা বোধ করেছিলেন।

৭.১.২ স্বভাব-প্রথার বিতর্ক

একটি বিতর্ক বেশ জমে উঠেছিলো প্রাচীন গ্রিসে, যেমন জমেছিলো প্রাচীন ভারতে। বিতর্কটি হচ্ছে *স্বভাব* [ফিসিস] ও *প্রথার* [নোমোস] তর্ক। গ্রিক দর্শনে স্বভাব ও প্রথার বিরোধ এক বড়ো ব্যাপার। কোনো কিছুকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক মনে করার অর্থ হচ্ছে যে ওটি উদ্ভূত হয়েছে কোনো শাশ্বত বিধানের ফলে। তাই তার নিয়মশৃঙ্খলাও বিশ্ববিধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং তা অবশ্যমান্য। কোনো কিছুকে প্রথাগত বিবেচনার অর্থ হচ্ছে যে ওটি মানবিক রীতিনীতি ও সামাজিক চুক্তির ফল, সুতরাং তার নিয়মকানুন সর্বদা শিরোধার্য নয়। ভাষাবিষয়ক স্বভাব-প্রথার বিতর্ক আবর্তিত হয়েছে শব্দার্থ কেন্দ্র ক'রে। তাঁদের প্রশ্ন ছিলো—ভাষা, বিশেষ ক'রে শব্দ, কী

ক'রে অর্থ লাভ করে? —শব্দ ও শব্দার্থের মধ্যে কোনো শাশ্বত সম্পর্ক আছি কি-না? এ-সম্পর্কে প্লাতোর *ক্রাতিলুস* সংলাপে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। চরম স্বভাববাদী ক্রাতিলুস মনে করতেন যে শব্দ শব্দার্থ শাশ্বত সম্পর্কে জড়িত, তাই প্রতিটি শব্দের জন্যে তার অর্থ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শাশ্বত। ক্রাতিলুসের বিশ্বাস কোনো বস্তুর নাম তার আপন স্বভাবপ্রকৃতির বাস্তব প্রতিফলন, সুতরাং ভাষা স্বাভাবিক কারণেই অর্থবহ। এ-তত্ত্বানুসারে কোনো শব্দের ধ্বনিসংগঠনে প্রতিফলিত হয় বস্তুটির আপন গঠন; তাই আমরা শব্দরাশিকে পরীক্ষা ক'রে বস্তুর সত্যমিত্যা পরখ করতে পারি। এ-তত্ত্বানুসারে, তাই প্রতিটি বস্তুরই থাকবে একটি মাত্র শুদ্ধ নাম, আর সে-নাম ব্যবহৃত হবে সর্বত্র। এ-তত্ত্ব থেকেই উৎসারিত হয়েছে *নিরুক্ত* বা *ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র* (*এটিমোলোজি* শব্দের মূল 'এতিমো', 'যার অর্থ সত্য', 'খাঁটি'; সুতরাং *এটিমোলোজির* আক্ষরিকার্থ —'সত্যতত্ত্ব')।

ক্রাতিলুস সংলাপে প্রথাবাদী হচ্ছেন এর্মোগেনেস। তাঁর মতে বস্তুনাম ও বস্তুর মধ্যে কোনো শাশ্বত সম্পর্ক নেই, নাম ও বস্তুর সম্পর্ক নিছক সামাজিক প্রথাগত। এ এক রকম সামাজিক চুক্তি। এ-চুক্তি পরিবর্তনশীল, তাই যে-কোনো শব্দই শুদ্ধ শব্দ, যতোক্ষণ ভাষাভাষীরা ওই শব্দের অর্থ সম্পর্কে একমত পোষণ করে। সক্রেতিস উভয় মতের গুণাগুণ যাচাইয়ে প্রবৃত্ত হন। সক্রেতিসের মতে নাম [*ওনোমা*—নাম, বিশেষ্য, কর্তা] হচ্ছে পদ বা পদসমষ্টি, বা বাক্যের [*লোগোস*—পদ, বাক্যাংশ, বাক্য] ক্ষুদ্রাংশ, যার সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুকে পৃথক করা যায়। কিছু লোক আছেন, যাঁরা নাম-উদ্ভাবনদক্ষ। সুতরাং আমরা মনে করতে পারি যে তাঁরা বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার পরই বস্তুর নামকরণ করেন। সক্রেতিস দু-শ্রেণীর নাম—সরল ও জটিল নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে জটিল নামকে বিভিন্ন খণ্ডাংশে ভাঙা সম্ভব, এবং ওই খণ্ডাংশরাশিতে লক্ষ্য করা সম্ভব বস্তুর প্রকৃতি। সরল নামকে বিভিন্ন অংশে ভাঙা অসম্ভব। সরল নামকে ভাঙলে পাওয়া যায় বিভিন্ন বর্ণ, যাদের ভাগ করা যায় স্বর ও ব্যঞ্জনে। কিন্তু ওই স্বর-ব্যঞ্জন কী নির্দেশ করে? শব্দগঠনে অংশী বর্ণ বা ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। সক্রেতিস পরিশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ভাষা প্রথাগত।

ভাষা কোনো অলৌকিক দান নয়, তা মানুষের সৃষ্টি। শব্দের গঠন বা রূপের সাথে অর্থের কোনো শাশ্বত স্বর্গীয় সম্পর্ক নেই; শব্দ ও অর্থ প্রথাবশতই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য নানা উপায়ে দেখানো যেতে পারে যে শব্দের আকারে বা উচ্চারণের সাথে অর্থের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, কিন্তু ওই তত্ত্ব ভাষার অতি সামান্যাংশই ব্যাখ্যা করতে পারে।[৩] ধ্বন্যাত্মক শব্দরাশি তাদের নির্দেশিত আওয়াজের অনুকরণে গঠিত (যেমন : খটখট, কুহুকুহু, মিউমিউ); তবে অনেক তথাকথিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ কোনো ধ্বনি নির্দেশ করে না (যেমন : মিটমিট করা, খাঁখাঁ করা)। ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে ভাষা উদ্ভূত হয়েছে, এমন একটি মত থাকলেও দেখা গেছে যে ভাষার অতি সামান্য পরিমাণ শব্দই ধ্বন্যাত্মক। ভাষা স্বভাব বা প্রকৃতিজাত, এ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ধ্বনিরাশিকে বিভিন্ন ধ্বনিগুণের আধার ব'লে বিবেচনা সম্ভব। যেমন : [র], [ল]-কে তরল

ধ'রে 'তরল' শব্দটিতে স্বাভাবিক তরলতা জড়িয়ে আছে বলে মনে করতে পারি, বা মনে করতে পারি যে, 'আঁকাবাঁকা' শব্দটির ধ্বনি শব্দ ও গঠনেই স্বাভাবিক বক্রতা প্রতিফলিত হচ্ছে।[৪] কিন্তু দেখা গেছে যে, অনেক চমৎকার শব্দ তথাকথিত শ্রীহীন ধ্বনিতে গঠিত। ধ্বনিগুণ ও শব্দের সম্পর্ককে সাম্প্রতিককালে *ধ্বনিপ্রতীকতা* বলা হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ধ্বনিপ্রতীকমণ্ডিত শব্দরাজির ব্যাপক বিবরণ নেয়ার পর দেখা গেছে যে বিপুল পরিমাণ শব্দ প্রতিটি ভাষাতে থেকে যায়, যাদের উপরোক্ত তত্ত্বানুসারে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

৭.১.৩ শৃঙ্খলাবাদ ও বিশৃঙ্খলাবাদ

স্বভাববাদী ও প্রথাবাদীদের বিতর্ক শতাব্দীপরম্পরায় চলেছিলো। এ-বিতর্কের ফলেই পাশ্চাত্যে জন্মেছে *নিরুক্ত* ও *ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র*, যা শব্দশ্রেণীকরণের উৎসাহ বাঁচিয়ে রেখেছে পণ্ডিতদের চিত্তে। খ্রিপূ দ্বিতীয় শতকে জন্ম নেয় নতুন বিতর্ক : ভাষা কতোখানি সুশৃঙ্খল? সব ভাষায়ই নিয়মের রাজত্ব দেখা যায়, যদিও অনিয়মও অল্প নয়। বাঙলা থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বাঙলায় দেখতে পাই এরকম নিয়মিত বিন্যাস : 'ছেলে' : 'ছেলেরা', 'মেয়ে' : 'মেয়েরা, 'চাষী : 'চাষীরা' ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখতে পাই সর্বনামের বহুবচনে : 'সে' : 'তারা' (হওয়া উচিত ছিলো, '*সেরা'), 'তুমি' : 'তোমরা' (হওয়া উচিত ছিলো '=তুমিরা')। প্রাচীন গ্রিক ভাষাতাত্ত্বিকদের একদল মনে করতেন ভাষা শৃঙ্খলাশাসিত, তাই তাঁরা *শৃঙ্খলাবাদী*, আর বিরোধীদল মনে করতেন যে ভাষা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা বা অনিয়মের অনিকাম সংঘট্ট, তাই তাঁরা *বিশৃঙ্খলাবাদী*। শৃঙ্খলাবাদীরা বিভিন্ন পদ বা প্যারাডাইম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, যাতে ভাষার নিয়মিত শব্দসমূহকে বিভিন্ন সুশৃঙ্খল শ্রেণীতে সাজানো যায়। বিশৃঙ্খলাবাদীরা ভাষার নিয়মকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁরা বারবার দেখিয়েছেন যে ভাষা বারবার শৃঙ্খলাশাসন ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে অনেক ক্ষেত্রেই শব্দরূপ ও শব্দার্থের সম্পর্ক শৃঙ্খলারহিত; —যেমন গ্রিক-লাতিন-সংস্কৃত অনেক শব্দ আছে যেগুলো নির্দেশ করে সলিঙ্গ প্রাণীদের, কিন্তু ব্যাকরণে তাদের নির্দেশ করা হয় ক্লীব ব'লে। সংস্কৃত থেকে এর উদাহরণ দেয়া যাক। 'দার', 'ভার্য্যা' ও 'কলত্র'—শব্দ তিনটির প্রতিটির অর্থই হচ্ছে 'স্ত্রী'; কিন্তু ব্যাকরণে 'দার' পুংলিঙ্গ, 'ভার্য্যা' স্ত্রীলিঙ্গ, আর 'কলত্র' ক্লীবলিঙ্গ। সমার্থক ও সমধ্বনিক শব্দসমূহকেও তাঁরা বিশৃঙ্খলার নিদর্শন হিশেবে দেখিয়েছেন। ভাষা যদি প্রথাজাত হতো, তবে এমন বিশৃঙ্খলা থাকতো না, থাকলে তাকে শাসন করা হতো। বিশৃঙ্খলাবাদীদের মতে ভাষা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ব্যাপার, তাই তা শৃঙ্খলাসূত্র দিয়ে সামান্য পরিমাণেই বর্ণনা করা সম্ভব।

শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার বিতর্ক প্রাচীন গ্রিস থেকে যায় নি, চলেছে শতাব্দীপরম্পরায়। এর একটি কারণ বর্ণনামূলক ও আনুশাসনিক ব্যাকরণের মধ্যে সীমারেখা টানা হয় নি। মানুষ যেভাবে কথা বলে, তার নিরাবেগ নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা হচ্ছে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, আর মানুষের যেভাবে কথা বলা উচিত, তার সূত্র ও নির্দেশ হচ্ছে আনুশাসনিক ব্যাকরণ। ওই দু-নীতির মধ্যে সীমারেখা ছিলো না ব'লে বিশৃঙ্খলাবাদীরা ভাষার যেখানেই বিশৃঙ্খলা দেখেছেন, সেখানেই

শৃঙ্খলা আরোপের চেষ্টা করেছেন, এবং এর ফলে উদ্ভূত হয়েছে আনুশাসনিক ব্যাকরণ। অনিয়ম দেখানো যেতে পারে শুধু নিয়মের সাথে তুলনা ক'রে, তবে মুশকিল এখানে যে বিশেষ দৃষ্টিতে যাকে নিয়ম ব'লে মনে হয়, বিপরীত দৃষ্টিতে তা অনিয়মের চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হ'তে পারে। পরিশেষে অবশ্য দু-দলই স্বীকার করেছেন যে ভাষার নিয়ম ও অনিয়ম যুগপৎ সক্রিয়। বিশৃঙ্খলাবাদী স্টোয়িকেরা নিরুক্তিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জন্ম দেন প্রথাগত ব্যাকরণের।

৭.১.৪ প্লাতো

তিনটি গ্রন্থে—*ক্রাতিলুস, থেআতেতুস ও সোফিস্টগণ*—প্লাতোর ভাষাবিষয়ক মতামত প্রকাশিত। *ক্রাতিলুস*-এ তাঁর বিষয় শব্দনিরুক্তি, আর অন্য দুটিতে তিনি ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে কিছু কিছু শব্দ পরস্পর অন্বিত হয়ে একত্রে ব্যবহৃত হ'তে পারে, এবং অনেক শব্দ সহাবস্থান করতে পারে না। তাই তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন বিভিন্ন শব্দের গ্রহণযোগ্য সমবায় বর্ণনা করতে, যাতে তিনি সক্ষম হন সত্য বিবৃতি দানে বা সংজ্ঞা গঠনে। তাঁর এ-চেষ্টা 'ফর্মাল লজিক' প্রণয়নের প্রথম প্রয়াস। ফর্মাল লজিক বা রৌপ যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে এমন বিদ্যা বা পদ্ধতি, যার টার্মসমূহ পরীক্ষা ক'রে বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ের শুদ্ধাশুদ্ধি বলা সম্ভব। তিনি যে-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন, তার নাম 'বিভাজন'। এ-উদ্দেশ্যে তিনি 'জাতি'কে 'প্রজাতি'তে বিশ্লিষ্ট করার প্রণালি বের করেন। প্রণালিটি নিম্নরূপ : কোনো একটি প্রজাতি 'ক'-কে যদি সংজ্ঞায়িত করতে হয়, তাহলে নিতে হবে ব্যাপকতর ও পরিচিত জাতি 'খ'-কে, যার একটি সদস্য হচ্ছে 'ক'। তারপর 'ক'-কে আবার ভাগ করতে হবে দুটি উপশ্রেণী 'গ' ও 'ঘ'-তে। এ-ভাগ এমনভাবে করতে হবে যাতে 'গ' ও 'ঘ'র মধ্যে মাত্র একটিতে হাজির থাকে 'ক'-শ্রেণীর গুণ। একটি বৃক্ষচিত্র এঁকে আমরা 'গ'কে বাঁ-শাখায় এবং 'ঘ'-কে ডান শাখায় স্থান দিতে পারি, এবং মনে করতে পারি যে 'গ' নয়, শুধু 'ঘ'ই বহন করছে 'খ'র বৈশিষ্ট্য। 'ঘ'-কে পৌনপুনিকভাবে শ্রেণীকরণ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছোতে পারি, যখন আর শ্রেণীকরণ দরকার হবে না। এভাবে আমরা লাভ করি এক অন্ত্য শ্রেণী, এবং ডান টার্মসমূহের সরল যোগফলকে নির্দেশ করতে পারি 'ক'র সন্তোষজনক সংজ্ঞা ব'লে। এমন বিভাজন হবে নিম্নরূপ :

(১) [ক]
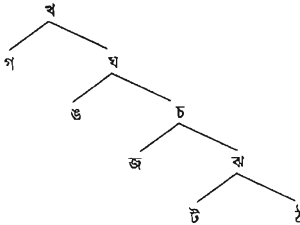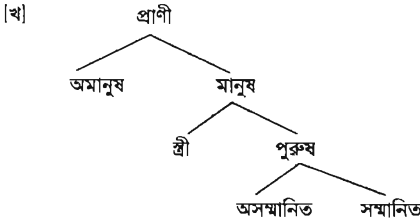
(১ক) অনুসারে *ক*= খ+ঘ+চ+ঝ+ঠ। (১খ) অনুসারে *ভদ্রলোক* = প্রাণী +মানুষ+পুরুষ +সম্মানিত। এ-প্রণালিতে শ্রেণীকরণের কোনো রৌপ [ফর্মাল] উপায় নেই বলে এটি ব্যবহারঅযোগ্য এবং এ-কারণে আরিস্ততল এ-প্রণালি বর্জন করেন।

প্লাতো *খেআতেতুস* গ্রন্থে সক্রেতিস-দত্ত ভাষার একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেন। সক্রেতিসের ভাষা-সংজ্ঞা এমন (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ৭৮)) : 'ভাষা হচ্ছে *ওনোমাতা* ও *হ্রিমাতার* সাহায্যে ভাবনার প্রকাশ, যা মুখনিসৃত বায়ুস্রোতে ভাষাভাষীর ভাবনা প্রতিফলিত করে।' 'ওনোমাতা' ও 'হ্রিমাতা' যথাক্রমে 'ওনোমা' ও 'হ্রিমা'র বহুবচনরূপ; এবং বহু অর্থজ্ঞাপক। *ওনোমা* বোঝাতে পারে 'নাম', 'বিশেষ্য', 'বিশেষ্যপদীয়', 'কর্তা' ইত্যাদি, আর *হ্রিমা* বোঝাতে পারে 'পদ', 'উক্তি', 'ক্রিয়াপদীয়', 'বিধেয়', 'কর্ম' প্রভৃতি। প্লাতোর মতে 'ওনোমা' ও 'হ্রিমা' হচ্ছে *লোগোস* [বাক্য]-এ মৌল সদস্য। *লোগোস* শব্দটিও বহু-আর্থক : এটি নির্দেশ করতে পারে 'স্বভাব', 'পরিকল্পনা', 'পদ', 'বাক্যাংশ', 'বাক্য' ইত্যাদি। *সোফিস্টগণ* গ্রন্থে প্লাতো বলেছেন যে, 'যার দ্বারা ক্রিয়া বোঝায়', তাই *হ্রিমা*, আর 'যার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়', তাই *ওনোমা*। এ-সংজ্ঞা দুটির সাথে মিল আছে প্রথাগত ব্যাকরণের ক্রিয়া ও বিশেষ্য সংজ্ঞার। প্লাতো প্রথাবাদী ছিলেন। শব্দ শব্দার্থের শাশ্বত সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

৭.১.৫ আরিস্ততল

গুরুঘাতী ছাত্রদের মধ্যে মহত্তম আরিস্ততল। তবে গুরু প্লাতোর মতকে তিনি শুধু নাকচ ক'রে দেন নি, গুরুর বহু মতকে তিনি গ্রহণ করে আপন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সম্প্রসারিত করেন। মানুষের কী জানার আছে, মানুষ তা কীভাবে জানে, এবং মানুষ তা কীভাবে ভাষায় প্রকাশ করে, সে-সম্পর্কে আরিস্ততলের নিজস্ব তত্ত্ব ছিলো। তাঁর ভাষাবিষয়ক তত্ত্ব পাশ্চাত্যে গভীরব্যাপক প্রভাবপাত করেছিলো। তিনি অর্থের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, আর তাঁর অর্থতত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অর্থতত্ত্ব অনেকটা সরল শংসামূলক অর্থতত্ত্ব। তাঁর মতে আমাদের বাকপ্রবাহ আমাদের চোখের সামনে বিশেষ বিশেষ বস্তুর ছবি তুলে ধরে। যদি কোনো উক্তি ছবি আঁকতে

না পারে, তা অর্থহীন; আর যদি পারে, তবে তা সার্থ। যেমন : 'অশ্ব' শব্দটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে অশ্বের ছবি। কিন্তু সমাসবদ্ধ 'যুবনাশ্ব', তাঁর মতে, পৃথকভাবে 'যুবন' ও 'অশ্ব'-এর ছবি না এঁকে আমাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে এক পৌরাণিক পুরুষের চিত্র। এভাবে আরিস্ততল বলবেন যে জন্তুদের চিৎকারশীৎকারেরও অর্থ আছে, কেননা ওই ধ্বনিপুঞ্জ চোখের সামনে হাজির করে ক্ষুধা-আনন্দ-বেদনা-কামনার ছবি।

ক্রিয়া ও বিশেষ্য-সম্পর্কিত আরিস্ততলীয় ধারণা বেশ কৌতুককর। তিনি সে-সব বিবৃতির বিশ্লেষণেই আনন্দ পান, যাদের সত্যাসত্য বর্তমান অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণয় সম্ভব। তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াকে বলতে চান ক্রিয়ার *পতন* (গ্রিক শব্দ *প্তোসিস* ও তার লাতিন অনুবাদ *কাসুস* [*কেস* : *কারক*] শব্দের অর্থ 'পতন', 'বিকৃতি') এবং নির্দেশক বর্তমান কালের ক্রিয়াকেই বলেন 'যথার্থ' ক্রিয়া। বিশেষ্য-সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি সাধারণত ব্যবহার করেন কর্তৃকারকের বিভক্তিশূন্য বিশেষ্যপদ; এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ওই রূপটিই 'সত্য' বিশেষ্য, আর বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যপদসমূহ হচ্ছে 'পতিত' বা 'কারক'।

তিনি, প্লাতোর মতো, বাক্যের তিনটি একক নির্দেশ করেন। *ওনোমা* [বিশেষ্য], *হ্রিমা* [ক্রিয়া] ও *লোগোস* [বাক্য], এবং এর সাথে তিনি যোগ করেন চতুর্থ একটি একক *সিন্দেস্‌মোই* [সংযোজক অব্যয়]। আরিস্ততলের যে-গ্রন্থটি পাশ্চাত্যের ব্যাকরণ, যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে, তার নাম *ক্যাটেগরিজ*। *ক্যাটেগরিজ*-এর মূল্যবান কিয়দংশ (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ৮৫)) :

> প্রত্যেক পৃথক শব্দ বা উক্তি নিম্নের যে-কোনো একটি অর্থ বোঝায় : কী (বা বস্তু), কতো বড়ো (বা পরিমাণ), কী রকম বস্তু (বা গুণ), কার সাথে (বা সম্পর্ক), কোথায় (বা অবস্থা) কখন (বা কাল), কী ভঙ্গিতে (বা অবস্থান, ভঙ্গি) কী অবস্থায় (বা অবস্থা), কী ভাবে বা কী করছে (বা ক্রিয়া), কেমন নিষ্ক্রিয় বা কী কী ভোগ করছে (বা অক্রিয়তা)।
>
> বস্তুর উদাহরণ 'মানুষ', 'অশ্ব'; পরিমাণের উদাহরণ 'দু-হাত লম্বা', 'তিন হাত দীর্ঘ'; গুণের উদাহরণ 'শ্বেত', 'ব্যাকরণিক'; 'অর্ধেক', 'বৃহত্তর' ইত্যাদি শব্দ সম্পর্ক বোঝায়। 'বাজারে' এবং 'লাইসিঅ্যামে' বোঝায় স্থান, আর 'গতকাল' বোঝায় কাল। ...'শুয়ে আছে' বা 'ব'সে আছে'; বোঝায় ভঙ্গি; 'পাদুকাপরিহিত' বা 'অস্ত্রসজ্জিত' জ্ঞাপন করে অবস্থা। 'কাটা' বা 'পোড়া' বোঝায় ক্রিয়া, আর 'আঘাতপ্রাপ্ত' বা 'দগ্ধ' জ্ঞাপন করে ফলভোগ।

ভাষাবিশ্লেষণে আরিস্ততল ধ্বনিতাত্ত্বিক, শাব্দ, ব্যাকরণিক ও স্টাইলগত একক ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রধানত আর্থ মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন, তবে বাক্যিক ও রৌপ মানদণ্ডও তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন : তিনি বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সাথে সংযোজক অব্যয়ের পার্থক্য নির্দেশ করেন আর্থ মানদণ্ড ব্যবহার ক'রে। কিন্তু সংযোজক অব্যয়ের রূপ নির্দেশ করেন বাক্যে তার

অবস্থান ও ভূমিকা বিচার ক'রে। লিঙ্গ নির্ণয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন রৌপ ধ্বনিতাত্ত্বিক মানদণ্ড : তাঁর মতে গ্রিক বিশেষ্যের লিঙ্গ শব্দান্ত্য বর্ণ দেখেই বোঝা যায়। এখানে তিনি রৌপ মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন এবং ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি শব্দ বিশ্লেষণে আপাতদৃশ্যমানতার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, এবং রূপমূল শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে শব্দান্ত্য বর্ণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মহাপুরুষের এ-ভ্রান্তি উত্তরাধিকারীরা শতাব্দীপরম্পরায় বহন করেছে।

৭.১.৬ স্টোয়িকগণ

খ্রিপূ চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের অন্ত পর্যন্ত দর্শন ও ব্যাকরণ-চর্চায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকেন স্টোয়িকেরা। তাঁরা ছিলেন আরিস্ততলের অনুসারীদের ঘোর বিরোধী। তাঁরা পার্থক্য নির্দেশ করেন ভাষার যৌক্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে, এবং ভাষা ব্যাখ্যার জন্যে উদ্ভাবন করেন প্রচুর পারিভাষিক শব্দ। ভাষার সার্থ রূপরাজি বিশ্লেষণের জন্যে তাঁরা তিনটি পরস্পরান্বিত অথচ স্বতন্ত্র ভাষিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন : (ক) *সিমাইনন* [প্রতীক, সংকেত] অর্থাৎ 'ধ্বনি', বা 'ভাষাবস্তু'; (খ) *সিমাইনোমেনন* বা *লেকতন* [যা উক্ত হয়েছে]— অর্থাৎ অর্থ; এবং (গ) *প্রাগমা* [নির্দেশিত বস্তু], বা *তুংখানন* [পরিস্থিতি] —অর্থাৎ প্রতীক দ্বারা নির্দেশিত বস্তু বা ব্যপার। অর্থ নয়, বরং ধ্বনি ও ধ্বনি দ্বারা নির্দেশিত বস্তুকে তাঁরা নির্দেশ করতেন ভাষাশরীর ব'লে। ধ্বনিতত্ত্বে তাঁদের উৎসাহ ছিলো, এবং তাঁরা অনর্থ বিচ্ছিন্ন ধ্বনির সাথে সার্থ ধ্বনিসমবায়ের পার্থক্যও নির্দেশ করেছিলেন। আরিস্ততলের *কারক* সম্পর্কিত অস্বচ্ছ ও বিশৃঙ্খল ধারণাকে তাঁরা অনেকখানি স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল ক'রে তুলেছিলেন। স্টোয়িকেরা কেবল বিশেষ্য শব্দের বেলাতেই *কারক* শব্দটি প্রয়োগ করেন এবং এর ফলে বিভক্তিযুক্ত ও বিভক্তিরহিত সমস্ত বিশেষ্যরূপ *কারক* নামে অভিহিত হয়। ক্রিয়ার বেলায় *কারক* কথাটি ব্যবহার থেকে বিরত হন তাঁরা। ক্রিয়ার অসমাপিকারূপ নির্দেশের জন্যে তাঁরা ব্যবহার করেন *হ্রিমা* শব্দটি, যেটিকে আরিস্ততল বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করেছিলেন, এবং সমাপিকারূপের জন্যে ব্যবহার করেন *কাতিগহ্রিমাতা* শব্দটি। প্রথমে তাঁরা চার ও পরে পাঁচ রকম পদ বা বাক্যাংশ [পার্টস অফ স্পিচ] নির্ণয় করেন। পদনির্ণয়ে তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন অর্থ ও রূপের মিশ্র মানদণ্ড। বিশেষ্যের সাথে বিভক্তি যুক্ত হয় ব'লে তাঁরা বিশেষ্য শনাক্তির সময় ব্যবহার করতেন রৌপ মানদণ্ড, আবার ওই বিশেষ্যকে নানা উপশ্রেণীতে ভাগ করার জন্য ব্যবহার করতেন আর্থ মানদণ্ড। বিশেষ্যকে নামবিশেষ্য (বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য) ও সাধারণ বিশেষ্যে (বা সামান্যবাচক বিশেষ্য) ভাগ করতেন তাঁরা নিম্নরূপে : সে-সবই নামবিশেষ্য, যাদের 'বিশেষ গুণ আছে'; —যেমন : 'সক্রেতিস' —এতে সক্রেতিস নামী ব্যক্তির বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; আর সে-সবই সাধারণ বিশেষ্য, যারা সাধারণ গুণবহ— যেমন : 'মানুষ'— এর মধ্যে নির্বিশেষ মানুষের গুণ সঞ্চিত। বাচ্য নির্ণয়ে তাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন বাক্যিক মানদণ্ড, এবং নির্দেশ করেছিলেন তিন রকম বাচ্য—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও মধ্যবাচ্য। ধ্বনিতত্ত্বে তাঁদের উৎসাহ ছিলো, কিন্তু বাকপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিলো ভ্রান্ত : তাঁরা মনে করতেন

যে চঞ্চল জিহ্বাই সমস্ত ধ্বনি উৎপাদন করে। প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিতাত্ত্বিকদের সাফল্যের তুলনায় তাঁদের সাফল্য সামান্য।

৭.১.৭ আলেকজান্দ্রীয় গোত্র : দিওনিসিউস থ্রাক্স

খ্রিপূ তৃতীয় শতকের শুরুতে গ্রিক উপনিবেশ আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থাপিত হয় এক মহাগ্রন্থাগার, যার এক বড় অংশ গঠিত হয় আরিস্ততলের ব্যক্তিগত পাঠাগারের গ্রন্থরাশিতে, এবং আলেকজান্দ্রিয়া পরিণত হয় সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার এক মহাকেন্দ্রে। ধ্রুপদী লেখকদের, বিশেষভাবে হোমারের, রচনার বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার ছিলো আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতদের লক্ষ্য। ধ্রপদী মহান কাব্যরাজির ভাবভাষার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা এমন দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন যে, ওই ধ্রপদী কাব্যরাজি যে-ভাষায় রচিত হয়েছিলো, তা ছিলো স্বভাবত এবং আন্তরগুণেই বিশুদ্ধ। আলেকজান্দ্রিয়ায় রচিত হয় দুটি অমর গ্রন্থ : একটি ইউক্লিডের *এলিমেন্টস*, অপরটি দিওনিসিউস থ্রাক্সের [খ্রিপূ দ্বিতীয় শতক] *গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি* [*ব্যাকরণকলা, বর্ণবিদ্যা*], যা কালপরম্পরায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

থ্রাক্সের *গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি* সংক্ষিপ্তির নিদর্শন : পঁচিশটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের আদিব্যাকরণ। থ্রাক্সের আলোচনার বিষয় গ্রিক ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব; বাক্যতত্ত্বকে তিনি তাঁর বিষয় করেন নি। তাঁর ক্ষুদ্র ব্যাকরণ পাশ্চাত্যের ফেলেছিলো দীর্ঘ প্রভাব;— তিনি যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন এবং যেভাবে তার সমাধান করেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে গত দু-হাজারের মতো বছর ধ'রে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ প্রথাগত ব্যাকরণ রচিত থ্রাক্সের ব্যাকরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুকরণে। থ্রাক্স সে-সব ক্যাটেগরি গ্রহণ করেছিলেন গ্রিক ভাষা বর্ণনার জন্যে। তিনি যে-সব আর্থ ক্যাটেগরি [পদ] শনাক্ত করেছিলেন, তা ছিলো গ্রিক ভাষার রূপ বা সংগঠনভিত্তিক, তাই ওই ক্যাটেগরিসমূহ বিনাবিচারে অন্য ভাষার ওপর চাপিয়ে দেয়ায় প্রচুর কুফল ফলেছে। থ্রাক্সের ব্যাকরণের খণ্ডাংশের অনুবাদ (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ৯৮-১০১), রবিন্স (১৯৬৭, ৩৩-৩৪)) :

> ১ ব্যাকরণ
>
> ব্যাকরণ হচ্ছে সাধারণত কবি লেখকদের ব্যবহৃত ভাষার প্রাকরণিক জ্ঞান। এর ষড়াঙ্গ : (১) শুদ্ধ উচ্চারণ, (২) প্রধান কাব্যলঙ্কাররাশির ব্যাখ্যা, (৩) শব্দ ও পৌরাণিক উদাহরণ সংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা, (৪) ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, (৫) শৃঙ্খলা বা সাদৃশ্য আবিষ্কার, এবং (৬) কবিদের রচনার সমালোচনা, যা এ-শাস্ত্রের মহত্তম অঙ্গ।
>
> ১১ পদপ্রকরণ (বাক্যাংশ]
>
> শব্দ হচ্ছে বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। পূর্ণ অর্থবহ শব্দের সমবায় হচ্ছে বাক্য। বাক্যে পদের (বাক্যাংশের) সংখ্যা আট : বিশেষ্য, ক্রিয়া, অব্যয় [পার্টিসিপল], আর্টিক্যাল, সর্বনাম, বিভক্তি [প্রিপজিশন], ক্রিয়াবিশেষণ, সংযোজক ...।

১২ বিশেষ্য [ওনোমো]

ব্যাক্যের যে-সমস্ত পদে বিভক্তি যুক্ত হয়, যে-সমস্ত পদ ব্যক্তি বা বস্তু নির্দেশ করে, তাই বিশেষ্য। বিশেষ্য বিশেষ বা নির্বিশেষ হ'তে পারে; যেমন : 'পাথর', 'শিক্ষা', 'মানুষ', 'ঘোড়া', 'সক্রেটিস'। বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য পাঁচ রকম : লিঙ্গ, প্রকার (শ্রেণী), রূপ, বচন, ও কারক।

লিঙ্গ তিন প্রকার : পুং, স্ত্রী, ও ক্লীব। অনেক বিশেষ্য আবার উভলিঙ্গ।

বচন তিন প্রকার : এক, দ্বি, ও বহু।

বিশেষ্যের কারক পাঁচ প্রকার : কর্তৃকারক [অর্থি (ঋজু), নোমিনেটিভ], সম্বন্ধ [জিনিকি, জেনেটিভ], সম্প্রদান [দোতিকি (দেয়া), ড্যাটিভ], কর্মকারক [আইতিআকি (যার ওপর কোনো ক্রিয়া করা হয়েছে), অ্যাকিউজেটিভ—এ-লাতিন-ইংরেজি শব্দটি মূল গ্রিক শব্দের ভুল অনুবাদ] এবং সম্বোধন [ক্লেতিকে (আহ্বান), ভোকেটিভ]।

১৩ ক্রিয়া [হ্রিমা]

যে-সমস্ত পদে বিভক্তি যুক্ত হয় না, কিন্তু কাল, পুরুষ ও বচনের জন্যে প্রত্যয়ান্ত্য হয়, এবং ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া বোঝায়, তাই ক্রিয়া।

ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আট প্রকার : ভাব, শ্রেণী, প্রকার, রূপ, বচন, পুরুষ, কাল, ক্রিয়ারূপ।

১৫ পার্টিসিপল [মেতোকি]

যে-সমস্ত পদে ক্রিয়া ও বিশেষ্যের গুণ বিদ্যমান, তাই পার্টিসিপল।

১৬ আর্টিক্যল [আর্থ্রন]

বিশেষ্যের আগে বা পরে অবস্থিত কারকজ্ঞাপক পদই আর্টিক্যল।

১৭ সর্বনাম [আনতোনিমিয়া]

যে-সমস্ত পদ বিশেষ্যের বদলে বসে, এবং নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তাই সর্বনাম।

১৮ প্রিপজিশন [প্রোথিসিস]

যে-সমস্ত পদ যুক্ত-বা বিযুক্তভাবে বাক্যের সমস্ত পদের সাথে ব্যবহৃত হয়, তাই প্রিপজিশন।

১৯ ক্রিয়াবিশেষণ [এপির্হিমা]

অপ্রত্যয়ান্ত্য যে-সমস্ত পদ ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলে, বা ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়, তাই ক্রিয়াবিশেষণ।

২০ সংযোজক [সিন্দেসমোস]

যে-সমস্ত পদ আমাদের ভাবনাপরম্পরাকে নির্দিষ্ট ক্রমে অন্বিত করে, তাই সংযোজক।

থ্রাক্সের মতে ব্যাকরণ হচ্ছে ভাষার প্রাকরণিক জ্ঞান।[৫] তাঁর ব্যাকরণের বিষয়বস্তু কথ্য ভাষা নয়, ধ্রুপদী সাহিত্যের ভাষা তাঁর উপাত্ত। ব্যাকরণকে ষড়াঙ্গে ভাগ করলেও সমস্ত অঙ্গের আলোচনা তিনি করেন নি। তিনি বাক্যের গঠনপ্রণালি সম্পর্কেও কোনো আলোচনা করেন নি। বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাপক কাজ করেন থ্রাক্সের পরবর্তী আরেকজন আলেকজান্দ্রীয় ব্যাকরণবিদ : আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস [খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক]। তিনিও অসীম প্রভাব ফেলেছিলেন পরবর্তী ব্যাকরণবিদদের ওপর।

৭.২ রোমান ব্যাকরণ

জ্ঞানের সমস্ত এলাকায় গ্রিকরা উদ্ভাবক, রোমানরা প্রতিভাবান অনুকারী ও প্রচারক। ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রেও তাই। খ্রিপূ দ্বিতীয় শতক থেকেই রোমানরা গ্রিক ব্যাকরণিক ক্যাটেগরিসমূহ লাতিনের ওপর প্রয়োগ করতে থাকে। সাংগঠনিক সাদৃশ্য থাকার ফলে গ্রিক ক্যাটেগরিসমূহ মোটামুটি ভালোভাবেই লাতিনে প্রযুক্ত হয়। আলেকজান্দ্রীয় শৃঙ্খলা বা সাদৃশ্যবাদী ও পেরগামোনের বিশৃঙ্খলাবাদীদের বিতর্ক রোমানদের নিকট পরিচিত করিয়ে দেন রোমে নিযুক্ত পেরগামোনের রাজদূত ক্রেতিস অফ মাল্লস, যিনি রোগশয্যা থেকে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাষাবিষয়ক বক্তৃতা দিতেন। তিনি শৃঙ্খলা বনাম বিশৃঙ্খলার বিতর্ক সঞ্চার ক'রে দেন রোমানদের মধ্যে, তাতে উৎসাহী হয়েছিলেন অনেকে। এমনকি জুলিয়াস সিজার, যিনি ছিলেন শৃঙ্খলাবাদী, গল (মধ্য-ফ্রান্স) অভিযানকালে *সাদৃশ্য* নামী একখানি ভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভ রচনা করে কিকেরোর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

৭.২.১ মার্কুস তেরেনতিউস ভাররো

মার্কুস তেরেনতিউস ভাররো (১১৬-২৭ খ্রিপূ) থ্রাক্সের সমকালীন, এবং পরিচিত ছিলেন স্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নামে। তিনি প্রণয়ন করেন *দে লিঙ্গুয়া লাতিনা* [লাতিন ভাষা] নামী পঁচিশ খণ্ডের এক ব্যাকরণগ্রন্থ। তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ খণ্ড কালের ছোবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ-খণ্ডসমূহে স্থান পেয়েছে ভাষা সম্পর্কে শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলাবাদীদের দ্বন্দ্বের বিবরণ। তিনি জানিয়েছেন স্টোয়িকেরা মনে করতো যে কথ্য ভাষায় অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা থাকলেও আদিরূপ বা মূল [এতিমা] বা ধাতু আবিষ্কার ক'রে দেখানো যায় যে, ভাষা ও বাস্তবের মধ্যে সাম্য রয়েছে। এর ফলে উদ্ভূত হয় ব্যুৎপত্তিবিদ্যা। চরম বিশৃঙ্খলাবাদীদের মতে, ভাষা প্রথাগত : যেহেতু যে-কোনো শব্দ যে-কোনো ভাব জ্ঞাপন করতে পারে, তাই ভাষাভাষীরা যা বলে, তা ছাড়া শুদ্ধতার আর কোনো মানদণ্ড নেই। ভাররোর মতে, উভয় দলেরই চরমপন্থীরা পথভ্রষ্ট, তাই তিনি ওই দু-মতের সংশ্লেষণের চেষ্টা করেন।

লাতিনের শব্দরূপ পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, যাঁরা ভাষার মধ্যে শাশ্বত স্বর্গীয় শৃঙ্খলা বিরাজমান ব'লে মনে করেন, তাঁরা অবশ্য হেরে যাবেন বিশৃঙ্খলাবাদীদের যুক্তির কাছে, কেননা ভাষায় অনিয়ম বিপুল। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন ভাষায় নিয়মেরই প্রাধান্য।

তাঁর কথা (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১০৮) : 'যাঁরা ভাষায় শৃঙ্খলা দর্শনে ব্যর্থ, তাঁরা শুধু ভাষার প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থ নন, ব্যর্থ বিশ্বপ্রকৃতি অনুধাবনেও।' তাঁর মতে, শব্দ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সার্থ মৌলরূপ, যা আর ভাঙা অসম্ভব। শব্দালোচনার নানা উপায় আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে শব্দের উৎপত্তিনির্ণয় [ব্যুৎপত্তি বা নিরুক্তি]। শব্দের উৎপত্তি ও সমকালীন রূপ আলোচনায় তিনি ব্যবহার করেছেন 'শব্দরূপ' [দেক্‌লিনাতিও] শব্দটি। শব্দরূপ বলতে তিনি মৌলরূপ থেকে ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে শব্দের রূপবদলকে বুঝিয়েছেন। তিনি ভাষার মূর্ত ও বিমূর্ত রূপের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন : বহু শতাব্দী পরে সোস্যুর যাকে বলেছেন : 'লঁগ-পারোল', আর চোমস্কি বলেছেন : 'বোধ-প্রয়োগ' (দ্র § ৪.২.৬)। আরো দুজন লাতিন ব্যাকরণবিদ—রেম্মিউস পালাএমন [খ্রিস্টীয় প্রথম শতক] : তিনি থ্রাক্সের ব্যাকরণ লাতিনে অনুবাদ করেন; এবং দোনাতুস [খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক] : তিনি বিদ্যালয়পাঠ্য লাতিন ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।

৭.২.২ প্রিস্কিআন

সুদূর অতীতে রচিত লাতিনের ব্যাপকতম ও বিশ্বস্ততম ব্যাকরণরচয়িতার নাম প্রিস্কিআন [খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ দশক]। তাঁর আপোল্লোনিউস দিস্কোলুসের গ্রিক ব্যাকরণ অনুসরণে রচিত। প্রিস্কিআনের ব্যাকরণ ছোটোবড়ো আঠারোটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম ষোলো খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে লাতিনের রূপতত্ত্ব; —এ-ষোলোটি খণ্ড মধ্যযুগে পরিচিত ছিলো *প্রিস্কিআনুস মাইঅর* নামে। শেষ দু-খণ্ডে আলোচিত হয়েছে লাতিনের বাক্যতত্ত্ব; এ-খণ্ড দুটি মধ্যযুগে পরিচিত ছিলো *প্রিস্কিআনুস মিনর* নামে। তাঁর ব্যাকরণ অন্তত দু-কারণে মূল্যবান : (ক) এটি লাতিনের সর্বাধিক সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এবং (খ) তাঁর ভাষিক তত্ত্ব প্রথাগত ব্যাকরণকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভাষাবর্ণনায় তিনি আর্থ মানদণ্ডকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তবে রৌপ মানদণ্ডকেও অবহেলা করেন নি। বাক্যের পদনির্ণয়ে তিনি আর্থ মানদণ্ডকেই উপযুক্ততম ব'লে বিবেচনা করেছেন। আরিস্ততলের মতো তিনিও সমস্ত পদের মধ্যে বিশেষ্যকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করতেন, এবং বিশেষ গুরুত্ব তিনি দিয়েছিলেন কর্তাবিশেষ্যপদকে। প্রিস্কিআন বিভিন্ন পদের যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১১৫), রবিন্স (১৯৬৭, ৫৭-৫৮)) :

> বিশেষ্য [নোমেন] (বিশেষণও এর অন্তর্ভুক্ত) : বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তু ও গুণ নির্দেশ : এবং বিশেষ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীতে বিশেষ বা নির্বিশেষ গুণ আরোপ করে।
>
> ক্রিয়া [ভের্বুম] : ক্রিয়ার প্রকৃতি হচ্ছে ক্রিয়া নির্দেশ : এর কাল ও ভাবজ্ঞাপক রূপ আছে, কিন্তু কারকের জন্যে একে প্রত্যয়যুক্ত করা হয় না।
>
> পার্টিসিপল [পার্তিকিপিউম] : যে-পদ ক্রিয়া ও বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য (কাল ও কারক) বহন করে, তাই পার্টিসিপল।
>
> সর্বনাম [প্রোনোমেন] : যে-পদ নামবিশেষ্যের বদলে বসতে পারে, এবং কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তাই সর্বনাম।

ক্রিয়াবিশেষণ [আদভের্বিউম] : বিকারহীন যে-সমস্ত পদের অর্থ ক্রিয়ার অর্থের সাথে যুক্ত হয় তাই ক্রিয়াবিশেষণ।

মনোভাবক শব্দ [ইনতেরইএক্‌তিও] : ক্রিয়ার অধীনতামুক্ত যে-সমস্ত পদ আবেগ-অনুভূতি বা মানস অবস্থা নির্দেশ করে, তাই মনোভাবক শব্দ।

সংযোজক [কনইউক্‌তিও] : বিকারবিহীন যে-পদ একাধিক অন্য পদকে সংযুক্ত করে, এবং তাদের মধ্যে অন্বয় নির্দেশ করে, তাই সংযোজক।

প্রিপজিশন [প্রাএপসিতিও] : বিকারবিহীন যে-পদ অন্য পদের আগে, সংযুক্ত বা অযুক্তভাবে বসে তাই প্রিপজিশন।

পদনির্ণয়ে প্রিস্কিআন প্রধানত ব্যবহার করেছেন আর্থ মানদণ্ড, এবং কিছু পরিমাণে ব্যবহার করেছেন রৌপ ও বাক্যিক মানদণ্ড। তিনি বিভিন্ন পদ নির্ণয়, শ্রেণীকরণ ও বর্ণনার জন্যে প্রথম স্থির করেছেন পদের 'মূলরূপ', এবং পরে তার সাথে তুলনা করেছেন অন্যান্য অমূলরূপের। তিনি বিশেষ্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে মূলরূপ রূপে গ্রহণ করেছেন এক বচনের কর্তাবিশেষ্যরূপকে [নোমিনেটিভ] এবং মন্তব্য করেছেন যে বিশেষ্যের কর্তারূপই 'প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি'। এ-উক্তি যেমন নিরর্থক, তেমনি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিপূর্ণ। ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে তিনি, ও তাঁর অনুসারী প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা, নির্দেশক বর্তমান কালে উত্তম পুরুষ এক বচনের রূপকে গ্রহণ করেছেন মুলরূপ ব'লে। এ-বর্ণনা গ্রহণঅযোগ্য। তাঁর শ্রেণীকরণ ও বর্ণনা মুখস্থ ক'রে নানারকম শব্দরূপ গঠন করা যায়, এবং করা হয়েছে শতাব্দীপরম্পরায়; কিন্তু ওই বর্ণনার ক্রটি গভীর। তাঁর ব্যর্থতার কারণ তিনি মূলরূপ নির্ণয় করতে পারেন নি। ধ্বনিতত্ত্বেও তাঁর ক্রটি প্রচুর।

৭.৩ মধ্যযুগ

রোমান সাম্রাজ্যের বিচূর্ণনের কাল থেকে রেনেসাঁসের উন্মেষের অব্যবহিতপূর্ব পর্যন্ত সময় ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ নামে পরিচিত। মধ্যযুগ, আধুনিক মানুষের কাছে, যদিও অন্ধকারের নামান্তর, তবু ওই সময়েও আলোর ঝলক দেখা যায়। আলো ইউরোপি মধ্যযুগেও ছিলো। লাতিনকে বলা যায় মধ্যযুগের মাতৃভাষা, যা ব্যবহৃত হয়েছে শাসনকাজে, ধর্মচর্চায়, শিক্ষায় ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত এলাকায়। তাই মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ের ভাষাতাত্ত্বিক সমস্ত কাজই লাতিনবিষয়ক। মধ্যযুগে শিক্ষার ভিত্তি ছিলো 'মানবিক সাতশিল্প', যা বিভক্ত ছিলো দু-ভাগে : একভাগে ছিলো গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ও সঙ্গীত [কোআদ্রিভিউম]; অন্য ভাগে ছিলো ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা ও অলঙ্কারশাস্ত্র [ত্রিভিউম]। ব্যাকরণচর্চা ছিলো মধ্যযুগের পাণ্ডিত্যের ভিত্তি। মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রিস্কিআন ও দোনাতুসের ব্যাকরণ, যা পড়া হতো আনুশাসনিক শাস্ত্র হিশেবে। মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে, অন্ধকার যুগে, ভাষাতত্ত্বচর্চা সীমাবদ্ধ থেকেছে এ-ব্যাকরণ দুটির ভাষারচনায়, ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ও অভিধান রচনায়।

মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার জগতে এক প্রধান পুরুষ বোএথিউস [জন্ম ৪৭০ খ্রিস্টীয় শতক]। তিনি যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সঙ্গীত ও জ্যামিতি বিষয়ে লিখেছিলেন মৌলিক গ্রন্থ, এবং শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন 'পাশ্চাত্যের শিক্ষক' নামে। তিনি বিভিন্ন টার্মের বিশেষ ও নির্বিশেষ অর্থ সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন, যা চলেছিলো কয়েক শতাব্দীব্যাপী। দ্বাদশ শতকে পেতের এলিআস রচনা করেন প্রিস্কিআনের ব্যাকরণের এক ভাষ্য, যাতে তিনি নতুন প্রণালিতে লাতিনের শৃঙ্খলা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। তাঁর রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে উদ্ভূত হয় *দার্শনিক ব্যাকরণ*। এ-ব্যাকরণের অন্য নাম *প্রাকল্পনিক ব্যাকরণ*।[৬] এ ব্যাকরণে আলেচিত হয়েছে ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। ভাষার সাহায্যে আমরা যে-সব বস্তু-ব্যাপার সম্পর্কে কথা বলি, সে-সবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে দার্শনিক ব্যাকরণে; এবং ভাষাবিদেরা লক্ষ্য করেছেন সে-বৈশিষ্ট্যরাশি লাতিনে কীভাবে প্রকাশিত হয়। সাংগঠনিকেরা এ-ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক ব'লে মনে করেছেন, কিন্তু রূপান্তরবাদীরা পুনরায় চেষ্টা করছেন ভাষা-সর্বজনীনতা আবিষ্কারের (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫))। এলিআস ব্যাকরণের যে-সংজ্ঞাটি দিয়েছিলেন, তা খুবই মূল্যবান, এবং তা প্রায় সর্বত্র গৃহীত হয়েছিলো (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১২৯)) : 'যে-বিজ্ঞান শুদ্ধভাবে লিখতে ও বলতে শেখায়, তাই ব্যাকরণ। ... এ-শিল্পের কাজ হচ্ছে, অশুদ্ধতা ও গ্রাম্যতা পরিহার ক'রে, বর্ণরাশিকে দলে, দলরাশিকে শব্দে, এবং শব্দপুঞ্জকে বাক্যে বিন্যাস করার রীতি শেখানো। তাঁর মতে ব্যাকরণ একাধারে শিল্প ও বিজ্ঞান। এলিআস পর্যন্ত মধ্যযুগে ব্যাকরণশাস্ত্রে যে-অগ্রগতি হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যতম হচ্ছে বিশেষ্য ভেঙে বিশেষ্য ও বিশেষণের সৃষ্টি। এর আগে বিশেষ্য ও বিশেষণকে অভিন্ন ক্যাটেগরি মনে করা হতো। অর্থতত্ত্বেও কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। একটি পদ কী বোঝায়— এ-সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত রেখে যুক্তিশাস্ত্রীরা আলোচনা শুরু করেন— পদগুলো কোনো কিছু কীভাবে বোঝায়? অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ নয়, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাজির অর্থপ্রকাশ প্রণালির দিকে তাঁরা আকৃষ্ট হন। এ-তত্ত্বের এক স্মরণীয় পুরুষ হচ্ছেন পেত্রুস ইস্পানুস [ত্রয়োদশ শতক]।

দার্শনিক ব্যাকরণপ্রণেতারা বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন 'হওয়া', 'বোঝা', ও 'বোঝানো'র রীতি [মোড]-বিষয়ক আলোচনায়, তাই তাঁদের বলা হতো 'রীতিবাদী' [মোদিস্তায়]। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক তাঁদের কাল। তাঁরা আলোচনায় মোটামুটিভাবে এক সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন : রচনাকে তাঁরা তিন ভাগে ভাগ করতেন। প্রথম ভাগে তাঁরা দিতেন বিভিন্ন রীতির বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ভাগে নির্ণয় করতেন বিভিন্ন পদের রীতি, এবং তৃতীয় ভাগে আলোচনা করতেন বিভিন্ন সংগঠনের শুদ্ধাশুদ্ধি। রীতিবাদীরা বিভিন্ন বস্তু ও তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। বস্তু হচ্ছে তা, যা বৈশিষ্ট্য নয়; আর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা, যা বস্তু নয়। যদি বস্তু না থাকে, তবে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না, কিন্তু বৈশিষ্ট্যরহিত বস্তু থাকে পারে। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুর থাকতে-পারে-নাও-থাকতে-পারে, এমন গুণ। বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা,

আরিস্ততলের অনুসরণে, ন-ভাগে ভাগ করেছিলেন : পরিমাণ, গুণ, সমপর্ক, স্থান, কাল, অবস্থান, অবস্থা, সক্রিয়তা, অক্রিয়তা। তাঁদের মতে বস্তুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বস্তুর গুণ, বা রীতি; কিন্তু তা 'বোঝা'র বা 'বোঝানো'র রীতি নয়। কোনো কিছু বোঝার রীতিকে তাঁরা ভাগ করেছিলেন দু-ভাগে : সক্রিয় রীতি ও অক্রিয় রীতি। বোঝার অক্রিয় রীতিকে মনে করা হতো বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে : কেননা কোনো কোনো বস্তু স্বতোবোধ্য। বোঝার সক্রিয় রীতি হচ্ছে মন বা মনের আপন শক্তি, যার সক্রিয়তায় আমরা বহির্জগতকে বুঝি! রীতিবাদীরা আর্থ ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। আর্থ ব্যাকরণরচয়িতা রোজার বেকনের মতে সব ভাষার ব্যাকরণ অন্তরে অভিন্ন, তাদের ভিন্নতা বাহ্যিক। তাঁর উক্তি (দ্র লায়ন্স (১৯৬৮, ১৫)) : 'যিনি এক ভাষার ব্যাকরণ জানেন, তিনি সব ভাষার ব্যাকরণ জানেন, শুধু জানেন না বাহ্যিক পার্থক্যগুলো।'

৭.৩.১ ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র

শব্দ বা উক্তির অর্থ নির্দেশের একটি প্রণালি, যা মধ্যযুগে ব্যবহৃত হতো, এবং আজো হয়, হচ্ছে ব্যুৎপত্তিনির্ণয়। ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান মধ্যযুগে সামান্যই ছিলো। তবে তাঁরা জানতেন যে ভাষা পরিবর্তনশীল—তাঁরা দেখেছেন আদি ও মধ্যযুগীয় লাতিনের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে বিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ সেন্ট ইজিদোর অফ সেভিল-এর [সপ্তম শতক] *নিরুক্তি* [*এটিমোলোজিজ*]। বহু শাস্ত্র এ-গ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে : ব্যাকরণ থেকে জাহাজবিদ্যা-ঘরকন্নার মতো বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নির্দেশিত অধিকাংশ নিরুক্তি, যদিও মজাদার, অবিশ্বাস্য। তিনি বলেছেন (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১৪৮)) : 'নিরুক্ত হচ্ছে শব্দের উৎপত্তিবিষয়ক বিদ্যা, যাতে বিশেষ্য বা ক্রিয়ার অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে স্থির করা হয়। এ-জ্ঞান অত্যাবশ্যক, কেননা কোনো একটি বিশেষ্যের উদ্ভবের ইতিকথা জানলে, সেটির অর্থ সহজবোধ্য হয়। যে-কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন সহজ হয়, যদি জানা থাকে ওই বিষয়ে ব্যবহৃত শব্দসমূহের ইতিকথা।' তিনি বাইবেলের 'বাবেলের টাওয়ার' কাহিনীতে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাঁর গ্রন্থে মনগড়া ব্যুৎপত্তির অভাব নেই। যেমন : তাঁর মতে জর্মানদের জর্মান বলা হয়, যেহেতু তাদের শরীর বিপুল। মধ্যযুগীয় ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের কল্পনাপ্রতিভার চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায় লাতিন ভাষার 'প্রস্তর' [লাপিস] শব্দের নিরুক্তিতে : এটি নাকি এসেছে 'চল্' জাতীয় ধাতু থেকে— কেননা প্রস্তর হচ্ছে সে-জাতীয় বস্তু, যা কখনো চলে না।

৭.৩.২ আনুশাসনিক ব্যাকরণ

ইংরেজি ব্যাকরণ, গ্রিক-লাতিন ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা পুষ্ট হয়ে, অষ্টাদশ শতকের মধ্যাংশে মোটামুটিভাবে স্থির রূপ পায়। ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা ইতিমধ্যে বিশ্ব সম্পর্কে জেনেছেন প্রচুর, জেনেছেন যে আরো বহু ভাষা আছে বিশ্বে, এবং ইংরেজির সাথে তুলনা করেছেন বেশ কিছু বিদেশি ভাষার। ভাষা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন আরিস্ততলীয়

সিদ্ধান্ত : ভাষা চিন্তাভাবনার প্রথাসম্মত সংকেত। তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌছে গিয়েছিলেন যে, বর্ণমালা হচ্ছে ধ্বনির প্রতীক, আর ভাষায় ভাষার পার্থক্য বিদ্যমান ধ্বনি ও বর্ণবিন্যাসে, কিন্তু সমগ্র মানবমণ্ডলি অভিন্ন বিষয়েই কথাবার্তা বলে। গ্রিক ও হিব্রু ব্যাকরণরচয়িতা রোজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা, যদিও ধ্বনিতে ভিন্ন, মূলত অভিন্ন। তখন সবাই বুঝতে পেরেছিলো যে ভাষা পরিবর্তনশীল, আর এ-পরিবর্তন তাদের নিকট মনে হতো অবশ্যম্ভাবী বিকৃতি ব'লে। সতেরোশতকের এক অনামা অভিধানপ্রণেতার মত (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১৫১)) : 'বাবেলে ভাষিক গণ্ডগোলে বিশ্বে জন্ম নিলো বহু ভাষা (এর আগে সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ভাষা ছিলো হিব্রু), তার মধ্যে এ-দেশের আদি ভাষা অন্যতম।' তাঁর মতে সে-আদিভাষার বিকৃতির ফলে উদ্ভূত হয়েছে তাঁর সমকালীন ইংরেজি। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্যও তাঁদের মধ্যে জন্মাতো তীব্র ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া। চারপাশে শোনা যাচ্ছে নানারকম ভাষা, এর মধ্যে শুদ্ধতম কোনটি? শুদ্ধ শব্দ কোনগুলো? বিশুদ্ধিকামনায় ও শুদ্ধতানির্দেশের জন্য দেখা দিলো অভিধানের প্রয়োজন। সতেরোশতকে দেখা দিলেন বহু অভিধানপ্রণেতা; —তাঁরা নারী ও অশিক্ষিতকে সুশিক্ষিত করার জন্যে শুদ্ধ শব্দের নামে উপহার দিতে লাগলেন প্রচুর গ্রিক-লাতিন শব্দ। কেউ কেউ অভিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে লিখলেন বিশ্বকোষ। এমন একজন ইংরেজি অভিধান-বিশ্বকোষপ্রণেতা হেনরি ককেরাম *ইংরেজি অভিধান* (১৬৫০) নামী গ্রন্থে 'কুম্ভীর' সম্পর্কে লিখেছেন (দ্র ডিনিন ১৯৬৭, ১৫৩)) : 'কুম্ভীর এক প্রকার অণ্ডজ জানোয়ার, তথাপি ইহাদের কোনো কোনোটি অতিশয় বিশাল আকারের হইয়া থাকে, দৈর্ঘ্যে দশ, বিশ, ত্রিশ ফুট হয়; ইহার দন্ত তীক্ষ্ণ ও পৃষ্ঠদেশ শল্কাবৃত, পদদেশ অতিশয় ধারালো নখরখচিত। ইহাকে যদি কেউ ভয় পায়, তবে ইহা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলে ইহা পালাইয়া যায়। মানুষের সমগ্র শরীর ভক্ষণ করিবার পর ইহা শিরটির কথা ভাবিয়া অশ্রুমোচন করে, কিন্তু পরিশেষে শিরটি ভক্ষণ করে। ইহা হইতেই কুম্ভীরাশ্রুবর্ষণ, অর্থাৎ কপট অশ্রুবর্ষণ প্রবাদটির জন্ম হইয়াছে।' এ-সব অভিধান কেবল জ্ঞান ছড়ায় নি, সরল ও কঠিন শব্দের অর্থ বর্ণনা করে নি, সাথে সাথে বানানেরও দিয়েছে স্থির রূপ।

সতেরোশতকে ইংরেজি বানান সম্পর্কে বিলেতি ভাষাবিদদের উৎসাহ জাগে, এবং বিজ্ঞানসম্মত বানানের জন্যে তর্কবিতর্ক জ'মে ওঠে। শুদ্ধ বানানের জন্যে তাঁদের অন্তরে জন্মে তীব্র আকুলতা, এবং ব্যাকুলতা জন্মে বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে। তাঁরা সবাই একমত ছিলেন যে ভাষা প্রথাগত : ভাষার শুদ্ধতার নিয়ামক হচ্ছে প্রথা ও সামাজিক ব্যবহার। তবু বিভিন্ন লেখক আক্রমণ করেছেন পরস্পরকে, এবং একজন অপরজনের বিরুদ্ধে এনেছেন অশুদ্ধতার অভিযোগ— যেনো শুদ্ধতার কোনো এক সুস্থির বিশুদ্ধ অদৃশ্য মানদণ্ড আছে, যার সাহায্যে ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তখন ইংরেজি ব্যাকরণের অভাব ছিলো না, শুধু অভাব ছিলো একজন থ্রাক্স, বা প্রিস্কিআনের, যাঁদের শাসন সবাই নত শিরে মেনে নিতে পারতো। মান বানান ও ব্যাকরণের জন্যে তাঁদের উৎসাহের অন্য কারণও ছিলো : ফরাশিরা ও ইতালীয়রা ইতিমধ্যেই

একাডেমি স্থাপন করেছিলো তাদের ভাষার শুদ্ধ মান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে। ষোড়শ শতকে স্থাপিত হয় ইতালীয় একাডেমি, এবং সতেরোশতকে স্থাপিত হয় ফরাশি একাডেমি, যা ইংরেজদের মনে ঈর্ষা জাগায়। ফরাশি-ইতালীয় একাডেমির কাজ ছিলো আপন ভাষার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নির্ণয় : স্বস্ব ভাষার বিধানকর্তা একাডেমি দুটি। ডানিয়েল ডিফো, ১৬৯৮-এ, 'শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, মার্জিত' ইংরেজি ভাষার জন্যে একাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব দেন, এবং একই রকম প্রস্তাব দেন ড্রাইডেন। শুদ্ধতার কোনো স্বর্গীয় শাশ্বত মানদণ্ড না থাকলেও তখন অনেকেই মনে করতেন যে শুদ্ধ সুশৃঙ্খল মান ইংরেজি পাওয়ার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। শুদ্ধতার জন্যে তাঁরা তাকান অতীতের চমৎকার সোনালি দিনগুলোর দিকে, বা কোনো একজন শেক্সপিয়রের দিকে। ড্রাইডেনের মতে বিশুদ্ধ ইংরেজির উদ্ভব হয় চসারে, আর সে-বিশুদ্ধতার পতন হচ্ছে তাঁর কালে। সুইফট বিশ্বাস করতেন— ইংরেজি মার্জিত ভাষার রূপ পেতে শুরু করে এলিজাবেথের শাসনের শুরুর কালে, এবং পতিত হয় বেয়াল্লিশের বিপ্লবের সময়। স্যামুয়েল জনসনও বিশ্বাস করতেন যে বিশুদ্ধ ইংরেজি রচিত হয়েছিলো রেস্টোরেশন-পূর্ব সাহিত্যে, আর প্রিস্টলি, শেরিডান, নোহ্ ওয়েবস্টার, পরবর্তীকালে, মনে করেছেন যে সুইফট-এর সময়ই হচ্ছে ইংরেজির স্বর্ণসময়। সংরক্ষণশীলেরা উৎসাহী ছিলেন ভাষার প্রবাহ রোধ ক'রে অতীতের সুখসমৃদ্ধ সময়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, আর প্রগতিশীলেরা চেয়েছেন পরিবর্তন : জীবনে ও ভাষায়। প্রগতিশীলেরা নতুনত্ব ও অভিনবত্বকে সানন্দে মেনে নিয়েছেন; কিন্তু সংরক্ষণশীলেরা চেয়েছেন একজন বিধাতা, যাঁর বিধান সবাই মেনে নেবে। জনসন তাঁর অভিধানের পরিকল্পনা প্রকাশের সময় (১৭৪৭) ভেবেছিলেন, তিনি এমন অভিধান রচনা করতে সক্ষম হবেন, যা অজর অমর চিরন্তন রূপ দেবে ইংরেজি উচ্চারণের, এবং ভাষাকে দেবে চির বিশুদ্ধতা; ফলে ইংরেজি হবে দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু যখন তিনি অভিধান রচনা শেষ করেন (১৭৫৫), তখন তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর অভিলাষ মৃত্যুশাসিত জীবনে অমৃতকাঙ্খার মতো দুরাশামাত্র। ভাষাকে অজর অমর চিরস্থির করার কোনো শক্তি নেই অভিধানসংকলকের। ভাষা কোনো একনায়কের নির্দেশ মানে না; কোনো সংসদ রচনা করতে পারে না ভাষার সংবিধান। তবে জনগণের অভিধান (১৭৫৫) ও পাদ্রি লৌথ-এর ব্যাকরণ (১৭৬২) বের হবার পর একাডেমির জন্যে ইংরেজের কামনা নিবৃত্ত হয়। সুইফট অভিযোগ করেছিলেন প্রধান ইংরেজি লেখকদেরও ভাষা অশুদ্ধ; আর ব্যাকরণবিদ লৌথ ঘোষণা করেছিলেন : ইংরেজি এক অবাধ্য ভাষা, তাকে কোনো সূত্রে শৃঙ্খলিত করা অসম্ভব। পাদ্রি লৌথ ইংরেজি ভাষাকে ধর্মযাজকের মতো শাসন করেছিলেন। 'শ্যাল' ও 'উইল'-এর বিতর্ক ইংরেজিতে বেশ পুরোনো—সরল ভবিষ্যতে উত্তম পুরুষের সাথে বসবে 'শ্যাল', কিন্তু প্রতিজ্ঞা বা ক্রোধে বসবে 'উইল'—এমন নিয়ম সতেরোশতকের মধ্যাংশে দেখা দেয়। আমাদের অঞ্চলে এ-পাঠ আজো দেয়া হয়, যদিও বিলেতে এ-নিয়ম আর মানা হয় না।

লৌথ নানা বিষয়ে অনুশাসন জারি করেছিলেন : তিনি ইংরেজিকে সূত্রনিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন ব'লে বহু প্রচলিত বাক্যকে অশুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর কিছু শাসন

মেনেও নিয়েছিলো ইংরেজি ভাষা। তাঁর সময়ের অনেক নামী লেখক ব্যবহার করতেন 'ইউ ওয়াজ' জাতীয় সংগঠন; কিন্তু লৌথ নির্দেশ দেন 'ইউ ওঅ্যার' ব্যবহারের, যা আজো মানা হয়। তখন 'হি ইজ টলার দ্যান আই/মি' স্বাধীন রূপান্তর রূপে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু লৌথ নির্দেশ দেন 'আই' ব্যবহারের। আনুশাসনিক ব্যাকরণের কাজ ছিলো শুদ্ধাশুদ্ধ সম্পর্ক দান : ভাষায় কী শুদ্ধ, আর কী শুদ্ধ নয়, তা নির্দেশ করাই এ-ব্যাকরণের কাজ। বিদ্যালয়পাঠ্য সমস্ত ব্যাকরণই মর্মমূলে আনুশাসনিক।

৭.৩.৩ রেনেসাঁস ও উত্তরকাল

রেনেসাঁস লাতিনের জন্যে দুঃসময় নিয়ে আসে, ঘনিয়ে আসে মহিমামণ্ডিত অবস্থান থেকে লাতিনের পতনের কাল। মধ্যযুগ লাতিনের রাজত্বকাল। রেনেসাঁসের সময় মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে বিভিন্ন 'আঞ্চলিক' ভাষা, এমনকি হয়ে উঠতে থাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনচর্চার মাধ্যম। রেনেসাঁস অভিযানের দুঃসাহসী দুরন্ত কাল : নাবিকেরা বেরিয়ে পড়ে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের উদ্দেশ্যে, জয়বিজয়ের সাথে সাথে তারা সাক্ষাৎ পায় বহু অজানা অস্বপ্নিত অভাবিত নতুন রহস্যরঞ্জিত ভাষার। ভাষাতাত্ত্বিকদের উপাত্তের পরিমাণ বেড়ে যায় বহু পরিমাণে।

সতেরো ও আঠারোশতক দুটি বিরোধী দর্শনশাসিত : একটি চৈতন্যবাদ, অপরটি অভিজ্ঞতাবাদ (দ্র § ৪.২.৭)। চৈতন্যবাদের প্রধান পুরুষ ও প্রবক্তার নাম দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), এবং অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন জন লক (৬৩২-১৭০৪)। দেকার্তের মতে মানুষ জ্ঞানার্জন করে সহজাত আন্তর ভাবনারাশির সাহায্যে; —এ-আন্তর ভাবনারাশি ইন্দ্রিয়ের সড়ক-সরণী-রাস্তা দিয়ে ঢুকে-পড়া উপাত্তকে জারিত ক'রে নেয়, অর্থাৎ মানবমন জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। অন্য দিকে অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-পথে ঢুকে-পড়া উপাত্তনির্ভর : এতে মানবমনের কোনো ভূমিকা নেই। শিশুর মন হচ্ছে *শূন্য পৃষ্ঠা* [*তাবুলা রাসা*], যাতে অভিজ্ঞতা দু-হাতে আপন রচনা লিখে যায়। সাম্প্রতিক কালের রূপান্তরবাদীরা চৈতন্যবাদী, আর সাংগঠনিকেরা অভিজ্ঞতাবাদী। দেকার্তকথিত সহজাত আন্তর ভাবনা সর্বজনীন : ভাবনার সর্বজনীনতা প্রধান স্থান দখল করেছিলো সপ্তদশ শতকের দার্শনিক বা প্রাকল্পনিক ব্যাকরণে। মধ্যযুগে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলো লাতিন ব্যাকরণ ও দার্শনিক ব্যাকরণ। রেনেসাঁসের সাথে সাথে উপাত্তের পরিমাণ যতোই বাড়তে থাকে, দার্শনিক ব্যাকরণরচয়িতারা ততোই জোর দিতে থাকেন ভাষার আন্তর সংগঠনের ওপর এবং বিভিন্ন ভাষার বাহ্যিক বৈসাদৃশ্যের ওপর। অর্থাৎ ভাষারাশি অন্তরে অভিন্ন, কিন্তু শরীরে ভিন্ন। রোজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) ঘোষণা করেছিলেন (দ্র লায়ন্স (১৯৬৮, ১৫)) সব ভাষার ব্যাকরণই অন্তরে এক, তাদের পার্থক্য কেবল বাহ্যিক। রূপান্তরবাদীদের সাথে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের চৈতন্যবাদী ও সর্বজনীন ব্যাকরণস্রষ্টাদের মিল গভীর। চোমস্কি যে-ব্যাকরণ পুস্তকটির নাম বারবার উল্লেখ করেন, সেটি ফরাশিদেশের পোর রআইআল পণ্ডিতদের রচিত *গ্রামার জেনেরাল এ রেজোনে*

(১৬৬০)। এ-ব্যাকরণে উপাত্তকে অতিক্রম ক'রে তার অন্তর্লোকের সূত্র উদঘাটনের অতি মূল্যবান চেষ্টা করা হয়।

৭.৪ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব

উনিশশতক তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক (বা কালানুক্রমিক) ভাষাতত্ত্বের শতাব্দী, যদিও তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বচর্চা এর আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ভাষাতত্ত্ব বলতে একদা তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বকেই বোঝানো হতো; — বিশশতকের তৃতীয় দশকেও ইয়েসপারসেন মন্তব্য করেছিলেন যে ভাষাতত্ত্ব হচ্ছে ভাষার ঐতিহাসিক বিদ্যা। তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা 'আবিষ্কার'। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় (১৭৮৬) উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃতের যে-স্তব করেন, তা অবিস্মরণীয় (দ্র লায়ন্স (১৯৬৮, ২৪)) : 'সংস্কৃত ভাষা, এর প্রত্নপরিচয় যাই-হোক-না-কেনো, এক বিস্ময়কর সংগঠনমণ্ডিত; এ-ভাষা গ্রিকের চেয়ে উৎকৃষ্ট, লাতিনের চেয়ে বিশদ, এবং উভয়ের চেয়ে সুচারুরূপে পরিশীলিত। তবুও এ-ভাষা উভয়েরই সাথে, ক্রিয়ামূল ও শব্দরূপে, বহন করছে এমন এক সুগভীর সম্পর্ক, যা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এদের সম্পর্ক এতো গভীর যে ত্রিভাষা নিরীক্ষার সময় কোনো ভাষাতাত্ত্বিকই বিশ্বাস না ক'রে পারবেন না যে এরা উৎসারিত হয়েছে কোনো অভিন্ন উৎস থেকে, যা সম্ভবত, আজ বিলুপ্ত।' কিন্তু তাঁর এ-উক্তির সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় নি বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বচর্চা। উনিশশতকের শুরু থেকে মোটামুটিভাবে সুষ্ঠু প্রণালিতে এ-শাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়। জর্মান, ও জর্মানিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পণ্ডিতেরা উনিশশতকের প্রারম্ভে যখন চেষ্টা করেন সুষ্ঠু তত্ত্ব রচনা ও প্রয়োগের, তখনই জন্ম হয় তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের। বিভিন্ন ভাষার ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিলো অনেক আগে : রোমান্স ভাষাসমূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে চতুর্দশ শতকেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন দান্তে (১২৬৫-১৩২১), এবং তারও আগে, দ্বাদশ শতকে, আইসল্যান্ডিক ও ইংরেজি শব্দের সাদৃশ্য সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন 'প্রথম ব্যাকরণবিদ' অভিধার এক অনামা লেখক। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে 'সংস্কৃত আবিষ্কার' ও ইউরোপীয় ভাষার সাথে এর সাদৃশ্য সন্ধান দেয় নতুন পথের।

উনিশশতকের ভাষাতত্ত্ব প্রধানত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোর বর্ণনাশাস্ত্র : ইন্দো-ইউরোপীয় নামী ভাষারাশিকে ভিত্তি করেই জন্মে ও লালিত হয় তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের তত্ত্বপ্রণালি। এ-সময়ে ভাষাতাত্ত্বিক মাত্রই জর্মান, আর যাঁরা জর্মান নন, তাঁরাও ভাষাতত্ত্ব শিখেছিলেন জর্মানিতে; — যেমন : মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক ডব্লিও ডি হুইটনি, জর্মানত্যাগী অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলার। উনিশশতকের প্রথমার্ধের ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রধানাংশ সংস্কৃতবিদ;— যেমন : এ ডব্লিও শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫), এফ শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯), ফ্রানৎস বপ (১৭৯১-১৮৬৭), এবং এ এফ পট (১৮০২-১৮৮৭)। এফ শ্লেগেল

অন দি ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড দি লারনিং অফ দি ইন্ডিয়ানস (১৮০৮) গ্রন্থে বিভিন্ন ভাষার জাতিগত সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে গুরুত্ব আরোপ করেন শব্দরূপতত্ত্বের, তাঁর ভাষায় 'আভ্যন্তর সংগঠন'-এর ওপর। এ-গ্রন্থেই তিনি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন *তুলনামূলক ব্যাকরণ* [ফেরগ্লাইখেন্ডে গ্রাম্মাটিক] অভিধাটি। আদি তুলনাবিদদের গবেষণার বিষয় ছিলো সংস্কৃত ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয়, বিশেষত গ্রিক-লাতিন ভাষার প্রাত্যয়িক ও গাঠনিক রূপতত্ত্ব। উনিশশতকের প্রথমার্ধের চারজন খ্যাতনামা ভাষাতাত্ত্বিক : আর রাস্ক (১৭৮৭-১৮৩২), ইয়াকব গ্রিম (১৭৮৫-১৮৬৩), ফ্রানৎস বপ (১৭৯১-১৮৬৭), ও হুমবোল্ড্ট (১৭৬৭-১৮৩৫)। রাস্ক ও গ্রিমকেই বিবেচনা করা যেতে পারে ইন্দো-ইউরোপীয় তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের সূচনাকারী ব'লে। তাঁদের সাথে যোগ করা যায় বপের নাম, এবং এ-তিনজনকে নির্দেশ করা সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে।

প্রাচীন নর্স ও প্রাচীন ইংরেজির প্রথম সুশৃঙ্খল ব্যাকরণ রচনা করেন রাস্ক। গ্রিম-এর *জর্মানিক ব্যাকরণ* (১৮১৮) সূচনা করে জর্মানিক ভাষাতত্ত্বের। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের 'স্ট্রং', 'উইক' প্রত্যয় ও 'অ্যাব্লাউট', 'উম্লাউট' জাতীয় ধ্বনিসূত্র প্রথম দেখান ও পারিভাষিক শব্দ রচনা করেন গ্রিম। বিভিন্ন শব্দের সুশৃঙ্খল তুলনার সাহায্যে শব্দরাজির ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক সুশৃঙ্খলভাবে নির্দেশের উপায় বের করেন রাস্ক। তাঁর সিদ্ধান্ত (দ্র রবিন্স (১৯৬৭, ১৭১)) : 'দুটি ভাষার অপরিহার্য শব্দরাজির মধ্যে যদি এমন সাদৃশ্য দেখা যায় যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বর্ণপরিবর্তনের সূত্র নির্ণয় সম্ভব হয়, তবে মনে করতে হবে যে ওই ভাষাদ্বয়ের মধ্যে মৌল সম্পর্ক বিদ্যমান।' যে-ধ্বনিসাম্যসূত্র বর্তমানে 'গ্রিমের সূত্র' নামে পরিচিত, প্রথম উদ্ভাবক রাস্ক। 'গ্রিমের সূত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় *জর্মানিক ব্যাকরণ*-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮২২)। সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তনের যে সাম্য তিনি লক্ষ্য করেন, তা-ই গ্রিমের সূত্র নামে পরিচিত। গ্রিম লক্ষ্য করেছিলেন যে সংস্কৃতের এক বিশেষ ধ্বনি গ্রিক-লাতিন-গোথিক-ইংরেজিতে এক নির্দিষ্ট সূত্রানুসারে পরিবর্তিত হয়। এ-পরিবর্তন প্রণালি সরলভাবে প্রকাশ করা যায় (২)-এর স্কিমার সাহায্যে।

(২)
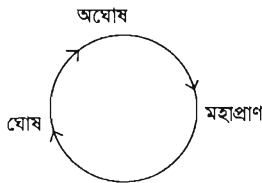
তাঁর ধ্বন্যান্তর সূত্র অবশ্য সর্বদা অভ্রান্ত নয়। তাঁর উক্তি (দ্র রবিন্স (১৯৬৭, ১৭২)) : 'ধ্বনিপরিবর্তন একটি সাধারণ প্রবণতা, কিন্তু তা যে সর্বত্র অনুসৃত হবে তা নয়।'

তখন রোমান্টিক বাতাস বয়ে যাচ্ছিলো জর্মানিতে, আর তাঁর চাঞ্চল্যছড়ানো ছোঁয়া লেগেছিলো গ্রিক-বপ-শ্লেগেল-এর চিত্তে। এ ডব্লিও শ্লেগেল শেক্সপিয়রের অমর অনুবাদক; তিনি আলোড়িত হয়েছিলেন তৎকালীন 'ঝড়ঝঞ্ঝা' আন্দোলন দিয়ে। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে ধ্বনিপরিবর্তনসূত্রপ্রবণতা ইয়াকব গ্রিম ও তাঁর ভাই ভিলহেল্‌ম গ্রিম সংগ্রহ করেছিলেন চিরায়ত জর্মান রূপকথারাজি, যা হরণ করেছে সমগ্র বিশ্বের শিশুচিত্ত। তখন জর্মানিতে হের্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) ছড়াচ্ছিলেন তাঁর জাতি-উৎকর্ষতত্ত্ব। গ্রিম অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হের্ডারের তত্ত্ব দ্বারা, এবং প্রচার করেছিলেন জর্মান জাতির উৎকর্ষের কথা। এ-তত্ত্ব, কয়েক দশক পরে, চরম উগ্র রূপ পায় শেরের-এর রচনায়, এবং শতবর্ষ পরে বিস্ফোরিত হয়।

বিভিন্ন ভাষার আদিরূপ উদ্ধার লক্ষ্য ছিলো উনিশশতকের ভাষাতাত্ত্বিকদের। রাস্ক, *অনুসন্ধান* সন্দর্ভে, সন্ধান করেন স্ক্যানডিন্যাভীয় ভাষার উৎস; এবং বপ তাঁর 'কনজুগেশন প্রণালি'র সাহায্যে পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করেন সে-মূলভাষা, যার ক্রমক্ষয়ের ফলে জন্মেছে ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রের ভাষারাশি। ভাষার পরিবর্তন বলতে তখন বোঝানো হতো ভাষার ক্ষয় ও বিনাশ; এবং সংস্কৃতকে মনে করা হতো ইন্দো-ইউরোপীয় আদি বা মূলভাষার সন্নিকটতম ভাষা ব'লে। প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষানুসন্ধানে বেরিয়ে বপ আবিষ্কার করেছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূল প্রণালিগুলো। কোনো ভাষার পূর্ববর্তী স্তর নির্ণয়ের জন্যে দরকার তুলনা, এবং কোনো একটি মূলভাষার জীর্ণতার ফলেই ঘটে ভাষাপরিবর্তন : এ ছিলো সে-সময়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। বপের ও অন্যান্যের ধারণা ছিলো প্রত্যয়ের উদ্ভব হয় স্বতন্ত্র সহায়ক শব্দ থেকে।

ভিলহেল্‌ম ফন হুমবোল্‌ড্‌ট্‌, যাকে পুনরাবিষ্কার করেছেন চোমস্কি, উনিশশতকের ভাষাতত্ত্বের একজন প্রধান পুরুষ। তাঁর বিপুল রচনাবলি যদি আরো সুশৃঙ্খল হতো, এবং পঠিত হতো ব্যাপকভাবে, তাহলে তিনি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম জনকের আসন পেতেন। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের সীমা পেরিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে। তিনি ছিলেন প্রুশীয় সরকারের মন্ত্রী ও বহু ভাষা-জ্ঞানী; রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের কিছু কিছু ধারণা, উনিশশতকেই, তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিলো। তিনি ভাষার সৃষ্টিশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, যেমন আজকাল রূপান্তরবাদীরা মনে করেন যে, ভাষাধিকার মানুষের সহজাত গুণ, তা না হ'লে শুধু প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়ার ভাষার উদ্ভব সম্ভব ছিলো না। কোনো ভাষার যতো ব্যাপক পরিমাণ উপাত্তই বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হোক-না-কেনো, তার মধ্যে ওই ভাষাকে পাওয়া যায় না—এমন কথা হুমবোল্‌ড্‌ট্‌ বলেছিলেন। চোমস্কির বক্তব্যও তা-ই। আধুনিক কালে পোর রআইআল ব্যাকরণ, ও তাঁকে আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব চোমস্কির। তিনি ভাষারাশিকে রূপতত্ত্বানুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন : বিশ্লিষ্ট ভাষা, যৌগিক ভাষা, ও প্রত্যয়ান্ত্য ভাষা। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে তাঁর এ-শ্রেণীকরণ আজো রক্ষিত। এ-তত্ত্বে শব্দকে ভাষার মৌল একক ধ'রে শব্দগঠনের বিভিন্ন রীতি

অনুসারে ভাষাশ্রেণীকরণ করা হয়। এরকম চিন্তা অবশ্য শ্লেগেল ও বপ-এরও ছিলো। তিনি যে-কোনো ভাষায় সংগঠনকেই মূল্যবান মনে করতেন। তবে তিনি আকৃষ্ট ছিলেন প্রত্যয়ান্ত্য ভাষার প্রতি। যে-সব ভাষার শব্দরূপে ধাতুর আন্তর পরিবর্তন ঘটে বা প্রত্যয়নের সময় ঘটে চমৎকার রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন, সে-সব ছিলো তাঁর প্রিয় ভাষা। তাঁর মত ছিলো, উদ্ভবকালে ভাষা প্রত্যয়জড়িত থাকে, এবং কালপ্রবাহে প্রত্যয়রাশি পৃথক হয় ও পরিণত হয় বিশ্লিষ্ট ভাষায়। ভাষার বাক্যসংগঠনকেও তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন : (ক) ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে ব্যাকরণিক অন্বয়হীন বাক্যসংগঠন (যেমন : চীনা ভাষা); (খ) শব্দরূপে ব্যাকরণিক অন্বয়নির্দেশক ভাষা (যেমন : সংস্কৃত), এবং (গ) এক শব্দে ঘনীভূত বাক্যসংগঠন (যেমন : আমেরিনডিয়ান ভাষা)।

মধ্য-উনিশশতকের প্রভাবশালী ভাষাতাত্ত্বিক এ শ্লাইখার (১৮২১-১৮৬৮)। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিষয়ক তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ : *কোম্পেনডিউম অফ দি কম্প্যারেটিভ গ্রামার অফ দি ইন্ডো-জর্ম্যানিক ল্যাংগুয়েজেজ* (১৮৬১), *আউটলাইন অফ এ ফোনেলোজি অ্যান্ড মোরফোলোজি অফ দি ইন্ডো-জার্মানিক প্যারেন্ট ল্যাংগুয়েজ*, এবং *হ্যান্ডবুক অফ দি লিথুয়ানিয়ান ল্যাংগুয়েজ* (১৮৫৬-১৮৫৭)। বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশ দেখানোর জন্যে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে যে-বংশলতিকা [স্টমবাউমতেওরি] ব্যবহৃত হয় তার উদ্ভবক শ্লাইখার। এটিকে তিনি গ্রহণ করেন তাঁর প্রিয় শাস্ত্র উদ্ভিদবিদ্যা থেকে। বংশলতিকা নির্মাণের যে-প্রণালি তিনি উদ্ভাবন করেন, তাতে জীবিত ভাষাসমূহকে, বিভিন্ন সাধারণ বৈশিষ্ট্যানুসারে, বিন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন উপগোত্রে, এবং প্রত্যেক উপগোত্রের জন্যে কল্পনা করা হয় এক-একটি *পিতৃভাষা* [গ্রুন্ডস্প্রাখ] এবং তাদের সকলের আদিরূপ রূপে শনাক্ত করা হয় এক মূলভাষা [উরস্প্রাখ]। এ-মূলভাষায় সমস্ত উপগোত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সঞ্চিত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মূলভাষা নির্ণয় করা হয় বিভিন্ন উপগোত্রের শব্দ তুলনা ক'রে, এবং ওই ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক সম্পর্ক মূর্ত করা হয় বংশলতিকায়। মূলভাষার শব্দসমূহ 'পুনর্গঠিত শব্দ', আর এরা রূপে পৃথক সমস্ত উপগোত্রের শব্দ থেকেই। পুনর্গঠিত শব্দের আগে তারকাচিহ্ন বসানোর রীতি প্রবর্তন করেন শ্লাইখার। তিনি যে-ভাষা পুনর্গঠন করতেন, তাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন; তাই পুনর্গঠিত ভাষায় গল্পও লিখতেন তিনি। তাঁর বংশলতিকাকাঠামো গৃহীত হয়েছিলো তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের অগ্রগতির সাক্ষ্য রূপে : কেননা বংশলতিকা এক-একটি ভাষাগোত্রের সদস্যদের সম্পর্ক মূর্ত ক'রে তোলে। বংশলতিকার শিরদেশের মূলভাষা থেকে যাত্রা ক'রে যতোই নিচে নামা যায় ততোই জানা যায় বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক। এ-প্রণালির মূল্য অস্বীকার করা যায় না, তবে এর দ্বারা অসচেতন পাঠক বিভ্রান্ত হ'তে পারেন। বংশলতিকায় যেমন সুচারুরূপে বিশেষ কোনো স্থানে ভাষা-শাখায়ন দেখানো হয়, বাস্তবে ভাষা এমনভাবে দ্বিভক্ত-ত্রিভক্ত হয় না। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষা জন্মাতে সময় লাগে;— ভাষাবৃক্ষে হঠাৎ শাখায়নের মতো ভাষা জন্মে না। ভাষার বিবর্তন এক ধীরস্থির কালানুক্রমিক পদ্ধতি।

ভাষাসম্পর্কের ও ভাষাবিবর্তনের এক বিরোধী তত্ত্ব দেন শ্লাইখারের ছাত্র জে শ্মিড্‌ট্‌ : তাঁর তত্ত্বের নাম *তরঙ্গতত্ত্ব* [ভেলনতেওরি]। এ-তত্ত্বানুসারে এক বিশেষ এলাকার সন্নিকট ভাষাগুলোর মধ্যে অভিনবত্ব, ভাষিক ও ধ্বনিক পরিবর্তন যেনো ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বংশললিকাতত্ত্বের বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযোগ : এ-তত্ত্ব ইঙ্গিত করে যে বিভিন্ন আঞ্চলিক বা উপভাষার আবির্ভাব সাম্প্রতিক ঘটনা, আদিতে উপভাষা ছিলো না। বংশলতিকার নিম্নতম শাখাসমূহে স্থান পায় বিভিন্ন উপভাষা। শ্লাইখার ডারউইনবাদী ছিলেন, তাঁর একটি গ্রন্থের নাম *ডারউইনীয় তত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান* (১৮৬৩)। ভাষা তাঁর কাছে ছিলো নানা প্রাকৃতিক জৈববস্তুর একটি, তাই তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রীতিনীতি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ভাষাব্যাখ্যায়। তাঁর বিশ্বাস ছিলো ভাষা ভাষাভাষীদের নিয়ন্ত্রণনিরপেক্ষ; —ভাষা তার নিজস্ব নিয়মে জন্মে, বিকশিত হয়, ও বিনষ্ট হয়। বপেরও ধারণা ছিলো ভাষা এক প্রাকৃতিক জৈববস্তু, যা বিশেষ নিয়মে জন্মে, আপন প্রাকৃতি অনুসারে জীবনধারণ করে, বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে, পরিশেষে লোকান্তরিত হয়। শ্লাইখার ভাষাকে অনেকটা প্রাণী ও উদ্ভিদের মতো মনে করতেন : ভাষা আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, পরাভূত হ'লে বিনষ্ট হয়, জয়ী হ'লে টিকে থাকে— যেমন টিকে আছে উনিশশতকী ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রিয় ভাষাগোত্র ইন্দো-ইউরোপীয়। এ-সময়ে ভাষাতত্ত্বে বহু পারিভাষিক শব্দ ঢুকে পড়ে জীববিজ্ঞান থেকে, তার মধ্যে যেটি প্রায় প্রত্যহ ব্যবহৃত হয়, সেটি হচ্ছে 'মোরফোলোজি' [রূপতত্ত্ব]।

উনিশশতেকর শেষাংশে দেখা দেন একগোত্র বিদ্রোহী, যাঁরা পরিচিত *নবব্যাকরণবিদ* [ইয়ুংগ্রাম্মাতিকার] নামে।[৭] তাঁরা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেননি শুধু তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে, আধুনিক কালের ভাষাবিজ্ঞানের সাথেই তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

নবব্যব্যাকরণ তত্ত্বের দুই প্রধান : অশ্‌টহফ, এবং ব্রুগম্যান। ধ্বনিপরিবর্তন সম্পর্কে তাঁরা মূল্যবান কাজ করেছিলেন। তাঁদের তত্ত্ব (দ্র রবিন্স (১৯৬৭, ১৮২-১৮৩)) : 'সমস্ত ধ্বনিপরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে এবং ব্যতিক্রমহীন সুনির্দিষ্ট সূত্রানুসারে সংঘটিত হয়। একই ভাষায় সে-সূত্র ব্যতিক্রমরহিত। অভিন্ন ধ্বনি অভিন্ন প্রতিবেশে অভিন্ন প্রণালিতে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু বিশেষ শব্দরাশির সাদৃশ্যগত গঠন ও পুনর্গঠন, ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক সমস্ত পর্বের, ভাষিক পরিবর্তনের বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য।' প্রাচীন গ্রিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা যেখানে সাদৃশ্যকে মনে করতেন ভাষার শৃঙ্খলার উদাহরণ, সেখানে নবব্যাকরণবিদেরা সাদৃশ্যকে মনে করতেন নিয়মের রাজ্যে অনিয়মের উৎপাত ব'লে। উনিশশতকী ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রাকৃতিক নিয়মের বিশ্বজনীতায় বিশ্বাসী ছিলেন— প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য ও সাম্য তখনকার বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। অশ্‌টহফের কাছে তাই ভাষাসূত্ররাশি ছিলো অমোঘ সূত্র, যা ভাষাভাষীর ওপর নির্ভরশীল নয়। নবব্যাকরণবিদেরা পুনর্গঠিত ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দসমূহের সত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা উপাত্তে আস্থাশীল, এবং উৎসাহী উপাত্তের আন্তর সূত্র আবিষ্কারে। এ-আবিষ্কারে তাঁরা সাহায্য নিয়েছেন শারীরবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের। তাঁদের নির্দেশ করা যায় মার্কিন সাংগঠনিকদের অগ্রযাত্রী ব'লে (দ্র হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮, ২০-৩৭))।

৭.৫ ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব

প্রাচীন বিশ্বে ভাষাতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল ভারতবর্ষে : ভাষার সমস্ত দিকে ও স্তরে পড়েছিলো প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থের কোনোটিই তাঁদের দৃষ্টি ও মেধাকে এড়াতে পারে নি, ফলে ক্রাইস্টের জন্মের অনেক আগে ভারতবর্ষে গ'ড়ে উঠেছিলো এমন এক বর্ণনামূলক ভাষাশাস্ত্র, যাকে বিজ্ঞানসম্মত ব'লে মেনে নিতে সাংগঠনিকেরাও দ্বিধা করেন নি। ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসিত শাস্ত্ররূপে ভাষাতত্ত্ব উদ্ভূত হয় নি : ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ধর্মজ : ষড়-বেদাঙ্গরূপে জন্মলাভ করে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব। বেদের ষড়াঙ্গ—'শিক্ষা', 'কল্প', 'ব্যাকরণ', 'নিরুক্ত', 'ছন্দ', ও 'জ্যোতিষ'—এর মাঝে চারটিই ভাষাতাত্ত্বিক। বেদের শুদ্ধ পাঠ ও প্রয়োগের জন্যে যে-চারটি বেদাঙ্গ অত্যাবশ্যক, সেগুলো হচ্ছে— শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ। এগুলো বেদসহায়ক শাস্ত্র। শিক্ষার কাজ বেদের শুদ্ধ উচ্চারণ নির্দেশ, ব্যাকরণের কাজ বেদের শুদ্ধ শব্দবিশ্লেষণ, নিরুক্তর কাজ বেদের শুদ্ধ অর্থনির্ণয়, ও ছন্দের কাজ বেদের শুদ্ধ ছন্দনির্দেশ। বেদের শুদ্ধতা রক্ষার জন্যে গ'ড়ে উঠেছিলো ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, এবং ধার্মিকের ভক্তি ও ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে গবেষণারত হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকেরা। বেদের শুদ্ধতা রক্ষা তাঁদের লক্ষ্য হ'লেও তাঁরা পুরোহিত-ধর্মযাজক ছিলেন না, তাই তাঁরা সহজেই অতিক্রম ক'রে যেতে পেরেছিলেন তাঁদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য আছে আলেকজান্দ্রিয়ায় ভাষাতত্ত্বের উন্মেষের : সেখানে ধ্রুপদী সাহিত্যের শুদ্ধতা রক্ষার জন্যে জন্মেছিলো ভাষাতত্ত্ব (দ্র § ৭.১.৭)। ধ্রুপদী সাহিত্যের ভাষা যখন আলেকজান্দ্রীয় ভাষাবিদদের কাছে অত্যন্ত সুদূর ও শুদ্ধ অতীতের বিষয় হয়ে পড়েছিলো, চারপাশের ভ্রষ্ট ভাষার সাথে তার যখন মিল পাওয়া যাচ্ছিলো না, তখন তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন বিশুদ্ধ অতীতের 'শুদ্ধ' ভাষা উদ্ধারের ও রক্ষার। ভারতবর্ষে বৈদিক পুণ্যশ্লোকের ভাষা যখন সুদূর শুদ্ধ পুণ্যলোকের অচেনা ভাষায় পরিণত, চারপাশে যখন শোনা যাচ্ছিলো না বেদের ঐশী ধ্বনিঝংকার, যখন কানে আসছিলো শুধু অশ্লীল কোলাহল, তখন বেদের শুদ্ধতা রক্ষার জন্যে জন্মে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব।

ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এক প্রাণবন্ত শাস্ত্র : অসংখ্য ভাষাবিদ ও অজস্র ব্যাকরণগ্রন্থের ও ধারার এক মহিমামণ্ডিত এলাকা ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব। এ-এলাকায় আছেন তিন শো-র অধিক ব্যাকরণবিদ, জন্মেছিলো বারোটির মতো ব্যাকরণধারা, এবং রচিত হয়েছিলো সহস্রাধিক ব্যাকরণগ্রন্থ (দ্র বেলভালকার (১৯১৫)।[৮] ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব প্রবণতায় আনুশাসনিক, কিন্তু প্রণালিপদ্ধতিপ্রকৃতিতে বর্ণনামূলক, এবং অনেকাংশে রূপান্তরমূলক। এ-শাস্ত্র চেয়েছে বেদের শুদ্ধতারক্ষার সূত্র বা বিধি রচনা করতে, তাই তা আনুশাসনিক; কিন্তু যে-প্রণালিতে সে-সূত্ররাশি রচিত, তা বর্ণনামূলক, এবং মাঝেমাঝে এমনভাবে সূত্র রচনা করা হয়েছে, যার সাথে মিল পাওয়া যায় শুধু ১৯৫৭ উত্তর রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের। তাঁরা অবশ্য সচেতনভাবে ভাষা 'সৃষ্টি' করতে চান নি, তাঁরা চেয়েছিলেন ভাষা বিশ্লেষণ করতে, নতুন নতুন শব্দ বা বাক্য সৃষ্টির জন্যে তাঁর রচনা করেন নি তাঁদের সূত্র, গঠিত শব্দের অনুপুঙ্খ বর্ণনা ছিলো তাঁদের লক্ষ্য।

ভাষাচিন্তা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম চিন্তাগুলোর অন্যতম। ঋগ্বেদে এমন সব ভাষাবিষয়ক মন্তব্য পাওয়া যায়, যাতে মনে হয় পাণিনির আবির্ভাবের অনেক আগেই এ-দেশে শুরু হয়েছিলো ব্যাকরণচিন্তা। ধ্বনিতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিলো বহু আগে। *ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* ও *উপনিষদ*-এ পাওয়া যায় 'করণ' [উচ্চারক], 'স্থান' [উচ্চারণস্থান], 'স্পর্শ', 'উষ্ম', 'অন্তস্থ', 'স্বর', 'ঘোষ' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ (দ্র অ্যালেন (১৯৫৩, ৬))। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ধারাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : পাণিনি-পূর্ব ও পাণিনি-উত্তর। পাণিনিই সে-আলোকস্তম্ভ, যাঁর মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিলো অতীতের সমস্ত আলোক, এবং যাঁর আলোতে আলোকিত হয়েছে সুদীর্ঘ উত্তরকাল। পাণিনি-পূর্ব ভাষাতাত্ত্বিকদের কয়েকজন : যাস্ক, শাকল্য, শাকটায়ন, গার্গ্য, গালব, স্ফোটায়ন। সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিকাংশ মূলতত্ত্ব প্রাকপাণিনীয় : বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছিলো তাঁর অনেক আগে। যাস্ক চার রকম পদ নির্দেশ করেছিলেন— বিশেষ্য, ক্রিয়া, উপসর্গ ও নিপাত (অব্যয়)। শাকটায়ন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে ভাষার সমস্ত শব্দই ধাতুরাজ। শব্দকে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে, এবং প্রকৃতিকে পুনরায় নাম ও ধাতুতে বিভাগের প্রণালি স্থির হয়েছিলো পাণিনির বহু আগে। বাক্যের উদ্দেশ্যে-বিধেয় বিভাগও প্রাকপাণিনীয়। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণিক পরিভাষার অধিকাংশ অপাণিনীয়।

যাস্কের (?খ্রিপূ ৮০০-৭০০) গ্রন্থের নাম *নিরুক্ত*। তিনি সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 'নৈরুক্ত' বা ব্যুৎপত্তিতাত্ত্বিক। যাস্ক, *নিরুক্ত*র পাঁচ অধ্যায়ে, নির্দেশ করেছেন বেদের শব্দরাশির ব্যুৎপত্তি ও গঠনপ্রণালি। যাস্কের পরেই যাঁর নাম আসে, তিনি বিশ্ববিশ্রুত পাণিনি, যাঁর মধ্যে প্রাচীনতম ভাষাতাত্ত্বিক ধারাগুলো পরিণতি লাভ করে। পাণিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপতাত্ত্বিক; তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী*, ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩) মতে, 'মানবমনীষার পরম উৎকর্ষের নিদর্শন'। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ রূপতাত্ত্বিক নন, সর্বাধিক ভাগ্যবানও; — *অষ্টাধ্যায়ীই* হচ্ছে প্রাচীনতম শব্দশাস্ত্রগ্রন্থ, যা অখণ্ডরূপে উত্তরকালের হাতে এসে পৌঁচেছে। বলা যায় পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীই* হচ্ছে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব জগতের একমাত্র অখণ্ড মৌলিক গ্রন্থ : এর পূর্ববর্তী রচনারাজি কালের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে ভগ্নাংশরূপে উপস্থিত হয়েছে উত্তরকালের নিকট, আর *অষ্টাধ্যায়ী*-উত্তর ব্যাকরণ পুস্তকগুলো *অষ্টাধ্যায়ীরই* ভাষ্য-উপভাষ্য-মহাভাষ্য। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বমনীষা জড়ো হয়েছিলো একটি গ্রন্থে—*অষ্টাধ্যায়ীতে*; এর পূর্ববর্তী ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থরাজি প্রায় বিস্মৃত বিলুপ্ত; এবং এর পরবর্তী গ্রন্থগুলো জন্মেছে এরই গর্ভ থেকে, বা একে কেন্দ্র ক'রে। প্রথানুবর্তনে ভারতীয় প্রতিভা তুলনারহিত। প্রতিষ্ঠিত ধারার অনুকরণ এবং অনুকরণ ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের একটি বড়ো লক্ষণ। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে চারজনই প্রধান পুরুষ : পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরি। প্রথম তিনজন ঋষির মর্যাদা পেয়েছেন;—তাঁদের সম্মিলিত রচনারাশির অভিধা *ত্রিমুণি ব্যাকরণ*। ভর্তৃহরির ভাগ্যে অবশ্য ঋষির সম্মান জোটে নি, যদিও তাঁর মেধা ও তত্ত্ব অত্যুজ্জ্বল।

পাণিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের সালাতুর-এ (লাহোর), সম্ভবত খ্রিপূ চতুর্থ শতকে। তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী* আট অধ্যায়ে বিন্যস্ত চার হাজার সূত্রের সমষ্টি। এ-সূত্ররাশি সমস্ত

সংস্কৃত শব্দের গঠনপ্রণালি নির্দেশ করেছে। তাঁর পরে আসেন তাঁর শত্রুমিত্ররা : ভাষ্য-উপভাষ্যকারগণ। পাণিনির প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ও ত্রুটিনির্দেশক কাত্যায়ন। [?খ্রিপূ দ্বিতীয় শতক]। কাত্যায়ন তাঁর *বার্তিকায়* পাণিনির অনেক সূত্রের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন, এবং নতুন সূত্র রচনা করেছেন; এবং অনেক সূত্র সংস্কার ক'রে দিতে চেয়েছেন শুদ্ধ রূপ। চার হাজার বার্তিকায় তিনি ত্রুটি ধরেছেন পাণিনির পনেরো শো সূত্রের, এবং সে-সব সূত্র সংশোধন করেছেন। শত্রুর পরে আসেন মহামিত্র পতঞ্জলি [খ্রিপূ দ্বিতীয় শতক] : তিনি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন পাণিনির বিরুদ্ধে কাত্যায়নের অভিযোগগুলো। তিনি *অষ্টাধ্যায়ীর* যে-ভাষ্য রচনা করেন, তার নাম *মহাভাষ্য*। মহাভাষ্যও আট-অধ্যায়ী, এবং প্রতিটি অধ্যায়ে আছে চারটি ক'রে পদ, এবং প্রতিটি পদ বিভক্ত এক থেকে ন-টি আহ্নিকে। তিনি পাণিনির সমস্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নি;—কাত্যায়ন যে-সমস্ত সূত্রের ত্রুটি ধরেছেন, এবং তিনি নিজে যে-সমস্ত সূত্রকে সংশোধনযোগ্য ব'লে বিবেচনা করেছেন, শুধু সে-সমস্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন পতঞ্জলি। তাঁর পরবর্তী মহৎ ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরি [সপ্তম শতক]। তাঁর গ্রন্থ *বাক্যপদীয়* ব্যাকরণতত্ত্ব সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ রচনা। তাঁকে বলা যায় 'পরমাণুবাদী' বা 'অদ্বৈতবাদী';— আবিভাজ্যতা তাঁর তত্ত্বের সার কথা। তিনি 'বাক্যবাদী'; তাঁর মতে বাক্য অখণ্ডনীয় অবিভাজ্য। *বাক্যপদীয়* বিভক্ত তিন অধ্যায়ে : ব্রহ্ম বা আগমকাণ্ড, বাক্যকাণ্ড, এবং পদ বা প্রকীর্ণকাণ্ড। তাঁর পর ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের নতুন কিছু করার ছিলো না। ইতিমধ্যে সংস্কৃত ভাষা সুচারুরূপে ম'রে গেছে, চারপাশের অপভ্রংশের অশীল কোলাহলও তাকে আর অশুদ্ধ করতে পারছিলো না। সংস্কৃত তখন পরিণত হয়েছে এক শ্রদ্ধেয় অবিচল নিষ্প্রাণ ধ্রুপদী ভাষায়, জীবনের তীব্র তাপেও বিপর্যস্ত হ'তে পারছিলো না তার কোনো ঠাণ্ডা সূত্র। তাই ভাষাতাত্ত্বিকেরাও মুক্তি পেয়েছিলেন মেধা নিয়োগ ক'রে নতুন সূত্র রচনার দায় থেকে। তাঁদের সামনে তখন শুধু খোলা থাকে একটি রাস্তা : মহামুনি পাণিনির জটিল কঠিন নির্মম 'ভাষাবিজ্ঞানীর ব্যাকরণ' অষ্টাধ্যায়ীর সরলীতরলীকরণ হয় শুধু তাঁদের কৃত্য। সরলীতরলীকরণ ধারার প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিমলসরস্বতীর [চতুর্দশ শতক] *রূপমালা*। এ-গ্রন্থের অনুকরণে জন্মে 'কৌমুদী' নামের সরলীকৃত ব্যাকরণের এক দীর্ঘ ধারা। কৌমুদীজাতীয় পাণিনির সরল ভাষ্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভট্টোজি দীক্ষিত [সপ্তদশ শতক]। *সিদ্ধান্তকৌমুদী* নামে তিনি রচনা করেন পাণিনির এক সরল ভাষ্য, আর এ-ভাষ্য এতো প্রিয় ও প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিলো যে *অষ্টাধ্যায়ী* শিক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়েছিলো। স্বরচিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভাষ্যও তিনি রচনা করেছিলেন *প্রৌঢ়-মনোরমা* ও *বাল-মনোরমা* নামে। এছাড়া বহু ভাষ্য রচিত হয়েছিলো পাণিনির 'ধাতুপাঠ','গণপাঠ', 'লিঙ্গানুশাসন', 'উনাদিপাঠ', এবং 'পরিভাষা'র।

৭.৫.১ ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসন

শব্দবিশ্লেষণশাস্ত্রের প্রাকপাণিনীয়, এবং জনপ্রিয়, নাম *ব্যাকরণ*; এর বদলে পতঞ্জলি *মহাভাষ্য*-এ ব্যবহার করেছিলেন আত্মবিশ্লেষণাত্মক অভিধা 'শব্দানুশাসন'। শুদ্ধ, এবং শুধুমাত্র শুদ্ধ শব্দগঠনপ্রক্রিয়া নির্দেশ করা ব্যাকরণের কাজ। প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণ বলতে বোঝানো হতো

রূপতত্ত্ব। ব্যাকরণবিদেরা একে বেদের ষড়াঙ্গের শ্রেষ্ঠাঙ্গ ব'লে বিবেচনা করতেন, এবং প্রায় ধর্মগ্রন্থের তুল্য মর্যাদা দিতেন। ভর্তৃহরি ব্যাকরণের নাম দিয়েছিলেন 'ব্যাকরণস্মৃতি'। ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসনের কাজ হচ্ছে শব্দের আন্তর গঠনপ্রক্রিয়া আবিষ্কার ও তার সূত্র রচনা; এবং এ-কাজে অশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকেরা। যাস্কের *নিরুক্ত*গ্রন্থে বৈদিক শব্দ চমৎকার শৃঙ্খলার সাথে বিশ্লেষিত হয়েছিলো। কিন্তু ভারতীয় শব্দবিশ্লেষণশাস্ত্র পরম বিকাশ লাভ করে পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীতে*। ভাষাতত্ত্বের যে-দুটি এলাকার প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব তুলনারহিত, তার প্রথমটি রূপতত্ত্ব; এবং তার প্রধান পুরুষ পাণিনি। শব্দের ত্রিমাত্রা : রূপ, ধ্বনি ও অর্থ। শব্দের উৎপত্তি নির্দেশ ক'রে অর্থ নির্দেশ করেছেন নৈরুক্ত বা ব্যুৎপত্তিবিদেরা, ধ্বনি নির্দেশ করেছেন ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা, এবং রূপ বিশ্লেষণ করেছেন রূপতাত্ত্বিকেরা। শব্দ সম্পর্কে দার্শনিক বিতর্কও কম হয় নি : একদলের মতে শব্দ অবিভাজ্য ও অবিশ্লেষ্য, তা অদ্বৈত পরমাত্মার বহিঃপ্রকাশ; এবং বিরোধীদল পোষণ করেছেন এর বিপরীত মত। চারপাশের প্রাকৃত ভাষার অশুদ্ধ হস্তাবলেপ থেকে ঐশী সংস্কৃত শব্দরাজিকে মুক্ত ও বিশুদ্ধ রাখার জন্যে সংস্কৃত শব্দপুঞ্জের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন রূপতাত্ত্বিকেরা, এবং বিশ্লেষণ করতে করতে পৌঁচেছেন শব্দের আত্মায়, বা 'প্রকৃতি'তে। প্রাচীন গ্রিস বা রোমে এমন হয় নি। সংস্কৃতের মতোই প্রত্যয়বিজড়িত ভাষা লাতিন; কিন্তু রূপতাত্ত্বিকেরা প্রকৃতি থেকে প্রত্যয়কে বিশ্লিষ্ট করতে গিয়ে যেখানে হিমশিম খেয়েছেন এবং পদেপদে বিভ্রান্ত হয়েছেন, সেখানে সংস্কৃত রূপতাত্ত্বিকেরা বীজগাণিতিক সূত্রে তাঁদের ভাষার সমস্ত শব্দের গঠনপ্রক্রিয়া নির্দেশ করেছেন। প্রিস্কিআন লাতিন রূপতত্ত্ব ব্যাখ্যায় পদেপদে পদস্খলিত হয়েছেন (দ্র ডিনিন (১৯৬৭, ১১৯-১২০)), কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা অর্জন করেছেন সাফল্যের পর সাফল্য।

অর্থ ও রূপে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সংস্কৃত শব্দাবলির দিকে একটু মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যে এ-সব শব্দ দু-অংশে বিভক্ত। একটি অংশ মৌলিক, যাকে বিবেচনা করা যায় শব্দসাররূপে; এবং দ্বিতীয়াংশটিকে ধরা যায় পরিবর্তমান অংশরূপে, যা শব্দের সারাংশের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে। এভাবে শব্দপর্যবেক্ষণদৃষ্টি অর্জন করেছিলেন তাঁরা; এবং শব্দকে বিশ্লিষ্ট করেছিলেন দু-অংশে। শব্দের মৌল বা সার অংশকে তাঁরা বলেছেন 'প্রকৃতি' বা পরমাণু অংশ; এবং পরিবর্তমান অমৌল দ্বিতীয়াংশকে বলেছেন 'প্রত্যয়'। শব্দবিভাজনের এ-প্রণালির নাম 'সংস্কার'। প্রকৃতিকে তাঁরা পুনরায় দু-শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন : 'নাম' ও 'ধাতু'। যে-প্রকৃতি ক্রিয়া বোঝায় তাই ধাতু; আর যা তা বোঝায় না, তা নাম। যাস্ক ও শাকটায়ন গিয়েছিলেন আরো গভীরে—তাঁরা দাবি করেছিলেন যে ভাষার সমস্ত শব্দই ধাতুজাত। 'নাম' শব্দের বিকল্পে পাণিনি ব্যবহার করেছিলেন নতুন পারিভাষিক শব্দ 'প্রাতিপদিক'।[৯] যাস্কের মতে যা বস্তুবাচক, তা হচ্ছে নাম; এবং পতঞ্জলির মতে ধাতু ক্রিয়া বা হওয়া বোঝায়। শুধু প্রাত্যয়িক রূপতত্ত্বে নয়, শব্দগাঠনিক রূপতত্ত্বেও তাঁরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সমাস বা একাধিক বিশেষ্য-বিশেষণের সম্মিলনজাত শব্দ বিশ্লেষণে তাঁরা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়

দিয়েছিলেন। এ-প্রণালির সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল ব্যবহার করেছেন কয়েক হাজার বছর পরবর্তী রূপান্তরবাদীরা (দ্র লিজ (১৯৬০))। প্রাত্যহিক রূপতত্ত্বে তাঁরা যে-প্রণালি অবলম্বন করেছিলেন, তার আধুনিক নাম 'বস্তু ও প্রক্রিয়া' (দ্র পরিশিষ্ট : দুই) : এ-প্রণালিকেও আধুনিক কালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন রূপান্তরবাদীরা (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ৩২))। অবশ্য 'শব্দ ও শব্দ-শ্রেণী' (দ্র হকেট (১৯৫৪)) প্রণালির ব্যবহারও ভারতীয় রূপতাত্ত্বিকেরা করেছেন।

সংস্কৃত ভাষার সর্বাংশ পাণিনির উপাত্ত ছিলো না; তাঁর উপাত্ত ছিলো সংস্কৃত শব্দরাশি। *অষ্টাধ্যায়ীতে* তিনি বর্ণনা করেছেন সংস্কৃত শব্দের আন্তর গঠনপ্রণালি। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিলো আনুশাসনিক, তাঁর দৃষ্টি ছিলো সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীর, এবং প্রণালিপদ্ধতি ছিলো, অনেকাংশে, রূপান্তরবাদী ভাষাবিজ্ঞানীর। এক সসীম এলাকায় অসীম সাফল্য আয় করেছিলেন তিনি। *অষ্টাধ্যায়ীর* ব্যাপকতা ও অনুপুঙ্খতার মুখোমুখি এলে যে-কোনো আধুনিক রূপতাত্ত্বিক অসহায় বোধ করবেন। রূপান্তরবাদীদের নীতিসমূহ—পুঙ্খানুপুঙ্খতা, সামঞ্জস্য, পরিমিতি—তিনি আয়ত্ত করেছিলেন অনেক আগেই, এবং সূত্র রচনা করেছিলেন গাণিতিক প্রণালিতে। তিনি রূপান্তরবাদীদের মতো, তাঁর সূত্ররাশিকে বিন্যস্ত করেছিলেন ক্রমানুসারে। উপাত্তের কোনো কিছুকে পাঠকের জ্ঞান বা বোধির ওপর ছেড়ে না দিয়ে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করাই পুঙ্খানুপুঙ্খতা; ভাষার এক স্তরের বর্ণনার সাথে অন্য স্তরের বর্ণনার যাতে বিরোধ না বাধে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই সামঞ্জস্য, এবং সূত্রের স্বল্পতাই পরিমিতি। পরিমিতি লক্ষ্য ছিলো সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণবিদের : সূত্র থেকে অর্ধমাত্রা হ্রাস করতে পারলে তাঁরা পূত-নরক-ত্রাতা পুত্রলাভের আনন্দ পেতেন। *অষ্টাধ্যায়ীতে* চার হাজার সূত্র আট অধ্যায়ে বিন্যস্ত। পরিমিতি বা সংক্ষিপ্তি লাভে পাণিনিকে সাহায্য করেছে 'প্রত্যাহার' (সংক্ষিপ্ত বাক্য), 'অনুবন্ধ' (তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যয়), 'গণ' (সমপ্রক্রিয়ায় রূপান্তরলাভী শব্দের তালিকা), বিভিন্ন রকম প্রতীক, অনুবৃত্তি' (সূত্র থেকে শব্দবর্জনরীতি), এবং সূত্রক্রম (সূত্ররাশি কোন ক্রমে প্রযুক্ত হবে, তার নির্দেশ : যদি কোনো ক্ষেত্রে একাধিক সূত্র প্রযুক্ত হ'তে পারে, তবে অগ্রবর্তী সূত্র আগে প্রযুক্ত হবে)। *অষ্টাধ্যায়ীর* আট অধ্যায়ে বিন্যস্ত সূত্রসমূহ যাতে নির্ভুলভাবে প্রযুক্ত হ'তে পারে, সেজন্যে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, 'ধাতুপাঠ' (ধাতুরাশির তালিকা), 'গণপাঠ' (শব্দ-শ্রেণীর তালিকা), এবং 'উনাদিসূত্র' (অনেকের ধারণা এটি শাকটায়নের রচনা)। *অষ্টাধ্যায়ী* সহজ সরল শিক্ষার্থীর ব্যাকরণ নয়, এটি ভাষাবিজ্ঞানীর জন্যে রচিত ব্যাকরণ, যা বোধগম্য হ'তে পারে শুধু ভাষ্যের সাহায্যে। পাণিনি সংস্কৃত শব্দসমূহের গঠনপ্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃতের অন্যান্য স্তরের বর্ণনাও প্রচ্ছন্ন এর মধ্যে। তিনি ধ'রে নিয়েছেন যে সংস্কৃতের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবরণ অন্যত্র দেয়া হয়েছে সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে, তাই ধ্বনি সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করেন নি। তবে তিনি ধ্বনিগুলোকে তাঁর রচনায় এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে তাঁর সূত্র প্রয়োগ সহজ হয়। আপাতদৃষ্টিতে পাণিনির ধ্বনি বা বর্ণসজ্জা জটিল ও বিভ্রান্তিকর; কিন্তু তাঁর সূত্রসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখলে এ-সজ্জার অসাধারণত্ব ধরা পড়ে।

পাণিনির শব্দগঠনপ্রক্রিয়া বর্ণনার সাথে বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে আধুনিক রূপান্তরবাদীদের প্রণালি। রূপান্তবাদীরা যেমন ক্রমানুসারে প্রযুক্ত সূত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে গ'ড়ে তোলেন বাক্য, বা শব্দ, এবং গভীর তল থেকে বহির্তল পর্যন্ত আসতে সৃষ্টি করেন এমন সব বাক্য, ও শব্দ, যাদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই— যদিও থাকতে পারতো— পাণিনির প্রণালিও তেমন : শব্দসার 'ধাতু' থেকে বাস্তব শব্দগঠন করতে গিয়ে সূত্রপরম্পরার প্রয়োগে তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন সব মধ্যতলীয় শব্দ, যাদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। 'ভূ' ধাতু থেকে 'আভবৎ' শব্দরূপটি পাওয়া যায় নিম্নে প্রদর্শিত স্তরগুলো অতিক্রম ক'রে। (দ্র রবিন্স (১৯৬৭, ১৪৬) : ডান দিকের সংখ্যারাশি প্রাসঙ্গিক সূত্র নির্দেশক) :

ভূ-অ	৩.১.২	৩.১.৬৮			
ভূ-অ-ৎ	১.৪.৯৯	৩.১.২	৩.২.১১১	৩.৪.৭৮	৩.৪.১০০
আ-ভূ-অ-ৎ	৬.৪.৭১	৬.১.১৫৮			
আ-ভো-অ-ৎ	৭.৩.৮৪				
আ-ভব-অ-ৎ	৬.১.৭৮				
আভবৎ					

এর মধ্যে একমাত্র 'আভবৎ' ধ্বনিরূপে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু এটি গঠনের জন্যে ক্রমান্বয়ে সূত্ররাশি সৃষ্টি করে বেশকিছু মধ্যতলীয় শব্দ, যা 'আকস্মিক শূন্যতা'বশত সংস্কৃতে অনুপস্থিত। পাণিনির শব্দবিশ্লেষণপ্রণালি তাঁর একান্ত নিজস্ব উদ্ভাবন নয়, সংস্কৃত রূপতত্ত্বের একটি বিজ্ঞানসম্মত ধারা তাঁর মধ্যে পরিণতি পায়। সংস্কৃত, বিশেষভাবে পাণিনীয়, ধাতু ও প্রত্যয়তত্ত্ব আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক রূপতত্ত্বে, বিমূর্ত রূপমূল ও সহরূপমুল, যা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের এক বড়ো আবিষ্কার, প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবপ্রসূত। ব্লুমফিল্ড গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন পাণিনীয় রূপতত্ত্ব দ্বারা; তাঁর 'মেনোমিনি মোরফোফোনেমিক্স' চেতনা ও প্রণালিতে পাণিণীয়। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে গৃহীত 'শূন্য' বস্তু পাণিনি থেকেই ঋণ করা। যে-সমস্ত শব্দকে সহজে বর্ণনা করতে পারছিলেন না সাংগঠনিকেরা, তাদের বিশ্লেষণের জন্যে 'শূন্য' বস্তুর সাহায্য প্রচুর নিয়েছেন সাংগঠনিকেরা; এবং এর ব্যবহার এতো ব্যাপক হয়ে উঠেছিলো যে শূন্যের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও উঠেছিলো।

৭.৫.২ ধ্বনিতত্ত্ব

বেদ-এর প্রথম অঙ্গ *শিক্ষা* বেদের ধ্বনিশাস্ত্র। পুণ্যশ্লোকের শুদ্ধ উচ্চারণ অত্যাবশ্যক : শুদ্ধ উচ্চারণ খুলে দেয় স্বর্গের দরোজা, বিকৃত উচ্চারণ নরকের। প্রাচীন ভারতে শুদ্ধাশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে পুরস্কার ও শাস্তি উভয়ই নির্দিষ্ট ছিলো; —যে-ছাত্র বিশুদ্ধ উচ্চারণে সমর্থ, সে

বসতে পারতো অধ্যাপকদের পংক্তিতে, আর অশুদ্ধ উচ্চারণ তাকে *ঠেলে* দিতো কুম্ভীপাক নামী নরকে। বেদের ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা গ'ড়ে তুলেছিলেন এমন এক শাস্ত্র, যা প্রাচীন বিশ্বে অতুল্য। উনিশশতকে পাশ্চাত্য ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা পরিচিত হন সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্বের সাথে, এবং জন্ম নেয় আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান। অতি সাম্প্রতিক ধ্বনিবিজ্ঞান পৌঁচেছে এমন অনেক সিদ্ধান্তে, যার সুচারু প্রয়োগ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্বকালের ভারতীয় ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা। তাঁরা সংস্কৃত ধ্বনিসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, নির্দেশ করেছেন ধ্বনিসমূহের বৈশিষ্ট্য, শরীরবিদের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন ধ্বনি-উচ্চারকগুলো। পাশ্চাত্যে যেখানে ঈশপ থেকে আরিস্ততল চঞ্চল জিহ্বাকেই নির্দেশ করেছেন ধ্বনি-উচ্চারক ব'লে, সেখানে ভারতীয় ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা অনুপুঙ্খরূপে শনাক্ত করেছেন বিভিন্ন উচ্চারক। এমনকি অদৃশ্য স্বরতন্ত্রি পর্যন্ত পৌঁচেছে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁদের পারিভাষিক শব্দপুঞ্জ আজো সাহায্য করছে এ-অঞ্চলের ধ্বনিবিদদের। পাশ্চাত্যে আধুনিক ধ্বনিশাস্ত্র গ'ড়ে উঠেছে সংস্কৃত *ধ্বনিতত্ত্ব* থেকে ঋণ ক'রে। উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত ভাষাকে তুলে ধরেছিলেন বিশ্বের সামনে। *ডিসার্টেশন অন দি অর্থোগ্র্যাফি অফ এসিয়্যাটিক ওয়ৰ্ডস ইন রোমান লেটারস* নামক সন্দর্ভে তিনি ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় ধ্বনিশাস্ত্রের রীতিনীতি। রূপার্ট ফার্থ স্পষ্ট বলেছেন যে ভারতীয় ব্যাকরণবিদ ও ধ্বনিতাত্ত্বিকদের সাহায্য ছাড়া উনিশশতকী ইউরোপী ধ্বনিতত্ত্বের উদ্ভব সম্ভব ছিলো না (দ্র অ্যালেন (১৯৫৩, ৩))। হুইটনি তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব দ্বারা। ঘোষ-অঘোষ ধ্বনির পার্থক্য পাশ্চাত্যে স্পষ্ট হয়েছে ভারতীয় ধ্বনিতত্ত্বের সাথে পরিচয়ের পর।

দু-শ্রেণীর রচনায়—'প্রাতিশাখ্য' ও 'শিক্ষা'—ভারতীয় ধ্বনিতত্ত্বের পরিচয় লিপিবদ্ধ। প্রাতিশাখ্য হচ্ছে *চতুর্বেদের* উচ্চারণশাস্ত্র। প্রতিটি বেদের জন্যে আছে একটি ক'রে প্রাতিশাখ্য। যেমন : ঋগ্বেদ—'ঋক-প্রাতিশাখ্য', সাম-বেদ—'ঋক-তন্ত্র-ব্যাকরণ', 'কৃষ্ণ যজুর্বেদ—'তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য', শ্বেত যজুর্বেদ—'বাজসনেয়ি-বা কাত্যায়নীয়-প্রাতিশাখ্য' এবং অথর্ব-বেদ—'অথর্ব-প্রাতিশাখ্য'। 'শিক্ষা' কোনো বিশেষ বেদকেন্দ্রিক নয়, এর দায়িত্ব প্রাতিশাখ্যকে আরো উচ্চারণপ্রণালি দিয়ে সাহায্য করা। প্রাতিশাখ্যসমূহ, সম্ভবত, জন্মেছিলো শিক্ষাকে ভিত্তি ক'রে, তবে যে-সব শিক্ষা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, সেগুলো প্রাতিশাখ্য-পাণ্ডুলিপির চেয়ে অর্বাচীন। শিক্ষাসমূহের রচনাকাল, কারো কারো মতে, খ্রিপূ ৮০০-৫০০ শতক, আর প্রাতিশাখ্যের রচনাকাল খ্রিপূ ৫০০-১৫০ শতক। প্রাতিশাখ্যাবলিই অধিকতর গুরুত্ব বহন করতো। *সর্বসম্মত-শিক্ষায়* পাওয়া গেছে এ-মন্তব্যটি (দ্র অ্যালেন (১৯৫৩, ৫)) : 'যদি শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যে বৈষম্য দেখা দেয়, তবে শিক্ষাকে দুর্বলতর ব'লে বিবেচনা করতে হবে; যেমন হরিণ দুর্বল সিংহের চেয়ে।' শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য ছাড়া অন্যত্রও পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবৃতি। *অষ্টাধ্যায়ী* ও *মহাভাষ্য* যদিও ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক নয়, তবুও এ-দুটিতে পাওয়া যায় প্রচুর ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবৃতি। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে প্রচুর ধ্বনিতাত্ত্বিক পারিভাষিক শব্দ মেলে।

ধ্বনিনির্দেশের জন্যে তাঁরা ব্যবহার করেছেন 'বর্ণ' শব্দটি। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে আমরা আজো যে বর্ণবিন্যাস দেখতে পাই, তা প্রাকপাণিনীয়। ধ্বনিবর্ণনাকে তাঁরা মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন : উচ্চারণরীতি বর্ণনা, বর্ণবর্ণনা, ও সন্ধি-অক্ষর গঠনপ্রক্রিয়া বর্ণনা। উচ্চারণে অংশী প্রত্যঙ্গগুলোকে তাঁরা শনাক্ত করেছিলেন সুনির্দিষ্টভাবে। উচ্চারণে দুটি প্রত্যঙ্গ অংশ নেয় : একটি নেয় সক্রিয় ভূমিকা, তার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'করণ' (উচ্চারক), আর অন্যটির ভূমিকা নিষ্ক্রিয়, সেটির নাম দিয়েছিলেন 'স্থান' (উচ্চারণস্থান)। অধিকাংশক্ষেত্রে জিহ্বার বিভিন্নাংশ কাজ করে করণরূপে : যেমন— জিহ্বামূল, জিহ্বামধ্য, জিহ্বাগ্র, এবং স্থানরূপে কাজ করে মাড়ির মূল (হনুমূল) : যেমন— তালু, দন্ত, দন্তমূল। এ-শ্রেণীকরণ তাঁরা সম্প্রসারিত করেছিলেন ওষ্ঠ, এমনকি স্বরতন্ত্রি, পর্যন্ত। ঔষ্ঠধ্বনি উচ্চারণে স্থানরূপে নির্দেশ করেছিলেন ওপরের ঠোঁটকে (ওষ্ঠ), এবং করণরূপে নির্দেশ করেছিলেন নিচের ঠোঁটকে (অধর)। স্বরতন্ত্রির ক্ষেত্রেও নির্দেশ করা হয়েছে স্থান-করণ : স্বরতন্ত্রির নিম্নাংশকে নির্দেশ করেছিলেন করণরূপে। জিহ্বাই যে বাচাল ও চঞ্চলতম উচ্চারক, সে-দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়েছিলো। তাই জিহ্বাকে তাঁরা ভাগ করেছেন নানা অংশে, এবং জিহ্বাগ্রকে নির্দেশ করেছেন বাগ্দেবী সরস্বতীর সিংহাসন ব'লে। নাসিক্যধ্বনির বেলায় স্থান-করণ শনাক্তিতে অবশ্য বিরোধ বেধেছে তাঁদের মধ্যে : এক দলের মতে নাসিকা হচ্ছে স্থান, বিরোধীদলের মতে নাসিকাই করণ।

ধ্বনি সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় বিতর্কও কম হয় নি। একদলের মতে ধ্বনি নশ্বর, উচ্চারণের পরই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বেদবাদী জৈমিনির মীমাংসাতত্ত্বানুসারে ধ্বনি অবিনশ্বর ও শাশ্বত। তা কখনো বিলুপ্ত হয় না। ধ্বনি অনাদি, অনন্ত। এ-মতানুসারে ধ্বনি উচ্চারকের সাহায্যে উচ্চারিত হয় না, উচ্চারণের পর বিলুপ্তও হয় না। উচ্চারকগুলোর কাজ শুধু চির অস্তিত্বময় ধ্বনিরাশিকে প্রকাশ করা (দ্র প্রভাতচন্দ্র (১৯৩০))। তবে তাঁরা যেই ধ্বনিবিশ্লেষণে নেমেছেন, অমনি নেমেছেন পরাবিদ্যার অতীন্দ্রিয় জগত থেকে বাস্তব বৈজ্ঞানিক জগতে। ধ্বনি-উচ্চারণ প্রক্রিয়াকে [প্রযত্ন] তাঁরা ভাগ করেছিলেন দুটি প্রধান ভাগে : 'আভ্যন্তর' এবং 'বাহ্য'। মুখগহ্বরে সংঘটিত ধ্বনি-উচ্চারণ প্রক্রিয়াগুলোই 'আভ্যন্তর প্রযত্ন', আর অন্যত্র সংঘটিত প্রক্রিয়ারাশি হচ্ছে 'বাহ্য প্রযত্ন'। আভ্যন্তর প্রযত্নের পাণিনিব্যবহৃত বিকল্প পারিভাষিক শব্দ 'আস্য প্রযত্ন'। পতঞ্জলি ওষ্ঠ থেকে 'কাকলক' (কণ্ঠমণি) পর্যন্ত এলাকাকে নির্দেশ করেছিলেন মুখগহ্বর ব'লে। তাঁরা উচ্চারণ প্রক্রিয়াকে মোটামুটি নিম্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন (দ্র অ্যালেন (১৯৫৩, ২২)) :

১। আভ্যন্তর প্রযত্ন

- ক সংবৃত : স্পর্শধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
- খ বিবৃত : স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
- গ সংকীর্ণতা (চাপ খাওয়া) : শিসধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

২। বাহ্য প্রযত্ন

ক কণ্ঠনালীয় : ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

খ ফুসফুসজাত : মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

গ নাসিক্য : নাসিক্য ও নাসিক্য ধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

স্থান ও করণের রুদ্ধতার বা সংবৃততার চার রকম মাত্রা স্থির করেছিলেন তাঁরা : এর মধ্যে সর্বাধিক রুদ্ধতার নাম 'স্পৃষ্ট', এবং স্বল্পতম রুদ্ধতার নাম 'বিবৃত'। স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিকে তাঁরা পৃথক করেছিলেন 'অস্পৃষ্টতা'র মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রে। অর্থাৎ স্থান-করণের সংস্পর্শে জন্মে ব্যঞ্জনধ্বনি, কিন্তু স্বরধ্বনি উচ্চারণে স্থান-করণের মধ্যে কোনো সংস্পর্শ হয় না। মুখগহ্বরে উচ্চারক—উচ্চারণস্থানে রুদ্ধতার বিভিন্ন মাত্রাও তাঁরা নির্ণয় করেছিলেন অনুপুঙ্খভাবে; যেমন : 'স্পৃষ্ট', 'ঈষৎ স্পৃষ্ট', 'ঈষৎ-বিবৃত', 'বিবৃত'। উষ্ম বা শিসধ্বনির উচ্চারণে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে এগুলো স্পর্শধ্বনির মতোই উচ্চারিত হয়, শুধুমাত্র এ-ক্ষেত্রে উচ্চারকের মধ্যস্থল উন্মুক্ত থাকে। অর্ধস্বরধ্বনির নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'অন্তঃস্থ ধ্বনি' এবং এ-ধ্বনিগুলোকে মোটামুটি নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাহ্য প্রযত্নরাশির মধ্যে ঘোষ-অঘোষ, মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ, নাসিক্য-অনাসিক্য ধ্বনি-উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা তাঁরা দিয়েছিলেন। উচ্চারণস্থানানুসারে স্পর্শধ্বনিসমূহকে তাঁরা যে-পাঁচটি বর্গে বিভক্ত করেছিলেন, সে-শ্রেণীকরণ আজো রক্ষিত।

ভারতীয় ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা ধ্বনির উচ্চারণস্থানের বর্ণনা শুরু করেন গভীরতম উচ্চারণস্থান থেকে, এবং ক্রমশ এগোন ওষ্ঠের দিকে। এ-রীতি বেশ যুক্তিসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ : ধ্বনির উৎস ফুসফুস, তাই তাঁদের বর্ণনা শুরু হয় ফুসফুসের সন্নিকটতম স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি থেকে। ফুসফুসই গভীরতম স্থান ও করণ। ফুসফুসকে তাঁরা নির্দেশ করেছেন ঘোষ [হ], এবং অঘোষ [হ্] ধ্বনির উচ্চারণস্থান ব'লে। তবে অনেকে এ-ধ্বনি দুটিকে কণ্ঠজাত ব'লেও মনে করেছেন। উভট-এর মতে ('ঋকপ্রাতিশাখ্য') 'উষ্ম' [হ], এবং [হ্] কণ্ঠ্যধ্বনি; অন্য অনেকের মতে, ফুসফুসজাত [উরস্য] ধ্বনি। অঘোষ [হ্] ধ্বনির জন্যে কোনো বর্ণ নেই, তাই এটিকে নির্দেশ করা হয় (ঃ) চিহ্ন দিয়ে, যাকে বলা হয় 'বিসর্জনীয়' বা 'বিসর্গ' অর্থাৎ ত্যাগযোগ্য। ক-বর্গের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণস্থান ব'লে নির্দেশ করা হয় জিহ্বামূলকে। কিন্তু জিহ্বামূল এ-ধ্বনিরাশির উচ্চারণস্থান নয়, উচ্চারক; এদের উচ্চারণস্থান হচ্ছে হনুমূল (উর্ধ্বমাড়ির মূল)। আধুনিক কালে বাঙলার এ-ধ্বনিগুলোকে পশ্চাত্তালুজাত ব'লে মনে করা হয় (দ্র মুহাম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৪, ৬০))। চ-বর্গের ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থানরূপে নির্দেশ করা হয়েছে তালুকে, তাই এগুলোকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। এদের উচ্চারক মধ্য জিহ্বা। ট-বর্গের ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থানরূপে নির্দেশ করা হয় মূর্ধাকে (মাথা) এবং এদের নাম দেয়া হয় মূর্ধন্যধ্বনি। এদের 'প্রতিবেষ্টিত'ও বলা হয়। তাঁরা এর ধ্বনিগুলোর উচ্চারণপ্রক্রিয়া বুঝেছিলেন ভালোভাবে, এবং এদের 'প্রতিবেষ্টিত' অভিধাও দিয়েছিলেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের ধ্বনিরাশির মধ্যে সবচেয়ে

অবার্চীন যে-ধ্বনিসমূহ, সেগুলো হচ্ছে ট-বর্গের ধ্বনি; এবং এরা যে-নামটি (মূর্ধন্য) বহন করে, সেটি বিভ্রান্তিকর। ত-বর্গের ধ্বনিগুলোকে নির্দেশ করা হয়, 'দন্ত্য' ব'লে, বা 'দন্তপ্রান্ত'জাত ব'লে। এদের উচ্চারকরূপে নির্দেশ করা হয় জিহ্বাগ্রকে, যা একটু 'প্রস্তীর্ণ' (প্রসারিত)-রূপে দন্তপ্রান্তে লাগে। ঔষ্ঠধ্বনিগুলোকে (প-বর্গ) নির্দেশ করা হয় ওষ্ঠজাত ব'লে; এবং ওপরের ওষ্ঠকে নির্দেশ করা হয় স্থান ও নিচের ওষ্ঠকে নির্দেশ করা হয় করণ ব'লে।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ বর্ণনার সময় তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন বর্ণমালার (বর্ণ-সমামনায়) প্রথম বর্ণ 'অ'-র ওপর। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরধ্বনিগুলোকে তাঁরা যুগলরূপে পাশাপাশি সাজিয়েছেন, এবং হ্রস্বধ্বনিটির নাম দিয়ে নির্দেশ করেছেন উভয়েরই প্রতি। যেমন : 'ই-বর্ণ' বললে [ই], এবং [ঈ] উভয়কে বোঝানো হয়। তাঁদের অনেকে লক্ষ্য করেছিলেন [ই : ঈ] এবং [উ : ঊ] ধ্বনিযুগলের হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের মধ্যে ধ্বনিগুণগত পার্থক্য খুব বেশি নেই। ধ্বনিতত্ত্বগতভাবে এদের সমান্তরাল যুগল [অ : আ] : তবে অনেক ধ্বনিবিজ্ঞানী এদের মধ্যে দৈর্ঘ্য [কালভিন্ন] এবং উন্মুক্ততার মাত্রায় [বিবৃত-ভিন্ন] পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। [আ]কে তাঁরা বিবেচনা করতেন সর্বাধিক বিবৃত ব'লে, এবং [আ]কে তুলনামূলকভাবে সংবৃত বিবেচনা করতেন। তবে [অ : আ]কে এক যুগলের দু-সদস্যরূপে বিবেচনা করা সুবিধাজনক ছিলো। এ-সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন পাণিনি, এবং রচনা করেছিলেন তাঁর সূত্র (দ্র অ্যালেন (১৯৫৩, ৫৮)) : 'একঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।' অর্থাৎ যদি কখনো কোনো হ্রস্বস্বর সদৃশ স্বর দ্বারা অনুসৃত হয়, তবে তাদের বিকল্পে ওই যুগলের দীর্ঘ স্বরটি বসবে। [অ : আ]কে তাঁরা নির্দেশ করেছিলেন কণ্ঠ্যধ্বনি ব'লে। [ই]কে নির্দেশ করেছিলেন তালব্য, এবং [উ]কে নির্দেশ করেছিলেন ঔষ্ঠধ্বনি ব'লে [ঋ], এবং [ঌ]কে অনেকে স্বরব্যঞ্জনের মিশ্রণ ব'লে ভাবতেন, এবং স্বরধ্বনির পর্যায়ে স্থান দিতে অরাজি ছিলেন।

৭.৫.৩ বাক্য ও পদতত্ত্ব

ভাষা সম্পর্কে একটি চমৎকার পরাবৈদ্যিক তত্ত্ব পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বে—তত্ত্বটির নাম 'স্ফোটতত্ত্ব' (দ্র প্রভাতচন্দ্র (১৯৩০, ৮৪-১২৫))। সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকদের মেধা, কখনো-কখনো, বেশ কৌতুককর;—তাঁরা মূর্তকে সহজেই বিমূর্ত পরমাত্মায় বিলীন ক'রে দিতে পারেন। স্ফোটতত্ত্বকে বলা যায় ভাষায় 'আদর্শ' বা 'বিমূর্ত' রূপের তত্ত্ব; কিন্তু তাত্ত্বিকেরা স্ফোটকে ভাষাবিচ্ছিন্ন ক'রে অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মে লীন ক'রে দিয়েছেন। ভাষার দুটি রূপ কল্পনা করা যায় : একটি ভাষার ব্যবহারিক বাস্তব রূপ, অন্যটি তার অমূর্ত আদর্শ রূপ, যা সকল ভাষাভাষী অসচেতনভাবে জানে। আধুনিক কালে ভাষার এ-আদর্শ রূপকে 'লঁগ, (দ্র সোস্যুর (১৯১৫)) ও 'বোধ' (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫) ইত্যাদি নামে নির্দেশ করা হয়েছে (দ্র § ৪.২.৬)। এদেরই তুল্য সংস্কৃত তত্ত্ব হচ্ছে স্ফোট—ভাষার অমূর্তরূপ, এবং এর বাস্তবরূপ হচ্ছে 'ধ্বনি'। স্ফোটতত্ত্বকে অনেকে আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতেই। তবে মনে করা

সম্ভব যে ভাষার অমূর্ত আদর্শরূপ হচ্ছে স্ফোট, যার বাস্তবায়ন ঘটে নানারূপে। স্ফোটবাদীরা অনশ্বর অদ্বয় স্ফোটের নানারকম অভিব্যক্তি নির্দেশ করেছেন : বর্ণ-স্ফোট, পদ-স্ফোট, বাক্য-স্ফোট, অখণ্ড-পদ স্ফোট, অখণ্ড-বাক্য-স্ফোট, বর্ণ-জাতি-স্ফোট, বাক্য-জাতি-স্ফোট প্রভৃতি। তাঁদের মতে ভাষার সমস্ত বস্তুর মধ্যে বাক্যই সত্য, এবং অবিভাজ্য। ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ এককরূপে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন বাক্যকে। তাঁরা পরমাণুবাদী : তাঁদের বিশ্বাস বাক্য আর ক্ষুদ্রাংশে বিভাজ্য নয় (দ্র § ২,২)।

স্ফোটতত্ত্বের পুরোধা হচ্ছেন *বাক্যপদীয়র* প্রতিভাবান রচয়িতা ভর্তৃহরি। তাঁর মতে বাক্য অবিভাজ্য, অবিশ্লেষ্য—বিদ্যুচ্চমকের মতো তা এক ঝলকে সমস্ত কিছু আলোকিত করে। ভর্তৃহরির উক্তি (দ্র অ্যালেন (১৯৫৩, ৯)) : 'ধ্বনি-এককরাশিতে তাদের উপাদানের কোনো স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নেই, শব্দেও কোনো স্বাধীন সত্তা নেই ধ্বনি-এককগুচ্ছের, আর বাক্যেও কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই বাক্যের উপাদানসমূহের।' ভর্তৃহরি বাক্যবাদী। বাক্যের প্রাধান্য স্বীকার করেন ব'লে তাঁকে সাম্প্রতিক রূপান্তরবাদীদের সন্নিকট ব'লে মনে হয়। কিন্তু বাক্য অবিভাজ্য, এ-তত্ত্ব গহণযোগ্য নয়। বাক্যবাদীদের বিরোধী ছিলেন পদবাদীরা। তাঁরা মনে করতেন বাক্য বিভাজ্য বস্তু, এবং ভাষায় পদই সত্য, বাক্য নয়। বাক্য যেহেতু পদের সমষ্টি, তাই পদসমবায় ছাড়া বাক্যের কোনো পৃথক নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। বাক্যবাদীদের মধ্যে প্রখ্যাত দুজন হচ্ছেন পাণিনি ও পতঞ্জলি। বাক্যের সংগঠন সম্পর্কে পাওয়া যায় নানাবিধ মত। যেমন : বাক্য হচ্ছে (ক) ক্রিয়াপদরূপ, (খ) শব্দক্রম, (গ) বুদ্ধিজাত সমন্বয়, এবং (ঘ) স্বতন্ত্র ও অন্যোন্য আকাঙ্ক্ষী পদের সমবায়। অভিহিতান্বয়বাদীদের মতে বাক্য হচ্ছে পদক্রম, বা পদসমষ্টি। অন্বিতাভিধানবাদীদের মতে পারস্পরিক আসত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতাসম্পন্ন শব্দরাজির সমবায়ই বাক্য। আসত্তি (নৈকট্য) বলতে বোঝায় যে বাক্যের যে-সমস্ত শব্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, সেগুলো পরস্পরের থেকে সুদূরে অবস্থান করবে না, তাদের অবস্থান হবে সন্নিকট। আকাঙ্ক্ষা বলতে বোঝায় যে অনন্বয়ী শব্দপুঞ্জের সমাহার বাক্য নয়, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহে সহাবস্থানযোগ্য হতে হবে। যোগ্যতা (সঙ্গতি) বোঝায় যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থে সঙ্গতি থাকতে হবে। যেমন : 'সে বন্ধ্যা মাতার পুত্র' সাংগঠনিকরূপে নির্ভুল হ'লেও বিসঙ্গতিবশত গ্রহণযোগ্য নয়। যোগ্যতাকে সাম্প্রতিক রূপান্তরবাদীরা বলেন 'সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন'। আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে বাক্যের সংগঠন, আর যোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করে বাক্যের অর্থ (দ্র § ২.৪.২)।

কাত্যায়নের মতে কোনো ক্রিয়াপদরূপ যখন কোনো অব্যয়, কারক, বা ক্রিয়াবিশেষণসহ উপস্থিত হয়, তখনি রচিত হয় বাক্য। পতঞ্জলিও পোষণ করেন এ-মত। ক্রিয়াপদই বাক্য—এমন মতও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাক্যে ক্রিয়াপদের প্রধান ভূমিকাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। অনেকের মতে ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠিত হ'তে পারে

না। এ-মতের বিরোধী ছিলেন জগদীশ;— যিনি মনে করতেন যে ক্রিয়া ছাড়াও বাক্য গঠিত হতে পারে। কারকতত্ত্ব ও ক্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার— সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকদের অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন। প্রতিটি বাক্যে থাকবে একটি ক্রিয়া ও এক বা একাধিক বিশেষ্যপদ, যারা বিভিন্ন সম্পর্কে অন্বিত থাকবে ক্রিয়ার সাথে— এ(কারক) তত্ত্ব তাঁদের অতুল্য ভাষাব্যাখ্যা শক্তির উদাহরণ। আধুনিক কালে সংস্কৃত কারকতত্ত্ব ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে *কারক ব্যাকরণ*, যা অন্যান্য ব্যাকরণ থেকে নানা দিকে উৎকৃষ্ট (দ্র ফিলমোর (১৯৬৬, ১৯৬৮), হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩))। লাতিন-গ্রিক ব্যাকরণবিদেরা মনে করেছিলেন যে পদরাশির মধ্যে বিশেষ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ;—এ-ধারণা গ্রহণঅযোগ্য। সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকেরা ক্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন সর্বত্র। শাকটায়ন ভাষার সমস্ত শব্দকে ধাতুজ ব'লে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন, এবং বাক্যবর্ণনার সময় একগোত্র ভাষাতাত্ত্বিক ক্রিয়াপদকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন বাক্যের প্রধান উপাদান ব'লে। চোমস্কি (১৯৬৫) অবশ্য দাবি করেছেন যে বাক্যে বিশেষ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং ক্রিয়ানিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ্যের দ্বারা। কিন্তু চোমস্কির মতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে এতো উপাত্ত জড়ো করা হয়েছে যে ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন (দ্র স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩, ৭১৮-৭৪৯))।

বাক্য অবিভাজ্য—ভর্তৃহরির এ-মত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে বাক্য হচ্ছে পদসমষ্টি, এবং পদের সংখ্যা নির্ণীত হয়েছিলো প্রাকপাণিনি যুগে—যাস্কের জন্মেরও আগে। যাস্ক নির্দেশ করেছেন যে পদের সংখ্যা চার : বিশেষ্য, ক্রিয়া, উপসর্গ ও নিপাত (অব্যয়)। পদশনাক্তিতে তাঁরা প্রধানত ব্যবহার করেছেন আর্থ মানদণ্ড, তবে রৌপ মানদণ্ডের ব্যবহারও তাঁরা করেছেন। যাস্কের মতে যা বস্তুবাচক, তাই বিশেষ্য; আর যা ক্রিয়াবাচক; তা ধাতু (ক্রিয়া)। শাকটায়নের মতে উপসর্গের নিজস্ব কোনো তাৎপর্য নেই, বিশেষ্য বা ক্রিয়ার পূর্বে প্রযুক্ত হওয়াই তার বৈশিষ্ট্য। যাস্কর মত হচ্ছে উপসর্গের আছে 'অর্থদ্যোতকত্ব', আর অন্যান্য শব্দের আছে 'অর্থবাচকত্ব'। গার্গ্যর মতে উপসর্গেরও অর্থ আছে। পাণিনির মতে ধাতুর অর্থের 'প্রকর্ষ'-সাধনই উপসর্গের কাজ; তবে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে উপসর্গও অর্থবহন করে। ভর্তৃহরি 'কর্মপ্রবচনীয়'কেও পৃথক পদরূপে নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে ক্রিয়া ও কারকের মধ্যে সম্বন্ধনির্দেশক রূপ-শ্রেণীই কর্মপ্রবচনীয়। তাঁরা নিপাতের নিজস্ব অর্থ আছে ব'লে মনে করতেন। সম্বন্ধপদ সম্পর্কে তাঁরা একটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে সম্বন্ধ ক্রিয়ারই ফল। পরবর্তী অনুকারী ব্যাকরণ রচয়িতারা এ-অন্তর্দৃষ্টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

৭.৫.৪ অর্থতত্ত্ব

সংস্কৃত অর্থতত্ত্বও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। ভাষাশরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তা; কিন্তু ভাষার আত্মা, অর্থাৎ অর্থ, অদৃশ্য, এবং সহজে তাকে কাবু করা যায় না। তাই বিশশতকী সাংগঠনিকেরা সযত্নে এড়িয়ে চলতেন অর্থকে। সংস্কৃত অর্থতাত্ত্বিকেরা বা

'নৈরুক্ত'রা অন্তর্ভেদী আলো ফেলেছিলেন ভাষার অন্তরে, অর্থোদ্ধারের জন্যে, এবং এর ফলে আলোকিত হয়েছিলো ব্যাপক অন্ধকার এলাকা। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিলো : অর্থ কী, শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক কী, বাক্যের অর্থ কীভাবে স্থির করা হয়, অর্থ বদলের প্রক্রিয়া কী ইত্যাদি। প্রাচীন গ্রিসে যেমন বিতর্ক হয়েছে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক নিয়ে, তেমনি বিতর্ক জমেছিলো ভারতীয় 'স্বভাববাদী' ও 'প্রথাবাদী'দের মধ্যেও (দ্র § ৭.১.৩)। একদল ভাষাতাত্ত্বিক শব্দকে ঐশী বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের মতে : সমগ্র বিশ্ব ও বস্তু শব্দে স্থির, শব্দই বিশ্বসার, আর 'শব্দব্রহ্মা'র বিবর্ত হচ্ছে অন্যান্য বস্তু। পতঞ্জলি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে অর্থ প্রকাশ ও চিন্তাজ্ঞাপন শব্দের মৌল কাজ।

শব্দার্থ নির্ণয়ের প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত (ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র)। দুর্গার মতে ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের সূত্র রচনা করা হচ্ছে ব্যাকরণের কাজ, আর ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের দায়িত্ব হচ্ছে শব্দার্থনির্ণয়। শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক কী? এ-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন অর্থতাত্ত্বিকেরা; — একগোত্র *স্বভাববাদী, অন্যগোত্র* প্রথাবাদী। পাণিনি-পতঞ্জলি-ভর্তৃহরি স্বভাববাদী। ভর্তৃহরির মতে শব্দ আপন প্রকৃতিবশতই অবিনশ্বর ভাব জ্ঞাপন করে। অর্থ শব্দের অন্তর্নিহিত, অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক শাশ্বত, অবিনশ্বর ও অনাদি। ভর্তৃহরি বলেছেন, কোনো শব্দ যা নির্দেশ করে, তাই হচ্ছে শব্দটির অর্থ। তাঁর এ-তত্ত্ব আরিস্ততলের শংসামূলক অর্থতত্ত্বের সদৃশ (দ্র § ৭.১.৬)। শব্দ-অর্থের অদ্বৈতবাদীরা শব্দ ও অর্থকে এক পরমাত্মার দু-রকম উৎসারণ (রূপ) ব'লে বিশ্বাস করতেন। *শ্রুতিবাদী*দের মতে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য ও শাশ্বত; তাই একটি বিশেষ শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই প্রকাশিত হয় একটি বিশেষ অর্থ। তাঁদের মতে অর্থ স্থির হয়ে থাকে আগেই, পরে তাকে দেয়া হয় ধ্বনিরূপ। ভর্তৃহরির মতে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক, বিধাতার বিধানে, চিরস্থির; তা কোনো প্রথার ফল নয়। জৈমিনি ছিলেন রক্ষণশীল বেদবাদী, এবং তাঁর মতে শব্দ ও অর্থ স্বর্গীয় ইচ্ছায় শাশ্বত চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ। স্বভাববাদীদের বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে শব্দ ও অর্থ অনাদি অবিনশ্বর শাশ্বত সম্পর্কে আবদ্ধ, আর এ-সম্পর্কের স্থপতি হচ্ছে অনাদি অবিনশ্বর ঈশ্বর। প্রথাবাদীরা এ-মতের বিরোধী— শব্দ ও অর্থের সম্পর্ককে তাঁরা প্রথাগত ব'লে মনে করেন। প্রথাবাদীদের মধ্যে আছেন ন্যায়-বৈশেষিকেরা : তাঁদের মতে শব্দের সাথে শব্দনির্দেশিত বস্তুর কোনো 'সংযোগ' নেই, কোনো 'সমবায়'ও নেই। তাই কোনো সম্পর্ক নেই শব্দ ও শব্দনির্দেশিত বস্তুর, অর্থাৎ অর্থের। তাঁদের মতে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক 'সংকেত'গত বা প্রথাগত। গৌতমের মতে ধ্বনিগুচ্ছ ও তার নির্দেশিত অর্থের সম্পর্ক সহজাত বা স্বাভাবিক নয়, যদি হতো তবে সারা বিশ্বে ভাষাভেদ ঘটতো না। প্রথাবাদীরা মনে করেন শব্দ ও অর্থ পরস্পরসংশ্লিষ্ট প্রথাবশত; তবে এ-প্রথার স্রষ্টা মানুষ নয়, স্বয়ং বিধাতা এ-প্রথার স্রষ্টা। তাঁরই নির্দেশে শব্দ-অর্থ সম্পর্কিত। ভারতীয় স্বভাববাদী প্রথাবাদী উভয় গোত্র শব্দ-অর্থের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে অবশেষে উপনীত হয়েছেন বিধাতার দরবারে। তাঁদের সাথে গ্রিক প্রথাবাদী-স্বভাববাদীদের পার্থক্য বিপুল। গ্রিকরা পরমাত্মা বা ঈশ্বরে পৌঁছেন নি, তাঁরা সীমিত থেকেছেন প্রাকৃতিক নিয়মে ও মানবিক নিয়মে।

শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক যদি শাশ্বত হয়, বা নির্দিষ্ট হয় ঐশী আদেশে, তবে শব্দার্থবদল হয় কী ক'রে? ঐশী বিধানও কি মানবিক প্রথার মতো পরিবর্তনশীল? এ-প্রশ্নের উত্তরে প্রথাবাদীরা 'সংকেত'কে ভাগ করেছেন দু-ভাগে : 'অজানিক' ও 'আধুনিক' সংকেতে। অনাদিকাল থেকে রূপ ও অর্থে, ঐশী নির্দেশে, বিবাহিত শব্দাবলি হচ্ছে 'অজানিক', এবং আধুনিক কালের লেখকমণ্ডলি যে-সব শব্দে নতুন অর্থ সঞ্চার করে দিয়েছেন, সেগুলো 'আধুনিক'। এ-আধুনিক অর্থেরই বদল ঘটে। শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্যে তাঁরা গঠন করেছিলেন প্রচুর পারিভাষিক শব্দ; যেমন : 'বাচ্য-বাচক', 'প্রকাশ্য-প্রকাশক', 'কার্য-কারণ'। অর্থ ভিত্তি ক'রে তাঁরা শব্দরাশিকে 'রূঢ়', 'যোগরূঢ়', 'যৌগিক' ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন (দ্র প্রভাতচন্দ্র (১৯২৫))।

বাক্যার্থ নির্ণয় সম্পর্কেও তাঁরা চমৎকার আলোচনা করেছেন। ভর্তৃহরির মতে বাক্যের উপাদানরাশিতে পাওয়া যায় না বাক্যার্থ, বাক্য বিদ্যুচ্চমকের মতো হঠাৎ, ও একবার, অর্থজ্ঞাপন করে। তবে বাক্যার্থ জানার জন্যে তাঁরা মোটামুটি চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিষয় চারটি : 'আসত্তি' বা 'নৈকট্য', 'আকাঙ্ক্ষা', যোগ্যতা' ও 'তাৎপর্য'। বাক্যের দ্ব্যর্থতা নিরসনের উপায়ও নির্দেশ করেছিলেন তাঁরা। একটি উপায় হচ্ছে প্রসঙ্গের সাহায্যে দ্ব্যর্থতা নিরসন : খাওয়ার সময় যদি কেউ 'সৈন্ধব' (লবণ, অশ্ব) চায়, তবে বুঝতে হবে সে লবণ চাইছে, অশ্ব চাইছে না। শব্দের অর্থবদলের ব্যাপারটিও তাঁদের লক্ষ্যে পড়েছে। তাঁরা অর্থের সংকোচন, প্রসারণ ও বিলোপ— সবই দেখেছেন। সংকোচনের উদাহরণ : কবি = 'মেধাবী ব্যক্তি' ⟶ 'কবি'; মৃগ = 'পশু' ⟶ হরিণ'। প্রসারণের উদাহরণ : কুশল = 'কুশসংগ্রাহক' ⟶ 'দক্ষ'; প্রবীণ = 'দক্ষ বীণাবাদক (গন্ধর্ব) ⟶ 'জ্ঞানী' ⟶ 'বয়স্ক' (বর্তমানে); উদার = 'অশ্ব' ⟶ 'মহৎ'। অর্থবিলোপ : 'ন' ও 'নঞ' বেদে নিষেধার্থে, এবং তুল্যার্থে-সাদৃশ্যার্থে ব্যবহৃত হতো, পরে এদের দ্বিতীয়ার্থটি বিলুপ্ত হয়।

৭.৫.৫ প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ

শব্দবিশ্লেষণবিদ্যার প্রাকপাণিনীয় নাম ব্যাকরণ, এবং এটিই গৃহীত হয়েছে বাঙলায় ভাষাবিশ্লেষণবিদ্যার অভিধারূপে। বাঙলা ব্যাকরণ আজন্ম আনুশাসনিক, শব্দকেন্দ্রিক, এবং বিভ্রান্তিকর। ব্যাপক অর্থে ব্যাকরণ হচ্ছে কোনো ভাষার আন্তরবাহ্যিক নিয়মকানুন, আর সংকীর্ণ অর্থে ব্যাকরণ হচ্ছে ব্যাকরণপুস্তক, যা রচিত হয় কোনো ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে শেখানোর জন্যে। ব্যাকরণের সংকীর্ণ অর্থই বাঙলায় প্রচলিত। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের যে-ধারা কয়েক শো বছরে গ'ড়ে উঠেছে, এবং বর্তমানে যা প্রচলিত, তা তিন রকম ব্যাকরণের সংমিশ্রণজাত, লাতিন, ইংরেজি, ও সংস্কৃত ব্যাকরণের অসুখী মিলনে জন্মেছে প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকগুলো। বাঙলা ব্যাকরণের আদি পুরুষরা বিদেশি-বিভাষী, তাঁরা লাতিন ও ইংরেজি ব্যাকরণের ক্যাটেগরি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন বাঙলায়; পরে আসেন

সংস্কৃত পণ্ডিতেরা, যাঁরা বাঙলাকে অধঃপতিত সংস্কৃত ভেবে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত প্রণালি ও ক্যাটেগরি প্রয়োগ করেন বাঙলায়। আর্থ ক্যাটেগরি সর্বজনীন হ'তে পারে, কিন্তু শাব্দ-বাক্যিক ক্যাটেগরিতে ভাষায় ভাষায় পার্থক্য অনেক। আর্থ ক্যাটেগরি গঠন করে ভাষার আন্তর সংগঠন, এবং শাব্দ ও বাক্যিক ক্যাটেগরি রচনা করে ভাষার বহিঃসংগঠন, যাতে ভাষায় ভাষায় প্রচুর বিরুদ্ধতা ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথাগত ব্যাকরণ যদিও প্রধানত অর্থনির্ভর, তবু বিশ্লেষণের সময় ভাষার বাস্তব দিকেই তা বেশি মনোযোগ দেয়। বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করতে ব'সে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাঙলায় খুঁজতে থাকেন সংস্কৃত ক্যাটেগরি, শুদ্ধ বাঙলার নামে সংস্কৃত থেকে নিয়ে আসেন প্রচুর সংস্কৃত সূত্র, এবং জন্ম দেন এমন এক আনুশাসনিক শাস্ত্র, যা বাঙলা ভাষা বিশ্লেষণ করে নি, এবং তার অনুশাসনও মান্য ব'লে বিবেচিত হয় নি। এ-ব্যাকরণগুলোকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ (১২৯২, ৩৪২) মন্তব্য করেছিলেন : 'প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।' প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ শুধুই ছাত্রপাঠ্য, বিভ্রান্তিকর ও অন্ধ।

প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ উদ্দেশ্যে আনুশাসনিক, প্রণালিতে সামান্য পরিমাণে বর্ণনামূলক, এবং অতি সামান্য পরিমাণে সৃষ্টিশীল। প্রধানত শব্দশুদ্ধতা নির্দেশ এগুলোর লক্ষ্য। এ-সমস্ত পুস্তককে গ্রহণ করা যেতে পারে উপাত্তসংগ্রহ ব'লে; কিন্তু ওই উপাত্তও সর্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ-সমস্ত ব্যাকরণের ওপর একবার চোখ ফেললেই দেখা যায় এগুলোর আলোচ্য বিষয় অভিন্ন, রীতি অভিন্ন, এমনকি উদাহরণ-উপাত্তও অভিন্ন। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের ইতিহাস মেধারহিত পুনরাবৃত্তির ইতিহাস। এ-ব্যাকরণগুলোর রচনারীতি ধর্মীয় আনুশাসনিক : ব্যাকরণবিদেরা এমন ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেন যাতে তাঁদের সিদ্ধান্তকে ধ্রুব শাশ্বত ব'লে মনে হয়। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের সাধারণ আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ (দ্র সুনীতিকুমার (১৯৭২)) : প্রথমে দেয়া হয় ভাষা ও ব্যাকরণের সংজ্ঞা, এবং সাধু-চলতি-আঞ্চলিক রীতির বাঙলার নমুনা। প্রথমেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এর ফলে, কেননা ব্যাকরণটির আলোচ্য ভাষারীতি কোনটি, তা স্থির করা মুশকিল হয়। সাম্প্রতিক রচয়িতারা অবিরাম যাতায়াত করেন সাধু-চলিত-আঞ্চলিক রীতির মধ্যে; অসাম্প্রতিক রচয়িতারা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকতেন সাধুরীতিতে। পাঠকের বোধি বাঙলা ব্যাকরণবিদদের প্রধান বান্ধব, তাই তাঁরা অনুপুঙ্খ বর্ণনায় যান না, এবং যে-বর্ণনা দেন, তা বিশৃঙ্খল। এরপর ব্যাকরণের বিষয় হয় 'বর্ণ ও ধ্বনি'। 'ধ্বনি' শব্দটি সম্প্রতিক সংযোজন; সংস্কৃতানুসারীরা 'ধ্বনি' বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করেন 'বর্ণ' শব্দটি, এবং জন্ম দেন ধ্বনি ও লিপির মধ্যে এক জটিল গোলযোগ। 'বর্ণ ও ধ্বনি' অংশে ব্যাকরণবিদদের প্রিয় বিষয় হচ্ছে 'সন্ধি'। পুস্তকের প্রথমেই সন্ধি, অর্থাৎ প্রতিবেশী ধ্বনির মিলনসূত্ররাশি, বিভ্রান্তি জন্মায়। সমাসবদ্ধ শব্দের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনই সন্ধিসূত্রের নির্দেশের বিষয়, তাই এর স্থান হওয়া উচিত সমাসের পরে। বাঙলা ভাষা সন্ধিনিয়ন্ত্রিত ভাষা নয়, তাই সন্ধি অংশে পাওয়া যায় সংস্কৃত

শব্দের ব্যাপক ও ক্লান্তিকর তালিকা, যা বর্ণনা ও অনুশাসন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। এর পরে 'পদ', 'বচন', 'লিঙ্গ', 'পুরুষ', 'কারক', 'বিভক্তি', 'অনুসর্গ', 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ', 'ক্রিয়া', 'সর্বনাম', 'অব্যয়', 'সমাস', 'শব্দগঠন;, 'প্রকৃতি', 'প্রত্যয়', 'উপসর্গ', 'বাক্যগঠন', 'বাচ্য', 'বাগধারা', 'প্রবাদ', 'অলঙ্কার' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা থাকে। বাঙলা ব্যাকরণের অধিকাংশ তত্ত্ব ও পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব থেকে ঋণ করা।

বাঙলা ব্যাকরণে সাধারণত পাঁচ রকম পদ স্বীকার করা হয় : 'বিশেষ্য', 'বিশেষণ', 'সর্বনাম', 'ক্রিয়া' ও 'অব্যয়' (দ্র § ২.৪.০))। পদের সংজ্ঞা সাধারণত গ্রহণ করা হয় সংস্কৃত থেকে, তবে আধুনিক কালে ইংরেজি ব্যাকরণ বই থেকেও ঋণ করা হয়। সংস্কৃতের অনেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্ব বাঙলায় স্থূলভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সুগভীর কারকতত্ত্ব কালক্রমে সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতাদের হাতেই বিনষ্ট হয়েছিলো, এবং বাঙলায় তার প্রয়োগ হয় সমস্ত অন্তর্দৃষ্টিবর্জিত হয়ে। সংস্কৃত কারকতত্ত্ব আর্থ, কিন্তু বাঙলায় তা প্রযুক্ত হয় রূপগতভাবে; এবং সৃষ্টি হয় বিপুল বিশৃঙ্খলা। 'শব্দগঠন' অংশে 'কৃৎ' ও 'তদ্ধিত' প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দগঠন শেখানোও ব্যাকরণবিদদের এক প্রিয় কাজ। বাঙলায় প্রত্যয়গুলোকে দু-শ্রেণীতে ভাগ করাই অপ্রয়োজনীয়—কেননা 'ধাতু' ও 'নাম'-এর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে এদের চেনার কোনো উপায় নেই। প্রত্যয়ের নাম হয় যার সাথে তা যুক্ত হয়, তার নামানুসরণে। যেমন : ক+খ+গ; এখানে 'ক' ধাতু ও নামের, 'খ' প্রত্যয়ের, এবং 'গ' গঠিত শব্দের প্রতীক। যদি 'ক' ধাতু হয়, তবে 'খ'কে বলি 'কৃৎ প্রত্যয়', আর যদি 'ক' নাম বা বিশেষ্য হয়, তবে 'খ'কে বলি 'তদ্ধিত প্রত্যয়'। অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে যুক্ত হওয়ার আগে প্রত্যয়ের মধ্যে কোনটি কৃৎ, কোনটি তদ্ধিত, তা জানার উপায় নেই। তাই প্রত্যয়ের শ্রেণীকরণ অপ্রয়োজনীয়, এবং বিভ্রান্তিকর।

কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক বাঙলা ব্যাকরণপুস্তক পর্যালোচনা করলে প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উৎসাহীরা আসসুম্পসাঁউ (১৭৪৩), হ্যালহেড (১৭৭৮), রামমোহন (১৮৩৩), জগদীশচন্দ্র (১৩৪০), হরনাথ (১৯৩৭), সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ১৯৭২), মু. শহীদুল্লাহ (১৩৪৭), হরনাথ ও সুকুমার (১৩৫৬) দেখতে পারেন। আমি চারটি ব্যাকরণ— আসসুম্পসাঁউ (১৭৪৩), রামমোহন (১৮৩৩), সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ১৯৭২)—সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই শুধু। আসসুম্পসাঁউর *বাঙলা ব্যাকরণ* পর্তুগিজ ভাষায় লাতিন আদর্শে রচিত। তিনি উপাত্ত হিশেবে নিয়েছিলেন ভাওয়াল অঞ্চলের বাঙলা।

আসসুম্পসাঁউকে ইদানীং আর রচয়িতা ব'লে মনে করা হয় না, ধরা হয় সম্পাদক হিশেবে। তাঁর ব্যাকরণ আদর্শ ও উপাত্ত উভয় ক্ষেত্রেই ক্রটিপূর্ণ এবং তাঁর বর্ণনার মধ্যেও ক্রটির অভাব নেই। লাতিন আদর্শে তিনি বিশেষ্য ও ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন করেছেন। বিশেষ্যকে, লাতিন আদর্শে, বিভিন্ন 'গণ'-এ ভাগ করেছেন শব্দান্ত্য বর্ণ অনুসারে। বিশেষ্যের বিভিন্ন রূপ দেখানোর জন্যে তিনি এমন সব শব্দ উদাহরণ হিশেবে নিয়েছেন, যেগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক

নয়। যেমন : বিশেষ্যের বিভিন্ন রূপ দেখানোর জন্যে তিনি নিয়েছেন 'লোহা' শব্দটিকে; এবং দেখিয়েছেন যে শব্দটির একবচনে কর্তৃকারকরূপ 'লোহা', 'সম্বন্ধপদরূপ 'লোহার', 'সম্প্রদানরূপ 'লোহারে', 'কর্মরূপ 'লোহারে'/ 'লোহাকে', সম্বোধনরূপ 'অ(ও) লোহা', অপাদানরূপ 'লোহাতে', এবং কর্তৃকারকে বহুবচনরূপ 'লোহারা'। স্বীকার করতে হয় যে আসসুম্পসাঁউর 'লোহা' শব্দের রূপসমূহ নির্ভুল; তবে এ-উদাহরণ হাস্যকর ও আপত্তিকর এ-কারণে যে শব্দটি ওপরে প্রদর্শিত সবগুলো রূপ ধারণ করে না। 'লোহা'র বহুবচনের রূপ [*লোহারা] আমরা ভাবতে পারি না, যেমন ভাবতে পারি না প্রিয়সম্বোধন 'ও লোহা'। তাঁর পরবর্তী বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারাও শব্দরূপের এমন হাস্যকর ও বিভ্রান্তিকর উদাহরণ দিয়েছেন; কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে সব শব্দ স্থাপন করতে পারে না ক্রিয়ার সাথে সমস্ত কারকসম্পর্ক, এবং ধারণ করতে পারে না সমস্ত রূপ। বেশ কৌতুককর, লাতিন প্রভাবিত, বিশ্লেষণ পাওয়া যায় আসসুম্পসাঁউয়ে। 'লোহা' শব্দের বহুবচনরূপ গঠন সম্পর্কে আসসুম্পসাঁউ (১৭৪৩, ১২) বলেন : "লোহা' এই শব্দটিকে বহুবচনে রূপ করিতে হইলে সম্বন্ধে 'লোহার' সহিত আকার যোগ করিতে হয়। যেমন : কর্তৃ : 'লোহারা'। এমন বিভ্রান্ত, প্রিস্কিআনপ্রভাবিত, বর্ণনা অবিস্মরণীয়। লাতিন শব্দরূপ গঠনে প্রিস্কিআন শব্দান্ত্য বর্ণের ওপর গুরত্ব দিয়েছিলেন, এবং ত্রুটিভরা নিয়ম তৈরি করেছিলেন। সে-ত্রুটিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন আসসুম্পসাঁউ বাঙলা বর্ণনার সময়। ধাতুরূপ বর্ণনায়ও তিনি বিভ্রান্ত। বাঙলা ক্রিয়াপদ বচননিয়ন্ত্রিত নয়; বাক্যের কর্তার সাথে ক্রিয়ারূপের সঙ্গতি থাকে পুরুষ ও শ্রেণীতে। বাঙলা ক্রিয়াপদ (ক্রিয়ারূপ) বচননিরপেক্ষ : যেমন : 'আমি/আমরা যাবো'। আসসুম্পসাঁউও লক্ষ্য করেছেন এ-ব্যাপারটি, কিন্তু ধাতুরূপ দেখানোর সময় রূপগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে বাঙলা ক্রিয়াপদ অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ বচনভেদে ভিন্ন হয় ব'লে ধারণা জন্মে (দ্র § ৪.৪.১)। আসসুম্পসাঁউ (১৭৪৩, ১২) থেকে 'অস্তি-বাচক ক্রিয়া 'হ'-র বর্তমান কালের রূপগুলো উদ্ধার করছি :

একবচন	বহুবচন
আমি হই, বা আমি হ।	আমরা হই, বা হ।
তু, বা তুমি হইস, বা হ।	তোরা, বা তোমরা হইস।
উ হয়, বা তিনি হয়েন।	ওয়ারা হয়, বা তাহারা হয়েন।

ক্রিয়ারূপের উল্লিখিত বিন্যাস দেখেই ধারণা জন্মে বাঙলা ক্রিয়ারূপ বচনভেদে ভিন্ন হয়, যেমন ভিন্ন হয় পর্তুগিজে। কিন্তু তাঁর বিবরণটি পড়ার পর বোঝা যায় তেমন কোনো ভিন্নতা হয় না বাঙলায়। বাঙলা ক্রিয়ারূপের ভিন্নতা ঘটে কর্তার পুরুষ ও শ্রেণী অনুসারে— এ-সূত্রটি তিনি ধরতে পারেন নি।

রামমোহন রায়ের *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩) মাতৃভাষা বর্ণনায় বাঙালির প্রথম প্রচেষ্টা। এটিকে তাঁর একটি সৃষ্টিশীল রচনা ব'লে গ্রহণ করা সম্ভব। তিনি বাঙলার দিকে, তাঁর ভাষায়,

'ভাষা'র দিকে, নিজের চোখে তাকিয়েছিলেন; এবং সংস্কৃতের সাথে বাঙলার পার্থক্য অনেকটা স্পষ্ট বোধ করেছিলেন। তাই তিনি পরিহার করেছিলেন সে-সব বিষয়, যা সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত— যদিও তাঁর উত্তমপুরুষেরা সে-সব বিষয় পরম উৎসাহে গ্রহণ করেছেন বাঙলা বর্ণনার সময়। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* বেশ কিম্ভূত ভাষায় রচিত : তাঁর গদ্যরীতিটি যদি আরো পরিচ্ছন্ন হতো ((রামমোহনের (১৮৩৩, ৩৭৯) ভাষার উদাহরণ : 'শব্দসকল যাহা সম্ভ্রমরহিত সমূহকে কহে, তাহার স্বভাব বুঝাইতে প্রায় মি কিম্বা আমি ইহার সংযোগ করা হয়।), তবে এ-ব্যাকরণ ব্যাপকতর প্রভাব ফেলতে পারতো। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*, *গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নির* মতো না হলেও, সংক্ষিপ্তির নিদর্শন; তাই বাঙলা ভাষায় এক সামান্য খণ্ডাংশের বর্ণনাই এতে পাওয়া যায়। লাতিন ব্যাকরণ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন রামমোহন; —লাতিনে 'ব্যাকরণ' শব্দের অর্থ 'বর্ণবিদ্যা'; এবং তিনিও ব্যাকরণকে গ্রহণ করেছেন শুদ্ধ বর্ণপ্রয়োগশাস্ত্র ব'লে। তাঁর পদবিভাগ, তাঁর ভাষায় 'পদবিধান', বেশ তাৎপর্যপূর্ণ (দ্র § ২.৪.০)। ভাষার সমস্ত শব্দকে তিনি ভাগ করেছেন দু-প্রধান ভাগে—বিশেষ্য ও বিশেষণে। এ-বিভাগ লাতিন বা সংস্কৃত অনুসারী নয়। 'রাম' তাঁর কাছে বিশেষ্য, এবং 'যাইতেছেন' ও 'সুন্দর' বিশেষণ। গ্রিক-লাতিন ব্যাকরণবিদেরা প্রথম দিকে বিশেষ্য ও বিশেষণকে একই পদভুক্ত বলে বিবেচনা করতেন, সংস্কৃত ব্যাকরণে সুস্পষ্টভাবে ক্রিয়া নির্দেশ করা হয়েছে। বিশেষণপ্রিয়তা রামমোহনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কালে অবশ্য বিশেষণকে ক্রিয়া ব'লে গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশেষ্যের বিকল্প নামরূপে তিনি 'নাম' ও 'সংজ্ঞা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, এবং বিশেষ্যকে ভাগ করেছেন 'ব্যক্তি সংজ্ঞা', 'সাধারণ সংজ্ঞা', 'সামান্য সংজ্ঞা', 'প্রতি সংজ্ঞা' (সর্বনাম) প্রভৃতি বিভাগে। বিশেষণেরও করেছেন অনেকগুলো ভাগ : 'গুণাত্মক বিশেষণ', 'ক্রিয়াত্মক বিশেষণ', 'বিশেষণীয়', 'সম্বন্ধীয় বিশেষণ', 'সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ', ও 'অন্তর্ভাব বিশেষণ'। তিনি পদের চার রকম রূপ স্বীকার করেছেন : 'অভিহিতরূপ', 'কর্মরূপ', 'অধিকরণরূপ', ও 'সম্বন্ধরূপ'। এদের উদাহরণ যথাক্রমে : 'রাম', 'রামকে', 'রামে', ও 'রামের'। এ-রকম রূপ স্বীকারের মূলে আছে লাতিন ব্যাকরণ, যেখানে 'নোমিন্যাটিভ', তাঁর পরিভাষা 'অভিহিত', 'রূপকে মূলরূপ ধ'রে অন্যান্য রূপকে ধরা হয় 'পতিত' বা 'কারকরূপ' ব'লে। তিনিও শব্দের মূলরূপ হিশেবে গ্রহণ করেছেন কর্তারূপকে [অভিহিত]। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বাঙলা ভাষা লিঙ্গনিয়ন্ত্রিত নয়, তাই 'চিত্তের বিক্ষেপ' এড়ানোর জন্যে এ-বিষয়ে তিনি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তাঁর ব্যাকরণও শব্দকেন্দ্রিক; বিশুদ্ধ শব্দরূপ ও শব্দগঠনপ্রণালি শেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বাঙলা ব্যাকরণকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা 'উত্তম', 'মধ্যম', 'প্রথম' পুরুষ থেকে; এবং এর বদলে ইংরেজির অনুকরণে, গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে 'প্রথম', 'দ্বিতীয়', 'তৃতীয়' পুরুষকে। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর উদ্ভাবনকে সংস্কৃতের পদতলে বিসর্জন দেন। 'প্রতিসংজ্ঞা'র (সর্বনাম) যে-বিস্তৃত বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তাতে 'আপনি' সর্বনামটি পাওয়া যায় না। বাঙলায় এটি উদ্ভূত হয় কখন?

বর্তমান কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণের রচয়িতা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯, ১৯৭২)। তাঁর ব্যাকরণ সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণ এবং ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের রীতিনীতির মিশ্রণ। তিনিও, আক্ষরিকার্থে, বৈয়াকরণ;— তাঁর রচনায় ব্যাপকতা আছে, উপাত্তের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু নেই অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতা, এবং কোনো বিজ্ঞানসম্মত রীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ। তাঁর ব্যাকরণ বিভ্রান্তিকর এ-কারণে যে তিনি আবিরাম কালানুক্রমিক উপাত্তের সাহায্য নেন, এবং এমন ধারণা জন্মান যে ভাষাব্যবহারের জন্যে ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তনের জ্ঞান অপরিহার্য। তাঁর ব্যাকরণ ছাত্রপাঠ্য, এবং শুধুই ছাত্রপাঠ্য। পাশ্চাত্যে প্রথাগত ও ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণরচয়িতারা যে, গভীরতার পরিচয় দেন, তা এতে দুর্লভ।

প্র তি ব র্ণী ক র ণ

[ক] পরিভাষা

অর্থি [কর্তৃকারক] Orthē
আইতিআকি [কর্মকারক] Aitiake
আদভের্বিউম [ক্রিয়াবিশেষণ] Adverbium
আর্থ্রন [? নির্দেশক] Arthron
ইয়ুংগ্রাম্মাতিকার [নবব্যাকরণবিদ] Junggramatiker
উরস্প্রাখ [মূলভাষা] Ursprache
ওনোমা [নাম, বিশেষ্য, কর্তা] Onoma (বহুবচন onomata : ওনোমাতা)
কনইউকতিও [সংযোজন] Coniuctio
কাতিগর্হিমাতা [সমাপিকা ক্রিয়া] Katēgorhēmata
কোআদ্রিভিউম [চতুর্বিদ্যা] Quadrivium
কাসুস [পতন, কারক] Casus
ক্লেতিকে [সম্বোধন] Kleticke
গ্রাম্মাতিকি তেক্‌নি [বর্ণকলা, ব্যাকরণ] Grammatikē Technē
গ্রাম্যার জেনেরাল এ রেজোনে Grammaire Generale et Raisonne
জিনিকি [সম্বন্ধপদ] Gēnike
তাবুলা রাসা [শূন্যপৃষ্ঠা] Tabula rasa
ত্রিভিউম [ত্রিবিদ্যা] Trivium
থেআতেতুস Theateaus
দোতিকি [সম্প্রদান] Dōtike

নোমোস [প্রথা] Nomos

পৃতোসিস পতন, কারক] Ptosis

পারোল Parole

পার্তিকিপিউম [পার্টিসিপল] Participium

প্রাএপসিতিও [প্রিপজিশন] Praepositiō

প্রাগমা [নির্দেশিত বস্তু] Pragma

প্রিস্কিআনুস মাইঅর [প্রিস্কিআনের প্রধান] Priscianus Major

প্রিস্কিআনুস মিনর [প্রিস্কিআনের অপ্রধান] Priscianus Minor

ফিসিস [স্বভাব, প্রকৃতি] Physis

ফেরগ্লাইখেন্ডে গ্রাম্মাটিক [তুলনামূলক ব্যাকরণ] Vergleichende Grammatik

ভের্বুম [ক্রিয়া] Verbum

মোদিস্তায় [রীতিবাদ] Modistae

লঁগ Langue

লেকতন [অর্থ] Lekton

লোগোস [বাক্য] Logos

স্টামবাউমতেওরি [বংশতত্ত্ব] Stammbaumtheorie

সিমাইনন, [প্রতীক, ধ্বনি] Semainon

সিন্দেসমোই [সংযোজক অব্যয়] Syndesmoi

হ্রিমা (পদ, উক্তি, বিধেয়, ক্রিয়া] Rhēma : (বহুবচন Rhēmata : (হ্রিমাতা)

[খ] নাম

অশ্‌ট্‌হফ Osthoff

আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস Apollonius Dyscolus

আরিস্ততল Aristotle

আরিস্তোফানেস Aristophanes

আসসুম্পসাঁউ Assumpcam

ইউরিপিদেস Euripides

ইয়েসপারসেন Jespersen

এর্মোগেনেস Hermogenes

এস্কিলুস Aeschylus

ক্রাতিলুস Cratylus

ক্রেতিস অফ মাল্লস Crates of Mallos
গ্রিম Grimm
জুলিয়াস সিজার Julius Caesar
জোনস Jones
দিওনিসিউস থ্রাক্স Dionysius Thrax
দেকার্ত Descartes
দোনাতুস Donatus
পট Pott
পেতের এলিয়াস Peter Helias
প্রিস্কিআন Priscian
পেত্রুস ইস্পানুস Petrus Hispanus
প্লাতো Plato
প্রোতাগোরাস Protagoras
বপ Boop
বোএথিউস Boethius
ব্রুগমান Brugmann
মার্কুস তেরেনতিউস ভাররো Marcus Terenitus Varro
রাস্ক Rask
রেম্মিউস পালাএমন Remmius Palaemon
রোজার বেকন Roger Bacon
র‍্যাঁবো Rimbaud
লৌথ Lowth
শ্লাইখার Schleicher
শ্মিড্‌ট্‌ Schmidt
শ্লেগেল Schelegel
কিকেরো Cicero
সেন্ট ইজিদোর অফ সিভিল Saint Isidore of Seville
হুইটনি Whitney
হুমবোল্‌ড্‌ট্‌ Humboldt
হের্ডার Herder
হ্যালহেড Halhead

টীকা

[১] 'সোফিস্ট' শব্দের মূল অর্থ 'জ্ঞানীব্যক্তি'। তাঁরা বাগ্মিতার পাঠ দিতেন : চতুর চমৎকার বাচালতার সাহায্যে বিতর্কে বিজয়ী হওয়াই তখন বিবেচিত হতো জ্ঞান ও জ্ঞানীর লক্ষণ ব'লে। সক্রেটিস হরণ করেন তাঁদের মহিমা;—তিনি ধরিয়ে দেন সোফিস্টদের জ্ঞানের তুচ্ছতা ও অন্তঃসারশূন্যতা। ফলে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'ছদ্মজ্ঞানীব্যক্তি'।

[২] প্রাচীন গ্রিসে বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-ভর মেপেমেপে চমৎকার বিজ্ঞানমুখিতা দেখিয়েছিলেন সোফিস্টরা। কোনো বাক্যকে তাঁরা বলতেন 'বর্তুল বাক্য',' কোনোটিকে, সম্ভবত, 'চতুষ্কোণ বাক্য'। এমন বিজ্ঞানমনস্কতা সহজেই প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রূপ জাগাতে পারে। সোফিস্টদের বিজ্ঞানমনস্কতায় কৌতুক বোধ করেছিলেন আরিস্তোফানেস, যা উত্তপ্ত বিদ্রূপরূপে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর *ব্যাঙেরা* নামী প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কে। প্রেতপুরীতে দিউনিসিউস দেখতে পান এস্কিলুস ও ইউরিপিদেস-এর মধ্যে কবিতাযুদ্ধ। ইউরিপিদেস সোফিস্টদের অনুসারী, এবং মনে করেন যে 'প্রাকরণিক কৌশল'ই হচ্ছে উৎকৃষ্ট কবিতার লক্ষণ। কবিতাযুদ্ধে কীভাবে স্থির করা যাবে কবিতার মান? ইউরিপিদেস কোনো মন্ময় বিচারে বিশ্বাস করেন না, তিনি চান কবিতার বস্তুগত, নিরাসক্ত, তন্নিষ্ঠ বিচার। তাই তিনি প্লুতোর ভৃত্যদের আদেশ দেন নিয়ে আসতে দাঁড়িপাল্লা, রুলার, ও নানা রকম বৃত্ত, যাতে বস্তুগতভাবে পরিমাপ করা যায় কবিতার মান।

[৩] ধ্বনির সাথে কোনো শাশ্বত সম্পর্ক নেই অর্থের, তেমনি বর্ণের, আকৃতির সাথেও কোনো সম্পর্ক নেই অর্থের। তবে *ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্ব* ধ্বনি-অর্থের মধ্যে দেখাতে চায় সম্পর্ক; এবং ভাষাভাষীরা এবং বিশেষত শিশুরা, মন্ময়ভাবে অনেক সময় বিশেষ বর্ণমালার সাথে বিজড়িত করে বিশেষ বিশেষ আবেগ অনুভূতি। বর্ণমালার বিশেষ বর্ণের সাথে বিশেষ রঙের সম্পর্কায়নও ঘটিয়ে থাকে অনেকে। এমন সম্পর্কায়ন চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে জাঁ আর্তুর র‍্যাবোর *নরকে এক ঋতু* কাব্যগ্রন্থের 'প্রলাপপুঞ্জ' কবিতার দ্বিতীয় 'প্রলাপ'-এ, যার নাম 'শব্দের আলকেমি'। প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ : 'আবিষ্কার করেছি আমি স্বরবর্ণের রঙ! —আ কালো, অ শাদা, ই লাল ও নীল, উ সবুজ। —স্থির করেছি আমি প্রতিটি ব্যঞ্জনে গতি ও প্রকৃতি।'

[৪] ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্বের চরম ও চূড়ান্ত প্রয়োগ, বাংলা ভাষায়, করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথের 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' (১৩০৭) ও রামেন্দ্রসুন্দরের 'ধ্বনি-বিচার' (১৩১৪) প্রবন্ধে পাই ধ্বনির সাথে অর্থের সহজাত সম্পর্ক আবিষ্কারের এক বিস্ময়কর প্রয়াস, যাতে কল্পনাঅন্তর্দৃষ্টি সক্রিয় যতোখানি, ততোখানিই সক্রিয় তাঁদের তত্ত্বমত্ততা। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চূড়ান্তে যান নি, যদিও চরমে পৌঁচেছেন; কিন্তু

রামেন্দ্রসুন্দর, তত্ত্বের হাতছানিতে, চূড়ান্তে বা চোরাবালিতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বটি রেখেছেন পেছনে, ধ্বনির সাথে অর্থের সম্পর্ক খুঁজেছেন কবিপ্রতিভার সহায়তায়। রামেন্দ্রসুন্দর তত্ত্বকে ক'রে তুলেছেন মুখ্য, এবং বাঙলা ধ্বনি ও ধ্বনিসমষ্টির ওপর প্রয়োগ করেছেন নির্দয় বিজ্ঞানীর মতো। রবীন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক শব্দ বর্ণনা করতে গিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন : 'যে-সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।' এ-তত্ত্ব অবলম্বন করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধকে তিনি শ্রুতিগ্রাহ্য ক'রে তুলেছেন। ধ্বনি-অর্থের সম্পর্কস্থাপনে তাঁকে, মাঝেমাঝে, সাহায্য নিতে হয়েছে এমন সব অনুমানের, যাকে বাঙলায় বিশেষিত করা হয়ে থাকে 'স্বকপোলকল্পিত' শব্দে। তবে রবীন্দ্রনাথ একটি সীমা রক্ষা করেছেন সব সময়ই। কিন্তু ধ্বনি অর্থের মিলনতত্ত্বকে চূড়ান্তে নিয়ে গেছেন রামেন্দ্রসুন্দর; — তাঁর দীর্ঘ, ব্যাপক, পরিশ্রমী প্রবন্ধটিতে যেমন পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, তেমনি পাওয়া যায় তত্ত্বের আকর্ষণে বস্তু-পেরিয়ে-যাওয়া প্রচণ্ড স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা। তিনি প্রতিটি ধ্বনিকে তার উচ্চারণ স্থান ও রীতি অনুসারে যুক্ত করেছেন বিশেষ ধরনের অর্থের সাথে; এবং ওই ধ্বনিসমূহের সমবায়ে গঠিত শব্দে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন ধ্বনির সাথে সহজাতভাবে জড়িত অর্থ। যেমন : প-বর্গের ধ্বনি সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের মত : 'প ফ ব ভ, এই চারি বর্ণের উচ্চারণে মুখকোটরের বায়ু দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া বাহির হয়। দুই ঠোঁট জোড়া হইয়া বায়ুর পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে; বায়ু ঠোঁট দুইখানিকে ভিন্ন করিয়া তাহাদের মাঝে পথ করিয়া লইয়া জোরের সহিত বাহির হয়। শূন্যগর্ভ ফাঁপা দ্রব্যের কঠিন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ বায়ু সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেই এই শ্রেণীর ধ্বনি জন্মে।' এবং তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে 'প-বর্গের ধ্বনির সহিত বায়ুপূর্ণ ফাঁপা দ্রব্যের স্বাভাবিক ধ্বনির সম্পর্ক রহিয়াছে।' এভাবে তিনি ধ্বনির সাথে অর্থের স্বাভাবিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেন, এবং বিপুল পরিমাণ শব্দের মধ্যে ধ্বনি-অর্থের সম্পর্ক নির্দেশ করেন। তাঁর অনেক আবিষ্কার চমৎকার, এবং অনেক আবিষ্কার রোমহর্ষক। প্রবন্ধের শেষে তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর আলোচনায় 'প্রচুর পরিমাণে অনুমান ও কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। বহু স্থলে হয়ত কষ্টকল্পনারও অভাব নাই।' রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ দুটি ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্বের শক্তি ও অশক্তির নিদর্শন।

|৫| থ্রাক্স ব্যাকরণকে গ্রহণ করেছিলেন 'প্রাকরণকি জ্ঞান' হিশেবে। তাঁর সময় গ্রিসে, আরিস্ততলীয় রীতিতে, জ্ঞানরাশিকে ভাগ করা হতো চার ভাগে : 'দক্ষতা', 'ব্যবহারিক জ্ঞান', 'কলা' ও 'উচ্চ জ্ঞান'। শ্রমিকের প্রয়োজন প্রথম শ্রেণীর জ্ঞান, দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান দরকার শ্রমিক-প্রধানের, তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান প্রয়োজন প্রকৌশলীর, এবং দার্শনিকের দরকার চতুর্থ শ্রেণীর জ্ঞান। থ্রাক্সের ব্যাকরণের নাম *গ্রাম্মাতিকি তেকনি* বা

বর্ণবিন্যাসকলা। ভাষায় প্রথম শ্রেণীর জ্ঞান থাকে প্রায় সব মানুষেরই, অর্থাৎ সব মানুষই ভাষা ব্যবহারে মোটামুটি দক্ষ এবং ভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানও অর্জন ক'রে থাকেন অনেকে। কিন্তু তাঁরা নানা অসামর্থ্যবশত, ভাষার শৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে পারেন না। তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান অর্জন করেন ব্যাকরণবিদেরা, যাঁরা ভাষার শৃঙ্খলা চমৎকারভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, এবং আবিষ্কার করেন ভাষার নানাবিধ সূত্র। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর জ্ঞান উদঘাটন করে সমস্ত কিছুর ধ্রুব অবিচল শৃঙ্খলা, যা থ্রাক্স মনে করেছেন যে তাঁর পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

[৬] জেমস বেট্টি (১৭৮৮) *দার্শনিক ব্যাকরণ*-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন (দ্র চোমস্কি (১৯৬৫, ৫)) : 'ভাষাসমূহের, সুতরাং, এ-বিষয়ে সাদৃশ্য মানুষের সাথে; যদিও প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যার সাহায্যে নির্দেশ করা যায় অন্যের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য, তবু সকলেরই রয়েছে কতিপয় সাধারণ গুণ, বা বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ভাষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয় প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণে ও অভিধানে। যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক ভাষায় অভিন্ন, বা যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন প্রত্যেক ভাষার, তাদের ব্যাখ্যা করা হয় যে-শাস্ত্রে, তাকে আমরা নাম দিয়েছি, 'সর্বজনীন বা দার্শনিক ব্যাকরণ'।

[৭] লাইপজিগের তরুণ বিদ্রোহীরা ১৮৭৬ সালে ঘোষণা করেন যে, 'ধ্বনিসূত্র ব্যতিক্রমরহিত', এবং অবিলম্বে তাঁরা অর্জন করেন প্রবীণদের তিরস্কার ও বদনাম 'ইয়ুংগ্রাম্মাতিকার' [নবব্যাকরণবিদ]। অগ্রজদের দেয়া এ-বদনামটিকে তাঁরা পরিণত করেন সুনামে, এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যবিশ্লেষণের সাহায্যে ভাষাপরিবর্তনের সূত্র নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। 'নবব্যাকরণবিদ'দের মধ্যে ছিলেন ব্রুগমান, অশ্‌ট্‌হফ, লেস্কিন প্রমুখ। তাঁরা আলোড়ন জাগিয়েছিলেন, এবং লাইপজিগে আকৃষ্ট করেছিলেন অনেক ভাষাবিজ্ঞানীকে। লাইপজিগেই শিক্ষিত হয়েছিলেন মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের মহাপুরুষ লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড।

[৮] বেলভালকার (১৯১৫) খুঁজে পেয়েছেন সংস্কৃত ব্যাকরণের বারোটির মতো 'স্কুল', বা ধারা। ধারাগুলো নিম্নরূপ : (ক) প্রাকপাণিনীর ধারা [যাস্ক, শাকল্য, গার্গ্য, গালব] ; (খ) পাণিনীয় ধারা (পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, জয়াদিত্য, বামন, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, হরদত্ত, ভর্তৃহরি, কৈয়ট, ভট্টোরি দীক্ষিত, নাগেশ, বৈদ্যনাশ]; (গ) চান্দ্র ধারা [চান্দ্রগোমিন, কাশ্যপ]; (ঘ) জৈনেন্দ্র ধারা [মহাবীর, দেবনন্দী]; (ঙ) শাকটায়ন ধারা [শাকটায়ন (অর্বাচীন), অভয়চন্দ্রাচার্য, কেশববর্ণি]; (চ) হেমচন্দ্র ধারা [হেমচন্দ্র]; (ছ) কাতন্ত্র ধারা [সর্ববর্মণ, দুর্গাসিংহ]; (জ) সারস্বত ধারা [অনুভূতিস্বরূপাচার্য, পুণ্যরাজ, অমৃতভারতি]; (ঝ) বোপদেব ধারা [বোপদেব, দুর্গাদাস, বিদ্যাবাগীশ]; (ঞ) জৌমুর ধারা [ক্রমদীশ্বর, জুমর নন্দী, রাসবতী]; (ট) সৌপদ্ম ধারা [পদ্মানাভদত্ত]; এবং (ঠ) অন্যান্য [রূপগোস্বামী, বালরামপঞ্চানন]।

(৯) 'সংজ্ঞা' ও 'পরিভাষা' শব্দ দুটির অর্থ বাঙলা ভাষায় চরমভাবে বদলে গেছে। 'সংজ্ঞা' শব্দের সংস্কৃত অর্থ 'পরিভাষা', আর 'পরিভাষা' শব্দের আদি অর্থ 'পরিভাষার ব্যাখ্যা'। পাণিনি চয়ন করেছিলেন প্রচুর পারিভাষিক শব্দ; কিন্তু বাঙলা ব্যাকরণ প্রাকপাণিনীর পরিভাষাই গ্রহণ করেছে বেশি।

[পরিশিষ্ট : দুই]

অষ্টম অধ্যায়

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান

৮.১ ভূমিকা

একদা 'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান' ও 'বর্ণবিজ্ঞান' নামে বিখ্যাত, এবং বর্তমানে 'শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান' অভিধায় নিন্দিত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। বর্তমানে 'সাংগঠনিক' শব্দটি নিন্দার্থেই ব্যবহৃত হয় বেশি। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানকে বিবেচনা করা যেতে পারে একরাশ বিজ্ঞানমনস্ক প্রবণতার সমষ্টিরূপে। বিশেষ কোনো ভাষার কোনো সুনির্দিষ্ট কালের শারীর উপাদানের শ্রেণীকরণ ও বর্ণনা দেয়া সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যা প্রথাগত ব্যাকরণ নয়, এবং রূপান্তরবাদী ভাষাবিজ্ঞান নয়, তাই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান—এর এমন নঞার্থক সংজ্ঞাও দেয়া যেতে পারে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার রূপকেন্দ্রিক; অর্থকে সর্বদা পরিহার ক'রে ভাষা বর্ণনা করা এক ধর্ম। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে প্রত্যেকটি ভাষাকে বিবেচনা করা হয় কতিপয় পরস্পরসম্পর্কিত সিস্টেমের সমষ্টি ব'লে। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি, শব্দ প্রভৃতির কোনো নিজস্ব মূল্য স্বীকার না ক'রে তাদের মনে করা হয় ভাষাসিস্টেমের বিভিন্নাংশের মধ্যে সম্পর্কস্থাপক বস্তু ব'লে (দ্র লায়ন্স ১৯৬৮, ৫০))। এ-পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্তের ওপর আরোপ করা হয় অসীম গুরুত্ব, এবং উপাত্তের অন্তর্গত ভাষাবস্তুরাশি আবিষ্কারের জন্যে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ কর হয় বিভিন্ন প্রণালিপদ্ধতি (দ্র § ৮.২.২)। বলা যেতে পারে যে সাংগঠনিকেরা যান্ত্রিকভাবে যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যান্ত্রিকভাবে কোনো প্রক্রিয়ার আন্তর সূত্র উদঘাটন অসম্ভব ব'লে রূপন্তরবাদী ভাষাবিজ্ঞানীরা সাংগঠনিকদের প্রণালিপদ্ধতিসমূহকে 'ব্যাকরণ আবিষ্কারপ্রণালি' নামে বাতিল ক'রে দিয়েছেন (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৯৬৪, ১৯৬৫))। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা দৃষ্টি দিয়েছিলেন বিভিন্ন ভাষার বহিঃস্তরে, অর্থাৎ ধ্বনি, রূপ প্রভৃতিতে এবং নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন বিভিন্ন ভাষাবস্তুর বিন্যাস। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান উদ্ভূত হয়েছিলো, অনেকটা, প্রথাগত ব্যাকরণের প্রতিক্রিয়ায়, এবং অনেকটা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিক্রিয়ায়। প্রথাগত ব্যাকরণ আর্থ, ও আনুশাসনিক, কিন্তু সাংগঠনিকেরা ঘৃণা করতেন অর্থ ও অনুশাসনকে; আর ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ভাষার বিবর্তন আলোচনায় উৎসাহী, কিন্তু সাংগঠনিকেরা উৎসাহী ভাষার এক বিশেষ কালের বিশেষ 'অবস্থা'র বর্ণনায়। আমি, এখানে, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন

ধারার মধ্যে যেটি প্রধান, সে-মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান ধারাটির বিস্তৃত বিবরণ দানে উৎসাহী। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের উৎস ও আদিপুরুষ ফের্দিন্যাঁ দ্য সোস্যুর। মার্কিন সাংগঠনিকেরা যদিও সোস্যুর থেকে সুদূরে চ'লে গিয়েছিলেন, তবু সোস্যুরের প্রধান তত্ত্বরাশিও এ-রচনায় গৃহীত হয়েছে (দ্র — § ৮.১.১-৮.১.৪)।

৮.১.১ ফের্দিন্যাঁ দ্য সোস্যুর

ফের্দিন্যাঁ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩) আধুনিক, সাংগঠনিক, ভাষাবিজ্ঞানের জনক ব'লে স্বীকৃত। তাঁর জন্ম হয় সুইজারল্যান্ডে এক উদ্বাস্তু ফরাশি পরিবারে। বাইশ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের এক স্তম্ভগ্রন্থ *মেমোআর স্যুর ল্য সিস্তেম প্রিমিতিফ দে ভোআইএল দঁও লঁগ আঁদো-এওরোপেআন* (১৮৭৯) [*ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে স্বরধ্বনির আদিম সিস্টেম-বিষয়ক সন্দর্ভ*]। কালক্রমে তিনি পরিচিত হন এমিল দুর্খাইমের (১৮৫৮-১৯১৭) সমাজতাত্ত্বিক রচনাবলির সাথে, এবং প্রভাবিত হন তাঁর দ্বারা। জীবনকালে তাঁর কোনো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ বেরোয়নি। তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পর বেরোয়, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর বক্তৃতাসংগ্রহ, *কুর দ্য ল্যাঁগুইস্তিক জেনেরাল* (১৯১৫) [*তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানপাঠ*]। তাঁর এ-রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, প্রত্যক্ষপরোক্ষভাবে, বিশশতকী ভাষাবিজ্ঞানের সব ধারা। যখন সবাই প্রায় মগ্ন ছিলেন তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে, তখন তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সৃষ্টিতে। সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞান যে লিখিত ভাষার চেয়ে কথ্যভাষার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়, ভাষাবিজ্ঞানকে মনে করে, আনুশাসনিক নয়, বর্ণনাত্মক শাস্ত্র, এবং ভাষাকে বিবেচনা করা হয় পরস্পর-অন্বিত কতিপয় সিস্টেমের সমবায়—এর সবই সোস্যুর থেকে পাওয়া। সোস্যুরের ভাষিক চিন্তার কয়েকটি মৌল তত্ত্ব ও চাবিশব্দ : (ক) 'লঁগ', 'পারোল', 'লঁগাজ'-এর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ, (খ) 'কালানুক্রমিক' [ডায়াক্রোনিক] ও 'কালকেন্দ্রিক' [সিনক্রোনিক] ভাষাবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যনির্দেশ; (গ) 'ভাষিক প্রতীক'-এর সংজ্ঞা; (ঘ) 'আনুষঙ্গিক' ও 'বাক্যিক' [সিন্ট্যাগম্যাটিক] সম্পর্কের স্বাতন্ত্র্য, এবং (ঙ) 'আধার' ও 'আধেয়'র স্বাতন্ত্র্য।

৮.১.২ লঁগ, পারোল, লঁগাজ

ভাষা শব্দটিতে এক রকম অস্পষ্টতা রয়েছে : বাঙলা একটি ভাষা, ইংরেজি একটি ভাষা, জাপানি একটি ভাষা; কিন্তু যখন কোনো নামোল্লেখ না ক'রে শুধু ভাষার কথা বলা হয়, তখন মনে হয় 'ভাষা'র এক সর্বজনীন, অমূর্ত রূপ রয়েছে। ফরাশিতে 'ভাষা'র তিনটি প্রতিশব্দ আছে— 'লঁগ', 'পারোল', ও 'লঁগাজ'। সোস্যুর এ-শব্দ তিনটি ব্যবহার করেছেন ভাষার ত্রিরূপ দেখানোর জন্যে। চোমস্কির 'কম্পিটেন্স', 'পারফরমেন্স' যথাক্রমে সোস্যুরের 'লঁগ' ও 'পারোল'-এর সমান্তরাল (দ্র § ৪.২.৬)। ভাষাকে ত্রিরূপে ভাগ করার কারণ হলো সোস্যুর ভাষাকে পরিগণনা করতে চেয়েছিলেন বস্তুরূপে, যাতে ঐতিহাসিক তথ্য ছাড়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে

ভাষা বিশ্লেষণ করা যায়। এ-বিষয়ে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন দুর্খাইমের দ্বারা। ভাষার বিভিন্ন রকম অভিব্যক্ত বা উৎসারণ সোস্যুরের নিকট 'পারোল' [উক্তি]। ভাষাভাষীরা যে-সমস্ত উক্তি—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য—দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে, তার যোগফল হচ্ছে 'পারোল'। যদি কোনো ভাষাভাষীদের সমস্ত উক্তি সংগ্রহ করা হয়, তবে তাতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তি, বা 'পারোল', এবং ওই ভাষার আন্তর শৃঙ্খলা। সোস্যুরের কাছে 'পারোল' ও ভাষার আন্তর শৃঙ্খলার যোগফল হচ্ছে 'লঁগাজ'। সোস্যুর 'লঁগাজ'কে বিজ্ঞানসম্মত কারণে বিশ্লেষণের যোগ্য মনে করেন নি, কেননা 'লঁগাজ'-এ ব্যক্তির স্পর্শ সুস্পষ্ট, এবং তা সমগ্র সমাজের নয়। অর্থাৎ 'লঁগাজ'-এ ভাষার বিমূর্ত সর্বজনীন চরিত্র নেই। ভাষার আন্তর শৃঙ্খলাকে সোস্যুর নির্দেশ করেছেন 'লঁগ' নামে। 'লঁগ'-এর একটি বীজগণিতিক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সোস্যুর : 'লঁগাজ থেকে পারোল বিয়োগ করলে যা থাকে, তাই লঁগ'। সমাজের নিকট থেকে অসচেতন ও সহজাতভাবে পাওয়া যে-সমস্ত অভ্যাসের সাহায্যে আমরা পরস্পরকে বুঝি, উক্তি সৃষ্টি করি, এবং অন্যের উক্তি অনুধাবন করি, তাই 'লঁগ'। 'লঁগ' বলতে তিনি বোঝান ভাষাভাষীর ব্যক্তিতার স্পর্শরহিত ভাষাশৃঙ্খলাকে, যা সমস্ত সমাজের সম্পত্তি, যার নিয়মকানুন সমগ্র সমাজে অভিন্ন। 'পারোল'-এ পাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যখচিত ভাষারূপ, তাতে সমগ্র সমাজকে পাই না। 'লঁগাজ'-এ মিশ্রিত ব্যক্তি ও সমাজ। 'লঁগ'-এ পাই অভিন্ন নিয়মকানুনমানা সমাজকে। 'লঁগ' ব্যাপারটি বিমূর্ত। সোস্যুরের মতে ভাষাবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণের উপাত্ত হচ্ছে 'লঁগ', কেননা শুধু এরই আছে সর্বজনীন রূপ ও সূত্র। এ-তত্ত্ব থেকে ক্রমশ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে 'উক্তি' হচ্ছে 'পারোল'-এর একক, আর 'বাক্য' হচ্ছে বিমূর্ত, সর্বজনীন 'লঁগ-এর একক।

৮.১.৩ কালানুক্রমিক বনাম কালকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান

সোস্যুরের ভাষিক তত্ত্ব ও পারিভাষিক শব্দসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে *কালানুক্রমিক* ও *কালকেন্দ্রিক* ভাষাতত্ত্বের পার্থক্য নির্দেশ। নবব্যাকরণবিদেরা ভাষার ঐতিহাসিক বর্ণনাকেই মনে করতেন বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সোস্যুর ছিলেন এ-মতের বিরোধী। ভাষার কালানুক্রমিক-ঐতিহাসিক-বিদ্যা হচ্ছে কালপরম্পরায় কোনো ভাষার বিবর্তন বর্ণনা, আর কালকেন্দ্রিক—বর্ণনামূলক-বিদ্যা হচ্ছে বিশেষ এককালে কোনো এক ভাষার বিশেষ *অবস্থার* বর্ণনা। বর্তমানে যা 'বর্ণনামূলক' অভিধায় পরিচিত, তাকে তিনি দিয়েছিলেন 'কালকেন্দ্রিক' অভিধা, এবং যা 'ঐতিহাসিক' অভিধায় পরিচিত, তাকে দিয়েছিলেন 'কালানুক্রমিক' নাম। তাঁর পারিভাষিক শব্দ দুটি বহন করছে গূঢ় তাৎপর্য : 'কালানুক্রমিক'-এর (ঐতিহাসিক) বিপরীত তত্ত্বরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'কালকেন্দ্রিক'কে, এবং 'আনুশাসনিক'-এর বিপরীত রূপে 'বর্ণনামূলক'কে। কোনো ভাষার কালানুক্রমিক বর্ণনায় দেয়া যেতে পারে সে-ভাষার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিবর্তনের বর্ণনা, বা ওই বর্ণনা সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়সীমায় বিবর্তনের মধ্যে। কিন্তু কালকেন্দ্রিক বর্ণনা হচ্ছে বিশেষ এককালে কোনো এক ভাষার বিশেষ এক 'অবস্থা'র বর্ণনা। শুধু জীবিত নয়, মৃত ভাষারও কালকেন্দ্রিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব, যদি ওই

ভাষায় উপাত্ত পাওয়া যায়। যে-কোনো কালানুক্রমিক বর্ণনার ভিত্তি হচ্ছে কালকেন্দ্রিক বর্ণনা, কেননা যদি বিশেষ বিশেষ কালের ভাষার রূপ নির্ণীত না হয়, তবে তার বিবর্তন দেখানো অসম্ভব। তিনি ভাষার কালকেন্দ্রিক বর্ণনাকেই মূল্যবান বিবেচনা করেছিলেন, এবং এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে কোনো বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় ঐতিহাসিক উপাত্ত অপ্রয়োজনীয়। এ-ইঙ্গিতটি বিশশতকী ভাষাবিজ্ঞানের মর্মবাণী বহন করছে। প্রত্যেক ভাষার ভাষীরা ভাষার ইতিহাস না জেনেই ভাষা ব্যবহার করে। কালকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞানের মৌল তত্ত্ব বোঝানোর জন্যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রিয় সাদৃশ্য দাবা খেলাকে। দাবা খেলা যতোই এগোতে থাকে ঘুঁটির স্থানবদলের ফলে ততোই বদলাতে থাকে দাবার ছকের রূপ বা অবস্থা, কিন্তু ছকের অবস্থা বর্ণনা করা যায় খেলা চলাকালীন যে-কোনো মুহূর্তে। ছক এক বিশেষ সময়ে যে-অবস্থায় থাকে, তা বর্ণনার জন্যে আগের চালগুলোর ইতিহাস জানা অদরকারী। আগের চালগুলোর ইতিহাস না জেনে বিশেষ এক অবস্থায় ছকের রূপের বর্ণনা দেয়া যায়, অর্থাৎ ছকটিকে 'কালকেন্দ্রিক'ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব। সোস্যুরের মতে ভাষা তেমনভাবে বর্ণনা করা সম্ভব, এবং বর্ণনা করা উচিত।

বাঙলা ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক :

(১)	প্রাচীন বাক্যিক রূপ	সাধু রূপ	চলিত রূপ
	করিতে আছে	করিতেছে	করছে
	যাইতে আছে	যাইতেছে	যাচ্ছে
	খাইতে আছে	খাইতেছে	খাচ্ছে

(১) উদাহরণে দেখা যাচ্ছে চলতি বাঙলায় তৃতীয় পুরুষ-বর্তমান কাল-ঘটমান ক্রিয়ারীতিতে ক্রিয়ারূপ গঠিত হয় ক্রিয়াসমূহের সাথে ক্রিয়াসহায়ক 'ছে'-যোগে (যেমন : কর + ছে = করছে, যা + ছে = যাচ্ছে, খা + ছে = খাচ্ছে), কিন্তু সাধু রীতিতে ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হয় ক্রিয়াসহায়ক 'ইতেছে' (যেমন : কর + ইতেছে = করিতেছে)। এ-ক্রিয়ারূপগুলোর একটি বাক্যিক রূপও ছিলো, যা আজো আঞ্চলিক বাঙলায় ব্যবহৃত হয়। (দ্র (১) এর প্রথম স্তম্ভ) এ-বাক্যিক রূপগুলোতে দুটি ক্রিয়ামূল ব্যবহৃত হতো, এবং হয়। একটিতে যুক্ত হতো অসমাপিকাদ্যোতক ক্রিয়াসহায়ক 'ইতে', এবং অন্যটিতে (যা মূলত অস্তিবাচক ক্রিয়ামূল 'আছ') যুক্ত হতো সমাপিকাদ্যোতক ক্রিয়াসহায়ক 'এ'। জটিল বাক্যের একটি অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ারূপের সন্ধির ফলে সাধু ভাষারীতির সৃষ্টি হয়েছিলো 'করিতেছে', 'খাইতেছে ইত্যাদি ক্রিয়ারূপ। কিন্তু চলতি বাঙলায় ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হচ্ছে শুধুমাত্র 'ছে ('কর-ছে', 'লিখ-ছে', 'বল-ছে'), এবং ক্রিয়ামূল যদি স্বরান্ত হয়, তবে 'ছে'র সমস্থানিক দ্বৈত-উচ্চারণ হয় ('খা-ছে' → 'খাচ্ছে', 'যা-ছে' → 'যাচ্ছে')। সাধু ভাষায় এ-ক্রিয়ারূপসমূহ যেভাবে গ'ড়ে ওঠে, তা জানার জন্যে যেমন দরকার নেই প্রাচীন বাক্যিক রূপ, তেমনি চলতি ভাষায় যা গঠছে, তা বোঝানো বা বর্ণনার জন্যে সাধুরূপ জানার কোনো দরকার নেই। কালকেন্দ্রিক

ভাষাবিজ্ঞান ভাষার ইতিহাস মন্থন করার বদলে বিশেষ কোনো সময়ে ভাষার বর্ণনায় উৎসাহী। ইতিহাস মূল্যবান, কিন্তু বর্তমান জীবনবস্ত, ও অধিকতর মূল্যবান।

ভাষার বিবর্তন বর্ণনার জন্যে ভাষার বিভিন্ন স্তরের অবস্থা জানা দরকার; কিন্তু বিশেষ কোনো পর্বের ক্রিয়াকৌশল ও ব্যবহারসূত্র জানা বা বর্ণনার জন্যে ঐতিহাসিক বিবর্তনের জ্ঞান সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। কোনো ভাষার ভাষীদের অতি সামান্য অংশই তাদের ভাষার বিবর্তনের সংবাদ রাখে। ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে কোনো রকম সংবাদ যারা রাখে না, তারাও চমৎকার মেনে চলে তাদের ভাষার নিয়মাবলি। যে-সকল ভাষাভাষী (তাঁদের প্রধানাংশ পণ্ডিত) তাঁদের ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তনের সংবাদ রাখেন, তাঁদের ভাষা-ব্যবহারও কালকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞানের সপক্ষে। যদি দেখা যায় যে তাঁদের ব্যবহৃত ভাষা প্রাচীন নিয়মাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহলে বলতে হবে যে তাঁরা প্রাচীন ভাষা বলেন, অর্থাৎ তাঁরা সমকালীনদের থেকে পৃথক একটি ভাষা বলেন— তাই তাঁদের ভাষা সমকালীন ভাষার কালকেন্দ্রিক বর্ণনার উপাত্ত হ'তে পারে না। আবার যদি দেখা যায় যে ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান দৈনন্দিন ভাষার ওপর কোনোই প্রভাব ফেলে নি, তাঁরাও ব্যবহার করেন অন্য দশজনের মতো ভাষা, তবে তো ভাষার সমকালীন রূপের কালকেন্দ্রিক বর্ণনায় কালানুক্রমিক তথ্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কালকেন্দ্রিক বর্ণনা সর্বাংশে কালানুক্রমিক তথ্যমুক্ত। ভাষা পরিবর্তনশীল, তবে স্মরণ্য যে সময় ভাষার শাসক বা নিয়ন্ত্রক নয়। আন্তরবাহ্যিক নানা কারণে ভাষা এক কালকেন্দ্রিক অবস্থা থেকে আরেক কালকেন্দ্রিক অবস্থায় পৌঁছে।

৮.১.৪ আধার-আধেয়

ভাষা 'দ্বিসাংগঠনিক' : অর্থাৎ ভাষার 'নিম্নস্তর' ধ্বনিতত্ত্ব স্তরের ক্ষুদ্র ধ্বনি-এককসমূহ পরস্পরের সাথে পুনরাবৃত্ত বিন্যাস গ'ড়ে তোলে ভাষার 'উচ্চস্তর' রূপতত্ত্বের বৃহত্তম একক-রূপমূল, শব্দ ইত্যাদি। 'প্রকাশস্তর'-এর ('আধার'-স্তর) এমন দ্বিসাংগঠনিক বিন্যাসেই সামান্য কয়েকটি ধ্বনির সাহায্যে গ'ড়ে ওঠে ভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ। শব্দ হচ্ছে ধ্বনির বিভিন্ন বিন্যাস। 'দ্বিসাংগঠনিক' কথাটিকে ভুল বুঝে থাকে অনেকে : তারা ভুল ক'রে ভাষার দ্বিসংগঠন বলতে মনে করে 'আধার' ও 'আধেয়'কে। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বকে ধরা হয় ভাষার দুটি 'স্তর'— 'লেভেল'—ব'লে, এবং 'আধার' [অ্যাক্সপ্রেশন] ও 'আধেয়'কে [কন্টেন্ট] ধরা হয় ভাষার দুটি 'তল'—'প্লেন—ব'লে। বিভিন্ন ভাষার আর্থ সংগঠনের পার্থক্য সোস্যুর ও তাঁর অনুসারীরা ব্যাখ্যা করেন 'আধার' [সাবস্টেন্স] ও 'আধেয়'র [ফর্ম, কন্টেন্ট] (এর মধ্যে ফর্ম' [রূপ] শব্দটি সামান্য বিভ্রান্তি জন্মায়, কেননা এটি যেনো 'আধার'কে নির্দেশ করতে চায়) স্বাতন্ত্র্য দ্বারা। 'আধার' বলতে বোঝানো হয় ভাষার শরীর উপাদানকে, আর 'আধেয়' বলতে বোঝানো হয় অর্থকে, যা, সোস্যুরের কাছে, সব ভাষাতেই প্রায় অভিন্ন। বিভিন্ন ভাষার প্রধান ভিন্নতা 'আধার-

ভিন্নতাঘটিত। 'ফর্ম' শব্দটিকে এক বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন সোস্যুর, এবং তা প্রযোজ্য আধার ও আধেয় উভয় ক্ষেত্রে। 'আধার' ও 'ফর্ম'-এর স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্যে পুনরায় নেয়া যায় দাবা খেলার সাদৃশ্য। দাবাখেলায় ঘুঁটির উপাদানের কোনো ভূমিকা নেই। ঘুঁটি বানানো যেতে পারে কাঠে, প্লাস্টিকে, সোনায়, হীরকে, রূপসীর অস্থিতে, যে-কোনো বস্তুতে; শুধু লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে ঘুঁটিগুলোর রৌপ পার্থক্য সুস্পষ্ট থাকে। দাবাখেলায় ঘুঁটির উপাদানই শুধু তুচ্ছ নয়, এমনকি তুচ্ছ তাদের আকৃতিও। তাদের আকৃতিগত পার্থক্য ততোটুকু থাকা দরকার, যতোটুকুর সাহায্যে খেলার নিয়মানুসারে তাদের চালনা করা যায়। ঘুঁটির আকৃতি ও খেলায় তার ভূমিকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ প্রথাগত। তাই দাবাখেলায় যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে খেলার নিয়মকানুন, বা বিধি। এ-সাদৃশ্যটাকে আরোপ করা সম্ভব ভাষার 'আধার তল' এর ওপর : যে-সমস্ত উপাদানে আধার তল গঠিত, তার গুরুত্ব সামান্য; মূল্যবান হচ্ছে আধার তলের বস্তুরাশির ব্যবহারবিধি। সোস্যুর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন : 'সাবস্টেন্স নয়, ফর্মই ভাষা' (দ্র লায়ন্স (১৯৬৮, ৫৯))।

৮.২ মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান

সোস্যুর উৎস : তাঁর থেকে উৎসারিত হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি ধারা—দুটি ইউরোপ, এবং অন্যটি, ও সবচেয়ে শক্তিমানটি, আমেরিকায়।[১] বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানই একমাত্র ভাষাবিজ্ঞান—প্রথাগত ব্যাকরণ অবৈজ্ঞানিক—এমন শোর তুলেছিলেন মার্কিন সাংগঠনিকেরা। তাঁরা কালকেন্দ্রিক বর্ণনায় উৎসাহী ছিলেন। বিশশতকী মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম হয় উত্তর আমেরিকার মাঠেময়দানে। 'ভাষাবিজ্ঞানীর স্বর্গ' বলে কথিত উত্তর আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো অসংখ্য 'আমেরিন্ডিয়ান' ভাষা, যা সুদূরবর্তী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে। অধিকাংশ ভাষাই পৌঁচেছিল অবলুপ্তির উপপ্রান্তে; কোনো কোনোটির ভাষাভাষীর সংখ্যা গোণা যেতো এক আঙুলে। ওই রহস্যরঞ্জিত ভাষাগুলোর অবধারিত লোকান্তরের আগেই মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে, ও পূর্ণ বর্ণনাবিবরণ রচনা করতে। ওই ভাষা কোনো ভাষাবিজ্ঞানীরই মাতৃভাষা ছিলো না। অচেনা ভাষা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁদের শাস্ত্রের নানা প্রণালিপদ্ধতি। গবেষক কীভাবে ধ্বনিলিপিতে ধ'রে রাখবেন অতি অচেনা ভাষা, কীভাবে তিনি তথ্যদাতার কাছ থেকে চমৎকারভাবে বের ক'রে নিয়ে আসবেন নির্ভুল উপাত্ত, কীভাবে তিনি অর্থ পরিহার ক'রে প্রত্নলিপিউদ্ধারে মতো আবিষ্কার করবেন ওই ভাষার বিভিন্ন 'বস্তু'—এ-সম্পর্কে তাঁদের ভাবতে হয়েছে প্রচুর। এ-ভাবনা থেকে জন্মে তাঁদের অধুনানিন্দিত প্রণালিপদ্ধতিগুলো। যেহেতু তাঁরা মৃত্যুমুখি ভাষার শরীর কালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁদের রীতি ছিলো 'বর্ণনামূলক'।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বেরোয় ফ্রান্সৎস বোয়াসের (১৮৫৮-১৯৪২) *হ্যান্ডবুক অফ আমেরিকান ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজেজ*। এটির প্রকাশের পর প্রায় সব মার্কিন ভাষাগবেষকই এক বা একাধিক আমেরিন্ডিয়ান ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ভাষা লিপিবদ্ধকরণ ও বর্ণনার প্রয়োজনে তাঁরা সৃষ্টি করেন 'ফিল্ড মেথড' — অনুসন্ধানপ্রণালি, ভাষিক তত্ত্ব রচনার কথা তাঁরা ভাবেন নি। ভাষিক তত্ত্ব তাঁদের কাছে ছিলো অলিপিবদ্ধ ভাষা বর্ণনার কৌশলমাত্র, যাতে মারাত্মক আঘাত হেনেছেন রূপান্তরবাদীরা। *আবিষ্কারপ্রণালি*প্রবণ এ-ভাষাবিজ্ঞানকে চোমস্কি দিয়েছেন 'ট্যাক্সোনোমিক' [শ্রেণীকরণী] নাম। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তত দুজন প্রধান পুরুষ আমেরিন্ডিয়ান ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট হন নি। এ-শতকের চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে যিনি সবচেয়ে কঠোরভাবে, নৈর্ব্যক্তিক প্রণালিতে, ধ্বনি-একক আবিষ্কারের প্রণালি বের করেন, সে-বার্নার্ড ব্লকের কোনো সম্পর্ক ছিলো না আমেরিকার আদিভাষার সাথে। তাঁর সম্পর্ক ছিলো আমেরিকান ইংরেজি উপভাষাতত্ত্বের সাথে। পঞ্চাশ-দশকের প্রথমাংশে যিনি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রণালিপদ্ধতি সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরাসক্তভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, এবং যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের প্রণালি নির্দেশ করেছিলেন, তিনি জেলিগ হ্যারিস (দ্র হ্যারিস (১৯৫১)), চোমস্কির শিক্ষক। নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সাথে তাঁর যোগ ছিলো সম্প্রীতির, গবেষণার নয় (দ্র হাইম (১৯৭২))। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম পর্যায়ের প্রণালি-পদ্ধতি-পর্যবেক্ষণ-প্রবণতা মর্মমূলে একদল নব্য তরুণের প্রথা ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁরা ছিলেন নতুনের পূজারী : অদৃশ্যকে বাদ দিয়ে দৃশ্যমানের স্তব করেন তাঁরা। প্রণালিপদ্ধতির সাহায্যে গবেষণাক্ষেত্রে তাঁরা সঞ্চার করতে চেয়েছেন পরুষতা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের আলো-বাতাসেই ছিলো এক রকম অতীতসন্দেহ, এবং প্রথাগত ধ্যানধারণা ও চৈতন্যবাদে অনাস্থা। জীবনের অন্যান্য এলাকায়, যেমন কাব্যমণ্ডলে, সঞ্চারিত হয়েছিলো সন্দেহ, অনাস্থা ও দ্রোহ। মহাযৌদ্ধিক দুঃস্বপ্নের আগে চেতনাচৈতন্যের বড়ো স্থান ছিলো নৃতত্ত্বে-ভাষাতত্ত্বে; ব্লুমফিল্ডের মতো কঠোর বস্তুবাদী আচরণবাদীও চৈতন্যবাদী ছিলেন তরুণ যৌবনে। *ল্যাংগুয়েজ*-এর প্রথম সংস্করণে (১৯১৪) তিনি ছিলেন চৈতন্যবাদী, কিন্তু ওই গ্রন্থের শোধিত সংস্করণে (১৯৩৩) তিনি তাঁর বিগত বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলেন।

বোয়াস (১৯১১) আমেরিকার আদিভাষাগুলো বর্ণনার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে, ওই ভাষাগুলো সুপরিচিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলো থেকে এতো পৃথক যে তাদের বর্ণনায় প্রথাগত ব্যাকরণ সামান্যই সাহায্য করতে পারে। ওই ভাষাগুলোতে তিনি দেখিয়েছিলেন মানবভাষার অকল্পনীয় বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য। মানবভাষাসমূহে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য অধিক. মিলের চেয়ে অমিলের পরিমাণ অনেক বেশি—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন বোয়াস। ব্লুমফিল্ডেরও বিশ্বাস ছিলো : মানবভাষারাজির মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো

সাদৃশ্য নেই। তাঁরা মনোনিবেশ করেছিলেন বিভিন্ন ভাষার বহিরঙ্গের ওপর, তাই বৈসাদৃশ্যই তাঁদের চোখে পড়েছিলো বেশি। আমেরিন্ডিয়ান ভাষাগুলো বেশ রোমাঞ্চকর, তাতে এমন সব কলকাঠি আছে, যাদের বর্ণনা প্রথাসম্মত উপায়ে অসম্ভব। অনেক ভাষার কাল-ধারণা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কাল-ধারণার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—তাতে বর্তমান ও অতীতে কোনো পার্থক্য নেই, কোনোটিতে পার্থক্য নেই একবচনে-বহুবচনে, এবং কোনোটিতে একটিমাত্র শব্দে পুঞ্জিভূত হয় প্রচুর প্রত্যয়, এবং রচিত হয় বাক্য। এসব দেখে বোয়াস সিদ্ধান্তে পৌঁছেন : প্রত্যেক ভাষার আপন ও অনন্য সংগঠন ও সূত্র রয়েছে, এবং তাই ভাষাবিজ্ঞানীর কর্তব্য ভাষার নিজস্ব ক্যাটেগরি আবিষ্কার ক'রে ভাষাটি বর্ণনা করা। প্রত্যেক ভাষার অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্য সাংগঠনিকতার বৈশিষ্ট্য। বোয়াস-উত্তর, ১৯২৪-১৯৪৯ সময়সীমার, দুই প্রধান মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী : অ্যাডওয়ার্ড স্যাপির (১৮৮৪-১৯৩৯) ও লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (১৮৮৭-১৯৪৯)। দু-বিপরীত মেরুর বাসিন্দা স্যাপির ও ব্লুমফিল্ড : প্রথমজন সমস্ত বৈজ্ঞানিকতাকে বিজড়িত ক'রে দেন মন্ময় স্নিগ্ধতায়, এবং দ্বিতীয়জন পর্যবেক্ষণসম্ভব শরীর থেকে অবাস্তব আত্মাটিকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করতে পারলে বিজ্ঞানযাপনের আনন্দ পান। জর্মান তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে শিক্ষিত হয়েছিলেন স্যাপির, কিন্তু ক্রমশ, বোয়াসের প্রভাবে, আকৃষ্ট হন আমেরিন্ডিয়ান ভাষাবর্ণনায়। তাঁর উৎসাহ বহুমুখি : নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, সঙ্গীত, কবিতার মতো আপাতবিষম বিষয়ে ছিলো তাঁর উৎসাহ, এবং এ-সমস্ত বিষয়েই তিনি মূল্যবান রচনার জনক। কিন্তু তাঁর বই বেরিয়েছিলো মাত্র একটি : ছোট, অন্তর্দৃষ্টিমণ্ডিত, মনোরম বইটির নাম *ল্যাংগুয়েজ* (১৯২১), যে-নামে এক যুগ পরে ব্লুমফিল্ডের অসামান্য প্রভাবপাতী বইটি বেরোয়। স্যাপিরের ধারা, তাঁর জীবনকালে, খুব কম ভাষাবিজ্ঞানীই অনুসরণ করেছেন : তাঁর প্রতিভাবান অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে হাস, নিউম্যান, সোয়াডেশ ও বেনজামিন হোর্ফ। তাঁর মৃত্যুর পর মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানের কর্ণধার হন ব্লুমফিল্ড, ও তাঁর অনুসারীরা, এবং গড়ে ওঠে *ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞান*-এর দুর্দান্ত ধারা। কয়েক শতক পর রূপান্তরবাদীরা পুনরাবিষ্কার করেন স্যাপিরকে।[২] তাঁর ভাষা-ধারণা সোস্যুরের ভাষা-ধারণার সন্নিকট। ভাষাকে তিনি দ্বিরূপে দেখতেন— একটি ভাষার আদর্শ অমূর্তরূপ, অপরটি ভাষার বাস্তব মূর্তরূপ। তিনি মনে করতেন একাধিক ভাষার আন্তর রূপ অভিন্ন হ'তে পারে তাদের ব্যবহৃত ধ্বনি-শব্দ ইত্যাদির বহিরাঙ্গিক পার্থক্য সত্ত্বেও। আবার দুটি ভাষা ধ্বনিবস্তুতে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আন্তর প্রণালিতে হ'তে পারে ভিন্ন। তাঁর এ-ধারণার সাথে তখনকার সাংগঠনিক ভাষা-ধারণার প্রভেদ অসীম। স্যাপির তাঁর অমূল্য অন্তর্দৃষ্টির জন্যে ইদানীং প্রশংসিত; কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সুস্পষ্ট, সুচারু ও সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করেন নি। ব্লুমফিল্ডের ভাষা-ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টি স্যাপিরতুল্য নয়; কিন্তু তিনি প্রশংসিত ও ব্যাপকভাবে অনুকৃত হয়েছেন তাঁর প্রকাশরীতির আপাদশির বিজ্ঞানমনস্কতার জন্যে। ব্লুমফিল্ডের

ভাষারীতি যথাযথ ও অদ্ব্যর্থ, তিনি তাঁর বোধসমূহ এমন নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক, বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন যে তাতে স্ববিরোধ ও স্খলন আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব—যদিও তা বোধগম্য হ'তে সময় নেয়। ভাষাবিজ্ঞানকে 'স্বায়ত্তশাসিত' ও 'বিজ্ঞাসসম্মত' শাস্ত্রে পরিণত করার পেছনে তিনিই প্রথম প্রধান ব্যক্তি তাঁর (তাঁর নৈর্ব্যক্তিক সংজ্ঞানির্মাণ প্রণালির জন্যে (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯২৬))। ভাষাবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত করার জন্যে তিনি তাঁর পরিধি সঙ্কীর্ণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যা তিনি বিজ্ঞানসম্মতরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব মনে করেছেন, তাই তিনি বহিষ্কার করেছেন ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা থেকে। ব্লুমফিল্ড কর্তৃক ভাষাবিজ্ঞানরাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলো অর্থতত্ত্ব। যা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণঅসম্ভব, যা বস্তুগতভাবে পরিমাপঅযোগ্য, তাই অবৈজ্ঞানিক;—এমন ধারণা ছিলো তখনকার জলবায়ুতে, এবং এ-ধারণাকে বহুগুণে বাড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন চৈতন্যবাদী, এবং পরবর্তী জীবনে উগ্র আচরণবাদী। আচরণবাদ গ্রহণের পর ধর্মান্তরিত ভক্তের মতো সর্বত্র প্রয়োগ করেন আচরণবাদ, এবং তিরস্কার করেন পূর্বাধর্মকে। *ল্যাংগুয়েজ*-এ (১৯৩৩) তিনি আচরণবাদী কাঠামোতে ভাষাবর্ণনার চেষ্টা করেন। তাঁর আচরণবাদের প্রধান শিকারের নাম অর্থতত্ত্ব। রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় বেশি প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে নি আচরণবাদ, কিন্তু অর্থতত্ত্বের বেলায় চরমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে আচরণবাদ (দ্র § ৮.২.৪)। ব্লুমফিল্ড অর্থকে বিজ্ঞানসম্মতরূপে বিশ্লেষণের বিষয় না ভাবলেও অর্থকে ব্যবহার করেছেন নানা কাজে, অনেকটা ভৃত্যরূপে : অর্থশূন্য ধ্বনিমূল নির্ণয়ে তিনি সাহায্য নেন অর্থবৈষম্যের, এবং রূপমূল নির্ণয়ে ভালোভাবেই কাজে লাগান অর্থকে। ব্লুমফিল্ড অবশ্য কখনোই বলেন নি যে অর্থ ছাড়াই ধ্বনিতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব-বাক্যতত্ত্ব বর্ণনা সম্ভব, যদিও তা সম্ভব হ'লে অশেষ তৃপ্তি পেতেন তিনি। অর্থকে তিনি তাই সরিয়ে দিয়েছিলেন ভাষাবিজ্ঞানের সীমান্তে : অর্থরহিত ধ্বনি-রূপ-শব্দ-বাক্য বর্ণনার দ্বারা তিনি ব্যাকরণকে করে তুলতে চেয়েছিলেন আদ্যন্ত শারীরী, বা রৌপ। তাঁর কয়েকটি মৌল তত্ত্ব, যা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল্যবান বোধ ব'লে গৃহীত, নিম্নরূপ :

[ক] ভাষাবিজ্ঞানের বর্ণিতব্য মৌলবস্তু : ভাষা নামী জটিল ব্যাপার থেকে তিনি বের করতে চেষ্টা করেছিলেন ভাষাবিজ্ঞানের বর্ণিতব্য যথার্থ 'বস্তু'। ধ্বনি বা অর্থ নয়, 'বিশেষ ধ্বনিরাশির সাথে বিশেষ অর্থপুঞ্জের সম্মিলনসাধন', তাঁর কাছে, ভাষাবিজ্ঞানের মৌলবস্তু। ধ্বনিসমূহ ততোটুকুই মূল্যবান, যতোটুকু তা অর্থস্বাতন্ত্র্য ঘটায়, এবং ধ্বনির সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যই গুরুত্বপূর্ণ. যা অর্থস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির সাথে জড়িত।

[খ] ভাষিক রূপ : সে-সমস্ত রূপই 'ভাষিক রূপ', যাদের মধ্যে বিশেষ কতিপয় ধ্বনির সাথে বিশেষ কতিপয় অর্থ সম্পর্কিত। ধ্বনিমূল যেহেতু অর্থশূন্য, তাই তা যথার্থ ভাষিক রূপ নয়। ভাষিক রূপকে তিনি প্রথমে দু-ভাগে ভাগ করেন :

মুক্তরূপ : যে-সমস্ত রূপ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে (অর্থাৎ শব্দ, পদ ইত্যাদি)।

বদ্ধরূপ : যে-সমস্ত রূপ পরাধীন, অন্য রূপাশ্রিত হয়ে ব্যবহৃত হয় (অর্থাৎ বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি)।

রূপসমূহকে তিনি পুনরায় ভাগ করেন দু-ভাগে :

জটিল রূপ : অন্য রূপের সাথে যে-সমস্ত রূপের আংশিক ধ্বনিক-আর্থ সাদৃশ্য রয়েছে (অর্থাৎ শব্দ, পদ, বাক্য ইত্যাদি।)

সরল রূপ : অন্য রূপের সাথে যে-সমস্ত রূপের কোনো রকম ধ্বনিক-আর্থ সম্পর্ক-সাদৃশ্য নেই (অর্থাৎ রূপমূল।)

[গ] উপাদান : একাধিক জটিল রূপের মধ্যে যে-অংশ সাধারণ, তাই উপাদান। উপাদানকে তিনি 'অব্যবহিত' ও 'অন্ত্য'—দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন। তিনি 'অব্যবহিত-উপাদান' তত্ত্ব (দ্র § ৩.২) পেশ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু তার ব্যাপক প্রয়োগ দেখান নি। তাঁর অনুসারীরা (দ্র ওয়েলস (১৯৪৭), এবং ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকরচয়িতারা এ-তত্ত্বকে বিস্তৃতি দেন; কিন্তু তার ব্যাপক, সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল প্রয়োগ করেন চোমস্কি (১৯৫৭), ও অন্যান্য রূপান্তরবাদী (দ্র পোস্টাল (১৯৬৪ ক, খ))।

[ঘ] প্রতিকল্পন (বিকল্পন) : বিশেষ অবস্থায় ও শর্তসাপেক্ষে কোনো ভাষিক রূপের বিকল্পে অন্য রূপের ব্যবহার প্রণালির নাম 'প্রতিকল্পন'। প্রতিকল্পিত বা বিকল্পিত রূপকে বলা হয় 'বিকল্প' বা 'প্রতিকল্প'। বিকল্পরূপসমূহকে সাধারণত সাজানো হয় 'রূপ-শ্রেণী'তে [ফর্ম-ক্লাস]।

[ঙ] বাক্যিক সংগঠন : যে-সমস্ত ভাষিক রূপের অব্যবহিত-উপাদানগুলোর কোনোটিই মুক্তরূপ (মূল) নয়, তাদের অভিধা হচ্ছে বাক্যিক সংগঠন। দু-রকম বাক্যিক সংগঠনের কথা তিনি বলেছেন (দ্র § ৩.২) :

প্রকেন্দ্রিক সংগঠন [এন্ডোসেন্ট্রিক কনস্ট্রাকশন] : যখন কোনো সংগঠনকে তার উপাদানসমূহের যে-কোনো একটির রূপ-শ্রেণীতে ফেলা সম্ভব, তখন সংগঠনটি 'প্রকেন্দ্রিক'। যেমন : 'সুন্দর মেয়েটি' সংগঠনটিকে শুধুমাত্র' 'মেয়েটি' উপাদানের শ্রেণীতে ফেলা যায়, তাই 'সুন্দর মেয়েটি' একটি প্রকেন্দ্রিক সংগঠন।

বিকেন্দ্রিক সংগঠন [এক্সোসেন্ট্রিক কনস্ট্রাকশন] : যদি কোনো সংগঠনকে তার উপাদানসমূহের কোনোটির শ্রেণীতে ফেলা সম্ভব না হয়, তবে সংগঠনটি 'বিকেন্দ্রিক'। যেমন : 'সে গান গায়' বাক্যটিকে তার কোনো উপাদানের শ্রেণীতে ফেলা সম্ভব নয়, তাই 'সে গান গায়' বাক্যটি একটি বিকেন্দ্রিক সংগঠন।

ব্লুমফিল্ডের উল্লিখিত ধারণারাশি মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের মৌল ধারণারূপে গৃহীত হয়েছিলো, যা ত্রিশ-দশকের অন্ত্যপর্যায় থেকে রূপান্তর ব্যাকরণের উন্মেষকাল পর্যন্ত আধিপত্য করে। ব্লুমফিল্ডের পরে তাঁর ধারা জীবন্ত রাখার চেষ্টা করেছেন বার্নার্ড ব্লক, ইউজিন নাইডা,

জর্জ ট্র্যাগার, জেলিগ হ্যারিস, চার্লস হকেট ও অন্যান্য সাংগঠনিক। তাঁর অনুসারীরা ভাষার রৌপ বর্ণনার প্রণালি প্রণয়নে আরো এগিয়ে যান। প্রণালিপদ্ধতিপ্রবণতা চরম রূপ পায় হ্যারিসে (১৯৫১)। তিনি ধ্বনি-রূপমূল-সংগঠন ইত্যাদি শনাক্তি ও বর্ণনার এমন নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক যান্ত্রিক প্রণালি প্রণয়ন করেন, যাকে তাঁর একদা-ছাত্র (হ্যারিস (১৯৫১) ভূমিকায় তাঁর প্রতিভাবান ছাত্র চোমস্কির কাছে ঋণ স্বীকার করেছিলেন প্রুফ সংশোধনের জন্যে) চোমস্কি সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও বিধ্বস্ত ক'রে দেন তুচ্ছ 'ব্যাকরণ আবিষ্কারপ্রণালি' নামে। চোমস্কি শিক্ষিত হয়েছিলেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে, এবং তিনিই সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বিনষ্টকারী। চোমস্কির (১৯৫৭) উদ্ভবের পর শুরু হয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের পতনের কাল, এবং বর্তমানে তা তার সমস্ত পূর্বমর্যাদা থেকে বঞ্চিত। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের সারাংশ প্রকাশ করা যায় এভাবে : সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান কোনো ভাষিক তত্ত্ব নয়— 'ইট ইজ এ স্টক অফ প্রেসক্রিপশন্স ফর ডেসক্রিপশন্স' (দ্র ওয়েলস (১৯৬৩))। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের শোচনীয়তা স্পষ্ট এ-মন্তব্যে।

৮.২.১ সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রণালিপদ্ধতি : বিধিনিষেধ

মার্কিন সাংগঠনিকেরা যান্ত্রিকভাবে ভাষাবর্ণনার জন্যে উদ্ভাবন করেছিলেন নানা রকম প্রণালিপদ্ধতি, যা তাঁরা প্রয়োগ করতেন নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে। যান্ত্রিকভাবে ব্যাকরণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। যে-সমস্ত ভাষা নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা, সেগুলো তাঁদের কাছে ছিলো অজানা, তাই অর্থ পরিহার ক'রে ভাষাবর্ণনার প্রণালিপদ্ধতি তাঁরা উদ্ভাবন করেছিলেন। অর্থবিবর্জিত ভাষাশরীর ছিলো তাঁদের বর্ণনার বিষয়। তখন ভাষাবিজ্ঞানী পরিণত হয়েছিলেন অজানা লিপিউদ্ধারকারীতে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের নীতি ও প্রণালি নিম্নরূপ :

[ক] উপাত্ত (কর্পাস] : কোনো ভাষা বর্ণনার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীকে প্রথম সংগ্রহ করতে হবে 'উপাত্ত'। উপাত্ত হচ্ছে রেকর্ড-করা, বা ধ্বনিলিপিবদ্ধ 'উক্তিসমুচ্চয়' (আটরন্স]। এ-উক্তি সংগ্রহ করতে হবে সুনির্দিষ্ট এক কালের সুনির্দিষ্ট এক ভাষা থেকে;—একাধিক ভাষার, ও একাধিক কালের ভাষার মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। হ্যারিসের (১৯৫১, ১৪) সংজ্ঞানুসারে 'উক্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বাক্যাংশ, যার আগে-পরে নীবরতা বিরাজ করে।' উপাত্ত সংগ্রহের পর ভাষা বর্ণনার জন্যে প্রয়োগ করা হয় নানা প্রণালিপদ্ধতি। সাংগঠনিক প্রণালিপদ্ধতির কয়েকটি নিম্নরূপ :

[খ] প্রণালিপদ্ধতি (মেথড অ্যান্ড প্রোসিডিউর] : উপাত্তের ওপর একগুচ্ছ প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে আবিষ্কার করা হয় উপাত্তের ব্যাকরণ। এ-প্রণালিসমূহ হচ্ছে : 'প্রতিবেশ' [এনভাইরনমেন্ট], 'বণ্টন' '[ডিস্ট্রিবিউশন], 'সাম্য' [ইক্যুভ্যালেন্স], 'প্রতিকল্পন' বা 'বিকল্পন' ['সাবস্টিটিউশন], 'স্বাতন্ত্রিক অর্থ' [ডিফ্যারেনশল মিনিং], 'সমার্থকতা',

'অসমার্থকতা' ইত্যাদি। এ-প্রণালিগুলো সুনির্দিষ্টক্রমে প্রয়োগ ক'রে তাঁরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার করেন উপাত্তের ব্যাকরণ।

প্রতিবেশ : কোনো উক্তির মধ্যে কোনো একটি ভাষাবস্তু যে-সমস্ত স্থানে বসতে পারে, তাই হচ্ছে ওই ভাষাবস্তুটির প্রতিবেশ। প্রতিবেশ নির্ণয়ের জন্যে দেখতে হয় বস্তুটির ডানে-বাঁয়ে কী আছে, অর্থাৎ ডান-বাঁয়ের বস্তু দুটির মধ্যবর্তী স্থানটুকুই বস্তুটির অবস্থানক্ষেত্র, আর ডান-বাঁ তার প্রতিবেশ। যেমন : 'আমি যাচ্ছি' বাক্যের 'আমি'র প্রতিবেশ হচ্ছে' —'যাচ্ছি'।

বণ্টন : কোনো একটি ভাষাবস্তুর সমস্ত প্রতিবেশের সমষ্টি হচ্ছে ওই বস্তুটির বণ্টন।

শ্রেণী : যে-সমস্ত ভাষাবস্তু অভিন্ন প্রতিবেশে বসে, তাদের একই শ্রেণীসদস্য বিবেচনা করা হয়, এবং ভাষাবস্তুরাশিকে প্রতিবেশভিন্নতা অনুসারে বিন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন শ্রেণীতে [ক্লাসে]।

[গ] স্তর (লেভেল) : ভাষাবর্ণনাকে ভাগ করা হয় তিনটি ('রূপধ্বনিতাত্ত্বিক' স্তর-সহ চারটি) স্তরে :

ধ্বনি(তাত্ত্বিক) স্তর

রূপ(তাত্ত্বিক স্তর) স্তর

বাক্য(ইক) স্তর

এ-স্তরগুলো সৃষ্টি করে স্তরক্রম : নিম্নস্তর স্তরে থাকে ধ্বনিতত্ত্ব, উচ্চতম স্তরে বাক্যতত্ত্ব, এবং মধ্যস্তরে থাকে রূপতত্ত্ব। প্রতিটি স্তরের একক গঠিত হয় অব্যবহিত নিম্নস্তরের একক-সমবায়ে : ধ্বনিমূলসমবায়ে গড়ে ওঠে রূপমূল, রূপমূলপরম্পরায় জন্মে সংগঠন। তাই ভাষার বর্ণনা শুরু করতে হয় নিম্নতম স্তরে—ধ্বনিতত্ত্ব স্তরে। ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণনার পরে যেতে হয় রূপতত্ত্ব স্তরে, এবং রূপতত্ত্ব বর্ণনার পর যেতে হয় বাক্যস্তরে। এ-স্তরক্রম অবশ্যই মান্য করতে হবে, নইলে বর্ণনা ভ্রষ্ট হবে। সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যাকরণের চিত্ররূপ দেয়া হলো (২)-এ)।

সাংগাঠনিকেরা ভাষার বর্ণনা বা ব্যাকরণকে তিনটি প্রধান 'স্তর' বা 'কক্ষ'-এ বিভক্ত করেছিলেন (দ্র (২))। বর্ণনার সময় এ-স্তরগুলোকে সযত্নে পৃথক রাখতে হয়। এ-ব্যাকরণের কাঁচামাল হচ্ছে ধ্বনিলিপিবদ্ধ একরাশ 'উক্তি', 'বা 'উপাত্ত'। এ-উপাত্তের ওপর নানা রকম প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে শনাক্ত করা হয় ধ্বনিমূল, রূপমূল, ও অন্যান্য একক। এ-ব্যাকরণের সংগঠন একমুখি (তীরচিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত) : বর্ণনা শুরু করতে হবে নিম্নতম স্তরে — ধ্বনিতত্ত্ব স্তরে; তারপর যেতে হবে রূপতত্ত্ব স্তরে, এবং শেষে বাক্য স্তরে। কিন্তু ওপর স্তর থেকে নিম্ন স্তরে আসা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ধ্বনিমূল শনাক্তির জন্যে ব্যবহার করা যাবে না কোনো রূপতাত্ত্বিক তথ্য, বা রূপমূল নির্ণয়ে কাজে লাগানো যাবে না কোনো বাক্যিক তথ্য।
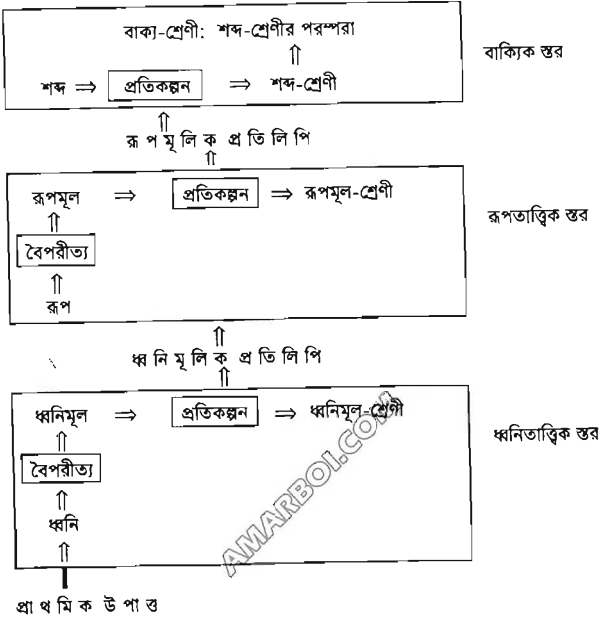
এ-বিশ্লেষণ প্রণালিপ্রাণ : ব্যাকরণের সমস্ত বিমূর্ত উচ্চ ক্যাটেগরিকে এ-কাঠামোতে বের করতে হয় উপাত্তের ওপর একগুচ্ছ কৌশল প্রয়োগ ক'রে। তাই ধ্বনিমূল ('ব্যবহারিক তাৎপর্যবহ অথচ অর্থরিক্ত ধ্বনি-শ্রেণী' (দ্র ম্যাকলে ১৯৭১, ১৫৯)), এ-ব্যাকরণে, উপাত্তের ওপর একরাশ কৌশলপ্রণালি প্রয়োগের ফল মাত্র। এ-বর্ণনার লক্ষ্য হচ্ছে শ্রেণীকরণ। এ-সমস্ত কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে 'রৌপ বণ্টনতত্ত্ব' (বণ্টন : কোনো ভাষাবস্তু যে-সমস্ত প্রতিবেশে ব্যবহৃত হতে পারে, তার সমষ্টি)। কোনো ভাষাবস্তুর বণ্টন নির্ণয়ের জন্যে সাধারণত দুটি কৌশল সুনির্দিষ্ট ক্রমে প্রয়োগ করা হয়। কৌশল দুটি হচ্ছে : 'বৈপরীত্য' ও 'প্রতিকল্পন'। এগুলো প্রয়োগ করা হয়, অভিন্ন প্রণালিতে, ব্যাকরণের সব স্তরে। প্রত্যেক স্তরের ব্যবহারিক তাৎপর্যবহ একক—যেমন : ধ্বনিমূল, রূপমূল—শনাক্ত করা হয় 'বৈপরীত্য'-এর সাহায্যে; এবং প্রত্যেক স্তরের একক-শ্রেণী—ধ্বনিমূল-শ্রেণী, রূপমূল-শ্রেণী—নির্ণয় করা হয় 'প্রতিকল্পন'-এর সাহায্যে। মনে করা যাক, কোনো একটি বিশেষ স্তর—'ক' স্তরের ভাষাবস্তুর (যেমন : ধ্বনি [ফোন], রূপ [মর্ফ] বণ্টন পাওয়া গেছে, তবে 'ক+১' স্তরে ভাষাবস্তু (ধ্বনিমূল, রূপমূল) স্থির

হবে নিম্নরূপে। যদি 'ক' স্তরের দুটি ভাষাবস্তু এক বা একাধিক বার অভিন্ন প্রতিবেশে বসে, তবে তাদের নির্দেশ করা হয় 'বৈপরীত্যসূচক (বা বিপরীত) বণ্টনভুক্ত' ব'লে, এবং 'ক+১' স্তরে তাদের নির্দেশ করা হয় ভিন্ন ভাষাবস্তু ব'লে। অন্যদিকে, যদি তাদের প্রতিবেশ সর্বদা বিভিন্ন হয়, তবে তাদের নির্দেশ করা হয় 'পরিপূরক বণ্টনভুক্ত' ব'লে। পরিপূরক বণ্টনভুক্ত বস্তুদের 'ক+১' স্তরে একই বস্তু. বা একই বস্তুর সদস্য ব'লে নির্দেশ করা হয়। তবে পরিপূরক বণ্টনভুক্ত ভাষাবস্তুদের একই ভাষাবস্তুর সদস্যরূপে নির্দেশ করার সময়, সাংগঠনিক নীতি বিপন্ন ক'রে, লক্ষ্য করা হয় ওই বস্তুদের মধ্যে ধ্বনিসাদৃশ্য আছে কি-না (ধ্বনিমূল নির্ণয়ের বেলায়), বা আর্থ সাদৃশ্য রয়েছি কি-না (রূপমূল শনাক্তির সময়), এবং বর্ণনা সুষমামণ্ডিত হচ্ছে কি-না। উল্লিখিত প্রণালিতে নিম্নতম কক্ষের ভাষাবস্তু আবিষ্কৃত হয়ে গেলে যেতে হয় অব্যবহিত উচ্চতর কক্ষে, এবং একই প্রণালিতে প্রয়োগ করা হয় 'বৈপরীত্য' ও 'প্রতিকল্পন' কৌশল। উচ্চতর কক্ষে কাঁচামালরূপে গৃহীত হয় অব্যবহিত নিম্নকক্ষে আবিষ্কৃত বস্তুরাশি। মনে করা যাক, কোনো কক্ষের (ধ্বনিতত্ত্ব কক্ষ, রূপতত্ত্ব কক্ষ) 'ক' স্তরের বস্তুরাশির ওপর বৈপরীত্য কৌশল প্রয়োগ করে পাওয়া গেছে ওই কক্ষেরই উচ্চতর স্তর 'ক+১' স্তরের ভাষাবস্তুসমূহ (ধ্বনিমূল, রূপমূল (দ্র চিত্র (২))। তাহলে 'ক+১' স্তরের বস্তুরাশির ওপর প্রয়োগ করা হবে 'প্রতিকল্পন' কৌশল। এ-স্তরের যে-সমস্ত বস্তু অভিন্ন প্রতিবেশে বসে, তাদের নির্দেশ করা হবে একই 'শ্রেণী'র সদস্যরূপে। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নয়নের জন্যে ব্যবহার করা হয় বৈপরীত্য কৌশল, এবং একই স্তরের বস্তুদের বিভিন্ন রূপ-শ্রেণী'তে বিন্যস্ত করার জন্যে প্রয়োগ করা হয় প্রতিকল্পন কৌশল।

সাংগঠনিক ব্যাকরণের প্রতিটি কক্ষ 'স্বায়ত্তশাসিত'। এ-ব্যাকরণে ভাষাবর্ণনা শুরু হয় ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষে বা স্তরে। এ-কক্ষের দায়িত্ব হলো বর্ণিতব্য উপাত্তের ধ্বনিতত্ত্ব—ধ্বনিরাশি ব্যবহারে আভ্যন্তর সূত্র—আবিষ্কার। এ-উদ্দেশ্যে শনাক্ত করা হয় উপাত্তের অন্তর্গত ধ্বনিমূলসমূহ [ধ্বনি-শ্রেণী]। ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণনার পরে কাজ শুরু হয় দ্বিতীয় কক্ষের; এ-কক্ষের কাজ হলো উপাত্তের রূপতাত্ত্বিক বর্ণনা। রূপতাত্ত্বিক কক্ষে কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয় নিম্নতর কক্ষের উচ্চতর বস্তু, অর্থাৎ ধ্বনিমূলপরম্পরা। এ-কক্ষে শনাক্ত করা হয় উপাত্তের অন্তর্গত রূপমূলসমূহ (দ্র § ৮.২.৩), অর্থাৎ 'ধ্বনিমূলপরম্পরা-শ্রেণী'সমূহ। রূপমূল সার্থ ভাষা-একক : রূপমূলের মধ্যেই ভাষার আধার-আধেয়র প্রথম মিলন ঘটে। প্রত্যেক ভাষায় ধ্বনিমূলের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু এই সীমিত সংখ্যক ধ্বনিমূলের পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে বিপুল পরিমাণ রূপমূল। রূপতাত্ত্বিক কক্ষের দায়িত্ব সম্পন্ন হ'লে কাজ শুরু হয় উচ্চতর কক্ষের : বাক্য কক্ষের। এ-কক্ষে কাঁচামালরূপে গৃহীত হয় 'রূপমূলপরম্পরা'। এখানে নির্ণয় করা হয় বাক্যের 'উপাদান' [রূপমূলপরম্পরা-শ্রেণী], এবং বর্ণনা করা হয় বিভিন্ন রকম বাক্য। উল্লিখিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে সাংগঠনিক ব্যাকরণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রণালির সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে শনাক্ত একগুচ্ছ ভাষা-এককের সমষ্টি।

৮.২.২ সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্ব

সাংগঠনিক ভাষাবর্ণনা শুরু হয় ধ্বনিস্তরে, আর এজন্যে ভাষাবিজ্ঞানীর সামনে উপস্থিত থাকে পর্যবেক্ষণসম্ভব বাস্তব ধ্বনিউপাত্ত। কথা বলার সময় ধ্বনিরাশি পরস্পরপৃথক রূপে উচ্চারিত হয় না, হয় অবিরাম উচ্ছ্রিত ধ্বনিপ্রবাহরূপে। ধ্বনিউপাত্ত বর্ণনার প্রথম স্তরে ধ্বনিবিজ্ঞানী অবিরাম উচ্ছ্রিত ধ্বনিপ্রবাহকে বিভক্ত করেন বিভিন্ন পৃথক খণ্ডে : অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহকে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনিখণ্ডে সুচারুরূপে ভাগ করাই সাংগঠনিক ধ্বনিবিদের আদিকর্তব্য। ধ্বনিপ্রবাহকে খণ্ডখণ্ড ক'রে পাওয়া যায় যে-সমস্ত একক, তাদের প্রত্যেকটিকে চিহ্নিত করা হয় এক-একটি প্রতীকে। ধ্বনিপ্রবাহকে বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ ক'রে পাওয়া যায় যে-সমস্ত ধ্বনিখণ্ড, তাদের বলা হয় 'ধ্বনি' [ফোন]। যখন কোনো ভাষার ধ্বনিপ্রবাহ থেকে আবিষ্কার করা হয়ে যায় তার ধ্বনিখণ্ডরাশি, তখন ধ্বনিতাত্ত্বিকের দায়িত্ব হয় ওই ভাষার ধ্বনিশৃঙ্খলা আবিষ্কার। সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হলো *ধ্বনিমূল*। বহু ভাষাবিজ্ঞানীর শ্রমেসাধনায় ধ্বনিমূল আবিষ্কারের প্রণালিপদ্ধতি ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে (দ্র সোস্যুর (১৯১৫), স্যাপির (১৯২৫), ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩), সোয়াডেশ (১৯৩৪), ট্রোবেল (১৯৩৫), ব্লক (১৯৪৮), হ্যারিস (১৯৫১), গ্লিসন (১৯৫৫), হকেট (১৯৫৮)। অবশ্য ধ্বনিমূলনির্ণয় প্রণালি আজো সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত ও 'বৈজ্ঞানিক' হয়ে ওঠে নি;—বিভিন্ন সাংগঠনিক একই ভাষায় বিভিন্ন সংখ্যক ধ্বনিমূল মাঝেমাঝেই আবিষ্কার করে থাকেন; এবং তাঁদের মৌল প্রয়োগপ্রণালির মধ্যে বিরোধ দেখা যায় অনেক সময়।

ধ্বনিমূলের নানাবিধ সংজ্ঞা প্রচলিত। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

[ক] ধ্বনিমূল হচ্ছে স্বাতন্ত্রিক ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের ক্ষুদ্রতম একক (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ৭৯))।

[খ] ধ্বনিমূল হচ্ছে কোনো ভাষার পরস্পরসম্পর্কিত ধ্বনিগুচ্ছ, যারা ওই ভাষার ধ্বনিপ্রবাহে এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে ওই গুচ্ছের একটি ধ্বনি যে-স্থানে বসে, অন্যগুলো সে-স্থানে কখনো বসে না (দ্র পেরেরা ও জোন্স (১৯১৯), জোন্স (১৯৫৭))।

[গ] ধ্বনিমূল হচ্ছে কোনো ধ্বনির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ গুণ (বা বৈশিষ্ট্য)-এর সমষ্টি (দ্র ত্রুবেৎস্কয় (১৯৬১, ৫২))।

[ঘ] ধ্বনিমূল হচ্ছে বিশেষ এক ধ্বনি-শ্রেণী (দ্র গ্লিসন (১৯৫৫, ২৫৮))।

[ঙ] কোনো ভাষার ধ্বনিশৃঙ্খলায় পরস্পরের বৈপরীত্যসূচক বস্তুরাজিই ধ্বনিমূল (দ্র হকেট (১৯৫৮, ২৬))।

এসব সংজ্ঞা সহজেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে ভাষাবিজ্ঞানে আগন্তুকদের (ধ্বনিমূলের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও তার চমৎকার সমালোচনার জন্যে (দ্র ট্র্যোডেল (১৯৩৫))। ধ্বনিমূলকে বাস্তব মূর্ত ধ্বনিবস্তুরূপে ভাবলে বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। ধ্বনিমূলকে বিবেচনা করা যায়

বিমূর্ত ধ্বনি-একক ব'লে, যা বাস্তবায়িত হয় বিভিন্ন ধ্বনিমূর্তিতে। যেমন : 'অ'কে ধ্বনিমূলরূপে না ধ'রে কল্পনা করতে পারি এক বিমূর্ত আদর্শ ধ্বনিমূল /অ/, যা বাস্তব মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে নিত্য-শোনা [অ] ধ্বনিরূপে (লক্ষণীয় : ধ্বনিমূলের প্রচলিত চিহ্ন/ /, আর ধ্বনিরূপের চিহ্ন [ ])।

কোনো ভাষার ধ্বনিমূল শনাক্ত করা যায় শুধুমাত্র 'আরোহী প্রথা'য়, এবং শনাক্তির সময় মেনে চলা হয় কতিপয় মৌল নীতি (দ্র সোয়াডেশ (১৯৩৪, ৪০-৪১))। এ-নীতিসমূহ হচ্ছে 'শব্দসামঞ্জস্যনীতি', 'আংশিক অভিন্নতানীতি', 'চিরসঙ্গনীতি', 'পরিপূরক বণ্টননীতি', 'বিন্যাসসঙ্গতিনীতি' 'এবং 'প্রতিকল্পননীতি'।[৩] ধ্বনিমূল নির্ণয়ের জন্যে সাংগঠনিকেরা খুঁজে ফেরেন 'ন্যূনতম শব্দজোড়' : শব্দযুগল, যাদের পার্থক্য শুধু একটি ধ্বনিতে। ইংরেজি বিপুল শব্দজোড়সমৃদ্ধ ভাষা; কিন্তু, বাঙালি ধ্বনিতাত্ত্বিকের দুর্ভাগ্য, বাঙলায় শব্দজোড় খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত হয়ে অবশেষে তাঁরা শব্দজোড় বানাতে উদ্যত হন (দ্র ফার্গুসন ও চৌধুরী (১৯৬০))। মনে করা যাক, সাংগঠনিক প্রণালিতে বাঙলার ধ্বনিশৃঙ্খলা বা ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণনা আমাদের বিষয়। আমাদের ধ্বনিউপাত্তে নিম্নের ধ্বনিপরম্পরা বিরাজমান (লক্ষণীয় উপাত্ত হিশেবে গৃহীত হয়েছে শব্দজোড়) : [পশু], [বসু]। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাঙলার ধ্বনিশৃঙ্খলায় [প] এবং [ব]-র স্থান ও অভিধা নির্ণয়। ধ্বনিবৈজ্ঞানিক পরিভাষায় [প] হচ্ছে 'অঘোষ অল্পপ্রাণ ঔষ্ঠধ্বনি', আর [ব] হচ্ছে 'ঘোষ অল্পপ্রাণ ঔষ্ঠধ্বনি'। এ-ধ্বনি দুটির পার্থক্য শুধু ঘোষতা-অঘোষতায়। [পশু], ও [বসু]-র মধ্যে তুলনা ক'রে বোঝা যায় যে [প] এবং [ব] পরস্পরের বিপ্রতীপ (বৈপরীত্যসূচক)। এরা বিপ্রতীপ, কেননা (ক) এরা উভয়ে অভিন্ন প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয় (এদের প্রতিবেশে : '—অশু'), এবং (খ) এদের স্বাতন্ত্রিক শক্তি— অর্থপার্থক্য সৃষ্টির শক্তি—আছে। এরা বসে একই প্রতিবেশ : এরা শব্দের শুরুতে বসতে পারে, এবং [অশু] ধ্বনিপরম্পরা দ্বারা অনুসৃত হ'তে পারে (ধ্বনিমূল শনাক্তির সময় প্রথাগত বানান সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে; থাকতে হবে উৎকর্ণ, শুনতে হবে শুধু ধ্বনিবৈশিষ্ট্য। ধ্বনিবিজ্ঞানী অন্ধ, তাঁর ইন্দ্রিয় একটি—শ্রুতি)। এদের (অর্থ) স্বাতন্ত্রিক শক্তি আছে : উদাহরণের শব্দ দুটির অর্থপার্থক্য ঘটেছে এ-ধ্বনি দুটির মধ্যে। যে-সমস্ত 'ধ্বনি' বিপ্রতীপ, সেগুলোকে পৃথক ধ্বনিমূলের সদস্য ব'লে বিবেচনা করা হচ্ছে সাংগঠনিক নীতি (দ্র § ৮.২.১)। সুতরাং আমরা [প] এবং [ব]-কে বিবেচনা করতে পারি দুটি পৃথক ধ্বনিমূলের সদস্য ব'লে, এবং ওই ধ্বনিমূল দুটিকে নির্দেশ করতে পারি, যথাক্রমে /প/ এবং /ব/রূপে। কোনো ধ্বনিমূলের এক বা একাধিক বাস্তব উৎসারণ বা রূপ থাকতে পারে। এজন্যেই ধ্বনিমূলের সংজ্ঞাদাতারা একটি ধ্বনিমূলকে 'ধ্বনিগুচ্ছ' বলে নির্দেশ করেন।

বাঙলা [ন], এবং [ণ] ধ্বনি দুটি লক্ষণীয়। উচ্চারণে এদের কোনো পার্থক্য নেই, তবে এদের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতেও পারে যখন বিশেষ এক শ্রেণীর ধ্বনির আগে এ-দুটি ব্যবহৃত হয়। [ন] বসে প্রায় সর্বত্র, আর [ণ] ব্যবহৃত হয় মুষ্টিমেয় প্রতিবেশে। দুটি শব্দ নিচ্ছি : [বন্ধন] এবং [বণ্টন]। আমার উচ্চারণে এখানেও কোনো পার্থক্য নেই [ন], ও [ণ]-এ, তবু ধরা যাক যে [ধ]-র পূর্ববর্তী [ন]-র সাথে সামান্য পার্থক্য আছে [ট]-র পূর্ববর্তী [ণ]-র। যদি

এখানে কোনো পার্থক্য থাকে, তবে তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেশগত। অর্থাৎ দন্ত্যধ্বনির আগে বসে [ন], আর প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির আগে বসে [ণ]। এরা কখনো অভিন্ন প্রতিবেশে বসে না। যদি বিশেষ ধ্বনিগুচ্ছ কখনোই অভিন্ন প্রতিবেশে না বসে, তবে তাদের মনে করা হয় 'পরিপূরক বন্টন'ভুক্ত ব'লে। পরিপূরক বন্টন হচ্ছে এক রকম অবিপ্রতীপ বন্টনের উদাহরণ। যে-সমস্ত ধ্বনিগুচ্ছ পরিপূরক বন্টনভুক্ত, তারা বিবেচিত হয় একই ধ্বনিমূলের সদস্য ব'লে। অর্থাৎ তারা একই ধ্বনিমূলের বিভিন্ন বাস্তব রূপ। তবে পরিপূরক বন্টনভুক্ত ধ্বনিরাশিকে একই ধ্বনিমূলের সদস্যরূপে গ্রহণের আগে পরখ ক'রে নেয়া হয় দু-একটি ব্যাপার। পরিপূরক বন্টনভুক্ত ধ্বনিরাশিকে তখনই বিবেচনা করা হয় একই ধ্বনিমূলের সদস্য ব'লে, যখন দেখা যায় যে ওই ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে ধ্বনিগত সাম্য-সাদৃশ্য আছে। ধ্বনি-সাম্য-সাদৃশ্যহীন পরিপূরক ধ্বনিগুচ্ছকে একই ধ্বনিমূলের সদস্য ব'লে ধরা হয় না। ব্যাপারটি একটি বানানো উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক যে, বাঙলার এমন কিছু প্রতিবেশ রয়েছে, যেখানে [ক] বসে, কিন্তু কখনোই [শ] বসে না, আবার এমন কিছু প্রতিবেশ আছে, যেখানে [শ] বসে, কিন্তু কখনোই [ক] বসে না। তাই [ক] ও [শ] পরিপূরক বন্টনভুক্ত। কিন্তু এদের একই ধ্বনিমূলের সদস্য ধরা হবে না—সাধারণ বাঙালিও বোঝে যে এরা ভিন্ন—, কেননা এদের 'বিন্যাসসঙ্গতি' বা ধ্বনিসাদৃশ্য নেই। কিন্তু [ন] ও [ণ] একই সঙ্গে পরিপূরক ও ধ্বনিসাদৃশ, অর্থাৎ একই ধ্বনিমূলের সদস্য হবার সমস্ত শর্ত এরা মেটায়। তাই /ন/ রূপ একটি বিমূর্ত ধ্বনিমূল কল্পনা করতে পারি, এবং [ন], ও [ণ]-কে বলতে পারি তার দুই ধ্বনিরূপ। 'একই ধ্বনিমূলের সদস্য' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে যে একই ধ্বনিমূলের দুই বা দুয়ের অধিক ধ্বনিপার্থক্যমণ্ডিত সদস্য, বা 'রূপান্তর' [ভ্যারিয়েন্ট] থাকতে পারে। ধ্বনিমূল নির্ণয়ের সময় 'সুমিতি' (বিন্যাসসঙ্গতি) ও 'পরিমিতি'র দিকেও চোখ রাখা হয়। যদি কোনো বিশ্লেষণে কোনো ভাষায় পাওয়া যায় বিশটি ধ্বনিমূল, এবং অন্য বিশ্লেষণে পাওয়া যায় ত্রিশটি, তবে পরিমিতির খাতিরে গ্রহণ করা হবে প্রথম বিশ্লেষণটি। কিন্তু এতেও বিপদ বাধে : পরিমিতির খাতিরে অনেক সময় জোর ক'রে ধ্বনিমূলের সংখ্যা কমানো হয় (দ্র ফার্গুসন ও চৌধুরী (১৯৬))। পরিমিতি ও সুমিতির সহাবস্থান জন্ম দেয় সমস্যা। পরিমিতি ও সুমিতি পরস্পরবিরোধী : প্রথমটি ধ্বনিমূলের সংখ্যা কমায়, দ্বিতীয়টি বাড়ায়।

অনেক সময় দেখা যায় দুটি পৃথক ধ্বনি একই প্রতিবেশে বসে, কিন্তু বৈপরীত্য সূচনা করে না, অর্থাৎ একটির বদলে অন্যটির ব্যবহারে শব্দার্থে কোনো পার্থক্য ঘটে না। এতে উচ্চারণে শুধু সামান্য স্বাতন্ত্র্য সঞ্চারিত হয়। এমন অবস্থায় ধ্বনিগতভাবে পৃথক একক দুটিকে ধরা হয় 'স্বাধীন রূপান্তর' ব'লে [লেখি], ও [লিখি] সমার্থক, এদের উচ্চারণপার্থক্য ঘটে প্রথম শব্দে [এ] এবং দ্বিতীয় শব্দে [ই] ব্যবহারের ফলে। এমন অবস্থায় [এ] ও [ই]-কে ধরা হবে পরস্পরের স্বাধীন রূপান্তররূপে, অর্থাৎ একই ধ্বনিমূলের বিভিন্ন বাস্তবায়ন ব'লে। স্বাধীন রূপান্তর অনেক সময় সাহায্য করে বর্ণনায়, এবং অনেক সময় সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি। যেমন :

[লেখি] ও [লিখি]-তে, তত্ত্বানুসারে, [এ] এবং [ও]-কে মেনে নিতে হয় স্বাধীন রূপান্তর ব'লে, যদিও এ-দুটি দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনিমূলের সদস্য। ধ্বনিমূলের বাস্তব উৎসারণকে বলা হয় 'সহধ্বনিমূল'। সহধ্বনিমূলগুলো কখনো থাকে পরিপূরক বণ্টনভুক্ত, এবং কখনো হাজির হয় স্বাধীন রূপান্তররূপে। 'মূল ও সহ'-নীতিকে (৩)-এর চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় (এ-নীতি প্রযোজ্য ধ্বনিমূল : সহধ্বনিমূল, রূপমূল : সহরূপমূল উভয় এলাকায় (দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ২৩০)) :

(৩)

.... [ক^{১}] /অ

.... [ক^{২}] /আ

.... [ক^{৩}] /ই

.... [ক^{৪}] /ঈ

.... [ক^{৫}] /উ

/ক/
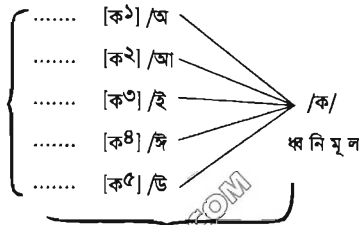
ধ্ব নি মূ ল

স হ ধ্ব নি মূ ল

(৩)-এর চিত্রে বিন্দুরেখাসমূহ নির্দেশ করছে বিভিন্ন স্বাধীন রূপান্তর, বন্ধনিবদ্ধ বস্তুরাশি (ক^{১}, ক^{২} প্রভৃতি) নির্দেশ করছে পরিপূরক বণ্টনভুক্ত রূপান্তর, এবং তির্যকরেখা ও বিভিন্ন বর্ণ (/অ, /আ প্রভৃতি) নির্দেশ করছে বিভিন্ন প্রতিবেশ। চিত্রটি নির্দেশ করছে যে /ক/ 'ধ্বনিমূলটি . '—/অ' প্রতিবেশ বাস্তবায়িত হয়। [ক^{১}] সহধ্বনিরূপে, '—আ' প্রতিবেশে বাস্তবায়িত হয় [ক^{২}] সহধ্বনিরূপে ইত্যাদি। [ক^{১}... ক^{৫}] হচ্ছে /ক/ ধ্বনিমূলের সহধ্বনি। ধ্বনিমূল /ক/র কোনো বাস্তব মূর্তি নেই, এটি বাস্তবায়িত হয়, বিভিন্ন প্রতিবেশে, বিভিন্ন সহধ্বনিরূপে।

সাংগঠনিকেরা ধ্বনিমূল আবিষ্কারের এমন প্রণালি বের করতে চেয়েছিলেন, যাতে অর্থ পরিহার করে শনাক্ত করা যায় উপাত্তের সমস্ত ধ্বনিমূল। কিন্তু তাঁদের সাধ ও সাধ্যে বিরোধ বেধেছে মাঝেমাঝেই। যে-বণ্টনরীতি তাঁদের বর্ণনার প্রধান হাতিয়ার, তা পরিহার ক'রে সদাই তাঁরা সাহায্য নিয়েছেন আর্থ মানদণ্ডের। ব্লক (১৯৪৮) চেষ্টা করেছিলেন অর্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ ক'রে ধ্বনিবর্ণনার, কিন্তু সাফল্য অনায়ত্ত থেকে গেছে। সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের একটি বিরক্তিকর ব্যাপার হলো শ্রেণীকরণ এবং শ্রেণীকরণ এবং শ্রেণীকরণ। এ-শ্রেণীকরণ বিভিন্ন ধ্বনির পার্থক্যকে বড়ো ক'রে তোলে, তাদের সাদৃশ্য দেখায় না। তাঁরা বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিপার্থক্যের ওপরেও জোর দিয়েছিলেন— এক ভাষার ধ্বনির সাথে অন্য ভাষার ধ্বনির তুলনাকে তাঁরা তিরস্কার করতেন, কিন্তু বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিসাদৃশ্য সাধারণ মানুষের শ্রুতিকেও ঠকাতে পারে না। সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি হলো ধ্বনিমূলের

'পরমাণুবাদীতত্ত্ব'। ধ্বনিমূল অবিভাজ্য : এটা হচ্ছে সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের সারকথা। এ-তত্ত্বে যেহেতু ধ্বনিমূলকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, তাই ভাষার বিপুল পরিমাণ ধ্বনিশৃঙ্খলা সহজ সরলরূপে দেখানো যায় না। রূপান্তরবাদীরা (দ্র চোমস্কি ও হাল (১৯৬৮), পোস্টাল (১৯৬৮) তীব্র আক্রমণ করেছেন সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বকে; তাই বর্তমানে সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্বের অবস্থা টলোমলো। রূপান্তরবাদী ধ্বনিতত্ত্বের নাম 'সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব'। সৃষ্টিশীল ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা অবিভাজ্যতায় বিশ্বাস করেন না।

৮.২.৩ সাংগঠনিক রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্ব—শব্দনির্মাণবিদ্যা— সাংগঠনিক ব্যাকরণের দ্বিতীয় কক্ষ বা স্তর। এর অবস্থান ধ্বনিতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব কক্ষের মধ্যস্থল (দ্র (২), § ৮.২.১ : লায়ন্স (১৯৭০))। শব্দের আন্তর গঠন বা রূপ বিশ্লেষণ রূপতত্ত্বের দায়িত্ব; বাক্যতত্ত্বের কাজ বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাজির বিন্যাসরীতি বর্ণনা। কিন্তু রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে সীমায়িত করা কঠিন : এ-স্তর দুটি বহু ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরলগ্ন। সাংগঠনিক ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণনার পর শুরু হয় রূপতত্ত্ব বর্ণনা, এবং এ-স্তরে উপাদানরূপে নেয়া হয় ধ্বনিতত্ত্ব স্তরে আবিষ্কৃত এককগুলোকে। ধ্বনিতত্ত্বে সাংগঠনিকদের বড়ো আবিষ্কার যেমন ধ্বনিমূল, রূপতত্ত্ব স্তরে তাঁদের বড়ো আবিষ্কার রূপমূল। যে-প্রণালিতে শনাক্ত করা হয় ধ্বনিমূল, সে-প্রণালির সাহায্যেই সাংগঠনিকেরা আবিষ্কার করেন রূপমূল, ও সহরূপমূল (দ্র স্যাপির (১৯২১) ব্লুমফিল্ড (১৯২৬, ১৯৩৩), হ্যারিস (১৯৪২, ১৯৫১), নাইডা (১৯৪৬, ১৯৪৮), হকেট (১৯৪৭, ১৯৫৪, ১৯৫৮), ম্যাথিউজ (১৯৭০, ১৯৭২, ১৯৭৪))। বিভিন্ন ধ্বনির পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে কোনো ভাষার রূপমূলসমূহ, এবং রূপমূলই এবং রূপমূলই হচ্ছে ভাষার ন্যূনতম সার্থ একক।

সাংগঠনিক রূপতত্ত্বের কিছুটা আভাস দেয়ার জন্যে উদাহরণের সাহায্য নেয়াই সবচেয়ে ভালো। উদাহরণ হিশেবে নিচ্ছি 'সাংবাদিকতা' শব্দটি। শব্দটি একটু নেড়েচেড়ে বুঝতে পারি যে এতে একটি মূল শব্দকে ঘিরে জড়ো হয়েছে আরো দুটি শব্দ, অর্থাৎ 'সাংবাদিকতা' শব্দটি তিনটি শব্দের মিলিত রূপ ('শব্দ' শব্দটি একটি 'আদিম ধারণা', অর্থাৎ এটি সুষ্ঠুভাবে নির্ণীত নয়)। শব্দটিকে ভাঙলে পাই তিনটি ভাষাবস্তু (আপাতত 'সাং'-এর 'আ-কার'টি সম্পর্কে নীরব থাকছি, এবং 'সংবাদ' আরো বিভাজ্য কি-না তাও ভাবছি না) : [সংবাদ], [ইক], [(অ)তা]। [সংবাদ]-এর সাথে [ইক] যোগ ক'রে পাওয়া যায় 'সাংবাদিক]', এবং 'সাংবাদিক'-এর সাথে [(অ)তা] যোগ ক'রে পাওয়া যায় 'সাংবাদিকতা'। দেখা যাচ্ছে যে, 'সাংবাদিকতা' তিনটি ভাষাবস্তুর যোগফল। এ-ভাষাবস্তুগুলো, সাংগঠনিক রূপতত্ত্বে, পরিচিত 'রূপমূল' অভিধায়। রূপমূল নির্দেশের জন্যে সাধারণত ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বন্ধনি (যেমন : {ইক})।

রূপমূল হচ্ছে ন্যূনতম সার্থ ভাষা-একক। রূপমূলের নানা সংজ্ঞা প্রচলিত; —তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

[ক] যে-ভাষিক রূপ অন্য ভাষিক রূপের সাথে আংশিক ধ্বনিক-আর্থ সাদৃশ্য বহন করে না, তাই রূপমূল (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ১৬১)। সংজ্ঞাটি আপাতদুর্গম অথচ অদ্ব্যর্থ ব্লুমফিল্ডীয় ভাষায় রচিত। সংজ্ঞাটি রচিত নঞার্থক ভাষায়। এর অর্থ হচ্ছে একই রূপমূলভুক্ত ভাষায় 'রূপ'সমূহ অভিন্ন ধ্বনিমূল সমবায়ে গঠিত নাও হ'তে পারে, এবং তারা নাও হ'তে পারে সম্পূর্ণ সমার্থক; কিন্তু এ-রূপসমূহ যদি অর্থসহ অন্য রূপের সদৃশ না হয়, তবে তাদের একই রূপমূলের সদস্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

[খ] রূপমূল হচ্ছে ন্যূনতম সার্থ একক, যা শব্দ বা শব্দাংশ গঠন করতে পারে (দ্র নাইডা (১৯৪৬, ১))।

[গ] কোনো ভাষা সংগঠনের ন্যূনতম সার্থ একক হচ্ছে রূপমূল (দ্র গ্লিসন (১৯৫৫, ৫৩))।

[ঘ] কোনো ভাষার উক্তিরাশির অন্তর্গত ন্যূনতম সার্থ বস্তু হচ্ছে রূপমূল (দ্র হকেট (১৯৫৮, ১২৩))।

রূপমূল, ধ্বনিমূলের মতোই, বিমূর্ত ভাষা-একক, এবং বাস্তবে তা নানারূপে উৎসারিত হয়। নানাবিধ মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রে রূপমূল শ্রেণীকরণ করা হয়। বণ্টন অনুসারে রূপমূলকে ভাগ করা হয় দুটি প্রধান শ্রেণীতে :

[ক] মুক্তরূপ(মূল) : যে-সমস্ত রূপমূল বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তাই মুক্তরূপ(মূল)। 'সাংবাদিকতা' শব্দগঠনে যে-সমস্ত রূপমূল ব্যবহৃত, তার মধ্যে একমাত্র [সংবাদ]-ই স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। তাই এটি একটি মুক্তরূপমূল।

[খ] বদ্ধরূপ(মূল) : যে-সমস্ত রূপমূল স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না, পরাশ্রিত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাই বদ্ধমূল(মূল)। 'সাংবাদিকতা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপমূল {ইক} ও {(অ)তা} কখনো মুক্তভাবে বসে না। তাই এগুলো বদ্ধরূপমূল। শুধুমাত্র ভাষাসংক্রান্ত বাক্যে বদ্ধরূপমূল স্বাধীনভাবে বসতে পারে। যেমন : বলতে পারি 'ইক' একটি বাঙলা রূপমূল।'

রূপমূলকে আরো নানা ভাগে ভাগ করা যায়। এমন দুটি ভাগ হচ্ছে : 'উপসর্গ', ও 'অনুসর্গ'। উপসর্গ ধাতুর আগে, এবং অনুসর্গ ধাতুর অন্তে বসে। ধাতু মুক্তরূপমূল হ'তে পারে, আবার হ'তে পারে বদ্ধরূপমূলও। তবে ধাতু কখনো উপসর্গ বা অনুসর্গ নয়। নাইডা (১৯৪৬, ৬-৬০) রূপমূল শনাক্তির ছটি, অন্যোন্যনির্ভর, প্রণালি বের করেছিলেন। এ-প্রণালি বা নীতিরাশি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রূপমূলের সংজ্ঞানুসরণে এ-প্রণালিগুলো ব্যবহার ক'রে রূপমূল শনাক্ত করা যায়। নাইডার রূপমূল শনাক্তির নীতিমালা:

[ক] সমআর্থবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সকল অবস্থায় অভিন্ন ধ্বনিমূলসমবায়ে গঠিত রূপসমূহ একই রূপমূলভুক্ত। এ-নীতি অনুসারে 'সাংবাদিক', 'সাহিত্যিক', 'ঔপন্যাসিক',

'প্রাবন্ধিক' ইত্যাদি শব্দের {ইক} রূপ একই রূপমূল রূপে গৃহীত। কেননা {ইক} উল্লিখিত শব্দগুলোতে সর্বদা অভিন্ন ধ্বনিতে গঠিত, ও সমার্থক। 'সাময়িক', 'সাম্প্রতিক', 'দৈনিক', 'বাৎসরিক' শব্দের {ইক} রূপও একই রূপমূলভুক্ত। কিন্তু প্রথম {ইক} ও দ্বিতীয় {ইক} ধ্বনিতে অভিন্ন হলেও অর্থে ভিন্ন, তাই এরা স্বতন্ত্র রূপমূল, বা স্বতন্ত্র রূপমূলের সদস্য।

[খ] সমআর্থবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, কিন্তু ধ্বনিমূলিক গঠনে (অর্থাৎ ধ্বনিমূলে, বা ধ্বনিমূলবিন্যাসে) ভিন্ন রূপরাজির রৌপ স্বাতন্ত্র্য যদি ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তবে ওই রূপসমূহ একই রূপমূলভুক্ত। এ-নীতি অনুসারে 'ছেলেরা', 'মেয়েরা', 'তারা' শব্দের বহুবচনচিহ্ন {রা}, এবং 'বালকেরা', 'লোকেরা', 'অধ্যাপকেরা' শব্দের {এরা} একই রূপমূলভুক্ত। {রা} ও {এরা} সমার্থক, কিন্তু এদের ধ্বনিমূলিক গঠনে ভিন্নতা রয়েছে। তবে এ-ভিন্নতা ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বাঙলায় স্বরান্ত্য বিশেষ্যশব্দের অন্তে বসে {রা}, আর ব্যঞ্জনান্ত্য বিশেষ্যের পরে বসে {এরা} : এ এক সরল ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র। এমন নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় 'ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ'। {রা} ও {এরা} যদিও গঠনে ভিন্ন, তবু তাদের গঠনগত ভিন্নতা যেহেতু ধ্বনিসূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তাই এরা অভিন্ন রূপমূলভুক্ত। {রা} ও {এরা} একই রূপমমূলের দু-রকম উৎসারণ বা বাস্তবায়ন, বা 'সহরূপমূল'।

[গ] সমআর্থবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রূপসমূহ যদি ধ্বনিমূলিক গঠনে এমনভাবে স্বতন্ত্র হয় যে ওই স্বাতন্ত্র্য ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, তবুও তাদের একই রূপমূলভুক্ত ব'লে বিবেচনা করা যাবে, যদি তারা, কতিপয় শর্তসাপেক্ষে, পরিপূরক বণ্টনভুক্ত হয়। এ-নীতির সাহায্যে ধ্বনিমূলিক গঠনে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য অথচ সমার্থক রূপসমূহকে একই রূপমূল ব'লে নির্দেশ করা হয়। যেমন : 'ভদ্রলোকগণ'-এর বহুবচনচিহ্ন {গণ}, ও 'কুকুরগুলো'র {গুলো}-র মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য নেই, এবং ধ্বনিসূত্রের সাহায্যেও এ-বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কিন্তু এ-নীতি অনুসারে {গণ} ও {গুলো} একই রূপমূলের সদস্য ব'লে বিবেচিত হবে।

[ঘ] কোনো সাংগঠনিক ভাষাবস্তু-শ্রেণীর অন্তর্গত বাহ্যিক গৌণ পার্থক্য রূপমূলরূপে বিবেচ্য, যদি ওই ভাষাবস্তু-শ্রেণীর কোনো একটি সদস্যের অন্তর্গত বাহ্যিক রৌপ পার্থক্য এবং একটি শূন্য সাংগঠনিক পার্থক্যই ধ্বনিক-আর্থ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ন্যূনতম একক চেনার একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ হয়। এ-নীতিটি প্রণীত কতিপয় ব্যতিক্রমী ইংরেজি শব্দের (যেমন : 'ফুট : ফিট', 'শিপ : শিপ', 'রিং : র‍্যা', 'স্লিপ : স্লেপ্ট') রূপমূল শনাক্তির জন্যে। বাঙলা রূপতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার আগে এ-নীতিটি বাঙলায় লাগবে কি-না, বলা অসম্ভব।

[ঙ] সমধ্বনিক রূপরাশিকে, নিম্ন শর্তসাপেক্ষে, অভিন্ন বা ভিন্ন রূপমূল ব'লে গণ্য করা হবে : স্বতন্ত্র অর্থমণ্ডিত সমধ্বনিক রূপরাশি ভিন্ন রূপমূল।

অর্থসম্পর্কযুক্ত সমধ্বনিক রূপসমূহের অর্থ-শ্রেণী যদি বণ্টনগত পার্থক্যের সমান্তরাল হয়, তবে তারা একই রূপমূলরূপে গণ্য; কিন্তু তাদের অর্থ-শ্রেণী যদি বণ্টনগত পার্থক্যের সমান্তরাল না হয়, তবে তারা বিভিন্ন রূপমূল।

সমধ্বনিক শব্দ (যে-সমস্ত শব্দ ধ্বনিগঠনে অভিন্ন) [বিশ : বিষ], [অংশ : অংস], [শাপ : সাপ] ইত্যাদি যেহেতু সমার্থক বা অর্থসম্পর্কযুক্ত নয়, তাই তারা একই রূপমূল ব'লে গণ্য হবে না। কিন্তু 'রেহানার পা' ও 'টেবিলের পা'র [পা] একই রূপমূল : এবং 'ডক্টর হাসানের মাথা' ও 'গাছের মাথা'র [মাথা] একই রূপমূল, যেহেতু তারা অর্থসাদৃশ্যবাহী।

[চ] কোনো রূপকে রূপমূল ব'লে শনাক্ত করা সম্ভব, যদি তা নিম্ন অবস্থায় বসে : বিচ্ছিন্ন বা পৃথকভাবে।

যে-সমস্ত একক-আশ্রিত হয়ে রূপটি ব্যবহৃত, সে-সমস্ত এককের অন্তত একটিও যদি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, বা অন্য রূপের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

রূপটি যদি শুধুমাত্র একটি এককের সাথে ব্যবহৃত হয়, তবে যে-এককেকটির সাথে ব্যবহৃত হয়, সেটি যদি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, বা অন্য 'অ-অনন্য', উপাদানের সাথে ব্যবহৃত হ'তে পারে। এ-নীতির প্রথম শর্তানুসারে 'ছেলে', 'মেয়ে', 'মানুষ', 'গাধা', যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে বসতে পারে বা আবৃত্ত হ'তে পারে, রূপমূলরূপে গণ্য। নীতিটির তৃতীয় শর্তাধীন বাঙলা উদাহরণ আমার জানা নেই।

দ্বিতীয় শর্তানুসারে 'প্রাবন্ধিক', 'সাংবাদিক' ইত্যাদির [ইক], যদিও এটি বিচ্ছিন্নভাবে বসে না, রূপমূল ব'লে গণ্য, কেননা এটি যে-সমস্ত এককের সাথে বসে, তারা বিচ্ছিন্নভাবে বসতে পারে। তৃতীয় শর্তটি মেটায় ইংরেজি 'ক্র্যানবেরি'র 'ক্র্যান', 'রাস্পবেরি'র 'রাস্প' রূপগুলো। 'ক্র্যান' ও 'রাস্প' শুধু একটি একক 'বেরি'র সাথে বসে, কিন্তু 'বেরি' বসে অন্য অনেক এককের সাথে।

নাইডা যদি বাঙলা উপাত্ত নিয়ে তাঁর নীতি স্থির করতেন, তবে তাঁর নীতির সংখ্যা বাড়তো বা কমতো। ধ্বনিতত্ত্বে যেমন পাওয়া যায় 'ধ্বনি', 'ধ্বনিমূল', 'সহধ্বনি(মূল)' ধারণা তিনটি, তেমনি তিনটি সমান্তরাল ধারণা পাওয়া যায় রূপতত্ত্বে : 'রূপ', 'রূপমূল' 'সহরূপ(মূল)' রূপমূল বিমূর্ত আদর্শ সার্থ একক, তার বাস্তবায়ন ঘটে এক বা একাধিক সহরূপমূলরূপে।

রূপতত্ত্ব সাধারণত বিভক্ত দু-ভাগে : (ক) শাব্দ রূপতত্ত্ব [ডেরিভেশন্যাল মর্ফোলোজি] ও (খ) প্রাতয়িক রূপতত্ত্ব [ইনফ্লেকশন্যাল মর্ফোলোজি]।

[ক] শাব্দ রূপতত্ত্ব : যে-প্রক্রিয়ায় যথার্থ নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাই শাব্দ রূপতত্ত্ব। যেমন : [সংবাদ]+[ইক] → 'সাংবাদিক' : শব্দ গঠনের এ-প্রণালি শাব্দ রূপতত্ত্বভুক্ত।

[খ] প্রাত্যয়িক রূপতত্ত্ব : গঠিত শব্দ বাক্যে ব্যবহারের সময় তার সাথে নানা রকম ভাষাবস্তু যোগের প্রণালি প্রাত্যয়িক রূপততত্ত্বের অন্তর্গত। যেমন : 'সাংবাদিক' + 'কে' → 'সাংবাদিককে' : বাক্যে ব্যবহারকালে বিশেষ্য বা ক্রিয়া বা অন্য পদের সাথে বিভিন্ন ভাষাবস্তু যোগের প্রণালি প্রাত্যয়িক রূপতত্ত্বভুক্ত।

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানে রূপমূলসংগঠন, এ-পর্যন্ত, তিনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (দ্র হকেট (১৯৫৪), ম্যাথিউজ (১৯৭০))। হকেট (১৯৫৪) প্রণালি তিনটির অভিধা দিয়েছেন :

[ক] বস্তু ও বিন্যাস [আইটেম অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট : আইএ]

[খ] বস্তু ও প্রক্রিয়া [আইটেম অ্যান্ড প্রোসেস : আইপি]

[গ] শব্দ ও শব্দ-শ্রেণী [ওয়ার্ড অ্যান্ড প্যারাডাইম : ডব্লিউপি]

মার্কিন সাংগঠনিকেরা 'বস্তু ও বিন্যাস' প্রণালি চল্লিশ-দশকের মধ্যভাগ থেকে ব্যবহার করেছেন। 'বস্তু ও প্রক্রিয়া' প্রণালির প্রধান প্রবক্তা রূপান্তরবাদীরা। 'শব্দ ও শব্দ-শ্রেণী' প্রণালির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে হয়েছে কম। 'বস্তু ও বিন্যাস' রীতিকে সরলভাবে নির্দেশ করা যায় কোনো ভাষাপ্রবাহের রূপমূলখণ্ডন, ও তার বিন্যাস ব'লে। ব্যাপারটি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করা যাক। 'সাংবাদিকেরা' একটি গঠিত শব্দ;—এটিকে ভাঙা সম্ভব তিনটি স্বাধীন খণ্ডে : 'সংবাদ' + 'ইক' + 'এরা'। একটি খণ্ড হচ্ছে 'সংবাদ';—এটি অন্যান্য শব্দে—যেমন : 'সুসংবাদ', 'দুঃসংবাদ',—ব্যবহৃত হয় ('সংবাদ'কেও ভাঙা সম্ভব আরো ক্ষুদ্রাংশে, কিন্তু বাঙলা রূপততত্ত্বের বর্ণনা যেহেতু আমার বিষয় নয়, তাই জটিলতা পরিহারের জন্যে ধ'রে নিচ্ছি যে এটি অবিভাজ্য); দ্বিতীয় খণ্ডটি হচ্ছে 'ইক'; —এটিও ব্যবহৃত হয় অন্যান্য শব্দে— যেমন : 'সাহিত্যিক', 'প্রাবন্ধিক' ; এবং তৃতীয় খণ্ডটি ব্যবহৃত হয় বিপুল পরিমাণ শব্দে— যেমন : 'লেখকেরা', 'যুবকেরা'। এ-প্রণালির মূলকথা হচ্ছে যে কিছু কিছু শব্দ-রূপ অন্যান্য রূপের সাথে 'আংশিক ধ্বনিক-আর্থ সাদৃশ্য' (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ১৬১)) বহন করতে পারে। 'সাংবাদিকেরা' শব্দের বিভিন্নাংশ 'সুসংবাদ', 'সাহিত্যিক', 'লেখকেরা' ইত্যাদি শব্দের বিভিন্নাংশের সাথে আংশিক ধ্বনিক-আর্থ সাদৃশ্য বহন করে। এ-প্রণালিতে শব্দের বিভিন্ন খণ্ডের সাথে রূপতত্ত্বের বিভিন্ন বিমূর্ত একককে (রূপমূল) সরাসরি যুক্ত করা হয়। 'সাংবাদিকেরা' শব্দে যে-সমস্ত বিমূর্ত একক ব্যবহৃত, তাদের চিহ্নিত করছি ঊর্ধ্বকমার (' ') সাহায্যে, এবং সে-এককগুলো হচ্ছে 'সংবাদ', 'ইক', ও 'বহুবচন'। এ-এককগুলো পরিচিত 'রূপমূল' নামে। শব্দে এ-এককসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমিক : এরা নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে শব্দে বিন্যস্ত হয়। 'সাংবাদিকেরা' শব্দে প্রথমে আসে 'সংবাদ', 'তারপর 'ইক', তারপর 'বহুবচন'। বাস্তবে এ-পুনরাবৃত্ত খণ্ডগুলোই পায় ধ্বনিরূপ। রূপমূলের বাস্তব উৎসারণকে 'রূপ' [মর্ফ : এটি

হকেটের পরিভাষা], বা 'রূপমূলিক খণ্ড [মর্ফিমিক সেগমেন্ট : এটি হ্যারিসের] বলা হয়। 'সাংবাদিকেরা'র রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (৪)-এর চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :

(৪)	রূপমূল	→	'সংবাদ'	'ইক'	'বহুবচন'
	⇓		⇓	⇓	⇓
	রূপ	→	সংবাদ	ইক	এরা
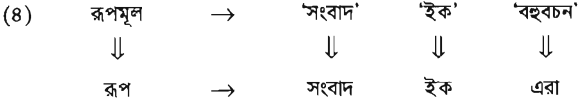
এখানে ঊর্ধ্বসারির ভাষাবস্তুগুলো রূপমূল, আর তীর দ্বারা চিহ্নিত নিম্নসারির বস্তুগুলো হচ্ছে রূপমূলের বাস্তব ধ্বনিউৎসারণ বা রূপ। এ-প্রণালিতে রূপমূলগুলো বিশেষ ক্রমানুসারে উপস্থিত হয়, এবং রূপমূলগুলোর রূপসমূহও বাস্তবায়িত হয় রূপমূলের ক্রমানুসারে। এ-প্রণালিতে কোনো ভাষার রূপতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে হ'লে দরকার হবে (দ্র ম্যাথিউজ (১৯৭০, ৯৯)) :

[ক] ওই ভাষার সমস্ত রূপমূল নির্ণয়;

[খ] ওই রূপমূলরাশি যে-পরম্পরায় বিন্যস্ত হ'তে পারে, তা নির্ণয়;

[গ] রূপমূলসমূহের বাস্তবায়ন বা রূপ নির্দেশ (অর্থাৎ রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন)।

একদা এ-প্রণালি প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে, এবং বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে এ-প্রণালিরই বিবরণ থাকে (দ্র হ্যারিস (১৯৪২), গ্লিসন (১৯৫৫), হকেট (১৯৫৮), হিল (১৯৫৮), হল (১৯৬৪), মাথিউজ (১৯৭৪))। কিন্তু ক্রমশ আপত্তি উঠতে থাকে এর বিরুদ্ধে। আপত্তি ওঠার প্রধান কারণ ইংরেজি ভাষায় এক ধরনের ব্যতিক্রমী শব্দ এ-প্রণালিতে বর্ণনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে ওই শব্দসমূহে নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে বস্তুবিন্যাস অসম্ভব (দ্র ওপরে বর্ণিত নাইডার রূপমূল শনাক্তির ষড়নীতির (ঘ) নীতি)। ইংরেজি 'স্যাংক' ও 'থ্যাংকড' উভয়ই আপন ক্রিয়ার অতীতকালের রূপ। 'থ্যাংকড'কে দু-খণ্ডে ভাঙা সম্ভব, কিন্তু 'স্যাংক'কে ভাঙা অসম্ভব। যদিও 'সিংক : স্যাংক'-এর সম্পর্ক 'থ্যাংক : থ্যাংকড'-এর সম্পর্কের সমান্তরাল, তবুও যেভাবে 'থ্যাংকড' গঠিত সেভাবে গঠিত নয় 'স্যাংক'। 'সিংক'-এর অতীতকালের রূপে এর সাথে নতুন রূপমূল যুক্ত না হয়ে ঘটেছে এর আন্তরবিকলন। এ-সমস্যাকে নানাজন নানাভাবে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু সন্তোষজনক বিজয় আসে নি। 'বস্তু ও বিন্যাস' প্রক্রিয়ার এ-ব্যর্থতায় তাই খুঁজতে হয় নতুন উপায়।

'বস্তু ও প্রক্রিয়া' প্রণালিতে শব্দের উপাদানপুঞ্জকে খণ্ডবিখণ্ড করা হয় না, বরং শব্দটিকে বিবেচনা করা হয় এক বিশেষ প্রক্রিয়ার ফল ব'লে। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্যে একটি কৃত্রিম উদাহরণ নিচ্ছি। বাঙলায় 'কর' ক্রিয়ামূলের বর্তমান কাল-সরল ক্রিয়ারীতি-প্রথম পুরুষের রূপ 'করি'; এবং তার অতীতকালের রূপ 'করলাম'। মনে করা যাক 'কর'-এর আরো একটি

অতীতকালের রূপ রয়েছে : '*কোর'। 'করলাম'কে যেমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করা যায় ('কর' + 'লাম' ('লাম'কে আরো ভাঙা সম্ভব)), 'কোর'কে তেমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করা অসম্ভব। '*কোর-এ 'কর'-এর অন্তর্গত [অ] ধ্বনিটি পরিণত হয়েছে [ও] ধ্বনিতে। 'বস্তু ও বিন্যাস' প্রক্রিয়ায় এ-ব্যাপারটি দেখানো কঠিন। 'বস্তু ও বিন্যাস' রীতিতে স্পষ্টভাবে রূপমূল ও তাদের বিন্যাসক্রম দেখাতে হয় ব'লে 'কর'-এর অন্তর্গত [অ], এবং '*কোর'-এর অন্তর্গত [ও]-কে গ্রহণ করতে হবে রূপমূল রূপে। এ-বর্ণনা ভাষাবোধবিরোধী। 'বস্তু ও প্রক্রিয়া' রীতি প্রত্যেকটি রূপমূল ও তার বিন্যাসক্রমে দেখায় না, বরং বর্ণনা করে শব্দটির সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। এ-প্রক্রিয়ায় শুধু লক্ষ্য করা হবে যে 'কর' ক্রিয়ামূলের প্রথম পুরুষ-বর্তমান কাল-সরল ক্রিয়ারীতির রূপ 'করি', এবং অতীতকালের রূপ 'করলাম' ও '*কোর'। 'কর' এর সাথে যে-সম্পর্ক বিদ্যমান 'করলাম'-এর, ঠিক একই সম্পর্ক বিরাজমান 'কর'-এর সাথে '*কোর'-এর। তাই 'বস্তু ও প্রক্রিয়া' রীতি দেখবে শুধু '*কোর'-এর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। এমন একটি সূত্র দরকার হবে : 'কর' + 'প্রথম পুরুষ-বর্তমান কাল-সরল ক্রিয়ারীতি' → '*কোর'। কিন্তু এ-প্রক্রিয়ায় বাস্তব শব্দ—অর্থাৎ শব্দের ধ্বনিরূপ—সৃষ্টি করতে হ'লে তিন রকম, ক্রমিক, সূত্র দরকার হবে :

[ক] ভাষার বিপুল পরিমাণ রূপমূলের মৌল বা আন্তর ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ প্রথমেই স্থির ক'রে নিতে হবে; এবং ওই মৌল রূপসমূহ বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় গঠন করবে নতুন শব্দ। বিষয়টি বর্ণনার জন্যে উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক। বাঙলায় তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ এক বচন সর্বনামের রূপ হচ্ছে 'সে', এবং বহুবচনে রূপ হচ্ছে 'তারা'। বচনগত পার্থক্য ছাড়া এদের আর কোনো আর্থপার্থক্য নেই। কিন্তু এদের রৌপ পার্থক্য অসীম। তবে কি স্বীকার ক'রে নিতে হবে যে অর্থ ছাড়া এদের আর কোনো সম্পর্ক নেই, রূপে এরা সম্পর্কশূন্য? স্বীকার করা যেতো, তবে স্বীকার করলে বর্ণনা দুর্বল হবে। 'তারা'র 'রা' যে বহুবচন নির্দেশক, তা সহজেই বোঝা যায়। অমিল শুধু 'সে, ও 'তা'র মধ্যে। 'সে' ও 'তারা'র মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা যেতে পারে এ-সূত্রটির সাহায্যে : 'সে' + 'বহুবচন' → 'তা' + 'রা' = 'তারা'। সূত্রটি নির্দেশ করছে যে 'সে'র সাথে বহুবচন চিহ্ন 'রা' যুক্ত হ'লে 'সে' পরিণত হয় 'তা'তে। ফলে '*সেরা' গঠিত না হয়ে গঠিত হয় 'তারা'। এখানে 'সে'কে ধরা হয়েছে তৃতীয় পুরুষ-সাধারণ এক বচন সর্বনামের মৌল ধ্বনিরূপ ব'লে, এবং 'তা' হচ্ছে বিশেষ অবস্থায় তার বাস্তব উৎসারণ।

[খ] এ-প্রক্রিয়ায় কিছু রূপমূল— যেমন : ওপরের উদাহরণের 'বহুবচন'—এমন শক্তিশালী হবে যে তারা বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের প্রতিবেশী রূপদের নানাভাবে রূপান্তরিত ক'রে নিতে পারবে।

[গ] এ-প্রণালিতে দরকার হবে একগুচ্ছ রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র, যারা গঠিত শব্দের বাস্তব রূপ নির্দেশ করবে।

'বস্তু ও প্রক্রিয়া' প্রণালি অভিনব নয়, প্রাচীন ভারতীয় রূপতাত্ত্বিকেরা এ-প্রণালির ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমানে এর ব্যাপক ব্যবহার করছেন রূপান্তরবাদীরা। এ-প্রণালি 'বস্তু ও বিন্যাস' প্রণালির চেয়ে উন্নত : যে-সমস্ত শব্দে রূপসমূহ খণ্ডনসম্ভব 'বস্তু ও বিন্যাস' প্রণালি বর্ণনা করতে পারে শুধু সে-সব শব্দের গঠনপ্রক্রিয়া, কিন্তু 'বস্তু ও প্রক্রিয়া' প্রণালি খণ্ডনসম্ভব ও অসম্ভব উভয় শ্রেণীর শব্দের গঠনপ্রণালিই বর্ণনা করতে পারে।

৮.২.৪ সাংগঠনিক অর্থতত্ত্ব : আচরণবাদ

ভাষাবর্ণনায় সাংগঠনিকদের উপাস্য ছিলো আধার, উপহাস্য ছিলো আধেয় : অর্থকে ভাষা থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করলে পারলে তাঁরা সুখী হতেন। অর্থ যেহেতু অদৃশ্য, ও পর্যবেক্ষণঅসম্ভব 'বস্তু', তাই সাংগঠনিকেরা অর্থকে বর্ণনাযোগ্য বিবেচনা করেন নি। ভাষার্থকে ভৃত্যের মতো তাঁরা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শাস্ত্রে স্থান দেন নি। সাংগঠনিকেরা পদেপদে অর্থনির্ভর;— 'ধ্বনিমূল', 'রূপমূল' প্রভৃতি নির্ণয়ে তাঁরা অর্থের সেবা নিয়েছেন, কিন্তু বারবার রটিয়েছেন যে অর্থ বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার বিষয় হতে পারে না। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান যে-মনস্তত্ত্ব দ্বারা চালিত, তার নাম *আচরণবাদ*। আচরণবাদ ভাষাবিজ্ঞানে নিয়ে আসেন মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের একনায়ক লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড। তিনি ভাষাবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ও স্বায়ত্তশাসিত শাস্ত্রে পরিণত করার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। *ল্যাংগুয়েজ* (১৯৩৩) নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি যখন তিনি সংশোধন করছিলেন, তখন তিনি আকৃষ্ট হন জে.বি. ওয়াটসন-ঘোষিত আচরণবাদের প্রতি। *ল্যাংগুয়েজ*-এর আদিলেখনের সময় ব্লুমফিল্ড ছিলেন চৈতন্যবাদী; সংশোধনের সময় তিনি পরিণত হন আচরণবাদীতে। তিনি, যে-কোনো ধর্মান্তরিতের মতো, পূর্ব মতকে আক্রমণ করেন তীব্রভাবে, এবং অন্ধের মতো প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন নতুন ধর্ম। আচরণবাদের সারকথা হচ্ছে : মানবাচরণের সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'উদ্দীপক', ও 'সাড়া'র সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ভাষা এক রকম মানবাচরণ, তাই ব্লুমফিল্ড আচরণবাদীতত্ত্ব ব্যবহার করেন ভাষাবর্ণনার সময়। কিন্তু ধ্বনিমূল, রূপমূল প্রভৃতি বস্তু মনস্তত্ত্বের জন্যে ভালো জমি নয়, তাই এসব রক্ষা পায় আচরণবাদের আক্রমণ থেকে। ভাষার্থ মনস্তত্ত্বের জন্যে এক চমৎকার এলাকা। তাই আর্থ-এলাকাতেই ব্লুমফিল্ড সজোরে প্রয়োগ করেন তাঁর আচরণবাদ।

আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের স্থপতি ওয়াটসন, এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চৈতন্যবাদী উইলিয়াম ম্যাকডগাল। ওয়াটসন বিশেষ বস্তু, বা পরিস্থিতির মুখোমুখি একজন মানুষ কী রকম আচরণ করবে, তা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি যে-কারো আচরণ দেখেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে চেয়েছিলেন কী বস্তু, বা পরিস্থিতি ওই আচরণের মূলে। তিনি চৈতন্যবাদী মনস্তত্ত্বকে, যেহেতু তা 'আত্মা', 'মন', 'ঈশ্বর' প্রভৃতি অবৈজ্ঞানিক বিষয়নির্ভর, বিবেচনা করতেন

অবৈজ্ঞানিক ব'লে। 'আত্মা', 'মন', 'ঈশ্বর' প্রভৃতি বস্তু কেউ দেখে নি, ছোঁয় নি, টেস্টটিউবে নিরীক্ষা করে নি, তাই এ-সব ধারণা অবৈজ্ঞানিক। ভিলহেলম ভুন্ড্ট্ ১৮৬৯-এ একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন 'চৈতন্য', বা 'চেতনা' নিরীক্ষা করার জন্যে। একেও অবৈজ্ঞানিক ব'লে ঘোষণা করেন ওয়াটসন; কেননা 'চেতনা-চৈতন্য' অবৈজ্ঞানিক 'আত্মা'রই ছদ্মঅভিধামাত্র। ওয়াটসন তাকেই বিজ্ঞানসম্মত ভাবতেন, যা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পর্যবেক্ষণসম্ভব, এবং নিরীক্ষণসম্ভব। এক-একটি 'প্রাণী' কী করছে, বা বলছে, তা যেহেতু আচরণ, এবং পর্যবেক্ষণসম্ভব, তাই তাকে ওয়াটসন গবেষণার বিষয় করেছিলেন। তিনি দুটি—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমান্তরাল—তত্ত্ব স্থির করেন, এবং তাদের নাম দেন—'উদ্দীপক', ও 'সাড়া'। 'উদ্দীপক' হচ্ছে 'বিচার্য প্রাণীর সাধারণ প্রতিবেশের যে-কোনো বস্তু, বা প্রাণীর শরীরবৃত্তের যে-কোনো পরিবর্তন'। উদ্দীপক প্রাণীকে কোনো-না-কোনো রকম আচরণ করতে বাধ্য করে। 'সাড়া' হচ্ছে উদ্দীপ্ত প্রাণীর কোনো বাস্তব ক্রিয়া—যেমন : গৃহনির্মাণ, শিল্পসৃষ্টি, আবিষ্কার, বা অন্য কোনো কর্ম। সাড়া উদ্দীপকের ফল। এ-প্রণালিতে অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীর আচরণ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব— প্রাণীটির ওপর প্রতিবেশের উদ্দীপক, ও প্রাণীটির সাড়ার সাহায্যে। আচরণবাদীরা মনে করেন যে প্রাণীটির সাড়া দেয়ার প্রণালির সবকিছু পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের পরিচিত সূত্ররাজির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মানবাচরণের পর্যবেক্ষণসম্ভব একটি রূপ হচ্ছে : 'ভাষাব্যবহার', বা 'উক্তি'। আচরণবাদীদের কাছে চিন্তা হচ্ছে অশ্রুত উক্তি। চিন্তাও একরকম আচরণ। ওয়াটসনের মতে : 'চিন্তা আলাপমাত্র, তবে তা সংগুপ্ত পেশির আলাপ'। ১৯৩০-এর দিকে তুমুল আবেদন জাগিয়েছিলো আচরণবাদী মনস্তত্ত্ব, এবং তার দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন ব্লুমফিল্ড। ওয়াটসন, ও অন্যান্য আচরণবাদী, তাঁদের বিষয়কে যতো পর্যবেক্ষণসম্ভব ভাবতেন, তা আসলে ততো পর্যবেক্ষণসম্ভব নয়। চেতনচৈতন্য যেমন প্রমাণসম্ভব বিষয়, তেমনি প্রমাণসম্ভব উদ্দীপক ও সাড়া। ব্লুমফিল্ড তাঁর *ল্যাংগুয়েজ* (১৯৩৩) গ্রন্থটির সংশোধন ও বর্তমান রূপ দেয়ার সময় ভাষাবর্ণনার কাঠামোরূপে গ্রহণ করেন আচরণবাদ। যদিও তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন (দ্র ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ২৭)) যে 'বিশেষ বিশেষ ধ্বনিপুঞ্জের সাথে বিশেষ বিশেষ অর্থপুঞ্জের সম্পর্কায়ন'ই ভাষাবিজ্ঞানের কাজ, তবুও তিনি অর্থকে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনাযোগ্য নয় ব'লে, ভাষাবিজ্ঞান থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। ভাষার ভূমিকা আচরণবাদী কাঠামোর ব্যাখ্যার জন্যে তিনি একটি গল্প রচেছিলেন, যা কয়েক দশকে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। তাঁর গল্প ও গল্পের আচরণবাদী ভাষ্যকে আপাতদৃষ্টিতে ঝকঝকে বিজ্ঞানসম্মত ব'লে মনে হয়, কিন্তু একটু গভীরে গেলেই ধরা পড়ে অন্তঃসারশূন্যতা। ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩, ২২) গল্পটি নিম্নরূপ : 'জ্যাক ও জিল গলিপথে হাঁটছিলো। জিল ছিলো ক্ষুধার্ত। হঠাৎ জিল একটি গাছে আন্দোলিত আপেল দেখতে পায়। সে তার স্বরতন্ত্রি-জিহ্বা-ওষ্ঠের সাহায্যে ধ্বনি সৃষ্টি করে। জ্যাক বেড়া ডিঙিয়ে গাছে চড়ে, আপেল পাড়ে, জিলের কাছে

আনে এবং আপেলটি জিলের হাতে দেয়। জিল আপেলটি খায়।' গল্পের ঘটনারাশি ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ২৩) বিন্যস্ত করেন নিচের তিন শ্রেণীতে :

(৫) [ক] উক্তি-পূর্ব বাস্তব ঘটনা(রাশি)

(খ) উক্তি

(গ) উক্তি-উত্তর বাস্তব ঘটনা(রাশি)

(৫ক)র অন্তর্গত ঘটনারাশিকে ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ২৩) নিম্নরূপ আচরণবাদী ভাষায় বর্ণনা করেছেন : সে (জিল) ক্ষুধার্ত ছিলো, অর্থাৎ তার কিছু পেশি সংকুচিত হচ্ছিলো এবং নিঃসৃত হচ্ছিলো, বিশেষভাবে পাকস্থলিতে, কিছু পরিমাণ তরলপদার্থ। সম্ভবত সে তৃষ্ণার্তও ছিলো, তার জিভ ও কণ্ঠ ছিলো শুষ্ক। লাল আপেল থেকে প্রতিসরিত আলো প্রবেশ করলো তার চোখে। তখন জিলের পাশে ছিলো জ্যাক। জ্যাকের সাথে তার সমগ্র অতীত সম্পর্ক চমৎকার। জিলের ক্ষুধা ও জ্যাকের সাথে তার ভালো সম্পর্ককে ব্লুমফিল্ড বলেছেন 'বক্তার উদ্দীপক'। (৫ক) নির্দেশ করছে বক্তার উদ্দীপক। (৫গ) নির্দেশ করছে বক্তার কথা শোনার পর শ্রোতার বাস্তব কাজ— একে ব্লুমফিল্ড বলেছেন 'শ্রোতার সাড়া'। জিল যদি একা হতো, তাহলে সে নিজেই আপেল পাড়তো, এবং পাড়তে না পারলে অভুক্ত থাকতো। জ্যাকের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হতো যদি, তবে সে জ্যাককে আপেল পাড়তে বলতো না। যে-সমস্ত বিষয়-বস্তু-প্রতিবেশ-ঘটনা জিলকে উদ্দীপ্ত করেছে আপেল পাড়ার জন্যে জ্যাককে অনুরোধ করতে, তা হচ্ছে 'উদ্দীপক' (উ)। আপেল পাড়ার জন্যে যে-সমস্ত কাজ, বা ঘটনা জিল নিজে সমাধা করতে পারতো, তা হচ্ছে 'স্বাভাবিক সাড়া' (সা)। স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক সাড়ার মধ্যে সম্পর্ক তীরচিহ্নের সাহায্যে নিম্নরূপে দেখানো যায় :

(৬) উ ··· ⟶ সা

কিন্তু জ্যাক উপস্থিত থাকায় জিল আপন শ্রমের বিকল্পে ব্যবহার করেছে উক্তি : এখানে উক্তি জিলের স্বাভাবিক সাড়ার স্থানে 'বিকল্প সাড়া' রূপে দেখা দিয়েছে। বিকল্প সাড়ার প্রতীকরূপে ব্যবহার করতে পারি (র্সা) প্রতীকটি। জ্যাক জিলের কথা শুনেই আপেল পেড়েছে, নিজে উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে নি; তাই জিলের উক্তিই জ্যাকের কাছে এসেছে 'বিকল্প উদ্দীপক' রূপে। বিকল্প উদ্দীপকের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারি (র্উ) প্রতীকটি। (৫ক-গ)র সমগ্র ব্যাপারটিকে প্রকাশ করা সম্ভব (৭)-এর স্কিমায়।

(৭) উ ⟶ র্সা ···⟶ র্উ ⟶ সা

(৬) ও (৭)-এর উদ্দীপক এবং সাড়ার প্রতীক পৃথক। উক্তিহীন উদ্দীপক ও সাড়া একই ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ (যেমন : (৬));—এ-ক্ষেত্রে যে উদ্দীপত হয়, সে-ই সাড়া দেয়। কিন্তু একজন স্বাভাবিকভাবে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি উক্তির সাহায্যে অনুদ্দীপ্ত অন্যকে উদ্দীপ্ত করতে পারে

(যেমন (৭)), এবং ফলত সেও সাড়া দিতে পারে। বক্তা যে-কাজ করতে পারে না শ্রোতা হয়তো তা করতে পারে। (৭)-এ অভগ্ন তীর (→) নির্দেশ করছে একই ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ ঘটনা (রাশি); এবং ভাঙা তীর (··· - →) নির্দেশ করছে উক্তি : বাতাসে ভাসমান ধ্বনিতরঙ্গ। কোনো উদ্দীপ্ত ব্যক্তি নিজেই সাড়া দিতে পারলে উক্তির দরকার পড়ে না; কিন্তু নিজে যদি সাড়া দিতে না পারে, অর্থাৎ বাস্তব কাজ করতে না পারে, তবে সে অন্যকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে ব্যবহার করে ভাষা বা উক্তি। তাই ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ২৬) সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, এবং (৭) জ্ঞাপন করে যে 'বক্তা ও শ্রোতার শরীরের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে— দুটি শরীরবৃত্তের বিচ্ছিন্নতাকে— সংযুক্ত করে ধ্বনিতরঙ্গরাশি।' ভাষা ব্যবহার বা উক্তি হচ্ছে মানবাচরণের এক বিশেষ দিক, আর ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩, ১৫৫) মতে কোনো মানবসমাজে ব্যবহৃত সমস্ত উক্তির সমষ্টি ওই সমাজের ভাষা। (৭)-এর স্কিমটি লক্ষণীয় : এটি গঠিত তিনটি উপাদানে : 'উ', 'সা', এবং 'র্সা'... 'র্উ'। 'উ' এবং 'সা' পরস্পরঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, আর 'উ+সা' অর্থাৎ উদ্দীপক ও সাড়ার সমবায়ই হচ্ছে কোনো উক্তির আধেয়-অংশ, বা অর্থ-অংশ। 'র্সা... র্উ' হচ্ছে পর্যবেক্ষণসম্ভব ধ্বনিতরঙ্গসমষ্টি, যা গ'ড়ে তোলে কোনো উক্তির আধার-অংশ, বা বহিরঙ্গ। ব্লুমফিল্ড লক্ষ্য করেছেন যে উক্তি, বা ধ্বনিতরঙ্গরাশি স্বকীয় মূল্যহীন, কিন্তু তা অর্থবহ হয়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্থ বলতে ভুল বুঝেছিলেন ব্লুমফিল্ড। কোনো উক্তির অর্থ বলতে তিনি বুঝেছেন ওই উক্তির সাথে জড়িত বাস্তব কর্মকাণ্ডকে। এখানেই ঘটেছে তাঁর স্খলন।

ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য সম্পর্কে ব্লুমফিল্ডের বোধ বেশ গভীর ও ব্যাপক ছিলো। তিনি (১৯৩৩, ২৭) বলেছেন : 'মানব-উক্তির বিভিন্ন ধ্বনিগুচ্ছ বিভিন্ন অর্থবহ। বিশেষ ধ্বনিগুচ্ছের সাথে বিশেষ অর্থগুচ্ছের সম্পর্কায়নই হচ্ছে ভাষাবিদ্যা।' তাঁর মতে ধ্বনিসৃষ্টির প্রক্রিয়া বেশ বোধগম্য ব্যাপার, কিন্তু অর্থসংগঠন তেমন বোধগম্য নয়। দুটি তত্ত্বের সাহায্যে অর্থ ব্যাখার চেষ্টা করা হয়— এর একটি 'চৈতন্যবাদ' এবং অন্যটি, ব্লুমফিল্ডের গৃহীত, 'আচরণবাদ' বা 'যান্ত্রিকতাবাদ'। চৈতন্যবাদ অনুসারে মানবাচরণ বৈচিত্র্যের মূলে আছে চৈতন্য, বা ঈপ্সা, বা মনের প্রভাব। এ-তত্ত্বানুসারে মানবমন জাগতিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দ্বারা চালিত নয়। তাই জ্যাক ও জিলের গল্পে জিল কী করবে বা বলবে, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল তার চৈতন্য বা মনের ওপর। তার মন যেহেতু বাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, তাই তার কর্ম, বা উক্তি সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যান্ত্রিকতাবাদ অনুসারে মানবাচরণের সমস্ত বৈচিত্র্যের মূলে আছে মানুষের জটিল শরীরবৃত্ত। মানব শরীরবৃত্তকে, এ-মতানুসারে, ঠিকভাবে পাঠ করতে পারলে মানুষের সমস্ত আচরণ ও উক্তি সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। ব্লুমফিল্ড যান্ত্রিকতাবাদ-অনুসারী। ভাষার্থ বিষয়ে ব্লুমফিল্ড পদস্খলিত হয়েছিলেন দু-কারণে। প্রথমত, তিনি কোনো উক্তির অর্থ বলতে বুঝেছিলেন উক্তির সাথে বিজড়িত সমস্ত কর্মকাণ্ডকে ও বক্তাশ্রোতার জীবনের সমগ্র পূর্বইতিহাসকে। দ্বিতীয়ত, তিনি ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দের

বৈজ্ঞানিক বর্ণনা কামনা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর সময়ে ভাবার্থ বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়, কেননা বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আরো বহুগুণে না বাড়া পর্যন্ত অর্থবিশ্লেষণ অসম্ভব। শব্দের যথার্থ অর্থ নির্দেশের জন্য তিনি কামনা করেছেন বিশ্বের সমস্ত বস্তু ও ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক বিবরণ। ভাষা, তাঁর কাছে, 'বিকল্প সাড়া' মাত্র, তাই যে-সমস্ত জিনিশ মানুষকে সাড়া দেবার জন্যে উদ্দীপ্ত করে, অর্থবিশ্লেষণের আগে সে-সমস্ত জিনিশের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্ণীত হওয়া দরকার। বিশ্বের যে-কোনো কিছুই উদ্দীপ্ত করতে পারে মানুষকে এবং প্ররোচিত করতে পারে ভাষাব্যবহারে। তাই ভাষার অর্থবিশ্লেষণের আগে দরকার, তাঁর মতে, প্রতিটি উদ্দীপক বস্তু-ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। অর্থ সম্পর্কে এ-ধারণা ভ্রান্ত। অর্থ সম্পর্কে তিনি ছড়িয়েছিলেন বিপুল হতাশা, যা তাঁর শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেছে ভাষাবর্ণনার সময় অর্থ বর্জন করতে। শব্দের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বলতে ব্লুমফিল্ড বুঝেছিলেন বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দকে। তিনি দেখেছিলেন যে গাছপালা, প্রাণী, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ সম্পর্কে বিজ্ঞান সরবরাহ করে বেশ চমৎকার বর্ণনা ও পারিভাষিক শব্দ (যেমন : লবণ—'এনএসিএল')। শব্দের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বলতে তিনি 'এনএসিএল' জাতীয় ফর্মুলাকে বুঝিয়েছেন। তাঁর এমন ধারণা আমাদের জানায় যে মনীষীরাও অনেক সময় সরলমতি শিশু হয়ে উঠতে পারেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রে 'এনএসিএল' জাতীয় বর্ণনা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ব্লুমফিল্ড দেখেছিলেন যে বিশ্বের অধিকাংশ বস্তু ও ক্রিয়ারই এমন বর্ণনা নেই; অর্থাৎ ওই বস্তু-ও-ঘটনারাশি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণিত হয় নি। আমরা জানি, 'প্রেম', 'ঘৃণা', 'স্মৃতি', 'বিষাদ', 'নীলিমা' ইত্যাদি অসংখ্য বোধের কোনো পারিভাষিক শব্দ নেই। নেই ব'লে হতাশ হয়েছিলেন ব্লুমফিল্ড। কিন্তু তিনি বোঝেন নি যে 'এনএসিএল' 'লবণ' শব্দের অর্থ নয়— গবেষণাগারের বাইরে কেউ 'লবণ' বলতে ওই ফর্মুলাটিকে বোঝে না। যদি গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষার পর 'প্রেম'-এর পারিভাষিক অভিধা দেয়া হয় 'প$_১$ম$_২$', তবে ওটি 'প্রেম' শব্দের অর্থ হয়ে উঠবে না। ব্লুমফিল্ডের আচরণবাদ ও 'বিজ্ঞানমনস্কতা' ভাষাবিজ্ঞান থেকে অর্থতত্ত্বকে নির্বাসিত করে রেখেছে বহু দিন। তাই অর্থরিক্ত আধারের বর্ণনার সময় কেটেছে ব্লুমফিল্ডের ও ব্লুমফিল্ডীয়দের।

ব্লুমফিল্ডের অর্থ-ধারণার সারকথা : অর্থ নির্ধারিত হয় ভাষাবহির্ভূত ব্যাপার দ্বারা; সুতরাং সমগ্র মহাজগতকে অনুপুঙ্খভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্ণনার আগে অর্থতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানের বিষয় করা অসম্ভব। একনায়কের এমন ভয়াবহ সিদ্ধান্তকে অনুসারীরা ভয়াবহতর ক'রে তুলতে পারে মাত্র। সমগ্র মহাজগত সম্ভবত কোনোদিনই ব্লুমফিল্ডীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে বর্ণিত হবে না, সুতরাং অর্থতত্ত্ব থাকবে ভাষাবিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত। তাঁর বাণী শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছিলেন ব্লুমফিল্ডীয়রা; তাই তাঁদের রচনায় দেখা যায় অর্থবর্জনের বিপুল প্রচেষ্টা। হ্যারিস (১৯৫১, ১৯৫৭), যাঁকে বিবেচনা করা যায় সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক ভাষাবিজ্ঞানের সন্ধিস্থল ব'লে, প্রাথমিক উপাত্তের ওপর যান্ত্রিকভাবে প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন উপাত্তের ব্যাকরণ। বিভিন্ন ভাষাবস্তু আবিষ্কারের জন্যে অর্থকে তিনি ভৃত্যের মতো

ব্যবহার করেছেন মাত্র। অর্থবহিষ্কারেচ্ছা চরমভাবে দেখা যায় ব্লক-এ (১৯৪৮)। সাংগঠনিকদের সহায়ক তথ্যদাতাও বর্জন করেন তিনি, এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে ভাষাবর্ণনার জন্যে যথাযথভাবে ধৃত বা রেকর্ড করা উক্তিপুঞ্জের বেশি আর কিছু দরকারী নয়। ব্লুমফিল্ডের *ল্যাংগুয়েজ* (১৯৩৩) প্রকাশের দু-দশক পরেও তাঁরই ভাষাবিজ্ঞানবোধ পুনরাবৃত্ত হয়েছে উত্তর-ব্লুমফিল্ডীয় এক ভাষাবিজ্ঞানীর রচনায় (দ্র ক্যারল (১৯৫৩, ১২)) : 'আধেয়র সাথে কেবল পরোক্ষ সম্পর্ক ছাড়া অন্য সব সম্পর্ক অস্বীকার ক'রে ভাষাবিজ্ঞানী সীমাবদ্ধ করেন তাঁর অনুসন্ধানক্ষেত্র। ভাষার সাহায্যে কী সঞ্চার করা হলো, তাতে কোনো উৎসাহ নেই ভাষাবিজ্ঞানীর, তাঁর প্রধান আগ্রহ ভাবসঞ্চারবাহনের প্রতি; অর্থাৎ ভাষাবৃত্তের প্রতি। যদি তিনি ব্যাপৃত হন আধেয় নিয়ে, তবে তিনি জড়িত হয়ে পড়বেন সমগ্র মানবজ্ঞানে।' কিন্তু এ-ভীতি সত্য নয়, অর্থ ব্যাখ্যার জন্যে সমগ্র মানবজ্ঞানে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। যে-কোনো ভাষার যে-কোনো ভাষী জানেন তিনি কী বলছেন, যদিও তিনি বিশ্বের জ্ঞাতব্য বিষয়রাশি সম্পর্কে হ'তে পারেন অজ্ঞ। কেউ সর্বজ্ঞ নন, পৃথিবীর কোন প্রান্তে কী ঘটেছে-ঘটছে-ঘটবে, সৌরলোকের কোথায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে, রাস্তার ক্ষুধার্ত শিশুটির পাকস্থলিতে জারকরসের উগ্রতা কেমন, এমনকি নিজের শরীরের কোন অংশে করাল কর্কট বাসা বাঁধছে ইত্যাদি না জেনেও আমরা চমৎকার ভাষাব্যবহার করি—কী বলছি, তা বুঝি; এবং আমাদের বিশ্বজ্ঞানহীন শ্রোতাও তা বোঝে। ব্যাপারটি যখন এমন, তখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে অর্থতত্ত্ব বিশ্লেষণের কোনো অসুবিধে নেই। অর্থবর্ণনায় কোনো বিজ্ঞানসম্মত বাধা নেই, তাই অর্থতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানসের অঙ্গ করা উচিত। অর্থতত্ত্বকে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত বিষয়রূপে বর্ণনা করা উচিত। রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ অর্থতত্ত্বকে পুনর্বাসিত ক'রে ভাষাবিজ্ঞান-এলাকায়, এবং চোমস্কি-উত্তর রূপান্তর ব্যাকরণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে ভাষাতত্ত্বে অর্থের ভূমিকা : ধ্বনি-রূপ-বাক্য নয়, অর্থই ভাষার আত্মা।

৮.২.৫ প্রথাগত, সাংগঠনিক, ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ

প্রাচীন গ্রিক-লাতিন-সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইউরোপীয় মধ্যযুগের দার্শনিক ব্যাকরণ এবং অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি আনুশাসনিক ব্যাকরণের ভাষিক তত্ত্ব ও প্রণালি অবলম্বনে রচিত ব্যাকরণ আমি নির্দেশ করেছি *প্রথাগত ব্যাকরণ* অভিধায়। *সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান* বলতে, প্রধানত, বোঝানো হয়েছে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত কালের মার্কিন ভাষাবর্ণনারীতিকে। চোমস্কি কর্তৃক উদ্ভাবিত, এবং তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সম্প্রসারিত, ১৯৫৭-উত্তর ভাষিক তত্ত্ব ও প্রণালিকে নির্দেশ করা হয়েছে *রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ* নামে। এ-ভাষাবর্ণনারীতিগুলোর মধ্যে ব্যাপক সাদৃশ্য ও ব্যাপকতর বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান জন্মেছে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রতিক্রিয়ায়, এবং রূপান্তর ব্যাকরণ উদ্ভূত হয়েছে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রেরণার ও সাংগঠনিক প্রণালির প্রতিক্রিয়ায়। সাংগঠনিকেরা প্রথাগত ব্যাকরণকে বর্জন করেছিলেন : তাঁদের দৃষ্টিতে প্রথাগত ব্যাকরণ বিশৃঙ্খল ও অবৈজ্ঞানিক। রূপান্তরমূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

প্রথাগত ব্যাকরণের চেয়েও দুর্বল সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান, কেননা তা ভাষার সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাস না ক'রে ভাষার খণ্ডাংশের বহিরাঙ্গের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। রূপান্তরবাদীরা সাংগঠনিক প্রণালি পরিত্যাগ করেছেন : তাঁদের বোধে সাংগঠনিক ব্যাকরণ ছদ্মবৈজ্ঞানিক;—তা বিজ্ঞানের বহিরঙ্গের অনুকরণ করেছে মাত্র (দ্র § ৪.১)। রূপান্তর ব্যাকরণ পুনরায় যোগসূত্র রচনা করেছে প্রথাগত ব্যাকরণের সাথে। রূপান্তরবাদীদের মতে, প্রথাগত ব্যাকরণ যদিও অসংখ্য ত্রুটিতে আচ্ছন্ন, তবু তা সাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে উৎকৃষ্ট। রূপান্তরবাদীদের অজস্র আক্রমণে বর্তমানে সাংগঠনিকেরা বিগতমহিমা। প্রথমে আমি প্রথাগত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ব্যাকরণের সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্যরাশির প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই :

[ক] প্রথাগত ব্যাকরণের ভাষাবিশ্লেষণদৃষ্টি মন্ময় বা আত্মনিষ্ঠ, আর সাংগঠনিক ব্যাকরণের দৃষ্টি তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ। বিভিন্ন ভাষাবস্তু নির্ণয়ে ও শ্রেণীকরণে এবং ভাষার সূত্ররচনায় প্রথাগত ব্যাকরণ অর্থের ওপর নির্ভরশীল। অর্থই প্রথাগত ব্যাকরণের প্রধান মানদণ্ড। বিভিন্ন ভাষাবস্তু নির্ণয়ে ও শ্রেণীকরণে এবং ভাষার সূত্ররচনায় সাংগঠনিক ব্যাকরণ নির্ভরশীল উপাত্তের সাংগঠনিক বর্ণনার ওপর। সাংগঠনিক ব্যাকরণে অর্থ বর্জন ক'রে বিভিন্ন ভাষাবস্তুর বন্টন অনুসারে বর্ণনা করা হয় উপাত্তের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। প্রথাগত ব্যাকরণবিদ ব্যক্তিক, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী নৈর্ব্যক্তিক।

[খ] ভাষার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয় প্রথাগত ব্যাকরণে, এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারবিধিও নির্দেশ করা হয় তাতে। কিন্তু সাংগঠনিক ব্যাকরণে দেয়া হয় ভাষা-উপাত্তের নিরাসক্ত বর্ণনা;—এক একটা বিশেষ সূত্র ভাষায় কেনো আছে; তার কারণ উদঘাটনে সাংগঠনিক ব্যাকরণের কোনো আগ্রহ নেই। সাংগঠনিক ব্যাকরণ বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে না।

[গ] প্রথাগত ব্যাকরণে ভাষার বিভিন্ন 'স্তর'-এর বর্ণনার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়। বিভিন্ন পদশ্রেণীকরণে মানদণ্ডের অদলবদল প্রথাগত ব্যাকরণে সব সময় দেখা যায়। সাংগঠনিক ব্যাকরণে ভাষাকে কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত স্তরে বিভক্ত ক'রে বর্ণনা করা হয়। এ-ব্যাকরণে সুস্পষ্ট পৃথকভাবে নির্দেশ করা হয় ধ্বনিতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব-বাক্যতত্ত্ব স্তর।

[ঘ] গ্রিক যুক্তিশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাশ্চাত্য প্রথাগত ব্যাকরণে 'বিবৃতিমূলক বাক্য'কে ধরা হয় 'মৌল বাক্য' রূপে এবং অন্যান্য বাক্যকে ধরা হয় বিবৃতিমূলক বাক্যের বিকার ব'লে; পদ বা 'বাক্যাংশ' নির্ণয়েও ব্যবহার করা হয় শুধু বিবৃতিমূলক বাক্য। সাংগঠনিক ব্যাকরণ সব রকম বাক্যকে সমান মূল্য দেয়, বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্য বর্ণনা করে, এবং বিভিন্ন বাক্যের উল্লেখযোগ্য রূপভেদ নির্দেশ করে। সাংগঠনিক ব্যাকরণে বর্ণনার সুবিধার জন্যে এবং ব্যবহার-আধিক্যবশত বিবৃতিমূলক বাক্যকে মৌল বাক্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

[ঙ] প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের অভিযোগ সাংগঠনিক ব্যাকরণ ভাষা ব্যাখ্যা করে না। সাংগঠনিকেরা যেনো মনে করেন যে বর্ণনাই ব্যাখ্যা। প্রথাবাদীদের মতে, সাংগঠনিকেরা অন্যান্য সংকেতপ্রণালির সাথে ভাষার সমীকরণ করেন, এবং এমন সমীকরণ ভাষাবিদ্যার বিমানবিকীকরণ মাত্র। সাংগঠনিকদের অভিযোগ, সুষ্ঠু বর্ণনায় ব্যর্থ হয়েই প্রথাগত ব্যাকরণে সাহায্য নেয়া হয় ব্যাখ্যায়। বর্ণনায় ব্যর্থ হয়ে প্রথাগতরা দিতে থাকেন সযত্নে বাছাই করা উদাহরণের ব্যাখ্যা এবং রচিত সূত্রের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে বানাতে থাকেন উদাহরণ, আর যে-সমস্ত শব্দ বা বাক্য তাঁদের নিয়ম মানে না, তাঁরা সেগুলোকে বলেন 'ব্যতিক্রম', 'বাগ্বিধি', 'অশুদ্ধ' ইত্যাদি। তাঁরা ভাষা সম্পর্কে পোষণ করেন পূর্বধারণা, ফলে বিভ্রান্তি জন্মে। তাঁদের রচনায় একাকার হয়ে যায় ধ্বনিক-রৌপ-বাক্যিক ক্যাটেগরি ও মানদণ্ড। তাঁরা বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য দেখে দেখে বিভিন্ন ভাষার স্বাতন্ত্র্য দেখতে পান না।

উভয় রীতির ব্যাকরণেই রয়েছে প্রচুর গুণদোষ : তবে আপাতদৃষ্টিতে প্রথাগত ব্যাকরণকে মনে হয় অবৈজ্ঞানিক এবং সাংগঠনিক ব্যাকরণকে বৈজ্ঞানিক। কিন্তু গভীরে ঢুকলে সাংগঠনিক ব্যাকরণকে মনে হয় ছদ্মবৈজ্ঞানিক এবং প্রথাগত ব্যাকরণকে মনে হয় বিজ্ঞানের সন্নিকট। প্রথাগত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ব্যাকরণের প্রধান পার্থক্যস্থল হিশেবে নির্দেশ করা যায় 'অর্থ'কে। সাংগঠনিক ব্যাকরণ ভাষা থেকে অর্থ বাদ দিয়ে বর্ণনা করতে চায় বিভিন্ন ভাষাবস্তুর বিন্যাস, অন্যদিকে প্রথাগত ব্যাকরণ পদে পদে অর্থনির্ভর। অবশ্য উভয় ব্যাকরণই ত্রুটিপূর্ণ : প্রথাগত ব্যাকরণ বিশৃঙ্খল, অস্পষ্ট, মন্ময়; এবং সাংগঠনিক ব্যাকরণ ভাষার বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ। তবে প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষার সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাসী, কিন্তু সাংগঠনিক ব্যাকরণ সৃষ্টিশীলতার প্রতি দৃষ্টিহীন। এটি এক মারাত্মক ত্রুটি। চোমস্কি (১৯৫৭, ১৯৬৪, ১৯৬৫) দেখিয়েছেন যে ভাষিক তত্ত্ব হিসেবে প্রথাগত ব্যাকরণ সাংগঠনিক ব্যাকরণের চেয়ে অনেক উন্নত।

চোমস্কি (১৯৫৭) যখন প্রথম রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি ইতিহাসের সাহায্য ও সমর্থন সন্ধান করেন নি। পরবর্তীকালে যখন তিনি (১৯৬৪, ১৯৬৫) পেছনে তাকান, তিনি আবিষ্কার করেন যে তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে মধ্যযুগ, অষ্টাদশ শতক, ও উনিশশতকী বেশ কিছু রচনার। তিনি যে-ব্যাকরণটির প্রতি বারবার নির্দেশ করেছেন সেটি হচ্ছে ফরাশিদেশের পোর রআইআল যাজক-পণ্ডিতদের রচনা *গ্রাম্যার জেনেরাল এ রেজোনে* (১৬৬০)। রূপান্তর ব্যাকরণে প্রতিটি বাক্যের জন্যে প্রস্তাব করা হয় দুটি পৃথক 'তল', 'বা 'সংগঠন' : 'গভীর তল (সংগঠন)' ও 'বহির্তল (সংগঠন)'। চোমস্কি (১৯৬৪, ১৫) দেখিয়েছেন যে বাক্যবর্ণনার জন্যে পোর রআইআল ব্যাকরণেও প্রস্তাব করা হয়েছে অনুরূপ গভীর তল, ও বহির্তল। পোর রআইআল ব্যাকরণে বিশ্লেষিত যে-বাক্যটি চোমস্কি (১৯৬৪, ১৫) বারবার উদ্ধৃত করেছেন, সেটির বাঙলারূপ দেয়া হলো (৮)-এ :

(৮) অদৃশ্য ঈশ্বর দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করেছে।

তাঁদের বিশ্লেষণ অনুসারে (৮) বাক্যের আন্তর আর্থসংগঠন (৯)-এর 'প্রস্তাব' বা 'বক্তব্য', বা 'বিবৃতি' [প্রোপজিশন] তিনটির সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব :

(৯) ক ঈশ্বর অদৃশ্য।

খ ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছে।

গ বিশ্ব দৃশ্যমান।

এর মধ্যে (৯খ) হচ্ছে প্রধান প্রস্তাব, এবং (৯ক, গ) তার সহযোগী। (৮) বাক্যে সহযোগী প্রস্তাব দুটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নি। এদের সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় নিম্নরূপে :

(১০) ঈশ্বর, যে অদৃশ্য, সৃষ্টি করেছে বিশ্ব, যা দৃশ্যমান।

(১০) বাক্যটি বাঙলায় যদিও কিছুটা অপরিচ্ছন্ন, তবুও এর অর্থ (৮)-এর অর্থের সাথে অভিন্ন। যেহেতু (৮) ও (১০) একই অর্থ প্রকাশ করছে, তাই এদের বিবেচনা করা যায় একই আভ্যন্তর সংগঠনের দু-রকম প্রকাশ ব'লে। রূপান্তরবাদীদের মতে, (৮) ও অন্যান্য বাক্যের যে-বিশ্লেষণ দিয়েছেন পোর রআইআল ব্যাকরণবিদেরা, এবং অন্যান্য প্রথাগত ব্যাকরণে বিভিন্ন বাক্যের অনুরূপ যে-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তা মূলত ঠিক। তবে তাঁদের ত্রুটি হচ্ছে তাঁরা কোনো ভাষিক তত্ত্ব ভিত্তি ক'রে তাঁদের বর্ণনাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ (৮) বাক্যটি গঠন করার জন্যে যে-সমস্ত সূত্র দরকার, তা তাঁরা প্রণয়ন করেন নি; তাঁরা কেবল প্রকাশ করেছেন নিজেদের ও ভাষাভাষীদের বোধি। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণও অনেকাংশে রূপান্তরবাদী। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে যে-প্রক্রিয়ায় সমাস বর্ণনা করা হয়, তা মর্মমূলে রূপান্তরমূলক ও সৃষ্টিশীল; কিন্তু কোনো প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতাই একাধিক শব্দের সমবায়ে নতুন শব্দ সৃষ্টির যে-নিয়মকানুনশৃঙ্খলা রয়েছে, তা সুশৃঙ্খলভাবে উদঘাটন করেন নি। তাঁদের বর্ণনাব্যাখ্যায় চমৎকার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তার বিজ্ঞান ও বস্তু-সম্মত বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায় না। তাই সমাস অংশে আমরা পাই চমৎকার অস্বচ্ছ মন্ময় বোধির পরিচয়। তবে এর ত্রুটি ভাষাভাষীর বোধি এতে সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায় না।

প্রথাগত ব্যাকরণের লক্ষ্য ছিলো মহৎ। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা উদঘাটন করতে চেয়েছিলেন ভাষাভাষীর ভাষাবোধের আন্তর সূত্র, কিন্তু সে-সূত্র তাঁরা সুস্পষ্টভাবে প্রণয়ন করতে পারেন নি। প্রথাগতদের হয়তো এমন ধারণা ছিলো যে ভাষার নির্মম বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনায় ভাষাবিদ্যা বিমানবিক হয়ে উঠবে, মানুষ তার ব্যক্তিগত বোধি হারাবে। প্রথাগতরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্জন করেন নি, এক রকম দার্শনিকতাকেই, তা যতোই স্থূলভাবে হোক-না-কেনো, তাঁরা আশ্রয় করেছেন সব সময়। উনিশশতকের তুলনামূলক-কালানুক্রমিক

ভাষাতাত্ত্বিককেরা পরিত্যাগ করেছিলেন ব্যাকরণ, তাঁরা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন ভাষাবিবর্তনের বৈজ্ঞানিক সূত্র। তাঁদের পরে আসেন সাংগঠনিকগণ। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্যস্ত ছিলেন ভাষার খণ্ডাংশের বহিরঙ্গের বর্ণনায়; তাঁরা ভাষার সৃষ্টিশীলতা অনুধাবন করতে পারেন নি। রূপান্তর ব্যাকরণ জয় করতে চেয়েছে উভয় ত্রুটি : ভাষার সৃষ্টিশীলতা ও ভাষাভাষীর ভাষাবোধের আন্তর সূত্র সুস্পষ্ট, সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উদঘাটনই রূপান্তর ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (দ্র চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

ভাষাবর্ণনার কালাকালান্তর লক্ষ্য করলে ভাষাবর্ণনার চারটি ধারা চোখে পড়ে : (ক) প্রথাগত ব্যাকরণ, (খ) কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্ব, (গ) সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান, এবং (ঘ) রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। এ-ধারাগুলোর মধ্যে প্রথাগত ব্যাকরণের চর্চা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে, কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের চর্চা হয়েছে প্রধানত উনিশশতকে, বিশশতকের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম দশক প্রথাগত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের কাল; আর ১৯৫৭ সালে উদ্ভব ঘটে রূপান্তর ব্যাকরণের—পরবর্তী দশকগুলো নিয়োজিত থাকে রূপান্তর ব্যাকরণ চর্চায়। (১১) চিত্রে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সরলরূপে, দেখানো হলো (→ = '(আংশিকভাবে) উদ্ভূত', ⇐ ⇒ = 'উদ্ভূত ও প্রতিক্রিয়াজাত'; দ্র ইআকবসেন (১৯৭৭, ৬১))।

(১১)
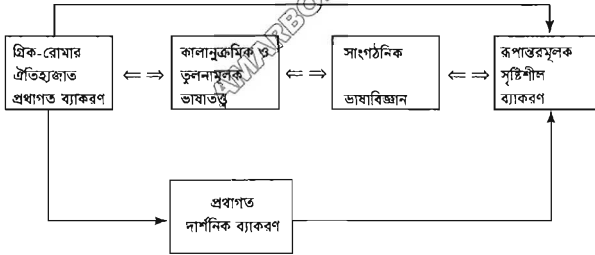
টীকা

[১] সোস্যুর থেকে উৎসারিত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি ধারা চোখে পড়ে : (ক) প্রাগ ধারা (ক্রবেৎস্কয়, ইআকবসেন); (খ) কোপেনহেগন ধারা (হিএলমশ্লেভ—তাঁর ধারা 'গ্লোসেম্যাটিকস' নামে পরিচিত); এবং (গ) মার্কিন ধারা (ব্লুমফিল্ড, হ্যারিস)। মার্কিন ধারা সোস্যুরের চিন্তা বিশেষ অনুসরণ করে নি : মার্কিন সাংগঠনিকেরা ইউরোপি ভাষাবিজ্ঞান ধারা থেকে সুদূরে স'রে গিয়েছিলেন। তাই তিরিশি সাংগঠনিকদের রচনায় সোস্যুরের নামের উল্লেখ পাওয়াও দুর্লভ ঘটনা। এ-ধারা তিনটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে নানা বিষয়ে— প্রতিটি ধারাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে ভাষার

কালকেন্দ্রিক ও কালানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে; এবং প্রতিটির ধারাই গুরুত্ব দেয় কালকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চায়। ধারা তিনটি মেনে চলেছে সারল্য, সুস্পষ্টতা, সামঞ্জস্য, নৈর্ব্যক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে অভিন্ন রীতিনীতি। তবে এদের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। প্রথাগত ভাষাবিশ্লেষণ ধারা পরিহার ক'রে নতুন উপায়ে ভাষাবর্ণনায় যাঁরা মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে যদি সাংগঠনিক ব'লে ধরি, তবে চোখে পড়ে আরো কয়েকটি উপধারা : (ক) জেনেভা ধারা (বালি, ফ্রেই); (খ) মস্কো ধারা (আভানেসভ, কুজনেকভ, সিদোরোভ), এবং (গ) লন্ডন ধারা (ফার্থ, হ্যালিডে)। রূপান্তর ব্যাকরণেরর উদ্ভবের আগে মার্কিন ধারাই ছিলো সবচেয়ে প্রভাবশালী।

[২] রূপান্তরবাদীরা স্যাপিরকে নানাভাবে সম্মানিত করেছেন। তাঁরা তাঁর অনেক বোধ স্মরণ করেছেন সশ্রদ্ধভাবে এবং স্যাপিরের অনেক রচনার নাম গ্রহণ করেছেন নিজেদের রচনার নামরূপে। স্যাপিরের একটি মূল্যবান ও অবহেলিত রচনার নাম 'সাউন্ড প্যাটার্ন্স ইন ল্যাংগুয়েজ' (১৯২৫)। এ-নাম অনুসরণে হাল তাঁর রুশধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের নাম রাখেন *সাউন্ড প্যাটার্ন অফ রাশিয়ান* (১৯৫৯); এবং চোমস্কি ও হাল তাঁদের সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক মহাগ্রন্থের নাম রাখেন *সাউন্ড প্যাটার্ন অফ ইংলিশ* (১৯৬৮)।

[৩] মরিস সোয়াডেশ 'ধ্বনিমূলিক নীতি' (১৯৩৪, ৪০-৪১) নামক প্রবন্ধ ধ্বনিমূল শনাক্তির জন্যে প্রস্তাব করেন নিম্নলিখিত পাঁচটি মৌল নীতি বা মানদণ্ড, ও একটি পরখপ্রণালি :

[ক] শব্দসামঞ্জস্যনীতি : শুধু শাব্দিবিকল্প ছাড়া কোনো শব্দ তার বিভিন্ন উপস্থিতিতে একই ধ্বনিমূলিক গঠনসম্পন্ন হয়। কোনো শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণে যদি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তবে ওই পার্থক্যসমূহ উপাদান-ধ্বনিমূলগুলোর বিভিন্ন মাত্রার বিকার ব'লে গণ্য করতে হবে।

[খ] আংশিক অভিন্নতানীতি : যে-সমস্ত শব্দযুগলের ধ্বনিক সাদৃশ্য রয়েছে, সেগুলোর অনুপুঙ্খ তুলনার মাধ্যমেই উপনীত হওয়া সম্ভব তাৎপর্যপূর্ণ মৌল ধ্বনি-প্রকার ধারণায়। তবে এ নীতিটি প্রয়োগের বেলা পরবর্তী নীতিটি স্মরণে রাখতে হবে সব সময়।

[গ] চিরসঙ্গনীতি : যদি কোনো ধ্বনিক বস্তুযুগল শুধুই একত্রে বসে, তবে তারা গঠন করে একটি ধ্বনিমূলিক এককধর্মী যৌগ। ওই যুগলের একটি বা উভয়ই ব্যবহৃত হ'তে পারে অন্য কোনো যৌগে, যৌগের এককধর্মী বৈশিষ্ট্য নষ্ট না ক'রে। এমন ক্ষেত্রে যে-সমস্ত ধ্বনিমূল একই ধ্বনিবস্তুসম্পন্ন, সেগুলো একই ধ্বনিমূল-শ্রেণীভুক্ত।

[ঘ] পরিপূরক বণ্টননীতি : যদি দুটি সদৃশ ধ্বনির মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ কোনো ধ্বনিক প্রতিবেশে স্বাভাবিকভাবে বসে, আর অন্যটি স্বাভাবিকভাবে বসে অন্য কোনো ধ্বনিক প্রতিবেশে, তবে ওই দুটি হ'তে পারে একই ধ্বনিমূলের দুটি উপরূপ।

[ঙ] বিন্যাসসঙ্গতিনীতি : বিশেষ বিশেষ ধ্বনিকে অভিন্ন বা বিভিন্ন ধ্বনিমূলরূপে শনাক্তির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ওই শনাক্তকরণ উপাত্ত-ভাষার সাধারণ ধ্বনিমূলিক বিন্যাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যেমন : নাভাহোর [ই] (যা শুধুই ব্যঞ্জনধ্বনির পরে বসে) আর [য] (যা শুধুই স্বরধ্বনির আগে বসে) পরিপূরক বণ্টনভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথক ধ্বনিমূল, কেননা নাভাহোতে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রক্ষিত।

কোনো ভাষার ধ্বনিমূল বিচারের সময় ব্যবহার করা দরকার নিচের উপকারী প্রণালিটি :

[চ] প্রতিকল্পনপ্রণালি : ধ্বনিমূল নির্ণয়ের সময় এক-একটি শব্দকে এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে যাতে ওই শব্দের অন্তত একটি ধ্বনিমূলের কিছুটা বিকার ঘটে। যদি ওই বিকার ভাষাভাষীদের কাছে গ্রাহ্য না হয়, তবে তা স্বাভাবিক বিকার বলে গণ্য। যদি ওই বিকার ভাষাভাষীদের পীড়িত করে, তবে তা স্বাভাবিকতা থেকে চরম বিকার, অর্থাৎ বিকৃতি। আর যদি বিকারের ফলে ভাষাভাষীরা কোনো নতুন শব্দ শোনে বা বোধ করে যে শব্দটির উচ্চারণে ভুল হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে ওই বিকার কোনো বিশেষ ধ্বনিমূলকে প্রতিকল্পিত করেছে অন্য কোনো ধ্বনিমূল দিয়ে।

পরিভাষা

অ

অ-অনন্য Non-unique
অ-অন্যপ্রতীক Non-terminal symbol
অকর্মক ক্রিয়া Intransitive verb
অক্রিয় রীতি Passive mode
অগণনীয় বিশেষ্য Non-count noun
অগ্রবর্তী Anterior
অগ্রবর্তী নাসিক্য ব্যঞ্জন Anterior nasal consonant
অঘোষ Voiceless, Non-voice
অঘোষ ধ্বনি Voiceless sound
অঘোষ স্বরধ্বনি Unvoiced vowel
অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্য Obligatory subject
অত্যাবশ্যক বিধেয় Obligatory predicate
অধিকরণ কারক Locative case
অধিকরণ রূপ Locative form
অধীন উপবাক্য Suboridnate clause
অধীন খণ্ডবাক্য Suboridnate clause
অধীন বাক্য Constituent sentence, Subordiante sentence
অধীনতাকরণ Hypotaxis, Subordination
অধীনতামূলক Subordinate
অধীনতামূলক উপবাক্য Subordinate clause
অধীনতামূলক প্রকেন্দ্রিক সংগঠন Subordinate endocentric construction
অধীনতামূলক সংযুক্ত বাক্য Subordinately conjoined sentence
অনব্যবহিত Non-immediate, Indirect
অনাসিক্য Non-nasal
অনির্দিষ্ট Indefinite
অনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ Indefinite noun phrase
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য Imperative sentence
অনুপুঙ্খতা Exhaustiveness
অনুমান Speculation
অনুশাসন Prescription
অনুসন্ধানপ্রণালি Field method
অন্ত্য উপাদান Ultimate constituent
অন্ত্যগ্রন্থি Terminal string
অন্ত্য প্রতীক Terminal symbol
অন্ত্য বৃত্ত Terminal node
অপবাক্য Non-sentence
অপাদান কারক Ablative case
অপাদানরূপ Ablative form
অপ্যারেটর Operator
অপ্রধান উপবাক্য Subordinate clause
অপ্রধান খণ্ডবাক্য Subordinate clause
অপ্রধান গঠক-শ্রেণী Minor form-class
অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য Inanimate noun
অবরোহী প্রণালি Deductive method
অবস্থা State
অবাক্য Non-sentence

অবিপ্রতীপ বন্টন Non-contrastive distribution
অবিভাজ্য Indivisible
অবিলম্ব মুক্তি Nondelayed release
অবিশ্লেষ্য Indivisible
অব্যবহিত Immediate
অব্যবহিত-উপাদান Immediate-constituent
অব্যবহিত-উপাদানকৌশল Immediate constituent analysis
অব্যবহিত-উপাদান ব্যাকরণ Immediate-constituent grammar
অভাষিক Non-linguistic
অভিজ্ঞতাবাদ Empericism
অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি Emperical method
অভিধা Epithet
অভিধান Lexicon, Dictionary
অভিধানপ্রণেতা/সংকলক Lexicographer
অভিহিত Nominative
অভিহিত রূপ Nominative form
অমনুষ্যবাচক বিশেষ্য Non-human noun
অমূর্ত Abstract
অমূর্ধন্য স্বরধ্বনি Non-retroflex vowel
অমৌল বাক্য Non-Kernel sentence
অর্থ Meaning
অর্থগত Semantic
অর্থতত্ত্ব Semantics
অর্ধস্বরধ্বনি Semi-vowel
অল্পপ্রাণ Non-aspirate
অশুদ্ধ Ungrammatical, Incorrect
অসংলগ্ন রূপমূল Discontinuous morphe
অস্তিত্ব Existence
অস্তিত্ববাচক/সূচক ক্রিয়া Existential verb
অসমাপিকা ক্রিয়া Nonfinite verb
অসমাপিকাভবন Infinitivalization
অসমাপিকা সম্পূরকীকরণ Infinitival complementation

আ

আকস্মিক শূন্যতা Accidental gap
আঙ্কিক ক্রমসংখ্যা Ordinal
আঙ্কিক সংখ্যা Numeral
আংশিক অভিন্নতানীতি Principle of partial identity
আচরণ Behaviour
আচরণবাদ Behaviourism
আচরণবাদী Behaviourist
আচরণবাদী মনস্তত্ত্ব Behaviourist Psychology
আজ্ঞাসূচক বাক্য Imperative sentence
আত্মবাচক সর্বনামীয়করণ Reflexivization
আত্মবিশ্লেষণাত্মক Self-explanatory
আদর্শ উপাত্ত Ideal data
আদর্শ পরিস্থিতি Ideal condition
আদর্শ বক্তাশ্রোতা Ideal speaker-hearer
আদর্শায়ন Idealization
আদর্শায়িত উপাত্ত Idealized data
আদিগ্রন্থি Initial string
আদিপ্রতীক Initial symbol
আদিম ধারণা Semantic primitive
আদেশাত্মক বাক্য Imperative sentence
আদেশ রূপান্তর Imperative transformation
আধার Form

আধিপত্য Dominance
আধেয় Content
আন্তর ক্রমবিন্যাস Intrinsic ordering
আন্তর বৈশিষ্ট্য Inherent feature
আন্তর সংগঠন Internal structure
আনুশাসনিক Prescriptive
আনুশাসনিক ব্যাকরণ Prescriptive grammar
আনুষঙ্গিক Associative
আবরণপ্রতীক Cover symbol
আবশ্যিক Obligatory
আবশ্যিক উপাদান Obligatory constituent
আবশ্যিক রূপান্তর(মূলক) সূত্র Obligatory transformational rule
আবিষ্কার প্রণালি Discovery procedure
আবেগসূচক বাক্য Exclamatory sentence
আবৃত Covered
আভিধানিক অর্থ Dictionary meaning
আভিধানিক উপকক্ষ Lexical subcomponent
আভিধানিক সংজ্ঞা Dictionary definition
আভ্যন্তর সংগঠন Underlying structure
আরোহী পদ্ধতি Inductive method
আর্থ Semantic, Notional
আর্থ উপস্থাপন Semantic representation
আর্থ কক্ষ Semantic component
আর্থ ক্যাটেগরি Semantic category
আর্থ গভীর তল Semantic deep structure
আর্থজ্ঞান Semantic knowledge
আর্থতত্ত্ব Semantic theory
আর্থত্রুটি Semantic deviation
আর্থ ধারণা Semantic concept
আর্থ পরমাণু Semantic atom
আর্থ প্রজেকশন সূত্র Semantic projection rule
আর্থ বৈশিষ্ট্য Semantic feature
আর্থ ব্যাকরণ Notional grammar
আর্থ মানদণ্ড Semantic criterion
আর্থ মিশ্রপ্রতীক Semantic complex symbol
আর্থ সংগঠন Semantic structure
আর্থ সংজ্ঞা Semantic definition
আর্থ সাম্য Semantic equivalence
আর্থ সূত্র Semantic rule
আলজিহ্ব্য Uvular
আশ্রিত উপবাক্য Dependent clause
আহরিত Derived
আহরিত অর্থ Derived meaning
আহরিত বাক্য Derived sentence
আহরিত সংগঠন Derived structure

ই

ইতিবাচক Affirmative

উ

উক্তি Utterance
উক্তি-একক Utterance-unit
উচ্চ High, Higher
উচ্চ উপাদান-শ্রেণী Higher constituent-class
উচ্চ ক্যাটেগরি Higher category
উচ্চতম বৃন্ত Highest node

উচ্চতর স্তর Higher level
উচ্চারক Articulator
উচ্চারণ স্থান Place of articulation
উত্তর-ব্লুমফিল্ডীয় Post-Bloomfieldian
উদ্দীপক Stimulus
উদ্দেশ্য Subject
উপগোত্র Sub-class
উপগ্রন্থি Sub-string
উপপদগত Subcategorial
উপবাক্য Clause
উপবিভাগ Sub-class
উপভাষা Dialect
উপভাষাতত্ত্ব Dialectology
উপযুক্ততার বহিঃশর্ত External condition of adequacy
উপযুক্ততার শর্ত Condition of adequacy
উপশ্রেণী Sub-class
উপশ্রেণীকরণ Sub-classification
উপস্থাপনা স্তর Representational level
উপাত্ত Data, corpus
উপাত্তবাদ Empericism
উপাত্তবাদী Emperical, Empericist
উপাদান Constituent
উপান্ত্যগ্রন্থি Preterminal string
উল্লম্ব Perpendicular

ঋ

ঋণাত্মক Negative

এ

এক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর Singulary transformation
একক Unit
একবচনত্ব Singularity
একবচনিক বিশেষ্য Singular noun
একমুখি Unidirectional
একাধিক-আভ্যন্তর সাংগঠনিক রূপান্তর Generalized transfomration

ঐ

ঐচ্ছিক Optional
ঐচ্ছিক উপাদান Optional constituent
ঐচ্ছিকতা Optionality
ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র Optional transformational rule
ঐতিহাসিক উপাত্ত Historical data

ক

কন্যা Daughter
কভার প্রতীক Cover symbol
কমার সাহায্যে সংযোজন Comma splice
করণ কারক Instrumental case
করোনাল Coronal
কর্তা Subject
কর্তা-থেকে-কর্মে-উন্নয়ন Subject-to-object raising
কর্তা থেকে স্থানান্তর Extraposition from subject
কর্তা-বিশেষ্যপদ Subject noun phrase
কর্তা-সম্পূরক Subject-complement
কর্তা স্থাপন Subject placement
কর্তৃকারক Agentive case
কর্তৃবাচ্য Active voice
কর্ম Object
কর্মকারক Accusative case
কর্মবাচ্য Passive voice

কর্ম-বিশেষ্যপদ Object noun phrase
কর্ম-সম্পূরক Object-complement
কল Device
কল্পজগত রচয়িতা ক্রিয়া World-creating verb
কক্ষ Component
কাঠামো Framework
কারক Case
কারক ব্যাকরণ Case grammar
কাল Tense
কালকেন্দ্রিক Synchronic
কালকেন্দ্রিক ভাষাবিজ্ঞান Synchronic linguistics
কালানুক্রমিক Diachronic
কালানুক্রমিক বর্ণনা Diachronic description
কালানুক্রমিক বিবর্তন Diachronic change
কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান/ভাষাতত্ত্ব Diachronic linguistics
কেন্দ্র-শাখায়ন Center-branching
ক্যাটেগরি Category
ক্যাটেগরিগত বৈশিষ্ট্য Categorial feature
ক্যাটেগরি সূত্র Categorial rule
ক্রম Order
ক্রমবিন্যাস Ordering
ক্রমবিন্যাসগত বিরোধ Ordering paradox
ক্রমসংখ্যা Ordinal
ক্রমস্তর Hierarchy
ক্রমস্তরিক Hierarchical
ক্রমস্তরিক বিন্যাস Hierarchical ordering
ক্রমহীন Unordered
ক্রিয়া Verb
ক্রিয়াজ শব্দ Verbal
ক্রিয়াজ বিশেষণ Participle
ক্রিয়াজ বিশেষ্য Gerund
ক্রিয়াজ বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়াবিশেষণ Infinitive
ক্রিয়াপদ Verb phrase
ক্রিয়াবিশেষণ Adverb
ক্রিয়াবিশেষণীয় Adverbial
ক্রিয়াবিশেষণধর্মী উপবাক্য Adverbial clause
ক্রিয়ামূল Verb root
ক্রিয়ারীতি Aspect
ক্রিয়ারূপ Verb form
ক্রিয়াসহায়ক Auxiliary
ক্লীবলিঙ্গ Neuter gender

খ

খণ্ড Segment
খণ্ডন Segmentation
খণ্ডবাক্য Clause

গ

গঠক Form, Formative
গঠক-শ্রেণী Form-class
গভীরতা Depth
গভীরতা তত্ত্ব Depth hypothesis
গভীর সংগঠন/তল Deep structure
গলানালীয় ধ্বনি Pharyngeal sound
গাঠনিক Derivational
গুণ Feature
গৌণ কর্ম Indirect object
গোলাকার বন্ধনি Round bracket
গ্রথিত বাক্য Embedded sentence

গ্রন্থন Embedding
গ্রন্থন প্রতীক Concatenating symbol
গ্রন্থন রূপান্তর Embedding transformation
গ্রন্থি string
গ্রহণযোগ্যতা Acceptibility

ঘ

ঘটমান Progressive
ঘোষ Voiced
ঘোষতা Voicing
ঘৃষ্টধ্বনি Affricate

চ

চক্রাবর্তন নীতি Cyclic principle
চতুর্বিদ্যা Quardrivium
চতুষ্কোণ বন্ধনি Square bracket
চোমস্কি-সংযোজন Chomsky-adjunction
চিরসঙ্গনীতি Principle of constant association
চৈতন্যবাদ Mentalism
চৈতন্যবাদী তত্ত্ব Mentalist theory

জ

জটিল উদ্দেশ্য Complex subject
জটিল বাক্য Complex sentence
জটিল বিধেয় Complex predicate
জটিল ভাষিক রূপ Complex linguistic form
জটিল রূপান্তর Complex transformation
জড়বাদীতত্ত্ব Materialistic theory
জাতি Genus
জাতিবাচক Generic
জাতিবাচক বিশেষ্য Generic noun
জিহ্বামূলীয় Velar

ঝ

ঝড়ঝঞ্ঝা আন্দোলন Sturm and Drang movement

ড

ডান-পৌনপুনিক সূত্র Right-recursive rule
ডান-শাখায়ন Right-branching
ডামিপ্রতীক Dummy symbol

ত

তত্ত্ব Theory
তত্ত্ব বৈধকরণ Theory validation
তথ্য Data, Fact
তথ্যদাতা Informant
তন্ত্র System
তরলধ্বনি Liquid
তরঙ্গতত্ত্ব Valentheoric
তল Plane, Structure
তারকাচিহ্ন Asterisk
তালব্য-দন্তমূলীয় অঞ্চল Palato-aveolar region
তির্যক শ্রেণীকরণ Cross-classification
তুলনামূলক ব্যাকরণ Vergleichende grammatik

তৃতীয় পুরুষ Third person
তৃতীয় বন্ধনি Third bracket

দ

দার্শনিক ব্যাকরণ Philosophical grammar
দীর্ঘ স্বরধ্বনি Long vowel
দুর্বল Weak
দুর্বলভাবে সমতুল্য Weakly equivalent
দুর্বল সৃষ্টিশক্তি Weak generative capacity
দৃঢ় Tense
দৃঢ় শব্দক্রম Fixed word-order
দ্বৈতক্রস Double cross
দ্বিতীয় পুরুষ Second person
দ্বিতীয় বন্ধনি Second bracket
দ্বিতীয় শব্দসংক্রাম Second lexicalization
দ্বিভাষা Diglossia
দ্বিমুখি Binary
দ্বিমুখি বৈপরীত্য নীতি Principle of binary opposition
দ্বিমুখি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য Binary distinctive feature
দ্বিসাংগঠনিক Double articulated
দ্বৈতকর্ম Double object
দ্ব্যর্থ Ambiguous
দ্ব্যর্থতা Ambiguity

ধ

ধনাত্মক Positive
ধাতু Root
ধারণা Concept

ধ্বনি Phone, Sound
ধ্বনি(ক) উপস্থাপন Phonetic representation
ধ্বনি-একক Sound-unit
ধ্বনি-খণ্ড Sound-segement
ধ্বনিতত্ত্ব Phonology
ধ্বনিতাত্ত্বিক Phonological
ধ্বনিতাত্ত্বিক তত্ত্ব Phonological theory
ধ্বনিতাত্ত্বিক গভীর সংগঠন Phonological deep structure
ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ Phonological conditioning
ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত Phonologically conditioned
ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনা Phonological description
ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র Phonological rule
ধ্বনি(তাত্ত্বিক) স্তর Phonological level
ধ্বনি-প্রতিলিপি Phonetic trancription
ধ্বনিপ্রতীকতা Sound symbolism
ধ্বনিমূল Phoneme
ধ্বনিমূলপরম্পরা Phoneme sequence
ধ্বনিমূল-শ্রেণী Phoneme-class
ধ্বনিমূল সংগঠন Phonemic structure
ধ্বনিমূলিক উপস্থাপন Phonemic representation
ধ্বনিমূলিক নীতি Phonemic principle
ধ্বনিরূপ Phonetic form
ধ্বনিলিপি Phonetic alphabet
ধ্বনি-শ্রেণী Sound-class
ধ্বন্যাত্মক শব্দ Onomatopoe(t)ic word

ন

নঞর্থক Negative
নবব্যাকরণবিদ Neogrammarian, Junggramatiker
নাদ Strident
নাম(বাচক) বিশেষ্য Proper noun
নাম-বিশেষণীয় খণ্ডবাক্য Adejective clasue
নাসিক্যীভবন Nasalization
না-সূচক Negative
নিম্ন Low, Lower
নিম্ন উপাদান Lower constiuent
নিম্নতম বৃন্ত Lowest node
নিম্নস্তর Lower level
নিরপেক্ষ কারক Neutral case
নির্দিষ্ট Definite
নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সংকেতসূচক প্রদর্শক Difinite deictic
নির্দিষ্টায়ন Difinitization
নির্দেশক Specifier
নির্দেশক সর্বনাম Deictic pronoun
নির্দেশ করা Refer
নির্বিশেষ Unspecific
নির্বিশেষ ভাষিক তত্ত্ব General linguistic theory
নির্বিশেষ সংখ্যাশব্দ Unspecific quantifier
নির্বিশেষীকরণ Generalization
নির্মিত বস্তু Artifact
নিষেধচিহ্ন Negative marker
নিষেধ রূপান্তর Negative transformation
নিষেধাত্মক Negative
নিষেধাত্মক রূপান্তর Negativc transformation
নিয়ন্ত্রণবাদ Determinism
ন্যূনতম শব্দজোড় Minimam pair
ন্যূনতম সার্থ একক Minimum meaningful unit
নেতিকরণ Negation
নৈর্ব্যক্তিকতা Impersonality

প

পংক্তি Row
পদ Phrase, category
পদগত Categorial
পদচিত্র Phrase marker
পদগত বিপর্যয় Categorial deviance
পদগত বৈশিষ্ট্য Categorial feature
পদগত যৌগিকতা Phrasal conjunction
পদগত সূত্র Categorial rule
পদপ্রতীক Category symbol
পদশ্রেণীকরণ Categorization
পদসাংগঠনিক উপকক্ষ Phrase structure sub-component
পদসাংগঠনিক কক্ষ Phrase structure component
পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ Phrase structure grammar
পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র Phrase structure rewrite rule
পরম্পরা Sequence
পরমাণুবাদ Atomism
পরমাণুবাদীতত্ত্ব Atomist theory

পরাবৈদ্যিক Metaphysical
পরিপূরক বণ্টন Complementary distribution
পরিপূর্ণ বিধেয় Complete predicate
পরিমাপক Quantifier
পরিমিতি Economy
পরীক্ষা ও ত্রুটি Trial and error
পরোক্ষ উক্তি Indirect speech
পরোক্ষ কর্ম Indirect Object
পর্যবেক্ষণসম্ভব Observable
পর্যবেক্ষণাত্মক যোগ্যতা Observational adequacy
পশ্চাতাভিমুখি Backward
পারস্পরিক নির্বাচন Cooccurence restriction
পারস্পরিক সংগঠন Reciprocal structure
পারস্পরিক স্থানান্তর Permutation
প্যারোল Parole
পার্টিসিপল পদ Participle phrase
পার্শ্বিক Lateral
পিতৃভাষা Grundsprache
পুঙ্খানুপুঙ্খতা Exhaustiveness
পুনরুদ্ধারযোগ্য Recoverable
পুনর্গঠন Reconstruction
পুনর্লিখন Rewrite
পুনর্লিখন প্রতীক Rewrite symbol
পুনর্লিখন সূত্র Rewrite rule
পূর্ণ অর্থ complete meaning
পূর্ণ উদ্দেশ্য Complete subject
পূর্ণ বিধেয় Complete predicate
পূর্ণ ভাব Complete sense
পূর্বধারণা Presupposition
পৌনপুনিক Recursive
পৌনপুনিক নীতি/তত্ত্ব Recursive principle
পৌনপুনিক শক্তি Recursive power
পৌনপুনিক সূত্র Recursive rule
প্রকল্পনা Speculation
প্রকাশ স্তর Expression level
প্রকেন্দ্রিক সংগঠন Endocentric construction
প্রক্রিয়ানির্দেশক সংকেত Operator
প্রতিকল্প Substitute
প্রতিকল্পন Substitution
প্রতিকল্পন-শ্রেণী Substitution-class
প্রতিবেদন Report
প্রতিবেশ Environment, Context
প্রতিবেশকাতর Context-sensitive
প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক ব্যাকরণ Context-sensitive phrase structure grammar
প্রতিবেশকাতর পদসাংগঠনিক পুনর্লিখন সূত্র Context sensitive phrase structure rewrite rule
প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত ব্যাকরণ Context-restricted grammar
প্রতিবেশনিয়ন্ত্রিত সূত্র Context-restricted rule
প্রতিবেশমুক্ত context-free
প্রতিবেশমুক্ত পদসাংগঠনিক সূত্র Conext-free Phrase structure rule
প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য Contextual feature
প্রতীক symbol

প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা Symbolic logic
প্রত্যক্ষ উক্তি Direct speech
প্রত্যক্ষ কর্ম Direct object
প্রত্যয়ান্ত্য ভাষা Inflectional language
প্রথম চক্র/বৃত্ত First cycle
প্রথম শব্দসংক্রাম First Lexicalization
প্রথা Nomos, Tradition
প্রথাগত (অনুশাসনিক) ব্যাকরণ Traditional (Prescriptive) grammar
প্রথাগত ব্যাকরণবিদ Traditional grammarian
প্রদর্শক Deictic
প্রধান উপবাক্য Main clause
প্রধান খণ্ডবাক্য Main clause
প্রধান গঠক-শ্রেণী Major form-class
প্রধান বাক্য Matrix sentence, main clause
প্রধান বিধেয় Main predicate
প্রশ্ন Question
প্রশ্নচিহ্ন Interrogative marker
প্রশ্নবোধক বাক্য Interrogative sentence
প্রশ্নাত্মক রূপান্তর Interrogative transformation
প্রসারক Modifier
প্রস্তাব Proposition
প্রলম্বিত Continuant
প্রক্ষেপণ সূত্র Projection rule
প্রয়োগ Performance
প্রাকরণিক Technical
প্রাতিকল্পনিক রূপান্তর Substitution transformation
প্রাত্যয়িক রূপতত্ত্ব Inflectional morphology
প্রাথমিক উপাত্ত Primary date

ফ

ফলাফলাত্মক উপবাক্য Resultative clause

ব

বংশতত্ত্ব Stammbaumtheorie
বক্তব্য Proposition
বক্তা speaker
বক্তার উদ্দীপক Speaker's stimulus
বক্তাশ্রোতা speaker-hearer
বচন Number
বন্টন Distribution
বন্টনশ্রেণী Ditribution-class
বন্টনিক বাক্যতত্ত্ব Distributional syntax
বন্টনিক মানদণ্ড Distributional criterion
বন্টনিত Distributed
বদ্ধরূপ Bound form
বন্ধনিকরণ Bracketing
বর্জন Delection
বর্তুল Round
বর্তুল বাক্য Rounded sentence
বর্ণনা Description
বর্ণনাত্মক যোগ্যতা Descriptive adequacy
বর্ণনামূলক Descriptive

বর্ণনামূলক ব্যাকরণ Descriptive grammar
বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান Descriptive linguistics
বস্তু ও প্রক্রিয়া Item and process
বস্তু ও বিন্যাস Item and arrangement
বস্তুগত Ojective
বহির্তল Surface structure
বহিঃসংগঠন Surface structure
বহুবচন-খণ্ড Plural segment
বহুবচন-খণ্ড রূপান্তর Plural segment transformation
বহুবচনচিহ্ন Plural marker
বহুবচনত্ব, বহুবচনতা Plurality
বাঁ-শাখায়ন Left-branching
বাক Speech
বাক্য Sentence
বাক্যকক্ষ Syntactic component
বাক্যকাঠামো Sentence-form
বাক্যতত্ত্ব syntax
বাক্যমূলক কর্তা Sentential subject
বাক্য সর্বনামীয়করণ Sentence pronominalization
বাক্যচিত্র Sentence diagram
বাক্যাংশ Part of speech
বাক্যিক Syntactic
বাক্যিক কক্ষ Syntactic component
বাক্যিক ক্যাটেগরি Syntactic category
বাক্যিক গভীর তল/গভীর সংগঠন Syntactic deep structure
বাক্যিক দ্ব্যর্থতা Syntactic ambiguity
বাক্যিক বহির্তল/বহিঃসংগঠন Syntactic surface structure
বাক্যিক বৈশিষ্ট্য Syntactic feature
বাক্যিক মানদণ্ড Syntactic criterion
বাক্যিক সংগঠন Syntactic structure
বাচ্য Voice
বাম-পৌনপুনিক সূত্র Left-rescurisve rule
বাস্তবায়ন Realization
বাহুল্য Redundancy
বাহুল্য বৈশিষ্ট্য Roundant feature
বাহুল্য সূত্র Redundancy rule
বাহ্যিক ক্রমবিন্যাস Extrensic ordering
বিকল্প Substitute
বিকল্প সম্প্রসারণ Alternative expansion
বিকল্প সাড়া Substitute response
বিকেন্দ্রিক সংগঠন Exocentric construction
বিঘ্নিত ধ্বনি Obstruent
বিচ্ছিন্ন উপাদান Discontinuous constituent
বিধেয় Predicate
বিন্যাসসঙ্গতিনীতি Criterion of pattern congruity
বিপ্রতীপ Contrastive
বিবৃত Open
বিবৃতি Statement
বিবৃতিধর্মী না-সূচক সংগঠন Declarative negative construction
বিবৃতিধর্মী হ্যাঁ-সূচক সংগঠন Declarative affirmative construction
বিভগ্ন তীর Broken arrow
বিভাজন Division
বিমানবিকীকরণ Dehumanization
বিমূর্ত Abstract

বিমূর্ত একক Abstract unit
বিমূর্তকরণ কারক Abstract Instrumental
বিমূর্ত প্রতীক Abstract symbol
বিলগ্ন রূপমূল Discontinuous morpheme
বিলুপ্ত শিরবিশেষ্য Deleted head noun
বিশেষ Specific
বিশেষক Modifier
বিশেষণ Adjective
বিশেষণ-উপবাক্য Adjectival clause
বিশেষণধর্মী Adjectival
বিশেষণীয় সম্পূরক Adjectival complement
বিশেষিত করা Modify
বিশেষ্য Noun
বিশেষ্য-উপবাক্য Noun clause
বিশেষ্যপদ Noun phrase
বিশেষ্যপদীয় Nominal
বিশেষ্যপদী গ্রন্থন Noun phrase embedding
বিশেষ্যপদীয় সম্পূরকীকরণ Noun phrase complementation
বিশেষ্যপদীয় সম্পূরক বাক্য Noun phrase complement clause
বিশেষ্যীকরণ Nominalization
বিশেষ্যীকৃত বিশেষ্যপদ Nominalized noun phrase
বিশ্বজনীন universal
বিশ্লিষ্ট ভাষা Isolating language
বিশৃঙ্খলা Anomaly
বিশ্লেষণাত্মকতা Analyticity
বিষয়গত সর্বজনীনতা Substantive universal

বুলিয়ান বিশ্লেষণ Boolean analysis
বৃত্তাকার Circular
বৃত্তি Function
বৃন্ত Node
বৃন্তনাম Node-label
বৃক্ষচিত্র Tree-diagram
বোধ বা ধারণা Concept, Notion
বোধিবাদ Mentalism
বৈপরীত্য Contrast
বৈপরীত্যসূচক Contrastive
বৈপরীত্যসূচক বন্টন contrastive distribution
বৈশিষ্ট্য Feature
বৈসাদৃশ্য Dissimilarity
ব্যত্যয় Anomaly
ব্যবহারিক ব্যাকরণ Grammar of usage
ব্যাকরণ Grammar
ব্যাকরণঅসম্মতপরম্পরা Ungrammatical sequence
ব্যাকরণ আবিষ্কারপ্রণালি Grammar discovery procedure
ব্যাকরণিক একক Grammatical unit
ব্যাকরণিক ক্যাটেগরি Grammatical category
ব্যাকরণিক গঠক-শ্রেণী Grammatical form-class
ব্যাকরণিক বর্ণনা Grammatical description
ব্যাকরণিক ভূমিকা Grammatical function
ব্যাকরণিক রূপ Grammatical form

ব্যাকরণিক সম্পর্ক Grammatical relation
ব্যাকরণিক সূত্র Grammatical rule
ব্যাকরণকাঠামো Grammatical framework
ব্যাকরণসম্মত Grammatical
ব্যাকরণসম্মতি Grammaticalness
ব্যাখ্যাত্মক যোগ্যতা Explanatory adequacy
ব্লুমফিল্ডীয় ভাষাবিজ্ঞান Bloomfieldean linguistics

ভ

ভগিনী Sister
ভঙ্গি Posture
ভবিষ্যদ্বাণী Prediction
ভাব Sense, Mood
ভাষা-অঞ্চল Linguistic area
ভাষা-অর্জন Language acquisition
ভাষা-অর্জন কল Language acquisition device
ভাষা-একক Linguistic unit
ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান Liguistics
(ভাষা)প্রয়োগ Performance
ভাষাবহির্ভূত Extralinguistic
(ভাষা)বোধ Competence
ভাষা-ব্যবহার Language use
ভাষা-সংগঠন Language structure
ভাষা-সমাজ Language community
ভাষা-সর্বজনীনতা Language universal
ভাষিক Linguistic
ভাষিক তত্ত্ব Linguistic theory
ভাষিক ধারণা Linguistic concept
ভাষিক প্রতীক Linguistic sign
ভাষিক বর্ণনা Linguistic description
ভাষিক রূপ Linguistic form
ভাষ্য Interpretation
ভাষ্যাত্মক Interpretive
ভিত্তি উপকক্ষ Base subcomponent
ভিত্তি গ্রন্থি Base string
ভিত্তি পদচিত্র Base phrase marker
ভিত্তি সূত্র Base rule
ভূমিকা Function
ভূমিকাগত ক্যাটেগরি Functional category
ভূমিকা-শব্দ Function-word
ভূমিকা-শব্দ-শ্রেণী Function word-class

ম

মধ্যগ্রন্থি Intermediate string
মধ্যবাচ্য Middle voice
মধ্য সংগঠন Intermediate structure
মনোভাবক শব্দ Interjection
মনোভাষাবিজ্ঞান Psycholinguistics
মন্তব্য Steatement
মহাপ্রাণ Aspirate
মানতত্ত্ব Standard theory
মানদণ্ড Criterion
মানরূপ Standard form
মিশ্রপ্রতীক Complex symbol
মিশ্রবাক্য Complex sentence

মিশ্র-যৌগিক বাক্য Complex-compound sentence
মুক্ত রূপ(মূল) Free from
মুখ্য কর্ম Direct object
মুখ্য ক্রিয়া Main verb
মূলভাষা Ursprache
মূর্ত Concrete
মূল্যায়নপ্রণালি Evaluation Procedure
মৃত রূপক Dead metaphor
মৌল পদচিত্র Base phrase marker
মৌল বাক্য Kernel sentence
মৌল সংগঠন Base structure

য

যন্ত্র Device
যন্ত্রবাদী তত্ত্ব Mechanistic theory
যান্ত্রিকতাবাদ Mechanistic theory
যুগ্ম Conjunct, Coordinate
যুগ্মবিশেষ্যপদ Coordinate noun phrase
যোগ্যতা Adequacy
যোগ্যতার শর্ত Conditions of adequacy
যোগ্যতার স্তর Levels of adquacy
যৌক্তিক কর্তা Logical subject
যৌগিক Coordinate
যৌগিক বাক্য Coordinate (conjoined) sentence
যৌগিক প্রকেন্দ্রিক সংগঠন coordinate endocentric construction
যৌগিক বিশেষ্যপদ coordinate noun phrase
যৌগিক ভাষা Agglutinating language
যৌগিক-মিশ্র বাক্য Compound-complex sentence
যৌগিক সংযুক্ত বাক্য Coordinately conjoined sentence

র

রণনশীল Sonorant
রীতি Mode
রীতিবাদী Modistae
রূপ Form
রূপগতভাবে Formally
রূপতত্ত্ব Morphology
রূপতাত্ত্বিক Morphological
রূপতাত্ত্বিক কক্ষ Morphological component
রূপতাত্ত্বিক স্তর Morphological level
রূপধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ Morphophonological component
রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন Morphophonological change
রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র Morphophonological rule
রূপধ্বনিমূল Morphophoneme
রূপমূল Morpheme
রূপমূলপরম্পরা Morpheme sequence
রূপমূল প্রতীক Morpheme symbol
রূপমূলসংগঠন Morphemic structure
রূপমূলিক খণ্ড Morphemic segment
রূপ-শ্রেণী Form-class
রূপান্তর Tranformation, Variant
রূপান্তর(মূলক) উপকক্ষ Transformational subcomponent

রূপান্তরবাদী Transformationalist
রূপান্তরমূলক Transformational
রূপান্তর ব্যাকরণ Transformational grammar
রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ Transfomrational generative grammar
রৌপ Formal
রৌপ বণ্টন Formal distribution
রৌপ বর্ণনা Formal description
রৌপ ব্যাকরণ Formal grammar
রৌপ মানদণ্ড Formal criterion
রৌপ সর্বজনীনতা Formal universal

ল

লিঙ্গ Gender

শ

শক্তিমান Strong
শক্তিমানভাবে সমতুল্য Strongly equivalent
শক্তিমান সৃষ্টিশক্তি Strong generative capacity
শংসামূলক অর্থ Referential meaning
শনাক্তি Identification
শব্দ ও শব্দ-শ্রেণী Word and Paradigm
শব্দকোষ Lexicon
শব্দক্রম Word-order
শব্দগাঠনিক রূপতত্ত্ব Derivational morphology
শব্দ-প্রতীক Word-symbol
শব্দবাদী Lexicalist
শব্দ-শ্রেণী Word-class
শব্দসামঞ্জস্যনীতি Criterion of consistency of words
শব্দসংক্রাম Lexicalization
শর্ত Condition
শর্তমূলক উপবাক্য Conditonal clause
শর্তমূলক বাক্য Conditional sentence
শাখায়ন Branching
শাব্দ-অভিন্নতা Lexical identity
শাব্দ ক্যাটেগরি Lexical category
শাব্দ রূপতত্ত্ব Derivational morphology
শাব্দ সূত্র Lexical rule
শারীরবাদ Physicalism
শির Head
শির বিশেষ্য Head noun
শুদ্ধ Grammatical
শুদ্ধতা Grammaticality, grammaticalness
শূন্য প্রতীক Empty symbol
শূন্যপৃষ্ঠা Tabula rasa
শূন্যবস্তু Zero element
শেষ চক্র Last cycle
শ্রেণী Class
শ্রেণীকরণ Classfication
শ্রেণী-প্রতীক Class symbol
শ্রেণীকরণী Taxonomic
শ্রেণীকরণী ভাষাবিজ্ঞান Taxonomic linguistics
শ্রোতার সাড়া Hearer's responsc

স

সংকেতবাচক সুনির্দেশক Deictic
সংকেতবাচক প্রদর্শক Demonstrative deictic

সংখ্যাশব্দ Quantifier
সংগঠন Structure
সঙ্গতি Concord, Agreement
সঙ্গতিবিধি Concord, Agreement, Selectional restriction
সঙ্গতি বৈশিষ্ট্য Selectional feature
সঙ্গতি সূত্র Selectional rule
সংযুক্ত বাক্য Conjoined sentence
সংযুক্ত প্রশ্ন Tag-question
সংযোগ চিহ্ন Concatenating symbol
সংযোজক Conjunction
সংযোজন Addition
সংক্ষেপক Abbreviator
সকর্মক Transitive
সমধ্বনিক Homophonous
সমধ্বনিক শব্দ Homophonous word
সমনির্দেশক Coreferential
সমনির্দেশক সূচি Coreferential index
সমবায়ী কাঠামো Compositional framework
সমাকৃতিক Identical
সমাজভাষাবিজ্ঞান Sociolinguistics
সমাপিকা ক্রিয়া Finite verb
সমাপ্ত ব্যুৎপত্তি Terminated derivation
সমার্থক Synonymous
সমার্থকতা Synonymy
সমীকরণ Equation
সম্পর্কিত বাক্য Related sentence
সম্পূরক Complement
সম্পূরক চিহ্ন Complementizer
সম্পূরক বাক্য Complement sentence
সম্পূরকী Complementizer
সম্পূরকীকরণ Complementation
সম্প্রসারক Modifier
সম্প্রসারণবাদী Expansionist
সম্প্রসারিত মানতত্ত্ব Extended standard theory
সম্বন্ধাত্মক সর্বনাম Relative pronoun
সম্মুখমুখি বিশেষ্যচ্যুতি Forward noun deletion
সরল Simple
সরল উদ্দেশ্য Simple Subject
সরল বাক্য Simple sentence
সরল বিধেয় Simple Predicate
সরল-বিবৃতিধর্মী-হ্যাঁ-সূচক বাক্য Simple declarative affirmative sentence
সরলরৈখিক Linear
সরল সংগঠন Simple structure
সর্বজনীন Universal
সর্বজনীন ব্যাকরণ Universal grammar
সর্বজনীন ভাষিক তত্ত্ব Universal linguistic theory
সর্বজনীন ভাষিক বৈশিষ্ট্য Universal linguistic feature
সর্বনাম Pronoun
সর্বনামীয়করণ Pronominalization
সসীম Finite
সসীম (অবস্থার) ব্যাকরণ Finite state grammar
সহজাত Inherent
সহজাত বোধ Inherent idea
সহজাত বৈশিষ্ট্য Inherent feature
সহধ্বনিমূল Allophone
সহরূপমূল Allmorph
সহাবস্থান Cooccurence
সহাবস্থানবিধি Cooccurence restriction
সহায়ক সংগঠন Constituent structure
সাংগঠনিক দ্ব্যর্থতা Structural ambiguity
সাংগঠনিকভাবে দ্ব্যর্থ Structurally ambiguous

সাংগঠনিক ধ্বনিতত্ত্ব Structural phonology
সাংগঠনিক বর্ণনা Structural description
সাংগঠনিক ব্যাকরণ Structural grammar
সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান Structural linguistics
সাংগঠনিক রূপতত্ত্ব Structural morphology
সাংগঠনিক রূপান্তর Structural transformation
সাধারণীকরণ Generalization
সাধারণত্ব শর্ত Condtion of generality
সামঞ্জস্য Consistency
সাম্পর্কিক বৈশিষ্ট্য Relational feature
সাম্য Equivalence
সার্থ Meanigful
সাড়া Response
সিদ্ধান্তপ্রণালি Decision procedure
সীমাচিহ্ন Boundary symbol
সুগঠিত Well-formed
সুমিতি Symmetry
সুশৃঙ্খল ধ্বনিতত্ত্ব Systematic phonology
সুষম বিধেয় Symmetrical predicate
সুস্পষ্ট Explicit
সূত্র Rule
সূত্রগত সর্বজনীনতা Formal universal
সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ Strict subcategorization
সূক্ষ্ম উপশ্রেণীকরণ-বৈশিষ্ট্য Strict subcategorial feature
সৃষ্ট Derived
সৃষ্টিশীল Generative
সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব Generative semantics
সৃষ্টিশীল ধ্বনিতত্ত্ব Generative phonology
সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ Generative grammar
স্কিমা Schema
স্তম্ভ Column
স্তর Level
স্তরক্রম Hierarchy
স্থানান্তরণ Extraposition
স্থানিক Local
স্বগ্রথিততা Self-embedding
স্বগ্রথিত বাক্য Self-embedded sentence
স্বভাববাদী Naturalist
স্বয়ংক্রিয় সাংগঠনিক বর্ণনা Automatic structural description
স্বাতন্ত্রিক অর্থ Differential meaning
স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য Distinctive feature
স্বাধীন উপবাক্য Independent clause
স্বাধীন ভাষিক রূপ Free linguistic form
স্বাধীন রূপ Free form
স্বাধীন রূপান্তর Free alternant
স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতত্ত্ব Autonomous syntax
স্বায়ত্তশাসিত ভাষাবিজ্ঞান Autonomous linguistics
স্মৃতিসহায়ক Memonic

হ

হ্যাঁ-সূচক Affirmative
হ্রস্বীকরণী রীতি Reductionist method

ক্ষ

ক্ষুদ্রতম(শব্দ)জোড় Minimal pair

রচনাপঞ্জি

এ-রচনাপঞ্জিতে গৃহীত হয়েছে দু-শ্রেণীর রচনা : [ক] এক শ্রেণীর রচনা গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেছে সরাসরি, এবং [খ] অন্য শ্রেণীর রচনা সাহায্য করেছে পরোক্ষভাবে। রচনাপঞ্জিটি প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত গ্রন্থটির সাথে। উৎসনির্দেশের প্রথাগত রীতি পরিহার ক'রে উৎস নির্দেশ করা হয়েছে গ্রন্থের ভেতরেই;— পাওয়া যাবে এমন নির্দেশ : (চোমস্কি (১৯৫৭, ১০))। সংকেতটি নির্দেশ করেছে চোমস্কির ১৯৫৭ অব্দে প্রকাশিত রচনার ১০ পৃষ্ঠার প্রতি। রচনাপঞ্জির সহায়তায় খুঁজে নিতে হবে তথ্য-উৎস। রচনাপঞ্জিতে প্রতিটি রচনার প্রথম প্রকাশকাল দেয়া হয়েছে; কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করেছি অন্য কোনো সংস্করণ, বা মুদ্রণ সেখানে কোন অব্দে প্রকাশিত মুদ্রণটি আমি ব্যবহার করেছি, তা জানানো হয়েছে রচনাবিবরণীতে। যেমন : চোমস্কি (১৯৫৭)-র সাথে সংলগ্ন গ্রন্থটির বিবরণীতে যদি পাওয়া যায় ১৯৬০-এর উল্লেখ, তবে বুঝতে হবে আমি ওই গ্রন্থটির ১৯৬০-এর সংস্করণ বা মুদ্রণ ব্যবহার করেছি।

আহমদ শরীফ (সম্পাদক)

১৩৮০ *ভাষাকথাক্রম*। ভাষা-সাহিত্য-পত্র, ১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, পৃ ১-৪৫।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১৯৪০ *বাংলাভাষার ব্যাকরণ*। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। সোনাডাঙ্গা : ফরিদপুর।

কালিদাস রায়

? *নব প্রবেশিকা ব্যাকরণ*। এ আর ব্যানার্জি য়্যাণ্ড ব্রাদার্স : কলকাতা।

গুরুপদ হালদার

১৩৫০ *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কালীঘাট-কালিকা-গ্রন্থমালা, ৬ : কলকাতা।

জগদীশচন্দ্র ঘোষ

১৩৪০ *আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ*। ২১তম সংস্করণ, ১৩৫৫। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি : ঢাকা।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)

১৩৭৭ *বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার : কলকাতা।

দেবকুমার দত্ত

?১৩৩৯ *বাংলা ব্যাকরণ*। নয়াবাজার : ঢাকা।

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ

? ১৩০৫ *ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। চতুর্থ সংস্করণ, ১৩১৫। কলকাতা।

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১৮৮৪ *সাহিত্য-প্রবেশ : এ গ্রামার অফ দি বেংগলি ল্যাংগুয়েজ*। সপ্তম সংস্করণ। স্যান্সক্রিট প্রেস ডিপোজিটরি : কলকাতা।

১৯৩৭ *বৃহৎ-সাহিত্য-প্রবেশ অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ*। ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরি : কলকাতা।

বিশ্বনাথ কবিরাজ

সাহিত্যদর্পণঃ।

মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও ইব্রাহিম খলিল

১৯৭২ *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। দ্বিতীয় ভাগ। পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ১৯৭৬। বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড : ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই

১৯৬৪ *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক

১৯৫২ *ব্যাকরণ-মঞ্জরী*। ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

? ১৩৪২ *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৪৭। দশম সংস্করণ, ১৩৫৬। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি : ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১৫ *শব্দতত্ত্ব*। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড)। ১৯৭৩। বিশ্বভারতী : কলকাতা।

১৩৩৬ *শেষের কবিতা*। ১৯৬৩। বিশ্বভারতী : কলকাতা।

১৯৩৮ *বাংলাভাষা-পরিচয়*। ১৯৬৯। বিশ্বভারতী। : কলকাতা।

রামমোহন রায়

১৮৩৩ *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*। *রামমোহন রচনাবলী*। ১৯৭৩। হরফ প্রকাশনী : কলকাতা।

লালমোহন বিদ্যানিধি

১৯১৯ *কাব্য-নির্ণয়*। নবম সংস্করণ। বিশ্বকোষ প্রেস : কলকাতা।

সংবৎ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৯ *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : কলকাতা।

১৯৭২ *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। নবীন সংশোধিত সংস্করণ। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

——— ও প্রিয়রঞ্জন সেন (সম্পাদক-অনুবাদক)

১৯৩১ *পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাম-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ বা বাঙ্গালা ও পোর্ত্তোগীস ভাষার শব্দকোষ*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : কলকাতা।

হরনাথ ঘোষ

? ১৯৩৭ *ভাষাপ্রবেশ ব্যাকরণ*। সপ্তদশ সংস্করণ। ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরি : ঢাকা।

——— ও সুকুমার সেন

১৩৫৬ *বাংলাভাষার ব্যাকরণ*। ষষ্ঠ সংস্করণ। কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ

১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা* : বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন (১৭৪৩-১৯৮৩)। প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা* : বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন (১৭৪৩-১৯৮৩)। দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

১৯৮৮ *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

Allen, H B (ed.,)

1958 *Readings in Applied English Linguistics*. Indian Edition, 1972. Amerind Publishing Co., : New Delhi.

Allen, W S

1951 *Phonetics in Ancient India*. London.

Anderson, J M

1971 *The Grammar of Case*. Cambridge University Press : London.

Apresjan, J D

1973 *Principles and Methods of Contemporary Structural Linguistics*. Transalted by Dina B Crockett. Mouton : The Hague.

Assumpcam, Manoel Da

1943 *Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez*. Lisboa.

Bach, E

1968 'Nouns and Noun Phrases'. In Bach and Harms (1968).

1971 *'Syntax since Aspecs'*. In O'Brien (1971).

Bach, E and R T Harms (ed.,)

1968 *Universals in Linguistic Theory*. Holt, Rinehart and Winston Inc : New York.

Bain, Alexander

1979 *A Higher English Grammar*. London

Barker, Russell H

1939 *The Sentence*. Rinehart and Co., : New York.

Bellart, Irena

1966 'On Certain Syntactical Properties of the English Connective "and" and "but". *In Transformational and Discourse Analysis Papers* : Zellig Harris. University of Pennsylvania : Philadelphia.

Belvalkar, S K

1915 *Systems of Sanskrit Grammar*. Poona.

Bierwisch, M

1970 'Semantics'. In Lyons (1970)

1971 'On Classifying Semantic Feature's. In Steinberg and Jakobovits (1971).

Bloch, B

1948 'A Set of Postulates for Phonemic Analysis'. *Language*, 24, 3-46.

Bloomfield, Leonard

1926 'A Set of Postulates for The Science of Language'. In Joos (1957).

1933 *Language*. 1965. Allen and Unwin Ltd : London.

Botha, R P

1968 *The Function of the Lexicon in Transformational Generative Grammar*. Mouton : The Hague.

Braun, Frank X

1947 *English Grammar for Language students*. Ann Arbor.

Bush, J T

1973 *The Scientific Approach*. Academic Press : London.

Carrol, J B

1953 *The Study of Language : A Study of Linguistics and Related Disciplines in Amrica*. Harvard University Press : Cambridge, Massachusetts.

Chomsky, Noam Abram

1956 Three Models for the Description of Language'. *IRE Transactions on Information Theory*. IT-2, 113-24.

1957 *Syntactic Structures*. Mouton : The Hague.

1958 'A Transformational Approach to Syntax'. In Fodor and Katz (1964).

1959 'A Review of B F Skinner's *Verbal Behavior*'. In Fodor and Katz (1964).

1961a 'On the Notion 'Rule of Grammar''. In Fodor and Katz (1964)

1961b 'Some Methodological Remarks on Generative Grammar'. In Allen (1958).

1961c 'Degrees of Grammaticalness'. In Fodor and Katz (1964).

1964 *Current Issues in Linguistic Theory*. Mouton : The Hague.

1965 *Aspects of the Theory of Syntax*. The MIT Press : Cambridge, Massachusetts.

1966a *Cartesion Linguistics : A Chapter in the History of Rationalist Thought*. Harper and Row : New York.

1966b *Topics in the Theory of Generative Grammar*. Mouton : The Hague.

1968 *Language and Mind*. Harcourt, Brace and World : New York.

1971 'Deep Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

1972 *Studies on Semantics in Generative Grammar*. Mouton : The Hague.

1975 *Reflections on Language*. Pantheon Books : New York.

Chomsky, Noam Abram and Morris Halle.

1968 *The Sound Pattern of English*. Harper and Row : New York.

Clark, Stephen W

1847 Practical Grammar.

Curme, George O

1931 *Syntax : A Grammar of the English Language*. Vol. III. D C Heath and Co., : Boston.

1947 *English Grammar*. 6th printing, 1955, Barnes and Noble Inc : New York.

Cushing, Steven

1972 'The Semantics of Sentence Pronominalization'. *Foundations of Language*. Vol 9, 168-208.

Dinnen, Francis P

1967 *An Introduction to General Linguistics*. Holt, Rinehart and Winston : New York.

Dougherty, Ray C

1970 'A Grammar of Coordinate Conjunction'. Part I. *Language*, Vol 46, 850-98.

1971 'A Grammar of Coordinate Conjunction'. Part II. *Language*, Vol 47, 298-339.

Faulkner, Claude W

1950 *Writing Good Sentences* : A Functional Approach to Sentence Structure, Grammar and Punctuation. Charles Scribner's Sons : New York.

Ferguson, Charles A and Munier Chowdhury.

1960 'The Phonemes of Bengali'. *Language*, 36 : 1, 23-59.

Fillmore, Charles J

1966a 'Toward a Modern Theory of Case'. In Reibel and Schane (1969).

1966b 'A Proposal Concerning English Prepositions'. In *Monogroph Series on Language and Linguistics*, No 19. Georgetown University Press : Washington.

1968a 'The Case for Case'. In Bach and Harms (1968).

1968b 'Lexical Entries for Verbs'. *Foundations of Language*, Vol 4, 373-393.

1969 'Types of Lexical Information'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

1971 'Some Problems for Case Grammar'. In O'Brien (1971).

Filmore, Charles J and D T Langendoen (eds.,)

1971 *Studies in Linguistic Semantics*. Holt, Rinehart and Winston : New York.

Fodor J A.and J J Katz (eds.,)

1964 *The Structure of Language* : Readings in the Philosophy of Language. Prentice-Hill Inc : New Jersey.

Firics, Charles Carpenter

1952 *The Structure of English* : An Introduction to the Construction of English Sentences. 3rd Impression, 1961. Longmans, Green and Co., : London.

1961 'Advances in Linguistics'. In Allen (1958).

Fudge, E C (ed.,)

1973 *Phonology*. Penguin Books : London.

Gardiner, Allen H

1932 *Theory of Spech and Language*. Clarendon press : London.

Gleason, H A

1955 *An Introduction to Descriptive Linguistics*. Indian Edition, 1970. Oxford and IBH Publishing Co., : Delhi.

1965 *Linguistics and English Grammar*. Holt, Rinehart and Winston Inc : New York.

Gleitman, L R

1965 'Coordinating Conjunctions in English'. In Reibel and Schane (1969).

Green, Judith

1972 *Psycholinguistics : Chomsky and Psychology*. 1974. Penguin Education.

Greenberg. J H

1966 *Language Universals*. Mouton : The Hague.

Halhed, Nathaniel Brassy

1778 *A Grammar of the Bengal Language*. Hoogly. Unabridged Facsimile edition, 1980. Ananda Publishers Private Limited : Calcutta.

Halle, M

1959 *The Sound Pattern of Russian*. Mouton : The Hague.

1962 'Phonology in Generative Grammar'. In Fodor and Katz (1964).

Harman, G (ed.,)

1974 *On Noam Chomsky*. Anchor Books : New York.

Harris, Zellig

1942 'Morpheme Alternants in Linguistic Analysis'. In Jos (1957).

1946 'From Morpheme to Utterance'. In Joos (1957).

1951 *Structural Linguistics* (Formerly entitled *Methods in Structural Linguisics)*. 1964. University of Chicago Press : Chicago.

1954 'Distributional Structure'. In Fodor and katz (1964).

1957 'Cooccurence and Transformation in Linguistic Structure'. In Fodor and Katz (1964).

Haugen, E

1951 'Directions in Modern Linguistic'. In Joos (1957).

Hill, A

1961 'Grammaticality'. In Allen (1958).

Hockett, Charles F

1947 'Problems of Morphemic Analysis'. In Joos (1957).

1948 'A Note on 'Structure". In Joos (1957).

1954 'Two Models of Grammatical Description'. In Joos (1957).

1958 *A Course in Modern Linguistics*. Indian Edition, 1970. Oxford and IBH Publishing Co., : Delhi.

House, H C and S E Harman

1931 *Descriptive English Grmmar*. 13th Printing, 1947. Prentice-Hill Inc : New York.

Householder, F W (ed.,)

1972 *Syntactic Theory 1 : Structuralist*. Penguin Books : London.

Huddleston, R

1976 *An Introduction to English Transformational Syntax* Longmans : London.

Humayun Azad

1977 'Reflexivization in Bengali'. *Jahangirnagar Review*, 1 : 1, 128-159.

1978 'Reciprocal Structures in Bengali'. Jahangirnagar Review, 2 : 1, 171-190.

1983 *Pronominalization in Bengali*. University o Dhaka : Dhaka.

Hymes, D

1972 'Review of *Noam Chomsky*'. In Harman (1974).

Jackendoff, Ray C

1972 *Semantic Interpretation in Generative Grammar*. The MIT Press : Cambridge, Massachusetts.

Jacobs, R A and P S Rosenbaum

1968 *English Transformational Grammar*. 1970. Ginn and Company Ltd : London.

Jacobs, R A and P S Rosenbaum (ed.,)

1970 *Readings in English Transformational Grammar*. Ginn and Company Ltd : Massachusetts.

Jacobsen, B

1977 *Transformational Generative Grammar*. North-Holland Publishing Co., : Amsterdam.

Jakbson, R and M Halle

1956 *Fundamentals of Language*. Mouton : The Hague.

Jespersen, Otto

1924 *The Philosophy of Grammar*. Reprint, 1935. Allen and Unwin Ltd : London.

Jones, Daniel

1957 "The History and Meaning of the Term 'Phoneme". In Fudge (1973).

Jones, E S

1935 *Practice-Handbook in English*. Appleton-Century Crofts : New York.

Joos, M (ed.,)

1957 *Readings in Linguistics* : The Development of Descriptive Linguistics in America since 1925. American Council for Learned Societies : Washington.

Katz, J J

1964 'Semi-Sentence'. In Fodor and Katz (1964).

1972 *Semantic Theory*. Harper and Row : New York.

Katz, J J and J A Fodor

1963 'The Structure of a Semantic Theory'. In Fodor and Katz (1964).

Katz, J J and P M Postal

1964 *An Inegrated Theory of Linguistic Descriptions*. The MIT Press : Cambridge, Massachusetts.

Kempson, R M

1977 *Semantic Theory*. Cambridge University Press : Cambridge.

Kierzek, J M

1947 *The Macmillan Handbook of English*. 1940. Macmillan Co., : New York.

Kierzek, J M and W Gibson

1960 *The Macmillan Handbook of English*. Fifth Printing, 1965. Macmillan Co., : New York.

Kiparsky, Paul and Carol Kiparsky

1971 'Fact'. In steinberg and Jakobovits (1971).

Klima, E S

1964 'Negation in English'. In Fodor and Katz (1964).

Koutsoudas, Andreas

1966 *Writing Transformational Grammar* : An Introduction. McGraw-Hill Inc.

Kuhn, T

1962 *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago University press : Chicago.

Lakoff, George

1970 *Irregularity in Syntax*. TAS in Linguistics : New York.

1971a 'On Generative Semantics'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

1971b 'Presuppostion and Relative Well-formedness'. In Steinberg and Jokobovits (1971).

Lakoff, George and S Peters

1966 'Phrasal Conjunction and Symmetrical Predicates'. In Reibel and Schane (1969).

Leech, G

1969 *Towards a Semantic Description of English*. Longmans : London.

1974 *Semantics*. Penguin Books : London.

Lees, Robert B

1957 'Review of *Syntactic Structures*'. In Harman (1974).

1960 *The Grammar of English Nominalization*. Mouton : The Hague.

1962 'Transformational Grammar and Fries' Framework'. In Allen (1958).

Lowth, Robert

1762 *A Short Introduction to English Grammar*, With Critical Notes.

Lyons, John

1966 'Towards a 'National' Theory of the 'Parts of Speech'. *Journal of Linguistics*, Vol 2, 209-36.

1968 *Introduction to Theoretical Linguistics*. 1974. Cambridge University Press : London.

1970a *Chomsky*. Fontana Modern Masters Sereies : London.

1970b *New Horizons in Linguistics*. 1971. Penguin Book : London. ed.

1970c 'Generative Syntax'. In Lyons (1970b).

1977 *Semantics*. 2 Vols. Cambridge University Press : Cambridge.

Macley, H

1971 'Overview'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

Macdonell, A A

1916 *A Vedic Grammar for Students*. Clarendon Press : Oxford.

1927 *A Sanskrit Grammar for Students*. 3rd Edition. Oxford University Press : London.

Matthews, G H

1964 *Hidasta Syntax*. Mouton : The Hague.

Matthews, P H

1970 'Recent Developments in Morphology'. In Lyons (1970b).

1974 *Morphology* : An Introduction to the Theory of Word-Strcuture. Cambridge University Press : Cambridge.

McCawley, James D

1968a 'The Role of Semantics in a Grammar'. In Bach and Harms (1968).

1968b 'Concerning the Base Component of a Transformational Grammar'. *Foundations of Language,* Vol 4, 243-69.

1970a 'Where do Noun Phrases Come Form? In Steinberg and Jakobovits (1971).

1970b 'English as a VSO Language'. *Language,* 46, 286-99.

1971a 'Interpretive Semantics Meets Frankenstein'. *Foundations of Language,* 7, 285-95.

1971b 'Prelexical Syntax'. In O'Breien (1971).

McMordie, W

1911 *English Grammar*. Henry Frowde : London.

Moreshwar Ramchandra Kale

1931 *A Higher Sanskrit Grammar*. 7th Edition, Gopalnarayan and Co., : Bombay.

Nesfield, J C

1895 *Idiom, Grammar and Synthesis*. 1921. Macmillan and Co., : Bombay.

Nida, Eugine A

1946 *Morphology* : The Descriptive Analysis of Words. Second Edition, 1957. University of Michigan Press : Ann Arbor.

1948 'The identification of Morphemes'. In Joos (1957).

1960 *A Synopsis of English Syntax*. 1966. Mouton : The Hague.

O'Brien, R J (ed.,)

1971 *Report of the Twenty-Second Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language*. Georgetown University press : Washington.

Pence, R W.

1947 *A Grammar of Present-Day English*. 5th Printing, 1952. Macmillan Co., : New York.

Perera, H S and D Jones
1919 *Colloquial Sinhalese Reader*. Manchester University press.

Popper, Karl R
1963 *Conjectures and Refutations* : The Growth of Scientific Knowledge. Routlege and Kegan Paul : London.

Postal, Paul M
1964a *Constituent Structure* : A Study of Contemporary Models of Syntactic Descriptions. Bloomington.
1964b 'Limitaitons of Phrase structure Grammars'. In Fodor and Katz (1964).
1968 *Aspects of Phonological Theory*. Harper and Row : New York.
1968b 'Epilogue'. In Jacobs and Rosenbaum (1968).
1971 'On the Surface Verb 'Remind''. In fillmore and Langendoen (1971).

Prabhatchandra Chakravarty
1925 *Linguistic Speculations of the Hindus*. Part 2 : *Semantics*. Calcutta.
1930 *The Philosphy of Sanskrit Grammar*. University of Calcutta : Calcutta.
1933 *Linguistic Speculations of the Hindus*. University of Calcutta : Calcutta.

Pradipkumar Mazumder
1977 *The Philosophy of Language* : In the Light of Paninian and Mimamsaka Schools of Indian Philosophy. Sanskrit Pustak Bhandar : Calcutta.

Priestly, Joseph
1761 *The Rudiments of English Grammar*.

Quirk, R and S Greenbaum
1973 *A University Grammar of English*. New Impression, 1976. Longmans : London.

Red, Alonzo and Kellog, Brainerd
1877 *Higher Lessons in English*.

Reibel, D A and S A schane (eds.,)
1969 *Modern Studies in English* : Readings in Transformational Grammar. Prentice-Hill Inc : New Jersey.

Ries, John
1894 *Was ist ein Satz?* Marburg. Revised Edition, 1931, Prague.

Robins, R H
1967 *A Short History of Linguistics*. 1976. Longmans : London.
Rosenbaum, P S
1967 *The Grammar of English Predicate Complement Constructions*. The MIT Press : Cambridge, Massachusetts.
Ross, J Robert
1967 *Constraints on Variables in Syntax*. Mimeographed. Bloomington : Indiana.
1970 'On Declarative Sentences'. In Jacobs and Rosenbaum (1970).
1970b 'Gapping and the Ordering of Constituents'. In *Progress in Linguistics*. Edited by Bierwisch and Heidelph (1970). Mouton : The Hague.
Rowe, F J and W T Webb
1897 *Hints on the Study of English*. 1915. Macmillan Co., : London.
Sapir, Edward
1921 *Language*. New York.
1925 'Sound Patterns in Language'. In Joos (1957).
Saussaure, F de
1915 *Course in General Linguistics*. Translated by W Baskin. 1966. McGraw-Hill Book co., : New York.
Schane, S A
1966 *A Schema for sentence Coordination*. Mitre Corp : Bedford.
Searle, J
1972 'Chomsky's Revolution in Linguistics'. In Harman (1974).
Seidel, Eugen
1935 *Geschichte und Kritik der Wichtigsten Satzdefinitionen*. Jena.
Smith, C S
1969 'Ambiguous Sentences with 'And''. In Reible and Schane (1969).
Steinberg, D D and L A Jakobovits (eds.,)
1971 *Semantics* : An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology. Cambride University press : Cambridge.
Stockwell, R P, B Schachter and B H Partee
1973 *The Major Syntactic Structures of English*. Holt, Rinehart and Winston : New York.

Sunden, Kari F

1941 *Linguistic Theory and The Essence of the Sentence*. Gotenbergs Hogaskolasarsskrift. 47, No. 5.

Swadesh, Morris

1934 'The Phonemic Principle'. In Joos (1957), and in Fudge (1971).

Tanner, W M

1928 *Correct English*. 1945. Ginn and Co., : Boston.

Trubetzkoy, N S

1939 'Phonemes and How to Detrmine Them'. In Fudge (1973).

Twaddell, W F

1935 'On Defining the Phoneme'. In Joos (1957).

Walcott, F G, C D Thorpe and S P Savage

1940 *Growth in Thought and Expression*. Benjamin H Sanboru and Co., Chicago.

Warfel, H R, E G Matthews and J C Bushman

1949 *American College English*. American Book Co., : New York.

Warriner, J E

1951 *Handbook of English*. Book Two. Harteourt, Brace and Co., : New York.

Watts, B M.

1944 *Modern Grammar at Work*. Houghton Mifflin and Co., : Boston.

Weinreich, Uriel

1966 'Explorations in Semantic Theory'. In Steinberg and Jakobovits (1971).

Wells, R S

1947 'Immediate Constituents'. In Joos (1957).

Wierzbicka, Anna

1967 'Against 'Conjunction Reduction''. Unpublished Paper.

Williams, Monier

1857 *A Practical Grammar of the Sanskrit Language* Arranged with Reference to the Classical Languages of Europe for the Use of English Students. 2nd Edition, MDCCLVII. 4th Edition: Enlarged and Improve, 1977 Clarendon Press : Oxford.

Yngve, V

1961 'Depth Hypothesis'. In Householder (1972)

নির্ঘণ্ট

খ

গ

ফ

য

র

ল

হ

ক্ষ